ইসলামি আইনের মূলনীতি

মুহাম্মদ হাশিম কামালী

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

ইসলামি আইনের মূলনীতি

মুহাম্মদ হাশিম কামালী

অনুবাদ
মো: সাজ্জাদুল ইসলাম

Since 1989

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

www.pathagar.com

ইসলামি আইনের মূলনীতি

লেখক : মুহাম্মদ হাশিম কামালী

অনুবাদ : মো: সাজ্জাদুল ইসলাম

ISBN : 978-984-8471-29-6

প্রকাশক
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)
বাড়ি # ০৪, রোড # ০২, সেক্টর # ০৯, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০
ফোন : ০২ ৮৯১৭৫০৯, ০২ ৮৯২৪২৫৬
E-mail : biit_org@yahoo.com, publicationbiit@gmail.com
Website : www.iiitbd.org

© বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

প্রথম প্রকাশ

সেপ্টেম্বর : ২০১৪

আশ্বিন : ১৪২১

জিলকদ : ১৪৩৫

মূল্য : ৪৫০.০০ টাকা US.$. 55

Islami Ainer Mulniti (Principals of Islamic Jurisprudence)' originally written by Muhammad Hashim Kamali. Translated by Md. Sajjadul Islam. Published by Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT), House # 04, Road # 02, Sector # 09, Uttara Model Town, Dhaka-1230, Bangladesh. Phone : 02 8917509, 02 8924256, E-mail : *biit_org@yahoo.com, publicationbiit@gmail.com* Web : *www.iiitbd.org* Price: Tk. 450.00, US.$. 55

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মূলনীতি ও পদ্ধতিগুলো একত্রে উসুল আল ফিকহ্ বলে পরিচিত। আর উসুল আল ফিকহ্তে বিভিন্ন নির্দেশনা ও পদ্ধতির বিবরণ রয়েছে। একে উৎস ও আইনশাস্ত্র বিষয়ক বিজ্ঞানও বলা হয়ে থাকে কেননা উসুল আল ফিকহ্ ও শরিয়তের অন্যান্য শাখা সার্বিকভাবে সবচেয়ে প্রভাবশালী ও শ্রেষ্ঠতম উৎস আল্লাহ্ তায়ালার বাণীর (ওহি) স্বীকৃতির সাক্ষ্য বহন করে এবং তার স্থান সব ধরনের যুক্তি ও মানব রচিত আইনের অনেক উর্ধ্বে। ইসলামি আইনের এ দিকটি সাধারণভাবে স্বীকৃত তথাপি মূল আরবি রচনাগুলোয় ইসলামি আইনের বিস্তারিত দিক প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট ওহি যেভাবে গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয়েছে ইংরেজি রচনাগুলোতে তা সেভাবে দেখতে পাওয়া যায় না।

তাই মুহাম্মদ হাশিম কামালী তার ইংরেজি গ্রন্থ Principals of Islamic Jurisprudence এ আরবি সূত্রসমূহে উসুল আল ফিকহ্র যেসব বিষয়বস্তু দেখতে পেয়েছেন কেবল সেগুলোই নয় উপরন্তু উৎসের যেসব বিষয়বস্তু তিঁনি বিবেচনা করেছেন সেগুলোকে তার যথাযথ বক্তব্য ও চেতনার আলোকে এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। লেখক বিভিন্ন মত ও মূলনীতির তত্ত্বীয় আলোচনার সমর্থনে কুরআন, সুন্নাহ ও সুস্বীকৃত গ্রহণযোগ্য রচনাগুলো থেকে ঘনঘন উদাহরণ পেশ করেছি অর্থাৎ মাজহাবগুলো যে কর্তৃত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার সাথে সঙ্গতি রেখে তাদের রচনাগুলোকে ব্যবহার করেছেন। বিআইআইটি মনে করে ইসলামি শরিয়াহ'র এ বিষয়গুলো সুষ্ঠভাবে অনুধাবন করার জন্য Principals of Islamic Jurisprudence ইংরেজি বইটি বাংলায় অনুবাদ করা প্রয়োজন।

বইটি ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদের সুকঠিন কাজটি অত্যন্ত সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় সম্পন্ন করে মো: সাজ্জাদুল ইসলাম আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। তদুপরি বইটি যত্ন সহকারে সম্পাদন কারেছেন এম জহুরুল ইসলাম *এফসিএ*। বিআইআইটি কর্তৃপক্ষ বইটি পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে সত্যিই আনন্দিত। বইটি প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

প্রফেসর ড. আবু খলদুন আল-মাহমুদ
ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রকাশনা
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

ইসলামিক ইনস্টিটিউটগুলোর আইন শিক্ষার পাঠ্যতালিকায় উসুল আল ফিকহ্ সব সময়ই একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। শরিয়ত জানার একটি বিষয় হিসেবে উসুল আল ফিকহতে ইসলামি আইনের উৎসগুলো ও এর বিকাশের পদ্ধতি অধ্যয়নকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এমনকি এ কথাও বলা যায় যে ইসলামি জ্ঞানের যেকোনো শাখা সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন ও উপলব্দির জন্য উসুল আল ফিকহ্ তার নির্দেশিত সুনির্দিষ্ট কাঠামোর বাইরে কিছু মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে। ইংরেজি ভাষায় পর্যাপ্ত পাঠ্য উপকরণ, বিশেষ করে উসুল আল ফিকহর ওপর গ্রন্থের অভাবের কারণে এ ভাষাতে ইসলামি আইনের ওপর শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে। এ কারণে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাসূচিতে শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী ও পাঠকরা দীর্ঘদিন ধরে উসুল আল ফিকহর ওপর একটি ব্যাপকভিত্তিক গ্রন্থের অভাব বোধ করে আসছিলেন। তাই এ বিশ্ববিদ্যালয়ে উসুল আল ফিকহ্ অধ্যয়ন অথবা শিক্ষার সাথে যারা জড়িত আছেন তাদের সবাই ড. হাশিম কামালীর এ অবদানকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ ও প্রশংসা করেছেন। ১৯৮৯ সালে প্রাথমিকভাবে কুয়ালালামপুরে প্রকাশিত হওয়ার পর বইটি ইতোমধ্যে উসুল আল ফিকহর ওপর সুস্বীকৃতি লাভ করে ও সর্বাধিক পঠিত রেফারেন্স গ্রন্থে পরিণত হয়েছে। প্রচলিত ধারার বাইরে প্রফেসর কামালীর রচনাশৈলীর মনোমুগ্ধকর অভিনবত্বের সঙ্গে সঙ্গে তার এ গ্রন্থ অকাট্য যুক্তি ও সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে রচিত এবং বিষয়ে আরবি উৎসগুলোর সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। ইসলামিক ও পশ্চিমা উভয় আইনে প্রশিক্ষণের ব্যাপারে লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিষয় এ গ্রন্থে প্রতিফলিত হয়েছে, তিনি বারংবার ইসলামি আইনের সাথে পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতির তুলনা করেছেন।

এ সুযোগে আমি মূল্যবান অবদানের জন্য প্রফেসর কামালীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই। এ ছাড়া বইটির নতুন ও আরো পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশ করার যে উদ্যোগ যুক্তরাজ্যের ক্যামব্রিজ ইসলামিক টেক্সট সোসাইটি গ্রহণ করেছে আমি তাকেও মোবারকবাদ জানাচ্ছি। ইংরেজি ভাষার উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ইসলামিক জুরিস্প্রুডেন্সের যেসব ছাত্রছাত্রী ও পাঠকরা আরবি পড়তে জানেন না তাদের জন্য বইটি অত্যন্ত সহায়ক হবে। উসুল আল ফিকহর বিষয়ে গভীর ও বিস্তারিত তথ্য এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে, যা কেবলমাত্র মূল আরবি সূত্রে পাওয়া যেতে পারে বলে আশা করা যায়। বইয়ের মুখবন্ধে লেখক নিজেই এ গ্রন্থ রচনার

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে তার দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এ প্রসঙ্গে মন্তব্যকালে প্রফেসর কামালী ইংরেজি ভাষায় উসূল আল ফিকহ্‌র ওপর বিদ্যমান সাহিত্যকে সাদামাটা ও অপূর্ণাঙ্গ উল্লেখ করে বলেন যে, এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান লাভের জন্য তা অত্যন্ত অপ্রতুল।

লেখনীর মাধ্যমে আমাদের জ্ঞান ও উপলব্ধির ভাণ্ডারকে আরো সমৃদ্ধ করতে প্রফেসর হাশিম কামালীর অব্যাহত প্রচেষ্টার আরো বড় ধরনের সাফল্য কামনা করছি।

প্রফেসর তান সিরি দাতুক আহমদ ইব্রাহীম
ডিন/শায়েখ, ফ্যাকাল্টি অব ল'জ
ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়া

www.pathagar.com

সূচি

ভূমিকা	১-১৪
প্রথম অধ্যায়	১৫-২৮
উসুল আল ফিকহ্-এর পরিচিতি	১৫
সংজ্ঞা ও পরিসর	১৫
উৎসসমূহে প্রাপ্ত নির্দেশনা থেকে ফিকহর নিয়মনীতি	১৫
উসুল আল ফিকহ অধ্যয়নের দুই পদ্ধতি	২২
শরিয়াহর সাক্ষ্য প্রমাণ (*আল আদিল্লাহ আল শরিয়াহ*)	২৪
দ্বিতীয় অধ্যায়	২৯-৬৪
শরিয়াহর প্রথম উৎস : আল কুরআন	২৯
কুরআনের বিধিবিধানের বৈশিষ্ট্য	৩৬
সুনির্দিষ্ট (কাতয়ী) ও অনুমানমূলক (যন্নী)	৩৬
সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত (আল ইজমাল ওয়াল তাফসির)	৪৬
পাঁচটি মূল্যবোধ (আহকাম)	৫১
কুরআনের সংঘটন প্রণালী (তালিল)	৫৩
কুরআনের অনন্য বৈশিষ্ট্য (ইযাজ)	৫৭
নাজিলের উপলক্ষ (আসবাব আল নুজুল)	৫৯
তৃতীয় অধ্যায়	৬৫-১১৮
সুন্নাহ	৬৫
সূচনা	৬৫
সুন্নাহর প্রামাণিক মূল্য (হুজ্জীয়া)	৭০
শ্রেণি বিভাগ ও মূল্য : ১	৭২
কুরআন ও সুন্নাহর পার্থক্য	৮১
সুন্নাহর চেয়ে কুরআনের অগ্রাধিকার	৮২
সুন্নাহ কি স্বাধীন উৎস?	৮৫
বিকৃতি ও জালিয়াতি	৯০
শ্রেণি বিভাগ ও মূল্য : ২	৯৪
অবিচ্ছিন্ন হাদিস	৯৪
সনদ বিচ্ছিন্ন হাদিস (আল হাদিস গায়ের আল মুত্তাসিম)	১০৮
সহিহ, হাসান ও জয়ীফ	১১০

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায় ১১৯-১৬৪
কুরআন-সুন্নাহ ব্যাখ্যার নীতিমালা/বিধিমালা-১ উৎস থেকে আইন সংগ্রহ ১১৯
সূচনা বক্তব্য ১১৯
তাবিল (রূপকধর্মী/ রূপকার্থ/নিহিতার্থ) ২২১
শ্রেণি বিভাগ-১ : স্পষ্ট ও অস্পষ্ট শব্দ ১২৪
অস্পষ্ট শব্দগুলো (আল আলফাজ গায়ের আল ওয়াজিহা) ১৩৪
শ্রেণি বিভাগ-২ : 'আম (সাধারণ) ও খাস (সুনির্দিষ্ট) ১৪০
শ্রেণি বিভাগ ৩ : নিরঙ্কুশ (মুতলাক) ও শর্ত সাপেক্ষ (মুকাইয়াদ) ১৫১
শ্রেণি বিভাগ ৪ : আক্ষরিক (হাকিকি) ও রূপক (মাজাজি) ১৫৫

পঞ্চম অধ্যায় ১৬৫-১৮২
ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের নিয়মাবলি - ২ আল দালালাত (মূলপাঠের নিহিতার্থ) ১৬৫
সুস্পষ্ট অর্থ (ইবারাহ আল-নস) ১৬৬
পরোক্ষ অর্থ (ইশারাহ আল নস) ১৬৭
অনুমিত অর্থ (দালালাহ আল নস) ১৬৮
প্রয়োজনীয় অর্থ (ইকতিদা আলনস) ১৬৯
বিচ্ছুরিত অর্থ (মাফহুন আল মুখালাফাহ) ও আল দালাল্যাতের শাফেয়ী শ্রেণি বিভাগ ১৭২

ষষ্ঠ অধ্যায় ১৮৩-১৯৪
আদেশ ও নিষেধ ১৮৩
আদেশ ১৮৩
নিষেধ ১৮৮
আইনগত আদেশের মূল্য ১৮৯

সপ্তম অধ্যায় ১৯৫-২১৮
নাছ্খ (রহিতকরণ) ১৯৫
নাছ্খের প্রকারভেদ ২০০
রহিতকরণ (নাছ্খ), সুনির্দিষ্টকরণ (তাখসিস) ও সংযোজন (তাজইজ) ২০৯
নাছ্খের বিপক্ষে যুক্তি ২১১

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়	**২১৯-২৫৪**
ইজমা বা বিশেষজ্ঞদের ঐকমত্য	**২১৯**
ইজমার অত্যাবশ্যকীয় শর্তাবলি (আরকান)	২২৪
ইজমার প্রমাণ (হুজ্জিয়াহ)	২২৭
কুরআনে ইজমা প্রসঙ্গ	২২৭
ইজমা সম্পর্কে সুন্নাহ	২৩১
ইজমার সম্ভাব্যতা	২৩৬
ইজমার প্রকারভেদ	২২৪
ইজমার ভিত্তি (সনদ)	২৪৩
ইজমার প্রচার	২৪৪
সংস্কার প্রস্তাব	২৪৫
উপসংহার	২৪৯
নবম অধ্যায়	**২৫৫-২৯৪**
কিয়াস (সাদৃশ্যলব্ধ সিদ্ধান্ত)	**২৫৫**
মূল বিষয়ের (আসল) সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলি	২৫৯
হুকম এর অংশ হওয়ার শর্ত	২৬১
নতুন ঘটনা (ফার)	২৬৫
কার্যকরকরণ (ইল্লত)	২৬৬
ইল্লত শনাক্তকরণ	২৭১
কিয়াসের শ্রেণি বিভাগ	২৭৬
কিয়াসের প্রমাণ (হুজ্জিয়াত)	২৭৮
কিয়াসের বিপক্ষে যুক্তি	২৮১
দণ্ডপ্রদানের ক্ষেত্রে কিয়াস	২৮৪
নস ও কিয়াসের মধ্যে বিরোধ	২৮৬
দশম অধ্যায়	**২৯৫-৩০০**
ইসলামি শরিয়াহ পূর্ব অবতীর্ণ আইন	**২৯৫**
একাদশ অধ্যায়	**৩০১-৩১১**
সাহাবিদের রা. ফতোয়া	**৩০১**

www.pathagar.com

দ্বাদশ অধ্যায়	৩১৩-৩৪০
ইসলামি আইনের ন্যায়পরায়ণতা বা ইস্তিহছান	৩১৩
রায়, কিয়াস ও ইস্তিহছান	৩২০
কিয়াস জলি, কিয়াস খফি ও ইস্তিহছান	৩২২
ইস্তিহছান নিয়ে হানাফী-শাফেয়ী মতবিরোধ	৩২৯
উপসংহার	৩৩৩
ত্রয়োদশ অধ্যায়	৩৪১-৩৬০
মাসলাহা মুরসালাহা (জনস্বার্থ বিবেচনা)	৩৪১
মাসলাহার শ্রেণি বিভাগ	৩৪৬
মাসলাহা মুরসালাহার শর্তাবলি (শুরুত)	৩৪৯
মাসলাহা মুরসালাহা সম্পর্কে আল তুফীর অভিমত	৩৫১
ইস্তিস্লাহ, কিয়াস ও ইস্তিহছানের মধ্যে পার্থক্য	৩৫২
মাসলাহা নিয়ে বিতর্ক	৩৫৩
উপসংহার	৩৫৭
চতুর্দশ অধ্যায়	৩৬১-৩৭৬
উরফ (প্রচলিত প্রথা)	৩৬১
বৈধ উরফের শর্তাবলি	৩৬৪
প্রথার প্রকারভেদ	৩৬৮
উরফের প্রমাণ (হজিয়াত)	৩৭১
পঞ্চদশ অধ্যায়	৩৭৭-৩৯২
ইস্তিশাব (ধারাবাহিকতার অনুমিতি)	৩৭৭
ইস্তিশাবের শ্রেণি বিভাগ	৩৮০
উপসংহার	৩৮৯
ষোড়শ অধ্যায়	৩৯৩-৪০৫
সাদ্দ আল জারাই (অন্যায়ের পথরোধ)	৩৯৩
সপ্তদশ অধ্যায়	৪০৭-৪৪৮
হুকম শারয়ী (শরিয়াহর আইন বা মূল্য)	৪০৭
সীমা নির্দেশক আইন (আল হুকম আল তাকলিফী)	৪১০
ঘোষণামূলক আইন (আল হুকম আল ওয়াদয়ী)	৪২৪
হুকম শারয়ীর স্তম্ভগুলো (আরকান)	৪৩২

www.pathagar.com

অষ্টাদশ অধ্যায় 8৪৯-৪৬০
সাক্ষ্য প্রমাণের বিরোধ ৪৪৯

ঊনবিংশ অধ্যায় ৪৬১-৪৯৮
ইজতিহাদ (ব্যক্তিগত গবেষণা) ৪৬১

গ্রন্থপঞ্জি ৪৯৯-৫০৬
শব্দার্থ ৫০৭-৫১২

www.pathagar.com

ভূমিকা

১. ইসলামি আইন বিজ্ঞানের ওপর লেখা ইংরেজি ভাষার বর্তমান গ্রন্থগুলোতে উসুল আল ফিকহ্ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা দেখতে পাওয়া যায় না। এ বিজ্ঞান অধ্যয়নের ক্ষেত্রে উৎসের বিষয়বস্তু যেমন কুরআন ও সুন্নাহ্র ওপর অধিকতর নজর দেয়া প্রয়োজন। ইংরেজি রচনাগুলোতে উসুল আল ফিকহ্ যে মূল উৎসের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে তার থেকে স্বতন্ত্রভাবে এর মূলনীতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উপরন্তু এ বিষয়ে আরবি রচনাগুলোর সাথে এসব গ্রন্থের তুলনা করলে একটা পৃথক স্টাইল ও প্রেক্ষাপট শৈলী আবিষ্কারের প্রবণতা পরিলক্ষিত হবে। উসুল আল ফিকহ্ ও শরিয়তের অন্যান্য শাখা সার্বিকভাবে সবচেয়ে প্রভাবশালী ও শ্রেষ্টতম উৎস আল্লাহ্ তায়ালার বাণীর (ওহি) স্বীকৃতির সাক্ষ্য বহন করে এবং তার স্থান সব ধরনের যুক্তি ও মানব রচিত আইনের অনেক উর্ধ্বে। ইসলামি আইনের এ দিকটি সাধারণভাবে স্বীকৃত তথাপি মূল আরবি রচনাগুলো ইসলামি আইনের বিস্তারিত দিক প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট ওহি যেভাবে গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয়েছে ইংরেজি রচনাগুলোতে কেউ সে ভাবে তা দেখতে পাবেন না। তাই আমি আরবি সূত্রসমূহে উসুল আল ফিকহ্র যেসব বিষয়বস্তু দেখতে পেয়েছি কেবল সেগুলোই নয় উপরন্তু উৎসের যেসব বিষয়বস্তু আমি বিবেচনা করেছি সেগুলোকে তার যথাযথ বক্তব্য ও চেতনার আলোকে এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আমি বিভিন্ন মত ও মূলনীতির তত্ত্বীয় আলোচনার সমর্থনে কুরআন, সুন্নাহ্ ও সুস্বীকৃত গ্রহণযোগ্য রচনাগুলো থেকে ঘনঘন উদাহরণ পেশ করেছি। অন্যকথায় মাজহাবগুলো যে কর্তৃত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার সাথে সঙ্গতি রেখে তাদের রচনাগুলোকে ব্যবহার করা হয়েছে।

২. মন্ট্রিলের ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটির ইসলামিক স্টাডিজ ইনস্টিটিউটে পোস্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে পড়ানোর সময় ১৯৮০ এর দশকের প্রথম দিকে আমি এ গ্রন্থ রচনার তাগিদ অনুভব করি। কিন্তু ১৯৮৫ সালে মালয়েশিয়ার সেলাঙ্গরে ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটির শিক্ষক হিসেবে যোগদান করার পরেই কেবল আমি আমার সে ইচ্ছা অনুযায়ী এ বই রচনা করতে সমর্থ হই। প্রাথমিকভাবে মাধ্যমিক পর্যায়ের জ্ঞান থেকে পরিপূর্ণ পারদর্শিতা অর্জনের জন্য অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্য বইয়ের অভাব আমাকে বইটি রচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। বর্তমানে ইংরেজি ভাষায় ইসলামিক আইন ও আইনশাস্ত্র বা উসুল আল ফিকহ্র ওপর যেসব বই রয়েছে তা নিছক সাদামাটা ধরনের ও অপূর্ণাঙ্গ এবং তাতে উসুল আল ফিকহ্ ও ফিকহ্র অন্যান্য শাখাসহ (যেমন- ফুরু আল ফিকহ্) গোটা

www.pathagar.com

বিষয়কে একটি খণ্ডের মধ্যে সমন্বিত করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। এ ধরনের গ্রন্থে উসুল আল ফিকহ্ সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যায় তা এ বিষয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ কোর্স অধ্যয়ন সম্পন্ন করার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য পর্যাপ্ত নয়। এখানে এ কথা উল্লেখ করা দরকার যে এ ক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম হলো পার্সোনাল ল' অর্থাৎ বিয়ে, তালাক, উত্তরাধিকার ইত্যাদি সম্পর্কিত আইন। এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমানে এ বিষয়ে অনেক ইংরেজি পাঠ্য বই পাওয়া যাচ্ছে। উসুল আল ফিকহ্র ওপর মূল আরবি গ্রন্থগুলোতে সার্বিকভাবে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমানে এ বিষয়ে আরবিতে সনাতনী ও আধুনিক উভয় প্রকারের অনেক পাঠ্য বই পাওয়া যায়। এর মধ্যে রয়েছে অতি সংক্ষিপ্ত আকারের পুস্তিকা থেকে বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত উন্নত গ্রন্থ। আব্দুল ওহাব খাল্লাফের ইলম উসুল আল ফিকহ্, আবু জাহরাহ্র উসুল আল ফিকহ্, মুহাম্মদ আল খুদারীর উসুল আল ফিকহ্, বাদরানের উসুল আল ফিকহ্ আল ইসলামি ইত্যাদি হচ্ছে এ বিষয়ে সুবিদিত আধুনিক গ্রন্থগুলোর অন্যতম। উসুল আল ফিকহ্র ওপর সনাতনী গ্রন্থও রয়েছে অনেক, ব্যাপক অর্থে বলা যায় যে এর সব কটি গ্রন্থে বিশদভাবে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, এমন কি এসব বইয়ের কোনো কোনোটির অনেকগুলো খণ্ড পর্যন্ত রয়েছে। আমি উপরিউক্ত গ্রন্থগুলো ছাড়াও গাজ্জালীর আল মুস্তাফা মিন ইলম আল উসুল, আল আমিদীর আল ইহ্কাম ফী উসুল আল আহ্কাম, আল শাতিবীর আল মুওয়াফাকাত ফী উসুল আল আহকাম ও আল শাওকানীর ইরশাদ আল ফুহুল ফী তাহকীক আল হাক্ক মিন ইলম আল উসুলের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করেছি। এসব রচনায় একান্তভাবে উসুল আল ফিকহ্র আইন ও বিচার সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং এতে এর ঐতিহাসিক বিকাশের দিকটি তেমন একটা দেখতে পাওয়া যায় না; আর প্রেক্ষাপটের প্রয়োজনে তা থাকলেও এর বাইরের সূচনা বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক ঘটনা হিসেবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। আরবি গ্রন্থ প্রণেতারা উসুল আল ফিকহ্ থেকে আইন বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক বিকাশের বিষয়কে পৃথকভাবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। ইসলামি আইন বিজ্ঞানের ইতিহাস ও এর বিভিন্ন পর্যায় যেমন- রসুল সা.-এর যুগ, সাহাবাদের রা. জামানা, হিজাজ ও ইরাকে আইনের প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাজহাবের অভ্যুদয়, অনুকরণ বা তাকলিদের যুগ এবং ইজতিহাদে প্রত্যাবর্তনের আহ্বানের ওপর আধুনিককালে লেখা অনেক আরবি গ্রন্থ বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে। ইসলামি আইন বিজ্ঞানের ইতিহাসের এ শাখা সাধারণভাবে তারিখ আল তাশরি নামে পরিচিত। এ শিরোনাম থেকে বুঝা যাচ্ছে যে এ শাখায় আইন ও

www.pathagar.com

বিচার এবং এ সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলোর ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।[১] উসুল আল ফিকহ ওপর আরবি গ্রন্থগুলো সার্বিকভাবে আইনের উৎসগুলো ও এর পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং এর ঐতিহাসিক বিকাশের বিষয়টি এ আলোচনার বাইরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

বর্তমানে ইংরেজি ভাষায় ইসলামি আইন বিজ্ঞানের ওপর যেসব সাধারণ গ্রন্থ পাওয়া যাচ্ছে তার ক্ষেত্রে এর বিপরীত চিত্র দেখতে পাওয়ার ঘটনাই সত্য। ব্যাপক অর্থে বলা যায় যে এ বিষয়ে ইংরেজি ভাষার লেখকেরা প্রাথমিকভাবে আইন বিজ্ঞানের ইতিহাসের ওপর নজর ও জোর দিয়েছেন, তবে তারা উসুল আল ফিকহর আইন ও বিচার সংক্রান্ত বিষয়ের প্রতি ঐতিহাসিক বিকাশের অনুরূপ গুরুত্ব দেননি। এ বিষয়ে বিদ্যমান ইংরেজি সাহিত্যের প্রকৃতি এবং ইংরেজি ভাষায় ইসলামি আইন বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য থাকার বিষয়টি স্মরণে রেখে এ গ্রন্থে ঐতিহাসিক বিকাশের বিষয় সম্পর্কে আলোচনার চেষ্টা না করে তার পরিবর্তে উসুল আল ফিকহ নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে।

ইংরেজি ভাষায় ইসলামি আইন বিজ্ঞানের ওপর মুসলিম ও অমুসলিম উভয় লেখকদের রচনার ব্যাপারে আরেকটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা দরকার। তা হলো, সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো আলোচনার ক্ষেত্রে তারা অনেকটা মর্জিমাফিক কাজ করেছেন; কিছু কিছু বিষয় তারা হয় উপেক্ষা করেছেন অথবা কেবল সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। এর ফলশ্রুতিতে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের নিয়মাবলি, শব্দগুলোর শ্রেণি বিভাগ, আদেশ-নিষেধ, মূল পাঠের নিহিতার্থ (আল দালালাত) ইত্যাদির মতো বিষয় এসব গ্রন্থে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় না অথবা থাকলেও অতি সংক্ষিপ্ত আকারে তা নিয়ে আলোচনা করা। এ ছাড়া বর্তমানে যেসব ইংরেজি গ্রন্থ ব্যবহৃত হচ্ছে অধিকাংশে কিয়াস, ইস্তিহছান, ইস্তিস্হাব, ইজতিহাদ ও সাদ্দ আল জারাইর মতো অতি পরিচিত বিষয়গুলো নিয়েও ভাসাভাসা আলোচনা করা হয়েছে। এ ধরনের উপেক্ষা বা বাদ পড়ার কারণ সব সময় স্পষ্ট নয়। এসব লেখক হয়তো এর মধ্যকার কয়েকটি বিষয়কে অনেকটা বিশেষ বিষয় বলে বিবেচনা করে থাকতে পারেন এবং দীর্ঘদিন ধরে উসুল আল ফিকহ সম্পর্কে ইংরেজি ভাষার পাঠকবর্গের আগ্রহ এর সাধারণ ও প্রারম্ভিক পর্যায়ের তথ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে বলে মনে করতে পারেন। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের নিয়মাবলি, আল দালালাত ও কিয়াসের কলাকৌশলের মতো বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে অনেকটা ব্যাপকভাবে আরবি পরিভাষার ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়, যা এ দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখা উচিত। ইসলামিক স্টাডিজের ইংরেজি

www.pathagar.com

ভাষাভাষী ছাত্রছাত্রীদের এমন শিক্ষার্থী হিসেবে গণ্য করা হয় যাদের উসুলে ফিকহ্র এসব বিস্তারিত খুঁটিনাটি বিষয় তেমন একটা কাজে আসে না বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। এটিকে হয়তো একটি শোভনীয় ব্যাখ্যা বলা যেতে পারে কিন্তু সম্প্রতি ইসলামি আইন শিক্ষার ব্যাপারে যে গভীর আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে তার আলোকে এর তেমন কোনো গুরুত্ব নেই। বিশেষ করে বর্তমানে পশ্চিমা জগৎ এবং খোদ ইসলামিক দেশগুলোতে প্রতিষ্ঠিত ইংরেজি মাধ্যমের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ইসলামি আইন অধ্যয়নে গভীর আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে।[২] উপরন্তু সাম্প্রতিক দশকগুলোতে ইসলামি দেশগুলোতে শরিয়ত ও সংবিধিবদ্ধ আইনের মধ্যে অধিকতর সঙ্গতি বিধানের একটা প্রচেষ্টা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এতে আইন বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, কর্মরত আইনজীবী ও বিচারকরা শরিয়তের আইনের বিষয়ে তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে ক্রমবর্ধমান হারে উৎসাহিত হচ্ছেন।

উসুল আল ফিকহ্র ওপর আরবিতে লেখা প্রাচীন গ্রন্থ ও আধুনিক রচনাগুলোর পার্থক্য হলো, পরবর্তীকালের লেখাগুলোতে মুসলিম ও অমুসলিম উভয় দেশগুলোর সাম্প্রতিক ঘটনাবলি সংযোজন করা হয়েছে। তাই আধুনিক পাঠকেরা এসব রচনায় অনেক তুলনামূলক আলোচনা ও মন্তব্য দেখতে পান। এতে আধুনিক আইন ও পশ্চিমা আইন শাস্ত্রের মূলনীতির সাথে শরিয়তের মূলনীতির প্রয়োগ ও প্রাসঙ্গিকতার ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়েছে। আধুনিক গ্রন্থগুলোর অনেক রচয়িতা ও আলেমের কৃতিত্ব হচ্ছে যে, তারা তাদের সমাজের সমসাময়িক আর্থসামাজিক অবস্থার সাথে উসুল আল ফিকহ্র কালজয়ী মূলনীতি ও পদ্ধতির একটা সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। অবশ্য শরিয়ত ও আধুনিক আইনের মধ্যে ক্রমান্বয়ে এক ধরনের ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে। এতে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে, যার সুরাহা করা আজও সম্ভব হয়নি। শরিয়ত ও আধুনিক সামাজিক অবস্থার মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে আনার প্রচেষ্টাও চালানো হচ্ছে। ব্যক্তিগত সংস্কার প্রস্তাব, নতুন করে ইজতিহাদ শুরুর আহ্বান, অথবা উসুল আল ফিকহ্র জ্ঞানভাণ্ডার আহরণে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশেষজ্ঞদের সম্মেলনে আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে এ উদ্যোগ পরিচালিত হচ্ছে। এ ধরনের কাজের অগ্রগতির বিষয়ে পূর্ণ বিবরণ প্রদান আমার এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য ও আওতার মধ্যে পড়ে না।[৩] তবে ইজতিহাদ, ইজমা, ইস্তিহ্ছান ও মাসলাহার মতো কিছু মূলনীতি আলোচনাকালে আমি সমসাময়িক আইন ও বিচারপ্রক্রিয়ায় কিভাবে এর প্রয়োগ করা যায় সে ব্যাপারে বর্তমানে সর্বজন স্বীকৃত আধুনিক অভিমত এবং কখনো কখনো আমার নিজস্ব মতামত তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। বিষয়টি এ বইয়ের

www.pathagar.com

বিষয়বস্তুর আওতার বাইরে চলে যায় কি না সে ব্যাপারে সচেতনতার পরও আমি এ স্বাধীনতাটুকু গ্রহণ করেছি। বইটিতে বিদ্যমান মূলনীতি ও মতবাদ এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ ঠিক যেভাবে রয়েছে ঠিক সেভাবে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। আমি আরো বলতে চাই যে আমার অভিমতের যথার্থতা বা অসঙ্গতির পূর্ণ দায়দায়িত্ব আমি নিজেই গ্রহণ করছি।

উপরন্তু উসূল আল ফিকহর ওপর সাম্প্রতিক আরবি পাঠ্য গ্রন্থগুলো এর বিষয়বস্তুকে অধিকতর সুসংহত ও সহজভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে, যা একে আধুনিক শিক্ষার্থীদের জন্য অনুধাবনযোগ্য বিষয়ে পরিণত করেছে। এ বিষয়ে পূর্বেকার রচনাগুলোর তুলনায় এসব গ্রন্থ সার্বিকভাবে সংক্ষিপ্ত। পুরনো গ্রন্থের থেকে আধুনিক বইগুলোর মধ্যে পার্থক্য মূলত দেখতে পাওয়া যায় আকার ও রচনা শৈলীর বিষয়ে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে আধুনিক রচনা প্রাচীন গ্রন্থগুলোর ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে বলে আশা করা যায় এবং মৌলিকভাবে এ বিষয়ে এ দুইয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা সম্ভব নয়। এ কথা বলার পর কেউ পুনরায় বলতে পারেন যে এক দৃষ্টিতে পূর্বসূরিদের রচনা থেকে আধুনিক বইগুলো ভিন্ন, তা হলো, আধুনিক গ্রন্থগুলোতে মুতাজিলা, শিয়া, জাহিরিয়া ইত্যাদি মতবাদের মূলনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি অধিকতর ন্যায়সঙ্গতভাবে তুলে ধরার মানসিকতা এবং প্রতিষ্ঠিত মাজহাবকে কেবল আনুষ্ঠানিক গ্রহণযোগ্যতা ও স্বীকৃতির ভিত্তিতে নয় বরং এদের উৎকর্ষতার আলোকে বিবেচনা করার প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। উসূল আল ফিকহর ওপর পাঠ্য বইয়ের বিষয়বস্তু ছাড়াও সাম্প্রতিক দশকগুলোতে মিসর ও অন্যান্য স্থানে অনেকগুলো লিগ্যাল এনসাইক্লোপিডিয়া রচিত হয়েছে। এর নাম দেয়া হয়েছে 'আল মাওসূয়াহ আল ফিকিয়াহ'। এর স্পষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রধান প্রধান সব মাজহাবের দৃষ্টিভঙ্গি ও অবদানের প্রতি ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ করা। প্রাচীন রচনাসমূহ, বিশেষ করে মাজহাব প্রতিষ্ঠার পর রচিত গ্রন্থগুলোতে নির্দিষ্ট মাজহাবের প্রতি অধিকতর জোর দেয়ার বিষয়টি লক্ষণীয়ভাবে পরিদৃষ্ট হতো। কিন্তু আধুনিক রচনাগুলোতে এ ধরনের বৈশিষ্ট্য প্রাধান্য পায়নি। বস্তুতপক্ষে এখন অধিকতর খোলামেলা মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে যাতে গোষ্ঠীগত পক্ষপাতিত্ব থেকে সরে আসার একটা প্রচেষ্টা প্রকাশ পেয়েছে। পূর্বেকার কিছু কিছু গ্রন্থে এ ধরনের পক্ষপাতিত্বের বিষয় পরিদৃষ্ট হয় এবং ইসলামি আইন ও আইন বিজ্ঞানে শিয়াদের অবদানের বিষয় তুলে ধরতে গিয়ে শিয়া মতবাদ, বিশেষজ্ঞ ও তাদের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সুন্নি বিশেষজ্ঞদের গ্রন্থ রচনাকে এখন আর অস্বাভাবিক বলে মনে হয়নি। বর্তমান গ্রন্থের

www.pathagar.com

লেখক এ অগ্রগতিকে স্বাগত জানিয়েছেন তবে তিনি নিজের বইয়ে সব মাজহাবের মতবাদের উপযুক্ত বিবরণ প্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছেন, এর কারণ হলো সময় ও স্থানের অভাব, এর জন্য প্রয়োজন এ আকারের আরেকটি হ্যান্ডবুক রচনা করা ।

৩. এ কথা বলা সম্ভবত সঠিক হবে যে পশ্চিমা আইন বিজ্ঞানের তুলনায় ইসলামি আইন বিজ্ঞানে মূল্যবোধ, চিন্তাধারা ও প্রতিষ্ঠানের অধিকতর স্থিতিশীলতা ও অবিচ্ছিন্নতার বিষয় প্রকাশ পেয়েছে। সম্ভবত এ দুই আইন বিজ্ঞানের নিজ নিজ আইনের উৎসের বিষয় উল্লেখের মাধ্যমে এর আংশিক ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে। যৌক্তিকতা, প্রথা, বিচারিক দৃষ্টান্ত, নৈতিকতা ও ধর্ম বিশ্বাস হচ্ছে পশ্চিমা আইনের মৌলিক উৎস। এর সর্বশেষ দু'টি বিষয়কে ইসলামি আইনেও অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। ইসলামি আইন ও সমাজ যেসব মূল্যবোধ অবশ্যই পালনীয় হিসেবে সমুন্নত ও সমর্থন করেছে তা সব সময়ই কেবল যৌক্তিক কারণে বৈধ বলে গণ্য করা হয় তা নয়। তৎসত্ত্বেও মানবীয় যুক্তি সবসময়ই ইজতিহাদের মাধ্যমে শরিয়তের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অবশ্য প্রাথমিকভাবে আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত বাণীর ওপর ভিত্তি করেই শরিয়ত প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

ইসলামি ও পশ্চিমা আইন বিজ্ঞান উভয়ের ক্ষেত্রেই দর্শন ও সমাজ বিজ্ঞানের মতো বিভিন্ন শাখার পারস্পরিক প্রবহণশীলতা ও অভিন্নতার বিষয়টি সত্য। তবে পশ্চিমা আইন বিজ্ঞানের পরিসর ও বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে বড় ধরনের অনিশ্চয়তা রয়েছে। একজন পর্যবেক্ষকের মতে, 'জুরিসপ্রুডেন্স' বা আইন বিজ্ঞান শিরোনামের গ্রন্থগুলোতে বিষয়বস্তু ও তার ব্যবহারের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায় কারণ বিষয়টির প্রকৃতি এমন যে তার পরিসর ও বিষয়বস্তু সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।[৪] জুলিয়াস স্টোন তার নাটকীয় সংজ্ঞায় বলেছেন, জুরিসপ্রুডেন্স হচ্ছে নৈরাজ্যকরভাবে সীমাহীন নৈরাজ্যময় বিষয়গুলো নিয়ে নৈরাজ্যকর আলোচনা।[৫]

অপরদিকে উসুল আল ফিকহ চমৎকারভাবে সুনির্ধারিত কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং একে ইসলামি শিক্ষার একটি পৃথক শাখা হিসেবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে আলেমদের কোনো সমস্যায় পড়তে হয় না। উসুল আল ফিকহর ওপর লেখা পাঠ্য গ্রন্থগুলোতে পরিচিত বিষয় নিয়ে প্রায় একই ধরনের আলোচনা দেখতে পাওয়া যায় এবং তাদের বিষয়বস্তুও সুস্পষ্টভাবে অনুমেয়। সাধারণভাবে শরিয়ত ও বিশেষ করে উসুল আল ফিকহ তার বিকাশের গোটা ইতিহাসে সরকার ও তার আইনি সংস্থার প্রভাব থেকে প্রায় পুরোপুরি মুক্ত থেকে যে আপেক্ষিক স্থিতিশীলতার পরিচয় দিয়েছে এতে সম্ভবত সে বিষয়টির প্রতিফলন ঘটেছে। এ ঘটনা থেকে অবশ্য এ কথাও

www.pathagar.com

অনুধাবন করা যায় যে উসুল আল ফিকহর অধিকাংশ গঠিত হয়েছে ফকিহগণের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়। তারা সরকারের ছত্রছায়া ও সংশ্লিষ্টতার বাইরে থেকে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে আইন সংক্রান্ত চিন্তাধারার বিকাশ সাধন করেন। এর ফলে উসূল আল ফিকহ অনেকটা তাত্ত্বিক শাখা হিসেবে রয়ে গেছে এবং একে সরকারি আইন সংস্থার সাথে একীভূত করা হয়নি। সরকার ও আলেমদের মধ্যে স্বার্থ ও মূল্যবোধের ভিন্নতার কারণে ইসলামিক আইন বিজ্ঞানের ইতিহাস ক্ষুণ্ন হয়েছে। সরকারের প্রতি আলেমদের অনীহা আইনগত চিন্তাধারা ও প্রতিষ্ঠানের বিকাশে সরকারের অংশগ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট হওয়াকে উৎসাহিত করেনি এবং ইসলামি আইন বিজ্ঞানের নমনীয়তা ও বাস্তব প্রয়োগকে অনেকটা নিরুৎসাহিত করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ইজমার মূলনীতি অনুযায়ী ইজমা গঠিত হওয়ার জন্য শর্ত হলো সমগ্র মুসলিম উম্মাহর সব মুজতাহিদের সার্বজনীন সর্বসম্মত মতৈক্য অর্জন প্রয়োজন। এ শর্তে এর বাস্তবায়নযোগ্যতা ও উপযোগিতার বিষয়কে ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য করা হয়নি। সার্বিকভাবে ইজমার তত্ত্বের ব্যাপারে সরকারের কোনোরূপ ভূমিকা থাকার বিষয়কেও স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। সরকারের পক্ষ থেকেও এ ক্রমাধিকারতন্ত্রে আলেমদের সংশ্লিষ্টতা ও অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা হয়নি এবং আলেমদের আইন ও বিচার সম্পর্কিত চিন্তার স্রোতধারা এবং ধর্মীয় বিষয়ে তাদের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রেখেছে। আইন বিজ্ঞান শাখা ক্রমে উন্নত ও কলেবর বর্ধিত হতে থাকে। বহু তত্ত্ব ও নীতিমালা উদ্ভাবনে সফল হয়েছে, যা নিজস্ব মানদণ্ডে মূল্যবান কিন্তু সরকারের আইনের তত্ত্ব ও বাস্তব প্রয়োগের মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে তা নিরসনের জন্য যথেষ্ট নয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে কেউ কিয়াস, মাসলাহা ইত্যাদি এবং বৈধভাবে এসবের প্রয়োগের জন্য যেসব শর্ত অবশ্যই পূরণ করতে হবে সে সম্পর্কে জানতে পারেন। কিন্তু এর প্রয়োগ করার ব্যাপারে যদি বিচারক বা ফকিহ কারোরই স্বীকৃত ভূমিকা বা ক্ষমতা না থাকে এ ধরনের জ্ঞানের থেকে কল্যাণ লাভের বিষয়টি অত্যন্ত সীমিত হয়ে পড়বে। কেউ এ কথাও বলতে পারেন যে, আধুনিক বিচার ব্যবস্থায় শরিয়তের বিধান প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা রয়েছে তার ত্বরিত কোনো সমাধান পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায় না। এটি হচ্ছে দীর্ঘদিনের পুরনো সমস্যা এবং তা আরো একটা সময় পর্যন্ত বজায় থাকবে বলে ধারণা করা যেতে পারে। আলোচ্য সমস্যার সমাধানের পথ প্রশস্ত করতে হলে দরকার হবে অনেকগুলো বিষয়কে একত্র করে কর্মক্ষেত্রে একযোগে কাজ করা। এ ধরনের একটি বিষয় হলো আলেম-ওলামা ও সরকারসহ সমাজের অন্যান্য স্তরের মধ্যে একটি মাত্রা পর্যন্ত মতৈক্য ও সহযোগিতা অর্জন এবং সরকারের পক্ষ থেকে তার আইনের অভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্য বিধানে প্রয়োজনীয়

www.pathagar.com

পদক্ষেপ গ্রহণের আগ্রহ। শরিয়ত ও আধুনিক আইনকে একটি ব্যবস্থার অধীনে সমন্বিত ও ঐক্যবদ্ধ করার অর্থ হচ্ছে ভিন্নমুখী দু'টি আইন পদ্ধতির মধ্যকার দ্বৈততা ও অভ্যন্তরীণ প্রসারণ ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনা ও অপসারণ করা।

আধুনিক সমাজে নানামুখী অসংখ্য দ্রুত বর্ধনশীল প্রভাব প্রকাশ পাওয়ার বিষয়াদি চিন্তা করলে মনে হবে মূল্যবোধের ব্যাপারে মতৈক্যে পৌঁছানোর সম্ভাবনা এখন আগের চেয়ে আরো কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আইনকে অবশ্যই মৌলিক মূল্যবোধ সমুন্নত রাখতে হবে। তাই এ ব্যাপারে আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির ইতঃস্ততার সমস্যা সমাধান করা এখন সাধারণভাবে আইনবিজ্ঞানের জন্য সম্ভবত সবচেয়ে কঠিন একটি কাজে পরিণত হয়েছে। জুরিসপ্রুডেন্স বা আইন বিজ্ঞানের প্রাথমিক কাজ হলো আইনের যথার্থতা বা ভ্রান্তি নির্ণয়ে এবং আইনের শাসনাধীনে একটি কার্যকর সরকারের কিছু মানদণ্ড নির্ধারণ করা।

সমসাময়িক জীবনের পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সাথে সংযোগ হারিয়ে ফেলার জন্য মুসলিম ফকিহদের সমালোচনা করা হয়। কারণ তিনি আধুনিক সরকার প্রক্রিয়ায় আইন ও বিচার কার্যক্রমের সাথে শরিয়তের বিধানের অমূল্য ভাণ্ডারকে সম্পর্কিত করতে সক্ষম হননি বা এখনো হচ্ছেন না। ইসলামি দেশগুলোর সরকারের ওপরও একই সমালোচনার একাংশ চাপানো হয়ে থাকে। এর কারণ তারা তাদের দেশের আইন ও বিচার কার্যক্রমে উসুল আল ফিকহকে অন্তর্ভুক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে। তথাকথিত ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনাকে একদিকে আইন ও তার উৎস, অন্য দিকে আইন ও সমাজের পরিবর্তিত পরিস্থিতির মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টির একটি কারণ হিসেবে দায়ী করা হয়। ইসলামি দেশগুলোয় সংবিধিবদ্ধ আইন প্রবর্তন করা হয়েছে, যা ইতোমধ্যে একটি সাধারণ কার্যক্রমে পরিণত হয়েছে। এ বিষয়টিও ইজতিহাদের ভূমিকা ও কার্যক্রমকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ফকিহ/মুজতাহিদের ঐতিহ্যবাহী ভূমিকাকে বাধাগ্রস্ত করা ছাড়াও স্বনিয়ন্ত্রিত সংবিধিবদ্ধ আইন ও ইজতিহাদ অনুমোদনের ক্ষেত্রে আরোপিত আনুষ্ঠানিক কার্যপ্রণালী আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে তার অংশগ্রহণে উৎসাহ দানকে ক্ষুণ্ন করেছে। উপরন্তু ইসলামি দেশগুলোতে পাইকারিভাবে বিদেশী আইন শিক্ষাদান ও প্রতিষ্ঠান আমদানি এবং আইন শিক্ষা ও বিচার কার্যক্রমে এসবের অমসৃণ সংমিশ্রণ সাধারণ অসন্তোষের কারণ হয়ে রয়েছে। এসব ঘটনা ও অন্যান্য কারণকে ইসলামি পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের জন্য দায়ী করা হয়। বর্তমানে অনেক মুসলিম সমাজে এ জাগরণ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

www.pathagar.com

আধুনিক সমাজে পরিদৃষ্ট বিভিন্নমুখী প্রভাব ও দ্রুতগতিতে সংঘটিত সামাজিক পরিবর্তনে মূল্যবোধের সঠিক ভারসাম্য শনাক্ত করার ক্ষেত্রে যে মাত্রায় অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে তা মোকাবেলা করা সম্ভবত জরুরি হয়ে পড়েছে। উপরন্তু এ অনিশ্চয়তাকে সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখার উপায় অনুসন্ধান অবশ্যই আইন বিজ্ঞানের একটি প্রধান ভাবনার বিষয় হয়ে থাকবে। অপেক্ষাকৃত উত্তম সমাধান ও অধিকতর পরিমার্জিত বিকল্পের বিষয়টি একান্তভাবেই ইজতিহাদের মধ্যে নিহিত রয়েছে এবং উসুল আল ফিকহর সনাতনী সূত্রবদ্ধকরণ নীতি অনুযায়ী ইজতিহাদের দরজা বন্ধ করার অনুমতি কখনো দেয়া হবে না। কারণ ইজতিহাদ হচ্ছে ফরজে কেফায়া, মুসলিম সমাজ ও তার ফকিহ/বিশেষজ্ঞদের সম্মিলিত একটি অবশ্যকরণীয় কর্তব্য। মুসলিম সমাজের নতুন নতুন সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে এবং আইন ও ধর্মীয় বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য তাদের অবশ্যই ইজতিহাদ চর্চা করতে হবে। এজন্য ইজতিহাদ চর্চায় ভুল করাকে কেবল সহনীয় বলে বিবেচনা করা হয়েছে তাই নয়, উপরন্তু এ ক্ষেত্রে মুজতাহিদকে তার একনিষ্ঠতা, আন্তরিকতা ও খুলুসিয়াতের জন্য পুরস্কারযোগ্য বলে গণ্য করা হয়েছে। এ ছাড়া এ ধরনের ভুলের মাধ্যমে অবশেষে সর্বোত্তম সমাধান বেরিয়ে আসে। কারো কাছে একটি নির্দিষ্ট সমস্যার অনেকগুলো সমাধান থাকতে পারে এবং কখনো কখনো সর্বোত্তম সমাধানও জানা থাকতে পারে তথাপি উপযোগিতা ও বিরাজমান বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় পছন্দের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হয়ে পড়তে পারে এবং তা অর্জন করা সম্ভব হয় না। এ ধরনের পরিস্থিতিতে যা করা সম্ভব একজন সেটি করবেন কিন্তু কোনোক্রমেই ইজতিহাদ একেবারে বন্ধ করে দেয়া যাবে না। ইজতিহাদ অর্জনযোগ্য নয় এবং এ জন্য যেসব শর্ত রয়েছে তা পূরণ করা খুবই কঠিন, এ কথা বলা হবে একটি সাধারণ ও মারাত্মক ভুল। উসুল আল ফিকহর প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো ইজতিহাদকে প্রণালীবদ্ধভাবে নিয়ন্ত্রণ করা এবং আইনের উৎসগুলো, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পদ্ধতি ও আইন সংগ্রহ সম্পর্কিত বিষয়ে যা কিছু শিক্ষা দিতে চায় তা নিয়ন্ত্রণ করা। উসুল আল ফিকহর ধারণা, তত্ত্ব ও নীতিমালা উপলব্ধির জন্য ইজতিহাদ কেবল সহায়ক তাই নয়, উপরন্তু সামাজিক সমস্যার অপেক্ষাকৃত উন্নত সমাধান অর্জনের চলমান প্রচেষ্টায় মুসলিম ফকিহ ও আইন প্রণেতারা যাতে অবদান রাখতে সক্ষম হন সে জন্যও প্রয়োজন। এ ছাড়া ইজতিহাদ আশাব্যঞ্জকভাবে শরিয়ত সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিরও বিকাশ সাধন করে। বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও সামাজিক পরিবর্তনকে ধারণ করার মতো উল্লেখযোগ্য নমনীয়তা ও সম্পদ শরিয়তের রয়েছে।

www.pathagar.com

৪. আরবি পরিভাষাগুলো অনুবাদের ক্ষেত্রে আমি অনেকটা বিদ্যমান গ্রন্থগুলো, বিশেষ করে আব্দুর ওহিমের Principles of Muhammedan Jurisprudence অনুসরণ করেছি। তবে যখন কোনো উদাহরণ দেখতে পাইনি অথবা আমি অধিকতর ভালো বিকল্প শব্দ খুঁজে পেতে সক্ষম হয়েছি তখন আমি নিজেই সমার্থক ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেছি। অধিকাংশ আরবি শব্দ পরিভাষাগত জটিলতা ছাড়াই সহজে ইংরেজি ভাষায় রূপান্তরিত করা যায়। কিন্তু এমনটি করা সম্ভব না হলে সে ক্ষেত্রে কেবল শব্দার্থিক যথার্থতা নয় বরং পূর্বাপর মিল ও রীতির আলোকে তা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর একটি উদাহরণ হলো, এ গ্রন্থের একটি অধ্যায়ে মূলপাঠের নিহিতার্থ (আল দালালাত) নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পাঁচ প্রকার নিহিতার্থ হচ্ছে, ইবারা আল নস, ইশারা আল নস, দালালা আল নস, ইকতিদা আল নস ও মাফহুম আল মুখালাফা। এগুলোর প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে এবং এর সমার্থক ইংরেজি শব্দ খুঁজে পাওয়া বেশ দুষ্কর। আমি সব সময় শব্দার্থিক যথার্থতার ওপর অগ্রাধিকার দেয়ার চেষ্টা করেছি; তবে এসব শব্দের নিম্নলিখিত ইংরেজি প্রতিশব্দ নির্ধারণে এটিই একমাত্র উপকরণ নয় : 'explicit meaning (সুস্পষ্ট অর্থ)', 'alluded meaning (পরোক্ষ অর্থ)', 'implied meaning (অনুমিত অর্থ)', 'required meaning (প্রয়োজনীয় অর্থ)' ও 'divergent meaning (বিচ্যুত অর্থ)'। অনেক সময় শব্দার্থ ও ধারণার বিষয়টি অনেকটা একই রকম ও পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত বলে মনে হয়; এতে শব্দার্থিক যথার্থতা সঠিকভাবে নিরূপণ করা বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। শব্দগুলোর শ্রেণি বিভাগ ও বিশ্লেষণের নিয়মাবলির মতো উসুল আল ফিকহর নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়ে পরিভাষা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে একটি নিজস্ব পদ্ধতি ও বিচার্য মানদণ্ড গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এসব ক্ষেত্রে আমি মূল আরবি পরিভাষাকে এর ইংরেজি প্রতিশব্দ থেকে আলাদা করা সহায়ক হবে না বলে মনে করেছি। তাই আমি বইয়ের ইংরেজি প্রতিশব্দের সাথে আরবি পরিভাষাকে সম্পর্কিত করতে ঘন ঘন আরবি পরিভাষা ব্যবহার করেছি। তথাপি পাঠক যদি পারিভাষিক অর্থ বুঝতে না পারেন তা হলে তিনি এ বইয়ের শেষে দেয়া দুরূহ শব্দার্থের তালিকা দেখতে পারেন, যা তার জন্য সহায়ক হতে পারে।

এ বইয়ে কুরআনের যেসব আয়াত উদ্ধৃত করা হয়েছে তার ইংরেজি অনুবাদ সাধারণভাবে আব্দুল্লাহ ইউসুফের translation of the Holy Quran এর আলোকে করা হয়েছে। অবশ্য কোনো কোনো সময় আমি এর বিকল্প হিসেবে আরো সহজ ও

www.pathagar.com

সরল অনুবাদ তুলে ধরেছি। তবে এমনটি করার সময় আমি অনেকগুলো তরজমা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেই তা করেছি। পাঠক এটিও লক্ষ্য করবেন যে আমি এ বইয়ে কুরআনের আয়াতের মূল আরবি উদ্ধৃত করিনি কারণ তা পাওয়া মোটেই কঠিন নয়। এ ছাড়া কুরআনের আয়াত সব একই রকম, সাধারণভাবে ব্যবহৃত এর অসংখ্য মুদ্রিত কপির মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য দেখা যায় না। কিন্তু হাদিসের ক্ষেত্রে সেরূপ নয়। যদিও হাদিসের মূল বক্তব্যে ভাব ও ভাষার মধ্যে সুসঙ্গতি ও ঐক্য বজায় রাখার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় তথাপি বিভিন্ন উৎসে বর্ণিত একটি নির্দিষ্ট হাদিসের মধ্যে অসঙ্গতি বা শব্দ ব্যবহারে পার্থক্য চোখে পড়ার বিষয় অস্বাভাবিক কিছু নয়। অংশত এ কারণ ছাড়াও যথার্থতা ও উপযোগিতা বিবেচনা করে আমি বইটিতে মূল আরবি ও হাদিসের ইংরেজি তরজমা উভয় তুলে ধরেছি। হাদিসের মূল আরবি থেকে অধিকাংশ ইংরেজি অনুবাদ আমার নিজস্ব। এ ছাড়া আমি যখন হাতের কাছে হাদিসের ইংরেজি অনুবাদ পেয়েছি তখন তাও ব্যবহার করেছি।

ফিকহ্ ও উসুল আল ফিকহ্ পরিভাষা দু'টির ইংরেজি অনুবাদের বিষয়ে কিছু বলা দরকার। এ শব্দ দু'টির আরবি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় 'ফিকহ্‌র মূল' বুঝাতে উসুল আল ফিকহ্‌র উল্লেখ করা হয়। বর্তমানে ইংরেজি ভাষায় এ পরিভাষার যে প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয় তাতে এ পার্থক্যের বিষয়টি অতটা স্পষ্ট নয়। 'Muhammedan Law' ও 'Islamic Law' এর মতো পরিভাষা শ্রেণিগত অর্থে প্রায় ব্যবহৃত হয় এবং ফিকহ্ ও উসুল আল ফিকহ্ উভয়ের ক্ষেত্রেই এর প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। এর জনপ্রিয় বিকল্প পরিভাষা 'Islamic Jurisprudence' এর ক্ষেত্রেও এ বিষয়টি সত্য। এদের কোনোটিই সমার্থক মূল আরবি পরিভাষার অনুরূপ স্পষ্ট অর্থ প্রকাশ করে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে বর্তমানে ইংরেজি ভাষায় উপরিউক্ত এক বা অন্য শিরোনামে অনেক বই পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু তার বিষয়বস্তুতে দু'টি শাখাকে পরস্পর থেকে পৃথক করার কোনো চেষ্টা করা হয়নি। 'Muhammedan Law' পরিভাষাটির ব্যবহার ইতোমধ্যে উঠে গেছে এবং ফিকহ্‌র জন্য 'Islamic Law' বা 'ইসলামি আইন' ও উসুল আল ফিকহ্‌র জন্য 'Islamic Jurisprudence' বা 'ইসলামি আইন প্রণয়নের মূলনীতি' পরিভাষার ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত ব্যবহার বিধিতে পরিণত হয়েছে। পরিভাষার এরূপ ব্যবহার অক্ষুণ্ন রাখা দরকার। 'Source' ('উৎস') ও 'Proof' ('সাক্ষ্য প্রমাণ') পরিভাষার মধ্যে অনুরূপ পার্থক্য করা উপযোগী বিবেচিত হতে পারে। পূর্বেরটি যতদূর সম্ভব কেবলমাত্র কুরআন ও সুন্নাহর জন্য সংরক্ষিত রাখা এবং পরেরটি অন্যান্য সাক্ষ্য প্রমাণ ও দলিল বুঝাতে উল্লেখ করা উচিত।

www.pathagar.com

আমার আরবি শব্দের প্রতিবর্ণীকরণ (Transliteration) Encyclopedia of Islam (New Edition) এর অনুরূপ। তবে দু'টি ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম করা হয়েছে, যা আদর্শ মানদণ্ডে পরিণত হয়েছে : ক্বাফ এর স্থলে q ও যাল এর স্থলে j এবং সবশেষে আমি ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটির ল' ফ্যাকাল্টির আমার সহকর্মী ও ছাত্রছাত্রীদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। আমি প্রায়ই পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় তাদের কাছে উত্থাপন ও তা নিয়ে আলোচনা করেছি। আমি প্রায় সময় তাদের মতামত থেকে উপকৃত হয়েছি এবং বর্তমান গ্রন্থ রচনায় তাদের এসব মতকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছি। আমি ফ্যাকাল্টির দফতরে কর্মরত স্টাফদেরও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই। আমি যখনই চেয়েছি তখনই তারা আমার কাজগুলো দ্রুত টাইপ করে দিয়েছেন। আইআইইউএমের লাইব্রেরির কর্মচারীগণ যে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান ও আগ্রহ দেখিয়েছেন সে জন্য তাদেরও কৃতজ্ঞতা জানাই।

৫. এ গ্রন্থ ১৯৮৯ সালের এপ্রিল মাসে প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পর আমি বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ, ছাত্রছাত্রী ও পাঠকদের কাছ থেকে যে মন্তব্য, পর্যবেক্ষণ-বিশ্লেষণ ও সাড়া পেয়েছি তা অত্যন্ত ইতিবাচক ও উৎসাহব্যঞ্জক। বর্তমান সংস্করণে আমি বইটিতে যে পরিবর্তন এনেছি তা বিষয়বস্তু ও বিন্যাস উভয় ক্ষেত্রে তাদের মতামতের গুরুত্ব দিয়েছি। অবশ্য এ পরিবর্তনের সার্বিক দিক সমগ্র মূল রচনাকে অটুট রেখেছে। আমি যেসব পরিবর্তন করেছি তা নির্দিষ্ট কয়েকটি অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে এবং তাতে মূল গ্রন্থ নতুন করে কম্পোজ করার দরকার হয়নি। এভাবে আমি রহিতকরণ (নাসখ), সাদৃশ্যলব্ধ অনুমান (কিয়াস) ও ধারাবাহিকতার অনুমিতি (ইস্তিশাব) সম্পর্কিত অধ্যায়গুলোতে নতুন তথ্য সংযোজন ও কোনো কোনো অংশ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। ইসলামি আইনের মূল বিষয়কে সুস্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে এসব ধারণার বিস্তারিত আলোচনা অথবা প্রাসঙ্গিক সমসাময়িক বিষয়ে নতুন নতুন উদাহরণ তুলে ধরার মাধ্যমে আমি এ অতিরিক্ত তথ্য সংযোজন করেছি। নাসখ অধ্যায়ের সংযোজনে ১৯৮৯ সালের সেপ্টেম্বরে কুয়ালালামপুরের ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সিম্পোজিয়ামে 'The Nature, Sources and Objectives of Shariah' শিরোনামে পঠিত আমার নিবন্ধের আলোচনার ফলাফল প্রতিফলিত হয়েছে। অন্যান্য অধ্যায়ের সংযোজন প্রধানত আধুনিক আইন বিজ্ঞানে উপেক্ষিত ইস্তিশাবের মতো উসুল আল ফিকহর কতিপয় মূলনীতির মূল্যবান অবদান নিয়ে নতুন গবেষণা ও সে সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মতের সমন্বয়ে করা হয়েছে। এ ছাড়া আমি কিছু বিষয়ের স্পষ্টতা ও শুদ্ধতার স্বার্থে বইটির একটা ক্ষুদ্রাংশের ছোটখাটো সংশোধন করেছি।

www.pathagar.com

ইসলামিক টেক্সট বুক সোসাইটির সম্পাদকীয় কর্মচারীবৃন্দ- বিশেষ করে মোহসীন আল নাজ্জার ও T. J, Winter এর সাথে আমার পরামর্শের ফলাফল হিসেবে আমি বইটির ফরমেটের পরিবর্তন করেছি। প্রতিবর্ণীকরণ, পদটিকার বিষয়ে ইসলামিক টেক্সট বুক সোসাইটির আদর্শ কার্যবিধি যাতে বাস্তবায়ন করা যায় সে জন্য শুরুতেই সমগ্র মূল বই পুনঃমুদ্রণ এবং ছোটখাটো সম্পাদকীয় পরিবর্তন করা হয়েছে। এভাবে আশা করা যায় যে এসব পরিবর্তন ইউরোপ ও আমেরিকার পাঠকদের কাছে পরিচিত ও পছন্দনীয় হিসেবে বইটির প্রকাশ নিশ্চিত করবে।

মালয়েশিয়ার ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটির ল' ফ্যাকাল্টির প্রফেসর অ্যামিরিটাস ও ডিন প্রফেসর আহমদ ইব্রাহীম দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য ভূমিকা লিখেছেন। অনেক ব্যস্ততা ও নিজের লেখালেখি নিয়ে প্রচুর ঝামেলা থাকা সত্ত্বেও তিনি অনুগ্রহ করে মুখবন্ধটি লিখে দিয়েছেন। তার মূল্যবান অবদান এবং প্রথম ও বর্তমান উভয় সংস্করণের মুখবন্ধ লেখার জন্য এ সুযোগে আমি তার প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই। প্রফেসর আহমদ ইব্রাহীম আমার গবেষণা কর্মের ব্যাপারে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং আমাকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য-সহযোগিতা করেন। আমি যাতে লেখা ও গবেষণা কর্মে ভালোভাবে মনোনিবেশ করতে পারি সেজন্য তিনি আমাকে অন্যান্য দায়িত্ব ও ব্যস্ততা থেকেও অব্যাহতি দেন।

ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রী ও সহকর্মীরা আমাকে উদারভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেন। এ সুযোগে চিন্তা ও মননশীল প্রশংসা করার জন্য আবারো তাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই। এসব প্রচেষ্টার বাস্তব ফল হিসেবে এ গ্রন্থটি এখন কেবল ল' ফ্যাকাল্টি নয়, বরং এ ইউনিভার্সিটির অন্যান্য ডিপার্টমেন্টেও একটি সুপারিশকৃত পাঠ্য বইয়ে পরিণত হয়েছে।

মুহাম্মদ হাশিম কামালী
ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, মালয়েশিয়া

www.pathagar.com

টিকা

১. উদাহরণ হিসেবে দেখুন, আল খুদারির তারিখ আল তাশরি আল ইসলামি; আল সবুনীর আল মাদখাল আল ফিকহী ওয়া তারিখ আল তাশরি আল ইসলামি; আল কাত্তানের আল তাশরি ওয়াল ফিকহ ফিল ইসলাম : তারিখান ওয়া মানহাজান এবং আল নাবহানের আল মাদখাল আল তাশরি আল ইসলামি : নিশয়াতুহ আওয়ারুব আল তারিখিয়াহ মুস্তাকবালুহ। পূর্ণাঙ্গ প্রকাশকাল জানতে হলে গ্রন্থপঞ্জি দেখুন।

২. উদাহরণ হিসেবে দেখুন, মালয়েশিয়ার ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি ও পাকিস্তানের ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, ইসলামাবাদ। এসব ইউনিভার্সিটিতে এলএলবি ও এমএ উভয় পর্যায়ে উসুল আল ফিকহকে প্রধান বিষয় হিসেবে পাঠ্য করা হয়েছে।

৩. সাম্প্রতিক চিন্তাভাবনা ও অগ্রগতির বিবরণ দেখতে পাওয়া যায় পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনাসমূহ, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, বিভিন্ন সাময়িকী ও এনসাইক্লোপিডিয়াগুলোতে। এসব আয়োজনের লক্ষ্য হচ্ছে এ মনোভাবের বিকাশ সাধন। এ সম্পর্কে জানতে হলে দেখুন, মুহাম্মদ ফারুক আল নাবহান, আল মাদখাল আল তাশরি আল ইসলামি, পৃষ্ঠা ৩৪২-৪০৭ ও মান্না আল কাত্তান, আল তাশরি ওয়াল ফিকহ ফিল ইসলাম, পৃষ্ঠা ৩৩১-৩৫৩।

৪. Dias, Jurisprudence, পৃষ্ঠা ১।

৫. Bentham, Dicey ও Arnold এর এই ও অন্যান্য বিবৃতি দেখুন, Curzon, Jurisprudence, পৃষ্ঠা ১৩।

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

উসুল আল ফিকহ্-এর পরিচিতি

১. সংজ্ঞা ও পরিসর

ইসলামি আইনশাস্ত্রের মূল বা উসুল আল ফিকহতে বিভিন্ন নির্দেশনা ও পদ্ধতির বিবরণ রয়েছে। এসবের দ্বারাই ফিকহ্‌র উৎসগুলো থেকে ফিকহ্‌র আচরণগুলো গ্রহণ করা হয়েছে। এসব নির্দেশনা প্রধানত আল কুরআন ও সুন্নাহ্‌তে পাওয়া গেছে। আর এ দু'টি হলো শরিয়াহ্‌র প্রধান উৎস। কুরআন ও সুন্নাহ্‌র সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মূলনীতিগুলো ও পদ্ধতি একত্রে উসুল আল ফিকহ্ বলে পরিচিত। কিছু কিছু লেখক উসুল আল ফিকহ্‌কে ব্যবহারিক আইন বিজ্ঞান বলে বর্ণনা করে থাকেন, এটা সঠিক তবে অসম্পূর্ণ। উসুল আল ফিকহ্‌র প্রধান কাজ নিয়মানুগ ব্যাখ্যা প্রদান ও বিচয়ন (deduction) হলেও দ্বিতীয়টি একান্তভাবেই আইন প্রণয়ন পদ্ধতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। উসুল আল ফিকহ্‌কে উৎস ও আইনশাস্ত্র বিষয়ক বিজ্ঞান বলা একদিক থেকে সঠিক কেননা উসুল আল ফিকহ্‌তে যে মূলনীতি প্রয়োগ করা হয়েছে তার উৎস ও বিষয়বস্তু উভয়ই হচ্ছে কুরআন ও হাদিস। আইন প্রণয়নের নীতিমালার পদ্ধতির ক্ষেত্রে খোদ কুরআন ও সুন্নাহ্‌র অতি সামান্য ভূমিকা রয়েছে বরং এতে এমন দিকনির্দেশনা রয়েছে যার ভিত্তিতে শরিয়াহ্‌র বিধিবিধানগুলো প্রণীত হয়েছে। বস্তুতপক্ষে উসুল আল ফিকহ্‌র পদ্ধতিগুলো ফিকহি আইনের যৌক্তিকতা বর্ণনা করে যেমন সাদৃশ্য চয়ন (কিয়াস), আইন সংক্রান্ত অগ্রাধিকার (ইস্তিহছান), ধারাবাহিকতা বজায় রাখা (ইস্তিশাব), বিচয়ন এবং ব্যাখ্যা করার বিধিমালায় উৎসগুলো ও ইজতিহাদ সম্পর্কে যথাযথ অনুধাবনে সহায়ক হিসেবে কাজ করতে এগুলো প্রণীত হয়েছে।

উৎসসমূহে প্রাপ্ত নির্দেশনা থেকে ফিকহ্‌র নিয়মনীতি

উসুল আল ফিকহ্‌র সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে উৎসগুলো অনুধাবন এবং ব্যাখ্যা করার সহায়ক হিসেবে ফিকহ্ আইনের নীতিমালা নির্দেশ করা। এজন্য উসুল আল ফিকহ্‌র চূড়ান্ত ফল হচ্ছে ফিকহ্। তথাপি এ দু'টি পৃথক বিষয়। ফিকহ্ ও উসুল আল ফিকহ্‌র মধ্যে প্রধান পার্থক্য হচ্ছে ফিকহ্‌তে ইসলামি আইনের বিধিবিধান ও এর বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা সম্পর্কিত জ্ঞানের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে আর উসুল আল ফিকহ্‌তে মূল উৎস থেকে এসব বিধিবিধান গ্রহণের জন্য যেসব পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে তা আলোচিত হয়েছে। অন্য কথায় বলা যায়, যে ফিকহ্ হচ্ছে আইন-কানুন আর উসুল আল ফিকহ্ হচ্ছে এ আইনের পদ্ধতি ও নীতিমালা। এ দু'টি বিষয়ের সম্পর্কের সাদৃশ্যের বিষয়টি ভাষার ক্ষেত্রে ব্যাকরণ ও দর্শনের ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

যুক্তিবিদ্যার (মানতিক) অনুরূপ। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, উসূল আল ফিকহ হচ্ছে শরিয়াহর উৎস, যা ফিকহর বিধিবিধান সঠিকভাবে গ্রহণের আদর্শিক মানদণ্ড। ফিকহ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানার্জনের জন্য এর উৎস সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। ফিকহর সংজ্ঞায় এ বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। এতে বলা হয়েছে শরিয়াহর ব্যবহারিক বিধিমালার জ্ঞান, এর উৎসগুলো বিস্তারিত সাক্ষ্য প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।[১] অন্যকথায় ফিকহর বিধিমালা অবশ্যই সরাসরি এর উৎসগুলো থেকে সংগৃহীত হতে হবে। আর এ জন্য শর্ত হলো ফিকহর উৎসের সাথে ফকিহর অবশ্যই ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকতে হবে। তাই দেখা যাচ্ছে, যে ব্যক্তি উৎসগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ফিকহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন তিনি কোনো ফকিহ হতে পারেন না।[২] 'অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করা নিষিদ্ধ' ফকিহকে কেবল এ বিধিটুকু জানলেই চলবে না। উপরন্তু উৎসের বিস্তারিত সাক্ষ্য প্রমাণ সম্পর্কেও তার সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে। তা হলো কুরআনের ওই আয়াত (সুরা বাকারা ২ : ১৮৮) যাতে বলা হয়েছে, 'তোমরা একে অন্যের সম্পদ অবৈধভাবে খেয়ো না'। 'কুরআনে চুরি নিষিদ্ধ করা হয়েছে' নিছক এ কথা বলার পরিবর্তে এ আয়াত হচ্ছে তার বিস্তারিত সাক্ষ্য প্রমাণ।

কুরআন-সুন্নাহ্র আইনগত পাঠ যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে হলে এর ব্যাখ্যার বিধিমালা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা জরুরি। কুরআনের বাণী ও সুন্নাহ্ সঠিকভাবে অনুধাবন করতে না পারলে, বিশেষ করে যে ক্ষেত্রে উল্লেখিত পাঠ সুস্পষ্ট নয় সেসব ক্ষেত্রে কোনো বিধিবিধান সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না। তাই উসূল আল ফিকহ অধ্যয়নের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট আয়াত থেকে অস্পষ্ট আয়াত, সুস্পষ্ট (জাহির), স্পষ্ট (নস), সাধারণ (আম), সুনির্দিষ্ট (খাস), আক্ষরিক (হাকিকি), রূপকধর্মী (মাজাজি) ইত্যাদি আয়াত পৃথক করার বিধিমালা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকতে হবে এবং প্রদত্ত আয়াতের যথার্থতা (দালালাত) কিভাবে অনুধাবন করা যায় তাও জানতে হবে। এ ছাড়া প্রয়োগ পদ্ধতি ও ব্যাখ্যার বিধি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন ওহিভিত্তিক এ আইন পদ্ধতিতে মানব যুক্তির সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, শরিয়াহর উৎস থেকে নতুন আইন সংগ্রহের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য (কিয়াস) হচ্ছে যুক্তির একটি অনুমোদনযোগ্য পদ্ধতি। কিভাবে কিয়াস গঠিত হবে, এর কী কী সীমাবদ্ধতা রয়েছে, কোন বিষয় সংযোজন বা বিরোধ নিয়ন্ত্রণে এর কর্তৃত্ব কতটুকু এবং অন্যান্য স্বীকৃত সাক্ষ্য প্রমাণের বিষয় নিয়ে আলোচনা, এসব হচ্ছে উসূলে ফিকহর প্রাথমিক বিষয়।

আইনি অগ্রাধিকার বা ইস্তিহছান হচ্ছে আরেকটি যুক্তিবাদী মতবাদ এবং ইসলামি আইনের একটি স্বীকৃত প্রমাণ বা পদ্ধতি। একটি সুনির্দিষ্ট সমস্যার অনুমিত অনেকগুলো সমাধানের ক্ষেত্রে একটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে এটি গঠিত হয়। ফকিহ

www.pathagar.com

ন্যায়পরায়ণতা ও স্বচ্ছতার আলোকে এসব সমাধানের একটি বা অন্যটিকে গ্রহণ করেন। এসব সমাধানের কোনটিকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে এবং কোনো নির্দিষ্ট সমস্যার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অগ্রাধিকার ও মতামতের সীমা প্রধানত পদ্ধতিগত ও ব্যাখ্যার বিষয়, তাই তাদের এসব কর্মপদ্ধতি উসুল আল ফিকহ্‌র বিষয়বস্তুর অংশে পরিণত হয়েছে।

উসুল আল ফিকহ্‌র প্রধান উদ্দেশ্য হলো ইজতিহাদ নিয়ন্ত্রণ এবং উৎস থেকে আইন সংগ্রহের প্রচেষ্টায় ফকিহ্‌কে পথনির্দেশনা প্রদান করা। অযোগ্য ব্যক্তিরা ইজতিহাদ করার চেষ্টা শুরু করলে ভ্রমের আশঙ্কা দেখা দেয় ও শরিয়াহ্‌র বিকাশের ক্ষেত্রে সংশয়ের সৃষ্টি হয়। তখন বিষয়টি আলেমদের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দেখা দেয় এবং উসুল আল ফিকহ্‌র পদ্ধতি প্রবর্তনের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। উসুল আল ফিকহ্‌র উদ্দেশ্য হলো শরিয়াহ্‌র উৎস থেকে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন এবং আইনি বিষয়বস্তু ও ধ্যান-ধারণা লাভের পদ্ধতি অনুসরণে ফকিহ্‌দের সহায়তা করা। এ ছাড়া উসুল আল ফিকহ্ কিয়াস, ইস্তিহছান, ইস্তিশাব, ইস্তিস্লাহ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে। এসব বিষয়ের জ্ঞান কোনো বিশেষ সমস্যার ক্ষেত্রে হুকম শারয়ি অর্জনে কোনো পদ্ধতি অবলম্বন সঠিক হবে তা নির্ধারণ ফকিহ্‌দের জন্য সহায়ক হয়। উপরন্তু উসুল আল ফিকহ্ ফকিহ্‌দের ইজতিহাদের শক্তি ও দুর্বলতা নিরূপণ ও তুলনা করতে সক্ষম করে তোলে এবং নুসুসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ইজতিহাদের রায়কে প্রাধান্য প্রদান করে।

এখানে এ কথা বলা যায় যে আম, খাস, মুতলাক, মুয়াকাইয়াদ ইত্যাদি ব্যাখ্যার বিধি সংক্রান্ত জ্ঞান সমভাবে আধুনিক সংবিধিবদ্ধ আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। শরিয়ত বা ধর্মনিরপেক্ষ আইনের কোনো আইনজ্ঞ বা বিচারক কোনো সুনির্দিষ্ট ঘটনার ক্ষেত্রে সংবিধিবদ্ধ আইনে কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশনা পেতে ব্যর্থ হলে তাকে বিচারসংক্রান্ত ব্যাখ্যা অনুসন্ধান অথবা এর সাদৃশ্য বের করতে হবে। তাই দেখা যাচ্ছে যে, দক্ষতার সাথে আইনগত বিষয় ব্যাখ্যা করা ও রায় দেয়া হচ্ছে বিচারকের কাজ। তিনি শরিয়াহ্‌র আদালত বা সংবিধিবদ্ধ আইনের আদালতের বিচারক কি না সেটা এখানে মুখ্য কোনো বিষয় নয়। উসুল আল ফিকহ্‌তে বিশেষজ্ঞ কোনো বিচারকের দক্ষতা এ ক্ষেত্রে যে কোনো আইনগত বিষয় উপলব্ধি ও ব্যাখ্যা প্রদানে তার জন্য সহায়ক বিবেচিত হতে পারে।[৩]

আল শাফেয়ী উসুল আল ফিকাহ্‌র প্রতিষ্ঠাতা। এ কথা বলা কতখানি যৌক্তিক? একটি মত হচ্ছে, যতদিন যাবত ফিকহ্‌র অস্তিত্বের কথা জানা যায় ততদিন ধরে উসুল আল ফিকহ্‌ও বর্তমান রয়েছে। উৎসগুলো ও এর বিষয়বস্তুর ব্যবহার পদ্ধতির অনুপস্থিতিতে ফিকহ্‌র সৃষ্টি সম্ভব নয়।[৪] এ দৃষ্টিতে এ কথা বলা যায় যে আল

www.pathagar.com

শাফেয়ীর অনেক আগে থেকেই উসুল আল ফিকহ্ বিদ্যমান ছিল। ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় সাহাবিগণ রা. উৎস থেকে কিভাবে ফিকহর বিধিবিধান সংগ্রহ করেছিলেন তার বহু উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। অন্য কথায় বলা যায়, ইসলামি আইন বিজ্ঞানের শীর্ষস্থানীয় ইমামদের অভ্যুদয়ের অনেক আগে থেকেই উসুল আল ফিকহর উল্লেখযোগ্য অস্তিত্ব বজায় ছিল। তবে এসব ইমাম- বিশেষ করে আল শাফেয়ীর কর্ম প্রচেষ্টায় উসুল আল ফিকহ্ একটি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ জ্ঞানভাণ্ডারে পরিণত হয়েছে। আমরা জানি যে এমনকি আল শাফেয়ীর আগে ইমাম আবু হানিফা কিয়াস ও ইস্তিহ্ছান প্রয়োগ করতেন এবং ইমাম মালিক তার মাদানি ইজমা তত্ত্বের জন্য সুপরিচিত ছিলেন। আমরা পরে এ বিষয়ে আরো আলোচনা করব। শাফেয়ী যখন এ ক্ষেত্রে আগমন করেন তখন বিচারিক চিন্তাধারার বিপুল সম্ভার ও পদ্ধতিগত বিষয়ে অগ্রসর পর্যায়ের যুক্তিতর্ক দেখতে পান। তবে বিরাজমান রচনাগুলো পুরোপুরিভাবে বৈসাদৃশ্য ও বহুমুখিতা থেকে মুক্ত ছিল না। তাই তার মানসম্মত রূপান্তরের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল এবং আল শাফেয়ী তার উসুলের আইনগত তত্ত্বে তা রূপায়িত করেন। তিনি তার গ্রন্থ রিসালাহ্তে একান্তভাবে এ বিষয়টি নিয়ে আলেচনা করেছেন এবং তার এ গ্রন্থটি উসুল আল ফিকহর ওপর প্রথম রচনা হিসেবে ব্যাপকভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

তথাপি এ কথা ঠিক যে ফিকহ্ উসুল আল ফিকহর অগ্রগামী ছিল এবং কেবলমাত্র ইসলামের দ্বিতীয় শতকে উসুল আল ফিকহর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি অর্জিত হয়।[৫] কেননা প্রথম শতকে উসুল আল ফিকহর তেমন একটা প্রয়োজন দেখা দেয়নি কারণ তখন রসুল সা. জীবিত ছিলেন এবং সমস্যার প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও সমাধান ওহির মাধ্যমে অথবা রসুল সা.-এর প্রত্যক্ষ নির্দেশনা থেকে পাওয়া যেত। অনুরূপভাবে রসুল সা.-এর ওফাতের পর তার শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট সাহাবিগণ রা. তার অনুসৃত নজিরের দ্বারা অনুপ্রাণীত হয়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত প্রদান করতেন। সূত্রের নিকটবর্তিতা ও ঘটনাবলি যথাযথভাবে অবগত থাকার কারণে তারা ব্যবহারিক সমস্যাবলির সহজ সমাধান দিতে পারতেন এবং এ জন্য কোনো পদ্ধতির প্রয়োজন দেখা দেয়নি।[৬] এরপর অবশ্য ইসলামের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার সম্প্রসারণ, বিভিন্ন এলাকায় সাহাবিগণের ছড়িয়ে পড়া এবং সরাসরি তাদের কাছে নির্দেশনা পাওয়া ক্রমশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এতে কুরআন সুন্নাহ্ অনুধাবনে সংশয় ও ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আরো স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। বিভিন্ন মহলে আইন ও বিচার-ফায়সালা সংক্রান্ত চিন্তাধারায় বিরোধ ও নানা মতের সৃষ্টি হয়। এতে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনার বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে। আর এ উপযুক্ত সময়ে আল শাফেয়ী উসুল আল ফিকহর পদ্ধতি প্রবর্তনে এগিয়ে আসেন। এ ক্ষেত্রে আল শাফেয়ীর আগমনের সময় ও ইরাকের ফকিহ্গণের মধ্যে ফিকহ্ সংক্রান্ত বিরোধ ব্যাপক আকার ধারণ করেনি;

www.pathagar.com

তারা যথাক্রমে আহল আল হাদিস ও আহল আল রাই হিসেবে পরিচিত ছিলেন। এ ছাড়া ওই আমলে হাদিস বিশারদরা সাফল্যের সাথে হাদিস সংগ্রহ ও সংকলন করতে সক্ষম হন। ফকিহ্গণ সুন্নাহ্র বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পর তারা আইনের ক্ষেত্র সম্প্রসারণের কাজ শুরু করেন। তাই ইজতিহাদ নিয়ন্ত্রণে একটি পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠে। শরিয়াহ্র একটি শাখা হিসেবে উসুল আল ফিকহ্র দৃঢ়ভিত্তি লাভ এককথায় বিশাল হাদিস সাহিত্যের যৌক্তিক সংকলন সুসম্পন্ন করতে সহায়ক হয়েছিল।[৭] ইসলামি ভূখণ্ডে বিপুলসংখ্যক অনারবের আগমন এবং সেখানে ইসলামের আইনগত ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ওপর এর ব্যাপক ক্ষতিকর প্রভাব পড়ার ঘটনা অবশেষে আল শাফেয়ীকে উসুল আল ফিকাহ্র আইনগত তত্ত্বের উৎকর্ষ সাধনে অনুপ্রাণীত করেছিল। আল শাফেয়ী শরিয়ত ও কুরআনের ভাষার বিশুদ্ধতা সংরক্ষণে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। তিনি তার গ্রন্থ রিসালাহ্তে ইজতিহাদের নীতি সম্পর্কিত নির্দেশনা প্রদান, খাস, আম, নাসিখ ও মানসুখ পরিচালনার নিয়মাবলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং ইজমা ও কিয়াস সম্পাদনের মূলনীতিমালা পেশ করেছেন। তিনি একক বা বিচ্ছিন্ন হাদিসের (খবর আল ওয়াহিদ) ওপর নির্ভরশীলতা এবং আহকাম নির্ধারণে এর মূল্যায়নের বিধিমালা সম্পর্কে আলোচনা করেন। আল শাফেয়ী ইস্তিহসানের বৈধতা খণ্ডন করে দেন এবং একে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে অযৌক্তিক চর্চা বই অন্য কিছু বলে বিবেচনা করেননি। এ কথা সত্য যে আল শাফেয়ী সর্বপ্রথম এসব বিষয় নিয়ে কাজ করেছেন তা নয়, তবে এ কথা ব্যাপকভাবে স্বীকার করা হয় যে, আল শাফেয়ী উসুল আল ফিকহ্কে সুসংহত ও সমন্বিত করেন, যা এর আগে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ও অসংহত অবস্থায় ছিল।[৮]

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে শিয়া আলেমগণ দাবি করে থাকেন যে তাদের পঞ্চম ইমাম মুহাম্মদ আল বাকির এবং তার ছেলে ও উত্তরাধিকারী জাফর আল সাদিক প্রথম উসুল বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। আবু জাহ্রাহ প্রাথমিক যুগের ইমামদের জীবনী ও কর্ম সম্পর্কে ব্যাপক লেখালেখি করেন। তার মতে, শিয়া ইমামগণও অন্যদের মতো উসুল সম্পর্কে লিখেছেন তবে এ দুই ইমামের কারোরই রিসালাহ্র সমমানের কোনো রচনা নেই। তাই উসুল আল ফিকহ্তে আল শাফেয়ীর অবস্থান ও অবদান অতুলনীয় এবং তাকে যথার্থই উসুল আল ফিকহ্র জনক হিসেবে বিবেচনা করা যায়।[৯]

আল শাফেয়ী আইনের চারটি প্রধান উৎস সম্পর্কে যে মৌলিক রূপরেখা প্রণয়ন করে গেছেন পরে আলেম সমাজ তা গ্রহণ করে নিয়েছেন। অবশ্য বিভিন্ন মাজহাব এর আরো উন্নতি সাধন করেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, হানাফিরা উসুল আল ফিকহ্তে ইস্তিহসান ও প্রচলিত রীতি (উরফ) সংযোজন করেছেন। আর মালেকী

www.pathagar.com

ঐকমত্যকে (ইজমা) আরো সংক্ষিপ্ত করে কেবলমাত্র মাদানী ইজমাতে সীমিত করেছেন। অন্যদিকে হাম্বল এ বিষয়ে অনেকটা মালেকীদের মতো দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন। তবে তাদের কেউই ঘোষিত মূলনীতি থেকে তেমন একটা দূরে সরে যাননি।[১০]

সাধারণভাবে এ কথা বলা যায় যে, ইসলামের চতুর্থ শতকের দিকে ইজতিহাদের দরজা বন্ধের তথাকথিত ঘোষণা ফিকহকে যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল উসুল আল ফিকহকে সেভাবে প্রভাবিত করতে পারেনি। এমনকি পরে অনুসৃত অনুকরণের (তাকলিদ) যুগেও উসুল আল ফিকহর শক্তি ও প্রভাব আরো বৃদ্ধি পায়। বস্তুত অনুকরণকারীরা তাদের যুক্তির বৈধতার মাপকাঠি হিসেবে উসুল আল ফিকহর পদ্ধতির ওপর নির্ভর করেন। এর ফলে উসুল আল ফিকহ সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে এবং তাকলিদকে যুক্তিগ্রাহী করার একটা উপায় হিসেবেও একে ব্যবহার করা হয়।[১১]

সংক্ষিপ্ত আকারে উসুল ও ফিকহর নিয়মাবলির (আল কাওয়াইদ আল ফিকাইয়াহ) মধ্যকার পার্থক্যের বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। কারণ এ দু'টি বিষয়ে মাঝেমধ্যে তালগোল পাকিয়ে যায়। ফিকহর নিয়মাবলি সম্পর্কে বলতে এর বিধিবিধান সংগ্রহের একটি ব্যবস্থা বুঝায় যা খোদ ফিকহর বিস্তারিত অধ্যয়নের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়। সাক্ষ্য প্রমাণ, লেনদেন, বিবাহ সংক্রান্ত আইন ইত্যাদির মতো ফিকহর বিভিন্ন ক্ষেত্রে তত্ত্বীয় নির্দেশনার সমন্বয়ে এগুলো গঠিত হয়। এভাবে এগুলো ফিকহর অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং উসুল আল ফিকহ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আল আশবাব ওয়া আল নাজায়ীর[১২] নামক গ্রন্থে দুই শতাধিক আইনসংক্রান্ত বিধি সংগ্রহ ও সংকলিত করা হয়েছে। এর মধ্যে ১০০টি ওসমানী মাজাল্লাহর সূচনা অংশে স্থান পেয়েছে। আল কাওয়াইদ আল ফিকাইয়াহ নামটির সাথে উসুল আল ফিকহর উচ্চারণের মিল রয়েছে। কিন্তু পূর্বেরটি উসুল আল ফিকহর অংশ নয় এবং দু'টি বিষয়ের একটির থেকে অন্যটির পার্থক্য রয়েছে।

উসুল আল ফিকহ ও উসুল আল কানুন এর মধ্যে তুলনা করলে দেখা যাবে যে এ দু'টি বিষয়ের মধ্যে অনেক অভিন্নতা রয়েছে, যদিও অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এ দু'টি বিষয়ে মিল বা সাদৃশ্যের কারণ হলো উভয়ই আইনের পদ্ধতি এবং তা সংগ্রহ ও ব্যাখ্যার বিধিবিধানের সাথে সংশ্লিষ্ট; তবে খোদ আইনের বিস্তারিত বিধিবিধানের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, সম্পত্তি আইনের ক্ষেত্রে উসুল আল ফিকহ ও উসুল আল কানুন উভয়ই সম্পত্তি আইনের সূত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং তা মালিকানা স্বত্ব, হস্তান্তর অথবা বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন সংক্রান্ত বিধিবিধানের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। এ বিষয়টি সম্পত্তি আইনের পদ্ধতির মধ্যে পড়ে না।

www.pathagar.com

যদিও উসুল আল ফিকহ্ ও উসুল আল কানুন এর সাধারণ উদ্দেশ্য অভিন্ন; উসুল আল ফিকহ্ প্রধানত : কুরআন, সুন্নাহ্, ইজমা ও কিয়াস এর সাথে সংশ্লিষ্ট। শরিয়াহ্র উৎসগুলো সার্বিকভাবে সুসমন্বিত এবং অনেকটা অনন্য, উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, এ দৃষ্টিকোণ থেকে আইনের কোনো বিধান অথবা কোনো হুকুম শারয়ী কেবল যৌক্তিকতার (আকল) কারণ দেখিয়ে এর কর্তৃত্বপূর্ণ সাধারণ উৎসের বাইরে থেকে উদ্ভাবন করা যাবে না। আকল ইসলামে আইনের স্বতন্ত্র কোনো উৎস নয়। এভাবে উসুল আল ফিকহ্ ইসলামের নির্দেশনার আওতায় গড়ে উঠেছে এবং এতে মানব আচরণের ওপরে আল্লাহ্ তায়ালার কর্তৃত্বের বিষয়টি স্বীকৃত হয়েছে।

অন্যদিকে উসুল আল কানুন প্রধানত যৌক্তিকতার মূলনীতির সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে এবং কেবলমাত্র যুক্তিই বহু ধর্মনিরপেক্ষ আইনের উৎস হতে পারে। এর কয়েকটি এতিহাসিক উৎস রয়েছে যেমন– রোমান আইন ও ব্রিটিশ সাধারণ আইন। সমাজে বিরাজমান আর্থসামাজিক অবস্থার আলোকে এসব আইনের মূলনীতি সমুন্নত রাখা হয় অথবা বাতিল করা হয়। অন্য দিকে শরিয়াহ্র উৎসগুলোর স্থায়ী বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা যৌক্তিকতা বা সামাজিক অবস্থার চাহিদার কারণ দেখিয়ে বাতিল করা সম্ভব নয়। উসুল আল ফিকহ্তে নমনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের একটা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যাতে সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি বিধানের জন্য আইনের প্রয়োজনীয় সমন্বয় করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তবে শরিয়ত ও এর উৎসগুলো সময় ও পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে বাতিল বা সীমিত করা যাবে না। উসুল আল ফিকহ্তে ফকিহ্ ও মুজতাহিদদের মূল ভূমিকা হলো ইতঃপূর্বে উৎস নির্দেশিত বিধিবিধান সংগ্রহ ও অনুধাবন করা। আর এ বিষয়টির সাথে উসুল আল কানুনের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। পশ্চিমা দেশগুলোর পার্লামেন্ট বা আইন পরিষদকে সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ হিসেবে উপযোগী বিবেচনা করা হয়, তারা যে কোনো আইন বাতিল বা নতুন আইন প্রণয়ন করতে পারে, অন্যদিকে ইসলামি রাষ্ট্রের আইন সংস্থা কুরআন অথবা সুন্নাহ্ বাতিল করতে পারে না তবে তারা মাসলাহা বা ইস্তিহসান ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে প্রণীত আইন রদ করতে পারে। সার্বিকভাবে কুরআনের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনার ক্ষেত্রে রদের বিধান প্রয়োগের তেমন একটা কার্যকারিতা নেই এবং মূলত রসুল সা.-এর ওফাতের সাথে সাথেই তার পরিসমাপ্তি ঘটে।[১৩]

ইসলামে সার্বভৌমত্বের অধিকারের বিষয়টি কেবল আল্লাহ্ তায়ালার। তিনিই মূল্যবোধ নিয়ন্ত্রণের একচ্ছত্র অধিপতি এবং তার ইচ্ছাতেই ভালো-মন্দ ও পাপ-পুণ্য নির্ধারিত হয়। এসব মূল্যবোধ এবং আইন প্রণয়ন ও তা সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে শাসক, গণপরিষদ এমনকি সার্বিকভাবে সমাজের কিছুই করার নেই। আল্লাহ্ তায়ালার প্রতিনিধি হিসেবে মুসলিম উম্মাহকে সুশাসন প্রতিষ্ঠার স্বার্থে শরিয়াহ্র

www.pathagar.com

বিধিবিধান বাস্তবায়ন ও ন্যায়বিচার পরিচালনাসহ প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণের কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে। সার্বভৌমত্বের সজ্ঞায় জনগণের সার্বভৌমত্বের ব্যবহারের ক্ষেত্রে সঠিক যে কথাটি বুঝায় তা হলো কেবলমাত্র প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা বা নির্বাহের সার্বভৌমত্ব (সুলতান তানফিজী)।[১৪] অবশ্য ইসলামে সমাজের বা ইসলামি পণ্ডিতদের মতৈক্য বা ইজমা আইনের স্বীকৃত উৎস। তবে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে ইজমাকে অবশ্যই কুরআনের বিধানের আওতাধীন হতে হবে এবং তা কখনই কুরআন সুন্নাহ্‌র সুস্পষ্ট নির্দেশনা খারিজ করতে পারে না। পশ্চিমা আইনে ব্যালট বাক্স ও জনগণের সার্বভৌমত্বের ভূমিকা যেভাবে দেখা হয় ইসলামের আইনে তাকে সেভাবে দেখা হয় না।

সবশেষে এ কথা বলা যায় যে পশ্চিমা আইনশাস্ত্রের মতো ইসলামি আইন বিজ্ঞানে কেবলমাত্র আদেশ-নিষেধের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এবং আইন-আদালতে প্রণীত বিষয়ের ওপর পশ্চিমা আইনশাস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ খুবই কম। ইসলামি আইন বিজ্ঞানের ক্ষেত্র অনেক বেশি বিস্তৃত। কারণ একজন মানুষ কি করবে অথবা করবে না তার সাথে এটি সম্পর্কিত নয়। উপরন্তু তার কী করা উচিত অথবা কি করা উচিত নয় তা এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত, যেখানে সে স্বেচ্ছায় সিদ্ধান্ত নেবে যে সে কী করবে অথবা কিছু করা থেকে বিরত থাকবে। উসুল আল ফিকহতে এসব ক্ষেত্রেও দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়।

২. উসুল আল ফিকহ অধ্যয়নের দুই পদ্ধতি

মাজহাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বিভিন্ন মাজহাবের আলেমরা উসুল আল ফিকহ অধ্যয়নে দু'টি পৃথক পন্থা অনুসরণ করেন যার একটি হলো তত্ত্বীয় এবং অন্যটি হলো অনুমেয় বা আইন প্রণয়ন সম্পর্কীয়। এ দুইপন্থার মধ্যে প্রধান পার্থক্য বিষয়বস্তুর নয়, পারিপার্শ্বিকতার। তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রাথমিকভাবে তাত্ত্বিক মূলনীতির ব্যাখ্যার সাথে সংশ্লিষ্ট আর অনুমেয় পন্থা এ দৃষ্টিকোণ থেকে বাস্তবসম্মত যে এর সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো প্রয়োগের আলোকে প্রণীত হয়েছে। একজন বিচারকের কাজ ও একজন আইনের খসড়া প্রণেতার কাজের তুলনার সাথে এ দু'টি পন্থার মিল রয়েছে। আইনের খসড়া প্রণয়ন প্রধানত মূলনীতির ব্যাখ্যার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যদিকে বিচারক নির্দিষ্ট মামলার মূলনীতি ও চাহিদার মধ্যে একটা সংশ্লেষণ অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করেন। শাফেয়ী মাজহাব ও মুতাকাল্লেমরা অর্থাৎ কালাম ও মুতাজিলা আলেমরা উসুল আল ফিকহ অধ্যয়নে তত্ত্বীয় পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। তত্ত্বীয় পদ্ধতি উসুল আল শাফেয়ী বা তরিকা আল মুতাকাল্লিমুন বলে পরিচিত। আর অনুমেয় পদ্ধতি উসুল আল হানাফিয়া বা তরিকা আল ফুকুহা বলে পরিচিত।

www.pathagar.com

আল শাফেয়ী প্রধানত, উসুল আল ফিকহর সাথে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে ফিকহকে সম্পর্কিত করার কোনো প্রচেষ্টা ছাড়াই তত্ত্বীয় মূলনীতি প্রণয়নে মনোযোগী হয়েছিলেন। একজন অসাধারণ উসুল আল ফিকহ বিশারদ হিসেবে আল শাফেয়ী অনেকগুলো মানদণ্ড নির্ধারণ করেন এবং যা ফিকহর বিস্তারিত বিধিবিধান প্রণয়নে অনুসরণ করা হবে বলে তিনি আশা করতেন। অন্য কথায় উসুল আল ফিকহর তার তত্ত্বীয় ব্যাখ্যা ফুরুর ক্ষেত্রে এর বাস্তব প্রয়োগের বিষয় বিবেচনায় আনা হয়নি। এ ছাড়া শাফেয়ী ও মুতাকাল্লিমরা দার্শনিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিভিন্ন জটিল বিষয়ে মনোযোগ দিয়েছিলেন। ফিকহর বাস্তবধর্মী বিধিবিধান বিকাশে তা হয়তো অবদান রেখেছিল অথবা রাখেনি। এ ভাবে নবুওতি মিশন এর পূর্বে নবিগণের ইসমাহতে শরিয়াহর বিধান প্রবর্তনের আগেই ব্যক্তি ও তার কর্মকাণ্ডের মর্যাদা সম্পর্কিত বিষয় এবং ফিকহর ব্যবহারিক বিধিমালার দূরতম প্রাসঙ্গিক বিষয়ের যৌক্তিক ও ভাষাগত দিকের মতো বিষয়ও শাফেয়ী ও মুতাকাল্লিমগণের রচনায় হানাফিগণের রচনার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে। অন্যদিকে হানাফিগণ খোদ ফিকহর সাথে সংযোগ বিধান করে উসুল আল ফিকহর মূলনীতিমালা বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন এবং এ বিষয়টির প্রতি অধিকতর বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের চেষ্টা করেছেন। সংক্ষেপে বলা যায় যে, তত্ত্বীয় পদ্ধতিতে উসুল আল ফিকহকে একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে রূপায়নের চেষ্টা করা হয়েছে, যার সাথে অবশ্যই ফিকহর সুসঙ্গতি বজায় থাকবে। অপরদিকে অনুমেয় পদ্ধতিতে উসুল আল ফিকহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, হানাফীগণ যখন দেখতে পান যে তাদের উসুলের কোনো মূলনীতির সাথে ফিকহর প্রতিষ্ঠিত মূলনীতির বিরোধ দেখা দিচ্ছে তখন তারা এ বিরোধ নিরসণের লক্ষ্যে তাদের নীতির সমন্বয় করেন অথবা একটি সমঝোতায় আসার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। উসুল আল ফিকহর তত্ত্বীয় নীতির তিনটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রচনা হলো, মুতাজিলা বিশেষজ্ঞ আবু হুসাইন আল বসরী (মৃত্যু, ৪৩৬), মুতামাদ ফি উসুল আল ফিকহ, শাফেয়ী বিশেষজ্ঞ ইমাম আল হারামাইন আল জুওয়াইনি (মৃত্যু, ৪৮৭), কিতাব আল বুরহান, ইমাম আবু হামিদ আল গাজ্জালী (মৃত্যু, ৫০৫), আল মুস্তাফা। পরে এ তিনটি গ্রন্থের সার সংক্ষেপ আল মাহসুল রচনা করেন ফকর আল দীন আল রাজী (মৃত্যু, ৬০৬)। সায়ীফ আল দীনের বিশাল রচনা আল ইহকাম ফি উসুল আল আহকাম এ উপরোল্লিখিত তিনটি অগ্রণী কিতাবের সংক্ষিপ্ত টিকা দেখতে পাওয়া যায়।

উসুল আল ফিকহর ওপর হানাফিগণের প্রাথমিক রচনার মধ্যে রয়েছে আবু হাসান আল কারখি (মৃত্যু, ৩৪০), কিতাব ফি আল উসুল, আবু বকর আল রাজী আল জামান (মৃত্যু, ৩৭০), উসুল আল জামান, ফকর আল ইসলাম আল বাজদাবি (মৃত্যু, ৪৮৩), তার বিখ্যাত গ্রন্থ হলো-উসুল, তিনি গ্রন্থটি রচনা করেন। এরপর

www.pathagar.com

প্রকাশিত হয় শামস আল দীন সারাখসির (মৃত্যু, ৪২৩) অসাধারণ গ্রন্থ উসুল আল সারাখসি। উভয় মাজহাবের আরো অনেক বিশিষ্ট আলেম এ সাহিত্যে অবদান রেখেছেন। তবে অগ্রগতির একটি নতুন পর্যায়ে উন্নতির লক্ষণ হিসেবে মুখতাছার আকারে অনেক পুস্তিকা রচনা করা হয়। এর মূল লক্ষ্য ছিল, শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিরাজমান রচনার সার সংক্ষেপ তুলে ধরা।

তত্ত্বীয় ও অনুমেয় পদ্ধতির সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টায় উসুল আল ফিকহর পরবর্তী পর্যায়ের অগ্রগতির বিষয় প্রকাশ পেয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ের হানাফি ও শাফেয়ী উভয় মাজহাবের আলেমদের রচনায় এ প্রচেষ্টার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে একটি সমন্বিত রচনা হলো, মুজাফফর আল দীন আল সুয়্যতীর (মৃত্যু, ৬৯৪) বাদি আল নিজাম আল জামি বায়ান উসুল আল বাজদাবি ওয়াল ইহকাম।

এ গ্রন্থে আল বাজদাবির উসুল ও আল আমিদির আল ইহকামের সমন্বয় করা হয়েছে। গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে লেখকের কৈফিয়তমূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে। দুই পদ্ধতির সমন্বয় করে রচিত আরেকটি অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হলো আল তাবদিহ। সদর আল শরিয়ত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ আল বুখারি (মৃত্যু, ৭৪৭) রচিত এ গ্রন্থে উসুল আল বাজদাবি, আল মাহসুল ও মালেকী ফকিহ আবু উমার ওসমান ইবনে আল হাজিব (মৃত্যু, ৬৪৬) রচিত মুখতাছার আল মুন্তাফার সমন্বয় করা হয়েছে। উসুল আল ফিকহর দুই পদ্ধতির সমন্বয়ে রচিত অন্য তিনটি সুপরিচিত গ্রন্থ হলো, শাফেয়ী ফকিহ তাজ আল দীন আল সুবকি (মৃত্যু, ৭৭১) এর জাম আল জাওয়ামী, কামাল আল দীন ইবনে আব্দুল হুমাম আল হানাফীর (মৃত্যু, ৮৬০) *আল তাহরীর* এবং হানাফী ফকিহ মুহিব আল দীন ইবনে আব্দুল শাকুরের (মৃত্যু, ১১১৯) মুসাল্লাম আল সুবুত। সবশেষে বলা যায়, আবু ইসহাক ইব্রাহীম আল শাতিবীর আল মুওয়াফাকাতের কথা উল্লেখ না করলে এ তালিকা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এটি হচ্ছে তাশরির দর্শন (হিকমাহ) এবং শরিয়াহর বিস্তারিত বিধিবিধান পালনের মাধ্যমে যে লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করা হয় সে সম্পর্কে এটি হচ্ছে বিস্তারিত আলোচনার এক অনন্য গ্রন্থ।[১৫]

৩. শরিয়াহর সাক্ষ্য প্রমাণ (*আল আদিল্লাহ আল শরিয়াহ*)

আদিল্লাহ শরিয়াহ ও আহকাম হলো আইনকানুন ও মূল্যবোধ যা মুকাল্লিফের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে, আর এ দু'টি বিষয় হচ্ছে উসুল আল ফিকহর মূল প্রতিপাদ্য। অনেক আলেমের মতে, এ দু'টি বিষয়ের মধ্যে আদিল্লাহ শরিয়াহ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং আদিল্লাহ থেকেই আহকামের সৃষ্টি হয়েছে। তাই এ দুটি বিষয় হচ্ছে পরস্পরের সম্পূরক। সম্ভবত উসুল আল ফিকহর দুটি প্রধান বিষয়ের মধ্যে মূল গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে আল আমিদী আদিল্লাহ শরিয়াহকে

www.pathagar.com

'ফিকহর প্রমাণ বিজ্ঞান (আদিল্লাহ আল ফিকহ) ও নিদর্শন বলে বর্ণনা করেন যাতে শরিয়াহর আহকাম সম্পর্কিত বিষয়গুলো পাওয়া যায়।'[১৬]

আক্ষরিক অর্থে দলিল অর্থ প্রমাণ, নিদর্শন বা সাক্ষ্য। প্রায়োগিক অর্থে এটি হলো উৎসের নির্দেশনা যা থেকে শরিয়াহর ব্যবহারিক বিধান বা হুকম সংগ্রহ করা হয়। এভাবে যে হুকম সংগ্রহ করা হয় তার বিষয়বস্তুর প্রকৃতি, আয়াত বা রেওয়ায়েতের স্পষ্টতা এবং যে মূল্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এতে করা হয় তার ওপর নির্ভর করে তা সুনির্দিষ্ট (কাতয়ী) বা অনুমানমূলক (যন্নী) হতে পারে।[১৭] উসুল আল ফিকহর পরিভাষায় আদিল্লাহ শরিয়তে চারটি প্রধান সাক্ষ্য প্রমাণ বা উৎসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো– কুরআন, সুন্নাহ্, ইজমা ও কিয়াস। এ অর্থে দলিল আসলের সমার্থক, কেননা শরিয়াহর চারটি উৎস আদিল্লাহ ও উসুল উভয় নামে পরিচিত। পবিত্র কুরআনে অনেক আয়াত রয়েছে যাতে শরিয়াহর উৎসগুলো এবং তাদের অগ্রাধিকার ক্রম চিহ্নিত করা হয়েছে। সুরা নিসার একটি আয়াতে (৪ : ৫৮-৫৯) অবশ্য সব কটি প্রধান উৎসের ইঙ্গিত করা হয়েছে : 'হে ইমানদার লোকগণ আনুগত্য কর আল্লাহ তায়ালার, তার রসুলের এবং সেসব লোকেরও যারা তোমাদের সামগ্রিক দায়িত্বসম্পন্ন। অতএব তোমাদের মধ্যে যদি কোনো প্রকার মতবৈষম্যের সৃষ্টি হয় তাহলে তাকে আল্লাহ ও তার রসুল সা.-এর দিকে ফিরিয়ে দাও।' এখানে 'আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য কর' বলতে কুরআন এবং 'রসুল সা.-এর আনুগত্য কর' বলতে সুন্নাহ্কে বুঝানো হয়েছে। 'যারা তোমাদের মধ্যে সামগ্রিক দায়িত্বসম্পন্নদের আনুগত্য' বলতে ইজমার উল্লেখ এবং এ আয়াতের শেষাংশে 'মতবৈষম্যের বিষয় আল্লাহ ও রসুল সা.-এর দিকে ফিরিয়ে দাও' বলার মাধ্যমে কিয়াসের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। মূলত কিয়াস হচ্ছে কুরআন-সুন্নাহ্র আদেশ-নিষেধের একটি সম্প্রসারণ। এসব উৎসে কিয়াসের যৌক্তিকতা বা কার্যকর কারণ (ইল্লত) স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ করা হয়েছে অথবা অনুমানের পন্থায়ও (ইসতিনবাক) একে চিহ্নিত করা যেতে পারে। উভয় পন্থার যে কোনোটির ভিত্তিতেই কিয়াস করা হোক না কেন, মূলত কিয়াসের কাজ হলো কোনো হুকম আবিষ্কার করা, যা ইতোমধ্যে কুরআন-সুন্নাহ্তে নির্দেশিত হয়েছে।[১৮]

অনেক ফকিহ দলিল ও আমারাহর (আলো, লক্ষণ বা পরোক্ষ ইঙ্গিত) মধ্যে পার্থক্য করে থাকেন এবং তারা দলিলকে এমন ধরনের সাক্ষ্য প্রমাণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন, যা সুনির্দিষ্ট রায় বা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে অথবা ইতিবাচক জ্ঞানের (ইলম) পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। অন্যদিকে আমারাহ সাক্ষ্য প্রমাণ ও আভাস-ইঙ্গিতের জন্য সংরক্ষিত, যা অনুমানমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথে ধাবিত করে।[১৯] এভাবে দলিল শব্দটি কেবলমাত্র সুনির্দিষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ যেমন- কুরআন, সুন্নাহ্, ইজমার ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

ব্যবহৃত হবে এবং অবশিষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ যা কিয়াস ও ইস্তিহসানের মতো অনুমানমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে গঠিত হয় তা আমারাহর শ্রেণির আওতায় পড়বে।

শরিয়াহর সাক্ষ্য-প্রমাণগুলোকে পুনরায় দুইভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, তা হলো, প্রেরিত সাক্ষ্য-প্রমাণ (আদিল্লাহ আকলিয়াহ) ও যৌক্তিক সাক্ষ্য প্রমাণ (আদিল্লাহ আকলিয়াহ)। প্রেরিত সাক্ষ্য-প্রমাণগুলো তাদের প্রথাগত রীতির স্বাভাবিকতায় স্বতন্ত্র, এ ছাড়া অধিকাংশ প্রেরিত সাক্ষ্য প্রমাণ যৌক্তিকভাবেও যথার্থ, আমরা পরে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। অবশ্য কুরআন সুন্নাহ্ ও ইজমার কর্তৃত্ব ও বাধ্যবাধকতার শক্তি তাদের সপক্ষে থাকতে পারে এমন যে কোনো যৌক্তিক যথার্থতা প্রতিপাদন থেকে স্বতন্ত্র। এর সাথে অন্য দু'টি প্রেরিত সাক্ষ্য-প্রমাণ যোগ করা হয়েছে, তাহলো, সাহাবাগণের রা. সিদ্ধান্ত এবং ইসলাম আগমনের আগের আইনগুলো (শারয়ী কাবলানা)।[২০]

অন্যদিকে যৌক্তিক কারণ ও যৌক্তিকভাবে যথার্থ প্রমাণিত প্রয়োজনের ওপর ভিত্তি করে যৌক্তিক সাক্ষ্য প্রমাণ গড়ে উঠেছে। এগুলো কেবল তাদের যৌক্তিকতার আলোকেই গৃহীত হতে পারে। মৌলিকভাবে কিয়াস, ইস্তিহছান ইস্তিশ্লাহ ও ইস্তিশাব হচ্ছে যৌক্তিক তত্ত্ব। এগুলো অবশ্য বিভিন্ন দিক দিয়ে প্রেরিত উৎসের ওপর নির্ভরশীল। ইসলামে যৌক্তিকতা এককভাবে কোনো স্বতন্ত্র সাক্ষ্য প্রমাণ বহন করে না, এ কারণে যৌক্তিক সাক্ষ্য প্রমাণকে পুরোপুরিভাবে প্রেরিত সাক্ষ্য প্রমাণের থেকে পৃথক করা সম্ভব নয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কিয়াস একটি যৌক্তিক প্রমাণ, তবে তা প্রেরিত সাক্ষ্য প্রমাণেরও অংশ, এখানে কিয়াস বৈধ হতে হলে তাকে অবশ্যই কুরআন, সুন্নাহ্ বা ইজমার একটি প্রতিষ্ঠিত হুকমের ভিত্তিতে গঠিত হতে হবে। কিয়াসে ইল্লতের অভিন্নতা প্রতিষ্ঠা হচ্ছে প্রধানত, একটি অভিমত ও ইজতিহাদের বিষয়। এ কারণে কিয়াসকে আদিল্লাহ আকলিয়াহ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে আদিল্লাহ শরিয়াহ সার্বিকভাবে যুক্তির সাথে সুসঙ্গতিপূর্ণ। বস্তুতপক্ষে শরিয়াহর সব ক্ষেত্রে মুকাল্লিফকে অর্থাৎ যুক্তি প্রদর্শনে সক্ষম এমন যোগ্য ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হয়েছে তা থেকে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেছে। সার্বিকভাবে শরিয়ত এমন কোনো দায়দায়িত্ব চাপিয়ে দেয় না, যা আকলের শর্তের পরিপন্থী। তাই দায়দায়িত্ব (তাকলিফ) বহনের মানদণ্ড হচ্ছে আকল এবং আকল ব্যতিরেকে সব বৈধ দায়দায়িত্ব ভূলুণ্ঠিত হবে এবং অনুরূপভাবে আকলবিহীন হুকম শারয়ী হবে ফলাফল শূন্য।[২১]

আদিল্লাহ শরিয়তকে পুনরায় মুস্তাকিল ও মুকাইয়াদ, এ দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে, এগুলো হলো– যথক্রমে স্বতন্ত্র ও নির্ভরশীল সাক্ষ্য প্রমাণ। শরিয়াহর প্রথম তিনটি উৎসের প্রত্যেকটি একটি স্বতন্ত্র আসল বা দলিল মুস্তকিল, যা নিজস্ব

www.pathagar.com

অধিকার বলেই দলিল বা সাক্ষ্য প্রমাণ হিসেবে পরিগণিত হয়। অন্যদিকে কিয়াস হলো নির্ভরশীল আসল বা দলিল মুকাইয়াদ অর্থে। উপরেই আভাস দেয়া হয়েছে যে এর ক্ষমতা তিনটি স্বতন্ত্র উৎসের যে কোনো একটি থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশ্ন উঠতে পারে ইজমার জন্য প্রায় কুরআন ও সুন্নাহ্‌র সনদ দরকার হয় তাই একে কেন স্বতন্ত্র সাক্ষ্য প্রমাণের শ্রেণিভুক্ত করা হবে? এর উত্তর হলো, ইজমা প্রথম গঠনের সময় কুরআন ও হাদিসের সনদের প্রয়োজন হয় কিন্তু একবার ইজমা গঠিত হয়ে গেলে তা আর সনদের ওপর নির্ভর করে না এবং তা একটি স্বতন্ত্র দলিল বা সাক্ষ্য প্রমাণে পরিণত হয়। অপরদিকে এ জন্য অব্যাহতভাবে ইল্লতের কিয়াসের যথার্থতা প্রতিপাদন করা প্রয়োজন। ইজমা চূড়ান্ত হওয়ার পর এর যথার্থতা প্রতিপাদনের কোনো দরকার হয় না তাই এটি হলো স্বতন্ত্র আসল।[২২]

আদিল্লাহ্‌র অপর শ্রেণি বিভাগেরও উল্লেখ করা প্রয়োজন, তা হলো– সুনির্দিষ্ট (কাতয়ী) ও অনুমানমূলক (যন্নী) সাক্ষ্য প্রমাণ। দলিল শারয়ীর এ বিভক্তিকে কেবল শরিয়াহ্‌র সাক্ষ্য প্রমাণের অখণ্ডতার আলোকে নয় বরং এর বিস্তারিত বিধিবিধানের ভিত্তিতে দেখা হয়েছে। এভাবে কুরআন, সুন্নাহ্ ও ইজমা হচ্ছে সুনির্দিষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ, এ অর্থে এগুলো চূড়ান্ত ও বাধ্যবাধকতামূলক। অবশ্য এর সব ক'টিতেই অনুমানমূলক বিধিবিধান রয়েছে, যা ব্যাখ্যার জন্য উন্মুক্ত। এ অর্থে একটি দলিল হুকমের সমার্থক। একটি দলিল বর্ণনা (রেওয়ায়েত) ও অর্থ (দালালাত) উভয়ের আলোকে কাতয়ী হতে পারে। বর্ণনা ও অর্থ উভয় ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদিস মুতাওয়াতির সবই সুস্পষ্ট নির্দেশনাপূর্ণ কাতয়ী আমরা পরে কুরআনের আইনের বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করব। এখানে কথা বলা যায় যে কুরআন ও এর সব অংশ নির্ভুল তাই এর যথার্থতা প্রমাণসিদ্ধ (কাতয়ী আল সুবুত)। অন্যদিকে বিচ্ছিন্ন বা আহাদ হাদিসের অনুমানমূলক যথার্থতা রয়েছে তাই তা অনুমানমূলক দলিল বা সাক্ষ্য প্রমাণ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে।[২৩] অনুরূপভাবে ইজমার কোনো সিদ্ধান্ত অব্যাহত সাক্ষ্যের (তাওয়াতুর) মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছলে তা সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণিত সাক্ষ্য (কাতয়ী আল সুবুত) বলে বিবেচিত হবে। তবে যখন ইজমা একক হাদিসের ভিত্তিতে গৃহীত হবে তখন এর যথার্থতার ব্যাপারে সংশয়ের সুযোগ থাকবে এবং সে কারণে তা যন্নী আল সুবুতের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।

কুরআনের আয়াত অথবা রসুল সা.-এর হাদিসের কোনো আদেশ বা নিষেধ থাকতে পারে। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী কোনো আদেশ (আমর) হলো বাধ্যতামূলক করণীয় (ইউজুব), আর নিষেধ (নাহি) তাহরিম বুঝায়, যদি এ ক্ষেত্রে ভিন্ন কিছু বুঝানোর কোনো প্রমাণ পাওয়া না যায়। কুরআন-হাদিসের শব্দ প্রয়োগ, বিষয়বস্তু ও অন্যান্য সহায়ক সাক্ষ্য প্রমাণের আলোকে তার সঠিক শারয়ী মূল্য কী হবে তা নির্ধারিত হতে

www.pathagar.com

পারে। এভাবে কোনো আদেশ ইউজুব নয়, সুপারিশ (নজব) বা নিছক অনুমোদন (ইবাহা) যোগ্য হবে। অনুরূপভাবে কুরআন বা সুন্নাহ্‌র কোনো নিষেধ (নাহি) ঠিক তাহরিম না হয়ে অপছন্দনীয় (করাহা) হতে পারে। তাই দেখা যাচ্ছে যে, পাঁচটি মূল্যের মানদণ্ডে কাতয়ী ও যন্নীর সঠিক মূল্য স্বপ্রমাণিত নয়, কুরআন, হাদিস ও ইজতিহাদে প্রাপ্ত সহায়ক সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে তা নির্ধারিত হয়ে থাকে। কুরআন-সুন্নাহ্‌র কাতয়ী মূলত ব্যাখ্যার জন্য উন্মুক্ত নয়। তাই কেবলমাত্র যন্নী সাক্ষ্য প্রমাণের ক্ষেত্রেই ব্যাখ্যা ও ইজতিহাদের সুযোগ রয়েছে।[২৪]

টিকা

১. আমিদী, ইহকাম, ১, ৬; শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ৩।
২. তুলনীয়, আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ৬।
৩. তুলনীয়, বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা, ৩৭-৩৮
৪. তুলনীয়, আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ৮।
৫. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ১৬; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা, ১০।
৬. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১৬-১৭।
৭. তুলনীয়, বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ১২।
৮. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১৪।
৯. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ১৩; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ১৪।
১০. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১৪।
১১. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১৪।
১২. দু'টি বিখ্যাত গ্রন্থের একই শিরোনাম হলো– আল আশবাব ওয়া আল নাযায়ীর। লিখেছেন, জালাল আল দীন আল সুয়ুতি ও ইবনে নুযাইম আল হানাফী।
১৩. বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৪১-৪৩।
১৪. তুলনীয়, জায়েদান, আল ফারজ ওয়া আল দাওলাহ, পৃষ্ঠা ১৯।
১৫. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ১৪-২০; Hitu Wajis, পৃষ্ঠা ১৩-২৪; যুহাইর, উসুল, ১, ৪।
১৬. আমিদী, ইহকাম, ১, ৭; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৩১।
১৭. একই গ্রন্থ, ১, ৯; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৪৬; Hitu Wajis, পৃষ্ঠা ৯৯।
১৮. তুলনীয়, বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৫১-৫৫।
১৯. আমিদী, ইহকাম, ১, ৯।
২০. তুলনীয়, বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৫৪-৫৫।
২১. আমিদী, ইহকাম, ৩, ১৮০; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৫০।
২২. আমিদী, ইহকাম, ১, ২৬০।
২৩. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ৪৭; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৫৩; Hitu Wajis, পৃষ্ঠা ১৯।
২৪. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৩৫; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ৭১; শালতুত, আল ইসলাম, পৃষ্ঠা ৪৯৮।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

শরিয়াহর প্রথম উৎস : আল কুরআন

মূল শব্দ কারাআ (অর্থ,পড়া) থেকে গঠিত কুরআন হচ্ছে একটি ক্রিয়া বিশেষ্য। কুরআন এর শাব্দিক অর্থ হলো 'পাঠ করা' অথবা 'তিলওয়াত বা আবৃতি করা।' একে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে, 'কুরআন আল্লাহ তায়ালার বাণী সম্বলিত গ্রন্থ, যা আরবি ভাষায় ওহির আকারে নবি মুহাম্মদ সা.-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যা অব্যাহত সাক্ষ্য বা তাওয়াতুর আকারে আমাদের কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে।[১] কুরআন হচ্ছে মুহাম্মদ সা.-এর নবুওতের সাক্ষ্য, মুসলমানদের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য দিকনির্দেশনা এবং শরিয়াহর প্রথম উৎস। এ হচ্ছে আলেমগণের সর্বসম্মত মত, অবশ্য কিছু সংখ্যক আলেম এমন কথাও বলে থাকেন যে, কুরআন হচ্ছে একমাত্র উৎস আর অন্য উৎসগুলো হলো কুরআনের ব্যাখ্যামূলক (সুরা আলাক ৯৬ : ১)। এর মাধ্যমে কুরআন নাজিলের সূচনা হয় এবং (সুরা মায়েদা ৫ : ৩) এ আয়াত দিয়ে, 'আজ আমি তোমাদের দীনকে তোমাদের জন্য সম্পূর্ণ করে দিয়েছি এবং আমার নিয়ামত তোমাদের প্রতি পূর্ণ করেছি আর তোমাদের জন্য ইসলামকে তোমাদের দীন হিসেবে কবুল করে নিয়েছি'।[২] কুরআনের প্রথম ও শেষ কথা হচ্ছে, শিক্ষা ও ধর্মীয় দিকনির্দেশনা। এভাবেই মানবজাতির প্রতি আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ বর্ষিত হয়েছে।

কুরআনে ছোট-বড় ১১৪টি সুরা ও ৬২৩৫টি আয়াত রয়েছে। সবচেয়ে ছোট সুরায় ৪টি আয়াত এবং সবচেয়ে বড় সুরায় ২৮৬টি আয়াত রয়েছে। প্রতিটি সুরার পৃথক পৃথক নাম রয়েছে। দীর্ঘতম সুরাটি প্রথমে রয়েছে এরপর ক্রমশ ছোট সুরাগুলো স্থান পেয়েছে। রসুল সা. তার ওফাতের বছর প্রতিটি সুরার আয়াতের ক্রম এবং সুরাগুলোর ক্রম পুনর্বিন্যাস ও চূড়ান্ত করে যান। এ পুনর্বিন্যাস অনুযায়ী কুরআনের শুরু সুরা ফাতিহা দিয়ে এবং শেষ হয়েছে সুরা নাস দিয়ে।[৩]

কুরআনের মূল বক্তব্য বিষয়বস্তু অনুসারে শ্রেণি বিভাগ করা হয়নি। বিভিন্ন বিষয়ের আয়াত অপ্রত্যাশিত স্থানে দেখা গেছে এবং এর মূলপাঠের পরম্পরা নির্ধারণে কোনো সুনির্দিষ্ট ক্রম অনুসরণ করা যাবে না। এর কয়েকটি উদাহরণ হলো, নামাজের (সালাত) নির্দেশ সংক্রান্ত বিষয় এসেছে দ্বিতীয় সুরার তালাক সম্পর্কিত আয়াতের মাঝামাঝি স্থানে (সুরা বাকারা ২ : ২২৮-২৪৮)। একই সুরায় আমরা ইয়াতিমদের সাথে আচরণ এবং অবিশ্বাসী (কাফের) মেয়েদের বিয়ে সংক্রান্ত বিষয়ের মাঝে মদপান, ধর্মত্যাগ ও যুদ্ধ সম্পর্কিত বিধিবিধান দেখতে পায় (সুরা বাকারা, ২ : ২১৬-২২১)। অনুরূপভাবে হজ সম্পর্কিত আয়াত (সুরা আল বাকারা, ২ : ১৯৬-২০৩) ও (সুরা হাজ, ২২ : ২৩-২৭) উভয় সুরাতে দেখতে পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

বিয়ে, তালাক ও বাতিলকরণ (রিজআহ্) সংক্রান্ত বিধিবিধান দেখতে পাওয়া যায় সুরা আল বাকারা, আল তালাক ও আল নিসায়। এ থেকে উপসংহারে আসা যায় যে, কুরআন হচ্ছে একটি অবিভাজ্য সমগ্র বিশ্বাস ও কর্মে পরিণত করার দিকনির্দেশনা, যা অবশ্যই অখণ্ডভাবে পুরোপুরি মানতে ও অনুসরণ করতে হবে। তাই কুরআনের কোনো কোনো বিষয় অনুসরণ এবং অবশিষ্ট অংশ পরিত্যাগ করার চেষ্টা হবে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। বস্তুত এ হচ্ছে কুরআনের আয়াতের (সুরা মায়েদা, ৫ : ৫২) মর্মবাণী যাতে রসুল সা.-কে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে : 'তাদের (কাফেরদের) ব্যাপারে সতর্ক থাকুন তা না হলে তারা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আপনার ওপর অবতীর্ণ বিধানের একাংশ থেকে আপনাকে সরে যেতে প্রলুব্ধ করবে'।[৪]

কুরআন সুস্পষ্ট ওহির (ওহি জাহের) সমন্বয়ে গঠিত। একে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তার রসুল মুহাম্মদ সা.-এর সাথে যোগাযোগ বলে অভিহিত করা হয়েছে। তাঁর বাণী রসুল সা.-এর কাছে পৌঁছে দেন ফিরিশতা জিব্রাঈল আ.। সুস্পষ্ট ওহি পরোক্ষ ওহির (ওহি বাতিন) থেকে আলাদা এবং তা কেবলমাত্র ধারণা সম্পর্কিত অনুপ্রেরণার (ইলহাম) সমন্বয়ে গঠিত : আল্লাহ তায়ালা রসুল সা.-কে অনুপ্রাণিত করেন এবং পরে রসুল সা. তা নিজ ভাষায় ব্যক্ত করেন। রসুল সা.-এর সব বক্তব্য বা অহাদিস ওহি বাতিল শ্রেণির আওতায় পড়বে যেন তা কুরআনের অন্তর্ভুক্ত হতে না পারে। এখানে হাদিসে কুদসি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া দরকার। এ শ্রেণির হাদিসে রসুল সা. সরাসরি আল্লাহ তায়ালার থেকে প্রাপ্ত ধারণা বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য শ্রেণির হাদিস থেকে হাদিসে কুদসি কেবলমাত্র কাঠামোর দিক থেকে আলাদা। রসুল সা. নিজে অবশ্য অন্যান্য হাদিস থেকে হাদিসে কুদসিকে আলাদা করেননি, মূলত হিজরি পঞ্চম শতকের দিকে হাদিস বিশারদগণ একে একটি পৃথক শ্রেণির হাদিস হিসেবে প্রবর্তন করেন। সব ধরনের হাদিসই খোদায়ী অনুপ্রেরণাজাত, যা রসুল সা.-এর বাণীর আকারে প্রকাশ পেয়েছে। কোনো হাদিসই কুরআনের সমতুল্য নয়। হাদিস পাঠকে কুরআন তেলাওয়াতের অনুরূপ আধ্যাত্মিক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা হয় না।[৫]

কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট আরবি ভাষায় এর বাণী নাজিল করা হয়েছে (সুরা নাহল ১৬ : ৩০)। আলেমরা অবশ্য একমত যে কুরআনে অনারব মূল শব্দও রয়েছে তবে সেসব শব্দ ওহি নাজিলের আগেই আরবি ভাষায় গৃহীত ও অঙ্গীভূত হয়ে যায়। এ ধরনের মাত্র কয়েকটি শব্দের উদাহরণ এখানে তুলে ধরা যেতে পারে, যেমন- কিস্তআম (দাড়িপাল্লা), (সুরা বনী ইসরাঈল ১৭ : ৩৫), গাছ্ছাক (তীব্র শীত), (সুরা নাবা ৭৮ : ২৫) ও সিজ্জিল (পোড়া মাটি),

www.pathagar.com

(সুরা হিজর ১৫ : ৭৪)। এসব শব্দ যথাক্রমে গ্রিক, তুর্কি ও ফার্সি ভাষা থেকে উদ্ভূত।[৬] তবে এদের ব্যবহার বিচ্ছিন্ন শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং কুরআনে অনারব উদ্ভূত কোনো শব্দগুচ্ছ বা বাক্য নেই।[৭] যেহেতু কুরআন আরবিতে সুস্পষ্ট ওহির সমন্বয়ে গঠিত তাই অন্য ভাষায় এর অনুবাদ অথবা আরবি বা অন্য ভাষায় ব্যাখ্যা কুরআনের অংশ নয়। অবশ্য ইমাম আবু হানিফা মনে করতেন যে কুরআন নামটি শুধু অর্থ বুঝানোর জন্য এবং ফার্সি অনুবাদ পাঠ করে নামাজ আদায় করা যেতে পারে। তবে তার শিষ্যরা এ ব্যাপারে তার সাথে দ্বিমত পোষণ করেন এবং আবু হানিফাও পরে তার এ প্রাথমিক মত পরিবর্তন করেন। বর্তমানে হানাফী মাজহাব তার এ মতকেই সঠিক বলে বিবেচনা করে থাকেন।[৮]

রসুল সা. নিজে কুরআন মুখস্থ করেন এবং অনুরূপভাবে সাহাবিগণ রা. কুরআন হিফজ করতেন। বস্তুত কুরআন সুনির্দিষ্ট ঘটনাবলি সম্পর্কে খণ্ড খণ্ডভাবে দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে অবতীর্ণ হওয়ায় এটি করা অনেকাংশে সহজ হয়েছে। কুরআন পর্যায়ক্রমে নাজিলের ব্যাখ্যা দিয়েছে এভাবে : 'অবিশ্বাসীরা বলে, এ ব্যক্তির (মুহাম্মদ) ওপর সমগ্র কুরআন একই সময় নাজিল হলো না কেন?' হ্যাঁ এরূপ করা হয়েছে এ জন্য যে আমরা একে খুব ভালোভাবে তোমার হৃদয়ে বদ্ধমূল করেছিলাম, আর (এ উদ্দেশ্যেই) আমরা একে এক বিশেষ ধারায় আলাদা আলাদা অংশে সজ্জিত করেছি' (সুরা ফুরকান ২৫ : ৩২)।

কুরআনের অন্যত্র আমরা দেখতে পাই : 'এ কুরআনকে আমরা অল্প অল্প করে নাজিল করেছি যেন তুমি লোকদেরকে থেমে থেমে তা শোনাও এবং একে আমরা (অবস্থা মতো) ক্রমশ নাজিল করেছি' (সুরা বনী ইসরাঈল ১৭ : ১০৬); 'আমরা তোমাকে পড়িয়ে দেবো, অতঃপর তুমি ভুলে যাবে না' (সুরা আ'লা, ৮৭ : ৬)।

পর্যায়ক্রমে কুরআন নাজিল হওয়ায় ইমানদাররা এ নিয়ে চিন্তাভাবনা করার এবং একে মুখস্থ করার সুযোগ পেয়েছে। এ ছাড়া একটা সময় ধরে ওহি নাজিলের ফলে অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ বজায় থাকে এবং আধ্যাত্মিক শক্তি নবায়নের সুযোগ সৃষ্টি হয় যাতে নতুন ধর্মের প্রতি অবিশ্বাসীদের বৈরিতার মুখে মুসলমানরা দুর্বল হয়ে না পড়ে। উপরন্তু তৎকালীন আরব সমাজের ব্যাপক নিরক্ষরতার পরিবেশে সমগ্র কুরআন একসাথে নাজিল হলে তাদের পক্ষে তা বুঝা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়াত। কুরআনের বিধিবিধান মানুষের জীবন ঘনিষ্ঠ। তাই হঠাৎ এক সাথে তা চাপিয়ে দেয়া সম্ভব ছিল না। কুরআন খণ্ড খণ্ড আকারে থেমে থেমে নাজিল করা হয় যাতে মুমিনদের জন্য তা কষ্টকর না হয়।[৯] মদ নিষিদ্ধ করে কুরআনের বিধিবিধান নাজিলের ঘটনায় পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন বিধিবিধান প্রবর্তনের কুরআনের পদ্ধতির চমৎকার দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়। বিধিবিধানের বৈশিষ্ট্য ও কাজ সম্পর্কে

www.pathagar.com

কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। বাহ্যত প্রথম দিকে মদ পানের ওপর বিধিনিষেধ ছিল না। পরে নৈতিক উপদেশের আকারে কুরআনের আয়াত নাজিল হয় : 'তারা জিজ্ঞাসা করছে, মদ ও জুয়া সম্পর্কে কী নির্দেশ? বলে দাও, এ দু'টি জিনিসে বড় পাপ রয়েছে, যদিও তাতে তাদের জন্য কিছু উপকারিতাও আছে' (সুরা বাকারা, ২ : ২১৯)। এরপর মাদকাসক্ত অবস্থায় নামাজ আদায় নিষিদ্ধ করা হয় (সুরা নিসা, ৪ : ৪৩)। অবশেষে মদপানের ওপর পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় (সুরা মায়েদা, ৫ : ৯৩) এবং 'মদ ও জুয়া উভয়কে শয়তানের কাজ...' বলে ঘোষণা করা হয়। 'শয়তান তোমাদের মধ্যে দুশমনি ও ঘৃণা-বিদ্বেষের বীজ বপন করতে চায়।' কোন বিষয়ে সমস্যা দেখা দিলে তা কিভাবে ক্রমান্বয়ে মোকাবেলা করতে হবে এখানে সে বিষয়টি দেখানো হয়েছে।

আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে সমগ্র কুরআন হচ্ছে মুতাওয়াতির অর্থাৎ সর্বজনীনভাবে গৃহীত সাক্ষ্যপ্রমাণের দ্বারা এর যথার্থতা প্রমাণিত। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে কুরআন মুখস্থ ও লিখিতভাবে সংরক্ষিত হয়ে আসছে। তাই কুরআনের ভিন্ন ভিন্ন পাঠের যথার্থতা প্রতিপাদনের জন্য তাওয়াতুর এর চেয়ে কম কোনো কিছু সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। এর উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর নামে কয়েকটি আয়াতে কিছু ভিন্ন ভিন্ন পাঠের শব্দ রয়েছে তাওয়াতুর এর মাধ্যমে যার যথার্থতা প্রতিপন্ন হয়নি তাই তা কুরআনের অংশ নয়, যেমন- তাওবার (কাফ্ফারা) হিসেবে আদর্শ আয়াতে তিন দিন ধরে রোজা পালনের কথা বলা হয়েছে, অন্যদিকে মাসউদ রা. এর সংস্করণে একটানা তিন দিন রোজা পালনের কথা বলা হয়েছে। (সুরা আল মায়েদার ৫ : ৯২) সংশ্লিষ্ট আয়াতের অতিরিক্ত শব্দ (যেমন- একটানা) তাওয়াতুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়নি তাই তা কুরআনের অংশ নয় এবং এর কোনো কার্যকারিতা নেই।[১০]

রসুল সা.-এর জীবদ্দশায় কুরআনের বাণী কেবলমাত্র মুখস্থ করার মাধ্যমেই সংরক্ষণ করা হয়নি উপরন্তু তা প্রাপ্ত বস্তুসমূহ যেমন– সমতল পাথর, কাঠ ও হাড়ের ওপর খোদাই করেও সংরক্ষণ করা হয়েছিল। তাই কুরআনকে কেন বাঁধাই গ্রন্থ আকারে সংরক্ষণ করা হয়নি তার ব্যাখ্যা এখানে পাওয়া যেতে পারে। প্রাথমিকভাবে প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর রা. ইমামাহর যুদ্ধে পরপরই কুরআন সংগ্রহ করেন। এ যুদ্ধে অন্তত ৭০ জন কুরআনে হাফেজ সাহাবা নিহত হন। রসুল সা.-এর নকলনবিস হজরত জায়েদ ইবনে সাবিত রা.কে কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করা হয় এবং তিনি ১১ থেকে ১৪ হিজরির মধ্যে তা সম্পন্ন করেন। তবে এ সংস্কারের কয়েকটি বিবরণ ও পাঠ শিগগিরই গোপনে ব্যবহার শুরু হয়। তৃতীয় খলিফা হজরত উসমান রাদি আল্লাহু আনহু হজরত জায়েদের রা. সেবাকর্মকে কাজে

www.pathagar.com

লাগিয়ে পুনরায় কুরআনের শুদ্ধতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে একক খণ্ডে সংকলিত করেন। এরপর ভিন্ন ধরনের অবশিষ্ট সব কিছু ধ্বংস করে ফেলন। এর ফলে আজ পর্যন্ত একটি মাত্র নির্ভুল কুরআন ব্যবহৃত হয়ে আসছে।[১১]

রসুল সা.-এর নবুওতি জিন্দেগির দু'টি পর্যায়ে মক্কা ও মদিনায় কুরআন নাজিল হয়। কুরআনের বড় অংশ মোট ৩০ পারার মধ্যে ১৯ পারাই মক্কায় রসুল সা.এর ১২ বছরের নবুওতি জীবনে নাজিল হয়। অবশিষ্ট অংশ রসুল সা.-এর মদিনায় হিজরতের পর মাত্র সাড়ে নয় বছরে নাজিল হয়।[১২] কুরআনের মক্কায় অবতীর্ণ অংশে প্রধানত ইমান বা বিশ্বাস, আল্লাহ তায়ালার একত্ব বা তাওহিদ মুহাম্মদ সা.-এর রেসালাত, আখিরাত এবং অবিশ্বাসীদের সাথে বিরোধ ও তাদের প্রতি ইসলামের দাওয়াতের বিষয় স্থান পেয়েছে। অন্যদিকে কুরআনের মাদানি অংশে রয়েছে বিভিন্ন বিধিবিধান এবং মদিনার নতুন পরিবেশে জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ন্ত্রণের বিষয়গুলো। মাদানি যুগের তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো মুসলিম উম্মাহ গঠন ও নবিন ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং নতুন সমাজের রাজনৈতিক, আইনগত ও অর্থনৈতিক নীতিমালার প্রতি কুরআনের গুরুত্বের পরিবর্তন। এ সময় ইসলাম আরবের অন্যান্য এলাকায় বিস্তারিত হয় এবং যুদ্ধ ও শান্তি, অধিকৃত অঞ্চলের জনগণের মর্যাদা ও অধিকার, পরিবার সংগঠন ও সরকারের নীতিমালার বিষয় কুরআনের মাদানি অংশে বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে।[১৩] কুরআনের মক্কী ও মাদানি অংশের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান কুরআনের আয়াত যে পরিবেশ-পরিস্থিতিতে নাজিল হয়েছিল তার প্রেক্ষাপট ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা গভীরভাবে উপলব্ধি, বিশেষ করে কুরআনের নির্দেশনা বাতিলের (নাসখ) সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনা বুঝতে সহায়ক হয়। কুরআনের বাতিল (আন নাসখ) ও বাতিল হয়ে যাওয়া (আল মানসুখ) অংশের পার্থক্যের বিষয় সংশ্লিষ্ট আয়াত অবতীর্ণের কালানুক্রমিক ক্রম নির্ধারণের ওপর নির্ভরশীল। অনুরূপভাবে কুরআনের অধিকাংশ সাধারণ ('আম) বিধিবিধান খোদ কুরআন অথবা হাদিসের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়েছে। এভাবে কুরআনের মক্কী ও মাদানি অংশ সম্পর্কে জ্ঞান কুরআনের অনেক বিধিবিধানের বৈশিষ্ট্য ভালোভাবে উপলব্ধির সুযোগ করে দিয়েছে।

কোনো সুরা মক্কায় অবতীর্ণ হলে এবং তাতে পরে মদিনায় অবতীর্ণ আয়াত থাকলেও তাকে মক্কী সুরা বলে বিবেচনা করা হয়। কুরআনে ৮৫টি মক্কী সুরা ও ২৯টি মাদানি সুরা রয়েছে। প্রতিটি যুগের বিরাজমান পরিবেশ-পরিস্থিতি উভয় যুগের সুরাগুলোয় ভিন্ন ভিন্ন বিষয়বস্তু ও রচনাশৈলীতে প্রকাশ পেয়েছে। মক্কাতে মুসলমানরা সংখ্যালঘু ছিল। তাই মক্কী যুগের আয়াতগুলোতে অনৈসলামিক পরিবেশে বসবাসকারী মুসলমানদের জন্য বিশেষভাবে অর্থপূর্ণ বিবেচিত হতে

www.pathagar.com

পারে। অন্যদিকে মাদানি আয়াতগুলো ইসলামি রাষ্ট্রের সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের কাছে গ্রহণীয় হতে পারে। আর মক্কী সুরাগুলো সংক্ষিপ্ত তবে ছন্দময় এবং এতে ইসলাম গ্রহণের জন্য গভীর আবেগ-আপ্লুত ভাষায় মুশরিক আরবদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। অন্যদিকে মাদানি সুরাগুলো বিস্তারিত ও এতে এক ধরনের প্রশান্ত ভাব অভিব্যক্ত হয়েছে যাতে কুরআন ভিন্ন ধাঁচের ওহি অবতীর্ণের প্রকাশ পেয়েছে।[১৪]

কুরআনের মক্কী ও মাদানি অংশের মধ্যকার পার্থক্যের বিষয়টি প্রধানত সাহাবিগণ ও তৎপরবর্তী যুগে 'তাবেয়ীগণের' দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। রসুল সা. নিজে এ বিষয়ে কোনো কিছু বলেননি। কুরআনের কোনো মূল প্রতিপাদ্যের মতো অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যপ্রমাণও এ পার্থক্য নিরূপণে বেশ সহজ হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যুদ্ধ সংক্রান্ত আয়াত কেবল হিজরতের পর নাজিল হয়। তবে মক্কায় অবতীর্ণ ১১১ নম্বর সুরায় আবু লাহাবের কথা এবং (সুরা আলে ইমরানে ৩ : ১২৩) বদর যুদ্ধের প্রসঙ্গ উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে দুই অংশের সুরায় সম্বোধনের ক্ষেত্রে প্রায় পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মদিনায় অবতীর্ণ সুরায় প্রায়ই 'হে ইমানদারগণ' ও 'হে কিতাবের অনুসারীগণ' সম্বোধন করতে অন্যদিকে মক্কী সুরায় 'হে মনুষেরা' ও 'হে মানবজাতি' বলে সম্বোধন করতে দেখা যায়। কুরআনের ১৯টি সুরা অর্থপূর্ণ একাধিক বর্ণ (আল মুকাত্তাআত) দিয়ে শুরু হয়েছে, যার দু'টি ব্যতিরেকে সব ক'টি মক্কী। ওই দু'টি সুরা হলো, আল বাকারা ও আল ইমরান। মুনাফিকদের প্রসঙ্গ মাদানি সুরাতেই দেখা যায়। অন্যদিকে সিজদা করার কথা যেসব সুরায় এসেছে সেগুলোর সবই মক্কী। মক্কী ও মাদানি সুরাগুলোর পার্থক্য হচ্ছে কুরআনের সুপ্রতিষ্ঠিত বৈশিষ্ট্য, প্রতিটি সুরার শিরোনামের পাশেই তা লিপিবদ্ধ থাকে এবং কুরআনের অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য এ ধরনের পার্থক্যের সর্বোত্তম সাক্ষ্য হয়ে রয়েছে।[১৫]

কুরআনের মক্কী ও মাদানি সুরাগুলোর বিষয়বস্তুর পার্থক্য নিরূপণের জন্য আলেমগণ তিনটি ভিন্ন ধরনের মানদণ্ড প্রয়োগ করেন : (১) নাজিলের সময়, এর অর্থ হলো, কুরআনের ওই অংশটুকু রসুল সা.-এর হিজরতের আগে নাজিল হলে তা মক্কী শ্রেণিভুক্ত হবে। আর হিজরতের পরে নাজিল হলে তা মাদানি শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে, অবশ্য সেগুলো কোথায় নাজিল হয়েছিল সে বিষয়টি এখানে ধর্তব্যের মধ্যে পড়বে না। এ অর্থে মক্কা বিজয় (আম আল ফাতহ) অথবা বিদায় হজের (হাজা আল বিদআ) পর যেসব আয়াত প্রকৃত পক্ষে মক্কাতে নাজিল হয়েছিল তা মাদানি হিসেবে ধরা হয়েছে। আলোচ্য তিনটি মানদণ্ডের মধ্যে এটিকে সবচেয়ে পছন্দনীয় বলে বিবেচনা করা হয়েছে। (২) নাজিলের স্থান, এর অর্থ হলো, রসুল

www.pathagar.com

সা.-এর মক্কা অথবা এর আশপাশের এলাকায় অবস্থান করার সময় যেসব আয়াত নাজিল হয়েছিল তা মক্কী শ্রেণিভুক্ত হবে এবং মদিনা অথবা এর আশপাশের এলাকায় আয়াতসমূহ মাদানি শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে। এ মানদণ্ড অসম্পূর্ণ কারণ রসুল সা.-এর জেরুসালেম ও তাবুকের মধ্যে বিভিন্ন স্থান সফরকালে অবতীর্ণ আয়াত এ শ্রেণি বিভাগের আওতায় পড়বে না। (৩) শ্রোতাদের প্রকৃতি, এর অর্থ হলো, কুরআনের যেসব অংশে মক্কার লোকদের সম্বোধন করা হয়েছে সেগুলো মক্কী আর যে অংশে মদিনার লোকদের সম্বোধন করা হয়েছে সেগুলো মাদানি শ্রেণিভুক্ত হবে। এ আলোকে যেসব আয়াতে 'হে মানবজাতি' বা 'হে মানুষেরা' বলে সম্বোধন করা হয়েছে তা মক্কী এবং যেসব আয়াতে 'হে বিশ্বাসীগণ' বলে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সম্বোধন করা হয়েছে সেগুলো মাদানি।[১৬]

এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কুরআনের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ আইন বা বিধিবিধান সংক্রান্ত। তাই কুরআন কোনো আইনগত বা সাংবিধানিক দলিল নয়। খোদ কুরআন নিজেকে আইনগত বিধিবিধান নয়, হুদা বা পথ প্রদর্শক বলে অভিহিত করেছে। কুরআনের ৬,২০০টিরও বেশি আয়াতের মধ্যে এক– দশমাংশেরও কম আয়াত আইন ও বিচার সংক্রান্ত। অবশিষ্ট বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ইমান, নৈতিকতা, দীনের পঞ্চ স্তম্ভ ও অন্যান্য নৈতিক বিষয়। এর আইন সংক্রান্ত বিষয়গুলো অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার সম্পর্কিত ধ্যানধারণাগুলো সার্বিকভাবে এর ধর্মীয় কর্তব্য পালনে সহায়ক।

কুরআনের বিধিবিধান বা ব্যবহারিক বিষয়গুলো (আল আহকাম আল 'আমালিয়া) ফিকহ আল কুরআন বা কুরআনের বিধিবিধান ব্যবস্থার ভিত্তি গঠন করেছে। কুরআনে প্রায় ৩৫০টি আইনগত আয়াত রয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার পর তা মোকাবেলা করার জন্য নাজিল করা হয়েছিল। যেমন– শিশু হত্যা, সুদি কারবার, জুয়া খেলা ও সীমা ছাড়া বহু বিবাহের মতো আপত্তিকর প্রথা বাতিলের জন্য এর কয়েকটি নাজিল হয়। অন্যগুলো কুরআন প্রবর্তিত সংস্কার বাস্তবায়নে বাধ্য করতে শাস্তি হিসেবে নাজিল হয়। তবে সার্বিকভাবে কুরআন আরব সমাজের বিরাজমান রীতি-প্রথা ও প্রতিষ্ঠানকে সমর্থন ও সমুন্নত করে কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে পরিবর্তন জরুরি হয়ে পড়েছিল সেসব ক্ষেত্রে পরিবর্তন করা হয়েছিল।[১৭] কুরআনের প্রায় ১৪০টি আয়াত নামাজ, জাকাত, রোজা (সিয়াম), হজ্জ, জিহাদ, দান-সদকা, শপথ গ্রহণ ও তওবার (কাফফারা) মতো বিষয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। অপরদিকে সত্তরটি আয়াতে বিবাহ, তালাক, অপেক্ষার সময়-ইদ্দতকাল, বাতিলকরণ (রিজআ), দেনমহর, রক্ষণাবেক্ষণ, শিশুদের তত্ত্বাবধান, শিশুদের লালনপালন, পিতৃত্ব এবং উত্তরাধিকার ও উইলের বিষয় দেখতে পাওয়া যায়। বেচাকেনা, ইজারাদান, ঋণপ্রদান, বন্ধকদানের মতো বাণিজ্যিক লেনদেন

www.pathagar.com

(মুআমালাত) সম্পর্কিত আরো সত্তরটি আয়াত রয়েছে। ত্রিশটি আয়াতে হত্যা, মহাসড়কে ডাকাতি (হিরাবা), জিনা ও মিথ্যা অপবাদ দানের (কাযব) মতো অপরাধ ও শাস্তির কথা বলা হয়েছে। অপর ত্রিশটি আয়াতে সুবিচার, সমতা, সাক্ষ্যদান, আলাপ-আলোচনা এবং বিচারকদের অধিকার ও দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে। ধনী ও গরিবের সম্পর্ক, শ্রমিকের অধিকার ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত আয়াতের সংখ্যা দশ।[১৮] এখানে এ কথা বলা দরকার যে ফকিহ্‌গণ এ পরিসংখ্যানের ব্যাপারে একমত নন। কুরআনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কারোর উপলব্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতার কারণে পরিসংখ্যানের ব্যাপারে এ ধরনের মতপার্থক্য দেখা দিতে পারে।[১৯]

কুরআনের বিধিবিধানের বৈশিষ্ট্য

আমরা ইতঃপূর্বে আল কুরআনের বিধিবিধান বাস্তবায়নের পর্যায়ক্রমিক অবস্থা (তানযিম) এবং এর মক্কী ও মাদানি শ্রেণি বিভাগ ছাড়াও বিশুদ্ধ আরবিতে সমগ্র কুরআন নাজিল হওয়ার বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। বস্তুতপক্ষে কুরআনের আইনে কার্যকারণ বা যুক্তি সম্পর্কে মাত্র কয়েকটি জায়গায় সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা সত্ত্বেও আমি নিম্নের আলোচনায় বিচার প্রণালীকে (তালিল) কুরআনের বিধিবিধানের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত করেছি। তৎসত্ত্বেও কুরআন তার উদ্দেশ্য-লক্ষ্য, কারণ, পুরস্কার ও সুবিচারের বিষয় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছে। কুরআনে কোনো ব্যক্তিকে সত্যপথ ও তার পবিত্র বাণীর দিকে উদ্বুদ্ধ ও সম্মত করতে তার বিবেককে সম্বোধন করা হয়েছে; সেই সাথে আদেশ মেনে চললে যে স্বাভাবিক কল্যাণ পাওয়া যাবে অথবা নিষেধ থেকে দূরে থাকলে যে ক্ষতি থেকে বাঁচা যাবে প্রায়ই তার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। এটি হলো কুরআনের বিধানের একটি বৈশিষ্ট্য যার সাথে বিচার প্রণালীর (তালিল) ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, যা তালিলের ওপর আরো অনুসন্ধান চালানোর জন্য মুজতাহিদকে একটি ভিত্তি প্রদান করেছে। অবশ্য কুরআনের বিধিবিধানের সব বৈশিষ্ট্যকে কাতয়ী ও যন্নীতে বিভক্ত করা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ এবং তা কুরআনের বিধিবিধান অনুসন্ধানের প্রায় সব ক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কিত, এ কারণে আমি এ বিষয়টি নিয়ে সর্বপ্রথম আলোচনা করতে চাই।

১. *সুনির্দিষ্ট (কাতয়ী) ও অনুমানমূলক (যন্নী)*

কুরআনের আয়াতে বর্ণিত কোনো বিধান হয় দ্ব্যর্থহীন বা সুস্পষ্ট অথবা ভাষাগত দিক থেকে তা বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যার জন্য উন্মুক্ত থাকতে পারে। সুনির্দিষ্ট আয়াত হচ্ছে এমন ধরনের আয়াত, যা স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট, এর একটি মাত্র অর্থ থাকে এবং যার অন্য কোনো ব্যাখ্যা বৈধ বলে গ্রহণ করা হয় না। এর একটি উদাহরণ হলো,

www.pathagar.com

মৃত স্ত্রীর সম্পত্তির ওপর স্বামীর অধিকার সংক্রান্ত আয়াত। এতে বলা হয় : 'আর তোমাদের স্ত্রীরা যা কিছু রেখে গেছে তার অর্ধেক তোমরা পাবে-যদি তারা নিঃসন্তান হয়' (সুরা নিসা, ৪ : ১২)। অন্যান্য উদাহরণ হলো, 'জিনাকারী পুরুষ অথবা নারী প্রত্যেককে ১০০টি কোড়া মার (সুরা বাকারা, ২ : ১৯৬), আর যারা পবিত্র চরিত্রের স্ত্রী লোকদের সম্পর্কে মিথ্যা দোষারোপ করবে তারপর চারজন সাক্ষ্য উপস্থিত করতে পারবে না তাদেরকে ৮০টি কোড়া মার (সুরা নূর, ২৪ : ৪)। এ তিনটি বিধানের পরিমাণগত দিক যেমন- অর্ধেক, এক ও আশি স্বপ্রমাণিত তাই এগুলোর ব্যাখ্যার কোনো সুযোগ নেই। নামাজ, রোজা, কেসাসের বিধান, সুনির্দিষ্ট শাস্তি ইত্যাদি দীনের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ে কুরআনের সব বিধিবিধানই কাতয়ী, এগুলোর বৈধতা নিয়ে কেউ বিতর্ক করতে পারে না এবং সবার জন্য এগুলো অনুসরণ বাধ্যতামূলক।

অন্যদিকে কুরআনের অনুমানমূলক আয়াতগুলো ব্যাখ্যা ও ইজতিহাদের জন্য উন্মুক্ত। এর সর্বোত্তম ব্যাখ্যা খোদ কুরআন থেকে গ্রহণ করা যেতে পারে, এ ক্ষেত্রে কুরআনকে সামগ্রিকভাবে বিবেচনায় এনে অন্যত্র অনুরূপ অথবা ভিন্ন প্রেক্ষাপটে এর প্রয়োজনীয় বিশদ বিবরণ থাকলে তা খুঁজে বের করা যেতে পারে। সুন্নাহ্ হচ্ছে আরেকটি উৎস, যা কুরআনের সম্পূরক এবং এর বিধিবিধানের ব্যাখ্যা প্রদান করে। যখন সহিহ্ হাদিস থেকে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তখন তা কুরআনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয় এবং উভয়ে মিলে একটি বাধ্যতামূলক শক্তি লাভ করে। এ ক্রমধারার পরবর্তী পর্যায়ে রয়েছেন সাহাবিগণ (রাদিআল্লাহু আনহুম)। কুরআনের আয়াত, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও রসুল সা.-এর শিক্ষার সাথে তারা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন।[২০]

কুরআনের নিম্নের আয়াতটি যন্নীর একটি উদাহরণ। এতে বলা হয়েছে, 'তোমাদের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছে তোমাদের মা, তোমাদের মেয়ে...,' (সুরা নিসা, ৪ : ২৩)। এ আয়াতে কোনো ব্যক্তির জন্য তার মা ও মেয়েকে বিয়ে করা হারাম করে দেয়া হয়েছে এবং এ ব্যাপারে কোনো মতবৈষম্য নেই। অবশ্য 'বানাতুকুম' (তোমাদের মেয়েরা) শব্দটির আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে, এর বিচারিক অর্থ হলো, কোনো ব্যক্তির মেয়ে সন্তান বিয়ে বা জিনার মাধ্যমে জন্ম নিতে পারে। কিন্তু এখানে 'বানাতুকুম' বলতে বৈধ সন্তান, কেবলমাত্র এ অর্থই বুঝাবে।

এ আয়াতের কোন অর্থটি পড়া উচিত তা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। হানাফীগণ এ দুই অর্থের প্রথমটি গ্রহণ করেছেন এবং কারোর অবৈধ কন্যাসন্তানকে বিয়ে করাকে হারাম বলে রায় দিয়েছেন। অন্যদিকে শাফেয়ীগণ দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করেছেন। তাদের ব্যাখ্যা মতে, কোনো ব্যক্তির জন্য তার অবৈধ মেয়েকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ

www.pathagar.com

নয় কারণ এ আয়াতে কেবলমাত্র বৈধ মেয়েকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এখান থেকেই এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে অবৈধ মেয়ের উত্তরাধিকারিত্বের অধিকার থাকবে না এবং অভিভাবকত্ব ও ভরণপোষণের বিধিবিধান তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।[২১]

অনুরূপভাবে অর্থহীন শপথের সংজ্ঞার ব্যাপারেও আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে, এটি জেনেবুঝে শপথের বিপরীত। (সুরা মায়েদায় ৫ : ৯২) এ সম্পর্কে বলা হয়েছে : 'তোমরা যেসব অর্থহীন শপথ করে থাকো আল্লাহ সে জন্য তোমাদেরকে পাকড়াও করেন না, কিন্তু তোমরা জেনেবুঝে যেসব কসম খাও সে সম্পর্কে তিনি অবশ্যই পাকড়াও করবেন...।' এরপর এ আয়াতে জেনেবুঝে কসম খাওয়ার প্রতিবিধান বা কাফফারার বিষয় বর্ণনা অব্যাহত থাকে। এর কাফফারা হলো, ১০ জন অভাবী ক্ষুধার্থ লোককে খাওয়ানো অথবা একজন দাসকে মুক্ত করে দেয়া কিংবা তিন দিন রোজা রাখা। হানাফী মাজহাবের মতে, অর্থহীন শপথ হলো এমন কিছু যাকে সত্য বলে ধরে নেয়া হয় অথচ তার সত্য হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ থাকে, তবে এ ঘটনায় বৈপরীত্যের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত হলো, এর অর্থ হচ্ছে না জেনেবুঝে শপথ করা, আদতে কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই শুধু মজা করার জন্য এ শপথ করা হয়। জেনেবুঝে শপথের (ইয়ামিন আল মুআক্কাদাহ) সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা কী হবে তা নিয়েও অনুরূপ মতপার্থক্য রয়েছে।[২২] এ ছাড়া তিন দিন রোজা একটানা পালন করতে হবে, না পৃথক তিন দিনে করতে হবে, তা নিয়েও মতভেদ আছে। তাই দেখা যাচ্ছে যে, এ আয়াতে না জেনেবুঝে শপথ করার কাফফারা সংক্রান্ত মৌলিক শর্ত যদিও সুনির্দিষ্ট তথাপি কাফফারার সঠিক কার্যকাল ও তা বাস্তবায়নের ধরন অনুমানমূলক।

কুরআনের যন্নীর আরেকটি উদাহরণ হিসেবে আমরা শব্দ গুচ্ছ 'ইয়ুনফাও মিনাল আর্দ' (পৃথিবী থেকে নির্বাসন দান) এর উল্লেখ করতে পারি (সুরা মায়েদায়, ৫ : ৩৩)। এ বিষয়টি দেখতে পাওয়া যায়। এ শব্দগুচ্ছতে মহাসড়কে ডাকাতির (হিরাবা) শাস্তির কথা বলা হয়েছে অথবা বিকল্প অর্থ হিসেবে অনুরূপ ব্যাখ্যা অনুযায়ী ওই সম্প্রদায় ও তাদের বৈধ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করার কথা বলা হয়েছে। আয়াতের নির্বাসন দানের (নাফি) প্রথম অর্থ হলো যে স্থানে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে সেখান থেকে নির্বাসন দান। বস্তুতপক্ষে এটি হচ্ছে এখানে শব্দগুচ্ছের সঠিক অর্থ এবং আলেমদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এ মতকে মেনে নিয়েছেন। তবে হানাফী ফকিহগণের মতে, এর অর্থ হচ্ছে কারাদণ্ড প্রদান, নির্বাসন দান নয়। হানাফীগণ মনে করেন এ শব্দগুচ্ছের আক্ষরিক ব্যাখ্যা সন্তোষজনক বলে প্রমাণিত হয় না : যদি কেউ এর আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করেন তা হলেও তিনি কাউকে

www.pathagar.com

দণ্ডদান ছাড়া আর কোনো পন্থায় পৃথিবী থেকে নির্বাসিত করবেন? অন্যদিকে নাফি বা নির্বাসন হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড বহির্ভূত একটি শাস্তি। উপরন্তু কোনো অপরাধীকে মুসলিম ভূখণ্ডের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নির্বাসন দেয়া হলে অনিষ্টকর পথরুদ্ধ হবে না কারণ সে পুনরায় অপরাধে লিপ্ত হতে পারবে। হানাফীগণ আরো যুক্তি দেখান যে কোনো মুসলমানকে মুসলিম ভূখণ্ডের বাইরে নির্বাসন দান ইসলামে অনুমোদনযোগ্য নয়। তাই শরিয়াহর দণ্ড বিধানের উদ্দেশ্য অর্জনের আলোকে এ শব্দগুচ্ছের একমাত্র অর্থ হচ্ছে কারাদণ্ড।

সবশেষে বলা যায়, 'ইয়ুনফাও মিনাল আর্দ' শব্দগুচ্ছ সম্বলিত মুহরাবাহর গোটা আয়াত বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যার জন্য উন্মুক্ত। নিম্নে আয়াতটির তরজমা তুলে ধরা হলো :

> 'যারা আল্লাহ্ তায়ালা ও তার রসুল সা.-এর সাথে লড়াই করে ও জমিনে ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি হত্যা বা শূলে চড়ানো অথবা তাদের হাত-পা উল্টা দিক থেকে কেটে ফেলা কিম্বা দেশ থেকে নির্বাসিত করা।'

এ আয়াতে হিরাবাহর পৃথক শাস্তির বিধান সম্পর্কিত শব্দগুচ্ছ সমন্বিত থাকায় সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। প্রধানত আর্টিকেল 'আউ' ব্যবহারের কারণে এমনটি হয়েছে যার অর্থ 'এবং'। তিনটি শব্দের এ শব্দগুচ্ছের মাঝে এর অবস্থানের কারণে. উল্লেখিত অপরাধের তিনটি পৃথক শাস্তির বিধান প্রকাশ পেয়েছে। এ কারণে অপরাধী–মুহারিবের জন্য উল্লেখিত তিনটি শাস্তির ঠিক কোনটি প্রযোজ্য হবে তা নিশ্চিত জানা নেই। অধিকাংশের মত হলো, মুহারিব যদি কারোর ধন-সম্পদ লুট করে এবং তাকে হত্যা করে তাহলে তার মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। তবে সে যদি শুধু ধন-সম্পদ লুট করে তাহলে তার দুই হাত কেটে দিতে হবে। আর সে যদি কোনো ধরনের লুণ্ঠন বা হত্যাকাণ্ড না করে থাকে তাহলে তার শাস্তি হবে নির্বাসন। লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ডের মতো ভয়াবহ অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দান ও শূলে চড়াতে হবে। একটি বিচারিক বিকল্প মত অনুযায়ী প্রতিটি অপরাধের ঘটনায় এ তিনটি শাস্তির যে কোনো একটি অথবা তিনটিকেই সমন্বিতভাবে প্রয়োগ করতে হবে কি না সংশ্লিষ্ট বিচারকই তা নির্ধারণ করবেন।

কুরআনের কোনো নির্দেশে একই সাথে সুনির্দিষ্ট ও অনুমানমূলক অর্থ থাকতে পারে; সে ক্ষেত্রে দু'টি অর্থের প্রতিটি একে অন্যের থেকে স্বতন্ত্রভাবে বিধান জ্ঞাপন করবে। এ নির্দেশের একটি উদাহরণ হলো, নামাজের জন্য অজুর শর্ত। (সুরা মায়েদাহ ৫ : ৬) এ সম্পর্কে বলা হয়েছে : '... এবং তোমাদের মাথা মাসহ কর।' এ আয়াতে অজু করার সময় মাথা মোছা বা মাসহ করার সুনির্দিষ্ট শর্তের বিষয়টি

উল্লিখিত হয়েছে তবে মাথার ঠিক কোন অংশ মুছতে বা মাসহ করতে হবে তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখিত নয়। তাই এটি একটি অনুমানমূলক বিধান। এখানে আমরা দেখতে পাই যে এ নির্দেশের প্রথমটির ব্যাপারে ফকিহ্‌দের মধ্যে সর্বসম্মত মতৈক্য রয়েছে কিন্তু দ্বিতীয় বিষয়টির ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।[২৩]

এমন কিছু কিছু দৃষ্টান্ত রয়েছে যেখানে কুরআনের ব্যাখ্যার ব্যাপারে মতপার্থক্য অনেক বেশি। এর উদাহরণ হিসেবে মুহাম্মদ শালতুত ভিন্ন ভিন্ন সাত বা আটটি অভিমতের কথা উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, এসব অভিমত ধর্মের অঙ্গীভূত এ কথা বলা যাবে না এবং তা আইনগত বাধ্যবাধকতামূলক নয়। এগুলো হলো ইজতিহাদী অভিমত। ইজতিহাদ করার কেবল অনুমোদনই দেয়া হয়নি উপরন্তু একে উৎসাহিত করা হয়েছে। শরিয়ত কোনো ব্যক্তির অনুসন্ধান চালানো ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার পর কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করেনি। এগুলো সঠিক হতে পারে আবার ভুলও হতে পারে। বিভিন্ন ধরনের অভিমতের ফলে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ সমাজের জন্য সবচেয়ে কল্যাণকর বিবেচিত হতে পারে এমন অভিমতকে বাছাই করার সুযোগ পায়। যখন কোনো শাসক কুরআনের কোনো নির্দিষ্ট ব্যাখ্যাকে অনুমোদন করে আইনে পরিণত করেন তখন তা একমাত্র অনুমোদিত সংস্করণ হিসেবে পালন করা সমাজের সবার জন্য বাধ্যতামূলক বিষয়ে পরিণত হয়।[২৪]

আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে কুরআনের (ও সুন্নাহ্) সুস্পষ্ট (খাস) বিষয় সুনির্দিষ্ট বলে বিবেচিত হবে, তবে সাধারণ ('আম) বিষয় সুনির্দিষ্ট না অনুমানমূলক সে ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। হানাফীগণ মনে করেন যে 'আম' সুনির্দিষ্ট ও বাধ্যতামূলক। কিন্তু মালেকী, শাফেয়ী এবং হাম্বলী মতালম্বীরা বলেন- 'আম' নিজেই অনুমানভিত্তিক এবং তা যাচাই বাছাইয়ের জন্য উন্মুক্ত। এখানে 'আম ও খাস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই কারণ পরে আমরা অন্যত্র এ বিষয়ে আলোচনা করব। 'আম ও খাস কিভাবে কাতয়ী ও যন্নীর সাথে সম্পর্কিত হতে পারে, এখানে সে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হবে।

আমরা প্রথমে কুরআনের বিধান উল্লেখ করার মাধ্যমে 'আম' এর বিষয় তুলে ধরতে চাই, যাতে বলা হয়েছে : 'তোমাদের ওপর হারাম করে দেয়া হয়েছে তোমাদের মা, তোমাদের মেয়ে, ভগ্নি, ফুফু, খালা...' (সুরা নিসা, ৪ : ২৩)। এ হলো মা, মেয়ে, বোন ইত্যাদি সম্পর্কে সাধারণ বিধান, এগুলোর সবই আম-এর অন্তর্ভুক্ত কারণ এ ক্ষেত্রে 'মা' বলতে কেবল প্রকৃত মাকেই বুঝাচ্ছে না, উপরন্তু সৎ মা, এমনকি নারীও বুঝাচ্ছে। অনুরূপভাবে 'মেয়ে'র মধ্যে প্রকৃত মেয়ে, সৎ মেয়ে, নাতনী, এমনকি অবৈধ মেয়েও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। হানাফীগণের মতে, ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করা

www.pathagar.com

সত্ত্বেও এসব বিষয় কাতয়ীর অন্তর্ভুক্ত। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে, এগুলো যন্নী। যখন কুরআনের কোনো যন্নী খোদ কুরআন অথবা সুন্নাহ্‌র দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয় তখন তা কাতয়ীতে পরিণত হয়। সে ক্ষেত্রে এ ব্যাখ্যা মূল বিধানের অবিচ্ছিন্ন অংশে পরিণত হয়। বিয়ে হারাম হওয়ার নির্দেশের বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহ্ উভয় কিতাবে অনেক সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে, যা দিয়ে এ বিষয়ে কুরআনের 'আম'কে সুস্পষ্ট বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা যায়। অনুরূপভাবে কুরআন অথবা সুন্নাহ্ কুরআনের কোনো সাধারণ বিধানকে সুস্পষ্ট করলে তা এতটা সুস্পষ্ট হয় যে তা কাতয়ীতে রূপান্তরিত হয়।

সুস্পষ্ট যন্নী বুঝায় 'আম'-এর এমন একটি উদাহরণ দিতে আমরা কুরআনের এ ঘোষণা উল্লেখ করতে চাই : 'আল্লাহ্ ব্যবসায় হালাল করেছেন আর সুদকে হারাম করেছেন...' (সুরা বাকারা ২ : ২৭৫)। এটি ব্যবসায়ে বা বেচাকেনার ব্যাপারে একটি সাধারণ বিধান। এতে যে কোনো বেচাকেনাকে বৈধ বলা হয়েছে। কিন্তু সুন্নাহ্‌তে কতিপয় দ্রব্য বিক্রি করাকে সুনির্দিষ্টভাবে হারাম করা হয়েছে। এর ফলে এ আয়াতের 'আমকে সুন্নাহ্'র দ্বারা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে যাতে গাছের অপরিপক্ব ফলের মতো কতিপয় দ্রব্য বিক্রি করার বিষয় এ আয়াতের আওতা বহির্ভূত করা হয়েছে। আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে খুবই সীমিত বা ক্ষুদ্র অর্থেও 'আম' সুনির্দিষ্ট করা হলে ওই অংশ এরপরও অনির্দিষ্টই থাকবে এবং যন্নীর পর্যায়ে নামিয়ে আনা হবে আর সেভাবেই ব্যবহৃত হবে।

ব্যাপকার্থে খাস হচ্ছে সুনির্দিষ্ট বা চূড়ান্ত। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে কুরআনে (আন নূর ২৪ : ৪) মিথ্যা অপবাদ দানের জন্য (কাজফকে) ৮০ ঘা বেত্রদণ্ডের আদেশ দেয়া হয়েছে। এ দণ্ডের পরিমাণগত দিকটি সুনির্দিষ্ট (খাস) এবং কোন অনুমানের ভিত্তিতে তা সংশয়াপন্ন নয়। কিন্তু এরপর আমরা এই আয়াতে (আন নূর ২৪ : ৪) দেখতে পাই যে, মিথ্যা অভিযোগকারীর (কাজিফ) জন্য অতিরিক্ত শাস্তির বিধান করা হয়েছে : '...তাদের সাক্ষ্য কবুল কর না, তারা নিজেরাই ফাসেক, সেই লোকেরা নয় যারা এরপর তাওবা করে সংশোধন করে নেয়।' এ আয়াতে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে 'কাজিফ' সাক্ষ্য দেয়ার অযোগ্য। কিন্তু এ আয়াতের পরবর্তী অংশে সন্দেহের উপাদান সংযোজন করা হয়েছে। এতে এর সুনির্দিষ্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা আরোপের প্রবণতা দেখা যায়। মিথ্যা অপবাদ দানকারী ও ফাসিককে মূল ও অতিরিক্ত শাস্তি বিধানের পর তাওবা করলে কাজিফ সাক্ষ্য দেয়ার যোগ্য হতে পারবে কি না সেটা প্রশ্ন সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আলোচ্য আয়াতে কী এ কথা বুঝানো হয়েছে, এতে প্রদত্ত সুবিধা কেবলমাত্র ফাসেকরা পাবে, মিথ্যা অপবাদদাতারা কোনোক্রমেই তা পাবে না? উত্তর যদি হ্যাঁ হয় তাহলে দেখা

www.pathagar.com

যাবে যে কাজিফ একবার যদি অপরাধের জন্য দণ্ডিত হয় তাহলে যতই তাওবা করুক না কেন সে পুনরায় মর্যাদাবান সাক্ষী হতে পারবে না। আয়াতের একটি অংশের অর্থে এ অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে, একটিমাত্র সর্বনাম-আল্লাজীনা' (অর্থ, তারা), এতে আয়াতের সম্পূর্ণ বা কোন অংশের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে তা জানা যায়নি। হানাফীগণ কাজিফকে স্থায়ীভাবে সাক্ষীর অযোগ্য বলে বিবেচনা করেছেন। অন্যদিকে শাফেয়ীগণ তওবা করার পর তাকে সাক্ষী হিসেবে মেনে নিয়েছেন। এ উদাহরণ থেকে যে বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে তা হলো, কোন আয়াত কাতয়ী না যন্নী তা সব সময় স্বপ্রমাণিত নয়, কারণ তাও ব্যাখ্যার জন্য উন্মুক্ত হতে পারে। তবে এ উদাহরণ দেয়ার মূল বিষয় হচ্ছে এটি দেখানো যে, যদিও খাস কাতয়ী তারপরও তাতে কোনোভাবে যন্নীর একটি বিষয় থাকতে পারে যা সার্বিকভাবে তার সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যকে ক্ষুণ্ন করতে পারে।

যেহেতু খাস নীতিগতভাবে কাতয়ী তাই অনুমানমূলক ব্যাখ্যার জন্য তা উন্মুক্ত নয়। তবে এ সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম থাকতে পারে। উদাহরণ হিসেবে না বুঝে কসম খাওয়ার কাফফারা সম্পর্কিত কুরআনের বিধান (সুরা মায়েদা, ৫ : ৮৯) তিন ধরনের। এর একটি হলো, দশজন গরিব লোককে খাওয়ানো। এটি একটি সুনির্দিষ্ট বিধান যার অর্থ হলো, দশজন গরিব লোক। এমনটি হওয়া সত্ত্বেও হানাফীগণ এ আয়াতের একটি বিকল্প ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, তা হলো, দশজন লোকের পরিবর্তে একজন গরিব লোককে দশবার খাওয়ানো যেতে পারে। অবশ্য আলেমদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হানাফীদের এ মতের সাথে একমত নন। যাই হোক, এ কথা বুঝানোর জন্য এ উদাহরণ দেয়া হয়েছে যে কেবল 'আম'এর ক্ষেত্রেই ইজতিহাদ সব সময় সীমাবদ্ধ থাকে না, এমনকি যেসব খাস ও সুনির্দিষ্ট বিধিবিধান অনুমানমূলক কারণের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে সেগুলোর ব্যাখ্যার প্রয়োজন হতে পারে।

উপরন্তু কুরআনের খাস সাধারণভাবে কোন আদেশ বা নিষেধ আকারে বর্ণিত হয়েছে, তা হয় কাতয়ী অথবা যন্নী। নিম্নে পৃথক অধ্যায়ে এ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কোনো আদেশ বা নিষেধের যন্নী দলিলকে নির্দ্বিধায় শনাক্ত করা যাবে কারণ কুরআনের আদেশ হয় ওয়াজিব অথবা মানদুব হবে, এমনকি তা নিছক মুবাহও হতে পারে। অনুরূপভাবে কুরআনের কোনো নিষেধ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ (তহরিম) অথবা অত্যন্ত ঘৃণ্য (কারাহা) হবে তা সব সময় নিশ্চিত নয়।

এ ছাড়া খাসকে নিরঙ্কুশ (মুতলাক) ও যোগ্যতাসম্পন্ন (মুকাইয়াদ) উপশ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। অন্তত দুইভাবে এ বিভক্তি কাতয়ী ও যন্নী বিভক্তির সাথে সম্পর্কিত থাকতে পারে। প্রথমত অনেকটা 'আম' এর মতো সুনির্দিষ্ট ব্যবহারের

www.pathagar.com

আলোকে মুতলাক ধারণামূলক, দ্বিতীয়ত যেসব কারণে মুতলাকের যোগ্যতা, যেসব কারণে তা যোগ্যতাসম্পন্ন হয় এবং যোগ্যতাসম্পন্ন ও যোগ্যতা বিভূষণকারীর মধ্যকার সম্পর্কের প্রকৃতি সব সময় নির্দিষ্ট জ্ঞানের বিষয় হয়, তা নয়। কুরআনের মুতলাক অনেক সময় ধারণামূলক কারণের ভিত্তিতে সাবিত হয়ে থাকে। এ কারণেই ফকিহ্গণ মুতলাক সাবিত হওয়ার বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাপারে একমত হতে পারেননি। নিম্নে পৃথক অধ্যায়ে মুতলাক ও মুকাইয়াদ এবং এর বিভিন্ন দিকের ব্যাপারে ফকিহ্গণের মতপার্থক্যের বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে একটি উদাহরণ দিতে চাই, কুরআনে সাক্ষ্যদান সম্পর্কে দুইটি পৃথক বিধান রয়েছে। মান অনুযায়ী এর একটি হলো মুতলাক আর অপরটি হলো মুকাইয়াদ। এর প্রথমটি প্রাথমিক লেনদেন সম্পর্কিত 'তোমরা যখন কেনাবেচা চুক্তি সম্পাদন করবে তখন সাক্ষী রেখে দেবে, 'ওয়া শাহিদু ইযা তাবাইয়াতুম' (সুরা বাকারা, ২ : ২৮২)। এ আয়াতে উল্লিখিত সাক্ষী যে কেউ হতে পারে, এ জন্য কোনোভাবে যোগ্যতা অর্জন করতে হয়নি। কিন্তু অন্যত্র তালাক (রিজাহ্) প্রত্যাহার সংক্রান্ত বিষয়ে যে উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় তাতে 'দুইজন সুবিচারকারী সাক্ষীকে আনার নির্দেশ দেয়া হয়েছে' (সুরা তালাক, ৬৫ : ২)। আলেমগণ এ দুইটি আয়াতকে পরস্পরের সাথে সার্বিকভাবে সম্পর্কিত করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে দ্বিতীয় আয়াতে সাক্ষীর যোগ্য হওয়া যে শর্ত দেয়া হয়েছে তা প্রথম আয়াতের ক্ষেত্রেও অবশ্যই প্রযোজ্য হবে, এ অর্থ হচ্ছে, লেনদেন বা তালাক প্রত্যাহার উভয় ক্ষেত্রেই সাক্ষীকে অবশ্যই যোগ্য হতে হবে। এটি একটি মীমাংসিত আইন। কাতয়ী ও যন্নী বিষয়ে আলোচনায় আমরা একে সম্পর্কিত করেছি। এ কথা বলা যায় যে প্রথম আয়াতের সুনির্দিষ্ট পরিমাণ নিরূপণে ধারণামূলক দিকটি উন্মুক্ত হয়েছে। সাক্ষীদের জন্য শর্তাবলি কেবল কেনাবেচা বা ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে? বস্তুতপক্ষে কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও এ বিষয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা উপযুক্ত নাও মনে হতে পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমগণ ফিকহর বিধিবিধান প্রণয়ন করেন। তবে এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হলেন জাহেরিগণ; তারা মনে করেন যে কেনাবেচা বা তালাক প্রত্যাহার ঘটনায় সাক্ষীর কোনো প্রয়োজন নেই। আলেমগণ অবশ্য কুরআনের ভেতরে ও বাইরে উভয় ক্ষেত্রে এর সমর্থনের পক্ষে অনেক যুক্তি দেখতে পেয়েছেন। তবে আমরা এ পর্যন্ত এ বিষয়ে যে আলোচনা করেছি তাতে এ কথা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট যে মুতলাক ও মুকাইয়াদ ধারণামূলক যুক্তির প্রতি সংবেদনশীল। পূর্ববর্তী উদাহরণ নিয়ে অবশ্য আরো একটু আলোচনা করলে দেখা যাবে যে দুইটির আয়াত পাশাপাশি অবস্থান এবং একটির দ্বারা অপরটি যোগ্যতাসম্পন্ন হয়েছে বহুলাংশে ধারণামূলক যুক্তির ভিত্তিতে। এরপর দুইটি আয়াতের দ্বিতীয়টির যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়ার শর্ত আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে

www.pathagar.com

যেতে পারে। যে প্রশ্ন করা হবে বরং ইতোমধ্যে করা হয়েছে, তা হলো, 'ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীর সঠিক অর্থ কী?' বিভিন্ন সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে আলাদা যোগ্যতা বা গুণ কী হবে তা নিয়ে মাজহাবের আলেমগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তারা প্রধানত ধারণামূলক ইজতিহাদের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

শব্দের আক্ষরিক (হাকিকি) ও রূপক (মাজাজি) বিভক্তির বিষয়ও কাতয়ী ও যন্নীর সাথে সম্পর্কিত। এখানে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার দরকার নেই। আমরা পরে অন্যস্থানে এ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করব। আক্ষরিক অর্থের ওপর নির্ভর করা সাধারণ নিয়ম এবং আইনগত বিধান কার্যকর করার ক্ষেত্রে এটি নিশ্চয়তার একটি শর্ত। তবে অনেক সময় আক্ষরিক অর্থের পরিবর্তে রূপক অর্থ গ্রহণ প্রয়োজন হতে পারে। এর উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, তালাকের শাব্দিক অর্থ হলো, অব্যাহতি প্রদান করা বা মুক্ত করে দেয়া, তবে এর পরিভাষাগত অর্থে এর একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে, যা তালাকের রূপক অর্থ, সাধারণভাবে এ অর্থই ব্যবহৃত হয়। আলেমগণ বিভিন্ন ধরনের এমন অনেক কারণ দেখতে পেয়েছেন যার ভিত্তিতে হাকিকি ও মাজাজিকে একে অপরের সাথে সম্পর্কিত করা যেতে পারে। মাজাজি বহুলাংশে ধারণামূলক ও অবাস্তব। এমনকি অনেক আলেম মাজাজিকে মিথ্যার সমার্থক বলে মনে করেছেন, এ কারণে কুরআনে এর কোনো স্থান নেই। এখানে এ অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে যে কুরআনের কোনো ব্যবহারিক আদেশের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মাজাজির ওপর নির্ভর করা যাবে না। যাই হোক না কেন, এ থেকে যে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেছে তা হলো, কুরআন ও অন্য কোনো শরয়ী উৎসেরও অর্থ নির্ণয় এবং হাকিকি ও মাজাজি প্রয়োগে ধারণামূলক যুক্তি ব্যবহারের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে।

উপরন্তু আলেমগণ কুরআনের সুস্পষ্ট শব্দ যা 'মানতুক' বলে উল্লেখিত হয়েছে, তা থেকে শরিয়াহর বিধিবিধান গ্রহণ করেছেন। তবে যখন কুরআনের অন্তর্নিহিত অর্থও অনুমান ও যৌক্তিক বিন্যাসের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়, তখন তা অন্তর্নিহিত অর্থ বা 'মাফহুম' বলে উল্লিখিত হয়। এ বিষয়টি নিয়ে আল দালালাত অর্থাৎ আয়াতের নিহিতার্থ শিরোনামে পৃথক অধ্যায়ে পুনরায় আলোচনা করা হয়েছে। এখানে এ বিষয়টি উল্লেখ করার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, শরিয়াহর বিধিবিধানগুলো আয়াতের অন্তর্নিহিত অর্থ থেকে অনুমানের মাধ্যমে গ্রহণের বিষয়টি ধারণামূলক দলিল ও ইজতিহাদের অংশ, এ বিষয়টি তুলে ধরা। স্বাভাবিকভাবে এ পন্থায় সংগৃহীত সব আহকামই যে যন্নী শ্রেণিভুক্ত, তা নয়। আয়াতের অন্তর্নিহিত অর্থ প্রায়ই একই আয়াতের সুস্পষ্ট আদেশের সমশক্তি সম্পন্ন অর্থ প্রকাশ করে থাকে। এ কথা বলার পর উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ভুলবশত হত্যা করার কাফফারা হলো একজন

www.pathagar.com

দাসকে মুক্ত করে দেয়া অথবা ৬০ জন মিসকিনকে খাওয়ানো কিম্বা দুই মাস রোজা পালন করা। আর ইচ্ছাকৃত হত্যার বিষয় বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে, এর কাফফারার উদ্দেশ্য হলো, গুনাহের জন্য ক্ষতিপূরণ দান এবং সব হত্যার ক্ষেত্রেও এ বিষয়টি সঠিক, এটি মূলত ধারণামূলক ইজতিহাদ কিছু নয়। এটি হলো (সুরা নিসার, ৪ : ৯২) আয়াতের অন্তর্নিহিত অর্থ। ভুলভ্রান্তিতে হত্যার ঘটনায় কাফফারার বিষয়টি এখানে সুস্পষ্ট। কিন্তু সুস্পষ্ট শব্দ সমষ্টি থেকে যে স্পষ্টতা প্রকাশ পায় এ আয়াতের অন্তর্নিহিত অর্থ তদরূপ নিশ্চয়তা নির্দেশ করে না। আর এ কারণেই আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত হননি।

কাতয়ী ও যন্নী সংক্রান্ত এ আলোচনায় কুরআন ও সুন্নাহ্‌কে পরস্পরের পরিপূরক ও অবিচ্ছিন্ন অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এর কারণ হলো, কুরআনের ধারণামূলক বিধান সুন্নাহ্‌র মাধ্যমে অকাট্য বিধান সাবিত হয়। অনুরূপভাবে সুন্নাহ্‌র যন্নী বিধান কুরআনের মাধ্যমে কাতয়ীতে সাবিত হয়। কুরআনের কোনো যন্নী বিধান খোদ কুরআন বা সুন্নাহ্‌র সমর্থনমূলক দলিলের সাহায্যে কাতয়ীতে উন্নীত হয়। অনুরূপভাবে সুন্নাহ্‌র যন্নী বিধানও খোদ সুন্নাহ্ অথবা কুরআনের সমর্থনসূচক সাক্ষ্য প্রমাণের সাহায্যে কাতয়ী সাবিত হয়। এরপর চূড়ান্ত ইজমা-বিশেষ করে সাহাবিগণের রা. ইজমার সাহায্যেও কুরআন ও সুন্নাহ্‌র যন্নী বিধান কাতয়ীতে উন্নীত হয়।

উপরের বর্ণনা অনুযায়ী, কুরআনের আয়াত বা সুন্নাহ্‌র কোনো ধারণামূলক নির্দেশনা কুরআন বা সুন্নাহ্‌র যেকোনো একটির সুনির্দিষ্ট দলিল দ্বারা প্রমাণিত বা প্রতিষ্ঠিত হলে সে ক্ষেত্রে তা প্রথম স্থানীয় সুনির্দিষ্ট বিধানের মতো বৈধ বলে গণ্য হবে। এর দৃষ্টান্ত হলো, সব একক হাদিস (আহাদ) যাতে কুরআনের সুদ (রিবা) নিষিদ্ধ করা সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট বিধানের (সুরা বাকারা, ২ : ২৭৫) ব্যাখ্যা রয়েছে। প্রকৃতিগতভাবে সব একক হাদিস ধারণামূলক। কিন্তু এখানে এর বিষয়বস্তু কুরআনের সুনির্দিষ্ট আয়াত দ্বারা সমর্থিত হওয়ায় এর যথার্থতার বিষয়ে সংশয় থাকা সত্ত্বেও তা অকাট্য বলে সাবিত হয়েছে। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী সব একক হাদিসের যথার্থতা ধারণামূলক হওয়ার বিষয়টি উন্মুক্ত থাকা সত্ত্বেও তা কুরআনের দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হলে কতয়ীতে উন্নীত হবে।[২৫] অবশ্য যন্নী যদি কাতয়ী দ্বারা অনুরূপভাবে প্রমাণিত হতে না পারে তা হলে তা বাধ্যতামূলক হবে না যতক্ষণ না তা অন্যান্য দলিল দ্বারা বৈধ বলে সাবিত হবে। এতে নিম্নের দুইটি সম্ভাবনার একটির পথ প্রশস্ত হতে পারে। প্রথমত, 'আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহার একটি বক্তব্য, যাতে তিনি স্বজনেরা কান্নাকাটি করলে মৃতের (রূহের) ওপর আজাব হয় বলে একটি কথিত হাদিস নাকচ করে দিয়েছেন।[২৬] কারণ এখানে যে যুক্তি দেখানো

www.pathagar.com

হয়েছে তা কুরআনের (সূরা আন'আম ৬ : ১৬৪) সুনির্দিষ্ট নির্দেশনার পরিপন্থী, এতে বলা হয়েছে, 'প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু অর্জন করে তার জন্য দায়ী সে নিজেই। কোনো ভার বহনকারী অন্য কারোর বোঝা বহন করে না।' দ্বিতীয়ত, অনুমানমূলক নির্দেশনা এমনও হতে পারে যে কোনোভাবেই তাকে কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণের সাথে সম্পর্কিত করা যাবে না। এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তাদের অনেকে এ বিষয়টি স্থগিত করার পরামর্শ দিয়েছেন আর অন্যরা অনুমোদনযোগ্য বলে ধরে নেয়ার বিধান (ইবাহা) প্রয়োগের পক্ষপাতি, কিন্তু এ ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে বিষয়টি ইজতিহাদের জন্য উন্মুক্ত রাখা।[২৭]

কুরআনের কাতয়ী দীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং কেউ এর বৈধতা প্রত্যাখ্যান বা অস্বীকার করলে সে আপনাআপনি ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে। কিন্তু যন্নীর কোনো একটি বিশেষ ব্যাখ্যা কেউ অস্বীকার করলে তাকে গোনাহগার হতে হবে, তা বুঝায় না। একজন মুজতাহিদের যেমন কোনো বিষয়ে ব্যাখ্যা দেয়ার অধিকার রয়েছে তেমনি কোনো শাসকেরও বিভিন্ন ব্যাখ্যার মধ্য থেকে কোনো একটিকে বাছাই করে বাস্তবায়ন করার অধিকার রয়েছে।[২৮]

২. *সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত (আল ইজমাল ওয়াল তাফসির)*

কুরআনের বিধিবিধানের বৃহত্তর অংশ স্পষ্ট উচ্চারিত এর সাধারণ মূলনীতিমালার সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে; অবশ্য কোনো কোনো স্থানে কুরআনের সুনির্দিষ্ট বিস্তারিত বিবরণ দেখতে পাওয়া যায়। শরিয়াহর মূল উৎস হিসেবে কুরআনে ইসলামি আইনের প্রায় সব প্রধান বিষয়েই সাধারণ দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ইমাম আবু জাহ্‌রাহ এ বিষয়ে মন্তব্য প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে হাজমের মূল্যায়নের সাথে একমত পোষণ করেন। তাতে বলা হয়েছে, ফিকহর প্রতিটি অধ্যায়ে মূল কুরআনে দেখতে পাওয়া যায় এবং পরে সুন্নাহ্‌র সাহায্যে তার ব্যাখ্যা ও বিশদ বিবরণ দেয়া হয়েছে'।[২৯] অনুরূপভাবে অপর এক মূল্যায়নে আল শাতিবী নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন : অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, কোনো সমস্যার সমাধান পেতে যেসব আলেম কুরআনের শরণাপন্ন হয়েছেন তাদের প্রত্যেকে কুরআন থেকে একটি মূলনীতি পেয়েছেন, যা থেকে তারা এ সমস্যা নিরসণের দিকনির্দেশনা পেয়েছেন।[৩০]

কুরআনের এ ঘোষণা, 'আমরা কিতাবের কোনো কিছুকেই অবহেলা করিনি' (সূরা আন'আম, ৬ : ৩৮), প্রায়ই উদ্ধৃত করা হয়। এর অর্থ হলো, রুউস আল আহকাম বা আইন ও ধর্মের সাধারণ নীতিমালা যা কুরআনে পুংখানুপুংখভাবে আলোচিত হয়েছে।[৩১] তাই কুরআন মূলত সাধারণ নীতিমালা সংশ্লিষ্ট; আর এ কারণে এর বিষয়বস্তু বিশদভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন এবং সুন্নাহ্‌র সাহায্যে তা প্রায়ই

www.pathagar.com

করাও হয়, কিন্তু তা পুংখানুপুংখভাবে করা হয় তা নয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, নিম্নের কুরআনের আয়াত শরিয়াহর সব বস্তুগত উৎস যেমন- কুরআন, সুন্নাহ্, ইজমা ও কিয়াসকে কর্তৃত্ব প্রদান করেছে। এ আয়াত বলা হয়েছে : 'হে ইমানদার লোকেরা, আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য কর তার রসুলের আনুগত্য কর, আর আনুগত্য কর তাদের যারা তোমাদের দায়িত্বশীল এবং যদি তোমাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতভেদ দেখা দেয় তাহলে তোমরা বিষয়টি আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের ওপর সোপর্দ কর...' (সুরা নিসা, ৪ : ৫৮)। এ আয়াতে 'আল্লাহ্ তায়ালার আনুগত্য কর' বলতে কুরআনকে এবং 'রসুলের আনুগত্য কর' বলতে সুন্নাহ্কে বুঝানো হয়েছে। আর 'যারা তোমাদের দায়িত্বশীল' বলতে 'আলেমদের মতৈক্য বা ইজমা বুঝানো হয়েছে। আয়াতের শেষ অংশে (এবং যদি তোমাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়) কিয়াসের বৈধতা প্রদান করা হয়েছে। কোনো বিষয়ে বিরোধ দেখা দিলে অনুরূপ ঘটনাবলির আলোকে কিয়াসের মাধ্যমে কুরআন ও সুন্নাহ্র বিধিবিধান সম্প্রসারণের প্রক্রিয়ায় আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল সা.-এর স্মরণাপন্ন হওয়া যায়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে যে কেউ এ কথা বলতে পারেন যে সমগ্র উসুল আল ফিকহ্ হচ্ছে এ একটিমাত্র আয়াতের ব্যাখ্যা বা তাফসির।[৩২] ইমাম সাতিবি আরো বলেছেন : যেখানে কুরআন সুনির্দিষ্টভাবে বিস্তৃত সেখানে এটা সাধারণ নীতিমালার সুন্দর এবং অর্থপূর্ণ উপস্থাপন।[৩৩] বলে কুরআনের বিধিবিধানের অধিকাংশই সাধারণ নীতিমালার দ্বারা গঠিত হয়েছে। অবশ্য কতিপয় বিষয়ে এতে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেখতে পাওয়া যায়। ব্যাপকার্থে বলতে গেলে যেসব বিষয় অপরিবর্তনীয় বলে মনে হয় সেসব বিষয়ে কুরআনের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। আর যেগুলো পরিবর্তনীয় সেসব ব্যাপারে কেবলমাত্র সাধারণ দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংবিধানিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে কুরআনের বিধিবিধান আইনের সাধারণ মূল নীতিমালা ও উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। নাগরিকদের লেনদেন সম্পর্কিত বিষয়ের উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, চুক্তি পূরণ, বিক্রির বৈধতা, সুদ নিষিদ্ধ, অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রহণ না করা, ঋণের দলিল প্রণয়ন ও বিভিন্ন ধরনের কিস্তি পরিশোধের মতো বিষয়গুলো কুরআনের নুসুসের সাধারণ নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত। এভাবে চুক্তি সম্পর্কিত কুরআনের বিধান অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে সীমাবদ্ধ রয়েছে,[৩৪] এবং নাগরিকদের বাণিজ্যিক লেনদেন ও সম্পত্তি সম্পর্কিত বিষয়ে ইমানদার লোকদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে; 'তোমরা নিজেদের পরস্পরের মধ্যে একে অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না, লেনদেন তো পরস্পরের সম্মতির ভিত্তিতে হওয়া আবশ্যক' (সুরা নিসা, ৪ : ২৯)। কুরআনের অন্যস্থানে (সুরা বাকারা, ২ : ২৭৫) বলা হয়েছে, '...আল্লাহ ব্যবসায়কে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।' কুরআনে

www.pathagar.com

বিভিন্ন ধরনের বৈধ ব্যবসায়, অন্যদের সম্পত্তি অবৈধ পন্থায় ভক্ষণ করা এবং বিভিন্ন ধরনের সুদি কারবার সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়নি। সুন্নাহ্‌তে এর কয়েকটি বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিবরণ রয়েছে। অবশিষ্ট যেসব বিষয় রয়েছে বিশেষজ্ঞ, আলেমবর্গ ও প্রত্যেক যুগের মুজতাহিদগণ শরিয়াহ্‌র সাধারণ মূলনীতি এবং জনগণের চাহিদা ও স্বার্থের বিষয় বিবেচনা করে সেগুলোর সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করবেন।[৩৫]

অপরাধ ও শাস্তির ক্ষেত্রে কুরআনে মাত্র পাঁচটি অপরাধের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে। সেগুলো হলো, হত্যা, চুরি, মহাসড়কে ডাকাতি, জিনা ও মিথ্যা অপবাদ দেয়া (অবমাননাকর অভিযোগ)। অন্যান্য অপরাধের বিষয়ে শাস্তি বিধানের দায়িত্ব কুরআন সমাজ ও তার দায়িত্বশীলদের (উলিল আমর) ওপর ন্যস্ত করেছে এবং তারা শরিয়াহ্‌র সাধারণ মূলনীতি ও সমাজের বিরাজমান পরিস্থিতির আলোকে সেগুলো নির্ধারণ করেন। কুরআনের একাধিক স্থানে দণ্ডবিধির ক্ষেত্রে উদারনীতি গ্রহণের কথা বলা হয়েছে, 'মন্দের প্রতিফল সেরকমই মন্দ' (সুরা আশ শুরা ৪২ : ৪০) এবং 'তোমরা যদি প্রতিশোধ গ্রহণ কর তা হলে শুধু ততটুকুই করবে যতটুকু তোমাদের ওপর অত্যাচার করা হয়েছে' (সুরা নাহল ১৬ : ১২৬)।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কুরআনের বিধিবিধান কাফেরদের সাথে যুদ্ধের নিয়মনীতি এবং কোন পরিস্থিতিতে তাদের সম্পত্তি গণিমতের মাল হিসেবে গ্রহণ করা যাবে তার বিবরণ দেয়া হয়েছে। তবে মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যকার সম্পর্কের বিধিবিধান সম্পর্কিত সাধারণ মূলনীতি নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে :

> আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেননি এ কাজ হতে যে তোমরা সেই লোকদের সাথে কল্যাণকর ও সুবিচার আচরণ করবে যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের ঘরবাড়ি থেকে বহিষ্কার করেনি। সুবিচারকারীকে তো আল্লাহ পছন্দ করেন। তিনি তোমাদের যে কাজ হতে বিরত থাকতে বলেছেন তা হচ্ছে : তোমরা বন্ধুত্ব কর না সেই লোকদের সাথে যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তোমাদের বাড়িঘর থেকে বহিষ্কার করেছে এবং তোমাদের বহিষ্কার করার ব্যাপারে পরস্পর সাহায্য-সহযোগিতা করেছে। এ লোকদের সাথে যারাই বন্ধুত্ব করে তারাই জালেম' (সুরা মুমতাহিনা ৬০ : ৮-৯)।

অনুরূপভাবে বিচার ফায়সালা সংক্রান্ত কুরআনের বিধিবিধান সাধারণ দিকনির্দেশনার মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিচারকের কর্তব্য অথবা কিভাবে সাক্ষ্য প্রদান করা হবে, তার ধরন সম্পর্কে কুরআনে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়নি।[৩৬] পরামর্শ, সমতা

www.pathagar.com

ও নাগরিক অধিকারের মতো সরকারের মূলনীতির বিষয়ে কুরআনে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়নি। সাধারণ মূলনীতিতে এগুলো বর্ণিত হয়েছে এবং সমাজের পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির আলোকে সমাজের আলেমগণ ও নেতৃবৃন্দ তার ভিত্তিতে সরকার গঠন ও রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন।[৩৭] কুরআন মুমিনদেরকে কুরআনের আয়াতের শর্তের কথা উল্লেখ করে প্রতিটি বিষয় নিয়ন্ত্রণের চেষ্টার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছে; কারণ এতে কঠোরতা ও দুঃসহ বিধিনিষেধ আরোপের পথ প্রশস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে : 'হে ইমানদার লোকেরা তোমরা নিজেদের কথাই চিন্তা কর, অপর কারোর পথভ্রষ্ট হওয়ায় তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না...' (সুরা মায়েদা ৫ : ১০৪)। এভাবে কুরআন একটি অতি নিয়ন্ত্রিত সমাজ গঠনকে নিরুৎসাহিত করেছে। অপরদিকে কুরআন অনিয়ন্ত্রিত সমাজ বলতে যা বুঝিয়েছে তা হলো আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ লক্ষ্য উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি সুপরিকল্পিত সমাজ, যা পারস্পরিক পরামর্শ ও ইজতিহাদের মাধ্যমে বিকশিত হবে। গভীর মনোনিবেশ সহকারে কুরআন অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে যে ইমান বা বিশ্বাস, নৈতিক মৌলিক নীতিমালা, আল্লাহ তায়ালার সাথে মানুষের সম্পর্ক এবং 'গায়েবিয়াত' বা অলৌকিক বিষয় সম্পর্কিত কুরআনের বক্তব্য বৈশিষ্ট্যগতভাবে অপরিবর্তনীয়। এসব বিষয়ে কুরআনের বক্তব্য সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত। কারণ ইমানের শর্ত হিসাবে এর সুস্পষ্টতা ও সুনিশ্চয়তা বিধান করা জরুরি। অন্যদিকে নামাজ, রোজা, হজ ইত্যাদি ইবাদত-বন্দেগি সংক্রান্ত বিষয়ে কুরআনের নির্দেশনাও অপরিবর্তনীয়, যদিও তা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং এর অধিকংকেরণ প্রয়োজনীয় বিস্তারিত বিবরণ সুন্নাহ্তে পাওয়া যায়। এর ব্যাখ্যায় বলা যায় যে ইবাদত-বন্দেগি হচ্ছে কর্মমূলক বা 'আমলি' প্রকৃতির এবং এর সুস্পষ্ট শিক্ষা প্রয়োজন। আর তা বাস্তব কাজ ও নমুনার মাধ্যমে প্রদানই হলো সর্বোত্তম উপায়। এর উদাহরণ হলো, নামাজ আদায়, জাকাত প্রদান ও হজ পালন সম্পর্কে কুরআনে মুমিনদের শুধু এ আদেশ দেয়া হয়েছে, ' নামাজ আদায় কর ও জাকাত প্রদান কর' এবং বলা হয়েছে, 'এ ঘরে হজ পালন করাকে আল্লাহ মানবজাতির জন্য বাধ্যতামূলক কর্তব্য বানিয়ে দিয়েছেন' (সুরা নাহল, ১৬ : ৪৪ ও সুরা আলে ইমরান, ৩ : ৯৭)। নামাজ প্রসঙ্গে রসুল সা. তার সাহাবিদেরকে রা. নির্দেশ দিয়েছেন :

صلوا كما رايتموني أصلي

'তোমরা আমাকে যেভাবে নামাজ আদায় করতে দেখবে তোমরাও ঠিক সেভাবে নামাজ পড়বে।' এবং হজ প্রসঙ্গেও তিনি অনুরূপভাবে লোকদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন[৩৮] :

www.pathagar.com

خذوا عني مناسككم

> 'কিভাবে হজ্জ পালন করতে হবে আমার কাছ থেকে তোমরা তা শিখে নাও।' মালে নেসাব হওয়া, জাকাতের পরিমাণ ও জাকাত সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ সুন্নাহ্তে দেখতে পাওয়া যায়।

এ ছাড়া কুরআনে কাদের বিয়ে করা যাবে না (মাহররমা, উত্তরাধিকারের বিধান, ইত্যাদি পারিবারিক বিষয় এবং কতিপয় অপরাধের সুনির্দিষ্ট শাস্তির ব্যাপারে বিস্তারিত বিধিবিধান রয়েছে। এগুলোর অধিকাংশই মানব প্রকৃতির সাথে সম্পর্কিত এবং তাদের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে যাতে মানুষের স্বাভাবিক চাহিদা পূরণ হতে পারে। এসব বিষয় সম্পর্কিত আইনের মৌলিক উদ্দেশ্য চিরন্তন। অবশ্য এমন অনেক বিষয় রয়েছে যা নিয়ে বিরোধ দেখা দিতে পারে। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এগুলো নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের মধ্যে সংঘাত রোধ করা। এসব ক্ষেত্রে কুরআনের সুনির্দিষ্ট বিধিবিধানে আরব সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত কয়েকটি রীতিকে বিবেচনায় এনে বাতিল ও বিলুপ্ত করা হয়। এ ধরনের প্রচলিত প্রথার প্রেক্ষাপটে নারীর মর্যাদা সম্পর্কিত কুরআনের সংস্কার ও পরিবারের মধ্যে সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বণ্টনের আইন সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে লোকদের মনে বদ্ধমূল করে দেয়া ছিল কার্যকর করার একমাত্র উপায়।[৩৯]

কুরআনে আইন ও ধর্মীয় বিষয়ে ঘন ঘন সাধারণ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে যা প্রায়ই খোদ কুরআনই সুনির্দিষ্ট বিধানে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তা না হলে সুন্নাহ্ দ্বারা কুরআনের সাধারণ নির্দেশনাকে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং এর সংক্ষিপ্ত ও দৃশ্যত অস্পষ্ট বিধানের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। তুলনামূলকভাবে কুরআনের বৃহৎ অংশ জুড়ে সাধারণ বিধিবিধান বর্ণিত হয়েছে, যা নির্দিষ্ট বিষয়গুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত করে সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। এর আংশিক কারণ হলো, আম (সাধারণ) ও খাস (সুনির্দিষ্ট) বিষয় অধ্যয়নকালে আমরা দেখতে পেয়েছি যে কুরআনের সাধারণ নির্দেশনা থেকে গুরুত্বপূর্ণ আইনগত বিধান সংগ্রহের বিশেষ সুন্নাহ্র তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আমরা এ কথা আগেই উল্লেখ করেছি যে কুরআনের বিধান সংক্ষেপে ও সাধারণ বিষয়ের সাথে বর্ণিত হয়েছে, যা থেকে কুরআন ও সুন্নাহ্র মধ্যকার সম্পর্কের বিষয় প্রকাশ পেয়েছে। যেহেতু কুরআনের সাধারণ, অস্পষ্ট ও কঠিন অংশের বিশদ বিবরণ ও তাখসিস (সুনির্দিষ্টকরণ) প্রয়োজন সেহেতু রসুল সা. তার প্রয়োজনীয় বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে কুরআনের সাধারণ বিধানগুলোর সুনির্দিষ্ট প্রয়োগের বিষয় নির্ধারণ করবেন, এটিই প্রত্যাশা করা হয়েছিল। এসব ও অন্যান্য কারণে কুরআন ও সুন্নাহ্র মধ্যকার অনন্য সম্পর্ক গড়ে

www.pathagar.com

উঠেছে এবং একে অপরের অবিচ্ছেদ্য অংশ ও অপৃথকযোগ্য হয়ে উঠেছে। কুরআনের সাধারণ নির্দেশনা সুনির্দিষ্টকরণ ও মুজমাল সুস্পষ্টকরণের মাধ্যমে শরিয়াহর বিধিবিধান গঠনে সুন্নাহ্ নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কুরআন ও সুন্নাহ্র স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট (খাস) বিধান শরিয়াহর প্রাণকেন্দ্র হিসেবে বিগঠিত হয়েছে এবং এ অর্থে কোনো আইনের সব বা অধিকাংশ যদি সংক্ষিপ্ত ও সাধারণ বিধানের সমন্বয়ে গঠিত হতো তাহলে কোনো আইনকে বাস্তবে আইন বলা যেত না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সুন্নাহ্র সুনির্দিষ্টকরণ ভূমিকা শরিয়তে প্রধান গুরুত্ব বহন করছে। এতদসত্ত্বেও কুরআনের সাধারণ বিধানের একটা নিজস্ব মূল্য রয়েছে। কুরআনের ব্যাপকভিত্তিক দিকনির্দেশনা ও স্থায়ী বৈধতার নির্যাস এতেই নিহিত রয়েছে। এ ছাড়া কুরআনের 'আম' নির্দেশনায় ধারাবাহিকভাবে এর তাফসির ও ব্যাখ্যার চিরকালের জন্য অব্যাহত সুযোগ ও উপকরণ রয়েছে। শত শত বছর ধরে ওলামায়ে কেরাম ও মুফাসসিরগণ তাদের যুগের বাস্তবতা এবং সমাজ জীবন বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ বাণী, শিক্ষা অথবা মূলনীতি কুরআন থেকে সংগ্রহের চেষ্টা করেছেন। কুরআনের অধিকাংশ স্থান জুড়ে বিভিন্ন পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত ব্যাপকভিত্তিক নির্দেশনা থাকায় বস্তুত এটি সম্ভব হয়েছে। এর একটি উদাহরণ হলো, পারস্পারিক পরামর্শ (শূরা)। এ বিষয়ে কুরআনে মাত্র দুইটি আয়াত রয়েছে যার প্রতিটি সাধারণ নির্দেশনা। এর একটিতে রসুল সা.কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে : 'দীন ইসলামের কাজকর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর' (সুরা আলে ইমরান ৩ : ১৫৯)। অপর আয়াতে মুসলমানদের প্রশংসা করে বলা হয়েছে : 'বস্তুতপক্ষে তারা নিজেদের যাবতীয় সামগ্রীর ব্যাপারে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন করে' (সুরা আশ শুরা ৪২ : ৩৮)। বস্তুতপক্ষে উভয় আয়াতের সাধারণ নির্দেশনা ঘোষণার ফলে উম্মাহর সামাজিক-রাজনৈতিক জীবন বিকাশের যে কোনো পর্যায়ের সাথে তাদেরকে সম্পর্কিত করা সম্ভব হয়েছে। কুরআনে শূরার মূলনীতি কিভাবে ব্যাখ্যা করা হবে তার কোনো পদ্ধতি সুনির্দিষ্ট করে দেয়নি। কোন কোন বিষয়ে শূরা বা পরামর্শ করতে হবে, এমনকি কোনো কর্তৃপক্ষের সাথে পরামর্শ করতে হবে সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি। এগুলো নির্ধারণ ও বাছ-বিচারের ক্ষমতা উম্মাহর ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধি ও রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের যথার্থ ক্ষেত্র হিসেবে উম্মাহকে শূরার ব্যাখ্যা ও বাস্তবায়নের পদ্ধতি নির্ধারণের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে।[৪০]

৩. *পাঁচটি মূল্যবোধ (আহকাম)*

কুরআনের বিধিবিধানের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে এ কথা বলা যেতে পারে যে কুরআনের আদেশ-নিষেধ বিভিন্ন ফরম বা আকারে প্রকাশ করা হয়েছে, যা ব্যাখ্যা

www.pathagar.com

ও ইজতিহাদের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। কুরআনের কোনো নির্দিষ্ট নির্দেশ বাধ্যতামূলক করণীয় না নিছক উপদেশ অথবা অনুমোদনযোগ্য কি না তা সব সময় কেবল আয়াতের শব্দ ও বাক্য থেকে নির্ধারণ করা যায় না। আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়োজন নেই কেননা এ বিষয়টি এ গ্রন্থের অন্যত্র পৃথকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে এ কথা বলা যায় যে, বিধিবিধান সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতের ভাষায় বৈচিত্র্য রয়েছে। ব্যাপকার্থে বলা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো কিছু করার নির্দেশ দেন বা প্রশংসা করেন অথবা বিশেষ ধরনের আচার-আচরণের সপক্ষে বলেন অথবা কোনো কিছুর ইতিবাচক গুণের উল্লেখ করেন কিংবা যখন বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা অমক অমক জিনিস ভালোবাসেন অথবা আল্লাহ যখন কোনো কিছুকে তার করুণা লাভ ও পুরস্কারের কারণ বলে শনাক্ত করেন, তখন এ ধরনের সব প্রকাশই উল্লেখিত আচার-আচরণের বৈধতার (মাশরুইয়াহ) নির্ধারক এবং এগুলো বাধ্যতামূলক ও প্রশংসনীয় বিষয়গুলোর অংশে পরিণত হয়। আয়াতের ভাষায় যদি বাধ্যতামূলক (ওয়াজিব) তাগিদ থাকে, যেন কোনো কিছু করার জন্য সুনির্দিষ্ট দাবি বা স্পষ্ট ভাষায় জোর দেয়া বুঝায়, তাহলে এ আচরণের বিষয়টি হয় বাধ্যতামূলক (ওয়াজিব) অথবা প্রশংসনীয় (মানদুব) হবে।

অনুরূপভাবে আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো কিছু করাকে সুস্পষ্টভাবে অনুমোদনযোগ্য (হালাল) বলে ঘোষণা করেন অথবা তা করার অনুমতি (ইজনুন) মঞ্জুর করেন অথবা যখন বলা হয়, এটি করায় কোনো 'দোষ নেই' বা 'পাপ হবে না' অথবা আল্লাহ যখন কোনো কিছু নিষিদ্ধ করতে অস্বীকার করেন, কিংবা আল্লাহ যখন মুমিনদের তাদের কল্যাণে সৃষ্টি করা জিনিস প্রসঙ্গে তার পুরস্কারের কথা স্মরণ করিয়ে দেন,[৪১] এসব কথা উচ্চারণের মধ্য দিয়ে এগুলো অনুমতিযোগ্য (ইবাহা) অথবা গ্রহণ করা বা না করার এখতিয়ার (তাখির) আছে কি না তা প্রকাশ পেয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা যখন নির্দিষ্ট কোনো আচরণ পরিহার করার দাবি জানান বা যখন তিনি কোনো নির্দিষ্ট কাজের নিন্দা করেন অথবা শাস্তির কারণ বলে চিহ্নিত করেন কিম্বা যখন কোনো নির্দিষ্ট আচরণকে অভিসম্পাত করেন এবং তা শয়তানের কাজ বলে গণ্য করেন অথবা যখন কোনো কাজের খারাপ ফলাফলের ওপর জোর দেন বা কোনো কিছুকে নোংরা অথবা বিচ্যুতি (ইসাম, ফিস্ক) বলে ঘোষণা করেন, তখন এ ধরনের প্রকাশকে নিষিদ্ধ কাজ বলে নির্ধারণ করা হয়, যা ঘৃণ্য বা অপছন্দনীয় (কারাহা) কাজের অংশ। যদি এর ভাষা সুস্পষ্ট বা জোরালো হয় তা হলে তা নিষিদ্ধ বুঝাবে এবং উল্লেখিত আচরণ বা কাজ হয় হারাম অথবা তিরস্কারযোগ্য (মাকরুহ) বলে বিবেচিত হবে। আয়াতের ভাষা ও শরিয়াহর সাধারণ উদ্দেশ্য ও মূলনীতিমালা

www.pathagar.com

উভয়ের আলোকে মুজতাহিদগণ এ ধরনের নির্দেশের সঠিক মূল্য কী হবে তা নির্ধারণ করেন।[৪২]

কুরআনে আইনের রচনা শৈলীতে বস্তুতপক্ষে এর বিধিবিধান মূল্যায়নে নমনীয়তার সুযোগ রাখা হয়েছে যাতে কাল নির্বিশেষে এর বৈধতা অক্ষুণ্ন থাকার বিষয় প্রকাশ পেয়েছে। কুরআন তার নির্দেশনার মূল্য কী হবে সে বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করেনি তাই এতে কখনো বাধ্যতামূলক সুপারিশ অথবা নিছক অনুমোদনযোগ্যতা নির্দেশ করার সম্ভাবনার বিষয় উন্মুক্ত থাকে। কুরআনে পাঁচটি আহকাম (আল আহকাম আল খামসা) নামে পরিচিত শ্রেণি নির্দেশ করা হয়নি যা ফকিহ্‌গণ তাদের আইন সংক্রান্ত বিবরণীতে সুনির্দিষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। যখন কোনো কাজকে বাধ্যতামূলক বা অবশ্যকরণীয় বলে মূল্যায়িত করা হয় তখন তাকে ফরজ বা ওয়াজিব হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। অন্য দিকে যে কাজকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বলে গণ্য করা হয় তখন তাকে হারাম বলে আখ্যায়িত করা হয়। এ দুই চূড়ান্ত অবস্থায় যে রূপরেখা প্রকাশ পেয়েছে তা বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে প্রাথমিকভাবে ধর্মীয় এবং এতে একটি মাপকাঠি পাওয়া গেছে, যা যে কোনো ধরনের মানব আচরণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে কেবলমাত্র ওয়াজিব ও হারাম এ চূড়ান্ত মূল্যায়ন আইনগত আদেশ-নিষেধ সংশ্লিষ্ট। অবশিষ্ট বিধিবিধানগুলো প্রধানত আইন বহির্ভূত এবং আইন আদালতে বিচারযোগ্য নয়। এ ভাবে কুরআনের মূল্যায়নে হারামে পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে উন্মুক্ত রাখা হয়েছে তবে তা নিঃশর্ত নয়। অন্যযুগে ফকিহ্‌গণ হয়তো তাকে নিছক তিরস্কারযোগ্য বা মাকরুহ্‌ শ্রেণিভুক্ত বলে গণ্য করে থাকতে পারেন। অনুরূপভাবে উম্মাহ্‌র অভিজ্ঞতা ও অগ্রগতির বিভিন্ন পর্যায়ে তাদের স্বার্থের অনুকূল বিবেচিত হলে কোনো সুপারিশযোগ্য বা মানদুব বিধান ওয়াজিবে উন্নীত হতে পারে।

৪. কুরআনের সংঘটন প্রণালী (তালিল)

তালিলের আক্ষরিক অর্থ হলো, 'সংঘটন' বা 'কারণ অনুসন্ধান' এবং কারণ ও ফলাফলের মধ্যকার যৌক্তিক সম্পর্ক নির্দেশ করা। তবে ইসলামি আইন বিজ্ঞানের আলেমরা তালিলের রূপভেদ ইল্লতকে পৃথক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে থাকেন। আইন সংক্রান্ত ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইল্লত (কার্যকর কারণ) প্রকৃতপক্ষে দুইটি ঘটনার মধ্যকার কার্যকারণ সম্বন্ধ নির্দেশ করে না বরং তা আইনের তুলনা, এর মূল্য ও উদ্দেশ্য বুঝায়। ব্যাপকার্থে বলা যায়, ইল্লত কোনো নির্দেশের যৌক্তিকতা বুঝায়। এ অর্থে তা 'হিকমত' এর সমার্থক, আর তা-ই হলো আইনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। কিন্তু ইল্লত ও হিকমতের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, যা আমি কিয়াস সংক্রান্ত পৃথক অধ্যায়ে

www.pathagar.com

আলোচনা করেছি। আরেকটি আরবি শব্দ 'সাবাব' ও ইল্লতের সমার্থক এবং এ দু'টি শব্দ পাস্পরিক পরিবর্তনীয়ভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আলেমগণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন (ইবাদত) সংক্রান্ত বিষয়ে সাবাবকে ব্যবহার করে থাকেন। আর অন্যান্য ক্ষেত্রে তারা ইল্লত শব্দটি ব্যবহার করেন। তাই এ কথা বলা জায়েজ, রমজানের আগমন হলো রোজার কারণ (সাবাব)। অন্যদিকে উন্মত্ততা হলো মদপান নিষিদ্ধ হওয়ার ইল্লত।[৪৩]

শরিয়াহর মূল উৎস হিসেবে আল কুরআনের কর্তৃত্ব তালিল থেকে স্বতন্ত্র। মুমিন বান্দাগণ কুরআনের বিধিবিধানগুলো অবশ্যই মেনে চলবে এটি ধরে নেওয়া হয়; তা যৌক্তিকভাবে ব্যাখ্যা করা যাক বা না যাক সেটা এখানে কোনো বিবেচনার বিষয় নয়। এ কথা বলার পরও অনেক উদাহরণ দেয়া যায় যাতে কুরআন তার বিধিবিধান মেনে চললে কী কল্যাণ লাভ করা যাবে অথবা তাতে কী উদ্দেশ্য অর্জিত হবে সে কথা উল্লেখ করার মাধ্যমে তার যথার্থতা প্রতিপাদন করা হয়েছে। কুরআন যাতে সহজে বুঝা যায় সে লক্ষ্যে প্রায়ই এ ধরনের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, নারী-পুরুষের মধ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে সাক্ষাৎ হয়ে গেলে সে ক্ষেত্রে মুমিনদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, 'তারা তাদের চোখকে ভিন্নদিকে ফেরাতে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানগুলো হেফাজত করতে' (সুরা নূর, ২৪ : ৩০)। একই আয়াতে এরপর বলা হয়েছে, এ ধরনের কর্মের মাধ্যমে তারা তাদের চরিত্র ও কর্মকাণ্ডে অধিকতর পবিত্রতা অর্জন করে। এ ব্যাপারে (সুরা আল হাশর, ৫৯ : ৭) থেকে আরেকটি উদাহরণ দেয়া যায়। কুরআন অভাবী, ইয়াতিম ও মুসাফিরদের মধ্যে গণিমতের মাল বণ্টনের নিয়ম করে দিয়েছে 'যাতে কেবল ধনীদের মধ্যে সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়ে না থাকে।' প্রথম আয়াতে দৃষ্টি নামিয়ে চলার বিষয়কে যথার্থতা প্রতিপন্ন করা হয়েছে কারণ তা উচ্ছৃঙ্খলতা ও ব্যভিচারের পথে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে। দ্বিতীয় আয়াতের বিধানের যথার্থতা এ কারণে প্রতিপন্ন হয়েছে যে তা কেবল কতিপয় ধনী ব্যক্তির মধ্যে সম্পদ পুঞ্জীভূত থাকা রোধ করে। উপরিউক্ত উদাহরণে আয়াত দু'টিতে নির্দেশনা সংশ্লিষ্ট ইল্লত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আরো অনেক ক্ষেত্রে ফকিহগণ যুক্তি প্রদর্শন ও ইজতিহাদের মাধ্যমে ইল্লত শনাক্ত করেছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় নিম্নের অনেক ঘটনার ইল্লত শনাক্ত করা হয়েছে ধারণামূলক কারণের ওপর ভিত্তি করে এবং আলেমগণ এসব ব্যাপারে একমত হননি: নির্দিষ্ট সময় হওয়া নামাজের কারণ (সাবাব বা ইল্লত), রমজান মাসের আগমন রোজার কারণ, কাবা শরীফে অবস্থান হজ্জের কারণ, সম্পদের মালিক হওয়া জাকাতের কারণ, চুরি হলো হাত কাটার কারণ, সফর হলো নামাজ সংক্ষিপ্ত (কসর) হওয়ার কারণ এবং জেনে বুঝে হত্যার ঘটনা হলো বদলা

www.pathagar.com

বা প্রতিশোধ গ্রহণের কারণ। ইল্লতের এসব ও অনুরূপ অন্যান্য বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদিসের সমর্থনযোগ্য সাক্ষ্য প্রমাণের আলোকে ইল্লত গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু এসবের অনেকগুলোর ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। এসব উদাহরণে ইতোমধ্যে উল্লিখিত ইল্লতের আক্ষরিক/যৌক্তিক অর্থ এবং বিচারিক কাজে ফকিহগণ কর্তৃক তার ব্যবহারের মধ্যে পার্থক্যের বিষয় দেখতে পাওয়া যাবে।[৪৪]

প্রশ্ন হচ্ছে, কুরআনের তালিলের ঘটনা মুজতাহিদকে এর আদেশের পেছনের কারণ ও যুক্তি অনুসন্ধানের সবুজ সংকেত প্রদান করেছে না কি কেবল আয়াতের অর্থ ভালোভাবে অনুধাবন করার জন্য তা অভিব্যক্ত হয়েছে। এ ব্যাপারে আলেমগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তালিলের বিরোধীরা মনে করেন যে সুস্পষ্ট আয়াতে আল্লাহ তায়ালার যে আদেশ প্রকাশিত হয়েছে তার বিপরীত বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা আমাদের কোনো নির্দেশনা প্রদান না করলে সে ক্ষেত্রে তার কারণ জানার কোনো প্রয়োজন আমাদের নেই। এভাবে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশের ব্যাপারে মুজতাহিদদের কৌতূহলী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ কেবল ধৃষ্টতামূলক হবে তাই নয়, উপরন্তু কুরআনের বিধানের কারণ (ইল্লত) ও উদ্দেশ্য (হিকমত) অনুসন্ধান করাকে ধারণামূলক চর্চা ছাড়া আর কিছু বুঝাবে না। এ ছাড়া তালিল বিরোধীরা আরো যুক্তি দেখান যে ইমানদার ব্যক্তিকে খোদার ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে এবং বিনা বাক্য ব্যয়ে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ মেনে চলার মাধ্যমে সর্বোত্তমভাবে তা করা সম্ভব। এ ধরনের আদেশের প্রেরণা, উদ্দেশ্য ও যুক্তি অনুসন্ধান এবং যৌক্তিকতার ভিত্তিতে তা গ্রহণ করা আরো খারাপ, এতে আল্লাহ তায়ালার কাছে নিজেকে সমর্পণে আন্তরিকতার অভাব প্রকাশ পায়। উপরন্তু একজন মুজতাহিদ আল্লাহ তায়ালার নির্দেশের যুক্তি চিহ্নিত করার চেষ্টার মাধ্যমে কেবলমাত্র যুক্তিসঙ্গত অনুমান করতে পারেন যা ভুল হওয়ার সম্ভাবনাকে দূরীভূত করতে পারে না। এমনকি কুরআনের কোনো সুনির্দিষ্ট বিধানের একাধিক কারণ বা ব্যাখ্যা থাকতে পারে, এ ক্ষেত্রে কয়েকটি কারণের মধ্যে কোনটি সঠিক হবে তা একজনের পক্ষে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়। এ হলো, জাহেরিদের মত। অবশ্য সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমগণ মনে করেন যে শরিয়াহর আহকাম কতিপয় উদ্দেশ্য পূরণ করার প্রত্যাশা করে এবং যখন তা চিহ্নিত হয় তখন তা কেবল অনুসরণ করাই অনুমোদনযোগ্য নয়, সেগুলো চিহ্নিত ও বাস্তবায়নের চেষ্টা করাও জরুরি। যেহেতু শরিয়াহর উদ্দেশ্য (মাকাসিদ) বাস্তবায়নে আহকামের কারণ/যুক্তি চিহ্নিত করা জরুরি সেহেতু আল্লাহ তায়ালার বিধানের সাধারণ উদ্দেশ্য অনুসরণের সক্ষমতা অর্জনে এগুলো উদ্ভাবন করা আমাদের কর্তব্যে পরিণত হয়েছে।[৪৫] তাই দেখা যাচ্ছে যে খোদার বিধান-বিশেষ করে কোনো সুনির্দিষ্ট বিধানের একাধিক ইল্লত থাকলে সে ক্ষেত্রে সঠিক ইল্লত

www.pathagar.com

চিহ্নিত করা মুজতাহিদের কর্তব্য। তালিল সম্পর্কে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মত হচ্ছে, কতিপয় সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রবর্তিত শরিয়াহ্র বিধিবিধান বিশ্লেষণ করা এবং আল্লাহ্ তায়ালা শরিয়াহ্র যে বিস্তারিত বিধিবিধান কার্যকর করেছেন তা যে তার মধ্যেই শেষ হয়ে গেছে তা নয়, বরং তা হচ্ছে ওই সব উদ্দেশ্য অর্জনের একটি উপায়। এভাবে কোনো আইন কার্যকর করার আগে ওই আইনের কেবল বাহ্যিক বিষয় নয় উপরন্তু তার যৌক্তিকতা ও উদ্দেশ্য কি তাও খতিয়ে দেখতে হবে। তাই দেখা যাচ্ছে, কোনো ব্যক্তি যখন পার্থিব স্বার্থ হাসিলের জন্য অথবা সামাজিক মর্যাদা লাভের জন্য কালেমা উচ্চারণ করে ইসলাম গ্রহণ করলে আল্লাহ্ তায়ালার কাছে তার ওই ইমানের কোনোই মূল্য নেই। ইসলাম গ্রহণের সত্যিকার উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ্ তায়ালার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করা এবং তার ইবাদত বন্দেগি করা। আর এর ব্যত্যয় হলে আনুষ্ঠানিক ঘোষণার কোনোই মূল্য নেই। অনুরূপভাবে কোনো লোক যদি বলে যে সে লোক দেখানো ও আত্মতুষ্টির জন্য নামাজ পড়ে তা হলে তার এ নামাজের কোনো মূল্য নেই। তাই কোনো আইন বা বিধানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, এর প্রকৃত উদ্দেশ্য ও মূল্যবোধ। তাই কোনো বিধান তার উদ্দেশ্য অনুযায়ী যাতে বাস্তবায়ন করা যায় সেজন্য মুজতাহিদ কর্তৃক তা চিহ্নিত করা জরুরি। কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী বিনা বাক্যে আল্লাহ্ ও তার রসুল সা.-এর আনুগত্য করা প্রয়োজন। তবে একই সাথে এতে আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশের প্রেরণা ও উদ্দেশ্য যাতে মানুষ উপলব্ধি করতে পারেন এতে তার ওপরও জোর দেয়া হয়েছে। কুরআনের বাণী উপলব্ধি করার জন্য অন্ধ অনুকরণের বিপরীতে যৌক্তিক চিন্তাভাবনা ও গবেষণা করার জন্য কুরআনে মানুষের প্রতি বার বার আহ্বান জানানো হয়েছে।[৪৬]

কিয়াস গঠনের ক্ষেত্রে তালিল বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। ইল্লত কিয়াসের একটি অপরিহার্য শর্তই নয় উপরন্তু এর একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যও। শরিয়তে বর্তমান কোনো বিধানকে অনুরূপ অন্যান্য বিষয়ে প্রযোজ্য করতে মুজতাহিদকে অবশ্যই মূল ও নতুন ঘটনার মধ্যে একটি অভিন্ন ইল্লত প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দুইটি সমান ঘটনার ক্ষেত্রে অভিন্ন ইল্লত চিহ্নিত করা ছাড়া কিয়াস গঠন করা সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে আরো বলা যায়, আরেক ধরনের কিয়াস আছে যাকে বলা হয়, কিয়াস মানসুস আল.ইল্লাহ বা এমন কিয়াস যার ইল্লত নস এ নির্দেশ করা হয়েছে যাতে আয়াতের আইনের ইল্লত আগেই শনাক্ত হওয়ার বিষয়টি নির্দেশিত হয়েছে। কোনো ইল্লত এভাবে শনাক্ত থাকলে সে ক্ষেত্রে মুজতাহিদকে যুক্তির বা ইজতিহাদের সাহায্যে নির্দেশের কার্যকর কারণ প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন হবে না। অবশ্য যেসব কিয়াসের ইল্লত নুসুসে ততটা শনাক্ত নয় তাদের সাথে তুলনা করলে দেখা যাবে যে এ ধরনের কিয়াসের পরিসর বেশ সীমিত। তাই এ কথা বলা সঠিক যে শরিয়াহ্র বিধিবিধানের কার্যকর কারণ শনাক্তকরণে অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে কিয়াসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক

www.pathagar.com

হলো তালিল। কিয়াসের ইল্লতের শনাক্তকরণ পদ্ধতি ও তালিলের বিভিন্ন দিক নিয়ন্ত্রণের নিয়মকানুন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এ গ্রন্থের অন্যত্র কিয়াসবিষয়ক ভিন্ন অধ্যায়ে দেখতে পাওয়া যাবে।

তালিলের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতির ব্যাপারে তালিলের বিরোধীদের মধ্যে সংশয় রয়েছে বলে মনে করা হয়। দৃশ্যত তালিলের বিরোধীরা এ বিষয়টিকে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ধৃষ্টতা ও অশিষ্টতার লক্ষণ বলে মনে করেন। বাস্তবে অবশ্য এমনটি মনে করার কোনো প্রয়োজন নেই। কোনো ব্যক্তি কুরআনের খোদায়ী উৎপত্তি ও এর মর্মবাণীর ওপর পুরোপুরি বিশ্বাসী থেকেও তালিলের চেষ্টা করতে পারেন। তালিলের চর্চা করলে যেমন আল্লাহ তায়ালার আদেশের বাধ্যতামূলক ক্ষমতা হ্রাস পায় না, তেমনি এর পবিত্রতাও ক্ষুণ্ন হয় না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, নামাজ আদায় ও জাকাত প্রদানের কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে, তবে আমরা নামাজ ও জাকাতের কারণ উপলব্ধি করতে পারি বা না পারি তৎসত্ত্বেও মুসলমানদের জন্য এ দু'টি বিধান পালন বাধ্যতামূলক বা ফরজ।

৫. কুরআনের অনন্য বৈশিষ্ট্য (ইযাজ)

অন্তত চারটি ক্ষেত্রে কুরআনের অনন্য বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমত, এর ভাষাগত চমৎকারিত্ব। অনেক বিশেষজ্ঞ বলেছেন, বিষয়বস্তু ও রচনা শৈলী উভয় ক্ষেত্রে কুরআনের চমৎকারিত্বের সাথে তুলনা করা যেতে পারে এমন কোনো সাহিত্য কর্ম খুঁজে পাওয়া যাবে না।[৪৭] এটি না গদ্য না পদ্য। এর ছন্দ, রচনা শৈলী ও শব্দ বিন্যাস অতুলনীয়। কুরআন হচ্ছে নবি মুহাম্মদ সা.-এর নবুওতের আধ্যাত্মিক ও অলৌকিক নিদর্শন। তিনি কখনো লেখাপড়া শিখেননি এবং এ ধরনের উচ্চমার্গের ভাষায় গ্রন্থ রচনা করার নিজস্ব সামর্থ্য তার ছিল না। কুরআনকে আল্লাহ তায়ালার বাণী হিসিবে বিশ্বাস করতে যারা অস্বীকার করেছিল এ মহাগ্রন্থের একাধিক স্থানে তাদেরকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে কুরআনের বাণীর সমকক্ষ কোনো কিছু রচনা করার আহ্বান জানানো হয়েছে।[৪৮]

কুরআনের ইযাজের দ্বিতীয় দিকটি হলো, শত শত বছর আগে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনার বিবরণ। অতীতের ঘটনাবলি সম্পর্কে কুরআনের বিবরণের যথার্থতা সাধারণভাবে ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণের সাহায্যে নিশ্চিত বলে প্রমাণিত হয়েছে।[৪৯]

কুরআনের ইযাজের তৃতীয় দিকটি হলো, বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে সঠিক ভবিষ্যৎবাণী। যেমন- বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় (সুরা আনফাল ৮ : ৭), মক্কা বিজয় (আল ফাতহ) এবং সবশেষে, রোমান সাম্রাজ্যের কাছে পারস্য সাম্রাজ্যের পরাজয় : 'রোমানরা নিকটবর্তী ভূখণ্ডে পরাজিত হয়েছে। নিজেদের এ পরাজয়ের পর কয়েক

www.pathagar.com

বছরের মধ্যেই তারা বিজয়ী হবে (ফী বিদয়ী সিনীন, যার শাব্দিক অর্থ হলো, দশ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হবে), (সুরা রূম ৩০ : ২)। রোমানরা পারসিকদের কাছে পরাজিত হলে ৬১৪ সালে পারসিকরা জেরুসালেম দখল করে নেয়। এর সাত বছর পর ৬২২ সালে ইসাসের যুদ্ধে রোমানরা পারসিকদের পরাজিত করে।[৫০]

কুরআনের ইযাজের চতুর্থ দিকটি হলো, মানুষ, পৃথিবী ও নক্ষত্র-গ্রহ-উপগ্রহ সৃষ্টি সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রমাণ পেশ। যেভাবে আমাদের এসব মতবাদ জানানো হয়েছে :

-- 'আমরা মানুষকে মাটির সার হতে বানিয়েছি। পরবর্তী পর্যায়ে তাকে এক বিশেষ স্থানে এক ফোঁটা বীর্যতে স্থিত করেছি। পরে ফোঁটাকে জমাট বাঁধা রক্তে পরিণত করেছি, এরপর জমাট বাঁধা রক্তকে মাংসপিণ্ড বানিয়েছি। একে অস্থিমজ্জা বানিয়েছি, এ অস্থিমজ্জার ওপর গোশ্‌ত বানিয়েছি' (সুরা মু'মিনুন ২৩ : ১২-১৪)।

-- 'জমীন সূর্যের সঙ্গে মিলিত অবস্থায় ছিল, পরে আমরা একে আলাদা আলাদা করে দিয়েছি এবং একে বসতির উপযুক্ত বানিয়েছি' (সুরা আম্বিয়া, ২১ : ৩০)।

-- 'এবং পানি থেকে প্রত্যেক জীবন্ত জিনিসকে সৃষ্টি করেছি' (সুরা আম্বিয়া ২১ : ৩০)।

-- 'এবং প্রথমে মহাবিশ্বে শুধু ধোঁয়া ছিল' (হামিম, ৪১ : ১১)।

-- 'এবং পদার্থসমূহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা দিয়ে গঠিত' (সুরা ইউনুস ১০ : ৬২)।

-- 'ফলোদায়ক বায়ু আমরাই পাঠাই, পরে বৃষ্টি বর্ষণ করি, আর সেই পানি দিয়ে তোমাদের সিক্ত করি, এ সম্পদের খাদ্যই তোমরা খাও' (সুরা হিজর ১৫ : ২২)।

কুরআনে ইযাজের আরো কয়েকটি প্রমাণ দেখতে পাওয়া যায় এর মানবিক, আইনগত ও সাংস্কৃতিক সংস্কারের ঘটনাবলিতে। জাতিগুলোর ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা নজিরবিহীন। এভাবে আইনের দৃষ্টিতে সরকারের পরিমণ্ডলে থাকা শাসক ও প্রজা উভয়ই বিচারের ক্ষেত্রে সমান বলে বিবেচিত হয়।[৫১] নাগরিকদের লেনদেন ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কুরআন সব ধরনের চুক্তির নিয়ম ও সারকথা হিসেবে পারস্পরিক সম্মতিতে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সম্পত্তির ক্ষেত্রে কুরআনের প্রধান সংস্কার হচ্ছে, ইস্তিখলাফ নীতির প্রবর্তন। কুরআন ঘোষণা করেছে, সব সম্পত্তির মালিক হলেন আল্লাহ তায়ালা। আর আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধি হিসেবে মানুষ নিছক

www.pathagar.com

সংরক্ষক এবং সরকারের তদারকিতে সমাজের মানুষের কল্যাণে সে তার মালিকানার অধিকার চর্চা করবে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে চুক্তি, যুদ্ধ পরিচালনা ও যুদ্ধ বন্দীদের সাথে আচরণ ইত্যাদি সব বিষয় সুনির্দিষ্ট নীতিমালার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে যার লক্ষ্য হচ্ছে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও মানব মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন। স্বাধীনতা ও সমমর্যাদার মূলনীতির আলোকে ব্যক্তির মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এবং রাষ্ট্রকে সমভাবে এসব মূলনীতি ও মূল্যবোধ মেনে চলতে ও সংরক্ষণ করতে হবে।[৫২]

৬. *নাজিলের উপলক্ষ (আসবাব আল নুজুল)*

কুরআনের আসবাব আল নুজুল পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও নাজিলের ঘটনাবলির ব্যাখ্যা সম্পর্কিত যাতে এর সুনির্দিষ্ট আয়াত নাজিলের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। আসবাব আল নুজুলের প্রখ্যাত ঘটনাবলি আমরা নির্ভরযোগ্য সাহাবিগণের কাছ থেকে জানতে পেরেছি। এ বিষয়ে বিবরণের নির্ভরযোগ্য হওয়ার শর্ত হলো, বর্ণনাকারী ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট আয়াতের প্রাসঙ্গিক ঘটনা বা নাজিলের সময়ে উপস্থিত থাকতে হবে। সাধারণত হাদিস সহিহ্ হওয়ার জন্য যেসব নিয়মনীতি প্রয়োগ করা হয় এর যথার্থতা প্রতিপন্ন করার ক্ষেত্রেও সেটা করা হয়। এভাবে তাবেয়ীগণের বিবরণকে দুর্বল (জয়িফ) বলে গণ্য করা হয়েছে কারণ তা রসুল সা. ও সাহাবিগণ পর্যন্ত পৌঁছায়নি।[৫৩]

যারা কুরআন সম্পর্কিত সম্যক জ্ঞান লাভ করতে চায় তাদের জন্য আসবাব আল নুজুল সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা জরুরি। এ বিষয়টি ব্যাখ্যার অন্তত দুইটি প্রধান কারণ রয়েছে : প্রথমত, প্রেক্ষাপট ও শ্রোতামণ্ডলীর প্রকৃতি জানা ছাড়া কেবল শব্দ ও ধারণা সম্পর্কে জানলেই জ্ঞানার্জন সাধারণত পরিপূর্ণ হয় না। বাচনভঙ্গিতে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ পেতে পারে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও শ্রোতামণ্ডলীর প্রকৃতির ওপরও এটি নির্ভরশীল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বাক্যের ধরন, যেমন একটি প্রশ্ন থেকে ব্যাখ্যা, বিস্ময় বা তিরস্কারের মতো বিভিন্ন অর্থও প্রকাশ পেতে পারে। অনুরূপভাবে একটি আদেশ কোন পরিস্থিতিতে প্রদান করা হয়েছে ও শ্রোতামণ্ডলীর প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে নিছক অনুমোদন যোগ্যতা, সুপারিশ অথবা হুমকি ইত্যাদি বুঝাতে পারে। প্রাসঙ্গিক অর্থ ও বাক্যের ধারায় অনেক সময় নির্দিষ্ট আয়াতের উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হতে পারে এবং আসবাব আল নুজুলের জ্ঞান ছাড়া এটি অনুধাবন সম্ভব নয়। আসবাব আল নুজুল সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে কোনো নির্দেশের একাংশ এমনকি পুরোটা বাদ পড়ার অথবা ভুলভ্রান্তির পথ প্রশস্ত করতে পারে।[৫৪] দ্বিতীয়ত : আসবাব আল নুজুল সম্পর্কিত অজ্ঞতা অন্যায় মতানৈক্য

www.pathagar.com

এমনকি সংঘাতের পথ পর্যন্ত খোলাসা করতে পারে। কুরআনের এমন অনেক আয়াত রয়েছে প্রকৃতিগতভাবে যার কোনোটির অর্থ স্পষ্ট (জাহির) এবং কোনটি অস্পষ্ট (মুরসাল)। কুরআনের আয়াতের এ ধরনের দৃষ্টান্ত নাজিলের পারিপার্শ্বিক অবস্থা উল্লেখ করার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, 'উমর ইবনে আল খাত্তাব রা. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. আলাপ করছিলেন। এ সময় উমর জিজ্ঞেস করলেন, উম্মাহর মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেবে কেন, তারা তো একই রসুলের অনুসরণ করে এবং কাবামুখী হয়ে নামাজ পড়ে? উত্তরে ইবনে আব্বাস বললেন, 'হে আমীরুল মুমেনীন, কুরআন আমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছে, আমরা তা পাঠ করি এবং কোন পরিস্থিতিতে তা নাজিল হয়েছিল আমরা তা জানি। কিন্তু আমাদের পরে যারা আসবে তারা নাজিলের অবস্থা না জেনেই কুরআন পাঠ করবে আর এভাবে তারা নিজস্ব মত তৈরি করে নেবে। এতে করে তাদের মধ্যে বিরোধ এমনকি রক্তক্ষয়ী সংঘাতেরও সৃষ্টি হতে পারে।'

প্রথমে উমর রা. ইবনে আব্বাস রা.-এর এ কথার সাথে দ্বিমত পোষণ করেন কিন্তু পরে তিনি তার ওই অবস্থান থেকে সরে আসেন। ইবনে আব্বাস কী বললেন তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করার পর উমর ইবনে আব্বাসকে কেবল এ কথা জানিয়ে দেন যে তিনি তার সাথে একমত পোষণ করছেন।[৫৫] এখানে যে বিষয়টি অনুধাবন করা গেছে তা হলো, ইবনে আব্বাস এ মন্তব্যের মাধ্যমে কুরআনের কতিপয় অপব্যাখ্যার কথা উল্লেখ করেন যা আসবাব আল নুজুল সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে সংঘটিত হয়েছিল। বিশেষ করে কুরআনের কতিপয় আয়াত অবিশ্বাসী বা কাফেরদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছিল কিন্তু কতিপয় তাফসিরকারক সেগুলোকে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সবার জন্য প্রযোজ্য বলে গণ্য করেন। এ ছাড়া পবিত্র কুরআনে আরো কতিপয় আয়াত রয়েছে, যা এমন লোকদের আচরণ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল যারা কয়েকটি নির্দিষ্ট বিধিবিধান নাজিলের আগেই মারা গিয়েছিল অথচ কিছুসংখ্যক মুফাসসির এগুলোকে সাধারণভাবে প্রযোজ্য বিধান বলে বিবেচনা করেন।[৫৬]

উপরন্তু আসবাব আল নুজুল তৎকালীন আরব সমাজের অবস্থা সম্পর্কিত তথ্যে পরিপূর্ণ। কুরআনে তাদের রীতিনীতি ও ভাষাগত ব্যবহার এবং ভাব প্রকাশের অর্থের স্বাভাবিক প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। আরব সমাজের রীতিনীতির বৈচিত্র্যময় বৈশিষ্ট্য প্রায় কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যার একটি প্রেক্ষাপট প্রদান করে এবং কোনো কোনো বিষয়ের সংশয় অথবা অস্পষ্টতা নিরসন করে। অন্যথায় এগুলো বুঝা বেশ কঠিন হতো। আরব সমাজে প্রচলিত প্রথা ও সম্পর্কের বিষয়ে কোনো বিধিবিধান কুরআনে থাকলে আসবাব আল নুজুলে তার পূর্ণ অর্থ গ্রহণ করা

www.pathagar.com

হয়েছে। কুরআনের আয়াত থেকে এর একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে : 'হে আমাদের রব, ভুলভ্রান্তিতে আমরা যেসব গোনাহ্ করে বসি, তুমি সেগুলোর জন্য আমাদেরকে পাকড়াও করো না' (আল বাকারা, ২ : ২৮৬)। এতে অবিশ্বাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অবিশ্বাসের অংশ হিসেবে বিবেচিত এসব কথা অসাবধানতা উচ্চারিত হয়েছে। জোর জবরদস্তি ও ভয়ভীতির মধ্যে অবিশ্বাসের কথাগুলো উচ্চারণ করা হয়েছে বলেই তা ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। অবশ্য তালাকের কথা উচ্চারণ, দাস মুক্ত করে দেয়া অথবা বেচাকেনার অনুরূপ ঘোষণার ক্ষেত্রে এ অব্যাহতি দানের বিষয় সম্প্রসারিত করা হয়নি। কারণ দাসমুক্ত করে দেয়া আরব প্রথা ছিল কি না তা জানা যায়নি, তেমনি শপথ গ্রহণ করা নিষিদ্ধ (আইমান) আরব প্রথা ছিল, এ কথাও জানা যায়নি। তাই দেখা যাচ্ছে যে, প্রচলিত আরব প্রথার আলোকে এ আয়াতের সঠিক প্রয়োগের বিষয়টি সমর্থিত হয়েছে।[৫৭]

টিকা

১. খোদ কুরআনের অন্যান্য নামের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় যেমন- কিতাব, হুদা, ফুরকান ও জিকির (এর অর্থ যথাক্রমে বই বা গ্রন্থ, জীবন যাপন পদ্ধতি, পার্থক্য বিধানকারী ও স্মরণ)। যখন কুরআনের সাথে সুনির্দিষ্ট আর্টিকেল আল সংযুক্ত থাকে তখন তা সমগ্র কুরআন বুঝায়, কিন্তু যদি আল সংযুক্ত না থাকে তাহলে তা কুরআনের সমগ্র গ্রন্থ বা তার কোনো অংশ উভয়ই বুঝিয়ে থাকে। তাই কেউ কুরআনের কোনো একটি সুরা বা আয়াত বুঝাতে কুরআন এবং সমগ্র কুরআন বুঝাতে আল কুরআন উল্লেখ করে থাকেন।

২. অনেকে এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে থাকেন। তারা বলেন, কুরআনের সর্বশেষ আয়াত (সুরা বাকারার ২ : ২৮১) : '... যেদিন তোমরা আল্লাহ তায়ালার দিকে ফিরে আসবে সেদিনের অপমান ও বিপদ থেকে বাঁচো, সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার উপার্জিত সৎকর্ম ও অপকর্মের পুরোপুরি প্রতিদান দেয়া হবে এবং কারোর ওপর কোনো জুলুম করা হবে না।'

৩. Hughes, Dictionary, পৃষ্ঠা ৪৮৫; von Denffer, 'উলুম, পৃষ্ঠা ৬৮।

৪. শালতুত, আল ইসলাম, পৃষ্ঠা ৪৯৯-৫০০; কাতাতআন, তাশরী, পৃষ্ঠা ৮৩। বাদরানি, উসুল, পৃষ্ঠা ৭২।

৫. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ২৩; আব্দুর ওহিম, Jurisprudence, পৃষ্ঠা ৬৯; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ৫৯।

৬. কুরআনে অনারব শব্দের একান্ত ব্যবহারের বিষয়ে জানতে দেখুন, আল শাওকানি, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ৭২; আরও দেখুন, আল গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ১, ৬৮।

৭. শালতুত, আল ইসলাম, পৃষ্ঠা ৪৮৬; von Denffer, 'উলুম, পৃষ্ঠা ৭৩।

www.pathagar.com

৮. নূহ ইবনে মরিয়মের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়। তিনি নিশ্চিত করেন যে আবু হানিফা তার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। দেখুন, আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ৬০; শালতুত, আল ইসলাম, পৃষ্ঠা ৪৭৮; সাবুনি, মাদখাল, পৃষ্ঠা ৪।

৯. সাবুনি, মাদখাল, পৃষ্ঠা ৪১-৪২; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ৬১; কাতআন, তাশরি, পৃষ্ঠা ৫৭।

১০. গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ১, ৬৪; আল শাওকানি, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ৩০; শালতুত, আল ইসলাম, পৃষ্ঠা ৪৪০। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের নামে ভিন্ন ধরনের পাঠের অন্য দু'টির উদাহরণের ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য হবে। চুরির শাস্তি ও ইলা নামে পরিচিত এক ধরনের তালাক সম্পর্কিত এ দু'টি উদাহরণ যথাক্রমে (সুরা আল মায়েদা ৫ : ৩৮) ও (সুরা আল বাকারাতে ২ : ২২৬) দেখতে পাওয়া যায়। এগুলো কেবলমাত্র একক হাদিস (আহাদ) দ্বারা সমর্থিত হওয়ায় কুরআনের বিধানের অংশ হয়নি।

১১. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ৬২; আব্দুর ওহিম, Jurisprudence, পৃষ্ঠা ৭১।

১২. প্রকৃতপক্ষে মক্কী যুগ ছিল ১২ বছর পাঁচ মাস ১৩ দিন এবং মাদানী যুগ ছিল ৯ বছর ৭ মাস ৭ দিন।

১৩. তুলনীয়, সাবুনি, মাদখাল, পৃষ্ঠা ৪১-৪৪; খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ২৪।

১৪. তুলনীয়, Von Denffer, 'উলুম, পৃষ্ঠা ৯০।

১৫. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৯১।

১৬. কাত্তান, তাশরি, পৃষ্ঠা ৬৯-৭০।

১৭. তুলনীয়, আব্দুর ওহিম, Jurisprudence, পৃষ্ঠা ৭১।

১৮. শালতুত, আল ইসলাম, পৃষ্ঠা ৪৯৪; খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৩২-৩৩।

১৯. উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আল গাজ্জালীর মতে, আহকাম সম্পর্কিত আয়াতের সংখ্যা ৫০০। গাজ্জালীর এ অভিমত সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আল শাওকানী বলেন, এ ধরনের কোনো হিসাব করা হলে তা নিছক আনুমানিক হিসাবই বুঝাবে (মুস্তাস্ফা, ২, ১০১; এবং শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২৫০)।

২০. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৩৫; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ৭১।

২১. শাবাআন, মানহাজ, পৃষ্ঠা ৩১।

২২. কোনো ব্যক্তি কোনো কিছুকে অসত্য জেনেও তা সত্য বলে শপথ করলে তা হবে গোনাহের কাজ, একে বলা হয়, ইয়ামিন আল গামুস যা এক ধরনের ইয়ামিন আল মুয়াক্কাদাহ। অবশ্য হানাফীগণ মনে করেন যে, কোনো ব্যক্তি ভবিষ্যতে কোনো কিছু করার অঙ্গীকার করলে সে কোন পরিস্থিতিতে তা করেছিল তার ওপরই পরবর্তী অবস্থা নির্ভর করে। তবে সে যদি তা পূরণ করতে অস্বীকার করে তা হলে তাকে কাফ্ফারা আদায় করতে হবে।

২৩. বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৬৬।

২৪. শালতুত, আল ইসলাম, পৃষ্ঠা ৪৯৮।

www.pathagar.com

২৫. শাতিবী, মুওয়াফাকায়াত ৩য় খণ্ড, ৯; কাত্তান, তাশরি, পৃষ্ঠা ৮২।

২৬. শাতিবী, মুওয়াফাকায়াত, ৩য় খণ্ড, ৯।

২৭. একই গ্রন্থ, ৩য় খণ্ড, ১২।

২৮. শালতুত, আল ইসলাম, পৃষ্ঠা ৪৯৮-৯৯; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ৭১; খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৩৫; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৬৭ ।

২৯. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ৮০। এখানে তিনি তার নিজের মতের সমর্থনে ইবনে হাজমের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন।

৩০. শাতিবী, মুওয়াফাকায়াত, ৩য় খণ্ড, ২১৯।

৩১. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ৭০।

৩২. সাবুনি, মুহাদারাত, পৃষ্ঠা ৩১। এ আয়াত সম্পর্কে আরো আলোচনা দেখতে পাওয়া যাবে এ গ্রন্থের যথাক্রমে সুন্নাহ্, ইজমা ও কিয়াসের হুজ্জাইয়াহ অধ্যায়ে।

৩৩. শাতিবী, মুওয়াফাকায়াত, ৩য় খণ্ড, ২১৭।

৩৪. চুক্তি সংক্রান্ত দুইটি আয়াতের একটি এসেছে আদেশের আকারে। অন্যটি প্রশ্নের আকারে। নিম্নে আয়াত দু'টি উদ্ধৃত করা হলো : 'হে ইমানদারগণ, বন্ধনসমূহ পুরোপুরি মেনে চলো' (সুরা মায়েদা ৫ : ১) এবং 'হে ইমানদারগণ, তোমরা সেই কথা কেন বলো যা কার্যত করো না' (সুরা আস সফ ৬১ : ২)। পরে আরেকটি আয়াতে (সুরা নিসা ৪ : ৫৮) এ বিষয়টি সমর্থিত হয়েছে। এ আয়াতে আমানতগুলো যথাযথ সংরক্ষণ এবং ন্যায়বিচারপূর্ণ আচরণের মূলনীতি পূরণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে : 'মুসলমানগণ, আল্লাহ তোমাদেরকে এ আদেশ দিয়েছেন যে, যাবতীয় আমানত তার উপযোগী লোকদের কাছে সোপর্দ করো এবং তোমাদের মধ্যে যখন (কোনো বিষয়ে) ফয়সালা করবে তখন তাতে ইনসাফ করো'। তাই দেখা যাচ্ছে যে, ইনসাফের লঙ্ঘন, বিশ্বাস ভঙ্গ অথবা আইনের নৈতিক আদর্শচ্যুতি চুক্তির শর্ত পূরণ করে না ।

৩৫. তুলনীয়, বাদরান, বায়ান, পৃষ্ঠা ২-৩।

৩৬. শালতুত, আল ইসলাম, পৃষ্ঠা ৫০১।

৩৭. সাবুনি, মাদখাল, পৃষ্ঠা ৭৩।

৩৮. শাতিবী, মুওয়াফাকায়াত, ৩, ১৭৮; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ১২২; খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ১৬৭।

৩৯. সাবুনি, মাদখাল, পৃষ্ঠা ৭২; বাদরান, বায়ান, পৃষ্ঠা ৪ ।

৪০. তুলনীয়, শাবাআন, মানহাজ, পৃষ্ঠা ২৯।

৪১. উদাহরণ হিসেবে দেখুন, 'তিনিই এ সমস্ত জোড়া সৃষ্টি করেছেন। আর তিনিই তোমাদের জন্য জাহাজ ও জন্তু-জানোয়ারকে বাহন বানিয়েছেন' (সুরা আয যুখরুফ, ৪৩ : ১২); এবং 'জন্তু-জানোয়ার সৃষ্টি করেছেন। তাতে তোমাদের জন্য পোশাকও রয়েছে, আর খাদ্যও; আরো নানাবিধ অন্যান্য ফায়দাও নিহিত রয়েছে' (আল নাহল,

www.pathagar.com

১৬ : ৫); এবং 'হে নবি, এদের বল, আল্লাহ যেসব সৌন্দর্যময় বস্তু তার বান্দাদের জন্য উৎপাদন করেছিলেন এবং বেঁচে থাকার উপকরণ করেছিলেন, খোদার দেয়া সেসব পাক জিনিসকে কে হারাম করেছে?' (সুরা আরাফ, ৭ : ৩২)।

৪২. তুলনীয়, শাবাআন, মানহাজ, পৃষ্ঠা ২২-২৩।

৪৩. তুলনীয়, আহমদ হাসান, 'Rationality', পৃষ্ঠা ১০১।

৪৪. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১০৪।

৪৫. ইবনে হাজম, ইহকাম, ৮, ৭৬; সাবুনি, মাদখাল, পৃষ্ঠা ৭৫। তালিল সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে এ গ্রন্থের কিয়াস অধ্যায়ে। কিয়াসের ইল্লতের আলোকে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৪৬. তুলনীয়, আহমদ হাসান, 'Rationality' পৃষ্ঠা ১০২।

৪৭. উদাহরণ হিসেবে দেখুন, (সুরা বাকারা ২ : ৩)। আয়াতটিতে বলা হয়েছে : 'আমার বান্দার প্রতি যে কিতাব নাজিল করেছি তা আমার প্রেরিত কি-না সে বিষয়ে সন্দেহ হলে তোমরা এর অনুরূপ একটি সুরা রচনা করে আনো।'

৪৮. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ৬৫; সাবুনি, মাদখাল, পৃষ্ঠা ৪৫।

৪৯. তুলনীয়, von Denffer, 'উলুম, পৃষ্ঠা ১৫২।

৫০. ইযাজ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন, von Denffer, উলুম, পৃষ্ঠা ১৫২-৫৭; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ৬৫-৬৬; খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ২৫-২৭।

৫১. তুলনীয়, আইনের শাসনাধীনে সরকারের মূলনীতিগুলো যা বৈধতার নীতিমালা বলেও উল্লেখ করা হয়েছে, এ সম্পর্কে জানতে দেখুন, আমার লেখা নিবন্ধ 'The Citizen and State' পৃষ্ঠা ৩০।

৫২. তুলনীয়, সাবুনি, মাদখাল, পৃষ্ঠা ৪৬; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ৬৭; কামালী, The Citizen, পৃষ্ঠা ১৫।

৫৩. Von Denffer, 'উলুম, পৃষ্ঠা ৯৩।

৫৪. শাতিবী, মুওয়াফাকায়াত, ৩, ২০১।

৫৫. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ২০১।

৫৬. খুদারি, উসুল, পৃষ্ঠা ২০৯-১০; কুদামাহ ইবনে মাযউনের বিরুদ্ধে মদপানের অভিযোগ আনা হলে উমর ইবনে খাত্তাব রা. তাকে শাস্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত নেন। এ সময় কুদামাহ আত্মপক্ষ সমর্থনে (সুরা মায়দা ৫ : ৯৩) উল্লেখ করেন। এ আয়াতে বলা হয়েছে : 'যারা ইমান এনেছে ও নেক আমল করেছে তারা পূর্বে যা কিছু 'খানাপিনা' করেছে সে জন্য কোনোরূপ পাকড়াও করা হবে না...।' ইবনে মাযউন দাবি করেন যে, তিনি তাদেরই একজন। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এ মত খণ্ডন করে দিয়ে বলেন, মদপান সুনির্দিষ্টভাবে নিষিদ্ধ হওয়ার আগে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তিদের জন্য এ আয়াত নাজিল হয়েছিল।

৫৭. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ২১১।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

সুন্নাহ্

সূচনা

আক্ষরিক অর্থে সুন্নাহ্ হলো সুস্পষ্ট পথ বা চলার পথ। তবে নিয়মতান্ত্রিক আচার-আচরণ অথবা প্রতিষ্ঠিত আচরণাদি বুঝাতেও সুন্নাহ্ ব্যবহার করা হয়। এটা ভালো বা খারাপ উদাহরণ হতে পারে এবং কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় তা স্থাপন করতে পারে।[১] প্রাক ইসলামি আরবের লোকেরা পূর্ব পুরুষদের থেকে উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত সমাজের প্রাচীন ও অব্যাহত আচার-আচরণ বুঝাতে 'সুন্নাহ্' শব্দটি ব্যবহার করত। প্রতিটি আরব গোত্রের নিজস্ব সুন্নাহ্ ছিল যাকে তারা নিজেদের আত্মপরিচয়ের ভিত্তি ও গৌরবের বিষয় বলে গণ্য করত।[২] সুন্নাতের বিপরীত শব্দ হলো বিদাত বা নবোদ্ভাবন যার বৈশিষ্ট্য হলো, অতীত উদাহরণ ও ধারাবাহিকতার অভাব। কুরআনের বহু স্থানে 'সুন্নাহ্' ও এর বহুবচন 'সুনান' এর উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়, (সুনির্দিষ্টভাবে ১৬ স্থানে)। এর সব জায়গায়ই প্রতিষ্ঠিত নিয়মনীতি বা আচার-আচরণ পদ্ধতি বুঝাতে 'সুন্নাহ্' ব্যবহার করা হয়েছে। হাদিসশাস্ত্র বিশারদ আলেম বা মুহাদ্দিসগণ সুন্নাহ্ বলতে রসুল সা.-এর সব বিবরণ, তার কাজ, কথা তিনি নিজে যা কিছু করার সম্মতি দিয়েছেন এবং তার শারীরিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত সব বিবরণীকে বুঝিয়েছেন। অবশ্য ইসলামি আইন বিজ্ঞান বিশারদ আলেমগণ রসুল সা.-এর দৈহিক বিবরণের বিষয়কে 'সুন্নাহ্র' অন্তর্ভুক্ত করেননি।[৩] কুরআনে সুন্নাহ্ আল নবি বা (সুন্নাহ্ আল রসুল) অর্থাৎ রসুল সা. -এর সুন্নাত, এ ধরনের কোনো বিবরণ দেখতে পাওয়া যায় না। তবে (সুরা আহজাবে ৩৩ : ২) উসওয়াহ হাসানা (সর্বোত্তম আচরণ) শব্দদ্বয় দেখতে পাওয়া যায় রসুল সা.-এর দৃষ্টান্ত স্থাপনীয় আচরণ সম্পর্কিত যাকে সুন্নাহ্ আল নবির সমার্থক নিকটতম কুরআনিক পরিভাষা বলা যায়।[৪] রসুল সা.-এর উসওয়াহ বা দৃষ্টান্ত পরে তার সুন্নাহ্র উল্লেখ বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কুরআনে পথনির্দেশনা বা হেদায়েতের উৎস হিসেবে 'হিকমাহ' (আলো, জ্ঞান) শব্দের ব্যবহারও দেখতে পাওয়া যায়, এর মধ্যে কুরআনও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী কুরআনে আল কিতাবের পাশাপাশি অন্তত ৭টি স্থানে 'হিকমাহ' ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। বলা যায়, (সুরা জুম্মাতে ৬২ : ২)-এর একটি ব্যবহারের উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়, সর্বশক্তিমান আল্লাহ রসুল সা.কে প্রেরণ করেছেন যিনি লোকদের জীবনকে পরিশুদ্ধ ও সুগঠিত করে এবং তাদেরকে কিতাব ও 'হিকমাহ' শিক্ষা দেয়। ইমাম শাফেয়ীর ব্যাখ্যা অনুযায়ী এই প্রেক্ষাপটে 'হিকমাহ' শব্দের অর্থ হচ্ছে রসুল সা.-এর সুন্নাত।[৫] আলেমদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশও এ মত পোষণ করে। 'সুন্নাহ্' ও 'সুন্নাহ্ আল

www.pathagar.com

রসুলুল্লাহ' উভয় পরিভাষা স্বয়ং রসুল সা. এবং তার সাহাবিগণ রা. ব্যবহার করেছেন।

لما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلّم ان يبعث معاذ بن خبل

اليمن قال له: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال أقضي بما في

كتاب الله , قال: فبسنة رسول الله قال: اختهد رايي ولا ألو

রসুল সা. মুয়াজ ইবনে জাবালকে রা. ইয়েমেনের বিচারক হিসেবে পাঠানোর সময় তাকে জিজ্ঞেস করলেন, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় তিনি কোন কোন উৎসের ওপর নির্ভর করবে। জবাবে মুয়াজ রা. প্রথমে 'আল্লাহ তায়ালার কিতাব' এরপর 'রসুলুল্লাহর সুন্নাহ্র' কথা উল্লেখ করলেন।[৬]

অন্য এক হাদিসে বলা হয়েছে :

تركت فيكم اثنين لن تضلّوا ما تمسكتم

بما كتاب الله و سنتي

রসুল সা. বলেছেন, 'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে গেলাম। যতদিন পর্যন্ত তোমরা এগুলো আঁকড়ে ধরে রাখবে ততদিন পর্যন্ত তোমরা বিপথগামী হবে না। তা হলো, আল্লাহ তায়ালার কিতাব ও আমার সুন্নাহ্ (সুন্নাতি)।[৭]

হিজরি প্রথম শতকের শেষদিকে ইরাকের ফকিহগণ রসুল সা.-এর সুন্নাহ্কে আইন তত্ত্বে ব্যবহার করেন বলে প্রমাণ রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, দু'টি চিঠিতে 'রসুল সা.-এর সুন্নাহ্' পরিভাষা ব্যবহার দেখা গেছে। এ দু'টি চিঠি লেখা হয় (৮৬ হিজরিতে) উমাইয়া শাসক আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানকে। খারেজি নেতা আবদুল্লাহ ইবনে ইবাদ ও আল হাসান আল বসরী এ চিঠি লিখেন। এ থেকে এ কথা বুঝানো হতে পারে যে, প্রথম শতকের শেষদিকে এই পরিভাষা প্রতিষ্ঠিত ছিল বলে প্রাথমিক কালের প্রাপ্ত দলিলে জানা গেছে। তবে এই দলিলে এ কথা প্রমাণিত হচ্ছে না যে এর পূর্বে এ পরিভাষা ব্যবহৃত হতো না।[৮]

প্রাথমিকভাবে 'সুন্নাহ্' পরিভাষাটি কেবলমাত্র রসুল সা.-এর সুন্নাহ্র ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না বরং সমাজের রীতিনীতি ও সাহাবিগণের রা. দৃষ্টান্ত বুঝাতেও তা ব্যবহৃত

www.pathagar.com

হতো। এ ব্যবহার দ্বিতীয় শতকের শেষদিক পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল বলে প্রতীয়মান হয়। এরপর ইমাম শাফেয়ী এর ব্যবহার কেবলমাত্র রসুল স.-এর সুন্নাহ্তে সীমাবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। অনেক সময় সুন্নাহ্র আগে সুনির্দিষ্ট আরবি আর্টিকেল 'আল' সংযুক্ত করে সুন্নাহ্ আল রসুল সা. বুঝায় এবং সুন্নাহ্র সাধারণ ব্যবহারে সমাজের আচার-আচরণ অথবা প্রথা বা রীতিনীতি বুঝানো হয়ে থাকে। হিজরি দ্বিতীয় শতকের শেষদিকে সুন্নাহ্র ব্যবহারিক/আইনগত অর্থ প্রাধান্য পায় এবং আলেমগণ তা এককভাবে রসুল সা.-এর আচার-আচরণের নিয়মনীতির ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন।[৯]

এভাবে আলেমগণ 'আবু বকর রা. বা উমরের রা. সুন্নাহ্র' মতো কথা উচ্চারণ করাকে নিরুৎসাহিত করেছেন। তাদের মতে, সুন্নাহ্র সঠিক ব্যবহার 'সুন্নাতুল্লাহ' ও 'সুন্নাহ্ রসুলুল্লাহ্র' মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। এর অর্থ হলো আল্লাহ তায়ালার সুন্নাহ্ বা তাঁর নির্দেশিত পথে কোনো কিছু করা এবং তাঁর রসুল সা.-এর সুন্নাহ্। তবে এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে, বিশেষ করে একটি হাদিসের আলোকে এ পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। এতে বর্ণনা করা হয় যে রসুল সা. বলেছেন :

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء اراشدينمن بعدي

'তোমরা আমার সুন্নত এবং খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নত অনুসরণ করবে'।

তবে আল শাওকানী উল্লেখ করেন যে, এ হাদিসে সম্ভবত রসুল সা. সুন্নাহ্কে 'তরিকা' বা তার সাহাবিগণ রা. প্রদর্শিত পন্থা বুঝাতে 'সুন্নাহ্' শব্দটি ব্যবহার করে থাকতে পারেন।[১০] আল শাওকানীর ব্যাখ্যা থেকে এ কথা বুঝানো হতে পারে যে, আলেমগণ পরে সুন্নাহ্ পরিভাষাটির যে একান্ত ধারণা গ্রহণ করেন রসুল সা. সে অর্থে হয়তো সুন্নাহ্র ব্যবহার করেননি।

সুন্নাহ্র আইনগত ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। উসুল আল ফিকহ বিশারদ আলেমগণ শরিয়াহ্র একটি উৎস এবং কুরআনের পরেই আইনগত দলিল হিসেবে সুন্নাহ্কে উল্লেখ করে থাকেন। তবে ফিকহ্র আলেমরা সুন্নাহ্কে প্রাথমিকভাবে শরয়ী মূল্য বুঝাতে ব্যবহার করেন যা মানদুবের সাধারণ শ্রেণির আওতাভুক্ত। যদিও এ অর্থে সুন্নাহ্ প্রায় মানদুবের সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয় তবুও এর অর্থ সুন্নাহ্ মানদুবের মধ্যে সীমাবদ্ধ এ কথা কোনো অর্থে বুঝাবে না। শরিয়তে এর অন্যান্য ব্যবহার থেকে বুঝা যায়, সুন্নাহ্ কেবল মানদুব নয়, ওয়াজিব, হারাম, মাকরুহ ও মুবাহ্র মতো বিষয়ের কর্তৃত্ব প্রদান ও গঠন করতে পারে। এভাবে উসুল আল ফিকহ্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে কেউ এ কথা বলতে পারেন যে, এ বিধান অথবা

www.pathagar.com

ওই সিদ্ধান্ত কুরআন বা সুন্নাহ্ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে, অন্যদিকে একজন ফকিহ এ কথা বলার চেষ্টা করেন যে, এ কাজ অথবা ওই কাজ হলো সুন্নাহ্, এর অর্থ হলো এটি ফরজও নয়, আবার ওয়াজিবও নয়, এটি মানদুবের শ্রেণিভুক্ত পাঁচটি মূল্যবোধের একটি।[১১]

আলেমগণ বস্তুতপক্ষে সুন্নাহ্ ও হাদিসকে প্রায় পরস্পর পরিবর্তনীয় হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তা সত্ত্বেও দুটি পরিভাষার নিজস্ব অর্থ আছে। আক্ষরিকভাবে হাদিস অর্থ হলো কোনো ঘটনার বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ। কুরআনে এ শব্দটি ঘন ঘন (সুনির্দিষ্টভাবে ২৩ বার) উচ্চারিত হতে দেখা যায় এবং প্রতি ক্ষেত্রেই এর অর্থ হলো বিবরণ বা যোগাযোগ। এসব দৃষ্টান্তের কোনোটিতেই হাদিস শব্দের ব্যবহারিক অর্থে অর্থাৎ একান্তভাবে রসুল সা.-এর কথা বুঝায়নি। রসুল সা.-এর ওফাতের পর ইসলামের প্রাথমিক দিনগুলোতে রসুল সা.-এর জীবন ও কর্ম সম্পর্কিত সব কাহিনী ও বিবরণ বুঝাতে হাদিস শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এভাবে শব্দটি প্রায় একান্তভাবেই রসুল সা.-এর বিবরণ বা কথা বুঝাতে ব্যবহার শুরু হয়।[১২]

এক অর্থে হাদিস সুন্নাহ্ থেকে পৃথক। হাদিস হলো রসুল সা. -এর কথা, কর্ম ও আচার-আচরণের বিবরণ। অন্যদিকে সুন্নাহ্ হলো উদাহরণ অথবা হাদিস থেকে গৃহীত আইন। এ অর্থে হাদিস হচ্ছে সুন্নাহ্র মাধ্যম বা বাহক। অবশ্য সুন্নাহ্ ব্যাপক অর্থবোধক; বিশেষ করে এর আক্ষরিক অর্থ যখন আইন রচনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এভাবে সুন্নাহ্কে কেবলমাত্র রসুল সা.-এর হাদিস নয় উপরন্তু সমাজের প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতিও বুঝানো হয়েছে। তবে এক সময় হাদিস ও সুন্নাহ্র আক্ষরিক অর্থ ব্যবহারিক প্রয়োগের পথ তৈরি করে দিলে উভয় একান্তভাবে রসুল সা.-এর আচার-আচরণের বিষয়ে ব্যবহৃত হয় এবং একে অপরের সমার্থকে পরিণত হয়। প্রধানত ইমাম শাফেয়ীর প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতেই এটি সম্ভব হয়েছে। তিনি এ বিষয়ে জোর দেন যে, সহিহ হাদিস থেকেই সুন্নাহ্ সংগৃহীত হবে এবং হাদিসের বাইরে কোনো সুন্নাহ্ থাকতে পারে না। শাফেয়ীর পূর্বকালীন সময়ে সাহাবি রা. ও তাদের উত্তরাধিকারী তাবেয়ীগণের কথাকেও 'হাদিস' বলে ব্যবহার করা হতো। এভাবে দেখা যায় যে, সুন্নাহ্ ও হাদিসের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করার পরই 'হাদিসকে' রসুল সা.-এর কাজ ও কথা বুঝাতে একান্তভাবে ব্যবহার শুরু হয়।[১৩]

'হাদিসের' বিকল্প হিসেবে অন্য দু'টি পরিভাষা ব্যবহার করা হয়, তাহলো খবর ও আসার। আক্ষরিক অর্থে খবর হলো, 'বার্তা বা প্রতিবেদন' এবং আসার মানে 'ধারণা, চিহ্ন বা প্রভাব'। উদাহরণ হিসেবে আমরা 'খবর আল ওয়াহিদ' শব্দাবলির ব্যবহার দেখতে পাই; এর অর্থ হলো একক (আহাদ) হাদিস। অধিকাংশ আলেম হাদিস, খবর ও আসারকে সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। অবশ্য অন্যরা

www.pathagar.com

আসার থেকে খবরকে পৃথক করে দেখেন। অন্যদিকে আসার যখন (কোনো কোনো সময় আমল) সাহাবিগণের দৃষ্টান্ত বুঝাতে ব্যবহৃত হয় তখন তাকে হাদিসের সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।[১৪]

আলেমদের বড় অংশ সাহাবিগণের দৃষ্টান্তকে অন্যতম সম্প্রচারিত (নকলী) দলিল বলে মনে করেন। প্রাথমিক আইনশাস্ত্র বিশারদ ফকিহ্গণ আসার সম্পর্কিত মতামতের ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নিতেন বলে জানা গেছে। এমনকি ইমাম মালিকের সমর্থনে রসুল সা.-এর হাদিস পর্যন্ত উপেক্ষার যুক্তি দিতে গিয়ে বলেন, আসার সত্যিকার সুন্নাহ্র প্রতিনিধিত্ব করে। কারণ সাহাবিগণই রা. রসুল সা.-এর সঠিক সুন্নাহ্ নিরূপণের অপেক্ষাকৃত ভালো অবস্থানে ছিলেন। এ ছাড়া সাহাবিগণের রা. মধ্যে এমন অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ছিলেন যাদের আইন সম্পর্কে তীব্র মেধা ও উৎস সম্পর্কে গভীর জ্ঞান তাদেরকে ফতোয়া প্রদানে বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারীতে পরিণত করেছিল। অনেক সময় উদ্ভূত সমস্যা নিয়ে তারা একত্রে সমবেত হয়ে আলোচনা করতেন এবং তাদের সম্মত অভিমত বা সম্মিলিত রায়ই আসার বলে পরিচিত। ইমাম শাফেয়ী (মৃত্যু ২০৪/৮১৯) অবশ্য মনে করেন যে, আসার কোনোক্রমেই রসুল সা.-এর সুন্নাহ্র প্রতিনিধিত্ব করে না। রসুল সা.-এর হাদিস পাওয়া না গেলে সে ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী সাহাবিদের রা. দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতেন, সাহাবিদের রা. মধ্যে মতপার্থক্য দেখা গেলে সে ক্ষেত্রে তিনি অন্যদের মতের চেয়ে প্রথম চার খলিফার মতকে অথবা কুরআনের সঙ্গে সবচেয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ মতটিকে শ্রেয় বলে মনে করতেন।[১৫]

ইমাম শাফেয়ীর মতে, সুন্নাহ্কে হাদিসের আকারে সরাসরি রসুল সা. থেকে আসতে হবে। নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে তা আইনের উৎসে পরিণত হবে, সমাজ তা গ্রহণ করুক বা না করুক তাতে কিছু যায়-আসে না। তিনি সাহাবিদের রা. কাজ ও আচার-আচরণ এবং মতামতের চেয়ে রসুল সা.-এর থেকে প্রাপ্ত হাদিসের কর্তৃত্বকে অগ্রাধিকার দেয়ার ওপর গুরুত্ব প্রদান করেন। ইমাম শাফেয়ী মনে করতেন যে এমনকি রসুল সা.- এর একক হাদিসকেও সমাজ, সাহাবিগণ রা. ও তাবেয়ীগণের কাজ, রীতিনীতি ও মতামতের চেয়ে অবশ্য অধিকতর অগ্রাধিকার দিতে হবে।[১৬]

ইমাম শাফেয়ী প্রধানত তৎকালীন ফকিহ্ বা আইনজ্ঞদের মধ্যকার বিরাজমান রীতির বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা চালান। তারা হাদিসের চেয়ে সমাজে প্রচলিত নিয়ম-নীতি ও সাহাবিগণের রা. সিদ্ধান্তকে অগ্রাধিকার দিতেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, ইমাম শাফেয়ী মাদানী রীতি হাদিসের চেয়ে অধিকতর প্রামাণিক বলে ইমাম মালিকের যুক্তিকে খণ্ডন করে দেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ইমাম মালিক (মৃত্যু

www.pathagar.com

১৭৯/৭৯৫) তার গ্রন্থ মুয়াত্তায় আইন সংক্রান্ত প্রতিটি অধ্যায় সাধারণভাবে রসুল সা.-এর হাদিসের মাধ্যমে সূচনা করেন। কিন্তু বিচার সংক্রান্ত বিস্তারিত বিষয় নির্ধারণে তিনি আসারের ওপর হাদিসকে অগ্রাধিকার দেয়ার মূলনীতি অব্যাহতভাবে মেনে চলতে পারেননি। বিষয়টি উল্লেখ করা দরকার যে, মুয়াত্তায় ১৭২০টি হাদিস রয়েছে। এর মধ্যে ৮২২টি হাদিস রসুল সা.-এর থেকে এবং অবশিষ্টগুলো সাহাবি রা., তাবেয়ী ও অন্যদের থেকে গৃহীত। এ থেকে বুঝা যায় যে, ইমাম মালিক হাদিস ও আসারের মধ্যকার পার্থক্যের বিষয়ে আগাগোড়া সচেতন ছিলেন না যা ইমাম শাফেয়ীর প্রচেষ্টার মূল প্রতিপাদ্যেও পরিণত হয়। তিনি এসব কিছুর ওপর রসুল সা.-এর হাদিসের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন।[১৭]

সুন্নাহ্‌র প্রামাণিক মূল্য (হুজ্জীয়া)

শরিয়াহ্‌র উৎস হিসেবে সুন্নাহ্‌র গুরুত্বের বিষয়ে আলেমগণের মধ্যে সর্বসম্মত মতৈক্য রয়েছে এবং হালাল ও হারামের বিষয়ে হাদিসের সিদ্ধান্তকে কুরআনের অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়।[১৮] রসুল সা.-এর সুন্নাহ্ হচ্ছে কুরআনের একটি প্রমাণ (হুজ্জাহ), যা এর কর্তৃত্বের সাক্ষ্য দান করে এবং একে মেনে চলার জন্য মুসলিমদের নির্দেশ প্রদান করে। কুরআনে বলা হয়েছে, রসুলের কথাগুলো আল্লাহ তায়ালারই অনুপ্রাণীত বাণী (সুরা নাজম, ৫৩ : ৩)। তাঁর কাজ ও শিক্ষা বলতে শরিয়াহ্‌র একটি বিধিবিধান প্রতিষ্ঠা বুঝায় যা বাধ্যতামূলক হওয়ার প্রমাণ গঠন করে।[১৯] 'সে নিজের ইচ্ছায় কোনো কথা বলেন না, এগুলো তার কাছে পাঠানো ওহি ছাড়া আর কিছুই নয়', কুরআনের এ আয়াত প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে আল গাজ্জালী বলেন, রসুল সা. যেসব ওহি লাভ করেন তার কিছু নিয়ে গঠিত হয়েছে কুরআন আর অবশিষ্ট অংশ সুন্নাহ্। রসুল সা.-এর কথা যে কেউই শুনতে পেয়েছেন তাদের জন্য এসব কথা হচ্ছে হুজ্জাহ। আমরা যারা তাদের কাছ থেকে এসব কথা মৌখিক বা লিখিত বিবরণের আকারে পাবো আমাদের জন্য তার যথার্থতা যাচাই করা প্রয়োজন।[২০]

সুন্নাতের শুদ্ধতার বিষয় একটি সুনির্দিষ্ট (কাতয়ী) প্রমাণ হতে পারে অথবা অগ্রাধিকারযোগ্য ধারণা অনুমান (আল যন্নী আল রাজিহ) হতে পারে। উভয় ক্ষেত্রে সুন্নাহ্ মুকাল্লাফকে আনুগত্যের আদেশ দেয়। রসুল সা.-এর সব সিদ্ধান্ত বিশেষ করে যেগুলো কুরআনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং কুরআনের কোনো বিষয়কে সমর্থন করে তা বাধ্যতামূলক আইন গঠন করে।[২১]

কুরআনে একাধিক স্থানে মুমিনদের রসুল সা.-এর আনুগত্য করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং বিনাবাক্যে রসুল সা.-এর রায় ও কর্তৃত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করাকে

www.pathagar.com

কর্তব্যে পরিণত করা হয়েছে। নিম্নের আয়াতগুলোতে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী তার বিখ্যাত গ্রন্থ আল রিসালাহতে এগুলো উদ্ধৃত করেন (পৃষ্ঠা ৪৭) :

> এবং রসুল তোমাদের যা কিছু দান করেন তা তোমরা গ্রহণ কর। আর যেসব জিনিস হতে তিনি তোমাদের বিরত রাখেন তা হতে তোমরা বিরত হয়ে যাও (সুরা হাশর, ৫৯ : ৭)।
>
> হে ইমানদার লোকেরা, আনুগত্য কর খোদার, আনুগত্য কর রসুলের এবং সেসব লোকেরও যারা তোমাদের মধ্যে কর্তৃত্ব সম্পন্ন। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি কোনো ব্যাপারে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয় তাহলে তাকে আল্লাহ ও রসুলের দিকে ফিরিয়ে দাও (সুরা নিসা, ৪ : ৫৯)।

মতবৈষম্যের বিষয় আল্লাহ্ তায়ালার কাছে ফিরে দেয়ার অর্থ হচ্ছে কুরআনের আশ্রয় গ্রহণ করা আর রসুলের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার মানে হচ্ছে সুন্নাহ্‌র আশ্রয় গ্রহণ করা।[২২] কুরআনের আরেকটি আয়াতে জোর দিয়ে বলা হয়েছে : 'যে রসুলের আনুগত্য করল সে তো আল্লাহ তায়ালারই আনুগত্য করল' (সুরা নিসা, ৪ : ৮০) এবং এ ব্যাপারে চূড়ান্তভাবে কুরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণা হলো, কুরআন ও সুন্নাহ্‌র অকাট্য বিধান পালন করা মুমিনদের জন্য বাধ্যতামূলক। এ কারণে আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার নির্দেশনা থেকে ভিন্নমত গ্রহণের অথবা নিজস্ব পছন্দের কোনো পন্থা অনুসরণের আর কোনো স্বাধীনতা তাদের নেই : 'কোনো মুমিন পুরুষ ও কোনো মুমিন স্ত্রীলোকের এ অধিকার নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রসুল সা. যখন কোনো বিষয়ে ফায়সালা করে দেবেন তখন সে নিজের সেই ব্যাপারে নিজস্ব কোনো ফায়সালা করার এখতিয়ার রাখবে' (সুরা আহজাব, ৩৩ : ৩৬)। কুরআনের অন্য এক স্থানে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, রসুল সা.-এর কর্তৃত্বকে মেনে চলা নিছক আনুষ্ঠানিক কোনো বৈধতার বিষয় নয় বরং মুসলমানদের ইমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ: 'না, হে মুহাম্মদ তোমার খোদার নামে শপথ, এরা কিছুতেই ইমানদার হতে পারে না, যতক্ষণ না তারা তাদের পারস্পরিক মতভেদের বিষয় ও ব্যাপারগুলোতে তোমাকে বিচারপতিরূপে মেনে নেবে' (সুরা নিসা, ৪ : ৬৫)। এটিও কুরআনের অনুরূপ অন্যান্য আয়াত থেকে এ উপসংহার আসা যায় যে, সব শরয়ী বিষয়ে কুরআনের পরের দলিলই হলো সুন্নাহ্ এবং রসুল সা.-এর নির্দেশনার প্রতি এ নিশ্চয়তা প্রদান যে তার প্রতিপালন করাকে সব মুসলমানের জন্য একটি কুরআনিক বাধ্যবাধকতায় পরিণত করেছে। এ বিষয়ে সাহাবিদের রা. মধ্যে মতৈক্য রয়েছে। রসুল সা.-এর জীবদ্দশায় এবং তার ওফাতের পরও তারা অধীর আগ্রহ নিয়ে রসুল সা.-এর নির্দেশ মেনে চলেছেন এবং তার দৃষ্টান্তগুলো অনুসরণ করেছেন– তার

www.pathagar.com

আদেশ ও নিষেধগুলো কুরআন থেকে অথবা অন্যভাবে এসেছে তা দেখেননি। প্রথম দুইজন খলিফা আবু বকর রা. ও ওমর রা. রসুল সা.-এর সুন্নাহ্ সম্পর্কে যখনই জানতে পেরেছেন তখনই তা অনুসরণ করেছেন। কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে রসুল সা.-এর সুন্নাহ্ সম্পর্কে তাদের জানা না থাকলে সে ক্ষেত্রে অন্য সাহাবিরা রা. বিষয়টি জানেন কি না তারা তা নির্ণয়ের চেষ্টা করতেন। খলিফা ওমর রা. তার বিচারকদেরকে লিখিত নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, কোনো সমস্যার ব্যাপারে কুরআনের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা না পাওয়া গেলে তারা যেন রসুল সা.-এর সুন্নাহ্ অনুসরণ করে।[২৩]

শ্রেণি বিভাগ ও মূল্য : ১

সুন্নাহ্কে কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য ও অনুসন্ধানকারীর দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভর করে এ শ্রেণি বিভাগ করা হয়েছে। অবশ্য এ ধরনের শ্রেণি বিভাগের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য প্রধান দু'টি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সুন্নাহ্র বিষয়বস্তু (মতন) ও সংগ্রহ পদ্ধতি (সনদ)। এখানে প্রাথমিকভাবে বিষয়বস্তুর আলোকে শ্রেণি বিভাগ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুন্নাহ্কে তিন প্রকারে বিভক্ত করা হয়েছে। তাহলো, মৌখিক (কাউলি), বাস্তব কর্ম (ফিলি) ও মৌন অনুমোদন (তাশরিরী)। এখানে আইনের সাথে সম্পর্কিত সুন্নাহ্র অন্য বিভক্তি হলো আইনবিষয়ক ও আইন বহির্ভূত সুন্নাহ্।

যে কোনো বিষয়ে রসুল সা.-এর বক্তব্য বা কথা হচ্ছে কাউলি সুন্নাহ্। যেমন– 'ফি আল সাইমাহ জাকাহ' এর অর্থ গবাদিপশুগুলোর জাকাত দিতে হবে।[২৪]

রসুল সা.-এর কাজ ও কাজের নির্দেশের সমন্বয়ে ফিলি সুন্নাহ্ গঠিত হয়েছে। যেমন- তিনি যে পদ্ধতিতে নামাজ আদায়, রোজা পালন ও হজ করেন অথবা তিনি যে ধরনের লেনদেন করেন যেমন- বেচাকেনা, ঋণ প্রদান ইত্যাদি। অনুরূপভাবে রসুল সা. চোরের হাত কবজি থেকে কাটার অনুমতি দেন। এতে কুরআনের আয়াত (সুরা মায়েদা, ৫ : ৩৮) কিভাবে বাস্তবায়ন করা হবে সে বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। এ আয়াতে শুধুমাত্র হাত কাটার কথা বলা হয়েছে। ঠিক কোন স্থান থেকে হাত কাটা হবে তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। মৌনভাবে অনুমোদিত সুন্নাহ্ সাহাবিগণের রা. কাজ ও কথার সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। এসব কাজ ও কথা সম্পর্কে রসুল সা. জ্ঞাত ছিলেন এবং তিনি তা অনুমোদন করেন। রসুল সা.-এর মৌন অনুমোদিত সুন্নাহ্কে তার নীরবতা পালন অথবা অননুমোদনের অভাব অথবা তার অনুমোদনের প্রকাশ ও মৌখিকভাবে নিশ্চিতকরণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[২৫] এ ধরনের সুন্নাহ্র উদাহরণ হলো দুই সাহাবি রা. সফরে গেলেন। পথের মধ্যে

www.pathagar.com

তারা ওজু করার জন্য পানি খুঁজে কোথাও পেলেন না। তারা উভয়ে তায়াম্মুম অথবা পরিষ্কার বালু দিয়ে দুই হাত, মুখমণ্ডল ও দুই পা মসেহ করে ফরজ নামাজ আদায় করলেন। এরপর যখন তারা পানি পেলেন, তখন তাদের একজন পুনরায় নামাজ পড়লেন, কিন্তু অপরজন আর পড়লেন না। ফেরার পর তারা রসুল সা.-কে তাদের এ অভিজ্ঞতার কথা জানালেন এবং তিনি তাদের উভয় কাজকে অনুমোদন করেন বলে জানা যায়। এভাবে এটি সুন্নাহ্ তাশরিরীয়ায় পরিণত হয়েছে।[২৬] এর আরেকটি উদাহরণ হলো, এক বিবরণে বলা হয়, বিশিষ্ট সাহাবি আমর ইবনে আল আস রা. বলেন যে, জাত আল সালাসিল অভিযানকালে রাতে তার স্বপ্নদোষ হয়। কিন্তু প্রচণ্ড শীতের কারণে তিনি গোসল করার পরিবর্তে তায়াম্মুম করে ফজরের নামাজ আদায় করেন। পরে তিনি রসুল সা.-কে এ ঘটনা জানান। রসুল সা. তার এ কথা শুনে হাসলেন, কিন্তু কিছুই বললেন না। এর অর্থ হলো, এ ধরনের পরিস্থিতিতে উল্লিখিত কাজ অনুমোদনযোগ্য। কারণ প্রচণ্ড শীতে গোসল স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।[২৭]

আমরা প্রায়ই এ ধরনের কাজ করতাম। রসুল সা.-এর জীবদ্দশাতেও তা করেছি। সাহাবিদের রা. এ ধরনের কথাও যদি রসুল সা.-এর দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যর্থ না হয় তাহলে তাও সুন্নাহ্ তাশরিরীর অংশ বলে পরিগণিত হবে। এর একটি উদাহরণ হলো, আবু সাঈদ আল খুদরীর রা. একটি বর্ণনা। তিনি বলেন, 'ঈদুল ফিতরের ফেতরা হিসেবে আমরা এক সা খেজুর বা বার্লি দিতাম।' এ বিষয়টি অজ্ঞাত কিছু ছিল না। তাই এটি সুন্নাহ্ তাশরিরীর অংশ। অবশ্য যখন কোনো সাহাবির বিবরণে অপরিচিত কোনো বিষয় উল্লেখিত হয় অথবা যখন সেই বিবরণটি ভুয়া হয় এবং রসুল সা.-এর জীবদ্দশায় বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছিল কি না তা সুস্পষ্টভাবে বলা না হলে, এ ধরনের বিবৃতিগুলো সুন্নাহ্ তাশরিরীয়ার অংশ হবে না।[২৮]

রসুল সা.-এর সমগ্র সুন্নাহ্, তার কথা, কাজ ও মৌন সম্মতিকে পুনরায় দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে। তাহলো আইন বহির্ভূত ও আইন সংক্রান্ত সুন্নাহ্।

আইন বহির্ভূত সুন্নাহ্ (সুন্নাহ্ গায়ের তাশরাইয়াহ) প্রধানত রসুল সা.-এর স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডের (আল ফায়াল আল জিবিল্লিয়াহ) সমন্বয়ে গঠিত। যেমন- তিনি কিভাবে খানা খেতেন, ঘুমাতেন, পোশাক পরতেন ইত্যাদি এবং অন্যান্য কর্মকাণ্ড নিয়ে শরিয়াহর অংশ গঠিত হয়নি। এ ধরনের কর্মকাণ্ড প্রাথমিকভাবে নবুওতি মিশনের তেমন কোনো গুরুত্ব না থাকায় সেগুলোকে নিয়ে আইনগত বিধিবিধান গঠিত হয়নি। অধিকাংশ আলেমের মতে, এসব ক্ষেত্রে রসুল সা.-এর পছন্দনীয় বা অগ্রাধিকারমূলক কাজ করা অনুমোদনযোগ্য (ইবাহা) হওয়ার আভাস পাওয়া গেছে। যেমন- তার পছন্দের রঙ, অথবা ডান কাত হয়ে শোয়া, ইত্যাদি।[২৯]

www.pathagar.com

এ ধরনের কাজের পেছনে যে কারণ দেখানো হয়েছে তা ওয়াজিব, মানদুব বা নিছক মুবাহ বলে বিবেচিত হতে পারে। প্রথম দু'টি কেবলমাত্র ইতিবাচক সাক্ষ্য-প্রমাণের সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। স্বাভাবিকভাবে ওয়াজিব ও মানদুব বিদ্যমান থাকার বিষয় প্রমাণিত না হলে তা অনুপস্থিত বলে মনে করা হয়। এ দুই শ্রেণির কোনো একটিতে রসুল সা.-এর স্বাভাবিক কাজকর্ম শরয়ী কাজকর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার মতো প্রমাণ না পাওয়া গেলে তা অপর শ্রেণি মানদুবের আওতায় পড়বে। আর এ জন্য কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণের দরকার নেই।[৩০]

অনুরূপভাবে বলা যায়, যেসব সুন্নাহ্ বিশেষায়িত বা কারিগরি জ্ঞান গঠন করে, যেমন- চিকিৎসা, বাণিজ্য ও কৃষির মতো বিষয় রসুল সা.-এর নবুওতির মূল মিশনের বহির্ভূত বলে বিবেচিত হওয়ায় এগুলো শরিয়াহর অংশ নয়। বিশেষ পরিস্থিতি যেমন- শত্রু বাহিনীকে বিভ্রান্ত করার সরঞ্জাম ও হামলা বা অবরোধ প্রত্যাহারের সময় নির্ধারণসহ রণকৌশল সংক্রান্ত বিষয়ে রসুল সা.-এর কথা ও কাজকে পরিস্থিতি বিষয়ক বলে গণ্য করা হয় এবং তা শরিয়াহর অংশ নয়।[৩১]

অনেক বিষয় রয়েছে যা রসুল সা.-এর ব্যক্তি জীবনকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। তাই তার এসব উদাহরণ সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে সাধারণ আইন গঠিত হবে না। এর উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, চারটি বিয়ের সীমার অতিরিক্ত বিয়ে, মোহরানা ছাড়া বিয়ে, রসুল সা.-এর বিধবা স্ত্রীদের পুনরায় বিয়ে করা নিষিদ্ধ ঘোষণা, অবিরত রোজা পালন (সাওম আল বিসাল) এবং খুজাইমা ইবনে সাবিতের সাক্ষ্যকে আইনগত প্রমাণ হিসেবে রসুল সা.-এর মেনে নেয়ার ঘটনা। এসব বিষয়ে শরিয়াহর বিধিবিধান কুরআনে বর্ণিত হয়েছে তাই সেগুলো সাধারণভাবে সব মুসলমানের জন্য বৈধ বিধান হয়ে আছে।[৩২] সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত হচ্ছে, কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াতের নির্দেশনা এবং রসুল সা. যে প্রক্রিয়ায় তা সম্পন্ন করেন তার ভিত্তিতে এসব বিষয়ের অবস্থান কি হবে তা নির্ধারিত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যখন কুরআনে রসুল সা.-কে 'হে রসুল বা 'হে কম্বলে আবৃত ব্যক্তি' (আল মুযাম্মিল, ৭৩ : ১, আল মুদাচ্ছির, ৭৪ : ১) বলে সম্বোধন করা হয়েছে তখন তা কেবল রসুল সা.-এর একার জন্য প্রযোজ্য হবে, যদি অন্য কোনো বিষয় বুঝানোর মতো চূড়ান্ত কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকে।[৩৩]

রসুল সা.-এর কিছু কাজ আইনগত ও আইন বহির্ভূত উভয় শ্রেণির মাঝামাঝি অবস্থানে পড়তে পারে। কারণ তাতে দুই ধরনের বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় দেখতে পাওয়া যায়। এভাবে রসুল সা.-এর কোনো কাজ সুস্পষ্টত ব্যক্তিগত বিষয় অথবা অন্যদের অনুসরণের জন্য উদাহরণ হিসেবে করা হয়েছে কি না তা নিরূপণ করা বেশ কঠিন হতে পারে। এ কথা জানা যায় যে, কখনো কখনো রসুল সা. কোনো নির্দিষ্ট পন্থায়

www.pathagar.com

কোনো কাজ করতেন, যা সমাজের প্রচলিত রীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, তিনি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য পর্যন্ত দাড়ি রাখতেন এবং মোচ ছেঁটে পরিপাট্টি করে রাখতেন। আলেমদের অধিকাংশ মনে করেন, এটি তৎকালীন জনপ্রিয় ব্যবহার রীতির নিছক অনুসরণ ছিল না বরং মুমিনদের অনুসরণের জন্য এটা দৃষ্টান্ত ছিল। অন্যরা এর বিপরীত মত পোষণ করেন। তারা বলেন, এটি ছিল আরবদের সামাজিক রীতির অংশ এবং তারা ইহুদি ও অন্যান্য অনারব সমাজের থেকে নিজেদের আলাদা করে রাখতে এরূপ করত। ওই ইহুদি ও অনারবরা দাড়ি কমাতো এবং মোচ বড় রাখতো। অন্য কথায় বর্তমানে এ ধরনের রীতি অনুসরণ মূলত ঐচ্ছিক বিষয়। অনুরূপভাবে রসুল সা. ঈদের নামাজ পড়তে এক পথ দিয়ে যেতেন এবং অন্য পথ দিয়ে ফিরে আসতেন এবং রসুল সা. অনেক সময় উটের পিঠে চড়ে হজ পালন করতেন। শাফেয়ী ফকিহগণ এ ধরনের প্রশংসনীয় কাজকে অনুমোদনযোগ্য (মানদুব) বলে বিবেচনা করেন। অন্যদিকে হানাফীগণ একে নিছক অনুমোদিত বিষয় (বা মুবাহ) বলে গণ্য করেন।[৩৪]

আইনগত সুন্নাহ্ (সুন্নাহ্ তাশরিইয়াহ) রসুল সা.-এর দৃষ্টান্তমূলক আচরণের সমন্বয়ে গঠিত। তা হতে পারে তার কাজ, কথা অথবা মৌন অনুমোদন। আইনগত সুন্নাহ্ শরিয়াহর বিধিবিধান ও নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ শ্রেণির সুন্নাহ্কে তিন ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত নবি, রাষ্ট্রপ্রধান বা ইমাম অথবা বিচারপতি হিসেবে রসুল সা. এসব সুন্নাহ্ প্রবর্তন করেছেন। আমরা নিচে পৃথকভাবে এ তিন প্রকার সুন্নাহ্ নিয়ে আলোচনা করব :

(ক) আল্লাহ তায়ালার নবি হিসেবে রসুল সা. যেসব বিধিবিধান প্রণয়ন করেন তা সার্বিকভাবে কুরআনের পরিপূরক। উপরন্তু কুরআনে উল্লেখ নেই এমন অনেক বিধিবিধানও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। এ অর্থে বলা যায়, সুন্নাহ্ হচ্ছে কুরআনের দুর্বোধ্য (মুজমাল) অংশের ব্যাখ্যা অথবা কুরআনের সাধারণ ও চূড়ান্ত বিষয়বস্তু সুনির্দিষ্টকরণ ও সীমিতকরণ। ধর্মীয় বিষয়ে বিশেষ করে ইবাদত-বন্দেগীর (ইবাদত) ক্ষেত্রে রসুল সা. যেসব নীতিমালা নির্ধারণ করেন এবং বৈধ ও অবৈধ কাজ অর্থাৎ হালাল ও হারাম সম্পর্কে তিনি যেসব বিধিবিধান অনুমোদন করেন সেগুলো হলো সাধারণ আইন (তাশরি আম) এবং এগুলো চিরন্তন; এসবের বৈধতা কোনো কাল বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। সুন্নাহ্তে যেসব আদেশ-নিষেধের কথা বলা হয়েছে তা ব্যক্তিগত অবস্থা, সামাজিক মর্যাদা বা রাজনৈতিক মত নির্বিশেষে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য পালন করা বাধ্যতামূলক। এসব আইন ও বিধিবিধান অনুযায়ী কাজ করার জন্য স্বাভাবিকভাবে কোনো ব্যক্তির ধর্মীয় নেতা বা সরকারের কাছ থেকে আগাম অনুমতি নেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।[৩৫]

www.pathagar.com

প্রশ্ন হলো, উপরে উল্লেখিত তিন প্রকার সুন্নাহ্‌র কোন্‌টি অনুযায়ী রসুল সা. কাজ করেছেন তা কিভাবে নিরূপণ করা হবে? কোনো নির্দিষ্ট ঘটনার ক্ষেত্রে এ প্রশ্নের জবাবের অনিশ্চয়তা বস্তুতপক্ষে ফকিহ্‌গণের মধ্যে আইনগত বিষয়ে মতপার্থক্যের (ইখতিলাফ) অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে রয়েছে। সার্বিকভাবে আলেমগণ কোনো কাজ বা কথার ক্ষেত্রে রসুল সা. ঠিক কোন বিষয়টির ওপর জোর বা নির্দেশনা (জিহাব) দিয়েছিলেন তা নিরূপণের চেষ্টা করেছেন। এ ধরনের অনুসন্ধানে আলোচ্য সুন্নাহ্‌টি ওয়াজিব, মানদুব বা ইবাহার শ্রেণিভুক্ত হবে অথবা নিষিদ্ধ অথবা ঘৃণ্য (কারাহা) বা অন্য কিছু বুঝাবে তার নির্দেশনা প্রদানে সহায়ক হয়েছে।

কোনো কাজের নির্দেশনার প্রমাণ উৎস থেকে জানা গেলে তার মূল্য সম্পর্কে আর কোনো সন্দেহ থাকবে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, রসুল সা. যদি কুরআনের দুর্বোধ্য সব বিধানের ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করেন তাহলে তার এই ব্যাখ্যার মান কুরআনের মূল নির্দেশনার অনুরূপ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত বলে পরিগণিত হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মত হলো, কুরআনের দুর্বোধ্য বিধান যদি বাধ্যতামূলক বা প্রশংসনীয় বলে জানা যায়, তাহলে ব্যাখ্যামূলক সুন্নাহ্‌র মূল্যও অনুরূপ হবে। উদাহরণ হলো, ফরজ নামাজ সম্পর্কে রসুল সা.-এর সব ব্যাখ্যা ও দৃষ্টান্ত ওয়াজিব এবং তিনি এর অতিরিক্ত যেসব নামাজ পড়েছেন যেমন– চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণকালের নামাজ (সালাত আল খুসুফ ওয়া আল কুসুফ) মানদুব পর্যায়ে পড়বে।[৩৬]

অন্যথায় খোদ সুন্নাহ্‌তেই কোনো নির্দিষ্ট বিধান ওয়াজিব, মানদুব বা মুবাহ হবে তার স্পষ্ট নির্দেশনা দেয়া থাকে। কোনো নির্দিষ্ট কাজের মূল্য নির্ণয়ের আরেকটি পদ্ধতি হলো– সুনির্ধারিত কাজ এবং জ্ঞাত অন্য কাজ বা বর্ণনার সাথে ইজমা করা। এ ছাড়া সুন্নাহ্‌র বিষয়বস্তুতেও তার মূল্য সম্পর্কে কোনো আভাস বা নির্দেশনা পাওয়া যেতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, নামাজের আহ্বান জানানো বা আজান এবং জামায়াতে নামাজ শুরুর ঠিক আগে কাতারবদ্ধ হওয়ায় (ইকামত) নামাজের বাধ্যতামূলক বৈশিষ্ট্যের বিষয় ফুটে উঠেছে। শরিয়াহর বিধান থেকে জানা যায়, কেবলমাত্র ফরজ নামাজের আগে আজান ও ইকামতের প্রয়োজন হয়। ফরজ নয় এমন নামাজ যেমন- ঈদের নামাজ ও ইসতিস্কার নামাজে (খরার সময় বৃষ্টির জন্য নামাজ) আজান-ইকামতের দরকার হয় না। কাজের মূল্যায়নের আরেকটি পদ্ধতি হলো, বিপরীত দিকটি অর্থাৎ অনুপস্থিতির বিষয় দেখা। আলোচ্য কাজটির প্রকৃতি যদি নিষেধের মতো হয় তাহলে তা রসুল সা. কর্তৃক অনুমোদিত না হলেও বাধ্যতামূলক বলে বিবেচনা করা হবে। উদাহরণ হলো, খৎনা করা বাধ্যতামূলক কাজ হিসেবে উন্নীত হয়েছে। যেহেতু স্পষ্ট কারণ ছাড়াই এতে যখমের সৃষ্টি হয় তাই বাধ্যতামূলক কাজে পরিণত হতে পারে না এবং এটি করা বেআইনি হবে বলে

www.pathagar.com

প্রতীয়মান হতে পারে। অন্যদিকে এর ওয়াজিব বৈশিষ্ট্য থাকায় শরিয়ত একে বৈধ করেছে। শরিয়ত নির্ধারিত সব দিকের ব্যাপারে মৌলিকভাবে এ ব্যাখ্যা প্রযোজ্য। অবশ্য নির্ধারিত শাস্তির অধিকাংশের ক্ষেত্রেই তার অবস্থা কী হবে সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট আয়াতের প্রত্যক্ষ নির্দেশনা রয়েছে। সব শেষে বলা যায়, ওয়াজিব বা মানদুব কাজের কাজা আদায় করা প্রয়োজন হতে পারে, আর এ কারণে এর মূল্যও আদায় করার (আদায়) অনুরূপ।[৩৭]

উপরোল্লিখিত শ্রেণির উদাহরণগুলোর কাজের গতি (Direction) নির্দেশনা ও মূল্য নির্ণয় করা সম্ভব। অবশ্য এ ধরনের কোনো পার্থক্য করা যদি সম্ভব না হয় তাহলে এটি কার্যকর করার পেছনে কী কারণ ছিল তা অবশ্যই খতিয়ে দেখতে হবে। রসুল সা.-এর কোনো কাজ যদি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য করা হয় তাহলে তা মানদুব শ্রেণির পর্যায়ে পড়বে, অন্যদের মতে তা ওয়াজিব। অবশ্য কোনো নির্দিষ্ট কাজের উদ্দেশ্য যদি শনাক্ত করা না যায় তাহলে তা ওয়াজিব শ্রেণিভুক্ত বলে গণ্য হবে, ভিন্ন মতে, তা হবে মানদুব। তবে বিষয়টির আরো ব্যাখ্যা ও ইজতিহাদ করার প্রয়োজন হবে।[৩৮]

(খ) ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে রসুল সা. কর্তৃক সম্পাদিত সরকারি তহবিল বরাদ্দ ও ব্যয়, সামরিক কৌশল ও যুদ্ধ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়োগ, গণিমতের মাল বণ্টন, চুক্তি স্বাক্ষর ইত্যাদির মতো বিভিন্ন কাজ থেকে সৃষ্ট সুন্নাহ্র সব বিধিবিধান হলো আইনসংক্রান্ত সুন্নাহ্। এ সুন্নাহ্ অবশ্য সাধারণ বিধান (তাশরি আম) নয়। উপযুক্ত সরকারের কাছ থেকে প্রথমে অনুমতি লাভ ছাড়া ব্যক্তির পক্ষে এ শ্রেণির সুন্নাহ্র চর্চা করা সম্ভব নয়। বস্তুতপক্ষে রসুল সা. কোন নির্দিষ্ট পন্থায় কাজ করেছেন অথবা এসব বিষয় সম্পর্কে কোনো কথা বলেছেন তা সরাসরি ব্যক্তির জন্য বাধ্যতামূলক নয় এবং বৈধ কর্তৃপক্ষের সুস্পষ্ট অনুমতি ছাড়া তারা নিজ নিজ উদ্যোগে এ বিষয়ে কাজ করার অধিকার রাখে না।[৩৯] হাদিসে এমন একটি উদাহরণ হলো :

من قتل قتيلاً فله سلبه

> যে ব্যক্তিই (যুদ্ধক্ষেত্রে) কোনো সৈন্যকে হত্যা করবে সে তার কাছে থাকা সব কিছু গ্রহণ করতে পারবে।[৪০]

এ হাদিসের সঠিক তাৎপর্যের ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তাদের একপক্ষ মনে করেন যে রসুল সা. ইমাম হিসেবে এ হাদিস উচ্চারণ করেন এবং এতে বুঝানো হয়েছে যে, ইমামের সুস্পষ্ট অনুমতি ছাড়া কেউই তার হাতে

www.pathagar.com

নিহত সৈনিকের মাল-সম্পদের মালিক হতে পারবে না। অন্য পক্ষের মতে, হাদিসটিতে সাধারণ আইন বর্ণিত হয়েছে এবং এতে ইমামের অনুমতি ছাড়াই সৈনিকটি মৃতের মাল-সম্পদের মালিক হওয়ার অধিকারী বলে গণ্য করা হয়েছে।[৪১] তৎকালীন বিরাজমান পরিস্থিতির আলোকে সাহাবিদের রা. জিহাদে অনুপ্রাণিত করতে রসুল সা. হাদিসটি উচ্চারণ করে থাকতে পারেন বলে মনে করা হয়ে থাকে। পরিস্থিতি এমন ছিল যে, এ ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। এমনও হতে পারে যে কোনো সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতির বিষয় বিবেচনা ছাড়াই সাধারণ আইনের ভিত্তি প্রদানের উদ্দেশ্যেও তিনি এ কথা বলতে পারেন। ইমাম শাফেয়ীর মতে, আলোচ্য হাদিসে শরিয়াহর একটি সাধারণ আইনের ভিত্তি প্রদান করা হয়েছে। সুন্নাহ্র আলোকে এটি একটি সাধারণ নিয়ম। রসুল সা.-এর নবুওতি মিশনের প্রধান লক্ষ্য ছিল শরিয়াহর একটি ভিত্তি প্রদান করা যদি তাতে এর বিপরীত কোনো নির্দেশনা না থাকে। তবে যে কেউই এ কথা অবশ্য মনে করবেন যে, হাদিসের উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণ আইন রচনা করা।[৪২]

(গ) বিশেষভাবে, বিচারপতি হিসেবে কোনো নির্দিষ্ট বিরোধের বিষয়ে রসুল সা.-এর হাদিস থেকে গঠিত সুন্নাহ্র সাধারণত দু'টি অংশ রয়েছে। এর একাংশে রয়েছে দাবি, সাক্ষ্য-প্রমাণ, বাস্তব তথ্যপ্রমাণ ও রায়, যা বিচারের ফলাফল হিসেবে প্রদান করা হয়। প্রথম অংশ পরিস্থিতি সম্পর্কিত এবং তাতে সাধারণ আইন গঠিত হয় না। অন্যদিকে দ্বিতীয় অংশে সাধারণ আইন গঠিত হয়েছে। অবশ্য অনুবিধি অনুযায়ী তা সরাসরি ব্যক্তির জন্য বাধ্যতামূলক নয় এবং কোন সুযোগ্য বিচারকের অনুমতির আগে কেউ এর আলোকে কাজ করতে পারবে না। স্বয়ং রসুল সা. বিচারকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাই তিনি যে বিধিবিধান প্রবর্তন করেছেন কাজীর দফতরকে অবশ্যই তা বাস্তবায়ন করতে হবে।[৪৩] তাই যখন কোন ব্যক্তি অন্যের কাছে কিছু দাবি করে কিন্তু সে তা মানতে অস্বীকার করে, সে ক্ষেত্রে দাবিদার অনুরূপ একটা বিরোধ রসুল সা. যে নির্দিষ্ট পন্থায় ফায়সালা করেছিলেন তা তার জানা থাকলেও নিজ হাতে আইন তুলে নেয়ার কোনো অধিকার লাভ করেনি। তাকে তার দাবি প্রমাণের জন্য অবশ্যই সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে এবং আদালতের রায় সংগ্রহ করতে হবে।[৪৪]

আইন সংক্রান্ত ও আইন বহির্ভূত সুন্নাহ্র মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে মুজতাহিদদের জন্য সুন্নাহ্ প্রদত্ত কোনো নির্দিষ্ট বিধানের মূল উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু নির্ণয় করা এবং তা সাধারণ আইন প্রতিষ্ঠার জন্য করা হয়েছে কি না তা স্থির করা জরুরি। রসুল সা. বিশেষ পরিস্থিতিতে কোন্ ক্ষমতাবলে কাজ করেছিলেন সে সম্পর্কে হাদিস সাহিত্যে সব সময় সুস্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। অবশ্য মুজতাহিদ

www.pathagar.com

হয়তো এর আভাস খুঁজে পেতে পারেন যা তার জন্য অনেকটা সহায়ক হয়ে থাকে। সাধারণ আইন গঠন করে যেসব সুন্নাহ্, তা থেকে আইন বহির্ভূত সুন্নাহ্ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা নিরূপণের পর্যাপ্ত তথ্য ও মানদণ্ডের অনুপস্থিতির বিষয়টি সাহাবিগণের রা. জামানা থেকেই চলে আসছে। অদ্যাবধি এ সমস্যা রয়েছে এবং প্রধানত পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবে সুন্নাহ্ অনুসরণ ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে।[৪৫]

এর আরেকটি উদাহরণ হলো– পতিত জমি পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত হাদিসের ব্যাপারে ফকিহদের মধ্যে উদ্ভূত মতপার্থক্য। হাদিসটিতে বলা হয়েছে :

من أحي أرضاً ميته فهي له

'যে ব্যক্তি পতিত জমি পুনরুদ্ধার করবে সে তার মালিক হবে'।[৪৬]

রসুল সা. নবি হিসেবে অথবা রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে এ হাদিস উচ্চারণ করেন কি না তা নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। যদি নবি হিসেবে তিনি এটি করেন তাহলে হাদিসটি একটি বাধ্যতামূলক আইন গঠন করবে। যে কেউই পতিত জমি পুনরুদ্ধার করলে সে তার মালিক হবেন এবং এজন্য ইমাম বা অন্য কারোর অনুমতি গ্রহণ করার কোনো প্রয়োজন হবে না। হাদিস প্রয়োজনীয় কর্তৃত্ব প্রদান করলে সরকারি অনুমোদন গ্রহণের দরকার হয় না। অবশ্য যদি ইমাম হিসেবে রসুল সা. হাদিসটি উচ্চারণ করেছিলেন বলে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে কেউ কোনো পতিত জমি পুনরুদ্ধার করতে চাইলে তাকে অবশ্যই তার আগেই ইমামের অনুমতি নিতে হবে। অন্য কথায় হাদিসটি নাগরিকদেরকে পতিত জমি পুনরুদ্ধারের অধিকার প্রদানের ক্ষমতা কেবলমাত্র ইমামকে প্রদান করেছে। অধিকাংশ আলেম প্রথম মতটি গ্রহণ করেছেন। তবে হানাফীগণ দ্বিতীয় মতটি গ্রহণ করেন। আবু হানিফার শিষ্য আবু ইউসুফসহ অধিকাংশ ফকিহ মনে করেন, পতিত জমি পুনরুদ্ধারের জন্য রাষ্ট্রের সম্মতি গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। তবে দৃশ্যত পরবর্তী যুগের ফকিহ ও বিশেষজ্ঞগণ পতিত জমি পুনরুদ্ধারে রাষ্ট্রের সম্মতি গ্রহণ করা প্রয়োজন সংক্রান্ত হানাফীগণের মতকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেছেন। লোকদের মধ্যে বিরোধ রোধের যুক্তির ওপর ভিত্তি করে হানাফী মতটি গড়ে উঠে। অন্যদিকে মালেকীরা মনে করেন, জমি যদি মানব বসতির কাছাকাছি হয় তাহলেই কেবল সরকারের সম্মতি গ্রহণ করার প্রয়োজন হবে এবং হাম্বলীরা মনে করেন, ওই জমি এর আগে অন্য কাউকে প্রদান করা হলেই কেবলমাত্র সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সম্মতি দরকার হবে।[৪৭]

www.pathagar.com

আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দার ঘটনা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত হাদিসের ব্যাপারেও মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। এ মহিলা রসুল সা.-এর কাছে অভিযোগ করেন যে তার স্বামী একজন কৃপণ মানুষ। একজন সচ্ছল মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তিনি তার ও তার সন্তানের ভরণপোষণের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ প্রদান করেন না। রসুল সা. তাকে এ নির্দেশ দিলেন :

خذي ما يكفيك وولدكبالمعروف

তুমি (স্বামীর সম্পত্তি থেকে) নিয়ম অনুযায়ী তোমার ও তোমার নিজের সন্তানের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ গ্রহণ কর।[৪৮]

রসুল সা. আইনের সাধারণ বিধান হিসেবে প্রণয়নের জন্য অথবা বিচারপতি হিসেবে হাদিসটি উচ্চারণ করেন সে ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। যদি ধরে নেওয়া হয় যে, কোনো নির্দিষ্ট ঘটনার ফায়সালা হিসেবে হাদিসটি উচ্চারিত হয়েছে, তাহলে তা কেবলমাত্র বিচারককে অনুরূপ নির্দেশ দানের কর্তৃত্ব প্রদান করবে। এতে দেখা যাচ্ছে, বিচারকের অনুমতি ছাড়া ঋণ গ্রহীতার সম্মতি থেকে ঋণদাতার প্রাপ্য অংশ কেটে নেওয়া হবে বেআইনি। অন্যদিকে হাদিস যদি আইনের সাধারণ বিধি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে ঋণ খেলাফির সম্পত্তি থেকে স্ত্রী অথবা ঋণদাতার অংশগ্রহণে রায়ের প্রয়োজন হবে না। এজন্য হাদিসটিই প্রয়োজনীয় কর্তৃত্ব প্রদান করেছে। কোনো সরকারি অনুমতির প্রয়োজন হলে তা কেবলমাত্র ঘোষণা বা ছাড়পত্রের পর্যায়ে পড়বে।[৪৯]

হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী ফকিহগণ মনে করেন যে, স্ত্রীর ভরণপোষণ দেয়ার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তা করতে অস্বীকার করলে স্ত্রী তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারবে এবং কাজী তার পক্ষে রায় প্রদান করবেন। এরপরও স্বামী তার কর্তব্য পূরণে ব্যর্থ হলে কাজী তার সম্পত্তি বিক্রির নির্দেশ দিতে পারেন এবং বিক্রীত সম্পত্তির অর্থ থেকে স্ত্রী তার ভরণ-পোষণের খরচ গ্রহণ করতে পারে। এমনকি স্বামী অব্যাহতভাবে এটার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করলে আদালত তাকে কারাদণ্ডও দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে স্ত্রী অবশ্য তালাক গ্রহণের অধিকারী হবে না। কারণ রসুল সা. হিন্দাকে স্বামীর সম্পত্তি থেকে তার ভরণপোষণের অর্থ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাকে তালাক চাওয়ার অধিকার মঞ্জুর করেননি। মালেকীরাও সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের সাথে একমত পোষণ করেন। তবে একমাত্র পার্থক্য হলো, তারা মনে করেন যে, স্বামীর অব্যাহতভাবে অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে স্ত্রী তালাক চাইতে পারবে। তৎসত্ত্বেও কিছু কিছু বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন- স্বামী-স্ত্রী অথবা

www.pathagar.com

উভয়ের আর্থিক অবস্থার ভিত্তিতে আদালত ভরণপোষণের খরচের পরিমাণ নির্ধারণ করে দেবে কি না। অধিকাংশের মতে, স্বামীর জীবনযাত্রার মান আদালতের রায়ের ভিত্তি হওয়া উচিত। এভাবে আলেমগণ সাধারণভাবে হাদিসটিকে রসুল সা.-এর বিচার সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের সমন্বয়ে গঠিত বলে বিবেচনা করেছেন এবং এ কারণে কেবলমাত্র বিচারক বা কাজীকে স্ত্রীর অভিযোগের ফায়সালা করা, ভরণপোষণের নানা দিক পরিমাণ নির্ধারণ ও পরিশোধের পদ্ধতি বাতলে দেয়ার কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে।[৫০]

যেসব সুন্নাহ্ সাধারণ আইন গঠন করে প্রায়ই তা সব মুসলমানের জন্য স্থায়ী ও সার্বজনীনভাবে প্রযোজ্য হওয়ার মানসম্পন্ন হয়ে থাকে। এ ধরনের সুন্নাহ্ হতে সাধারণত আদেশ-নিষেধ নির্দেশ করা হয়, যা অনুমোদন, সম্প্রসারণ অথবা পবিত্র কুরআনের সাধারণ বিধানের পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার ক্ষেত্রে কুরআনের সঙ্গে সম্পর্কিত।[৫১]

কুরআন ও সুন্নাহ্র পার্থক্য

রসুল সা.-এর জীবদ্দশায় কুরআন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লিখিতভাবে সংরক্ষণ করা হয়। ওহির মাধ্যমে যেভাবে কুরআন তার ওপর নাজিল হয়েছিল ঠিক সেভাবেই যাতে তা সংরক্ষণ করা হয় সেটা তিনি নিশ্চিত করেন। রসুল সা. সুস্পষ্টভাবে তার উদ্বেগের কথা প্রকাশ করেন যে, তার কোনো সুন্নাহ্র দ্বারা যেন কুরআনের কোনো আয়াত সন্দেহযুক্ত হয়ে না পড়ে। বস্তুতপক্ষে প্রধানত এ কারণে রসুল সা. তার নবুওয়তি মিশনের প্রথম অবস্থায় কোনো ক্ষেত্রেই সুন্নাহ্কে লিখিতভাবে সংরক্ষণ না করতে সাহাবিদের রা. উৎসাহিত করেন।[৫২] কেননা এটি করা হলে কুরআনের সঙ্গে সংশয়ের সৃষ্টির আশঙ্কা দেখা দিতে পারত। অন্যদিকে সুন্নাহ্কে সাহাবিগণ রা. সাধারণভাবে তাদের স্মৃতিতে ধারণ করে রাখেন। তারা রসুল সা.-এর শিক্ষাকে লিখিতভাবে সংরক্ষণ করেননি। কিন্তু সংশ্লিষ্ট হাদিস সাহিত্যেও এর কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়, কিছু সংখ্যক সাহাবি রসুল সা.-এর হাদিস সংগ্রহ করেছিলেন এবং সেগুলো লিখিতভাবে ব্যক্তিগতভাবে তাদের নিজেদের কাছে সংরক্ষণ করেন তবে সার্বিক বিবেচনায় দেখা যায় যে, এভাবে সুন্নাহ্ সংরক্ষণকারী সাহাবির সংখ্যা ছিল খুবই কম।

সাহাবিগণ রা. কুরআনের আয়াতের ব্যাপারে সন্দেহের উদ্রেক হলে খোদ রসুল সা.-এর মাধ্যমে যাচাই করতেন এবং তিনি প্রায় সুস্পষ্ট নির্দেশনার মাধ্যমে তা স্পষ্ট করতেন। তবে সুন্নাহ্র ক্ষেত্রে এ ধরনের যাচাইয়ের বিষয় জানা যায়নি।[৫৩]

www.pathagar.com

সমগ্র কুরআন অব্যাহত সাক্ষ্যের (তাওয়াতুর) মাধ্যমে আমাদের কাছে এসেছে। অন্যদিকে অধিকাংশ সুন্নাহ্ একক বা আহাদ বিবরণের আকারে বর্ণিত ও প্রচারিত হয়েছে। সুন্নাহ্র একটি ক্ষুদ্র অংশই মুতাওয়াতিরের মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে।

কুরআনের কোনো অংশই তত্ত্বগত বর্ণনা প্রচার অর্থাৎ খোদ বর্ণনাকারীর প্রচারিত কথা হিসেবে বর্ণিত হয়নি। কুরআনের তত্ত্ব ও কথা উভয়কে রসুল সা. যেভাবে লাভ করেছেন সেভাবে আল্লাহ তায়ালার বাণী হিসেবে সংরক্ষিত ও প্রচারিত হয়। অন্যদিকে সুন্নাহ্র অধিকাংশই বর্ণনাকারীদের কথা ও বাক্যের আকারে প্রচারিত বর্ণনার সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। এ কারণেই বিভিন্ন ব্যক্তির বর্ণিত একই বা অনুরূপ হাদিসের ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ দেখতে পাওয়া যায়। কোনো নির্দিষ্ট হাদিসের বিষয়ে এসব ব্যক্তির উপলব্ধি বা ব্যাখ্যা একই রকমের নয়।

কুরআনের ব্যাখ্যার ইখতিলাফ বা মতপার্থক্যের কিছু সুযোগ থাকতে পারে। সেই তুলনায় সুন্নাহ্র ক্ষেত্রে ইখতিলাফের সুযোগ অনেক বেশি। আলেমগণ এর ফলে আয়াত অনুধাবন/ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করে থাকেন। তবে কুরআনের বিষয়বস্তুর যথার্থতার ব্যাপারে কোনো সমস্যা নেই। তবে সুন্নাহ্র ব্যাপারে কোনো মতপার্থক্য কেবল ব্যাখ্যার বিষয়েই নয়; উপরন্তু এর যথার্থতা ও সাক্ষ্য-প্রমাণের ক্ষেত্র পর্যন্ত প্রসারিত। আমরা এ গ্রন্থে পরে এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করব।[৫৪]

সুন্নাহ্র চেয়ে কুরআনের অগ্রাধিকার

সুন্নাহ্ হচ্ছে শরিয়াহর দ্বিতীয় উৎস, কুরআনের পরই এর স্থান। তাই মুজতাহিদকে অবশ্যই কুরআন ও সুন্নাহ্র মধ্যকার একটি অগ্রাধিকার ক্রম মেনে চলতে হয়। তাই কোনো নির্দিষ্ট সমস্যার সমাধান পেতে ফকিহ কুরআনের কোনো নির্দেশনা পেতে ব্যর্থ হওয়ার পরই কেবল সুন্নাহ্তে তা অনুসন্ধান করেন। কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত পাওয়া গেলে অবশ্যই তা অনুসরণ করতে হবে এবং কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে সুন্নাহ্র এমন যে কোনো নির্দেশনার চেয়ে কুরআনকে অবশ্যই অগ্রাধিকার দিতে হবে। সুন্নাহ্র চেয়ে কুরআনকে অগ্রাধিকার দেয়া হয় অংশত এ কারণে যে, কুরআন হচ্ছে সুস্পষ্ট ওহি (ওহি জাহির)। অন্যদিকে সুন্নাহ্ হচ্ছে প্রধানত অভ্যন্তরীণ ওহি (ওহি বাতিল) এবং তা বহুলাংশে বর্ণনাকারীদের কথার আকারেই প্রচারিত হয়েছে। এ অগ্রাধিকার ক্রম অনুসরণের আরেকটি কারণ হলো এর যথার্থতার প্রশ্ন সম্পর্কিত। কুরআনের যথার্থতার ব্যাপারে কোনোরূপ সংশয়ের অবকাশ নেই। অন্য কথায় যথার্থতার বিচারে কুরআন কাতয়ী বা চূড়ান্ত। তাই সুন্নাহ্র যথার্থতার ক্ষেত্রে সুন্নাহ্র অন্তত যে অংশটুকু ধারণামূলক (যন্নী) তার চেয়ে

www.pathagar.com

কুরআনকে অবশ্যই অগ্রাধিকার দিতে হবে। কুরআন ও সুন্নাহ্র মধ্যে এ অগ্রাধিকার ক্রম প্রতিষ্ঠার তৃতীয় কারণটি হলো, সুন্নাহ্ হলো কুরআনের ব্যাখ্যা।[৫৫] সূত্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা বা তাফসিরের অবস্থান হচ্ছে দ্বিতীয়। উপরন্তু কুরআন ও হাদিসের অগ্রাধিকারের বিষয়টি মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. বর্ণিত একটি হাদিসে সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইতোমধ্যে হাদিসটি উদ্ধৃত করা হয়েছে। এ হাদিসের অন্তর্নিহিত অর্থ উমর ইবনে খাত্তাবও রা. গ্রহণ করেন এবং তার দু'জন বিচারক শুয়াইব ইবনে হারিস রা. ও আবু মূসা আল আশয়ারিকে রা. লেখা চিঠিতে তা অবহিত করেন। তিনি এ চিঠিতে তাদেরকে নির্দেশ দেন যে, কোনো সমস্যা নিরসনে তারা যেন প্রথমে কুরআনের নির্দেশনা অনুসরণ করে এবং কুরআনে কোনো নির্দেশনা না পেলেই কেবল তখনই তারা যেন সুন্নাহ্র অনুসরণ করে।[৫৬]

হানাফীগণের ফরজ ও ওয়াজিবের মধ্যে পার্থক্যের বিষয়ে এই অগ্রাধিকার ক্রমের বাস্তব প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। কুরআনের অকাট্য নির্দেশনার ভিত্তিতে ফরজ এবং সহিহ সুন্নাহ্র নির্দেশনার আলোকে ওয়াজিব গঠিত হয়েছে। একে একমাত্র দুর্বল বলে বিবেচনার কারণ হলো, এর প্রচার ও বিষয়বস্তুর যথার্থতা সম্পর্কে সম্ভাব্য সংশয়ের অবকাশ রয়েছে। কুরআন কর্তৃক সুন্নাহ্ বাতিল বা মানছুখ হতে পারে মর্মে আলেমদের সাধারণ মতৈক্যের ব্যাপারে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এসব বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে।[৫৭]

নীতিগতভাবে কুরআন ও সহিহ হাদিসের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। যদি কোনো ধরনের বিরোধ রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় সে ক্ষেত্রে অবশ্যই যতদূর সম্ভব একটা সমন্বয় করতে হবে এবং উভয়কে বহাল রাখতে হবে। যদি তা করা সম্ভব না হয়, তাহলে আলোচ্য সুন্নাহ্টির যথার্থতা সন্দেহমূলক হবে এবং কুরআনকে বহাল রাখতে হবে। মুতাওয়াতির হাদিস ও কুরআনের মধ্যে কোনোরূপ বিরোধ আছে বলে জানা যায়নি। কুরআন ও সুন্নাহ্র মধ্যে বিরোধের সব ক'টি উদাহরণই দেখতে পাওয়া যায় একক বা আহাদ হাদিসে। যে কোনো ক্ষেত্রে এর যথার্থতা সন্দেহজনক এবং কুরআনের কর্তৃত্বকে খর্ব করার কোনো ক্ষমতা এর নেই।[৫৮]

অবশ্য এমন মতও প্রকাশ করা হয়ে থাকে যে, কুরআনের ক্ষেত্রে সুন্নাহ্ মৌলিক ভূমিকা পালন করে। তাই এ ধরনের অগ্রাধিকার ক্রম প্রতিষ্ঠা তার পরিপন্থী ও অস্বাভাবিক। জনপ্রিয় আরবি শব্দগুচ্ছ, 'আল সুন্নাহ্ আল কাদাইয়া আলা আল কিতাব (সুন্নাহ্ কুরআনের ব্যাখ্যা)' থেকে জানা যায় যে, স্বাভাবিকভাবে সুন্নাহ্ কুরআনের ব্যাখ্য, কুরআন সুন্নাহ্র ব্যাখ্যা নয়। বস্তুতপক্ষে সুন্নাহ্ কুরআন আসলে ঠিক কী বুঝাচ্ছে তার ব্যাখ্যা ও সঠিক অর্থ নির্ধারণ করে। তাই দেখা যাচ্ছে, সুন্নাহ্

www.pathagar.com

কুরআনের ওপর যতখানি নির্ভরশীল কুরআন সুন্নাহ্র ওপর তার চেয়ে বেশি নির্ভরশীল।[৫৯] উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যখন কুরআনের কোনো আয়াতের একাধিক অর্থ বোঝায় অথবা যখন কোনো সাধারণ বিষয় প্রকাশ পায় সে ক্ষেত্রে সুন্নাহ্ তার সঠিক অর্থ সুনির্দিষ্টভাবে নির্দেশ করে যা অবশ্যই অধিকতর প্রতিপালিত হয়। আবার কুরআনের প্রকাশ্য (জাহির) বিষয় হাদিসের সাহায্যে মনছুখ হতে পারে। ঠিক যেমনভাবে সুন্নাহ্ কুরআনের সুনির্দিষ্ট (মুতলাক) পর্যায়ে উন্নীত হয়ে থাকে। অন্যদিকে কুরআন সুন্নাহ্র ক্ষেত্রে অনুরূপ ভূমিকা পালন করে না। সুন্নাহ্র ব্যাখ্যা প্রদান বা সুস্পষ্ট করা কুরআনের ঘোষিত উদ্দেশ্য নয়। কারণ এটি রসুল সা. নিজেই করেছেন। যেহেতু সুন্নাহ্ কুরআনের তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা সুনির্দিষ্টকরণ ও নির্ধারণ করে, সেহেতু সুন্নাহ্কে অবশ্যই কুরআনের চেয়ে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এটি যদি স্বীকার করে নেয়া হয়, তাহলে কুরআন ও সুন্নাহ্র মধ্যে ব্যত্যয়ে দেখা দিলে সে ক্ষেত্রে অবশ্যই সুন্নাহ্র অনুকূলে সমাধান পেশ করতে হবে। কোনো কোনো আলেম মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. বর্ণিত হাদিস যাতে হাদিসের চেয়ে কুরআনকে অগ্রাধিকার প্রদানের বিষয়টি সুস্পষ্ট ভাষায় নিশ্চিত করা হয়েছে সে সম্পর্কে এমন মতও প্রকাশ করেন যে, হাদিসটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ কারণ তাতে কুরআনের সব কিছুকেই যে সুন্নাহ্র চেয়ে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।[৬০]

আরেকটি কারণ হলো, মুতাওয়াতির হাদিস হলো কুরআনের সমমানের। অনুরূপভাবে কুরআনের সুস্পষ্ট (জাহির) বিষয় একক বা আহাদ হাদিসের মতো ব্যাখ্যা ও ইজতিহাদের জন্য উন্মুক্ত, আর এ দৃষ্টিতে উভয় কমবেশী সমপর্যায়ের। উপরন্তু অধিকাংশ আলেমের মতে, কুরআনের কোনো বিধান বাস্তবায়নের আগে অবশ্যই সুন্নাহ্র সাহায্য গ্রহণ করতে হবে এবং এটি নির্ণয় করতে হবে যে আলোচ্য বিধান সম্পর্কে কোনো কিছু বলা হয়নি অথবা ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি, যার ফলে কুরআনের আয়াত স্বতঃপ্রমাণিত।[৬১]

সুন্নাহ্ হচ্ছে কুরআনের ব্যাখ্যা, এ বিষয়টির ওপর জোরাল ঘোষণার জবাবে আল শাতিবীর বক্তব্য উল্লেখ করা যায়। যাতে তিনি বলেছেন, কুরআনের অনুকূলে অগ্রাধিকারক্রমে অযাচিত হস্তক্ষেপ করার কোনো দরকার নেই। যেসব ক্ষেত্রে সুন্নাহ্ কুরআনের সাধারণ অথবা অকাট্য বিষয়কে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করেছে সে ক্ষেত্রে সুন্নাহ্ কার্যত কুরআনের ব্যাখ্যা ও অর্থ প্রকাশ করেছে। সুন্নাহ্র অনুকরণে কুরআন মুনছুখ হয়েছে এমন কোনো দৃষ্টান্ত নেই। উপরের উদ্ধৃতি কাদিয়া (ব্যাখ্যা) শব্দটির অর্থ হলো মুবাইয়্যীনা (ব্যাখ্যামূলক) এবং এতে কুরআনের চেয়ে সুন্নাহ্র ওপর অগ্রাধিকার দেয়ার বিষয় বুঝানো হয়নি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, চুরির শাস্তি ও জাকাত ফরজ হওয়া সম্পর্কিত কুরআনের বিধিবিধান সুন্নাহ্র দ্বারা সুস্পষ্ট করা

www.pathagar.com

হয়েছে। তাই কেবল এ কথা বলাই যথার্থ যে, উভয় ক্ষেত্রে সুন্নাহ্ কুরআনের সাধারণ বিধানকে সম্প্রসারিত করেছে এবং এ কথা বলাও সঠিক হবে না যে, সুন্নাহ্ নতুন কিছু প্রবর্তন করেছে অথবা তা কুরআনের কোনো বিধানকে রহিত করার চেষ্টা করেছে। যখন কোনো ব্যাখ্যাদাতা আমাদের কাছে কোনো বিশেষ আইনগত ধারার ব্যাখ্যা প্রদান করে তখন যে আইনের এ ধারাটির কথা বর্ণিত হয়েছে তার উল্লেখ ছাড়াই আমরা তার কথা অনুযায়ী কাজ করেছি, এ কথা বলা সঠিক হবে না।[৬২]

উপরন্তু খোদ কুরআনেই তার সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সুন্নাহ্‌র ব্যাখ্যামূলক ভূমিকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। রসুল সা.-কে উদ্দেশ্য করে (সুরা আল নাহলে, ১৬ : ৪৪) বলা হয়েছে : 'আর এমন জিকর তোমার প্রতি নাজিল করেছি যেন তুমি লোকদের সামনে সেই শিক্ষাধারার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে থাকো।' এ আয়াত ও অনুরূপ অন্যান্য আয়াত থেকে এ সঠিক উপসংহারে উপনীত হওয়া যায় যে, সুন্নাহ্ কুরআনের ব্যাখ্যামূলক হওয়ায় তা এর অধীন।[৬৩]

সুন্নাহ্ কি স্বাধীন উৎস?

সুন্নাহ্ কুরআনের নিছক সম্পূরক না নিজস্ব ক্ষমতাবলে একটি উৎস? এ প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব পেতে হলে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র সম্পর্কের বিষয়ে নিম্নোক্ত তিনটি দিক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন।

প্রথমত, সুন্নাহ্‌তে বিভিন্ন বিধিবিধান থাকতে পারে- যেগুলো নিছক কুরআনের যথার্থতা প্রতিপন্ন করা ও তার কথারই পুনরুক্তি করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান কুরআনে সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং সুন্নাহ্ তাকে কেবলমাত্র সমর্থন করেছে। প্রশ্ন হচ্ছে সুন্নাহ্‌কে কি স্বতন্ত্র উৎস বলা যাবে। মৌলিকভাবে প্রশ্নটি অপ্রয়োজনীয়। যেসব বিষয়ের ব্যাপারে সুন্নাহ্ স্রেফ কুরআনের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছে সে ক্ষেত্রে সুন্নাহ্ অবশ্যই কোনো স্বতন্ত্র উৎস নয়। বস্তুতপক্ষে সুন্নাহ্‌র একটা উল্লেখযোগ্য অংশ এ প্রকৃতির ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভ এবং পিতা-মাতার অধিকার, অন্যের সম্পত্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মতো সব হাদিস এবং খুন, চুরি ও মিথ্যা সাক্ষ্যদান ইত্যাদির দণ্ড সম্পর্কিত হাদিসও মূলত এসব বিষয়ে কুরআনের নীতিকেই দৃঢ় সমর্থন জানিয়েছে।[৬৪] এ ব্যাপারে আরো সুস্পষ্ট করতে নিম্নোক্ত হাদিসটি তুলে ধরা যায় :

لا يحلّ مال امريء مسلم ال ابتيب عن نفسه

> 'কোনো মুসলমানের সুস্পষ্ট অনুমতি ছাড়া তার সম্পত্তি গ্রহণ করা অবৈধ'।[৬৫]

www.pathagar.com

এ হাদিসে নিছক কুরআনের আয়াতকে সমর্থন করা হয়েছে, যাতে মুসলমানদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে : 'তোমরা পরস্পরের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ে ফেল না, লেনদেন হতে হবে পারস্পরিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতেই' (সুরা নিসা, ৪ : ২৯)। এ বিধানের উৎপত্তি হয়েছে কুরআন থেকে, হাদিসের সমর্থনে বিষয়টি পূর্ণনিশ্চিত হয়েছে। তাই এ কথা বলার কোনো সুযোগ নেই যে, সুন্নাহ্ নিজ অধিকার বলে স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব গঠন করেছে।

দ্বিতীয়ত, সুন্নাহ্তে কুরআনের বাণীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও সুস্পষ্ট করা হয়েছে। সুন্নাহ্ কুরআনের অস্পষ্ট (মুজমাল) আয়াতের অর্থ স্পষ্ট করে এর নিরঙ্কুশ বিবৃতি বর্ণনা বা কুরআনের সাধারণ বিষয়কে সুনির্দিষ্ট করতে পারে। কুরআনের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সুন্নাহ্ বার বার এ যথার্থ ভূমিকাই পালন করেছে- সুন্নাহ্ই কুরআনের ব্যাখ্যা করেছে। সুন্নাহ্র একটি বৃহৎ উল্লেখযোগ্য অংশ এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, এ ধরনের সুন্নাহ্র মাধ্যমে সালাত, জাকাত, হজ, সুদ ইত্যাদি বিষয়ে কুরআনের বাণীর আইনই (শরয়ী) অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। আরেকটি উদাহরণ হলো, বিক্রয় চুক্তির ক্ষেত্রে কুরআনে কেবল এটুকু বলা হয়েছে, 'ব্যবসায়কে হালাল করা হয়েছে, আর সুদকে হারাম করা হয়েছে।' এ সাধারণ মূলনীতিকে পরে সুন্নাহ্তে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে যাতে শর্তাবলি, প্রকারভেদ এবং যেসব বেচাকেনা সুন্নাহ্র মধ্যে পড়তে পারে তা সহ ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে শরিয়াহ্র বিস্তারিত বিধিবিধান প্রকাশ পেয়েছে। কোন খাদ্যদ্রব্য হালাল এবং কোন্গুলো হারাম সে সম্পর্কিত কুরআনের বিধানও অনুরূপ। কুরআনে কেবল সাধারণ নীতি বিবৃত হয়েছে এবং সুন্নাহ্তে এর বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া গেছে।[৬৬]

অসিয়ত বা উইল সম্পর্কিত বিষয়ে কুরআনে অসিয়তের মৌলিক বৈধতার বিষয় বর্ণিত হয়েছে এবং উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টনের আগেই অসিয়তের বিধান অবশ্যই কার্যকর করতে হবে (সুরা নিসা, ৪ : ১২)। অতিরিক্ত বিধিবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে কুরআনের সাধারণ নীতির যথাযথ বাস্তবায়নের পথ প্রশস্ত করে সুন্নাহ্ এসব মূলনীতির উৎকর্ষ সাধন করেছে।[৬৭]

উপরোল্লিখিত দুই শ্রেণির সুন্নাহ্র সমন্বয়ে সুন্নাহ্র বৃহত্তম অংশ গঠিত হয়েছে এবং আলেমগণ একমত যে, এ দুই শ্রেণির সুন্নাহ্ কুরআনের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট হয়ে এর সাথে যৌক্তিক অবস্থার সৃষ্টি করেছে। এদেরকে একে অন্যের থেকে পৃথক করা অথবা স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনা করা সম্ভব নয়। যেমন- সুন্নাহ্ ইবাদত-বন্দেগী, চুরির শাস্তি, হজ, জাকাত আদায় ও অসিয়ত সংক্রান্ত বিষয়ে কুরআনের সাধারণ বিধিবিধান সুনির্দিষ্ট ও ব্যাখ্যা করে যেগুলো কেবলমাত্র খোদায়ী

www.pathagar.com

অনুপ্রেরণার (ইলহাম) মাধ্যমে এসেছে এবং এ কারণে এগুলোকে কেবল যৌক্তিকতা বা ইজতিহাদের মাধ্যমে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।[৬৮]

তৃতীয়ত, যেসব বিষয়ে কুরআনের নির্দেশনা নেই সেসব বিষয়ে বিধিবিধান সুন্নাহ্তে থাকতে পারে, সে ক্ষেত্রে উল্লেখিত বিষয়ে বিধিবিধান সুন্নাহ্ থেকেই প্রণীত হয়। এ শ্রেণির সুন্নাহ্কে বলা হয়, আল সুন্নাহ্ আল মুয়াসসিসাহ বা 'প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহ্'। এ সুন্নাহ্তে কুরআনের সমর্থন বা বিরোধিতা প্রকাশ পায়নি এবং এর বিষয়বস্তু আল কিতাবে দেখা যায় না। সুন্নাহ্ আইনের কোনো স্বতন্ত্র উৎস কি না সে ব্যাপারে বিতর্কের প্রাণকেন্দ্র হলো এ শ্রেণির সুন্নাহ্। এর কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। স্ত্রীর ফুফু ও খালাকে একই সাথে বিয়ে করা সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা; এদের বিয়ে করাকে হারাম বলে উল্লেখ করা হয়। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তির অংশ পাওয়ায় দাদীর অধিকার, রজমের অসিয়ত অর্থাৎ যেনার অপরাধে বিবাহিত মুসলমানকে পাথর মেরে হত্যা করা, এসব বিধান সুন্নাহ্ থেকে গৃহীত হয়েছে। কারণ কুরআনে এসব বিষয়ে কোনো নির্দেশনা নেই।[৬৯] সুন্নাহ্ অথবা এ সর্বশেষ শ্রেণির সুন্নাহ্ কোনো মানদণ্ডে শরিয়াহর স্বতন্ত্র উৎস গঠন করে কি না তা নিয়ে ফকিহদের মধ্যে কিছু কিছু মতপার্থক্য রয়েছে। আল শাতিবী ও আল শাওকানীসহ পরবর্তী যুগের কিছু আলেম (মুতাখখিরুন) এ মত পোষণ করেন যে, সুন্নাহ্ একটি স্বতন্ত্র উৎস।[৭০] তারা আরো মনে করেন যে, (সুরা আন নাহলের ১৬ : ৪৪), উপরে উল্লেখিত চূড়ান্ত কথা নয়। ওই আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় রসুল সা.-কে কুরআনের ব্যাখ্যাদাতা বলে উল্লেখ করা সত্ত্বেও সুন্নাহ্র স্বাধীন উৎস হওয়ার স্বীকৃতির বিষয় এতে খারিজ করে দেয়া হয়নি। অপরদিকে তারা আরো যুক্তি দেন যে, সুন্নাহ্র স্বাধীন মর্যাদার সপক্ষে কুরআনে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কুরআনের একাধিক স্থানে 'আল্লাহ তায়ালা ও তার রসুলের সা. আনুগত্য করাকে' (সুরা নিসা, ৪ : ৫৮, ৮০ ও ৯২) ইমানের জন্য অপরিহার্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুতপক্ষে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের পরই সুস্পষ্টভাবে রসুল সা.-এর আনুগত্যের বিষয়টি থেকে এ উপসংহারে পৌঁছা যায় যে, রসুল সা.-এর আনুগত্যের অর্থ কুরআনে অনুল্লেখিত বিষয়ে তিনি যা আদেশ বা নিষেধ করেন তাও মেনে চলা। যদি রসুল সা.-এর আনুগত্যের উদ্দেশ্য হলো তিনি যখন কুরআনের ব্যাখ্যা করেন কেবল তখন তাকে মেনে চলা বুঝাতো, তাহলে কেবল 'আল্লাহ্ তায়ালার আনুগত্য কর' বলাই যথেষ্ট ছিল, 'রসুলের সা. আনুগত্য কর' এ শব্দগুচ্ছ যোগ করার কোনো দরকার হতো না।[৭১]

কুরআনের অন্যত্র কোনো ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণের পরীক্ষা হিসেবে সর্বান্তকরণে রসুল সা.-এর কাছে আত্মসমর্পণ ও তার আনুগত করার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ

www.pathagar.com

করা হয়েছে। এ কথাই বলা হয়েছে নিম্নোক্ত কুরআনের আয়াতে : 'না, হে মুহাম্মদ, তোমার খোদার নামে শপথ, এরা কিছুতেই ইমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না তারা তাদের পারস্পরিক মতভেদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারপতিরূপে মেনে নেবে। অতঃপর তুমি যে ফায়সালাই করে দেবে সে সম্পর্কে তারা নিজেদের মনে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করবে না, বরং তার সামনে নিজেদের সম্পূর্ণরূপে সোপর্দ করে দেবে' (সুরা নিসা, ৪ : ৬৫)। বস্তুতপক্ষে সুন্নাহ্র স্বতন্ত্র মর্যাদার প্রস্তাব করা মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. বর্ণিত হাদিসটিও তাদের যুক্তির সপক্ষে উত্থাপন করে থাকেন। হাদিসটিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কুরআনে কোনো নির্দেশনা পাওয়া না গেলে সে ক্ষেত্রে সুন্নাহ্কেই অনুসরণ করতে হবে। অন্য কথায় কুরআনের সমর্থন থাকুক বা না থাকুক সুন্নাহ্ স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল।[৭২]

অবশ্য সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে, সব প্রকার সুন্নাহ্, এমনকি যখন তা কোনো মূল আইন প্রণয়ন করে বা ব্যাখ্যামূলক সবই কুরআনের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত।[৭৩] এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ীর অভিমতে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের দৃষ্টিভঙ্গিই প্রতিফলিত হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী তার গ্রন্থ রিসালায় এ সম্পর্কে লিখেছেন :

আলেমদের কেউ রসুল সা.-এর তিন প্রকার সুন্নাহ্র মূলনীতির বিরোধিতা করেছেন বলে আমার জানা নেই। প্রথম প্রকার সুন্নাহ্তে আল্লাহ তায়ালার নাজিল করা কিতাবের বিধিবিধানের অনুরূপ নির্দেশনা রয়েছে। দ্বিতীয় প্রকার সুন্নাহ্তে কুরআনের সাধারণ নীতিমালার ব্যাখ্যা প্রদান এবং আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট করা হয়েছে। তৃতীয় প্রকারের সুন্নাহ্তে আল্লাহ তায়ালার রসুল সা. বিভিন্ন বিষয়ে বিধিবিধান প্রদান করেছেন, আল্লাহ্ তায়ালার কিতাবে এসব বিষয়ে কোনো নির্দেশনা পাওয়া যায়নি। প্রথম দুই প্রকার সুন্নাহ্ কুরআনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। তবে তৃতীয় প্রকারের হাদিসের ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।[৭৪]

ইমাম শাফেয়ী কুরআনের সাথে সুন্নাহ্র সম্পর্কের বিষয়ে আলেমদের উত্থাপিত মতগুলোর আরো ব্যাখ্যা করেন। এর একটির প্রতি ইমাম শাফেয়ী তার দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করেন। তাতে বলা হয়, আল্লাহ রসুল সা.-এর প্রতি সুস্পষ্ট আনুগত্য করাকে ফরজ (অবশ্যকরণীয় বিষয়) হিসেবে নির্দেশ করেছেন। আল্লাহর নবি হিসেবে রসুল সা. অনেক বিধিবিধান প্রবর্তন করেন যার কিছু কুরআনে নির্দেশিত হয়েছে এবং অন্যগুলো কুরআনে নেই। তবে রসুল সা. প্রবর্তিত সব বিধিবিধানই খোদায়ী নির্দেশনায় গঠিত। সুন্নাহ্ ও কুরআনের এ উৎস একই এবং এর সব কিছুকেই অবশ্যই সমুন্নত রাখতে ও মেনে চলতে হবে। অন্যরা এ মত পোষণ করেন যে,

www.pathagar.com

বস্তুতপক্ষে নবুওতি মিশনের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁর রসুল সা.-কে পছন্দ করেছেন যা সুন্নাহ্র কর্তৃত্ব প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। কারণ রসুল সা. সুন্নাহ্র মাধ্যমেই তার খোদায়ী মিশন পূর্ণ করেন। অন্য আরেকটি মতে বলা হয়েছে, কুরআনে মূল নির্দেশনা পাওয়া যায় না এমন কোনো সুন্নাহ্ নেই। এ মত অনুযায়ী বলা হয় যে, এমনকি নামাজের বিষয়বস্তু, জাকাতের পরিমাণ এবং হালাল ও হারাম খাদ্য ও ব্যবসায়-বাণিজ্য সংক্রান্ত সুন্নাহ্ হচ্ছে কুরআনের সাধারণ নীতিমালার সম্প্রসারণ।[৭৫]

আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায়, হালাল ও হারাম খাদ্য সম্পর্কে যেসব হাদিসে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে তাতে বলা হয়েছে, সজীব ও স্বাস্থ্যকর খাবারই হচ্ছে হালাল এবং নোংরা ও অপরিষ্কার খাবার হচ্ছে হারাম, যা (সুরা আরাফ. ৭ : ১৫৭) এ বর্ণিত আল্লাহ্ তায়ালার ঘোষণার সম্প্রসারণ মাত্র।[৭৬]

অধিকাংশের মতে, সুন্নাহ্ ও কুরআনের প্রায় পূর্ণ অভিন্নতা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে এবং এ ক্ষেত্রে রসুল সা.-এর বিধবা স্ত্রী আয়েশার রা. একটি বিবরণও তুলে ধরা হয়ে থাকে। আয়েশা রা. রসুল সা.-এর চরিত্র সম্পর্কিত কুরআনের বিশেষণ 'ওয়া ইন্নাকা আলা খুলুকিন আজিম' (তুমি নৈতিকতার অত্যুচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত, (সুরা কলম, ৬৮ : ৪) সম্পর্কে ব্যাখ্যাকালে ওই বিবরণ দেন। আয়েশার রা. বরাত দিয়ে বলা হয়, তিনি বলেন, তার (রসুল সা.-এর) চরিত্র হলো কুরআন। এ ক্ষেত্রে খুলুকের অর্থ হচ্ছে, রসুল সা.-এর আচার-আচরণ, কাজ, কথা এবং যা কিছু তিনি অনুমোদন করেন তার সব কিছুই। এভাবে এ উপসংহার টানা যায় যে, সুন্নাহ্কে কুরআন থেকে পৃথক করা যায় না।[৭৭]

উপরন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে, কুরআন ও সুন্নাহ্র সাধারণ উদ্দেশ্যের মধ্যে অভিন্নতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়েছে : সুন্নাহ্ ও কুরআন সর্বসম্মতিক্রমে তিনটি উদ্দেশ্য সাধনে বিধিমালা প্রদান করেছে, তা হলো- জরুরি বিষয় (জরুরিয়াত), আনুষঙ্গিক প্রয়োজন পূরণ (হাজিয়াত) ও সৌন্দর্য বর্ধন (তাহসিনিয়াত)।[৭৮]

তাই যুক্তি দেখানো যেতে পারে যে, সুন্নাহ্তে যখন কোনো নতুন বিষয়ের অবতারণা করা হয় তখন তা কুরআন কর্তৃক বৈধ বলে উল্লেখিত উদ্দেশ্যের কোনো একটির কার্য সম্পাদিত হবে। এভাবে কুরআন ও সুন্নাহ্র মধ্যে মূল প্রতিপাদ্য ও বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে পরিচয়ের স্থানান্তর ঘটে থাকে তবে মূল উদ্দেশ্য ও চেতনা উভয়ের ক্ষেত্রে অভিন্ন থাকে।[৭৯]

সর্বশেষে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম এ কথা বলেন যে, সুন্নাহ্র কতিপয় নির্দেশনা কুরআনের কিয়াসের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। এর উদাহরণ হলো, কুরআনে

www.pathagar.com

একসাথে দুই বোনকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আর নিচে উল্লেখিত হাদিসে (পৃষ্ঠা-৭১) স্ত্রীর খালা-ফুফুকে একই সাথে বিয়ে করাকে হারাম করা হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রে একই ধরনের ক্ষতিকর কারণ (ইল্লত) ওপর ভিত্তি করে এটি করা হয়েছে; আর তাহলো, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্পর্ক (কাত আল আরহাম) ছিন্নের বিষয় পরিহার করা। সংক্ষেপে বলা যায়, সুন্নাহ্ কুরআনের সম্পূরক ছাড়া কিছু নয়। বরং কুরআন উপলব্ধির ক্ষেত্রে অনেক বিস্তৃত এবং এতে সমগ্র শরিয়াহর ব্যাপকভিত্তিক রূপরেখার পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা রয়েছে।[৮০]

উপসংহারে এ কথা বলা যায়, আইনের একটি উৎস হিসেবে এবং কুরআনের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সুন্নাহ্র প্রধান ভূমিকার প্রশ্নে উভয়পক্ষ সুন্নাহ্র কর্তৃত্বের ব্যাপারে পুরোপুরি একমত। উভয়পক্ষ এ কথা স্বীকার করে যে, কুরআনে পাওয়া যায় না এমন অনেক বিষয়ের বিধিবিধান সুন্নাহ্তে রয়েছে।[৮১]

তাদের মধ্যে মতপার্থক্যের বিষয়টি দৃশ্যত বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে নয় বরং ব্যাখ্যার বিষয়ে। রসুল সা.-এর আনুগত্য করা এবং তাকে কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার দায়িত্ব প্রদান সংক্রান্ত কুরআনের আয়াতগুলো বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যার জন্য উন্মুক্ত রয়েছে। সুন্নাহ্ কুরআনের সম্পূরক এবং স্বতন্ত্র উৎস এ দুই মতের সমর্থনে উভয়পক্ষ এসব আয়াত উপস্থাপন করে থাকে। উভয় মতের মূলকথা হলো, রসুল সা.-এর কর্তৃত্ব এবং তার সুন্নাহ্র অনুসরণ। একই সাথে উভয় পক্ষ স্বীকার করছে যে, সুন্নাহ্তে কুরআনের অতিরিক্ত অনেক আইনকানুন রয়েছে। এসব বিষয় স্বীকৃত হওয়ার পর অন্য বিষয়ে মতপার্থক্য অনেকটা অনাবশ্যক হয়ে পড়েছে। সুন্নাহ্ একটি স্বাধীন উৎস এ যুক্তি প্রদর্শন করে আর কী অর্জন করা সম্ভব? দুই মতের অনুসারীরা সম্ভবত এ প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়েই কার্যত তাদের মতপার্থক্যের অবসান ঘটিয়েছে। যেহেতু কুরআনে বহু প্রমাণ রয়েছে যাতে বলা হয়েছে, রসুল সা. কুরআনের যে ব্যাখ্যা করেছেন তার কথা অবশ্যই প্রতিপালিত হবে। তাই মৌলিক ঐক্যের উভয় দিকের মধ্যে তাত্ত্বিক বিরোধের কোনো প্রয়োজন নেই। যৌক্তিকতার বিরোধে না জড়িয়ে উভয় মতকে গ্রহণ করা যেতে পারে। দুই মতকে পরস্পরবিরোধী নয় বরং পরস্পরের যৌক্তিক সম্প্রসারণ বলে গণ্য করা উচিত।

বিকৃতি ও জালিয়াতি

হাদিস সাহিত্যের ব্যাপক জালিয়াতি হওয়ার ঘটনার ব্যাপারে কোনো বিতর্ক নেই। হাদিস বিশারদ আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত এবং অনেকে এতদূর পর্যন্ত বলেছেন যে, হাদিসের মতো ইসলামি বিজ্ঞানের আর কোনো শাখায় এতটা জালিয়াতির

www.pathagar.com

ঘটনা ঘটেনি। প্রখ্যাত আলেমদের লেখা গ্রন্থে এ বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। 'আল মাওয়াদুয়াত' বা 'জাল হাদিস' শিরোনামে এসব গ্রন্থে হাদিসের ব্যাপক জালিয়াতির ঘটনা ও সাক্ষ্য-প্রমাণ তুলে ধরা হয়েছে।[৮২]

হাদিসে জালিয়াতির ঐতিহাসিক উৎপত্তির সময় নির্ধারণের প্রশ্নে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে। অনেক পর্যবেক্ষক উসমান রা.-এর খেলাফতের সময়কে এর উৎপত্তির সময় বলে মনে করেন এবং অন্যদের ধারণা- এর কিছু সময় পরে ৪০ হিজরির দিকে জালিয়াতির সূত্রপাত হয়। সে সময় চতুর্থ খলিফা আলী রা. ও মুয়াবিয়ার রা. মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধ সামরিক সংঘাতে রূপ নেয় এবং মুসলমানরা বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তৃতীয় আরেকটি মতে, হাদিস জালিয়াতির ঘটনা আরো আগের। প্রথম খলিফা আবু বকরের রা. আমলে জাকাত প্রদানে অস্বীকারকারী মুরতাদদের (রিদ্দা) বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার সময় এ জালিয়াতি শুরু হয়। তবে ৪০ হিজরিতে হাদিস জালিয়াতির সূচনাকাল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ সে সময় মুসলিম উম্মাহর মধ্যে অনিরসনযোগ্য মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়। এর ফলে খারেজি ও শিয়া মতবাদের অভ্যুদয় ঘটে। সেই থেকে মুসলমানরা বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং তখন তারা তাদের নিজ নিজ দাবির সমর্থনে কুরআন-সুন্নাহ্‌কে ব্যবহার করতে শুরু করলে তাদের এ বৈরিতা ধর্মীয় মাত্রা লাভ করে। যখন কোনো বিভ্রান্ত মহল তাদের মতের সমর্থনে নির্ভরযোগ্য সূত্রে সমর্থন পেতে ব্যর্থ হয়, তখন তারা সুন্নাহ্‌র বিকৃত ব্যাখ্যা প্রদান অথবা সরাসরি জালিয়াতির আশ্রয় গ্রহণ করে।[৮৩]

রসুল সা.-এর নামে জাল হাদিসকে দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে : (১) সুপরিকল্পিত জালিয়াতি, একে সচরাচর হাদিসে মাওদু বলা হয়, (২) অনিচ্ছাকৃত জালিয়াতি, একে বলা হয় হাদিসে বাতিল। প্রধানত, ভুলত্রুটি থাকা ও বর্ণনার ক্ষেত্রে অসতর্কতার কারণে এ জালিয়াতির ঘটনা ঘটে থাকে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতা কেবলমাত্র সাহাবি রা. বা তাবেয়ী পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে বলে জানা যায়। কিন্তু বর্ণনাকারী এর পরিবর্তে একে সরাসরি রসুল সা. পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেন। ফলাফল একই, পরিকল্পিতভাবে বা অন্য যে কোনোভাবেই জালিয়াতি করা হোক না কেন, সবক্ষেত্রেই তা পরিত্যক্ত হবে।[৮৪] আমরা এ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সুপরিকল্পিতভাবে হাদিস জালিয়াতির বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।

ব্যক্তিভক্তি প্রচার সাহিত্যে (ফাজায়িল আল আশখাস) পটভূমিতে প্রাথমিক জালিয়াতির ঘটনা ঘটে বলে ধারণা করা হয়। এর লক্ষ্য হলো, নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের গুণকীর্তন (বা দুর্নাম) করার জন্য অতিরঞ্জিত দাবি করা। সুন্নিদের মতে, এ প্রেক্ষাপটে প্রাথমিক জালিয়াতির ঘটনা ঘটায় শিয়ারা। গাদিরে

www.pathagar.com

কুম বর্ণিত একটি হাদিসে এ জালিয়াতির বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। তাতে রসুল সা.-এর বরাত দিয়ে বলা হয়, 'আলী আমার ভাই, নির্বাহক ও উত্তরাধিকারী, তার কথা শুনবে এবং তার আনুগত্য করবে।' রসুল সা.-এর নামে অনুরূপ আরেকটি বিবরণ হলো, 'তোমাদের মধ্যে যে কেউ জ্ঞানের জন্য আদমের, দয়ার জন্য নূহের, সৌজন্য-ভদ্রতার জন্য ইব্রাহিমের, সপ্রতাপ উপস্থিতির জন্য মুসার ও ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি নিষ্ঠার জন্য ঈসাকে স্মরণ করতে চায় তাকে আলীর স্মরণ করা উচিত'।[৮৫]

মুয়াবিয়াকে রা. নিন্দা জানিয়ে অনেকগুলো জাল হাদিস রয়েছে। এমন একটি হাদিসের উদাহরণ হলো, রসুল সা.-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, তিনি মুসলমানদের এ আদেশ দিয়েছেন 'তোমরা যখন মুয়াবিয়াকে আমার মিম্বরের ওপর দেখবে তখন তাকে হত্যা করবে।' অন্যদিকে মুয়াবিয়া ও উমাইয়া শাসকগোষ্ঠীর অন্ধ সমর্থকরাও হাদিস জাল করেছে বলে জানা গেছে। যেমন- 'নির্ভরযোগ্য হলো তিনজন। আমি, জিব্রাইল ও মুয়াবিয়া'।[৮৬]

খারেজিরা সার্বিকভাবে হাদিস জাল করার বিষয় পরিহার করেন। প্রধানত : তাদের বিশ্বাসের কারণে তারা এমনটি করেছে, যাতে বলা হয়েছে, বড় ধরনের গোনাহগাররা আর মুসলমান থাকতে পারে না। তারা হাদিস জাল করাকে এ দৃষ্টিতে দেখেন এবং নীতিগত ও মতাদর্শের শর্তের কারণে হাদিস জাল করার বিষয় পরিহার করেছেন।[৮৭]

জানাদিকা (বহু বচন, জিনদিক) নামে পরিচিত মুনাফিকদের একটি উপদল ইসলামের প্রতি বিদ্বেষের কারণে হাদিস জাল করে যাতে তাদের অনুসারীদের চোখে ইসলামের দুর্নাম রটনা করা যায়। এ ধরনের জালিয়াতির উদাহরণ হলো: 'বেগুন সব রোগ নিরাময় করে।' 'নূরানী চেহারার লোকের দিকে তাকিয়ে থাকা এক ধরনের ইবাদত।' জানা যায় যে, কুখ্যাত হাদিস জালকারীদের একজন আবদুল করীম বিন আবু আল মাউজা মৃত্যুদণ্ডের ঠিক আগে স্বীকার করে যে, সে নিজে চার হাজার হাদিস জাল করেছে যাতে হালালকে হারাম হিসেবে এবং হারামকে হালাল হিসেবে দেখানো হয়েছে। আরো জানা গেছে যে, জানাদিকারা মোট ১৪ হাজার হাদিস জাল করেছিল।[৮৮]

এ বিবরণ বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে অথবা নাও হতে পারে। এ ধরনের বিবরণের সত্যতার ব্যাপারে সন্দেহ করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। এমনকি জালিয়াতির বিষয় হলেও হালাল ও হারাম সম্বন্ধে এত বিপুলসংখ্যক হাদিস তৈরি করা চাট্টিখানি কথা নয়। প্রধানত, তাদের ধ্বংসাত্মক মূল্যবোধের বিষয়টি তুলে ধরার জন্যই কি সংখ্যাকে এমন অতিরঞ্জিত করে তুলে উদ্ধৃত করা হয়েছে?

www.pathagar.com

হাদিস জাল করার আরেকটি প্রেক্ষাপট হলো জাতিগত, গোত্রীয় ও ভাষাগত উগ্রবাদ। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, 'আল্লাহ্ যখন রাগান্বিত হলেন তখন তিনি আরবিতে ওহি নাজিল করেন কিন্তু তিনি যখন শান্ত থাকেন তখন এ জন্য ফারসি পছন্দ করেন।' উগ্রবাদী আরবরাও অনুরূপ উগ্র স্বদেশিকতার প্রকাশ ঘটিয়ে দাবি করে, যখনই আল্লাহ রেগে যেতেন তখন তিনি ফারসিতে ওহি নাজিল করতেন। কিন্তু শান্ত অবস্থায় আরবিতে কথা বলতেন'।[৮৯] এসব জাল হাদিস ছাড়াও কোনো কোনো বিশেষ গোত্র, নগরী ও সময়কে অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে তুলে ধরার চেষ্টার অংশ হিসেবে গুণগান সম্বলিত জাল হাদিসগুলোও হাদিস বিশারদ আলেমগণ পৃথক করে আল মাওয়াদুয়াত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[৯০]

জালকারীদের মধ্যে পেশাজীবী, গাল্পিক ও প্রচারকেরাও (আল রুসসাস ওয়াল ওয়াইযুন) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তারা দর্শক-শ্রোতাদের মধ্যে আবেগ-উচ্ছ্বাস সৃষ্টির জন্য জালিয়াতির পন্থা অবলম্বন করে। তারা নিজেরাই গল্প ফেঁদে তাকে রসুল সা.-এর বলে চালিয়ে দেয়। জানা যায়, একজন গাল্পিক আহমদ ইবনে হাম্বল ও ইয়াহিয়া ইবনে মাঈনের উপস্থিতিতে এক মসজিদে একটি বিবরণকে হাদিস বলে উল্লেখ করে। এতে বলা হয়, 'যে কেউই এ কথা বলবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই, আল্লাহ্ তাকে প্রতি শব্দ উচ্চারণের জন্য বেহেশতে একটি করে পাখি উপহার দেবেন যার ঠোঁট হবে স্বর্ণের এবং পালকগুলো মুক্তার।' তার বক্তব্য শেষ হলে আহমদ ইবনে হাম্বল ও ইয়াহিয়া ইবনে মাঈন তাকে চ্যালেঞ্জ করে বলেন যে, তারা কখনো এ ধরনের বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো হাদিস দেখতে পাননি।[৯১]

আইনগত ও ধর্মীয় মতপার্থক্যে হাদিস জালিয়াতির আরেকটি দিক গঠিত হয়েছে। রসুল সা.-এর নামে নিম্নোক্ত বিবৃতিতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। 'নামাজ আদায়ের সময় যেই দু'হাত তুলবে তার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে।' আরেকটি বিবৃতিতে আমরা দেখতে পেয়েছি : 'যে এ কথা বলবে যে, কুরআন হচ্ছে আল্লাহ্ তায়ালার সৃষ্ট বক্তব্য সে কাফেরে পরিণত হবে... এবং তৎক্ষণাৎ তার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে।'

আরেক শ্রেণির জাল হাদিসের সাথে ব্যক্তির ধর্মীয় উদ্দীপনা, ইসলামের প্রতি অতিভক্তি তাদেরকে অসতর্কভাবে রসুল সা.-এর প্রতি হাদিস আরোপনের পথে ধাবিত করে। জনৈক নূহ ইবনে আবু মারিয়াম কর্তৃক কুরআনের বিভিন্ন সুরার গুণ বর্ণনায় হাদিস জালিয়াতির পন্থা অবলম্বনে এই বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। পরে সে তার এ কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা (তওবা) করে এবং এর ব্যাখ্যা দিয়ে বলে যে, লোকেরা কুরআন থেকে সরে গিয়ে আবু হানিফার ফিকাহ ও মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের যুদ্ধের কাহিনীর প্রতি ঝুঁকে পড়ছে দেখতে পাওয়ার পর থেকে সে এ

www.pathagar.com

জালিয়াতির পন্থা অবলম্বন করে। সংশ্লিষ্ট সাহিত্যে বাগদাদের গোলাম খলিল ও ইবনে আবি আয়াশসহ এ ধরনের আরো বহু লোকের নাম রয়েছে, যারা একদিকে ধর্মগুরু অন্যদিকে হাদিস জালকারী হিসেবে পরিচিত ছিল। তারা খোদার প্রশংসার বাণী (আজকার ওয়া আওরাদ) ও অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগীর বিষয়েও হাদিস জাল করেছিল।[৯২]

বিস্তারিত বিবরণ প্রদান ছাড়াই অন্য যেসব বিষয়ে হাদিস জালিয়াতির ঘটনা ঘটেছে, তার মধ্যে রয়েছে দরবারে সভাসদদের কোনো কোনো সদস্য কর্তৃত্বপূর্ণ শাসকদের মোসাহেবী ও প্রশংসার জন্য প্রচলিত হাদিসের বিকৃতি সাধন। অনুরূপভাবে কোনো কোনো খাদ্যদ্রব্য, পানীয়, পোশাক-আশাক ও প্রচলিত প্রথাকে অনুমোদন অথবা তার গুণ বর্ণনার জন্য কোনো কোনো ব্যক্তি হাদিসকে অতিরঞ্জিতভাবে বা ইচ্ছাকৃতভাবে পরিবর্তন করে উপস্থাপন করে।[৯৩]

শ্রেণি বিভাগ ও মূল্য : ২

বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতার অবিচ্ছিন্নতা ও পরিপূর্ণতার দৃষ্টিতে হাদিসকে পুনরায় দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। তাহলো, অবিচ্ছিন্ন (মুত্তাসিল) হাদিস ও বিচ্ছিন্ন (গায়ের মুত্তাসিল) হাদিস। মুত্তাসিল হাদিস হচ্ছে এমন হাদিস যার বর্ণনাকারীদের ক্রম পরিপূর্ণ অর্থাৎ সর্বশেষ ব্যক্তি থেকে রসুল সা. পর্যন্ত সনদ অবিচ্ছিন্ন। বিচ্ছিন্ন হাদিস মুরসাল হাদিস নামেও পরিচিত। এ হাদিসের বর্ণনাকারীদের ক্রম বিচ্ছিন্ন ও অসম্পূর্ণ। সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম মুত্তাসিল হাদিসকে আবার প্রধান দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। তা হলো, মুতাওয়াতির ও আহাদ। এর সাথে হানাফীগণ একে মধ্যবর্তী একটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। তা হলো, বহুল পরিচিত বা মাশহুর হাদিস।

১. অবিচ্ছিন্ন হাদিস

ক. মুতাওয়াতির

আক্ষরিক অর্থে মুতাওয়াতির মানে 'অবিচ্ছিন্নভাবে ঘটনার পুনরাবৃত্তি।' বর্তমান প্রেক্ষাপটে এর অর্থ হলো, এটি এমন হাদিস যার সাথে অনির্দিষ্ট সংখ্যক বর্ণনাকারী এমনভাবে সংশ্লিষ্ট যে তাদের পক্ষে একটি মিথ্যার ওপর একমত হওয়া কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। তাদের সংখ্যা এত অধিক ও বিভিন্ন স্থানে বসবাস এবং তাদের নির্ভরযোগ্যতার কারণে এ ধরনের সম্ভাবনার বিষয় একেবারেই কল্পনা করা যায় না।[৯৪] কোনো হাদিসের বিষয়বস্তু যদি বিষয়বস্তুর যৌক্তিকতার মতো কোনো কারণে অথবা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের বিষয় হওয়ার ওপর ভিত্তি করে বিশ্বাস করা হয়,

www.pathagar.com

তাহলে তাকে মুতাওয়াতির বলা যাবে না।[৯৫] নিম্নের শর্তগুলো পূরণ হলেই কেবল কোনো হাদিস মুতাওয়াতির শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে :

ক. প্রত্যেক জমানা ও প্রজন্মে বর্ণনাকারীদের সংখ্যা অবশ্যই এতটা অধিক হতে হবে যাতে তাদের পক্ষে কোনো মিথ্যা প্রচার করা কোনোক্রমেই সম্ভব হবে না। কোনো যুগে বর্ণনাকারীদের সংখ্যা নির্ভরযোগ্য পর্যায়ের চেয়ে কম হলে তাদের বিবরণ ইতিবাচক জ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে না। অতএব, তা মুতাওয়াতির নয়।[৯৬]

অনেক আলেম সর্বনিম্ন সংখ্যা সুনির্দিষ্ট করার চেষ্টা করেছেন, যা সর্বনিম্নে চার থেকে উর্ধ্বে ২০, ৪০, ৭০ বা শত শত। এসব সংখ্যা কিয়াসের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়েছে। আইনগত সাক্ষ্য-প্রমাণ গঠনের জন্য চারজন সাক্ষীর প্রয়োজন হয়। এ বিষয়টির ওপর ভিত্তি করেই চারজনের শর্তারোপ করা হয়েছে। পরবর্তী সংখ্যা ২০ নির্ধারণ করা হয় কুরআনে (সুরা আনফাল, ৮ : ৬৫) ওপর কিয়াসের মাধ্যমে। এ আয়াতে বলা হয়েছে, 'তোমাদের মধ্যে ২০ জন লোক যদি ধৈর্যশীল হয় তাহলে তারা দু'শ জনের ওপর বিজয়ী হবে। পরবর্তী সংখ্যা ৭০ও কুরআনের আয়াতের কিয়াসের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, 'অতঃপর সে (মুসা) নিজ জাতির মধ্য থেকে ৭০ জনকে বাছাই করে নিলো যেন তারা আমাদের নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হয়' (সুরা আরাফ, ৭ : ৬৫)। অন্যরা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের থেকে কিয়াসের মাধ্যমে এ সংখ্যা নির্ধারণ করেন। অবশ্য আলেমদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মতামতের প্রতিফলন ঘটেছে আল গাজ্জালীর এ অভিমতে, যাতে তিনি বলেন, এসব কিয়াসের কোনোটিই যুক্তিনির্ভর নয় তাই এর কোনো গুরুত্ব নেই। নিশ্চয়তার জন্য সংখ্যার প্রশ্নটি জরুরি নয়, এমনকি বর্ণনাকারীর সংখ্যা খুব বেশি না হলেও যথার্থতা প্রতিপন্নের জন্য অকাট্য সাক্ষ্য প্রমাণ এবং বর্ণনাকারীদের জ্ঞান ও বিশ্বাসযোগ্যতা থাকলে তা অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য হবে।[৯৭] এভাবে যুক্তিসঙ্গত সংখ্যক লোক কোনো বিষয় বর্ণনা করলে এবং যদি অন্যান্য দলিলের দ্বারা তা সমর্থিত হয়, তাহলে তাদের এ বিবরণ ইতিবাচক জ্ঞান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।[৯৮]

খ. বর্ণনাকারীদের বিবরণ অবশ্যই ইন্দ্রীয় উপলব্ধির ভিত্তিতে হতে হবে। যদি বিপুলসংখ্যক লোক মহাজগত সৃষ্টি করা হয়েছে বললেও তাদের এ বিবরণ মুতাওয়াতির হবে না। এ বিবরণ অবশ্যই সুনির্দিষ্ট জ্ঞানের ভিত্তিতে হতে হবে, নিছক ধারণামূলক হওয়া চলবে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়,

www.pathagar.com

ইসলামাবাদের লোকেরা আমাদেরকে একটি লোক সম্পর্কে জানিয়েছে, তাদের ধারণা লোকটি জায়েদ অথবা তারা একটি পাখি দিয়েছে, তাদের ধারণা, সেটি একটি কবুতর। এ দু'টি বিবরণের কোনোটি সুনিশ্চিত নয়।[৯৯]

গ. অনেক আলেম এ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বর্ণনাকারীদের অবশ্যই সৎ মানুষ ('উদুল) হতে হবে। যার অর্থ হলো, তারা অবশ্যই না কাফের না বড় গোনাহগার (কুফফার ওয়া ফুসাক)। অবশ্য এ ব্যাপারে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, এসব শর্তের কোনো প্রয়োজন নেই। মুতাওয়াতির হওয়ার জন্য যে জিনিসটা প্রয়োজন তা হলো, নিশ্চিত হওয়া এবং অমুসলিম, ফাসেক, এমনকি বুঝবান শিশু, যাদের বয়স সাত থেকে পনের বছরের মধ্যে, তাদের কাছ থেকেও হাদিস গ্রহণ করা যেতে পারে। অবশ্য একক হাদিসের ক্ষেত্রে অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। নিম্নে পরে এ নিয়ে আলোচনা করা হবে।[১০০]

ঘ. বর্ণনাকারীগণ তাদের উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে পক্ষপাতদুষ্ট নন এবং তারা কোনো রাজনৈতিক বা গোষ্ঠীগত আন্দোলনে পরস্পরের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না এবং বর্ণনাটির উৎপত্তি থেকে শেষ পর্যন্ত এসব শর্ত অবশ্যই পূরণ করতে হবে।[১০১]

মুতাওয়াতিরের মূল্য (হুকম) কতটুকু? সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে, মুতাওয়াতির হাদিসের মান কুরআনের সমতুল্য। সার্বজনীন অবিচ্ছিন্ন সাক্ষ্যে (তাওয়াতুর) এমন নিশ্চয়তা (ইয়াকিন) ও জ্ঞান বুঝায়, যা ইন্দ্রিয় উপলব্ধির মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানের সমতুল্য। বলা হয়ে থাকে, অধিকাংশ মানুষ যেমন তাদের ইন্দ্রিয় উপলব্ধির মাধ্যমে তাদের সন্তানদের চেনে, তেমনিভাবে তারা মুতাওয়াতির বিবরণের মাধ্যমে তাদের পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে জানে। অনুরূপভাবে বাগদাদ যে কয়েক শতাব্দী ধরে খেলাফতের কেন্দ্র ছিল, সে কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না, যদিও এ ব্যাপারে তাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাব রয়েছে। যখন বিপুলসংখ্যক হাদিস বর্ণনাকারীর বিবরণ অভিন্ন হয় কিন্তু শব্দ প্রয়োগ বা রূপের মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয় সে ক্ষেত্রে কেবল অভিন্ন অর্থকে মুতাওয়াতির বলে বিবেচনা করা হবে। একে বলা হয়, মুতাওয়াতির বিল মানা অথবা উপলব্ধিগত মুতাওয়াতির। হাদিসে এ ধরনের অসংখ্য মুতাওয়াতির হাদিসের উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়। এভাবে ফরজ নামাজ, হজের আনুষ্ঠানিকতা, রোজা পালন, জাকাতের পরিমাণ, হত্যার বদলা গ্রহণের (কিসাস) বিধিবিধান, হুদুদ বাস্তবায়ন ইত্যাদি সম্পর্কিত সব কাউলিও ফিলি হাদিস উপলব্ধিগত মুতাওয়াতির। বিপুলসংখ্যক সাহাবি রা. এসব বিষয়ে রসুল সা.-এর কথা ও কাজ প্রত্যক্ষ করেছেন এবং সব যুগে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ কর্তৃক তা প্রচারিত হয়েছে।[১০২] আরেক শ্রেণির মুতাওয়াতির হাদিস রয়েছে, যা উপলব্ধিগত

www.pathagar.com

মুতাওয়াতিরের তুলনায় কদাচিত ঘটেছে; একে বলা হয় মুতাওয়াতির বিল লাফজ বা মৌখিক মুতাওয়াতির। এ ধরনের মুতাওয়াতিরের সব বিবরণ অবশ্যই অভিন্ন হতে হবে, অর্থাৎ রসুল সা. যেভাবে তা উচ্চারণ করেন এ হাদিসের শব্দ বিন্যাস হুবহু সে রকমই হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা নিম্নোক্ত হাদিসটি উল্লেখ করা যায় :

من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده

من النّار

'যে সুপরিকল্পিতভাবে আমার সম্পর্কে মিথ্যা বলবে তাকে অবশ্যই দোযখ বাসের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে'।[১০৩] কাউলি বা মৌখিক মুতাওয়াতিরের সঠিক সংখ্যা সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে বলা হয় যে, এর সংখ্যা ১০টি হাদিসের বেশি নয়।[১০৪]

খ. মাশহুর (সুপরিচিত) হাদিস

মাশহুর হাদিস হচ্ছে এমন ধরনের হাদিস, যা মূলত রসুল সা. বা একজন সাহাবির রা. কাছ থেকে অন্য একজন, দুইজন বা ততোধিক সাহাবি রা. বর্ণনা করেন। পরে তা সুপরিচিতি লাভ করে এবং অনির্ধারিতসংখ্যক ব্যক্তি তা প্রচার করে। রসুল সা.-এর ওফাতের পর প্রথম বা দ্বিতীয় প্রজন্মের সময়ের মধ্যেই এই বিবরণ প্রচার হতে হবে, এরপর নয়। এর অর্থ হলো সাহাবি রা. অথবা তাবেয়ীদের জমানায় এ হাদিস সুপরিচিত ছিল। এ কারণে যুক্তি দেখানো হয় যে, এ সময়ে সব হাদিস সুপরিচিতি লাভ করে, তাই সাধারণ হাদিস থেকে মাশহুর হাদিসকে পার্থক্য করার কোনো কারণ নেই।[১০৫]

আবু হানিফা ও তার শিষ্যদের মতে, মাশহুর হাদিসে ইতিবাচক জ্ঞানের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। তবে তা মুতাওয়াতিরের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম নিশ্চয়তা বিধান করে এবং অধিকাংশ হানাফী আলেম মাশহুর হাদিসকে বিচ্ছিন্ন হাদিসের শ্রেণিভুক্ত বলে গণ্য করেন। আর এ কারণে তাকে কেবলমাত্র ধারণামূলক জ্ঞান বলে বিবেচনা করা হয়। হানাফীদের মতে, মাশহুর হাদিসের ওপর আমল করা বাধ্যতামূলক, কিন্তু তা অস্বীকার করলে কুফরি না।[১০৬]

বস্তুতপক্ষে মুতাওয়াতির ও মাশহুর হাদিসের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হচ্ছে মুতাওয়াতির হাদিসের প্রতিটি সনদে বহুসংখ্যক বর্ণনাকারী ধারাবাহিকভাবে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত, অন্যদিকে মাশহুর হাদিসের প্রথম সংযোগ কেবলমাত্র এক বা দু'জন সাহাবির রা. দ্বারা গঠিত। বর্ণনাকারীদের সনদের অবশিষ্ট সংযোগের ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

মুতাওয়াতির ও মাশহুর হাদিসের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মাশহুর হাদিস হলো এমন হাদিস যা রসুল সা.-এর থেকে একজন বিশিষ্ট সাহাবি রা. বর্ণনা করেন, এরপর তার থেকে এত বিপুলসংখ্যক বর্ণনাকারী তা প্রচার করেন যে, তাদের পক্ষে মিথ্যা হওয়ার ব্যাপারে একমত হওয়া সম্ভব ছিল না।[১০৭]

হানাফীদের মতে, মাশহুর হাদিস কুরআনের 'সাধারণ' পর্যায়ে উত্তীর্ণ হতে পারে। কুরআনের দ্বারা নির্দিষ্ট হয়েছে এমন ধরনের দু'টি হাদিস নিম্নে বর্ণিত হলো :

لا يرث القاتل

> 'খুনির কোনো ওয়ারিশ থাকবে না।' এ মাশহুর হাদিসটি কুরআনের (সুরা নিসার ৪ : ১১) উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সাধারণ বিধানের দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

অনুরূপ আরেকটি মাশহুর হাদিসে বলা হয়েছে :

لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها

> 'কোনো মহিলাকে একই সাথে তার ফুফু ও খালার সঙ্গে বিয়ে করা যাবে না।' এ হাদিসটি বিবাহ সংক্রান্ত কুরআনের সাধারণ বিধানের দ্বারা নির্দিষ্ট হয়েছে। এই আয়াতে যাদের বিয়ে করা নিষিদ্ধ তাদের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। 'এ নিষেধাজ্ঞার বাইরে বিয়ে করা তোমাদের জন্য বৈধ' (সুরা নিসা, ৪ : ২৪)।[১০৮]

আয়াতে যাদের বিয়ে করা নিষিদ্ধ তাদের প্রদত্ত তালিকায় স্ত্রীর ফুফু ও খালার কথা উল্লেখ নেই। হাদিসে এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।

গ. আহাদ (একক হাদিস)

আহাদ বা একক হাদিস (খবর আল ওয়াহিদ নামেও পরিচিত) হচ্ছে এমন হাদিস যা রসুল সা.-এর কাছ থেকে কোনো একব্যক্তি অথবা পরস্পর বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী একে খবর আল খাসাব বলে উল্লেখ করেছেন। রসুল সা.-এর কাছ থেকে এক, দুই বা ততোধিক ব্যক্তি কর্তৃক বর্ণিত প্রতিটি খবর যা মুতাওয়াতির বা মাশহুরের শর্তাবলি পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে, তা বুঝাতে এ পরিভাষাটি প্রয়োগ করা হয়।[১০৯] এটি এমন হাদিস যা নিজেই ইতিবাচক জ্ঞানের অংশ হয় না, যদি না তা বাইরের বা পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য-প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত হয়। এটি হলো সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত। তবে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও অন্যরা

www.pathagar.com

মনে করেন, আহাদ হাদিস ইতিবাচক জ্ঞান বুঝাতে পারে।[১১০] অনেক আলেম তাদের এ মতকে প্রত্যাখ্যান করেছেন সাক্ষ্য সংক্রান্ত দলিলের ওপর কিয়াসের ভিত্তিতে। তাতে বলা হয়েছে, এক ব্যক্তির সাক্ষ্য আইনের প্রমাণ হিসেবে গৃহীত হয় না। যারা আহাদ হাদিসের কর্তৃত্বকে বিনা বাক্যে মেনে নিয়েছেন তাদের মধ্যে জাহিরি মতবাদের অনুসারীগণও রয়েছেন। যারা আহাদ হাদিসের এখতিয়ারকে বিনা বাক্যে মেনে নিয়েছেন তাদের অভিমত হচ্ছে, রসুল সা. যখন কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের নির্দেশনা দিতে চাইতেন তখন তিনি মদিনার নাগরিকদের সেখানে উপস্থিত হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাতেন না। অবশ্য সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহগণ একমত যে, আহাদ হাদিস আইনের বিধান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে যদি তা কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর সঙ্গে সম্পর্কিত হয় এবং খবরের বিষয়বস্তু যদি যুক্তির পরিপন্থী না হয়।[১১১] অনেক আলেম মনে করেন যে, আহাদ হাদিস ধারণামূলক জ্ঞান এবং এর ওপর আমল করা কেবল অধিকতর পছন্দনীয় কাজ। আহাদ হাদিসের পক্ষে সমর্থনসূচক সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া গেলে অথবা এর বিষয়বস্তুর বিপরীত কিছু পাওয়া না গেলে, এর ওপর আমল করা হবে বাধ্যতামূলক।[১১২] তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম মনে করেন, বিশ্বাসের ভিত্তি (আকিদাহ) হিসেবে আহাদ হাদিসের ওপর নির্ভর করা যাবে না। বিশ্বাসের বিষয়গুলো অবশ্যই নিশ্চয়তার ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে যদিও কোনো কোনো সময় অনুমান (যন্নী) অধিকতর পছন্দনীয় মনে হতে পারে।[১১৩] কুরআনে বলা হয়েছে : 'ধারণা-অনুমান দৃঢ়প্রত্যয়ের বিপরীতে কোনো কাজই দিতে পারে না' (সুরা নাজম, ৫৩ : ২৮)। আহাদ হাদিস যদি অনুমানের ভিত্তিতে হয়, তাহলে তা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে না।

চারটি সুন্নি মাজহাবের সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের মতে, আহাদ হাদিস ইতিবাচক জ্ঞানে উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হলেও তার ওপর আমল করা বাধ্যতামূলক। এভাবে ব্যবহারিক আইনগত বিষয়ে একটি অধিকতর পছন্দনীয় যন্নী আমলের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতার ভিত্তি হওয়ার জন্য যথেষ্ট। কেবলমাত্র বিশ্বাসের বিষয়ের ক্ষেত্রে অনুমান 'দৃঢ়প্রত্যয়ের বিপরীতে কোনো কাজেই আসতে পারে না।[১১৪] এ কথা বলার পর বলা যায়, নিম্নের শর্তাবলি পূরণ করলেই কেবল আহাদ হাদিস বাধ্যবাধকতার ভিত্তি হিসেবে পরিগণিত হতে পারে :

ক. বর্ণনাকারীকে একজন যোগ্য ব্যক্তি হতে হবে। এর অর্থ হলো কোনো শিশু বা যে কোনো বয়সের হোক না কেন, মানসিক বিকারগ্রস্ত লোকের বর্ণনা করা খবর গ্রহণযোগ্য হবে না। নারী, অন্ধ ব্যক্তি ও দাসরা হাদিস বর্ণনার যোগ্য বলে বিবেচিত; তবে শারীরিক অক্ষমতার কারণে কেবলমাত্র সাক্ষী হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের কিছু সমস্যা রয়েছে।[১১৫]

www.pathagar.com

খ. আহাদ হাদিস বর্ণনাকারীকে অবশ্যই একজন মুসলমান হতে হবে; এর অর্থ হলো, কোনো অমুসলমানের বিবরণ গ্রহণযোগ্য হবে না। বর্ণনাকারীকে হাদিসটি বর্ণনার সময় অবশ্যই এ শর্ত পূরণ করতে হবে। তবে সে যখন এ তথ্য লাভ করে তখন এটি পূরণ তার জন্য জরুরি নয়। এ ধরনের হাদিসের উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়, যেমন- সাহাবিগণ রা. রসুল সা.-এর এমন কাজের বিবরণ দিয়েছেন যা তারা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে করতে দেখেছিলেন।[১১৬]

গ. হাদিস বর্ণনার সময় বর্ণনাকারীকে অবশ্যই একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি (আদল) হতে হবে। এ শর্ত পূরণের জন্য ন্যূনতম শর্ত হলো যে বর্ণনাকারী ব্যক্তি বড় ধরনের গোনাহের কাজ করেননি এবং অনবরতভাবে ছোটখাটো গোনাহের কাজও করেননি এবং তিনি লোকজনের চলাচলের রাস্তায় বসে খাওয়া, খারাপ বলে পরিচিত লোকদের সাথে সম্পর্ক রাখা এবং অবমাননাকর কৌতুক করার মতো ধর্মের প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ কাজে জড়িত নন বলে পরিচিত হতে হবে। আলেমগণ বর্ণনাকারীর সচ্চরিত্রের লোক (আদালা) হওয়ার ব্যাপারে একমত হলেও এর দ্বারা সুনির্দিষ্টভাবে ঠিক কি বুঝাচ্ছে, সে ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। হানাফীদের মতে, যে মুসলমান গোনাহগার (ফাসিক) নয় তাকেই সৎ ও ন্যায়পরায়ণ বলে গণ্য করা হবে। শাফেয়ীগণ আরো সুনির্দিষ্ট করে বলেছেন, এই ব্যক্তি কবিরা (বড়) ছগিরা (ছোট) গোনাহ পরিহার করে চলবেন এবং মুবাহাতকে অবজ্ঞা করবেন। মালেকী ফকিহ ইবনে আল হাজিব 'আদালাহকে খোদাভীরুতা, ধর্মীয় কর্তব্য পালন এবং সদাচরণের প্রকাশ বলে উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া আদালাহর সংজ্ঞা এবং তাদের ছোট ও বড় গোনাহের মধ্যে পার্থক্যের বিষয়েও আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।[১১৭]

ইতিবাচক প্রমাণের মাধ্যমে অবশ্যই বর্ণনাকারীর 'আদালাহ' অজ্ঞাত থাকলে তার বিবরণ গ্রহণযোগ্য হবে না। অনুরূপভাবে অজ্ঞাত ব্যক্তির (রিওয়াইয়া আল মাজহুল) বিবরণ, যখন বর্ণনাকারীদের বর্ণনা পরম্পরায় একাংশে বলা হয়, 'একব্যক্তি' এ বিষয়ে জানিয়েছেন, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। বিভিন্ন পন্থায় বর্ণনাকারীর 'আদালাহ প্রতিষ্ঠা করতে হবে, এর মধ্যে রয়েছে, তাজকিয়া, অর্থাৎ সে যে সৎ অন্তত একজন সৎমানুষ তা নিশ্চিত করেন অথবা যখন জানা যায় যে, বর্ণনাকারীকে আদালতে সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল অথবা কোনো ফকিহ বা বিদ্বান ব্যক্তি তার বিবরণের ওপর নির্ভর

www.pathagar.com

করেছিলেন অথবা তদানুযায়ী কাজ করেছিলেন। তবে ফকিহ্ তার পক্ষ থেকে নিছক অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বনের ইচ্ছার মতো অতিরিক্ত কারণ হেতু যে এটি করেননি সে ব্যাপারে অবশ্যই ইতিবাচক প্রমাণ থাকতে হবে।[১১৮]

আইনগত ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নির্বিশেষে সব সাহাবির রা. ক্ষেত্রে 'আদালাহ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কুরআনের বাণীর ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। কুরআনে সাহাবিদের রা. সম্পর্কে বলা হয়েছে : 'আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি রাজি ও সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি রাজি ও খুশি' (সুরা তাওবা, ৯ : ১০০)। কোনো ব্যক্তির সৎ, ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বাসযোগ্য হওয়ার খ্যাতিও আবার তার নির্ভরশীল হওয়ার প্রমাণ হিসেবেও কাজ করে। হাদিস বিশারদ কিছু আলেমের মতে, এক বা দুই ব্যক্তি কর্তৃক সৎ বলে নিশ্চিত করার চেয়ে এ ধরনের খ্যাতি অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য।[১১৯] কতিপয় ব্যক্তিত্ব যেমন- ইমাম মালিক, সুফিয়ান আল ছাওরি, সুফিয়ান ইবনে ইউওয়াইনাহ, আল লাইস ইবনে সাদ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের 'আদালাহ' হওয়ার সুখ্যাতি তাজকিয়ার কৌশলগত অবস্থার চেয়ে অনেক নির্ভরযোগ্য হওয়ার প্রমাণ হিসেবে কাজ করেছে।[১২০]

ঘ. আহাদ হাদিস বর্ণনাকারীকে প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী হতে হবে, যাতে তার বিবরণ বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে। সে যদি ঘন ঘন ভুলত্রুটি করে এবং তার মধ্যে অসঙ্গতি দেখা যায়, তাহলে তার বিবরণ গ্রহণযোগ্য হবে না। কোনো কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা মূলত যে উদ্দেশ্যে কথা বলা হয়েছে তার অর্থ অনুধাবন করা ও তা সংরক্ষণ করা এবং একে নির্ভুল হিসেবে রক্ষায় প্রয়োজনীয় সব ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করার কোনো ব্যক্তির সামর্থ্য ওই ব্যক্তির স্মৃতি ধারণক্ষমতা ও পারদর্শিতার পরিচায়ক হিসেবে কাজ করে। বর্ণনাকারীর স্মৃতিশক্তি সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্টি হলেও তার বিবরণ যদি তার পূর্বসূরিদের কাজের দ্বারা সমর্থিত হয় তাহলে এ ক্ষেত্রে তা গ্রহণীয় বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু এ ধরনের যাচাইয়ের সুযোগ না থাকলে পুরোপুরি অজ্ঞাত ব্যক্তিবর্গ এবং স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়ার বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়নি এমন ব্যক্তিদের বিবরণ গ্রহণযোগ্য হবে না[১২১]।

ঙ. বর্ণনাকারী হাদিসের বিষয়বস্তু (মতন) অথবা এর বর্ণনাকারীদের পারস্পরিক ক্রমের যে কোনো একটি বিষয়ের কোনো ধরনের বিকৃতির (তাদলিস) সাথে জড়িত ছিল না। হাদিসের বিষয়বস্তু বিকৃতি হচ্ছে রসুল সা.-এর কথার সাথে

www.pathagar.com

এমন কিছু যোগ করা যার অস্তিত্ব ছিল না অথবা বক্তব্যকে বিকৃত করা ও শ্রোতাকে বিভ্রান্ত করার জন্য এর মূল বিষয়বস্তুকে লঘু করা। আর সনদের তাদলিস হচ্ছে বর্ণনাকারীদের নাম ও পরিচিতিকে বিকৃত করা। সরাসরি জালিয়াতি ও এর মধ্যে তেমন একটা তফাৎ নেই।[১২২] এক ধরনের তাদলিস হলো, সনদের কোনো একটি সংযোগকে বাদ দেয়া। এ ধরনের বর্জনের উদ্দেশ্য গুরুত্বহীন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, অনেক সময় ইসনাদের সব অংশকে নির্ভরযোগ্য হিসেবে দেখানোর জন্য এর একটি দুর্বল সংযোগকে বাদ দেয়া হলো। উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, এ ধরনের তাদলিস কার্যত জালিয়াতির সমতুল্য। অবশ্য বর্ণনাকারী যদি নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের খ্যাতিসম্পন্ন কোনো বিদ্বান ব্যক্তি হন, তাহলে ইসনাদের ছোটখাটো বর্জন সত্ত্বেও তার বিবরণ সাধারণভাবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে।[১২৩]

চ. এ ছাড়া আহাদ হাদিসের বর্ণনাকারীকে এর ঠিক পূর্বের সূত্রের সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ ও তার কাছ থেকে হাদিসটি অবশ্যই শুনতে হবে। হাদিসের বিষয়বস্তু (মতন) অবশ্যই কুরআন ও শরিয়াহর অন্যান্য মূলনীতির পরিপন্থী বুঝাতে পারে এমন ব্যক্তিক্রমী (শাদদ) হবে না। এ ছাড়া বিবরণ যেমন- আবুর স্থলে ইবনের (পিতার স্থলে ছেলে) মতো অথবা দৃশ্যত একই রকম মনে হয় কিন্তু অর্থ ভিন্ন, এমন ধরনের ভুলত্রুটি থেকে অবশ্যই মুক্ত থাকতে হবে।[১২৪]

উপরিউক্ত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে তিনজন ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ ইবনে হাম্বল আহাদ হাদিসের ওপর নির্ভর করেছেন। অবশ্য আবু হানিফা এর সাথে আরো কয়েকটি অতিরিক্ত শর্ত জুড়ে দিয়েছেন, যাদের একটি হলো, বর্ণনাকারীর কাজ (আমল) অবশ্যই তার বিবরণের পরিপন্থী হতে পারবে না। এ কারণেই আবু হানিফা আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত নিম্নের হাদিসটির ওপর নির্ভর করেননি।

إذا ولغ الكب في إناء أحدكم فلغسله سبعا

احداهن بالتراب الطاهر

'কোনো পাত্রে কুকুর মুখ দিলে, তাকে সাতবার পরিষ্কার করে ধুতে হবে, এর মধ্যে অন্তত একবার অবশ্যই পরিষ্কার বালু দিয়ে মাজতে হবে।' আবু হানিফা এর ব্যাখ্যায় বলেন, আবু হুরায়রা রা. নিজে এ বিষয়ের ওপর আমল করেননি। তাই সাধারণভাবে তিনবার ধোয়ার শর্ত। এ সূত্রে আবু হুরায়রার রা. নাম ব্যবহারসহ

www.pathagar.com

হাদিসটিকে দুর্বল বলে গণ্য করা হয়েছে।[১২৫] অন্যদিকে আলেমদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মনে করেন যে, বিস্মরণ প্রবণতা বা অন্যান্য অজ্ঞাত কারণে বর্ণনাকারীর কথা ও কাজের মধ্যে পার্থক্য দেখা গেছে। এ ধরনের পার্থক্য কোনো বিবরণ অনির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হওয়ার কোনো চূড়ান্ত প্রমাণ বহন করে না।[১২৬]

হানাফীগণ আরো মনে করেন যে, আহাদ হাদিসের বিষয়বস্তু এমন নয় যে, তা বিপুলসংখ্যক লোকের জানা জরুরি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আমরা যদি একটি একক বিবরণের মাধ্যমে রসুল সা.-এর কোনো কাজ বা কথা জানতে পারি যা শত শত এমনকি হাজার হাজার লোক জানতেন, তথাপি কেবলমাত্র এক বা দু'জন তা রেওয়ায়েত করেছেন, তাহলে ওই হাদিস নির্ভরযোগ্য হবে না। এ ধরনের হাদিসের উদাহরণ হলো :

إذا مسّ أحدكم ذكره فليتو ضاً

'যে কেউ তার লজ্জাস্থান স্পর্শ করবে তাকে অবশ্যই নতুন করে অজু করতে হবে'।[১২৭] হানাফীগণ একে গ্রহণ করেননি। তারা এর ব্যাখ্যায় বলেন, হাদিসটি যদি সঠিক হতো তাহলে তা মুসলমানদের বাস্তব কাজ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতো। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা হয়নি, তাই হাদিসটি নির্ভরযোগ্য নয়। অবশ্য আলেমদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এ শর্তের ব্যাপারে তেমন জোর দেননি। তাদের বিশ্লেষণ হলো, যারা কোনো ঘটনার সাক্ষী ছিল অথবা প্রত্যক্ষ করে তারা তাকে জরুরি বলে মনে করে বর্ণনা করে, অনেক ক্ষেত্রে তা হয় না। এর উদাহরণ হলো, অসংখ্য মানুষ রসুল সা.-কে হজ পালন করতে দেখেছেন তথাপি খুব বেশি লোক তাদের এই প্রত্যক্ষকরণের বিষয় বর্ণনা করেনি।[১২৮]

সবশেষে বলা যায়, হানাফীগণ মনে করেন যে, আহাদ হাদিস বর্ণনাকারী ফকিহ না হলে তার বিবরণ যদি কিয়াসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় তাহলেই কেবল তা গ্রহণযোগ্য হবে। অন্যথায় কিয়াসকে আহাদ হাদিসের চেয়ে অগ্রাধিকার দিতে হবে। অবশ্য বর্ণনাকারী ফকিহ হিসেবে পরিচিত হলে তার বিবরণ কিয়াসের চেয়ে অগ্রাধিকার পাবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, এ কারণে হানাফীগণ মুসাররাত-এর হাদিস প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাহলো, ক্রেতা যাতে মুগ্ধ হয় সে জন্য পশুর বানে দুধ সংরক্ষণ করা। হাদিসটিতে বলা হয়েছে :

لا تُصرّوافي الايل والغنم ، من ابتاع شاة مصرّاة

فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام ، إن ضاء أمسكها وان

شاء ردها وردّ معها صاعا من تر

কোনো উটনী বা বকরির বাঁটে দুধ জমা করে রেখ না যাতে তার দেয় দুধের পরিমাণ বেশি করে দেখানো যায়। মুসাররাত ক্রয়কারী ব্যক্তি দুধ দোহনের তিন দিন পর সেটি রেখে দিতে পারে অথবা কিছু পরিমাণ (এক সা') খেজুরসহ তা ফেরত দিতেও পারে।[১২৯]

হানাফীগণ এ হাদিসকে কিয়াসের পরিপন্থী বলে মনে করেন। কারণ কিয়াসে ক্ষতিপূরণ ও ক্ষতির মধ্যে সমতার নীতি অনুসৃত হয়েছে। আবু হানিফা মনে করেন যে, ক্রেতা যে পরিমাণ দুধ গ্রহণ করে এক সা' খেজুর তার মূল্যের সমপরিমাণ নাও হতে পারে। তাই ক্রেতা যদি তার কেনা পশুটি ফেরত দিতে চায় তাহলে তাকে কেনার সময় বাঁটে থাকা দুধের মূল্যসহ ফেরত দিতে হবে, নির্দিষ্ট পরিমাণ খেজুরসহ নয়। অন্যদিকে ইমাম মালিক, শাফেয়ী, ইবনে হাম্বল এবং আবু হানিফার শিষ্য (আবু ইউসুফ ও জুফারসহ) সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম হাদিসটি গ্রহণ করেছেন এবং একে কিয়াসের চেয়ে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠের মত হচ্ছে, ক্ষতিপূরণ হিসেবে এক সা' খেজুর অথবা মূল্য দেয়া যেতে পারে। হাদিসটিতে সুনির্দিষ্টভাবে খেজুরের কথা বলা হয়েছে। কারণ সেকালে খেজুর প্রধান খাদ্যদ্রব্য ছিল, যা এখন নাও থাকতে পারে।[১৩০]

ইমাম মালিক এ শর্তে একক হাদিসের ওপর নির্ভর করেছেন যে, তা মদিনাবাসীর আমলের (আমল আহল আল মদিনা) পরিপন্থী হবে না। তিনি মদিনার বাসিন্দাদের আদর্শ আমলকে এক বা দু'জন ব্যক্তির বিচ্ছন্ন বিবরণের চেয়ে রসুল সা.-এর কাজের অধিকতর প্রতিনিধিত্বশীল বলে বিবেচনা করেন। তার মতে, মদিনাবাসীর আমল চূড়ান্তভাবে রসুল সা.-এর থেকে হাজার হাজার মানুষের এবং তাদের থেকে হাজার হাজার মানুষের বিবরণের প্রতিনিধিত্ব করছে। অন্য কথায় তা মাশহুর অথবা এমনকি মুতাওয়াতির সমতুল্য। মালিকীদের মতে, কেবল আহাদ হাদিস মাদানী আমলের পরিপন্থী হলে মাদানী আমলকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এভাবে মালিকীগণ বাতিলকরণ অধিকার (খেয়ার আল মাজলিস) সংক্রান্ত হাদিস অস্বীকার করেছেন, যাতে বলা হয়েছে :

إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار

ما لم يتفرّقا

www.pathagar.com

'চুক্তির বৈঠকের স্থল ত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত ক্রেতারা তাদের মন পরিবর্তন করার স্বাধীনতা ভোগ করবে।'[১৩১] এর কারণ, মদিনার অধিবাসীদের কাজের সাথে হাদিসটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ। মদিনাবাসীর আমলে এ বিষয়ে যে মত প্রমাণিত হয়েছে তাহলো, বৈধ প্রস্তাব পেশ ও তা গ্রহণের মাধ্যমে দুইপক্ষই যখন ঐকমত্য প্রকাশ করবে তখনই চুক্তি সম্পন্ন হবে এবং সেই মুহূর্ত থেকেই তা বাধ্যতামূলক, 'চুক্তির বৈঠক' অব্যাহত থাকুক বা না থাকুক সেটা কোনো ধর্তব্যের বিষয় হবে না।

চার মাজহাবের চারজন ইমামের সবাই আহাদ হাদিসকে নীতিগতভাবে নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচনা করেছেন এবং রসুল সা.-এর থেকে বর্ণনার ক্ষেত্রে দুর্বলতার প্রমাণ না পেলে অথবা তাদের কাছে অধিকতর নির্ভরযোগ্য কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণের পরিপন্থী না হলে তাদের কেউই একে প্রত্যাখ্যান করেননি।

আলেমদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ আহাদ হাদিস বর্ণনাকারী সর্বপ্রথম যেভাবে হাদিসটি শুনেছিলেন ঠিক সেভাবেই আক্ষরিক অর্থে হস্তান্তর করার মাধ্যমে তা গঠিত হতে হবে সে ব্যাপারে জোর দেননি। যদিও এটিই হচ্ছে যে কোনো হাদিস হস্তান্তরের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য রূপ। এর পরিবর্তে তারা আহাদ হাদিসের ভাবার্থ হস্তান্তর মেনে নেন, অবশ্য এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, বর্ণনাকারীকে হাদিসের ভাষা ও মর্মার্থ পুরোপুরি অনুধাবন করতে হবে। তাহলেই কেবল বর্ণনাকারীর নিজ ভাষায় হাদিসটি উপস্থাপিত হলে তাতে একই অর্থ বুঝাবে এবং তা গ্রহণযোগ্য হবে। চারটি সুন্নী মাজহাব একমত হয়েছে যে, বর্ণনাকারী এ পর্যায়ের জ্ঞানের অধিকার না হলে এবং হাদিসটি তার মূল আকারে হস্তান্তর করতে অসমর্থ হলে তার উপস্থাপিত হাদিসটি অবশ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।[১৩২]

হানাফী ও অন্যান্য মাজহাবের কিছুসংখ্যক আলেম মনে করেন যে, হাদিসের ভাবার্থ হস্তান্তর পুরোপুরি নিষিদ্ধ, সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমরা অবশ্য এ মতকে খণ্ডন করে দিয়েছেন। তারা বলেন, সাহাবিগণ রা. প্রায়ই একই হাদিস বর্ণনা করেছেন যার শব্দের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে এবং এ বিষয়টি কেউই অস্বীকার করতে পারে না। অন্যতম প্রখ্যাত সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ রা. বর্ণনা করেন, এ কথা জানা যায় যে এ ধরনের কথা বলার মাধ্যমে অনেক হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে: 'রসুল সা. এ কথা বলেছেন অথবা তিনি এ ধরনের কিছু একটা বলেছেন অথবা এর কাছাকাছি কিছু একটা বলেছেন।' এ ধরনের হাদিস বর্ণনা পদ্ধতির বৈধতাকে কেউই চ্যালেঞ্জ করেননি; তাই সাহাবিদের রা. বাস্তব কর্মে ভাবার্থ হস্তান্তরের অনুমতির বিষয় নিশ্চিত হয়েছে এবং এর সমর্থনে তাদের মতৈক্যের বিষয় উদ্ধৃত করা হয়েছে। এ

www.pathagar.com

কথা বলার পরও এটা ঠিক যে, হাদিসের বর্ণনার নির্ভুলতা ও এর মূল রূপের অক্ষুণ্ন অবস্থা বজায় রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।[১৩৩]

বস্তুতপক্ষে রসুল সা.-এর একটি হাদিসে এ বিষয় প্রকাশ পেয়েছে :

نضر الله امرأ سمع منّا شيئا فبلغه كما سمعه

فرب مبلّغ أوعى له من سامع

> আল্লাহ তায়ালা তাকে তার রহমতে সিক্ত করবেন, যে আমার কাছ থেকে কোনো কথা বলছে শুনল এবং ঠিক যেভাবে শুনেছিল ঠিক সেভাবেই তা অন্যদের কাছে পৌঁছে দিলো এবং পরবর্তী বর্ণনাকারী যার কাছ থেকে একথা শুনেছিল তার চেয়েও বেশি সতর্কতার সাথে তা ধারণ করবে।[১৩৪]

অনেক সময় একজন বর্ণনাকারী একটি হাদিস বর্ণনা করলেন কিন্তু একাংশ বাদ দিলেন। প্রশ্ন হচ্ছে, এ ধরনের বর্ণনা কি আদৌ অনুমোদনযোগ্য। নীতিগতভাবে হাদিস বর্ণনাকারী যে কোনো ধরনের হাদিসের অর্থের ক্ষেত্রে অবিচ্ছেদ্য বিবেচিত কোনো অংশই কোনোভাবেই বর্জন করতে পারবেন না। এর উদাহরণ হিসেবে বলা যায় : বর্জিত অংশে যখন কোনো শর্ত আরোপ অথবা হাদিসের মূল বিষয়ের কোনো ব্যতিক্রম বুঝায় অথবা এর প্রয়োগের ক্ষেত্রের উল্লেখ করা হয়। অবশ্য হাদিসের যে অংশ এর অবশিষ্ট অংশের অর্থকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না সে ক্ষেত্রে বর্ণনাকারী তা বর্জন করতে চাইলে করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে উল্লেখিত হাদিসকে সার্বিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের দিক দিয়ে দু'টি হাদিস বলে বিবেচনা করা হবে। হাদিসের যে অংশ মূল বক্তব্য বহন করে না তা বর্জন করা আলেমদের একটি পরিচিত প্রয়োগ রীতি হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। তবে এ ধরনের বর্জনের ফলে যদি উদ্ধৃত অংশ পূর্ণ বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক হয় তাহলে বিষয়টি পূর্বোল্লেখিত রীতিতে নয়, বরং বিরোধ ও অগ্রাধিকারের বিধানের (আল তাআরুদ ওয়াল তারজিহ) আলোকে নির্ধারিত হবে। সব ক্ষেত্রেই অগ্রগণ্য রীতি হচ্ছে হাদিসের কোনো অংশ বর্জন না করা। কারণ বর্জিত অংশে হয়তো অনেক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থাকতে পারে এবং অনেক উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে, যা হয়তো খোদ বর্ণনাকারীর চোখে ধরা পড়েনি।[১৩৫]

বহুসংখ্যক বর্ণনাকারীর বর্ণিত কোনো কোনো হাদিসের ক্ষেত্রে কোনো বর্ণনাকারীর হাদিসে অনেক সময় মূল বক্তব্যের সাথে অতিরিক্ত কথা থাকে, যা অন্য বর্ণনাকারীর

www.pathagar.com

হাদিসে দেখা যায় না। এ ধরনের বিবরণের পার্থক্য নিরূপণের জন্য প্রথমে দেখতে হবে যে, আলোচ্য হাদিসটি মূলত একই মজলিস অনুষ্ঠানে নাকি ভিন্ন ভিন্ন মজলিস বা অনুষ্ঠানে উচ্চারিত হয়েছিল। যদি ভিন্ন ভিন্ন মজলিস বা অনুষ্ঠানে হাদিসটি উচ্চারিত হয়ে থাকে তাহলে কোনো বিরোধ নেই এবং উভয় বিবরণই এভাবে গ্রহণযোগ্য হবে। তবে যদি এটি প্রতিষ্ঠিত হয় যে, ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ মূলত একই অভিন্ন মজলিসে উচ্চারিত হয়েছিল তাহলে সাধারণভাবে ব্যতিক্রমী বিবরণের চেয়ে অধিকাংশ বর্ণনাকারীর বিবরণ গ্রহণ করা হবে। কেননা পূর্ববর্তী ওই বিবরণে ভুল থাকা অথবা দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়ার বিষয় জানা যায়নি। এরই ফলশ্রুতিতে একক বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদিসটির অতিরিক্ত অংশ পৃথক করে প্রত্যাখ্যান করা হবে এ সহজ কারণে যে, অনেক ব্যক্তির চেয়ে একব্যক্তির পক্ষে ত্রুটি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তবে একক বর্ণনাকারী যদি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে খ্যাতিসম্পন্ন হন আর অন্যরা যদি অসতর্কভাবে বিবরণ দেয়ার ব্যাপারে পরিচিত হন তাহলে একক ব্যক্তির বিবরণকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। অবশ্য অনেক হাদিস বিশারদ আলেম এর সাথে একমত নন। সনদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সংযোজন ও পার্থক্য পরিমার্জিত হতে পারে, যেমন একদল বর্ণনাকারী হাদিসটিকে মুরসাল হাদিস হিসেবে বর্ণনা করলেন, অন্যদিকে একব্যক্তি তাকে বর্ণনা করলেন মুসনাদ হিসাবে (অর্থাৎ তা মুত্তাসিল বা অবিচ্ছিন্ন)। এ ক্ষেত্রেও হাদিসের মতনের পার্থক্য নিরূপণের অনুরূপ পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। অবশ্য অনেক সময় ভিন্ন ভিন্ন কারণে এক বিবরণের চেয়ে অন্য বিবরণকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকতে পারে। এর উদাহরণ হিসেবে নিম্নের হাদিসটি তুলে ধরা যেতে পারে :

من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه

'কোনো ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্য কেনার পর তা তাকে সরবরাহ করার আগে সে তা বিক্রি করতে পারে।' আরেকটি হাদিসে অবশ্য রসুল সা. অধিকতর সাধারণ নির্দেশনা প্রদান করেছেন :

لا تبع ما ليس عندك

এতে মুসলমানদের তাদের অধিকারে না আসা পর্যন্ত কোনো জিনিস বিক্রি করতে নিষেধ করা হয়েছে। হানাফীগণ দ্বিতীয় বিষয়টি অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেছেন। কেননা, এতে অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর ক্ষেত্র বুঝানো হয়েছে- যার মধ্যে খাদ্যদ্রব্যও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।[১৩৬]

www.pathagar.com

২. সনদ বিচ্ছিন্ন হাদিস (আল হাদিস গায়ের আল মুত্তাসিম)

এ ধরনের হাদিসের সনদ অর্থাৎ বর্ণনাকারীদের পারস্পরিক ক্রম সব ক্ষেত্রেই রসুল সা. পর্যন্ত পৌঁছেনি। তিনভাগে এ হাদিসকে ভাগ করা যায়, মুরসাল, মু'দাল ও মুনকাতি। বিচ্ছিন্ন হাদিসের প্রধান অংশ হচ্ছে মুরসাল, যাকে অনেক সময় মুনকাতি বলেও উল্লেখ করা হয়। মুরসাল এমন ধরনের হাদিস যার সর্বশেষ বর্ণনাকারী হচ্ছে তাবেয়ী অর্থাৎ যে সাহাবি রা. হাদিসটি বর্ণনা করেন তার নাম উল্লেখ ছাড়াই সরাসরি রসুল সা. এরূপ বলেছেন বলে বর্ণনা করেন। এটি হলো সংখ্যাগরিষ্ঠের সংজ্ঞা। অবশ্য হানাফীগণ মুরসালের সংজ্ঞায় বলেন, মুরসাল হলো এমন হাদিস যা একজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী এর সনদের একাংশ বাদ দিয়ে রসুল সা. বলেছেন বলে বর্ণনা করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠের মধ্যে এ বিচ্ছিন্ন মাধ্যম কোনো সাহাবি রা. এমনকি তাবেয়ীও হতে পারেন। তবে হানাফীদের মতে দ্বিতীয় যুগের বর্ণনাকারীরাও এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। এতে বিচ্ছিন্ন মাধ্যম অজ্ঞাত থাকায় তিনি সম্ভবত সৎলোক হবেন, অথবা তা নাও হতে পারেন। হাদিস বিশারদ আলেমগণ বর্ণনার ক্ষেত্রে এসব ও অনুরূপ অন্যান্য কারণে নীতিগতভাবে মুরসাল হাদিস গ্রহণ করেননি।[১৩৭]

আল শাওকানীর মতে, উসুল বিশারদ সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম মুরসালের সংজ্ঞায় বলেছেন, এ হাদিস বর্ণনাকারী ব্যক্তি রসুল সা.-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেননি এবং সরাসরি রসুল সা.-কে উদ্ধৃতও করেননি। বর্ণনাকারী একজন তাবেয়ী অথবা তার শিষ্য, (তাবেয়ী আল তাবেয়ী) বা তার পরের কেউ হতে পারেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এ ধরনের হাদিস গ্রহণ করেননি। বর্ণনাকারী তাবেয়ী প্রখ্যাত ব্যক্তি এবং অনেক সাহাবির রা. সঙ্গে সাক্ষাৎকারী ব্যক্তি না হলে ইমাম শাফেয়ীও তা গ্রহণ করেননি। এ কারণে সাদ ইবনে আল মুসাইয়িব, আল জুহুরী, আল কামাহ, মাশরুক, আল শাবী, হাসান আল বসরী, কাতাদাহর মতো অনেক প্রখ্যাত তাবেয়ীর বর্ণিত মুরসাল হাদিসকে নিম্নলিখিত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে গ্রহণ করা হয়েছে।[১৩৮]

প্রথমত : মুরসাল হাদিস আরেকটি অধিকতর নির্ভরযোগ্য হাদিস দ্বারা সমর্থিত হতে হবে যার সনদ অবিচ্ছিন্ন। সে ক্ষেত্রে পরের হাদিসটি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী সাক্ষ্য হিসেবে সাব্যস্ত হবে।

দ্বিতীয়ত : একটি মুরসাল অন্য আরেকটি মুরসাল দ্বারা সমর্থিত হলে এবং আলেমগণ যদি পরেরটিকে গ্রহণ ও তার ওপর নির্ভর করেন।

www.pathagar.com

তৃতীয়ত : মুরসাল সাহাবিদের রা. নজিরের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হলে সে ক্ষেত্রে তা রসুল সা. পর্যন্ত উন্নীত হয় ও রসুল সা.-এর প্রতি অরোপিত। এ প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'রাফি' এবং এ হাদিসকে বলা হয় 'মারফু'।

চতুর্থত : আলেমগণ যদি মুরসালকে অনুমোদন করেন এবং তাদের অনেকে তার ওপর যদি নির্ভর করেন বলে জানা যায়।

পঞ্চমত : মুরসাল বর্ণনাকারী কোনো দুর্বল বা সন্দেহপূর্ণ হাদিস বর্ণনা করেননি বলে খ্যাতি থাকে। এর উদাহরণ হলো, সাদ ইবনে মুসাইয়িব ও উপরে উল্লেখিত যে কোনো প্রখ্যাত তাবেয়ীর বর্ণিত মুরসাল হাদিস স্বাভাবিকভাবে গ্রহণযোগ্য।[১৩৯]

যখন উপরোল্লেখিত যে কোনো একটি পন্থায় মুরসাল হাদিস শক্তিশালী হয়, বিশেষ করে বর্ণনাকারী যদি নেতৃস্থানীয় তাবেয়ী হন যিনি অনেক সাহাবির রা. সঙ্গে সাক্ষাৎ করে থাকেন, তাহলে ইমাম শাফেয়ী তা গ্রহণ করেছেন। তদুপরি আলোচ্য মুরসাল হাদিস যদি অধিকতর নির্ভরযোগ্য হাদিসের পরিপন্থী হয়, সে ক্ষেত্রে পরের হাদিসটি অগ্রাধিকার পাবে।

উপরের বক্তব্যে মূলত মুরসাল হাদিস সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ীর দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অন্যদিকে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিক মুরসাল হাদিস গ্রহণের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম কঠোরতা অবলম্বন করেন। তারা তাবেয়ীদের বর্ণিত কেবল মুরসাল হাদিস নয় বরং তাবে-তাবেয়ী বলে পরিচিত দ্বিতীয় যুগের বর্ণনাকারীদের বর্ণিত হাদিসও গ্রহণ করেছেন। এর সমর্থনে তারা রসুল সা.-এর একটি হাদিস উদ্ধৃত করেন, যাতে বলা হয়েছে :

اكموا أصحابي فانهم خيركم ، ثم الذين

يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم يظهر الكذب

'আমার সাহাবিদের সম্মান কর, তারা হলো তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তারপর যারা তাদের অনুসরণ করবে, এরপর পরবর্তী যুগের লোকদের। অতঃপর মিথ্যার প্রসার ঘটবে'।[১৪০]

অবশ্য ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিক উভয়ই এর সাথে শর্ত জুড়ে দিয়েছেন যে, মুরসাল হাদিস বর্ণনাকারীকে অবশ্যই নেতৃস্থানীয় হাদিস বর্ণনাকারী হতে হবে, তা না হলে তার বিবরণ গ্রহণযোগ্য হবে না। বর্ণনাকারীর বিশ্বাসযোগ্যতার বিষয়টি

www.pathagar.com

নিশ্চিত হওয়ার পরই কেবল তারা তার বর্ণিত হাদিসের ওপর নির্ভর করেন। তাদের মতে, কোনো ন্যায়পরায়ণ ও বিজ্ঞ ব্যক্তি যখন কোনো হাদিসের সত্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হন তখন তিনি তাকে সরাসরি রসুল সা.-এর সঙ্গে সম্পর্কিত করে বলে থাকেন, রসুল সা. এরূপ বলেছেন। কিন্তু যখন তিনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারেন না তখন তিনি হাদিসটি যার কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন, তার বরাত দিয়ে তা বর্ণনা করেন। এ ধরনের মুরসালের উদাহরণ হলো মুহাম্মদ ইবনে হাসান আল শাফারানী বর্ণিত হাদিসসমূহ। তিনি একজন তাবে-তাবেয়ী, কিন্তু নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত। সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মত হলো, মুরসাল হাদিসের ভিত্তিতে আমল করা বাধ্যতামূলক নয়।[১৪১]

মুরসাল হাদিসের নির্ভরযোগ্যতার বিষয়ে শীর্ষস্থানীয় ইমামদের মতপার্থক্যের আংশিক ব্যাখ্যা হিসেবে বলা যায় যে, ইমাম শাফেয়ী ও হাম্বলী যে সময়ে বাস করতেন সে সময় রসুল সা. থেকে তাদের দূরত্ব অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল, যে কারণেই তারা তাদের পূর্বসূরি ইমাম আবু হানিফা ও মালিক থেকে বর্ণনার অবিচ্ছিন্নতার প্রয়োজনীয়তাকে অনেক বেশি করে অনুভব করেছিলেন।

বিচ্ছিন্ন অন্য দুই প্রকার হাদিস মুনকাতি ও মুদাল সম্পর্কে সংক্ষেপে উল্লেখ করা প্রয়োজন। মুনকাতি এমন হাদিস যার সনদে মাঝামাঝি কোনো একটি মাধ্যম বিচ্ছিন্ন। অন্যদিকে মুদাল এমন হাদিস যার বর্ণনাকারীদের নামের পাশাপাশি দু'টি মাধ্যম বিচ্ছিন্ন। এ দুই প্রকার হাদিসের কোনোটিই গ্রহণযোগ্য নয় এবং এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতৈক্য রয়েছে।[১৪২]

সহিহ, হাসান ও জয়ীফ

নির্ভরযোগ্যতার ভিত্তিতে হাদিস বর্ণনাকারীদের নিম্নোক্ত শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে : (১) সাহাবিগণ রা. যারা সাধারণভাবে গ্রহণযেগ্য, (২) সিকাত সাবিতুন অথবা নির্ভরযোগ্যতার দিক থেকে যাদের স্থান সাহাবিগণের রা. পরেই সর্বোচ্চ, (৩) সিকাত বা বিশ্বাসযোগ্য কিন্তু তা প্রথম দুই প্রকারের চেয়ে কম, (৪) সাদিক বা সত্যবাদী অর্থাৎ এমন ব্যক্তি যে জালিয়াতি বা মারাত্মক ক্রুটি করেছেন বলে পরিচিত নয়, (৫) সাদিক ইয়াবিম অর্থাৎ সত্যবাদী কিন্তু ভুলক্রুটি করেছে, (৬) মকবুল বা গ্রহণীয় অর্থাৎ তার বিবরণ যে অনির্ভরযোগ্য এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি, (৭) মাজহুল বা যে বর্ণনাকারীর পরিচয় জানা যায়নি। এসব ব্যক্তির পরে নিম্ন শ্রেণির ব্যক্তিরা এসেছে যাদের পাপী (ফাসেক) হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে, মিথ্যা বলে যাদের সন্দেহ করা হয় অথবা সরাসরি মিথ্যুক হিসেবে সাব্যস্ত।[১৪৩]

www.pathagar.com

প্রথম তিন শ্রেণির বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদিসকে সহিহ বলে নির্ভুল হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করা হয়।[১৪৪] এ হাদিসের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, এর সনদ অবিচ্ছিন্নভাবে রসুল সা. পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং এর বর্ণনাকারীরা ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি যারা প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী এবং তাদের বর্ণনা বড় বা ছোটখাটো উভয় ধরনের ক্রটি থেকে মুক্ত।[১৪৫]

হাসান হাদিস সহিহ থেকে পৃথক। এর বর্ণনাকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপরোল্লিখিত চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণির ব্যক্তিরা অর্ন্তভুক্ত রয়েছেন। এ হাদিসের স্থান সহিহ ও জয়ীফ হাদিসের মাঝামাঝি, এর বর্ণনাকারীরা সত্যবাদিতার জন্য সুপরিচিত হলেও তারা নির্ভরযোগ্যতা ও সুখ্যাতির ততদূর উচ্চপর্যায়ে উন্নীত হননি।[১৪৬]

দুর্বল বা জয়ীফ হাদিস হচ্ছে এমন হাদিস যার বর্ণনাকারীরা সহিহ ও হাসান হাদিসের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতার অধিকারী নন। এ হাদিসের সনদে অথবা এর মূল বক্তব্যে (মতন) দুর্বলতার কারণে একে জয়ীফ বা দুর্বল হাদিস বলা হয়ে থাকে। এর বর্ণনাকারী স্মৃতিশক্তি দুর্বল বলে পরিচিত অথবা তার চারিত্রিক দৃঢ়তা ও ধর্মানুরাগের বিষয়ে বড় ধরনের সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।[১৪৭]

কয়েক প্রকার জয়ীফ হাদিস রয়েছে, এর একটি হলো মুরসাল হাদিস। ইমাম মুসলিমসহ মুহাদ্দিসগণ মুরসাল হাদিসকে শারয়ী দলিল (*হুজ্জাহ*) বলে বিবেচনা করেননি। শাদদ, মুনকার ও মুজতারিবসহ আরো কয়েক প্রকার জয়ীফ হাদিস রয়েছে। এসব বিষয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। সংক্ষেপে বলা যায়, শাদদ হলো এমন হাদিস যার সনদ দুর্বল এবং অধিকতর নির্ভরযোগ্য হাদিসের সাথে এর বিরোধ রয়েছে। মুনকার হাদিসের বর্ণনাকারীকেও ন্যায়পরায়ণ প্রখর স্মরণশক্তির অধিকারীদের শ্রেণিভুক্ত করা সম্ভব নয়। মুজতারিব হচ্ছে এমন হাদিস যার বিষয়বস্তু অন্য কয়েকটি হাদিসের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ যার কোনোটিকে অন্যগুলোর চেয়ে অগ্রাধিকার দেয়া যায় না।[১৪৮]

সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী হাদিসের সার্বিক গ্রহণযোগ্যতা এর প্রমাণের দুর্বলতার বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়। তাই সনদের কোনো এক দুর্বল বর্ণনাকারীর উপস্থিতি সমগ্র হাদিসকে দুর্বল করে ফেলে। যদি বর্ণনাকারীদের একজন মিথ্যা বলেছেন বলে সন্দেহ হলে অবশিষ্ট বর্ণনাকারীদের সবাই বিশ্বাসযোগ্য (সিকাত) শ্রেণিভুক্ত হলেও অন্য সূত্রের দ্বারা হাদিসটি জানা না গেলে একে দুর্বল শ্রেণির হাদিসের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। হাদিসের নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ একটি নিয়ম অনুসরণ করেছেন; তাহলো, প্রত্যেক হাদিসকে

www.pathagar.com

অবশ্যই বর্ণনার অবিচ্ছিন্ন ক্রম পরম্পরায় তা রসুল সা. পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে এবং বর্ণনাকারীদের ধর্মপরায়ণ হতে হবে ও সুখ্যাতি থাকতে হবে। যে হাদিস এসব শর্ত পূরণ করবে না তা গ্রহণযোগ্য হবে না। দুর্বল বা জয়ীফ হাদিস শারয়ী দলিল (হুজ্জাহ) গঠন করতে পারে না তাই তা সাধারণভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়।

টিকা

১. আমরা এভাবে হাদিস থেকে পড়ে থাকি, 'তোমাদের যে কেউ সুন্দর উদাহরণ স্থাপন করবে–মান সান্না সুন্নাতান হাসানাতান, সে এবং অন্য যারা এর ওপর কাজ করবে, কেয়ামত পর্যন্ত তাদের ওপর তার সওয়াব জারি থাকবে, আর যে খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে-মান সান্না সুন্নাতান শাইয়াতান–সে এবং অন্য যারা তা অনুসরণ করবে কেয়ামত পর্যন্ত তাদের তার গোনাহের বোঝা বহন করতে হবে।' বিস্তারিত জানতে দেখুন, ইসনাভী, নিহাইয়াহ, ২য় খণ্ড, ১৭০, শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ৩৩।

২. বিস্তারিত জানতে দেখুন Guraya, Origins, পৃষ্ঠা ৮; আহমদ হাসান, Early development, পৃষ্ঠা ৮৫।

৩. শিবাই, আল সুন্নাহ্, পৃষ্ঠা ৪৭, আযামী, Studies, পৃষ্ঠা ৩।

৪. আলোচ্য আয়াতটিতে মুমিনদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে : 'প্রকৃতপক্ষে তোমাদের জন্য আল্লাহর রসুলের জীবনে সর্বোত্তম নমুনা বর্তমান আছে' (সুরা আল আহজাব, ৩৩ : ২১)

৫. শাফেয়ী, রিসালাহ, পৃষ্ঠা ৪৪-৪৫, শিবাই পৃষ্ঠা ৫০।

৬. আবু দাউদ, সুনান (হাসান অনূদিত), ৩য় খণ্ড, ১০১৯, হাদিস নম্বর ৩৫৮৫।

৭. শাতিবী, মুওয়াফাকাত, ৩য় খণ্ড, ১৯৭; ইবনে কাইয়িম, ইলাম, ১ম খণ্ড, ২২২।

৮. বিস্তারিত জানতে দেখুন, Guraya, Origins, পৃষ্ঠা ৫।

৯. তুলনীয়, আযামী, Studies, পৃষ্ঠা ৪।

১০. আবু দাউদ, সুনান, ৩য় খণ্ড, ১২৯৪, হাদিস নম্বর ৪৫৯০, শাওকানী, ইরশাদ পৃষ্ঠা ৩৩।

১১. ইসনাবী, নিহাইয়াহ, ২য় খণ্ড, ১৭০, শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ৩৩; Hitu, Wajiz, পৃষ্ঠা ২৬৪।

১২. তুলনীয় আযামী, Studies, পৃষ্ঠা ১-৩।

১৩. তুলনীয়, আহমদ হাসান, Early Development, Shabir, পৃষ্ঠা ৪৮, Authority of Hadith, পৃষ্ঠা ২-৩।

১৪. তুলনীয়, Studies, আযামী, পৃষ্ঠা ৩।

১৫. ইমাম শাফেয়ী, রিসালাহ, পৃষ্ঠা ১২৮-১৩০।

১৬. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১৭৭; Guraya, Origins, পৃষ্ঠা ২৯।

১৭. Guraya, Origins, পৃষ্ঠা ২৯-৩৪, আহমদ হাসান, Early Development, পৃষ্ঠা ৪৯-৫১।

১৮. শাওকানী, ইরশাদ পৃষ্ঠা ৩৩।

www.pathagar.com

১৯. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৩৭।

২০. গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ১ম খণ্ড, ৮৩।

২১. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৩৭।

২২. শাতিবী, মুওয়াফাকাত, ৪র্থ খণ্ড, ৭।

২৩. শাওকানি, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ৩৬; খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৩৮; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৮১।

২৪. আবু দাউদ, সুনান, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০৬, হাদিস নম্বর ১৫৬২; আমিদী, ইহকাম, ৩য় খণ্ড, ১৭০

২৫. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৩৬; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ৮৯।

২৬. তাবরিজি, মিশকাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬৬, হাদিস নম্বর ৫৩৩; শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ৪১; খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৩৬।

২৭. আবু দাউদ, সুনান, ১ম খণ্ড, ৮৮, হাদিস নম্বর ৩৩৪; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৬৯-৭০।

২৮. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ৬১; বাদরান, বাইয়ান, পৃষ্ঠা ৭৪।

২৯. শালতুত, আল-ইসলাম, পৃষ্ঠা ৫১২; খাল্লাফ ইলম, পৃষ্ঠা ৪৩।

৩০. ইনাবী নিহাইয়া, ২য় খণ্ড , ১৭১; Hitu, Wajiz, পৃষ্ঠা ২৭২।

জানা যায় যে, রসুল সা.-এর বিশিষ্ট সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. রসুলের স্বাভাবিক কাজকর্মও অনুসরণ করতেন। এ রকম করার সুপারিশ (মানদুব) করা হয়েছে বলে তিনি তা করতেন বরং রসুল সা.-এর প্রতি তার গভীর ভক্তি-শ্রদ্ধা ও অনুরাগের কারণে তিনি এমনটি করতেন বলে মনে হয়।

৩১. শালতুত, আল ইসলাম, পৃষ্ঠা ৫১২; খাল্লাফ, Ilm, পৃষ্ঠা ৪৩।

৩২. বিশেষ করে উল্লেখ করা যায়, (সুরা নিসা ৪ : ৩), (আল বাকারা ২ : ২৮২) ও (সুরা তালাক ৬৫ : ২)।

৩৩. Hitu, Wajiz পৃষ্ঠা ২৭৩; খাল্লাফ, Ilm, পৃষ্ঠা ৪৪।

৩৪. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ৩৫; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ৯০; Hitu, Wajiz পৃষ্ঠা ২৭৩।

৩৫. শালতুতু, আল ইসলাম, পৃষ্ঠা ৫১৩।

৩৬. Hitu, Wajiz, পৃষ্ঠা ২৭৪; বাদরান, বাইয়ান, পৃষ্ঠা ৪১।

৩৭. Hitu, Wajiz, পৃষ্ঠা ২৭৫।

৩৮. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ২৭৬।

৩৯. শালতুত, আল ইসলাম, পৃষ্ঠা ৫১৫।

৪০. আবু দাউদ, সুনান, ২য় খণ্ড, ৭৫৮, হাদিস নম্বর ২৭১৫; ইবনে কাইয়িম, ইলাম, ২, ২২৩।

৪১. শালতুত, আল ইসলাম, পৃষ্ঠা ৫১৫।

৪২. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৫১৬।

৪৩. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ৩৬; খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৪৪।

www.pathagar.com

৪৪. শালতুত, আল ইসলাম, পৃষ্ঠা ৫১৪।

৪৫. গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫১; বাদরান, বায়ান, পৃষ্ঠা ৪১-৪২; মুতাওয়াল্লী, মাবাদী, পৃষ্ঠা ৩৮।

৪৬. আবু দাউদ, সুনান (হাসান অনূদিত), ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৭৩, হাদিস নম্বর ৩০৬৭; তাবরিজি, মিশকাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৮৯, হাদিস নম্বর ২৯৪৫।

৪৭. আবু দাউদ, ৮৭৩ পৃষ্ঠার পাদটিকা ২৫৩৪; আল মারগিনানী, হেদাইয়া, (Hamilton অনূদিত), পৃষ্ঠা ৬১০।

৪৮. তাবরিজি, মিশকাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০০০, হাদিস নম্বর ৩৩৪২।

৪৯. শালতুত, আল ইসলাম, পৃষ্ঠা ৫১৫।

৫০. আল খতিব, মুগনী আল মুহতাজ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৪২; দীন, আল নাফাকাহ, পৃষ্ঠা ২০-২৩।

৫১. শালতুত, আল ইসলাম, পৃষ্ঠা ৫১৬।

৫২. প্রাথমিক অবস্থায় রসুল সা. তার কাছ থেকে কুরআন ছাড়া আর কোনো কিছু না লেখার জন্য সাহাবিগণের রা. প্রতি নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরে অবশ্য এর সংশোধনী আনা হয়েছিল এবং রসুল সা. সুন্নাহ্ লিখে রাখার অনুমতি দিয়েছিলেন। বাদরান অন্তত দু'টি উদাহরণ দিয়েছেন (উসুল, পৃষ্ঠা ৮৩-৮৪) যেখানে রসুল সা. তার নির্দেশনা লিখে সংরক্ষণ করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

৫৩. শালতুত, আল ইসলাম, পৃষ্ঠা ৫১১।

৫৪. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৫১২।

৫৫. তুলনীয়, শাতিবী, মুওয়াফাকাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ১০১।

৫৬. শাতিবী, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪; শিবাই, সুন্নাহ্, পৃষ্ঠা ৩৭৭; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৮২, শাতিবী আরো বলেছেন, অন্য দু'জন প্রখ্যাত সাহাবি, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. সুন্নাহ্র চেয়ে কুরআনকে অগ্রাধিকার দেয়াকে নিশ্চিত করেছেন বলে প্রমাণ রয়েছে।

৫৭. শাতিবী, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪।

৫৮. তুলনীয়, বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ১০২।

৫৯. এ বিষয়ে আওজাইর উদ্ধৃতি দিয়ে শাওকানী (ইরশাদ, পৃষ্ঠা ৩) সুন্নাহ্ শরিয়াহর স্বতন্ত্র উৎস এবং তা কেবল কুরআনের ব্যাখ্যাই নয়, এ মতের সাথে একমত পোষণ করেছেন। দেখুন, শাতিবী, মুওয়াফাকাত, ৪, ৪।

৬০. দেখুন শাতিবী, মুওয়াফাকাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫।

৬১. একই গ্রন্থ, আরো দেখুন শিবাই, আল সুন্নাহ্, পৃষ্ঠা ১৭৮-৭৯।

৬২. শাতিবী, মুওয়াফাকাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫।

৬৩. একই গ্রন্থ, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬।

৬৪. শিবাই, আল সুন্নাহ্ পৃষ্ঠা ৩৭৯; খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৩৯; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ১০২।

www.pathagar.com

৬৫. বায়হাকী, আল সুনান আল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০।

৬৬. ইবনে কাইয়িম, ইলাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৮, শিবাই, আল সুন্নাহ্, পৃষ্ঠা ৩৮০; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ১০৩-১০৫।

৬৭. বাদরান, বায়ান, পৃষ্ঠা ৬।

৬৮. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৭।

৬৯. ইবনে কাইয়ুম, ইলাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৩, খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৪০; শিবাই, আল সুন্নাহ্, পৃষ্ঠা ৩৮০।

৭০. তুলনীয়, শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ৩৩, শিবাই, আল সুন্নাহ্, পৃষ্ঠা ৩৮০।

৭১. শাতিবী, মুওয়াফাকাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭।

৭২. একই গ্রন্থ, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮; শিবাই, আল সুন্নাহ্, ৩৮৩।

৭৩. তুলনীয় আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ৮২।

৭৪. শাফেয়ী, রিসালাহ্, পৃষ্ঠা ৫২-৫৩।

৭৫. একই গ্রন্থ।

৭৬. তুলনীয় শিবাই, আল সুন্নাহ্, পৃষ্ঠা ৩৮৮।

৭৭. কুরতুবি, তাফসির, ১৮তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২৭।

৭৮. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, মাস্‌লাহা মুরসালাহ, ত্রয়োদশ অধ্যায়।

৭৯. তুলনীয়, শিবাই, আল সুন্নাহ্, পৃষ্ঠা ৩৮৮-৯০।

৮০. একই গ্রন্থ।

৮১. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৩৮৫।

৮২. তুলনীয়, শাবির, Authority of Hadith, পৃষ্ঠা ৫০।

৮৩. শিবাই, আল-সুন্নাহ্ পৃষ্ঠা ৭৫; শাবির, Authority of Hadith, পৃষ্ঠা ৫১।

৮৪. আযামী, Studies, পৃষ্ঠা ৬৮-৭০; Hitu, Wajiz, পৃষ্ঠা ২৯২।

৮৫. বিস্তারিত জানতে দেখুন, শিবাই, আল-সুন্নাহ্, পৃষ্ঠা ৭৬-৮০; আযামী, Studies, পৃষ্ঠা ৬৮-৭৩।

৮৬. শিবাই, পৃষ্ঠা ৮১।

৮৭. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৮২।

৮৮. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৮৪-৮৫; আযামী, Studies পৃষ্ঠা ৬৮; Hitu, Wajiz, পৃষ্ঠা ২৯০।

৮৯. এগুলো ও অন্যান্য আরো উদাহরণ জানতে দেখুন, শিবাই, আল সুন্নাহ্, পৃষ্ঠা ২৮৫।

৯০. উদাহরণ হিসেবে দেখুন, জালাল আল দীন আল সুয়ুতির (মৃত্যু : ৯১১ হিজরি) আল লায়ালি আল মাসনুয়াহ ফি আহাদিস মাওদুয়াহ, শায়েখ আলী আল-ক্বারী আল-হানাফীর (মৃত্যুঃ ১০১৪) আল মাওদুয়াত আল কবীর এবং ইয়াহিয়া ইবনে আলী আল-শাওকানীর (মৃত্যুঃ ১২৫০) আল ফাওয়াইদ আল মাজমাহ ফিল আহাদিস আল মাওদুয়াহ।

www.pathagar.com

৯১. শিবাই, আল-সুন্নাহ্, পৃষ্ঠা ৮৬-৮৭; আযামী, Studies, পৃষ্ঠা ৬৯; Hitu, Wajiz, পৃষ্ঠা ২৯১।

৯২. একই গ্রন্থ।

৯৩. বিস্তারিত জানতে দেখুন, শিবাই, আল-সুন্নাহ্, পৃষ্ঠা ৮৮; Hitu, Wajiz পৃষ্ঠা ২৯১।

৯৪. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ৪৬; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ৮৪; মাহমাসানি, ফালসাফাহ, (জিয়াদেহ অনূদিত) পৃষ্ঠা ৭৪।

৯৫. খুদারী, উসুল, পৃষ্ঠা ২১৪; Aghnides, Muhammedan Theories, পৃষ্ঠা ৪০।

৯৬. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ৪৯; Hitu, Wajiz পৃষ্ঠা ২৯৪।

৯৭. গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৮; শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ৪৭; Hitu, Wajiz, পৃষ্ঠা ২৯৫ ।

৯৮. গাজ্জালী (মুস্তাস্ফা) ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৭-৮৮, এর প্রমাণ হিসেবে নিম্নোক্ত বিবরণ দিয়েছেন : ধরুন পাঁচ-ছয়জন লোক অন্য এক ব্যক্তির মৃত্যুর খবর জানাল, এতে নিশ্চিত কিছু বোঝাবে না; কিন্তু যখন মৃত ব্যক্তির পিতাকে শোকাতুর অবস্থায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা যাবে এবং তার মধ্যে বড় ধরনের আঘাত পাওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাবে যাতে মানুষ হিসেবে তার অস্বাভাবিক অবস্থার অভিব্যক্তি প্রকাশ পাবে, তাহলে এ দু'টি খবরের সমন্বয়ে ইতিবাচক জ্ঞান বুঝাবে।

৯৯. গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৬, খুদারী, উসুল, পৃষ্ঠা ২১৪।

১০০. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ৪৮; Hitu, Wajiz, পৃষ্ঠা ২৯৫।

১০১. গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৩; শাওকানি, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ৪৮।

১০২. ইসনাবী, নিহাইয়াহ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৫; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ৮৪; খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৪১।

১০৩. আবু দাউদ সুনান, (হাসান অনূদিত) ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৩৬, হাদিস নম্বর ৩৬৪৩।

১০৪. বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৭৮।

১০৫. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ৮৪; Aghnides, Muhammedan Theories, পৃষ্ঠা ৪৪; শাওকানী মাশহুরের সংজ্ঞায় (ইরশাদ, পৃষ্ঠা ৪৯) অবশ্য দ্বিতীয় এমনকি তৃতীয় হিজরি শতকের বলে সুপরিচিত হাদিসও অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

১০৬. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ৮৪; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৮৫।

১০৭. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৪১।

১০৮. দারিমী, সুনান, কিতাব আল ফারাইদ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৮৪; ইবনে মাজাহ, সুনান, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯১৩, হাদিস নম্বর ২৭৩৫; সহিহ মুসলিম, পৃষ্ঠা ২১২, হাদিস নম্বর ৮১৭; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৮৫।

১০৯. শাফেয়ী, রিসালাহ, পৃষ্ঠা ১৫৯; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ৮৪, মাহমাসানি, ফালসাফাহ, পৃষ্ঠা ৭৪।

www.pathagar.com

১১০. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ৪৮-৪৯।

১১১. আমিদী, ইহ্কাম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬১; মাহমাসানি, ফালসাফাহ, পৃষ্ঠা ৭৪।

১১২. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ৪৭; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ৮৫।

১১৩. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ৮৫; Hitu, Wajiz পৃষ্ঠা ৩০৫। যে আহাদ বা একক হাদিসে সহায়ক বিষয় বর্ণিত হয় যা মূল ধর্ম বিশ্বাসের জন্য অপরিহার্য নয়- যেমন কবর আজাব, (কেয়ামতের দিনে) সুপারিশ বা শাফায়াত ইত্যাদি; এগুলো অবশ্য মানতে ও বিশ্বাস করতে হবে। যে কেউ এগুলো অস্বীকার করবে সে বড় গোনাহগার (ফাসেক) হবে তবে কাফের হয়ে যাবে না। কারণ সে এমন বিষয় অস্বীকার করেছে যা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত নয়।

১১৪. বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৯১ ও খুদারী, উসুল, পৃষ্ঠা ২২৭।

১১৫. খুদারী, উসুল, পৃষ্ঠা ২১৭।

১১৬. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ২১৬।

১১৭. আহাদের শর্ত সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ৪৮-৫২; Hitu, Wajiz, পৃষ্ঠা ৩০৭, আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ৮৬; মাহমাসানি, ফালসাফাহ, পৃষ্ঠা ৭৪।

১১৮. খুদারী, উসুল, পৃষ্ঠা ২১৭।

১১৯. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ৬৭; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৯২।

১২০. খুদারী, উসুল, ২১৭।

১২১. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ৫২; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ৮৬; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৯৩; খুদারী উসুল, পৃষ্ঠা ২১৮।

১২২. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ৫৫

১২৩. খুদারী, উসুল, পৃষ্ঠা ২১৮-২১৯।

১২৪. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ৮৫।

১২৫. মুসলিম, সহিহ মুসলিম, পৃষ্ঠা ৪১, হাদিস নম্বর -১১৯।

১২৬. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ৮৫।

১২৭. তাবরিজি, মিশকাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৪, হাদিস নম্বর -৩১৯।

১২৮. Hitu, Wajiz, পৃষ্ঠা ৩০২; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৯৫।

১২৯. মুসলিম, সহিহ মুসলিম, পৃষ্ঠা ২৪৮, হাদিস নম্বর ৯২৮।

১৩০. Hitu, Wajiz পৃষ্ঠা ৩০৪; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৯৭-৯৮।

১৩১. শাফেয়ী, রিসালাহ, পৃষ্ঠা ১৪০; মুসলিম, সহিহ মুসলিম, পৃষ্ঠা ২৫১, হাদিস নম্বর ৯৪৪; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ৮৫।

১৩২. Hitu, Wajiz, পৃষ্ঠা ৩১৭; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৯৩-৯৪।

www.pathagar.com

১৩৩. খুদারী, উসুল, পৃষ্ঠা ২২৯।

১৩৪. তাবরিজি, মিশকাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৮, হাদিস নম্বর ২৩০; খুদরী, উসুল, পৃষ্ঠা ২২৯।

১৩৫. খুদরী, উসুল, পৃষ্ঠা ২২৭; Hitu, Wajiz পৃষ্ঠা ৩১৯-৩২০।

১৩৬. তাবরিজি, মিশকাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৬৩, হাদিস নম্বর ২৮৪৪; ইবনে মাজাহ, সুনান, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৩৭, হাদিস নম্বর ২১৮৭; খুদারী, উসুল, পৃষ্ঠা ২৩৩, Hitu, Wajiz, পৃষ্ঠা ৩১৮-৩১৯।

১৩৭. Hitu, Wajiz পৃষ্ঠা ৩১৬; খুদারী, উসুল, পৃষ্ঠা ২২৯; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ৮৬।

১৩৮. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ৬৪; আবু জাহরাহ, উসুল, ৮৭।

১৩৯. বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ১০০; খুদরী, উসুল, পৃষ্ঠা ২৩১; খিন, আসার, পৃষ্ঠা, ৩৯৯।

১৪০. শাফেয়ী, রিসালাহ, পৃষ্ঠা ৯০৪; ইসনাবী, নিহাইয়াহ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২৩, তাবরিজি, মিশকাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬৯৫, হাদিস নম্বর ৬০০৩।

১৪১. একই গ্রন্থ, Studies, পৃষ্ঠা ৬৪; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ৮৭; খিন, আসার, পৃষ্ঠা ৪০১।

১৪২. আযামী, পৃষ্ঠা ৪০; Hitu, Wajiz পৃষ্ঠা ৩১৬।

১৪৩. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৬০।

১৪৪. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৬২।

১৪৫. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ৬৪; শিবাই, আল সুন্নাহ, পৃষ্ঠা ৯৪; Hitu, Wajiz, পৃষ্ঠা ৩২১।

১৪৬. শিবাই, আল সুন্নাহ, পৃষ্ঠা ৯৫; আযামী, Studies, পৃষ্ঠা ৬২।

১৪৭. শিবাই, আল সুন্নাহ, loc. cit.

১৪৮. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৯৬।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

কুরআন-সুন্নাহ্ ব্যাখ্যার নীতিমালা/বিধিমালা-১
উৎস থেকে আইন সংগ্রহ

সূচনা বক্তব্য

কুরআন ও সুন্নাহ্ প্রদত্ত নির্দেশনা ও আভাস বা ইঙ্গিত থেকে আইনের বিধিবিধান সংগ্রহ করার লক্ষ্যে কুরআন বা সুন্নাহ্র ব্যাখ্যা করার জন্য এর ভাষা সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করা জরুরি। এসব উৎস ব্যবহারে সমর্থ হওয়ার জন্য এর মূল বক্তব্যের শব্দগুলো ও এর জন্য সুনির্দিষ্ট নিহিতার্থ অবশ্যই মুজতাহিদের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন থাকতে হবে। এ উদ্দেশ্যে উসুলের আলেমগণ উসুল আল ফিকহর পদ্ধতিতে শব্দগুলোর শ্রেণি বিভাগ ও তাদের ব্যবহার বিধি অন্তর্ভুক্ত করেছেন। শব্দের উৎপত্তি, তার ব্যবহার ও শ্রেণি বিভাগ করা সংক্রান্ত বিধিমালা প্রাথমিকভাবে ভাষাগত কারণের ভিত্তিতে করা হয়, আর সে কারণে তা আইন বা ধর্মের কোনো অবিচ্ছেদ্য অংশ নয়। তবে শরিয়তকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করার জন্য এগুলো সহায়ক হিসেবে কাজ করে।

মূল বক্তব্য কোনো প্রমাণ ছাড়াই সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার বুঝা গেলে সে ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে মুজতাহিদ কোনো ধরনের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবেন না। তবে ফিকহর বৃহত্তর অংশ যেসব বিধিবিধানের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে তা ব্যাখ্যা ও ইজতিহাদের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়েছে। এ বিষয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। ইজতিহাদ বিভিন্ন আকারে হতে পারে। আর এ ব্যাখ্যার লক্ষ্য হচ্ছে আইনগত মূল বক্তব্যের শব্দ ও বাক্যের অধীন অর্থ অনুধাবন করা, যা সব ধরনের ইজতিহাদের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

ব্যাখ্যার কাজ হলো কোনো বিষয়ে আইনদাতার অভিপ্রায় অথবা কোনো ব্যক্তির কথা ও কাজের উদ্দেশ্য কী ছিল তা নির্ণয় করা। প্রাথমিকভাবে ব্যাখ্যার লক্ষ্য হলো যা আপনা থেকে সহজবোধ্য নয় তা আবিষ্কার করা। তাই যে কোনো অন্য আইনের মতো ইসলামি আইনের ব্যাখ্যার লক্ষ্য হলো, পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে প্রয়োজনীয় অনুমানের বিষয় হিসেবে যা অপ্রকাশিত রাখা হয়েছে সে সম্পর্কে আইনদাতার উদ্দেশ্য কী ছিল তা নির্ণয় করা।[১]

নির্দিষ্ট অর্থ বুঝানোর জন্য স্পষ্টতা, ব্যাপ্তি ও বহন ক্ষমতার আলোকে শব্দগুলোকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। শব্দের ভাবগত স্পষ্টতা (Conceptual

www.pathagar.com

classify) নিরূপণের ভিত্তিতে উসুলের আলেমগণ শব্দসমূহকে দু'টি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন; এগুলো হলো, 'স্পষ্ট' ও 'অস্পষ্ট' শব্দ। এ শ্রেণি বিভাগের মূল উদ্দেশ্য হলো, শব্দের মাত্রা চিহ্নিত করা যাতে তার অর্থ স্পষ্ট অথবা অস্পষ্ট ও সন্দেহজনক বুঝায়। এ শ্রেণি বিভাগের তাৎপর্য তাৎক্ষণিকভাবে ভাষাগত রূপ এবং আদেশ ও নিষেধের ক্ষেত্রে পরিচালিত হয়। যে শব্দে কোনো আদেশ বুঝানো হয়েছে তার স্পষ্টতার (অথবা অস্পষ্টতার) মাত্রা কেউ নিরূপণ করার সামর্থ্য হলে কোনো আদেশের সুনির্দিষ্ট অর্থ মূল্যায়নের কাজ অনেকটা সহজ হয়ে যায়। এভাবে প্রকাশ্য (জাহির) ও সুস্পষ্ট (নস) স্পষ্ট শব্দ হওয়া সত্ত্বেও প্রেক্ষাপট ও পরিস্থিতির প্রয়োজনে এদের ভিন্ন অর্থের সপক্ষে প্রাথমিক অর্থ বর্জন করা হতে পারে। শব্দের প্রসারতার আলোকে সেগুলোকে সমার্থক, সাধারণ, সুনির্দিষ্ট, অকাট্য ও সীমিত শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। শব্দের ভাব বা অর্থের ব্যাকরণগত প্রয়োগের বিষয় মৌলিকভাবে এ শ্রেণি বিভাগের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে : কোনো শব্দ এক বা একাধিক অর্থ বুঝায় কি না অথবা কোনো শব্দ সুনির্দিষ্ট না সাধারণ অর্থ ব্যক্ত করে এবং কোনো বিষয়ে কোনো শব্দের সন্দেহাতীত প্রয়োগ এর পরিসরকে নির্দিষ্ট ও সীমিত করতে পারে কি না।

প্রকৃত ব্যবহারের আলোকে যেমন- কোনো শব্দকে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, আক্ষরিক, ব্যবহারিক ও সনাতন অর্থে পুনরায় দু'টি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। তাহলো, আক্ষরিক (হাকিকি) ও রূপকার্থ (মাজাজি)। উসুল আল ফিকহর পদ্ধতি থেকে আমরা জানতে পেরেছি, শব্দের রূপকার্থ গ্রহণ করে কোনো আদেশ ও নিষেধ গঠন করা যাবে না, কারণ তাতে তার প্রয়োগে অনিশ্চয়তা দেখা দেবে। তথাপি এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমন- যখন রূপকটি প্রাধান্য পায় তখন আক্ষরিক বা মূল অর্থ আর কোনো কাজে আসে না।

একটি আইন সম্পর্কিত বিধানের শক্তি যে ভাষায় তা প্রকাশিত হয়েছে তার ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে। শব্দের অস্পষ্টতা থেকে স্পষ্টতাকে পৃথক করা এবং অস্পষ্টতার মাত্রা নির্ণয়ও ফকিহদের জন্য আইনের বিরোধপূর্ণ দিকটি নিরসন প্রচেষ্টায় সহায়ক হয়। যখন কোনো মুজতাহিদ কোনো আভাস-ইঙ্গিত বা নিছক সম্ভাবনা থেকে আইন সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত হন, তখন তার কোনো কোনো সিদ্ধান্ত অন্যদের থেকে ভিন্ন হতে পারে। তাই দেখা যাচ্ছে ইজতিহাদ কেবল আইনের ভাষার উপলব্ধির জন্য দরকার তাই নয়; উপরন্তু এর সিদ্ধান্তের বিরোধের বিষয় নিরূপণের পদ্ধতি ও দিকনির্দেশনার জন্যও প্রয়োজন।

আমরা এসব বিষয়ের প্রতিটি সম্পর্কে পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে আলোচনা করব। কিন্তু তাবিলের আলোচনা এ অধ্যায় শুরু করলে তা ফলপ্রসূ হবে।

www.pathagar.com

তাবিল (রূপকধর্মী/ রূপকার্থ/নিহিতার্থ)

শুরুতেই এ কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আরবি ভাষায় স্পষ্টকরণের দু'টি শব্দ রয়েছে, তাহলো– তাবিল ও তাফসির। এর মধ্যে তাবিল স্পষ্টকরণের খুবই কাছাকাছি। অন্যদিকে তাফসিরের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে ব্যাখ্যা। ইংরেজিতে 'ইন্টারপ্রিটেশন' ও 'এক্সপ্লানেশন' দ্বারা আরবি শব্দ দু'টির যে পার্থক্য নির্দেশ করে তা প্রকাশ পায় না। 'রূপক স্পষ্টকরণ' তাবিলের গ্রহণযোগ্য সমার্থক হতে পারে। তবে আমি ইংরেজির সমার্থক হিসেবে মূল আরবি ব্যবহার করাকে প্রাধান্য দিয়েছি। তাই আমি তাবিল ও তাফসিরের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করে 'তাবিল' যথারীতি ব্যবহার করেছি।

মৌলিকভাবে তাফসিরের লক্ষ্য হচ্ছে কোনো মূল বক্তব্যের অর্থের ব্যাখ্যা প্রদান এবং এর শব্দ ও বাক্যের সীমার মধ্যে থাকা হুকম সংগ্রহ করা।[২] অন্যভাবে বলা যায় যে তাফসিরে মূল বক্তব্যের বিষয়বস্তু ও ভাষাগত গঠনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রদান করা হয়।

অন্যদিকে তাবিল শব্দ ও বাক্যের আক্ষরিক অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না এবং এদের অন্তর্নিহিত অর্থ ও পাঠ উদ্ধার করে যা প্রায় ধারণামূলক যুক্তি ও ইজতিহাদের ভিত্তিতে করা হয়ে থাকে। শব্দের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নিয়ম হলো তা স্পষ্ট প্রতীয়মান অর্থ প্রকাশ করে। তাবিল এ স্বাভাবিক নিয়ম থেকে সরে গেছে এবং এর প্রয়োগের যথার্থতা প্রতিপন্ন করার সপক্ষে যুক্তি না থাকলে তাবিল নেই বলে ধরে নেয়া হয়।[৩] বিভিন্নভাবে তাবিল কার্যকর হতে পারে। যেমন- প্রদত্ত আয়াতের সাধারণ বা আমকে খাস বা সুনির্দিষ্টকরণ অথবা সন্দেহাতীত পর্যায়ে উন্নীত করা। সব শব্দই সন্দেহাতীত, সাধারণ বা নিরঙ্কুশ অর্থ বুঝায় বলে ধরে নেয়া হয় যতক্ষণ না তা থেকে সরে বিকল্প অর্থ গ্রহণের সঠিক যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায়। আইনগত প্রেক্ষাপটে তাবিল ও তাফসিরের মূল উদ্দেশ্য একই। তাহলো আইনকে স্পষ্ট করা এবং নির্দেশনার আলোকে আইনদাতার উদ্দেশ্যকে আবিষ্কার করা, যার কিছু সুনির্দিষ্ট হতে পারে এবং অন্যগুলো অধিকতর দূরবর্তী। প্রাথমিকভাবে উভয়ই যেসব বক্তব্যের বিষয় আপনা থেকে প্রমাণিত নয় এবং ব্যাখ্যা সাপেক্ষ তার সাথে সংশ্লিষ্ট। অনেক সময় আইনদাতা অথবা যথাযথ আইন কর্তৃপক্ষ আইনগত বক্তব্যের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা প্রদান করে। এ ধরনের ব্যাখ্যাকে বলা হয় তাফসির তাশরিয়ী, যা আইনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আরো বলা যেতে পারে যে, তাফসির কুরআনের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনার ভিত্তিতে করা হয় এবং তা এর প্রয়োজনীয় ও যৌক্তিক অংশ গঠন করে। এর বাইরে অন্য সব ধরনের ব্যাখ্যা, সে তাফসির অথবা তাবিল যাই হোক না কেন, তার প্রকৃতি অভিমত বা ইজতিহাদের মতো এবং এ কারণে তা

www.pathagar.com

আইনের অবিচ্ছেদ্য অংশ গঠন করবে না। তাফসির ও তাবিলের মধ্যে পার্থক্য সব সময়ই সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ। আইন বিষয়ের আয়াতের ব্যাখ্যা বা মন্তব্য উভয়ই হতে পারে এবং কোনো একস্থানে এসে উভয়ে পরস্পরের সাথে মিলিত হতে পারে। তদুপরি তাফসির ও তাবিলের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যের বিষয় সচেতন থাকা ভালো হবে। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, উসুল আল ফিকহ বিশেষ করে বিশ্লেষণের নিয়মাবলির বিষয়ে আলোচনার প্রেক্ষাপটে প্রাথমিকভাবে তাফসির নয় তাবিলের প্রতি আমরা মনোযোগ দেব। উসুলের আলেমগণ তাবিলের সংজ্ঞায় বলেছেন, তাবিল হচ্ছে আয়াতের সুস্পষ্ট (জাহির) অর্থ বাদ দিয়ে অন্য অর্থ গ্রহণ করা এবং যার সপক্ষে যৌক্তিক সাক্ষ্য-প্রমাণ রয়েছে।[৪] যথাযথ শর্ত মেনে তাবিল করা হয় যাতে এর শুদ্ধতা নিশ্চিত হয় এবং সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য হয় এবং সাহাবিগণসহ রা. সব যুগের আলেমগণ কুরআন-সুন্নাহ্ থেকে আইনের বিধিবিধান সংগ্রহ প্রচেষ্টায় একে ব্যবহার করেছেন। তবে তাবিলের শুদ্ধতা নিশ্চিত করতে হলে নিম্নলিখিত শর্তাবলি অবশ্যই পূরণ করতে হবে : (১) তাবিল প্রয়োগের সপক্ষে কিছু সাক্ষ্য-প্রমাণ রয়েছে এবং নিছক মর্জিমাফিক বা ব্যক্তিগত অভিমতের ভিত্তিতে তাবিল হবে না। মূল পাঠ্যের (Text) শব্দ ও শব্দগুচ্ছ তাবিলের যোগ্য বা তাবিলের মাধ্যমে নিষ্পত্তি যোগ্য। এভাবে কেবলমাত্র নির্দিষ্ট ধরনের শব্দগুলো যেমন- প্রকাশ্য (জাহির) ও সুস্পষ্ট (নস) তাবিলের জন্য উন্মুক্ত। তবে দ্ব্যর্থহীন (মুফাচ্ছার) ও স্বচ্ছ (মুহকাম) তাবিলের জন্য উন্মুক্ত নয়। অনুরূপভাবে সাধারণ (আম), নিরঙ্কুশ (মুতলাক) সহজে তাবিলযোগ্য কিন্তু নির্দিষ্ট (খাস) ও অকাট্য (মুকায়াদ) নয়। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে এগুলোও তাবিলযোগ্য হতে পারে। (৩) যে শব্দের রূপক ব্যাখ্যা দেয়া হয় তার একটা প্রবণতা থাকে, এমনকি ব্যাখ্যার সপক্ষে একটা মাত্র দুর্বল প্রবণতাও থাকতে পারে। এ শর্ত প্রদত্ত শব্দগুলোর অর্থের বাইরে অস্বাভাবিক বিশ্লেষণ করাকে অসম্ভব করে তুলে। (৪) যে ব্যক্তি তাবিল করার চেষ্টা করবেন তাকে তা করার যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে অর্থাৎ তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অবশ্যই ভাষা, প্রচলিত রীতি অথবা বিচারিক ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। এভাবে কুরআনের আয়াতের (সুরা বাকারা, ২ : ২২৮) 'কুর' শব্দের দু'টি অর্থ রয়েছে। এ ছাড়া এর অন্য কোনো অর্থ করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না, তাহলো, ঋতুকালীন অবস্থা (হায়েজ) ও দুই ঋতুকালীন অবস্থার মধ্যবর্তী পরিচ্ছন্ন অবস্থা (তুহুর)। অন্য অর্থ করার যে কোনো চেষ্টা করলে তাতে ভাষার নিয়ম লঙ্ঘিত হবে। তবে আক্ষরিক অর্থ থেকে রূপক অর্থে এবং সাধারণ থেকে সুনির্দিষ্ট অর্থে পরিবর্তনের দৃষ্টিতে তাবিলের বিষয়টি আরবি ভাষার অপ্রচলিত রীতি নয়। বস্তুতপক্ষে যে কোনো ভাষায় এমন সব সম্ভাবনার বিষয় সমর্থনযোগ্য।[৫]

www.pathagar.com

দুই ধরনের তাবিল রয়েছে, তাহলো : দূরবর্তী ও অস্বাভাবিক তাবিল এবং 'প্রাসঙ্গিক' তাবিল যা সঠিক উপলব্ধি হিসেবে চিন্তা করার আয়ত্তের মধ্যে। প্রথম ধরনের তাবিলের একটি উদাহরণ হলো, একটি হাদিসের হানাফী বিশ্লেষণ। ওই হাদিস থেকে জানা যায় যে দুই বোনকে বিবাহ করা অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেন সাহাবি ফিরুজ আল দায়লামী রা.।[৬]

امسك ايتهما شءت وفارق الاخرى

তাকে তাদের দু'জনের মধ্য থেকে পছন্দমতো যে কোনো একজনকে রেখে অন্যজনকে তালাক দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। হানাফীগণ এ হাদিসের বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে যে, যদি একটি মাত্র কাবিনে তাদের বিয়ে হয় তাহলে আল দায়লামীকে রা. দুই বোনের মধ্যে একজনের সঙ্গে নতুন করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে বলা হয়েছে। তবে তারা যদি দু'টি পৃথক কাবিনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকেন তাহলে তিনি যাকে প্রথম বিয়ে করেছিলেন তাকে নতুন করে বিয়ে ছাড়াই রাখতে পারবেন। হানাফীগণ সম্ভবত একই কাবিনে দুই মহিলাকে বিয়ে করার অনুমতি না থাকা সংক্রান্ত শরয়ী বিধানের আলোকে এ তাবিল করেছেন। আর তা যদি না হয়ে থাকে তাহলে যাকে স্ত্রী হিসেবে রাখবেন তার সাথে নতুন করে কাবিন করা প্রয়োজন হবে।

তবে এ হলো দূরতম বিশ্লেষণ যা হাদিসের শব্দের দ্বারা সমর্থিত হয়নি। এ ছাড়া দায়লামী রা. একজন নওমুসলিম হওয়ায় শরয়ী বিধিবিধান সম্পর্কে তার অবগত থাকার কথা নয়। হানাফীগণ হাদিসটির যে অর্থ ব্যক্ত করেছেন রসুল সা.-এর উদ্দেশ্য কী তাই ছিল? রসুল সা. তো নিজেই একে সুস্পষ্ট করেছেন। তাই হানাফীদের বিশ্লেষণ হাদিসের বিষয়বস্তুর আলোকে টিকতে পারে না। তাই এ কারণে একে অস্বাভাবিক বলে গণ্য করা হয়েছে।[৭]

অস্বাভাবিক যুক্তি আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হওয়া ছাড়াই তাবিল গ্রহণযোগ্য হলে তা হবে প্রাসঙ্গিক ও সঠিক তাবিল। এ ধরনের বিশ্লেষণের উদাহরণ হিসেবে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম যে শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেন তাহলো, 'ইজা কুমতুম ইলা'ল সালাহ' (যখন তোমরা নামাজে দাঁড়াও)। এ হলো নামাজের জন্য ওজুর শর্তাবলি সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতে (সুরা মায়েদা, ৫ : ৭) অংশ। এর প্রাসঙ্গিক ও সঠিক অর্থ হলো 'যখন তোমরা নামাজ পড়ার ইচ্ছা কর।' এ ছাড়া এ আয়াত উপলব্ধির ক্ষেত্রে কিছু অনিয়ম দেখা দেবে। আলোচ্য আয়াতের সংশ্লিষ্ট অংশে বলা হয়েছে, "হে ইমানদারগণ, তোমরা যখন নামাজে দাঁড়াবে, তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও দুই হাতের কনুই পর্যন্ত ... ধৌত করবে।' 'যখন তোমরা নামাজে দাঁড়াবে' বলতে

www.pathagar.com

এখানে 'তোমরা যখন নামাজ আদায়ের ইচ্ছা কর' বুঝানো হয়েছে। বস্তুতপক্ষে নামাজে দাঁড়ানোর আগেই ওজু করা জরুরি, এটিই হচ্ছে আয়াতের সঠিক বিশ্লেষণ। কেননা আল্লাহ্ তায়ালা নামাজ শুরু পর ওজু করা জরুরি, মুমিনদের এ কথা বলেননি।[৮]

তাবিল পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা এবং জাহিরিদের মতো সব সময়ই কুরআন-সুন্নাহ্র আক্ষরিক অর্থ গ্রহণের মনোভাব আইন ও এর সাধারণ উদ্দেশ্যের চেতনা থেকে বিচ্যুত হওয়ার পথ প্রশস্ত করতে পারে। অন্যদিকে এ কথা বলা সমভাবে বৈধ হবে যে, অবশ্যই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বিশ্লেষণের চেষ্টা করতে হবে এবং যখন তা করা প্রয়োজন ও যুক্তিসঙ্গত হবে কেবল তখনই তা করতে হবে, অন্যথায় আইনের স্বেচ্ছাচার ও অপব্যবহার হতে পারে। সঠিক বিশ্লেষণের সমর্থন দেখতে পাওয়া যায় নুসুস, কিয়াস অথবা আইনের সাধারণ মূলনীতিতে। সাধারণত সঠিক বিশ্লেষণ আইনের সুস্পষ্ট নির্দেশনার বিরোধী হয় না এবং কুরআন-সুন্নাহ্র বিষয়বস্তুতেই এর যথার্থতা প্রকাশ পায়।[৯]

শ্রেণি বিভাগ-১ : স্পষ্ট ও অস্পষ্ট শব্দ

স্পষ্টতার (উজুহ) দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দ সমষ্টিকে প্রধান দুইটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে, তাহলো স্পষ্ট শব্দ ও অস্পষ্ট শব্দ। স্পষ্ট শব্দ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়াই এমন কোনো ভাবকে বুঝায় যা বোধগম্য। স্পষ্ট শব্দে কোনো বিধান প্রকাশ পেলে তাবিল অবলম্বন ছাড়াই তা আইনগত বাধ্যবাধকতার ভিত্তি গঠন করে। অন্যদিকে উপরিউক্ত গুণাবলির অভাব থাকলে একটি শব্দ অস্পষ্ট বলে বুঝাবে। এ শব্দ যে অর্থ প্রকাশ করে তা অস্পষ্ট/অসম্পূর্ণ এবং তার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। ব্যাখ্যা প্রয়োজন এমন অস্পষ্ট মূল পাঠে কোনো আমল বা কাজের ভিত্তি গঠন করতে পারে না। এ ধরনের ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে তা কেবল বাহ্যিক সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে সরবরাহ করা হতে পারে। কারণ খোদ মূল পাঠেই অস্পষ্টতা রয়েছে এবং বিষয়বস্তুর বাইরের সাক্ষ্য-প্রমাণ অবলম্বন ছাড়া তা পূর্ণাঙ্গ অর্থ প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়েছে। অন্যদিকে একটি স্পষ্ট মূল পাঠ স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং তাতে বাইরের কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণের আশ্রয় অবলম্বনের কোনো প্রয়োজন হয় না।

স্পষ্টতার মাত্রা ও উপলব্ধিগত শক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে স্পষ্ট শব্দ সমষ্টিকে চার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যার সূচনা হয়েছে কম স্পষ্ট শব্দ বা প্রকাশ্য (জাহির) দিয়ে। এরপর রয়েছে স্পষ্ট (নস) যা জাহিরের চেয়ে অধিকতর স্পষ্টতার অধিকারী। এরপর দ্ব্যর্থহীন (মুফাচ্ছার) এবং সর্বশেষে রয়েছে প্রাঞ্জল (মুহকাম) যার স্থান স্পষ্টতার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ। এরপর অর্থের অস্পষ্টতার মাত্রার আলোকে শব্দ সমষ্টিকে

www.pathagar.com

আবারো চার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এর সূচনা হয়েছে কম অস্পষ্ট শব্দ দিয়ে এবং শেষ হয়েছে সবচেয়ে অস্পষ্ট শব্দ দিয়ে। আমরা স্পষ্ট শব্দসমূহের ব্যাখ্যার মাধ্যমে এ বিষয়ে আলোচনা শুরু করব।

১. ১ ও ২, *জাহির ও নস*

প্রকাশ্য (জাহির) হচ্ছে এমন শব্দ যার স্পষ্ট অর্থ রয়েছে তথাপি তা তাবিলের জন্য উন্মুক্ত। প্রাথমিকভাবে এর কারণ হলো, এটি যে প্রেক্ষাপটে ঘটেছিল তার সঙ্গে এর অর্থ সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এটি এমন ধরনের শব্দ যার নিজস্ব আক্ষরিক/মূল অর্থ রয়েছে কিন্তু তার একটি বিকল্প বিশ্লেষণের সম্ভাবনাও উন্মুক্ত রয়েছে। উদাহরণ হলো, 'আমি একটি সিংহ দেখেছিলাম' বাক্যে 'সিংহ' শব্দটি যথেষ্ট স্পষ্ট। তবে সম্ভাবনা কম থাকা সত্ত্বেও এটা মনে করা যেতে পারে যে, বক্তা এ কথার মাধ্যমে একজন সাহসী ব্যক্তিকে বুঝিয়ে থাকতে পারেন। জাহিরের সংজ্ঞায় বলা হয়, এমন শব্দ বা শব্দ সমষ্টি যা স্পষ্ট অর্থ প্রকাশ করে। পক্ষান্তরে এ অর্থ খোদায়ী বিধানের যে মূল পাঠে পাওয়া গেছে তার মূল প্রতিপাদ্য নয়।[১০]

যখন কোনো শব্দ স্পষ্ট অর্থ প্রকাশ করে এবং যে প্রেক্ষাপটে তা প্রকাশ পায় তার সাথেও তা সঙ্গতিপূর্ণ হয়। তথাপি তা তাবিলের জন্য উন্মুক্ত হলে, সে শব্দকে নস শ্রেণিভুক্ত বলে মনে করা হয়। জাহির ও নসের মধ্যে পার্থক্য প্রধানত, যে প্রেক্ষাপটে তা প্রকাশ পায় তার সাথে তাদের সম্পর্কের ওপর নির্ভর করছে। জাহির ও নস দু'টিই স্পষ্ট শব্দ বুঝায়, কিন্তু দুইয়ের মাঝে যে পার্থক্য রয়েছে তাহলো– জাহির খোদায়ী বিধানের মূলপাঠের মূল প্রতিপাদ্য গঠন করে না, অন্যদিকে নস তা করে। বহু বিবাহ সংক্রান্ত কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতে এ বিষয়টি দেখতে পাওয়া যায় :

> 'তোমরা যদি ইয়াতিমদের প্রতি অবিচার করাকে ভয় কর তাহলে যেসব স্ত্রীলোক তোমাদের পছন্দ হয় তাদের মধ্য হতে দুই দুই, তিন তিন, চার চারজনকে বিয়ে করে নাও' (সুরা নিসা, ৪ : ৩)।

দু'টি বিষয় এ আয়াতের মূল প্রতিপাদ্য গঠন করেছে, তার একটি হলো একাধিক বিয়ে করার অনুমোদন রয়েছে। অন্যটি হলো, তা অবশ্যই সর্বোচ্চ চারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। তাই আমরা এ কথা বলতে পারি যে, এ হলো এ আয়াতের সুস্পষ্ট ঘোষণা (নস)। কিন্তু এ আয়াত পুরুষ ও নারীর মধ্যে বিয়ের বৈধতা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, বিশেষ করে আয়াতের যে অংশে বলা হয়েছে, 'যেসব স্ত্রীলোক তোমাদের পছন্দ হয় তাদের মধ্য থেকে বিয়ে কর'। অবশ্য বিয়েকে বৈধতা দেয়া এ আয়াতের

www.pathagar.com

মূল প্রতিপাদ্য নয় বরং সহায়ক বিষয়। মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে নস এবং পারিপার্শিক বিষয় হচ্ছে জাহির।[১১]

জাহির ও নস এর যে ফলাফল স্পষ্ট অর্থ প্রকাশ করে তা অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে এবং তার ভিত্তিতে আমল করা বাধ্যতামূলক যদি না তাতে তাবিলের আশ্রয় গ্রহণের সাক্ষ্য-প্রমাণ থাকে। এর অর্থ হলো, ভিন্ন ধরনের কোনো বিশ্লেষণ থাকতে পারে, যা আইনদাতার উদ্দেশ্যের সঙ্গে অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ হবে। বিশ্লেষণের মৌলিক নিয়মের শর্ত হলো, সুস্পষ্ট অর্থ পরিত্যাগের জোরালো কোনো কারণ না থাকলে শব্দের সুস্পষ্ট অর্থকে গ্রহণ ও অনুসরণ করতে হবে। যখন আমরা বলি, জাহির তাবিলের জন্য উন্মুক্ত তখন জাহির হচ্ছে সাধারণ এবং একে সুনির্দিষ্ট করা যেতে পারে, কিন্তু যখন তা সন্দেহাতীত হয় তখন তা সীমাবদ্ধ ও সুনির্দিষ্ট হতে পারে। অনুরূপভাবে জাহিরের আক্ষরিক অর্থ রূপক অর্থের সপক্ষে পরিত্যাজ্য হতে পারে। সবশেষে বলা যায়, জাহির কুরআন সুন্নাহ্‌র ক্ষেত্রে রদ হওয়ার বিষয় গ্রহণযোগ্য এবং তা কেবলমাত্র রসুল সা.-এর জীবদ্দশায় ঘটা সম্ভব ছিল। প্রাথমিকভাবে জাহিরের যে উদাহরণ দেয়া হয়েছে, তাহলো সন্দেহাতীত বিষয়; কিন্তু পরে কুরআনের আয়াতে (সুরা নিসা, ৪ : ২৪) তা সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। এতে বিয়ের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞার মাত্রা বর্ণিত হয়েছে। আয়াতটিতে এরপর বলা হয়েছে, 'এ ছাড়া আর যেসব মেয়েলোক রয়েছে তাদেরকে নিজেদের মাল-সম্পদের বিনিময়ে হাসিল করা তোমাদের জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছে এবং যথাযথভাবে তাদের বিয়ে কর...।' যেসব মহিলা আত্মীয়কে বিয়ে করা নিষিদ্ধ এ আয়াতের আগে তাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এ আয়াতে একাধিক বিয়ে অথবা স্ত্রীর খালা বা ফুফুকে বিয়ে করার কোনো উল্লেখ নেই। এ আয়াতের বাহ্যত বা জাহির অর্থ হচ্ছে, বিশেষ করে 'এ ছাড়া আর যেসব মেয়েলোক রয়েছে তারা তোমাদের জন্য হালাল' আয়াতের এ অংশে দৃশ্যত চারের অধিক মেয়েলোককে এবং স্ত্রীর খালা ও ফুফুকে বিয়ে করা বৈধতা প্রদান করা হয়েছে। অবশ্য এ আয়াতের সন্দেহাতীত শর্তাবলি পূর্বোল্লিখিত কুরআনের আরেকটি নির্দেশনার দ্বারা (সুরা নিসা, ৪ : ৩) সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে যাতে চারটি মেয়েলোককে বিয়ে করার সীমা বেঁধে দেয়া হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের অন্য বিষয়টি একটি মাশহুর হাদিসের মাধ্যমে মানোত্তীর্ণ হয়েছে, যাতে একই সাথে স্ত্রীর খালা ও ফুফুকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[১২] এ উদাহরণ জাহির ও নসের মধ্যকার বিরোধ রোধের একটি দৃষ্টান্ত হিসেবেও কাজ করে। যেহেতু আলোচ্য দু'টি আয়াতের দ্বিতীয়টি নস এবং তা জাহিরের চেয়ে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী, তাই তা বহাল থাকবে। জাহির ও নসের পারস্পরিক বিরোধের বিষয় নিয়ে পরে আরো আলোচনা করা হবে।

www.pathagar.com

এ কথা বলা দরকার যে, পারিভাষিক অর্থ ছাড়াও নসের অধিকতর সাধারণ একটি অর্থ রয়েছে, যা সাধারণভাবে ফকিহ্গণ ব্যবহার করেছেন। আমরা এখানে এর পারিভাষিক অর্থ নিয়ে আলোচনা করব। ফিকহ্র পরিভাষা হিসেবে নস অর্থ হলো কুরআন অথবা সুন্নাহ্র কোনো সুনির্দিষ্ট বক্তব্য বা নির্দেশনা। তাই বলা হয়ে থাকে, এ বা ওই নির্দেশনা হলো একটি নস, যার অর্থ হলো এটি কুরআন বা সুন্নাহ্র সুনির্দিষ্ট আদেশ। কিন্তু জাহিরের নস এমন শব্দ বা শব্দ সমষ্টি বুঝায় যাতে সুস্পষ্ট অর্থ প্রকাশ পায় এবং খোদায়ী বিধানের যে মূলপাঠে তা দেখতে পাওয়া গেছে তার মূল প্রতিপাদ্যের প্রতিনিধিত্ব করে। কুরআনের আয়াতে নস-এর একটি উদাহরণ হলো, সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে ঋণ ও অসিয়তকে উত্তরাধিকারের চেয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করা। প্রাসঙ্গিক আয়াতে উত্তরাধিকারীদের অংশ বণ্টনের পর বলা হয়েছে, 'সবক্ষেত্রে মৃত্যুর আগে কৃত অসিয়ত পূর্ণ করা এবং তার ঋণ পরিশোধ করার পরই' উত্তরাধিকারীদের মধ্যে অংশ বণ্টন করার কথা বলা হয়েছে (আন নিসা, ৪ : ১১)। অনুরূপভাবে কুরআনের আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে 'তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু ও রক্ত' (সুরা মায়েদা, ৫ : ৩)। মানুষের জন্য এসব দ্রব্য খাওয়া নিষিদ্ধের বিষয়টি হচ্ছে একটি নস।[১৩] আগেই বলা হয়েছে যে জাহিরের মতো নস ও তাবিল ও মনসুখের জন্য উন্মুক্ত। উদাহরণ হিসেবে মৃত জন্তু ও রক্ত গ্রহণ নিষিদ্ধ সবেমাত্র উদ্ধৃত আয়াতের সন্দেহাতীত হওয়ার বিষয় কুরআনের অন্যত্র সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে, তাতে 'রক্ত' বলতে প্রবাহিত রক্ত বুঝানো হয়েছে (সুরা আন'আম, ৬ : ১৪৫)। অনুরূপভাবে একটি হাদিসের দুই ধরনের মরা জন্তু খাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে তাহলো, মাছ ও পঙ্গপাল।[১৪] (১৩১ পৃষ্ঠায় এ হাদিসের পূর্ণ বিবরণ দেখুন)। নসের আরেকটি উদাহরণ হলো গবাদিপশুর জাকাত সংক্রান্ত একটি হাদিস যার তাবিল প্রয়োজন। হাদিসটিতে বলা হয়েছে :

فِي أَربعين شاة شاة

প্রতি ৪০টি ভেড়ার একটি' জাকাত হিসেবে দিতে হবে।[১৫]

এ হাদিসের সুস্পষ্ট নস হলো, হাদিসের শর্ত অনুযায়ী জাকাত হিসেবে পশুই দিতে হবে। কিন্তু এ কথা বলা আইনের মৌলিক উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে যে, হয় মেষ অথবা তার সমপরিমাণ অর্থ দেয়া যেতে পারে। জাকাতের উদ্দেশ্য হচ্ছে দরিদ্রদের প্রয়োজন পূরণ এবং সমপরিমাণ অর্থ দিয়ে তা আদায় করা যেতে পারে; এমনকি তা তাদের কাছে অধিকতর পছন্দনীয় হতে পারে।[১৬] হানাফীগণ অন্য দু'টি আয়াতের অনুরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। এর একটি হলো, মিথ্যা শপথের কাফফারা এবং অন্যটি রমজান মাসে ইচ্ছাকৃত রোজা ভঙ্গের কাফফারা। প্রথমটির কাফফারা

www.pathagar.com

হলো ১০ জন গরিব লোককে খাওয়ানো (সুরা মায়েদা, ৫ : ৯২) এবং দ্বিতীয়টির কাফফারা হলো, অনুরূপ ৬০ জনকে খাওয়ানো (সুরা মুজদালা, ৫৮ : ৪)। হানাফীগণ মনে করেন যে, ১০ জন গরিব লোককে একসাথে খাইয়ে, আবার এ ধরনের একজনকে ১০ বার খাওয়ানোর মাধ্যমেও কাফফারা আদায় করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় আয়াতের বিধানও উপলব্ধি করা যায়। হানাফীদের মতে, এর অর্থ ৬০ জন গরিব ব্যক্তিকে খাওয়ানো বা এ ধরনের এক ব্যক্তিকে ৬০ বার খাওয়ানো বুঝায়।[১৭]

আগেই বলা হয়েছে নস জাহিরের চেয়ে শক্তিশালী এবং দুইয়ের মধ্যে বিরোধ থাকলে সে ক্ষেত্রে নসের প্রাধান্য বহাল থাকবে। নিম্নের দু'টি আয়াতে এ বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। এর একটি হচ্ছে মদপান নিষিদ্ধ করা সংক্রান্ত নস এবং অন্যটি সাধারণভাবে পানাহার করা সংক্রান্ত জাহির। আয়াত দু'টি নিম্নে বর্ণিত হলো :

> হে ইমানদারগণ, শরাব, জুয়া ও এর আস্তানা ও পাশা একই নাপাক শয়তানী কাজ। তোমরা এগুলো পরিহার কর (সুরা মায়েদা, ৫ : ৯০)।
>
> যারা ইমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে তারা পূর্বে যা কিছু 'খানাপিনা' করেছে সে জন্য তাদের কোনোরূপ পাকড়াও করা হবে না; অবশ্য যদি তারা ভবিষ্যতে হারাম জিনিসগুলো থেকে দূরে থাকে এবং ইমানের ওপর মজবুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ও ভালো ভালো কাজ করে (সুরা মায়েদা, ৫ : ৯৩)।

প্রথম আয়াতের নস হলো মদ হারাম হওয়ার বিষয়টি যা হলো এ আয়াতের মূল উদ্দেশ্য ও প্রতিপাদ্য। দ্বিতীয় আয়াতের জাহির হলো, অবাধ পানাহার করার অনুমতি। অবশ্য দ্বিতীয় আয়াতের মূল উদ্দেশ্য হলো খোদাভীতি বা তাকওয়া। এ দৃষ্টিতে তাকওয়া খাবার গ্রহণের কৃচ্ছ্রতার সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। তাহলো, খোদা সম্পর্কে সচেতনতা ও সৎ কাজের বিষয়। এ দুই আয়াতের বাহ্যত বিরোধ রয়েছে বলে মনে হয়, যেহেতু মদপানের ওপর নিষেধাজ্ঞা একটি প্রতিষ্ঠিত নস এবং পানাহারের অনুমতির বিষয় জাহির আকারে এসেছে, তাই জাহিরের ওপর নস বহাল থাকবে।[১৮]

আধুনিক ফৌজদারি আইনে জাহিরের উদাহরণ দিতে আমরা 'রাত' শব্দটি উল্লেখ করতে পারি, যা চুরির সাথে সম্পর্কিত অনেক সংবিধিবদ্ধ আইনে দেখতে পাওয়া যায়। যখন রাতে চুরি সংঘটিত হয় তখন তার কঠোর শাস্তি দেয়া হয়। কেউ যদি রাতের প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করে তাহলে তা হবে সূর্যাস্ত থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময়। কিন্তু এ অর্থ আইনের উদ্দেশ্যের সাথে পুরোপুরি

www.pathagar.com

সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এখানে 'রাত' বলতে প্রকৃতপক্ষে গভীর রাত বুঝানো হয়েছে যা চুরির জন্য উপযুক্ত অবস্থা। এখানে জাহিরের অর্থ আইনের মৌলিক উদ্দেশ্য এবং আলোচ্য অপরাধের প্রকৃতির আলোকে জাহির নির্দিষ্ট করা হয়েছে।[১৯]

১. ৩ ও ৪. *দ্ব্যর্থহীন (মুফাচ্ছার) ও প্রাঞ্জল (মুহকাম)*

মুফাচ্ছার হচ্ছে এমন শব্দ বা আয়াত ও সুন্নাহ্ যার অর্থ পুরোপুরি স্পষ্ট। একই সাথে তা যে প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ বা বর্ণিত হয়েছিল তার সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ। এসব কারণ ও অর্থের উচ্চমাত্রার স্পষ্টতার কারণে মুফাচ্ছারের তাবিল অবলম্বনের কোনো প্রয়োজন নেই। তথাপি মুফাচ্ছার কুরআন-সুন্নাহ্র আলোকে বাতিলের জন্য উন্মুক্ত, যা রসুল সা.-এর জীবদ্দশায় সংঘটিত হয়েছিল। মুফাচ্ছারের ধারণা এ শব্দটিতেই নিহিত রয়েছে, আর তাহলো, আয়াত নিজ থেকেই তার ব্যাখ্যা তুলে ধরেছে। অন্য কথায় আইনদাতা পরিপূর্ণ স্পষ্টতা সহকারে তার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন এবং এ ক্ষেত্রে তাবিলের দরকার হয়নি। দুইভাবে মুফাচ্ছার হয়ে থাকে। একটিতে আয়াত নিজেই তার ব্যাখ্যা প্রদান করে, তাই তা স্বব্যাখ্যাত বা মুফাচ্ছার বিজাতি এবং অন্যটিতে একটি আয়াতের অস্পষ্টতা অন্য একটি আয়াত দ্বারা স্পষ্ট ও ব্যাখ্যা করা হয় এবং একে বলা হয় মুফাচ্ছার বিগাইরি। এ ক্ষেত্রে দু'টি আয়াত পরস্পরের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয় এবং আয়াত দু'টি একত্রে মুফাচ্ছার গঠন করে।[২০] কুরআনের সুরা তাওবার একটি আয়াতে (৯ : ৩৬) মুফাচ্ছারের উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়। আয়াতটিতে মুমিনদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে : 'আর মুশরিকদের সাথে সকলে মিলে (কাফফা) লড়াই কর, যেমন তারা সবাই মিলে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে।' আয়াতটিতে 'কাফফা' শব্দটি বার বার উচ্চারিত হয়েছে, যা তার পূর্ববর্তী শব্দগুলো যেমন শিরককারীদের (মুশরিকীন) ক্ষেত্রে নির্দিষ্টকরণ (তাকসিস) প্রয়োগের সম্ভাবনা নাকচ করেছে। সুনির্দিষ্ট অপরাধ ও তার দণ্ড সম্পর্কিত অনেক আধুনিক সংবিধিবদ্ধ আইনে মুফাচ্ছার সংঘটিত হতে দেখা যায়। তবে নাগরিক দায়দায়িত্ব, ক্ষতিপূরণ দান ও ঋণ পরিশোধের প্রসঙ্গেও তা হয়ে থাকে। সংবিধিবদ্ধ আইনের শব্দও সব সময়ই এতটা স্বব্যাখ্যাত ও সুনির্দিষ্ট হয় যে, তার তাবিল অবলম্বন সম্ভব হয় না। তবে আয়াতের সংশ্লিষ্ট যে অংশটি অস্পষ্ট (মুজমাল) এবং যা পরিষ্কার করার দরকার তার ব্যাখ্যার মৌলিক কাজটুকু খোদ কুরআনের অন্য একটি আয়াতই সম্পাদনা করেছে। যখন প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দেয়া হয়, তখন অস্পষ্টতা দূর হয়ে যায় এবং আয়াতটি মুফাচ্ছারে পরিণত হয়। এর উদাহরণ হলো কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে 'লাইলাতুল

www.pathagar.com

ক্বদর' (ক্বদরের রাত) এ শব্দগুচ্ছ অস্পষ্টভাবে শুরু হয়, অতঃপর এর ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় :

> আমরা একে (কুরআন) ক্বদরের রাতে নাজিল করেছি। তুমি কি জানো ক্বদরের রাত কী? ... ফেরেশতা ও রূহ এ (রাতে) তাদের খোদার অনুমতিক্রমে সব হুকম নিয়ে অবতীর্ণ হয় (সুরা ক্বদর, ৯৭ : ১-৪)।

এ আয়াতে এভাবে 'লাইলাতুল ক্বদরের' ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এবং প্রদত্ত ব্যাখ্যার কারণে আয়াতটি স্বব্যাখ্যাত বা মুফাচ্ছারে পরিণত হয়েছে। তাই তাবিল অবলম্বনের কোনো প্রয়োজন হয়নি। অনেক সময় কুরআনের আয়াতে অস্পষ্টতা থাকলে সুন্নাহ্‌তে তা সুস্পষ্ট করা হয়েছে, এ ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা প্রদানকারী সুন্নাহ্‌ কুরআনী আইনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। এ ধরনের ব্যাখ্যার বহু উদাহরণ রয়েছে। যেমন- সালাত, জাকাত, হজ, সুদ যা নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে দেখতে পাওয়া যায় :

> নামাজ আদায় কর ও জাকাত প্রদান কর (সুরা নাহল, ১৬ : ৪৪)।
>
> লোকদের ওপর খোদার এ অধিকার আছে যে, এ ঘর পর্যন্ত পৌঁছার সমর্থ যার আছে সে যেন তার হজ সম্পন্ন করে (সুরা আলে ইমরান, ৩ : ৯৭)।
>
> আল্লাহ ব্যবসায়কে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন (সুরা বাকারা, ২ : ২৭৫)।

এসব আয়াতের এ সংক্ষিপ্ত উল্লেখ থেকে নামাজ, জাকাত, হজ ও সুদের কানুনী অর্থ জানা সম্ভব নয়। তাই রসুল সা. মৌখিক ও বাস্তবকর্মের নির্দেশনার আকারে এসবের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এভাবে প্রাথমিকভাবে অস্পষ্ট (মুজমাল) আয়াতসমূহ মুফাচ্ছারে পরিণত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে নামাজ প্রসঙ্গে বলা যায়, রসুল সা. তার সাহাবিদের রা. নির্দেশ দিয়েছেন :

صلوا كما رأيتموني أصلي

> 'তোমরা আমাকে যেভাবে নামাজ আদায় করতে দেখছো ঠিক সেভাবে তোমরা নামাজ পড়বে।'

এবং হজ সম্পর্কে রসুল সা. তাদেরকে এ নির্দেশ দেন :

www.pathagar.com

خذوا عني مناسككم

তোমরা আমার থেকে হজের আরকানগুলো শিখে নাও।[২১]

সুদ হারাম হওয়া কুরআনের নির্দেশের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত বহু হাদিস রয়েছে।

মুফাচ্ছারের মান বা মূল্য (হুকম) হলো, এর ওপর আমল করা ফরজ বা বাধ্যতামূলক। মুফাচ্ছারের সুস্পষ্ট অর্থের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দরকার নেই এবং তা মুনসুখ না হলে আয়াতের সুস্পষ্ট নির্দেশনা অবশ্যই মেনে চলতে হবে। যেহেতু রসুল সা.-এর ওফাতের সাথে সাথে কুরআন ও সুন্নাহ্র অবতরণের পরিসমাপ্তি ঘটেছে তাই সব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের আলোকে মুফাচ্ছার প্রাঞ্জল বা মুহকামের সমতুল্য- যা হলো স্পষ্টই তাদের সর্বোচ্চ পর্যায় এবং তা কোনোরূপ পরিবর্তনের জন্য উন্মুক্ত নয়।

সুনির্দিষ্ট শব্দগুলো (আল আলফাজ আল খাস্সাহ) তাবিলের জন্য উন্মুক্ত নয় অথবা তাদের প্রাথমিক অর্থের কোনো ধরনের পরিবর্তনযোগ্য নয়। এগুলো প্রকৃতিগতভাবে মুফাচ্ছার। এভাবে কুরআনের (সুরা নূরে, ২৪ : ৪) মিথ্যা অপবাদের (কাজফ) জন্য ৮০টি বেত্রাঘাতের দণ্ড এবং (সুরা নিসার, ৪ : ১১) উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আয়াতে বৈধ উত্তরাধিকারীদের জন্য সুনির্দিষ্ট অংশ প্রাপ্তির বিধান নির্ধারিত সংখ্যার সমন্বয়ে গঠিত যা তাবিলের সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছে।[২২]

এগুলোর সবই মুফাচ্ছারের মানসম্পন্ন। যেহেতু মুফাচ্ছার নসের চেয়ে একমাত্রা শক্তিশালী সেহেতু উভয়ের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে মুফাচ্ছারই বহাল থাকবে। দু'টি হাদিসে এ বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। কোনো মহিলার অনিয়মিত মাসিকের ক্ষেত্রে তার ওজু সংক্রান্ত এ হাদিসে বলা হয়েছে স্বাভাবিক তিন বা তার চেয়ে বেশি দিনের স্থলে কোনো মহিলার মাসিক দীর্ঘতর হলে তাকে নামাজ পড়তে হবে। আর নামাজের জন্য ওজুও করতে হবে। হাদিসটিতে তাকে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা হলো :

المستحاضة تتضا لكل صلاة

'কোনো মহিলার মাসিক দীর্ঘ সময় ধরে হলে তাকে প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাজের জন্য অবশ্যই নতুন করে ওজু করতে হবে'।[২৩]

অন্য আরেকটি হাদিসে বলা হয়েছে :

www.pathagar.com

المستحاضة تتوضا وقت كل صلاة

> কোনো মহিলার মাসিক দীর্ঘ সময় ধরে হলে তাকে প্রতিবার নামাজের সময় অবশ্যই নতুন করে ওজু করতে হবে।[২৪]

প্রথম হাদিসটিতে প্রত্যেক নামাজের জন্য নতুন করে ওজুর প্রয়োজন হলো একটি নস। কিন্তু দ্বিতীয় হাদিসটি মুফাচ্ছার যা তাবিলকে অনুমোদন করে না। প্রথম হাদিসে 'প্রত্যেক নামাজ' বলতে ফরজ ও নফল উভয় ধরনের নামাজের ক্ষেত্রে ওজু প্রয়োজন কি না তা পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। মনে করুন, প্রত্যেক ওয়াক্তের উভয় ধরনের নামাজ আদায় করতে হয়। তাহলে সে ক্ষেত্রে কি পৃথক ওজু করার প্রয়োজন? কিন্তু দ্বিতীয় হাদিসটিতে এ ধরনের কোনো অস্পষ্টতার প্রশ্ন উঠেনি। এতে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে যে, প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাজের জন্য ওজু করা প্রয়োজন এবং এ নির্দিষ্ট ওয়াক্তের সব নামাজ সে মতোই আদায় করা যাবে।[২৫]

যেসব শব্দ ও বাক্যের অর্থ সন্দেহাতীতভাবে স্পষ্ট এবং তাবিল বা মানসুখের জন্য উন্মুক্ত নয় তাকে বলা হয় মুহকাম (প্রতিষ্ঠিত নির্দেশ)। এর একটি উদাহরণ যা কুরআনের আয়াতে প্রায়ই দেখা যায়। তাহলো, 'আল্লাহ তায়ালা সব কিছুই জানেন।' রসুল সা.-এর জীবদ্দশায় অথবা তার ওফাতের পর কোনো অবস্থাতেই এ ধরনের বক্তব্য মুনসুখ হওয়া সম্ভব নয়।[২৬] অনেক সময় আয়াতেই তার ব্যাখ্যা থাকে, যা মানসুখের সম্ভাবনা নাকচ করে দেয়। এর একটি উদাহরণ হলো, রসুল সা.-এর পত্নীগণ সম্পর্কে মুমিনদের উদ্দেশ্য করে কুরআনের একটি আয়াত, এতে বলা হয়েছে : 'তোমরা আল্লাহর রসুলকে কষ্ট দেবে, তা তোমাদের পক্ষে কিছুতেই জায়েজ হতে পারে না, না তার অবর্তমানে তার স্ত্রীদের বিয়ে করা তোমাদের পক্ষে জায়েজ হতে পারে। তা আল্লাহ তায়ালার কাছে অতি বড় গোনাহের কাজ' (আল আহজাব, ৩৩ : ৫৩)। এখানে 'আবাদান' (কখনই নয়, আদৌ নয়) শব্দটির মাধ্যমে নিষিদ্ধের বিষয়টি জোর দিয়ে উল্লেখ কর হয়েছে, এটি মুহকাম বুঝাচ্ছে, যা মানসুখের সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছে। বস্তুতপক্ষে মুহকাম মুফাচ্ছার বৈ কিছু নয়। দুইয়ের মধ্যে একটি পার্থক্য রয়েছে, তাহলো, মুহকাম মানসুখের জন্য উন্মুক্ত নয়। মুহকামের একটি উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায় জিহাদ সংক্রান্ত একটি হাদিসে। তাতে বলা হয়েছে :

الجهاد ماض إلى يوم القيامة

'কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদ (পবিত্র সংগ্রাম) বৈধ থাকবে'।[২৭] উসুলের আলেমগণ মুহকামের আরেকটি উদাহরণ হিসেবে মিথ্যা অপবাদ দানের কুরআনের আয়াত

www.pathagar.com

পেশ করেছেন। যদিও এর ব্যাখ্যার বিষয়ে হানাফী ও শাফেয়ী ফকিহদের মধ্যে কিছুটা এখতেলাফ রয়েছে। আয়াতটি মিথ্যা অপবাদের জন্য দোষী সাব্যস্ত ও দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কিত : ' ...আর তাদের সাক্ষ্য কখনো কবুল করো না, তারা নিজেরাই ফাসেক' (সুরা নূর, ২৪ : ৪)। পুনরায় আবাদান (চিরকাল) শব্দটি আসায় আয়াতটি মুহকাম বুঝাচ্ছে এবং এতে মানসুখের সব সম্ভাবনা নাকচ হয়ে গেছে। হানাফীগণের মতে, আয়াতটির স্পষ্ট শর্তে কোনো ধরনের ব্যতিক্রম স্বীকার করা হয়নি। একজন কাজিফ হচ্ছে মিথ্যা অপবাদ দানকারী ব্যক্তি তাই তাকে সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না, এমনকি তওবা করার পরও। তবে মালেকীরা মনে করেন, শাস্তির পর কাজিফ তওবা করলে তাকে সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। শাফেয়ীদের মতে, এ ব্যতিক্রমের কারণ হলো ওই আয়াতের পরবর্তী অংশ, যাতে বলা হয়েছে : 'সেই লোকেরা নয় যারা এরপর তওবা করবে এবং সংশোধন করে নেবে।' এ মতপার্থক্য বা এখতিলাফের কারণ সম্পর্কে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করার দরকার নেই। আয়াতের দু'টি সর্বনাম বুঝার ক্ষেত্রে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। এ সর্বনাম দু'টি কাজিফ না ফাসেক অথবা কেবল শেষেরটি বুঝিয়েছে কি না তা নিয়েই এ এখতিলাফ। আয়াতের বিধান অনুযায়ী কাজিফের ৮০টি কোড়া মারার মূল শাস্তি বিধানের ব্যাপারে এখানে কোনো মতানৈক্য নেই বরং কেবল অতিরিক্ত শাস্তি-সাক্ষী হিসেবে তাদের চিরতরে নিষিদ্ধ করার বিষয়ে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। তাই দেখা যাচ্ছে এসব মতপার্থক্যের বিষয় তাবিল নয় বরং তাফসিরের আওতায় পড়ে। মুহকাম মানসুখের জন্য উন্মুক্ত নয়। উপরের উদাহরণের আয়াতটিতেই এ বিষয়টি নির্দেশিত হতে পারে অথবা মানসুখ আয়াতের অনুপস্থিতির কারণেও এটি হতে পারে। পরের বিষয়টি মুহকাম বিজাতি বা স্বমহিমায় মুহকাম আর দ্বিতীয়টি মুহকাম বিগাইরি বা অন্য কারণে মুহকাম।[২৮]

উপরের চার প্রকার স্পষ্ট শব্দের মধ্যকার পার্থক্য নিরূপণের উদ্দেশ্য হলো এগুলোর মাত্রা চিহ্নিত করা অথবা অন্যথায় তা তাবিলযোগ্য, অর্থাৎ এর স্পষ্ট উচ্চারিত অর্থের থেকে ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করা এবং তা মানসুখের জন্য উন্মুক্ত কি না সেটি নিরূপণ করা। যদি শব্দগুলোতে এ ধরনের কোনো সম্ভাবনা উন্মুক্ত না থাকে তাহলে ধরে নেয়া হবে এর মূল বা প্রাথমিক অর্থ বহাল থাকবে এবং এর অন্য কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ গ্রহণ করা হবে না। অন্য কথায় বর্তমান শ্রেণি বিভাগে তাবিলের চিন্তাভাবনার সুযোগ থাকলে তা কেবল জাহির ও নসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। কিন্তু মুফাচ্ছার ও মুহকামের ক্ষেত্রে নয়। এ শ্রেণি বিভাগের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো, বিভিন্ন শ্রেণির শব্দের সম্ভাব্য বিরোধ নিরসনের একটি দিক নির্দেশনা প্রদান করা। এভাবে একটি অগ্রাধিকক্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যাতে অন্য তিন শ্রেণির স্পষ্ট শব্দের উপরে মুহকামকে স্থান দেয়া হয়েছে এবং নসের ওপর মুফাচ্ছার ইত্যাদি। কিন্তু কুরআনের

www.pathagar.com

আয়াতে পরস্পর বিরোধী উভয় শব্দ এলেই কেবল এ অগ্রাধিকারক্রম প্রয়োগ করা হয়। অবশ্য যখন কুরআনের জাহির এবং সুন্নাহ্‌র নসের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় তখন অগ্রাধিকারক্রমে একমাত্র দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও জাহির বহাল থাকবে। বিয়ের অভিভাবকত্ব সম্পর্কে কুরআনের আয়াতে এ বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। এখানে শব্দটি প্রকৃতিগতভাবে জাহির। আয়াতটিতে বলা হয়েছে : 'স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক দেয় তাহলে সে স্ত্রী তার জন্য হালাল হবে না; অবশ্য পরে সে পুনরায় তাকে বিয়ে করতে পারবে যদি অন্য ব্যক্তির সাথে তার বিয়ে হয় (হাত্তা তানকিহা) এবং সে তালাক দেয়' (আল বাকারা ২ : ২৩০)। এ আয়াতে অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে বিষয়টি জাহির, কেননা এ মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে তালাক (বিবাহ বিচ্ছেদ), অভিভাবকত্ব নয়। আয়াতের 'তানকিহা' শব্দের আরবি রূপ থেকে হানাফীগণ অতিরিক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তাহলো, একজন বয়স্ক নারী তার অভিভাবকের উপস্থিতি ছাড়াই তার নিজের বিয়ের ব্যাপারে চুক্তি সম্পাদন করতে পারবে। কিন্তু অভিভাবকত্বের বিষয়ে একটি হাদিস রয়েছে যা প্রকৃতিগতভাবে নস। তাতে বলা হয়েছে :

لا نكاح الا بولي

অভিভাবক (ওয়ালী) ছাড়া কোনো বিয়ে হবে না।[২৯]

এ হাদিসটির বিষয় অধিকতর সুনির্দিষ্ট; তাহলো, কোনো মহিলার বিয়ের চুক্তি অবশ্যই তার অভিভাবক করবে। তৎসত্ত্বেও অন্তত হানাফীগণ হাদিসের নসের উপরে কুরআনের জাহিরকে স্থান দিয়েছেন। অবশ্য সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম এ ক্ষেত্রে সুন্নাহ্‌র নির্দেশনা অনুসরণ করেছেন।[৩০]

২. অস্পষ্ট শব্দগুলো (আল আলফাজ গায়ের আল ওয়াজিহা)

এসব শব্দ অতিরিক্ত স্পষ্ট প্রমাণের সাহায্য ছাড়া আপনা থেকেই স্পষ্ট অর্থ প্রকাশ করতে পারে না, যা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা অথবা মুজতাহিদ সরবরাহ করে থাকেন। যদি অনুসন্ধান ও ইজতিহাদের মাধ্যমে সহজাত অস্পষ্টতা দূর করা হয় তাহলে এসব শব্দ খফি (অস্পষ্ট) ও মুশকিল (কঠিন) শ্রেণিভুক্ত হবে। তবে কেবল আল্লাহ প্রদত্ত ব্যাখ্যার মাধ্যমে অস্পষ্টতা দূর করা হলে সে শব্দ হয় মুজমাল (দ্ব্যর্থবোধক) হবে অথবা মুতাশাবিহ (দুর্বোধ্য)। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হলো।[৩১]

২. ১ *অস্পষ্ট (খফি)*

খফি হচ্ছে এমন শব্দ যার একটি মৌলিক অর্থ রয়েছে কিন্তু কিছু পৃথক পৃথক ঘটনায় ব্যবহারের ক্ষেত্রে এর অর্থ আংশিকভাবে দ্ব্যর্থবোধক হয়। কেবলমাত্র এসব ঘটনার ফলশ্রুতিতেই শব্দটি অস্পষ্ট হয়ে থাকে। খফির দ্ব্যর্থবোধকতা সুস্পষ্ট করার

www.pathagar.com

জন্য বাইরের সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রয়োজন, যা সব সময়ই একটা গবেষণা ও ইজতিহাদের বিষয়। খফির একটি উদাহরণ হলো, 'চোর' (শারিক) শব্দটি। এর একটি মৌলিক অর্থ রয়েছে, কিন্তু যখন তা কোনো পকেটমার বা কাফন চুরির মতো ঘটনায় ব্যবহার করা হয় তখন তাৎক্ষণিকভাবে স্পষ্ট জানা যায় না যে 'চোর' এর মধ্যে পকেটমার অন্তর্ভুক্ত আছে কি নেই এবং চুরির শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে কি না। এসব কর্মকাণ্ডে চুরির মৌলিক উপাদান বর্তমান রয়েছে। কিন্তু বস্তুতপক্ষে কোনো ব্যক্তির জাগ্রত অবস্থায় তার অর্থ ছিনিয়ে নিতে একজন পকেটমার এক ধরনের কৌশল অবলম্বন করে যা চুরির থেকে কিছুটা ভিন্ন ধরনের। অনুরূপভাবে মুর্দার কাফন চুরিতে লিপ্ত ব্যক্তি- নাব্বাশ, 'চোরের' অন্তর্ভুক্ত হবে কি না তাও নিশ্চিত নয়; কারণ কাফন প্রহরাধীন কোনো বস্তু (মাল মুহরাজ) নয়। ইমাম শাফেয়ী ও আবু ইউসুফ নাব্বাশের জন্য চুরির সুনির্দিষ্ট শাস্তি প্রয়োগ করার পক্ষে। অন্যদিকে অধিকাংশ আলেমের মত হলো, এটি তাজিরের আওতায় বিচারপূর্বক শাস্তিযোগ্য বিষয়। একটি ইজাতিহাদী মতও রয়েছে, যাতে পকেটমারের জন্য চোরের হাদ প্রয়োগের অনুমোদন দেয়া হয়েছে।[৩২]

নিম্নের হাদিসে 'কাতিল' (খুনি বা হত্যাকারী) শব্দটি রয়েছে।

لا يرث القاتل

খুনি অবশ্যই উত্তরাধিকারী হতে পারবে না।[৩৩]

এখানে কাতিল শব্দটিও খফি। এ কারণে ভুলবশত হত্যাকাণ্ডের (কতল আল খাতা) মতো কয়েক ধরনের হত্যাকাণ্ড রয়েছে। মালিকীগণ মনে করেন যে, ভুলবশত হত্যাকাণ্ড এ হাদিসের অর্থের আওতায় পড়বে না। অন্যদিকে হানাফীগণের মতে, জনগণের জীবনের নিরাপত্তা বিধানের জন্য ভুলবশত হত্যাকাণ্ডও এ হাদিসের অর্থের অন্তর্ভুক্ত হবে।[৩৪] খফির অস্পষ্টতা দূর করার জন্য সাধারণত ইজতিহাদের পন্থা অবলম্বন করা হয়ে থাকে। এতে উপরিউক্ত উদাহরণের জন্য কেন ভিন্ন ভিন্ন বিধান রাখা হয়েছে তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। খফি বিচারিক ব্যবস্থার ভিত্তি হওয়ার পূর্বে মুজতাহিদের কর্তব্য হলো এর অস্পষ্টতা দূর করতে সচেষ্ট হওয়া।

২. ২ *কঠিন (মুশকিল)*

মুশকিল এমন শব্দকে বুঝায়, যা সহজাতভাবে দ্ব্যর্থবোধক এবং কেবলমাত্র গবেষণা ও ইজতিহাদের মাধ্যমে এ অস্পষ্টতা দূরীভূত করা যেতে পারে। মুশকিল ও খফির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে; তাহলো, খফির একটি মৌলিক অর্থ রয়েছে, যা সাধারণত

www.pathagar.com

স্পষ্ট অন্যদিকে মুশকিল সহজাতভাবে দ্ব্যর্থবোধক বা অস্পষ্ট। এর উদাহরণ হলো, যেসব শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে এবং যখন তা কুরআনের কোনো আয়াতে দেখা যায় তখন সে আয়াত এর ভিন্ন ভিন্ন অর্থের কারণে অস্পষ্ট হয়। এভাবে সুরা আল বাকারার আয়াতে (২ : ২২৮) 'কুর' শব্দটি মুশকিল, কারণ এর দু'টি ভিন্ন অর্থ রয়েছে, তাহলো মাসিক (হায়েজ) এবং দু'টি মাসিকের মধ্যবর্তী পরিচ্ছন্ন অবস্থা (তুহুর)। এর কোন অর্থটি গ্রহণ করা হবে তার ভিত্তিতে আয়াতটির নির্দেশনায় পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। 'কুর'-এর সঠিক অর্থ হিসেবে ইমাম শাফেয়ী ও আরো অনেক ফকিহ্ তুহুর অন্যদিকে হানাফী ও অন্যরা হায়েজকে গ্রহণ করেছেন।

অনেক সময় পরস্পরবিরোধী আয়াত থাকার কারণেও কোনো আয়াতে মুশকিল দেখা দিয়ে থাকে। অবশ্য এ ধরনের দু'টি আয়াতের প্রত্যেকটি পৃথকভাবে দেখলে সম্পূর্ণ স্পষ্ট কিন্তু যখন তাদের সমন্বয় করার চেষ্টা করা হয় তখন মুশকিল হয়ে দেখা দেয়। নিম্নের দু'টি আয়াতে এ বিষয়টি দেখতে পাওয়া যায়। এর একটিতে বলা হয়েছে :

> যদি তাদের কোনো কল্যাণ হয় তাহলে তারা বলে এ তো আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে হয়েছে। আর কোনো অকল্যাণ হলে বলে, এটা হয়েছে তোমার বদৌলতে (আন নিসা, ৪ : ৭৯)।

অন্যত্র (সুরা আল ইমরানে, ৩ : ১৫৪) আমরা দেখতে পাই, 'বলে দাও, এ কাজের সমস্ত ইখতিয়ার রয়েছে একমাত্র আল্লাহর হাতে।' নিম্নের দু'টি আয়াতেও অনুরূপ মুশকিল লক্ষ করা যায়। প্রথম আয়াতটিতে বলা হয়েছে : 'আল্লাহ তায়ালা কখনো নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনার হুকুম দেন না' (সুরা আ'রাফ ৭ : ২৮)। এরপর আমরা (সুরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ১৬) দেখতে পাই : 'আমরা যখন কোনো জনপদকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত করি তখন তার সচ্ছল অবস্থার লোকদেরকে হুকুম দেই; আর তারা সেখানে সব ধরনের নাফরমানী করতে শুরু করে। তখন আজাবের ফায়সালা এ জনপদের ভাগ্যলিপি হয়ে দাঁড়ায়। আর আমরা তাকে বরবাদ করে রাখি।' সর্বাত্মক ধ্বংসকে কি এক ধরনের শয়তানী কাজ বলা যেতে পারে? মুশকিলের সঠিক অর্থ কোনটি হবে সে ব্যাপারে কোনো নিশ্চয়তা না থাকায় তা সহজাতভাবে দ্ব্যর্থবোধক। মুজতাহিদ এর যত ব্যাখ্যাই প্রদান করুন না কেন তা ধারণামূলক হতে বাধ্য। তৎসত্ত্বেও কোনো কাজের ভিত্তি হিসেবে মুশকিলকে গ্রহণ ও বাস্তবায়নের আগেই মুজতাহিদকে এর সঠিক অর্থ আবিষ্কারে সচেষ্ট হতে হবে।[৩৫]

www.pathagar.com

২. ৩ *দ্ব্যর্থবোধক (মুজমাল)*

মুজমাল বলতে এমন শব্দ বা আয়াত বুঝায় যা সহজাতভাবে অস্পষ্ট এবং এর সুনির্দিষ্ট অর্থ কী হবে সে সম্পর্কে কোনো ইঙ্গিত থাকে না। মুজমালের অস্পষ্টতার কারণ এর উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গির মধ্যেই নিহিত রয়েছে। শব্দটি মনলেখ হতে পারে যার একাধিক অর্থ রয়েছে এবং এর মধ্যে কোনটি সঠিক হতে পারে তার কোনো ইঙ্গিত নেই অথবা বিকল্পভাবে আইনদাতা এর আক্ষরিক অর্থ থেকে ভিন্ন কোনো অর্থ প্রদান করেছেন অথবা শব্দটি পুরোপুরি অপরিচিতও হতে পারে। এসবের যে কোনো ক্ষেত্রে স্বয়ং আইনদাতার প্রদত্ত ব্যাখ্যা ছাড়া অস্পষ্টতা দূর করার কোনো উপায় নেই। কেন না তিনিই প্রথম অস্পষ্ট শব্দ প্রবর্তন করেছেন। যেসব শব্দ কোনো ধারণা প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয় যাতে আক্ষরিক অর্থের পরিবর্তে তার পারিভাষিক অথবা বিচারিক অর্থ জানানো হয়, তা মুজমাল শ্রেণির আওতায় পড়ে। উদাহরণ হলো, নামাজ (সালাত), সুদ (রিবা), হজ ও রোজা (সিয়াম)। এ শব্দগুলোর তাদের আক্ষরিক অর্থ হারিয়ে ফেলেছে কারণ আইনদাতা এগুলোকে তাদের মূল অর্থের থেকে ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন। এসব শব্দের প্রতিটির আক্ষরিক অর্থ রয়েছে। কিন্তু তাদের পারিভাষিক অর্থ আক্ষরিক অর্থ থেকে এতটাই ভিন্ন যে, তাদের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং প্রবল পারিভাষিক অর্থই নিরঙ্কুশ অর্থে পরিণত হয়েছে। এ ধরনের শব্দ স্বয়ং আইনপ্রণেতা সুস্পষ্ট না করা পর্যন্ত দ্ব্যর্থবোধক থেকে যায়। উপরোল্লিখিত কুরআনের সব শব্দের বিচারিক অর্থের ব্যাখ্যা রসুল সা. দিয়েছেন, সে ক্ষেত্রে এগুলো আর দ্ব্যর্থবোধক নয়। যখন আইনপ্রণেতা প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা প্রদান করেন তখন মুজমালের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এবং তা মুফাচ্ছারে পরিণত হয়।

অনেক সময় মুজমাল অপরিচিত শব্দ হতে পারে, যা সহজাতভাইে অস্পষ্ট; তবে যে আয়াতে তা এসেছে তাতেই তাকে সুস্পষ্ট করা হয়েছে। এর উদাহরণ হলো, কুরআনের শব্দ 'আল কারিয়া' ও 'হালু'। সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো :

> ভয়াবহ দুর্ঘটনা (আল ক্বারিয়া), কি সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা, তুমি জান সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা কী? সেদিন যখন মানুষ বিক্ষিপ্ত পোকার মতো এবং পাহাড় রঙ-বেরঙের ধুলা-পশমের মতো হয়ে যাবে (সুরা ক্বারিয়া, ১০১ : ১-৫)।
>
> মানুষ খুবই সংকীর্ণমনা (হালুয়ান) সৃষ্ট হয়েছে, তার ওপর যখন বিপদ আসে তখন সে ঘাবড়ে যায় এবং যখন স্বাচ্ছন্দ্য-সচ্ছলতা হাতে আসে তখন সে কার্পণ্য করতে শুরু করে (সুরা মাআরিজ, ৭০ : ১১-২১)।

www.pathagar.com

এসব আয়াতের দ্ব্যর্থবোধক শব্দগুলো এভাবে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। ফলে আয়াতগুলো স্বব্যাখ্যাতে অথবা মুফাচ্ছার। আইনদাতার ব্যাখ্যা পূর্ণাঙ্গ হলেই মুজমাল মুফাচ্ছারে পরিণত হবে কিন্তু যখন তা অসম্পূর্ণ বা অস্পষ্টতা দূর করতে অপর্যাপ্ত হবে তখন মুজমাল মুশকিলে পরিণত হবে এবং তা অনুসন্ধান ও ইজতিহাদের জন্য উন্মুক্ত হবে। এ ধরনের শব্দের একটি উদাহরণ হলো 'রিবা' (সুদ)। কুরআনের (সুরা আল বাকারায়, ২ : ২৭৫) এ শব্দটি মুজমাল আকারে প্রকাশ পেয়েছে। আয়াতটিতে বলা হয়েছে : 'আল্লাহ তায়ালা ব্যবসায়-বাণিজ্যকে হালাল এবং রিবাকে হারাম করেছেন।' আয়াতটির শেষ শব্দটি 'রিবা'র আক্ষরিক অর্থ 'বৃদ্ধি'। যেহেতু সব ধরনের বৃদ্ধি বা মুনাফা হারাম নয়, তাই আয়াতটি দ্ব্যর্থবোধক রয়ে গেছে। তাহলো, কোন ধরনের বৃদ্ধি হারাম করার উদ্দেশ্যে তা অবতীর্ণ হয়েছে। রসুল সা. তার হাদিসে রিবার মৌলিক ধারণা সুস্পষ্ট করেছেন, যাতে তিনি সুনির্দিষ্টভাবে ছয়টি জিনিসের (স্বর্ণ, রৌপ্য, গম, বার্লি, লবণ ও খেজুর) ওপর রিবা হারাম বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ ব্যাখ্যা বিস্তারিত উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ, এ কারণে অনুরূপ বস্তুগুলোর ওপর একই বিধান প্রয়োগের লক্ষ্যে আয়াতটির যৌক্তিক বিশ্লেষণ ও গবেষণার অবকাশ উন্মুক্ত রয়েছে। এভাবে হাদিসটি আরো ইজতিহাদের এবং এতে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখিত বস্তুগুলোর ওপর কিয়াস করার পথ উন্মুক্ত করেছে।[৩৬]

২. ৪. *দুর্বোধ্য (মুতাশাবিহ)*

মুতাশাবিহ এমন শব্দ বুঝায় যার অর্থ পুরোপুরি রহস্যঘেরা বা দুর্বোধ্য। কুরআনে এমন কিছু শব্দ রয়েছে যার অর্থ আদৌ বোধগম্য নয়। শব্দগুলো নিজ থেকে অথবা যে আয়াতে তা দেখা যায় তাতে তাদের অর্থ সম্পর্কে কোনো আভাস পাওয়া যায় না। এ কারণে আইনগত নুসুসের কোনো মুতাশাবিহ দেখা যায় না। কিন্তু অন্যান্য প্রেক্ষাপটে এ ধরনের শব্দ দেখা যায়। কুরআনের কয়েকটি সুরা আল মুকাত্তায়াতের মাধ্যমে শুরু হয়েছে, অর্থাৎ কয়েকটি অক্ষর উচ্চারণের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে যার অর্থ সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য। কুরআনের ২৯ স্থানে আলিফ লাম মীম, ইয়াসিন, হা-মিম ও অন্যান্য স্থানে অনুরূপ উচ্চারণ দেখতে পাওয়া যায়। এগুলোর সবই মুতাশাবিহ শ্রেণিভুক্ত। অনেক আলেম মনে করেন যে, কুরআনের অনানুকরণীয় বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ হচ্ছে মুকাত্তায়াত। অন্যদের মত হলো, এগুলো সংক্ষিপ্ত বর্ণ সমষ্টি নয় বরং আল্লাহ তায়ালার প্রতীক ও নাম। তাই এগুলোর সংখ্যাবাচক তাৎপর্য রয়েছে এবং শ্রোতাদের আকৃষ্ট করতে এগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। অন্য আরেকদল আলেম মনে করেন যে, কুরআনের মুতাশাবিহর অর্থ হচ্ছে মুমিনদের জ্ঞানের

www.pathagar.com

সীমাবদ্ধতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া, তাদেরকে এ কথা বুঝতে হবে যে, অদৃষ্টমান বাস্তবতা এতই বিশাল যে তাকে কেবল যুক্তির মাধ্যমে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।[৩৭]

ইবনে হাজম আল জাহিরিসহ অনেক আলেম এ মত পোষণ করেন যে, মুকাত্তায়াত ছাড়া কুরআনে আর কোনো মুতাশাবিহ নেই অন্যরা মনে করেন, কুরআনের যেসব আয়াতে আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে সাদৃশ্য বিধান করা হয়েছে তাও প্রকৃতিগতভাবে মুতাশাবিহ।[৩৮]

এ ধরনের আয়াত হচ্ছে : 'তাদের হাতের ওপর আল্লাহর হাত ছিল।' (সুরা আল ফাতাহ, ৪৮ : ১০) এবং নূহ আ. প্রসঙ্গে আমরা দেখতে পাই : 'আমাদের পর্যবেক্ষণের অধীন ও আমাদের ওহি অনুযায়ী একখানা নৌকা তৈরি করা শুরু কর' (সুরা হুদ, ১১ : ৩) এবং (সুরা আর রহমানে, ৫৫ : ২৭) বলা হয়েছে : 'কেবলমাত্র তোমার মহিয়ান-গরিয়ান প্রভুর মহান সত্তাই অবশিষ্ট থাকবে।' এগুলোর সবই মুতাশাবিহ', কারণ এর সঠিক অর্থ অজানা রয়েছে। অবশ্য কেউ এর প্রতিটি ক্ষেত্রে রূপক অর্থ করতে পারে, মুতাজিলারা এমনটি করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু কোনোটিই না সন্তোষজনক না সুনিশ্চিত। বলা যায়, 'হাতের' রূপক অর্থ হলো ক্ষমতা এবং 'চোখের' পর্যবেক্ষণ, কিন্তু এগুলো ধারণা বৈ কিছু নয়। কারণ আমরা আমাদের তুলনার বিষয় সম্পর্কে কিছুই জানি না। কুরআন থেকে আমরা আগে জেনেছি যে, 'আল্লাহ তায়ালার মতো কোনো কিছুই নেই' (সুরা আশ শুরা, ৪২ : ১১)। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এ সাদৃশ্যের বিষয়ে ব্যাখ্যা দেননি তাই তা মানবজ্ঞানের বাইরেই রয়ে গেছে।[৩৯]

কুরআনের মুতাশাবিহর প্রমাণ খোদ কুরআনে দেখতে পাওয়া যায় :

> তিনিই তোমার প্রতি এ কিতাব নাজিল করেছেন। এ কিতাবে দু' ধরনের আয়াত আছে, এক হচ্ছে মুহকামাত, যেগুলো কিতাবের আসল বুনিয়াদ এবং দ্বিতীয় হচ্ছে মুতাশাবিহ। যাদের মনে বক্রতা আছে তারা ফেতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সব সময় মুতাশাবিহের পেছনে লেগে থাকে এবং তার অর্থ করার চেষ্টা করে থাকে। অথচ সেগুলোর আসল অর্থ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। বিপরীত পক্ষে পরিপক্ব জ্ঞানের অধিকারীরা বলে, 'আমরা এর প্রতি ইমান এনেছি, এসব আমাদের রবের পক্ষ থেকেই এসেছে। আর প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানী লোকেরাই কোনো বিষয় থেকে সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে (সুরা ইমরান, ৩ : ৭)।

আলেমগণের মধ্যে এ আয়াতের উপলব্ধি বিশেষ করে মুহকামাত ও মুতাশাবিহের সংজ্ঞার ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে সঠিক মত হচ্ছে যে, মুহকাম হচ্ছে

www.pathagar.com

কুরআনের এমন অংশ যাতে ধারণা বা সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই, অন্যদিকে মুতাশাবিহে সে সুযোগ আছে। যেসব অক্ষর দিয়ে সুরার সূচনা হয়েছে সেসব মুতাশাবিহকে এসব সুরার নাম বলে মনে করা হয়। মুতাশাবিহের ওপর আমল করার অনুমতি রয়েছে কি না সে ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। তবে সঠিক মত হচ্ছে, কেউ এর ওপর আমল করতে পারে না। কারণ মুতাশাবিহে কোনো অর্থ নেই সেজন্য নয় বরং এ কারণে যে কোনো মানুষের পক্ষে এর সঠিক অর্থ জানা সম্ভব নয়।[৪০] এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সব মুতাশাবিহে অর্থ রয়েছে কিন্তু একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই তা জানেন এবং যেসব ক্ষেত্রে খোদার বাণীর সঠিক অর্থ জানার কোনো নির্দেশনা আমাদের কাছে নেই সে ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই আল্লাহর বাণীর ওপর আমাদের ধারণাকে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করব না।[৪১]

শ্রেণি বিভাগ-২ : 'আম (সাধারণ) ও খাস (সুনির্দিষ্ট)

শব্দসমূহে তাদের ব্যাপ্তির আলোকে 'সাধারণ' ও 'সুনির্দিষ্ট' শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। মূলত এটি হচ্ছে ধারণাগত পার্থক্য, যা সব সময় শব্দের ব্যকরণগত গঠনে স্পষ্ট প্রতিভাত হয় না। অবশ্য আলেমগণ শব্দের কতিপয় ভাষাগত ধরন চিহ্নিত করেছেন, যা আমাদের 'আম' ও 'খাস'-এর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণে সহায়তা করে থাকে।

'আমের সংজ্ঞায় বলা যায়, এটা এমন শব্দ যা সীমিতসংখ্যক নয়-বিপুল জিনিসকে বুঝায় এবং যার ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হয় তার সব কিছুই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে।[৪২] এর একটি উদাহরণ হলো, ইনসান (মানুষ জাতি) শব্দটি। কুরআনের আয়াতে বলা হয়েছে: 'নিশ্চয়ই মানবজাতি (ইনসান) ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত' (সুরা আসর ১০৩ : ১)। অথবা আদেশ, 'যে কেউ এ বাড়িতে প্রবেশ করবে তাকে এক দিরহাম প্রদান কর।' উভয় উদাহরণে 'মানবজাতি' ও 'যে কেউ' হলো সাধারণ শব্দ এবং এতে কোনো ধরনের সীমাবদ্ধতা আরোপ ছাড়াই সব মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। 'আম' হচ্ছে মৌলিকভাবে এমন শব্দ যার একটি একক অর্থ রয়েছে। কিন্তু তা কোনো ধরনের বাধানিষেধ ছাড়াই অসীম সংখ্যা বুঝায়। আরবি বা অন্য যে কোনো ভাষায় হোক না কেন মৌলিকভাবে সব শব্দই সাধারণ, তা কোনোভাবে সুনির্দিষ্ট ও অর্থ সীমিত করা না হলে সেগুলোর সাধারণত্ব অক্ষুণ্ন থাকে। সাহাবিগণের রা. ইজমা ও আরবি ভাষার নিয়ম অনুসারে কুরআন ও সুন্নাহ্ শব্দ দু'টি সাধারণ হিসেবে ব্যবহৃত হয় যদি না তাদের সাধারণ অর্থ থেকে বিকল্প অর্থ গ্রহণের তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়।[৪৩] বলা যায় যে, 'আমের একটা একক অর্থ রয়েছে যা 'আমকে সমনামিকতা বা (মুশতারাক) অর্থাৎ যার একাধিক নাম রয়েছে, তার

www.pathagar.com

থেকে পৃথক করেছে। অনুরূপভাবে 'আম' অসীম সংখ্যা বুঝায় বা খাসকে 'আমের সংজ্ঞার বহির্ভূত রেখেছে।[৪৪] কোনো শব্দ তার আকারের কারণে যেমন মানুষেরা, শিক্ষার্থীরা, বিচারকগণ ইত্যাদি অথবা কেবলমাত্র অর্থের দ্বারা যেমন- জনগণ, সমাজ ইত্যাদি অথবা প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে সাধারণ বিশেষ্যের আগে সব, প্রত্যেক, সম্পূর্ণ ইত্যাদি সর্বনাম যুক্ত করে একটি শব্দ 'আম' হতে পারে। এ বিষয়টি কুরআনের আয়াতে দেখা যায় : 'প্রত্যেক ব্যক্তিকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে' (সুরা আলে ইমরান, ৩ : ১৮৫)। অথবা বর্ণিত হয়েছে 'প্রত্যেক চুক্তির ক্ষেত্রে দু'টি পক্ষ থাকবে' এ উভয় বিবরণ সাধারণ অর্থ প্রকাশ করছে।

'আম' যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে অবশ্যই তার সব কিছুকেই বুঝাবে। এভাবে যখন কোনো আদেশ 'আম' আকারে প্রদান করা হলে তাকে সেভাবেই বাস্তবায়ন করা জরুরি। এভাবে যদি 'ক' তার চাকরকে তার বাড়িতে প্রবেশকারী প্রত্যেককে এক দিরহাম করে দেয়ার নির্দেশ দেয় সে ক্ষেত্রে তার এ নির্দেশ যথাযথভাবে পালনের জন্য চাকরকে 'ক'র নির্দেশে কেবলমাত্র তার আত্মীয়-স্বজনকে সুনির্দিষ্টভাবে বুঝাচ্ছে বলে ধরে নিলে চলবে না। চাকর যদি তার নিজস্ব ব্যাখ্যা অনুযায়ী কেবলমাত্র 'ক'-এর ইচ্ছা মনে করে তার আত্মীয়-স্বজনকে এক দিরহাম করে দেয় তাহলে তার এ ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হবে না এবং সে বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হবে।

যখন কোনো শব্দ সীমিত সংখ্যক জিনিসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়-যার ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য তার সব কিছুই এর অন্তর্ভুক্ত থাকে। ধরুন, এক বা দুই, অথবা একশত, একে সুনির্দিষ্ট (খাস) বলে উল্লেখ করা যায়। এ ধরনের শব্দ কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে যেমন জায়েদ বা আহমদ অথবা কোনো নির্দিষ্ট প্রজাতির কোনো একটিকে যেমন- ঘোড়া বা পাখি কিংবা কোনো গণের (genus) অন্তর্ভুক্ত কাউকে যেমন- একজন মানুষ বুঝিয়ে থাকে।[৪৫] অপরপক্ষে সাধারণ বা 'আম-এর বিপরীত হওয়ায় 'সুনির্দিষ্ট শব্দ' (খাস) সীমিত সংখ্যকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, হোক তা গণ বা প্রজাতি অথবা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি। একটি একক বিষয় অথবা সুনির্দিষ্ট সংখ্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়ার শর্তে এটি খাস হয়। কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো সীমাবদ্ধতা না থাকলে শব্দটি আম শ্রেণিভুক্ত হবে।

সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত আইনগত বিধিবিধানগুলো প্রয়োগের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট এবং স্বাভাবিকভাবে তা তাবিলের জন্য উন্মুক্ত নয়। এভাবে কুরআনের যে আয়াতে মিথ্যা ওয়াদার জন্য কাফফারা হিসেবে '১০ জন গরিব লোককে খাওয়ানোর যে বিধান করা হয়েছে তা স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট এবং 'দশ' সংখ্যা তাবিল স্বীকার করেনি। অবশ্য তাবিল *অবলম্বনের জন্য ব্যতিক্রমী কারণ থাকলে সে ক্ষেত্রে খাস তাবিলের জন্য উন্মুক্ত হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, দশজন গরিব লোককে খাওয়ানো*

www.pathagar.com

সংক্রান্ত উপরিউক্ত আয়াতে বিশ্লেষণ করে হানাফীগণ বলেছেন যে, দশ ব্যক্তিকে এক সাথে অথবা অনুরূপ এক ব্যক্তিকে দশবার খাওয়ানো যাবে। অবশ্য সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম হানাফীদের এ মতকে নাকচ করে দিয়ে বলেছেন যে, নিয়ম অনুযায়ী খাস তাবিলযোগ্য নয়।

'আম'-এর ব্যাপ্তি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কেবল ভাষার নিয়মকানুন নয়, উপরন্তু জনগণের ব্যবহার রীতিরও উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ দুইয়ের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে জনগণের ব্যবহার রীতিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। আরবরা সাধারণত স্বাভাবিক অর্থে শব্দ ব্যবহার করে থাকে, কিন্তু এ বিবরণ অবশ্যই সুনির্দিষ্ট হতে হবে। কেননা শব্দের ভাষা ব্যবহারে অনেক রূপ রয়েছে। অনেক সময় শব্দগুলো 'আম' আকারে ব্যবহৃত হলেও বক্তার উদ্দেশ্য বস্তুতপক্ষে আম-এর চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম, এমনকি খাস হতে পারে। তাই বক্তার অবস্থা ও বক্তব্যের প্রেক্ষাপটের আলোকে আম-এর সুনির্দিষ্ট ব্যাপ্তি নিরূপণ করা হয়। এর উদাহরণ হলো, যখন কেউ বলে, আমি জনগণকে শ্রদ্ধা করেছি। অথবা আমি শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছি তখন সে নিশ্চিতভাবে ওই সব লোকের কথাই বুঝিয়েছে যাদের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়েছে। নিয়ম অনুসারে 'আম' বিশেষ করে যখন নিজস্ব রীতিতে ব্যবহৃত হয় তখন তা তার অন্তর্ভুক্ত সব কিছুকেই বুঝায়। কিন্তু যখন তা অন্যান্য শব্দের সমন্বিত অবস্থায় ব্যবহৃত হয়, তখন দু'টি সম্ভাবনা থাকে, হয় 'আম' আগের অবস্থায় বহাল থাকবে অথবা অন্যান্য শব্দের দ্বারা সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করবে।[৪৬]

এ থেকে জানা যায় যে, তিন প্রকার 'আম' রয়েছে তাহলো প্রথমত, নিরঙ্কুশ সাধারণ 'আম' যা কোনো সর্বনাম সংযুক্তির আকারে নির্দেশিত হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে কুরআনের নিম্নের দু'টি আয়াত উল্লেখ করা যেতে পারে : 'জমীনে বিচরণশীল কোনো জীবন এমন নেই যার রিজিক দানের দায়িত্ব আল্লাহ তায়লার ওপর নয়' (ওয়া মা মিন দাব্বাতিন ফিল আরদ) (সুরা হূদ ১১: ৬) এবং 'পানি থেকে প্রত্যেক (কুল্লু শাইন) জীবন্ত জিনিস সৃষ্টি করেছি' (সুরা আম্বিয়া ২১ : ৩)। প্রথম আয়াতে মা মিন (কেউ নয়, কোনো জীবন্ত জিনিস নেই) এবং দ্বিতীয় আয়াতে 'কুল্লু' (অর্থ সকলে বা প্রত্যেকে) সংযুক্তিতে যে অর্থ প্রকাশ পেয়েছে তা 'আম' হিসেবে পরিচিত। উভয় আয়াত সাধারণ বৈশিষ্ট্য ধারণ করেছে, যা এর যে কোনোরূপ সুনির্দিষ্টকরণের পথরুদ্ধ করে দিয়েছে। এভাবে এগুলো 'নিরঙ্কুশভাবে সাধারণ হিসেবে' বহাল রয়েছে এবং যেসব ক্ষেত্রে একে প্রয়োগ করা হয়েছে কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই তা পুরোপুরিভাবে এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। দ্বিতীয়ত, এমন 'আমও আছে যার অর্থ খাস ইঙ্গিত করে। আম-এর এ ব্যবহার রীতির ক্ষেত্রে প্রথম থেকে এমন আভাসও পাওয়া যায় যে সম্ভবত যেসবের ওপর তা প্রযোজ্য হয় তার সব

www.pathagar.com

কিছুকে নিয়ে নয়, কাউকে কাউকে নিয়ে 'আম' গঠিত হয়। এর একটি উদাহরণ হলো, 'আল নাস' (জনগণ) শব্দটি। কুরআনের (সুরা আল ইমরানে, ৩ : ৯৭) শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে : 'লোকদের ওপর খোদার এ অধিকার রয়েছে যে যার এ ঘর পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য আছে সে যেন হজ সম্পন্ন করে।' এখানে কুরআনের আয়াতে যে নির্দেশনা রয়েছে তাতে শিশু, পাগল অথবা যারা হজ সম্পন্ন করতে সমর্থ নয় তাদের এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তৃতীয়ত, আরেক প্রকার 'আম' রয়েছে যাকে উপরের দুই প্রকার আম-এর কোনো বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে ফেলা যায় না। কুরআনের 'আল মুতাল্লাকাত' (তালাকপ্রাপ্তা নারীরা) শব্দটি হলো এর উদাহরণ। কুরআনের আয়াতে বলা হয়েছে- 'যেসব স্ত্রীলোককে তালাক দেয়া হয়েছে তারা যেন তিনবার মাসিক ঋতু আসা পর্যন্ত নিজেদের বিরত রাখে (আল বাকারা, ২ : ২২৮)। এ ধরনের 'আম' সাধারণত্বের দিক থেকে জাহির, এর অর্থ হলো, এর সুনির্দিষ্টকরণের (তাখসিস) বিষয় যুক্তিসিদ্ধ হওয়ার সাক্ষ্য-প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তা সাধারণ থাকবে। এর আরেকটি উদাহরণ কুরআনের বিধানে পাওয়া যায়, যাতে অপেক্ষাকালীন সময়ে বা 'ইদ্দত' পালনের সাধারণ শর্তের উল্লেখ করা হয়েছে। (সুরা আল আহজাবে ৩৩ : ৪৯) এ বিধান বর্ণিত হয়েছে : 'হে ইমানদার লোকেরা, তোমরা যখন ইমানদার মহিলাদেরকে বিয়ে করবে এবং তাদের স্পর্শ করার আগেই তালাক দেবে তখন তাদের দিক থেকে ইদ্দত পালন করার দরকার হবে না।' এভাবে স্পর্শ করার আগেই তালাকপ্রাপ্ত নারীদের প্রথম আয়াতের ইদ্দত পালনের সাধারণ শর্তের আওতামুক্ত রাখা হয়েছে। অন্য কথায় দ্বিতীয় আয়াতটি প্রথম আয়াতকে সুনির্দিষ্ট করেছে।[৪৭]

ব্যাকরণের দিক থেকে আরবি ভাষায় 'আম-এর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিভিন্ন রূপ রয়েছে। ব্যাকরণে অসংখ্য রূপে 'আম' প্রকাশিত হয়। প্রধানত ভাষাগত ও বিষয়বস্তুর আরবি বৈশিষ্ট্যের আলোকে আমি এখানে আম-এর কতিপয় সুপরিচিত রূপ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব।

যখন কোনো বিশেষ্যের একবচন বা বহুবচনের আগে আর্টিকল 'আল' বসে তখন শব্দটিকে 'আম' বলে শনাক্ত করা হয়। কুরআনের আয়াতে এর উদাহরণ হলো, 'ব্যাভিচারী পুরুষ ও ব্যাভিচারী নারী উভয়কে একশটি কোড়ড়া মার' (আল নূর, ২৪ : ২)। এখানে ব্যাভিচারী শব্দের আগে আর্টিকল আল রয়েছে (আল যানিয়া ওয়াল যানি) যাতে বুঝানো হচ্ছে যে, সব ব্যাভিচারী সুনির্দিষ্ট শাস্তি ভোগ করবে। অনুরূপভাবে কোনো বিশেষ্য বহুবচনের আগে 'আল' আর্টিকল বসে তখন তা 'আম' হিসেবে শনাক্ত হয়। এর উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায় উপরোল্লিখিত তালাকপ্রাপ্ত নারীদের (আল মুতাল্লাকাত) ইদ্দত সম্পর্কিত আয়াতে। আয়াতটি 'আল

www.pathagar.com

মুতাল্লাকাত' শব্দ দিয়ে শুরু হয়েছে। যার অর্থ 'তালাকপ্রাপ্ত নারীরা'[৪৮] যাদের পুনরায় বিয়ের আগে তিনটি মাসিক ঋতু পর্যন্ত ইদ্দত পালন করতে হবে। 'তালাকপ্রাপ্ত নারীরা' হলো একটি 'আম' যাদের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য তাদের সবাইকে নিয়েই এটি গঠিত হয়েছে।

আরবি ভাষায় জামি, কাফফা ও কুল (সকল, পুরোপুরি) এর উচ্চারণ ফলাফলের দিক থেকে শ্রেণিবাচক এবং যখন এগুলো কোনো শব্দের আগে বা শেষে যুক্ত হয় তখন যার ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হয় তার সমগ্রটি নিয়েই গঠিত হয়। আমরা ইতোমধ্যে কুরআনের আয়াতে 'কুল্লু' শব্দের ব্যবহারের উদাহরণ দিয়েছি। আমরা পানি থেকে জীবন্ত এমন সব কিছু সৃষ্টি (কুল্লু শায়ইন) সৃষ্টি করেছি। 'জামি' শব্দটি যখন কোনো শব্দের আগে বা শেষে বসে তখন অনুরূপ ফল দেখতে পাওয়া যায়। এ বিষয়টি কুরআনের একটি আয়াতে দেখতে পাওয়া যায় : 'তিনিই তোমাদের জন্য পৃথিবীর সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করেছেন' [খালাকা লাকুম মা-ফিল আরদ জামিয়া (সুরা বাকারা, ২ : ২৯)- যার অর্থ হলো- পৃথিবীর সব কিছুই মানুষের কল্যাণে সৃষ্টি করা হয়েছে। অনুরূপভাবে যখন সাধারণত কোনো বিশেষ্যের বহুবচন ওয়াল্লাজিনা (ওই সব লোকেরা) ও ওয়াল্লাতি'র (ওই সব নারী যারা) মতো অব্যয় দ্বারা সংযুক্ত হলে ফলাফলের দিক থেকে তা শ্রেণিবাচকে পরিণত হয়। কুরআনের (সুরা নূরে, ২৪ : ৪)-এর উদাহরণে দেখতে পাওয়া যায় : 'যারা পবিত্র চরিত্রের স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে মিথ্যা দোষারোপ করবে তার পর চারজন সাক্ষী হাজির করতে পারবে না তাদের আশিটি কোড়া মার।' এ বিধান সাধারণ, কেননা এর আওতায় পড়তে পারে এমন সবার ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে এবং সুনির্দিষ্ট করে বুঝানোর কোনো প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তা বহাল থাকবে। দেখা যায় (এ রকম আরো উদাহরণ) একই রুকুর পরবর্তী আয়াতে মিথ্যা অভিযোগের প্রমাণ সংক্রান্ত বিধানের ক্ষেত্রে। দ্বিতীয় আয়াতে স্বামী কর্তৃক অভিযোগ আনার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম করা হয়েছে। তাকে চারজন সাক্ষীর পরিবর্তে চারবার আল্লাহ্ তায়ালার নামে শপথ করে স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যাভিচারের প্রমাণ পেশ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে কিন্তু স্ত্রীও চারবার শপথ করে তার এ অভিযোগ খণ্ডন করতে পারবে (সুরা নূর, ২৪ : ৬)। এভাবে প্রথম আয়াতের সাধারণ বিধানকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে কারণ, তা বিবাহিত দম্পতির সাথে সংশ্লিষ্ট।

অনির্দিষ্ট শব্দ (আল নাকিরা) যখন না সূচক অর্থ প্রকাশ করে তার ফলও নেতিবাচক। হাদিসে এর উদাহরণ দেখা যায়, লা জারারা ওয়ালা জিরারা ফিল ইসলাম (ইসলামে কেউ জুলুম করে না এবং কেউ জুলুমের শিকার হয় না)- এর অর্থ সাধারণ এবং যেহেতু 'লা জারারা' ও 'লা জিরারা' উভয়ই অনির্দিষ্ট শব্দ যা

www.pathagar.com

নেতিবাচকভাবে তাদের ধারণা প্রকাশ করে। এভাবে এ শব্দ দু'টি যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় তার সব কিছুকেই নেতিবাচকে পরিণত করে।

'মান' (সে, যিনি) শব্দটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট। কিন্তু যখন তা শর্ত সাপেক্ষে বাক্যে ব্যবহৃত তখন তার ফল সাধারণ হয়ে থাকে। কুরআনের আয়াতে এর দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায় : 'যে কেউ (ওয়া মান) ভুল করে কোনো মুমিনকে হত্যা করবে তাকে অবশ্যই একজন ইমানদার দাসকে মুক্ত করে দিতে হবে' (সুরা নিসা, ৪ : ৯২) এবং তোমাদের মধ্যে যেই (ফা-মান) নতুন চাঁদ দেখবে তাকে অবশ্যই রোজা পালন করতে হবে '(সুরা বাকারা, ২ : ১৮৫)।

অর্থগত দিক থেকে খাস সুনির্দিষ্ট (কাতয়ী), এ ব্যাপারে সাধারণ মতৈক্য রয়েছে। কিন্তু 'আম' সুনির্দিষ্ট না ধারণামূলক (যন্নী) সে ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হানাফীদের মতে, যেসব ক্ষেত্রে 'আম' প্রযোজ্য হয় তার সব কিছুই সুনির্দিষ্ট, এর কারণ হলো আইনের ভাষা সচরাচর সাধারণ হয়ে থাকে এবং সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়া অথবা কেবল কতিপয় ক্ষেত্রে প্রয়োগ সীমিত করা সংক্রান্ত নির্দেশনা না থাকলে কেবল শব্দের ভিত্তিতে মাত্র কতিপয় ক্ষেত্রে তার ব্যবহার সীমিত করা হলে তাতে আইনদাতার উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে।[৪৯]

অন্যদিকে শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলীগণসহ সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে, যেসব ক্ষেত্রে 'আম' প্রযোজ্য হয় তার সবই যন্নী বা ধারণামূলক, কারণ তা সীমিতকরণ ও তাবিলের জন্য উন্মুক্ত এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এ সম্ভাবনা থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা সুনির্দিষ্ট হবে না। কুরআনের 'আম' এবং হাদিসের বিশেষ করে দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন হাদিসের খাসের মধ্যে বিরোধের কারণে মতপার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অধিকাংশের মত অনুযায়ী, বিচ্ছিন্ন হাদিস কুরআনের কোনো সাধারণ বিধান নির্দিষ্ট করতে পারে। তাই কুরআনের 'আম' যা যন্নী এবং বিচ্ছিন্ন হাদিসের খাস অর্থের দিক থেকে সুনির্দিষ্ট হলেও তা প্রামাণিকতার দিক থেকে ধারণামূলক। একটি যন্নী কোনো কাতয়ী বা অন্য যন্নীর দ্বারা সুনির্দিষ্ট হতে পারে।[৫০]

অবশ্য হানাফীদের মতে, কুরআনের 'আম' সুনির্দিষ্ট এবং বিচ্ছিন্ন হাদিস বা এই বিষয়ে কিয়াস ধারণামূলক। কোনো সুনির্দিষ্ট বিষয় কোনো ধারণামূলক বিষয় দ্বারা সীমিত বা সুনির্দিষ্ট হতে পারে না। কুরআনে পশু জবাই সংক্রান্ত আয়াতে এ দুই মতের দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়। আয়াতটিতে বলা হয়েছে : 'আর যে জন্তু খোদার নাম নিয়ে জবাই করা হয়নি তার (গোশত খেয়ো না)' (সুরা আন'আম, ৬ : ১২১)। এ সাধারণ বিধানের সংযোজনমূলক একটি বিচ্ছিন্ন হাদিস রয়েছে, যাতে বলা হয়েছে:

www.pathagar.com

ذبيحة المسلم حلال ذكراسم الله أو لم يذكر

'মুমিনগণ আল্লাহ তায়ালার নাম উচ্চারণ করুক বা না করুক তারা আল্লাহর নামেই পশু জবাই করে থাকে'।[৫১]

সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে, হাদিসটি কুরআনের আয়াতকে সুনির্দিষ্ট করেছে, তাহলো, কোনো মুসলমান পশু জবাই করলে, এমনকি সে আল্লাহর নাম উচ্চারণ না করলেও তা খাওয়া জায়েজ হবে। কিন্তু হানাফীদের মতে, এটি জায়েজ নয়, কারণ কুরআনের 'আম' বিচ্ছিন্ন (আহাদ) হাদিস দ্বারা সুনির্দিষ্ট হতে পারে না। কেবলমাত্র বিচ্ছিন্ন হাদিসের কারণে মাজহাবের মধ্যে এ মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। অবশ্য মুতাওয়াতিরের (ও মাশহুর) ক্ষেত্রে এ বিষয়ে কোনো মতপার্থক্য নেই। এর যে কোনো একটি কুরআনের সাধারণ বিধানকে সুনির্দিষ্ট করতে পারে যেমনটি অনেক সময় কুরআন স্বয়ং তার নিজস্ব সাধারণ বিধানকে সুস্পষ্ট করে।[৫২]

একটি সাধারণ বিবৃতি হয় একই আয়াতের অধীন খণ্ডবাক্য অথবা স্বতন্ত্র বাচনভঙ্গির দ্বারা সুনির্দিষ্ট হতে পারে। আলেমদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এ দু'টি ঘটনাকে দুই ধরনের তাখসিস বলে গণ্য করেন। অবশ্য হানাফীগণ মনে করে যে, স্বতন্ত্র বাক্য প্রয়োগ পদ্ধতি আরেকটি বাক্য প্রয়োগ পদ্ধতিকে কেবল তখনই সুনির্দিষ্ট করতে পারে যখন এটি প্রতিষ্ঠিত হয় যে, দু'টি বাক্য প্রয়োগ পদ্ধতি কালানুক্রমিকভাবে পরস্পরের সমান্তরাল। কিন্তু তারা যদি তেমন সমকক্ষ না হয় সে ক্ষেত্রে পরেরটি পূর্বেরটিকে মুনসুখ করবে। এ ক্ষেত্রে বিষয়টি তাখসিস নয় বরং মুনসুখ হবে। নির্দিষ্টকরণ শব্দগুলো যার অগ্রবর্তী হয়েছে তার সাথে সম্পর্কিত হলে এবং তাতে শব্দ ব্যবহার প্রক্রিয়া গঠন ক্ষুণ্ন না হলে, সে ক্ষেত্রে তারা স্বাধীন উক্তি হিসেবে গণ্য হবে না। হানাফীগণ বাদে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত হলো, অধীন খণ্ডবাক্য মূল উক্তির সাথে কোন ব্যতিক্রম (ইস্তিসনা), শর্ত (শার্ত), গুণ (সিফাত) অথবা ব্যাপ্তির নির্দেশনা (গাইয়া) উপস্থাপনের মাধ্যমে সাধারণ উক্তিকে নির্দিষ্ট করতে পারে। এ ধরনের প্রতিটি খণ্ডবাক্যের কারণে সাধারণ উক্তির ব্যবহার সীমিত ও সুনির্দিষ্ট হবে। ইস্তিসনার আকারে সাধারণ বিধান সুনির্দিষ্টকরণের একটি উদাহরণ হলো, বাণিজ্যিক লেনদেন সংক্রান্ত নির্ধারিত দস্তাবেজ যাতে ঋণ পরিশোধের কথা লেখা হয়েছে (সুরা বাকারা, ২ : ২৮২)। অতঃপর ওই একই আয়াতে সাধারণ বিধানের ব্যতিক্রম বর্ণিত হয়েছে, তাহলো 'অবশ্য যেসব ব্যবসায় সংক্রান্ত লেনদেন তোমরা হাতে হাতে (নগদ) করে থাক তা লিখে না রাখলে দোষ নেই।' এভাবে আয়াতের দ্বিতীয় অংশে প্রথম অংশের ব্যতিক্রম প্রকাশ পেয়েছে। কোন সাধারণ বিবরণ শর্তের (শর্ত) আকারে নির্দিষ্টকরণের (তাখসিস) উদাহরণ কুরআনের আয়াতে দেখা যায়।

www.pathagar.com

ওই আয়াতে মৃত স্ত্রীর সম্পত্তিতে স্বামীর অংশের বিধান বর্ণিত হয়েছে। আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর তোমাদের স্ত্রীরা যা কিছু রেখে গেছে তার অর্ধেক তোমরা পাবে- যদি তারা নিঃসন্তান হয়' (সুরা নিসা, ৪ : ১২)। আয়াতের প্রথম অংশের সাধারণ বিধান প্রয়োগের শর্তের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং আয়াতের শেষাংশে শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে, তাহলো, 'তারা যদি নিঃসন্তান হয়।' গুণের (সিফাত) বর্ণনার মাধ্যমে তাখসীসের উদাহরণ হিসেবে আমরা সৎ মেয়েকে বিয়ে করা হারাম সংক্রান্ত কুরআনের আয়াত উল্লেখ করতে পারি। '(তোমাদের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছে) সেসব স্ত্রীর মেয়েরা যাদের সাথে তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে' (সুরা নিসা, ৪ : ২৩)। এভাবে আয়াতের প্রথম অংশের সাধারণ বিধান পরবর্তী অংশের দ্বারা সুনির্দিষ্টকরণের উদাহরণ আমরা নামাজের জন্য ওজু সংক্রান্ত কুরআনের আয়াত থেকে দিতে পারি। এ আয়াতে বলা হয়েছে, 'তোমরা তোমাদের দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত কর' (সুরা মায়েদা, ৫ : ৬)। দুই হাত ধৌত করা হচ্ছে সাধারণ বিধান, কনুই পর্যন্ত অবশ্যই ধৌত করতে হবে বলার মাধ্যমে একে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। অনুরূপভাবে যখন বলা হয়, 'তোমরা স্বদেশীদের সম্মান করবে যতক্ষণ না তারা আইন লঙ্ঘন করে।' এখানে স্বদেশী সব নাগরিককে বুঝিয়েছে। কিন্তু পরবর্তী বাক্যাংশ সাধারণ বিধানের কাজের ব্যাপ্তি সুনির্দিষ্ট করেছে।[৫৩]

যখন কোনো সাধারণ বিবরণ আয়াতের সাধারণ রীতির অন্তর্গত কোনো খণ্ডবাক্যে নয় বরং পৃথক আয়াতের অংশ কোনো খণ্ডবাক্য রীতির দ্বারা সীমিত হয়, যা যুক্তির সাধারণ শর্ত, সামাজিক রীতি অথবা শরয়ী লক্ষ্যের (হিকমাহ আল শরয়ী) সমন্বয়ে গঠিত হয়ে থাকে। এটি হলো যুক্তির গুণ, উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, শিশু ও পাগলদের কুরআনে হজ করা ফরজের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে, সুরা আল ইমরানে (৩ : ৯৭) এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে কুরআনের সাধারণ আয়াতে বলা হয়েছে, '(প্রবল বাতাস) তার খোদার নির্দেশে সব কিছু ধ্বংস করে দিলো' (সুরা আহকাফ, ৪৬ : ২৫)। প্রথানুযায়ী সব কিছু বলতে যা ধ্বংসযোগ্য তাকে বুঝানো হয়েছে। একইভাবে ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে আইনের সাধারণ বিধান প্রায়ই জনগণের মধ্যে প্রচলিত রেওয়াজের আলোকে নির্দিষ্ট করা হয়ে থাকে। আমরা ইতোমধ্যে তালাকপ্রাপ্ত নারীর ইদ্দতের মেয়াদ সম্পর্কিত একটি আয়াত দ্বারা অন্য একটি আয়াতের নির্দিষ্টকরণের উদাহরণ দিয়েছি। (সুরা বাকারায়, ২ : ২২৮) বর্ণিত সাধারণ বিধান অনুযায়ী তালাকপ্রাপ্ত মহিলাকে অবশ্যই তিনটি মাসিক পর্যন্ত অবশ্যই ইদ্দত পালন করতে হবে। কিন্তু কুরআনের (সুরা আল আহজাবের ৩৩ : ৪৯) আয়াতে একে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এ আয়াতে বলা হয়েছে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই তালাক হয়ে গেলে সে ক্ষেত্রে ইদ্দত পালন করার প্রয়োজন

www.pathagar.com

হবে না।[৫৪] সবশেষে বলা যায়, যখমের ক্ষেত্রে প্রতিশোধ গ্রহণের কুরআনের সাধারণ বিধান হচ্ছে, 'সমান সমান' ভিত্তিতে (সুরা মায়েদা, ৫ : ৪৮)। আইনদাতার উদ্দেশ্যের আলোকে একে নির্দিষ্ট করা হয়েছে- আর তাহলো, অপরাধী ব্যক্তিকে যখমের শিকার ব্যক্তির মতো দৈহিকভাবে আহত করা নয় বরং তার অপরাধের অনুপাতে তাকে দণ্ড প্রদান করা। এরপরে আসছে সাধারণ ও সুনির্দিষ্ট বিধানের মধ্যকার কালানুক্রমিক ক্রমের প্রশ্ন। সুনির্দিষ্টকরণ খণ্ডবাক্য হয় সাধারণ বিধানের মূলের সমান্তরাল অথবা সুনির্দিষ্টকরণ বিধানের সমান্তরাল হয় অথবা তাদের কালানুক্রমিক ক্রম অজ্ঞাত থাকে। হানাফীদের মতে, যখন সুনির্দিষ্টকরণ খণ্ডবাক্য সাধারণ বিধান নয় সুনির্দিষ্টকরণ বিধানের মূল হয় তখন পূর্বের বিধান পরেরটিকে মুনসুখ করে এবং তা আর তাখসিস হিসেবে গণ্য হয় না বরং একটি আয়াত দ্বারা অন্যটি আংশিক মুনসুখ হয়। হানাফীদের মতে, 'আম' ও খাস কালানুক্রমিকভাবে পরস্পরের সমান্তরাল হলেই কেবল তাখসিস হতে পারে। যেসব ক্ষেত্রে এদের এ ক্রম প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না, সে ক্ষেত্রে তাদেরকে সমান্তরাল বলে ধরে নেয়া হবে। মুনসুখ ও তাখসিসের মধ্যে পার্থক্য হলো এই যে, মানসুখে পরবর্তী সময়ে কোনো বিধানের পুরোপুরি বা আংশিক রহিত হয় আর তাখসিস মূলত 'আম-এর প্রাথমিক ব্যবহারকে সীমিত করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে, সব ধরনের তাখসিস হচ্ছে এক ধরনের ব্যাখ্যা (বায়ান)। কিন্তু হানাফীদের মতে, তাখসিস কেবল তখনই বায়ান হয় যখন সুনির্দিষ্টকরণ অধীন খণ্ডবাক্য সাধারণ বিবরণ থেকে স্বাধীন। কালানুক্রমিকভাবে এর সমান্তরাল এবং কাতয়ী বা যন্নী হওয়ার ক্ষেত্রে এর শক্তির মাত্রা আমের সমতুল্য হয়। তবে যখন সুনির্দিষ্টকরণ অধীন খণ্ডবাক্য সাধারণ বিবরণের পরের উৎপত্তি হয় এবং এর ফল পরেরটির ওপর পড়ে, তাহলে হানাফীদের মতে তা বায়ান হবে না বরং মুনসুখ হবে।[৫৫] অবশ্য তাখসিস সম্পর্কে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত হানাফীগণের থেকে ভিন্ন। তাদের মতে, তাখসিস অধীন বা স্বাধীন উভয় ধরনের উক্তি বুঝাতে পারে এবং সুনির্দিষ্টকরণ অধীন খণ্ডবাক্যের কালানুক্রমিকভাবে সাধারণ বিবরণের সমান্তরাল হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। এর কারণ হলো, সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে, সুনির্দিষ্টকরণ অধীন খণ্ডবাক্য সাধারণ বিবরণের ব্যাখ্যা প্রদান করে, তাকে মুনসুখ বা অকার্যকর করে না।[৫৬]

তাখসিসের প্রকৃতি সম্পর্কে আলেমদের মধ্যে মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও এটি প্রতীয়মান হয় যে, তাখসিস 'আম' কে আংশিক অকার্যকর করে না বরং তার ব্যাখ্যা দেয় বা এভাবে তাকে সুনির্দিষ্ট করে। এটি হলো সংখ্যাগরিষ্ঠের মত, যা হানাফীদের মত থেকে অধিকতর পছন্দনীয় মনে হয়– যাতে তাখসিসকে আংশিক মানসুখের সমতুল্য বলে গণ্য করা হয়েছে।[৫৭] ইমাম গাজ্জালী হানাফীদের মত সম্পর্কে

www.pathagar.com

আলোচনা করেন এবং তা খণ্ডন করে দিয়ে বলেন যে, নিছক সময়ের পার্থক্যে তাখসিসের বৈশিষ্ট্য মানসুখে পরিবর্তিত হয়, এ সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না, না এ কথা বলা সঠিক হবে যে, দলিলের শক্তির তারতম্য তাখসিস ও মানসুখের নির্ধারক হতে পারে।[৫৮]

সুনির্দিষ্টকরণ অধীন বাক্য 'আম-এর প্রয়োগ সীমাবদ্ধ না করা পর্যন্ত তা কার্যকর থাকবে এবং তার ওপর আমল করা প্রয়োজন। যে ক্ষেত্রে সাধারণ বিধান আংশিকভাবে সুনির্দিষ্ট হয় সে ক্ষেত্রে যে অংশটুকু অনির্দিষ্ট থাকে তার বৈধ কর্তৃত্ব তখনো বহাল থাকে। সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে, সার্বিকভাবে 'আম' ধারণামূলক, এর আগে বা পরে তাখসিস থাকুক বা না থাকুক এবং এ রকম হলে সে ক্ষেত্রে তা সীমিতকরণ ও তাবিল উভয়ের জন্য উন্মুক্ত হবে। অবশ্য হানাফীদের মতে, আম প্রথমত, সুনির্দিষ্ট তবে যখন তা আংশিকভাবে সুনির্দিষ্ট হয় তখন যে অংশটুকু তখনো অনির্দিষ্ট থাকে সে অংশ ধারণামূলকে পরিণত হয়, তাই তাকে যন্নী হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং তাকে আরেকটি যন্নী দ্বারা সহজে আরো সুনির্দিষ্টকরণ করা যাবে।[৫৯]

সাধারণ বিধানের কোনো কারণ এর সাধারণ প্রয়োগকে সীমিতকরণের বিষয় হলো কি না সে প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, কোনো কারণ একটি সাধারণ বিধানকে কখনো সুনির্দিষ্ট করতে পারে না। কুরআন যেহেতু অবতীর্ণের সময় বা আসবাব আল নুজুলের সাথে সংশ্লিষ্ট তাই এ বিষয়টি প্রাসঙ্গিক। সুনির্দিষ্ট বিষয়ের ব্যাপারে অবতীর্ণ কুরআনের আয়াত থেকে প্রায় সাধারণ বিধান পাওয়া যায়। অবতীর্ণের কারণ বিশেষ পরিস্থিতির কথা চিন্তা করা অথবা না করা যাই হোক না কেন, তা সাধারণ বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতার বিষয় হিসেবে কাজ করে না। এভাবে (সুরা নূরে ২৪ : ৬) শপথ করা (লিআন) সংক্রান্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় মদিনার এক অধিবাসীর অভিযোগ প্রসঙ্গে। হেলাল ইবনে উমাইয়া স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যাভিচারের অভিযোগ প্রমাণের জন্য চারজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী হাজিরের কঠিন অভিজ্ঞতার কথা রসুল সা.কে জানানোর পর আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এ অবতীর্ণের কারণ সুনির্দিষ্ট কিন্তু বিধানটি সাধারণ রয়ে গেছে। অনুরূপভাবে হাদিসে বলা হয়েছে :

ايما أهاب دبغ فقد طهر

'যখন কোনো চামড়া শুকিয়ে পাকা করা হয় তখন তা পবিত্র হয়ে যায়।'[৬০]

হাদিসটিতে মেষের চামড়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তৎসত্ত্বেও এ বিধান সব ধরনের চামড়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। তাই কারণ যাই হোক না কেন, সেটা বড়

www.pathagar.com

কথা নয়, বরং সাধারণ বিধানের প্রকৃত বক্তব্য কি সেটাই বিবেচনায় নিতে হবে। যদি বিধানটি সাধারণ বিষয় বুঝায় তাহলে তাকে অবশ্য সেভাবেই প্রয়োগ করতে হবে ঘটনার কোনো পেছনের কারণ সুনির্দিষ্ট হলেও।[৬১]

আম ও খাস-এর মধ্যে বিরোধ

একই ও অভিন্ন বিষয়ে কুরআনের মূল পাঠে দু'টি বিধান থাকলে তার একটি আম ও অন্যটি খাস হলে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে নয়, হানাফীগণের মতে, সে ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেবে। এর কারণ হলো, হানাফীদের মতে, আম ও খাস উভয়ই সুনির্দিষ্ট (কাতয়ী) এবং এ কারণেই তাদের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে, কেবলমাত্র খাসই কাতয়ী এবং তা সব সময়ই আম-এর ওপরে বহাল থাকে, কেননা আম হচ্ছে যন্নী।

হানাফীগণ মনে করেন যে, কুরআনে আম ও খাসের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে প্রথমেই অবশ্যই তাদের মধ্যকার কালানুক্রমিক ক্রম নির্ণয় করতে হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, তারা উভয়ে মক্কী ও মাদানি আয়াত অথবা একটি মক্কী অন্যটি মাদানী আয়াত হতে পারে। যদি দু'টি সমান্তরাল সময়ে অবতীর্ণ হয়ে থাকে তাহলে খাস আমকে সুনির্দিষ্ট করবে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে যদি পৃথক কালানুক্রমিক ক্রম প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে আম পরে আসলে তা খাসকে মুনসুখ করবে, কিন্তু খাস পরে হলে তা কেবল আংশিকভাবে আমকে মুনসুখ করবে। এর কারণ হানাফীগণ মনে করেন যে, আম ও খাস যখন কালানুক্রমিকভাবে সমান্তরাল হয় কেবল তখনই খাস 'আমকে সুনির্দিষ্ট করে। উভয়ে কাতয়ী এবং উভয় স্বাধীন উক্তি।

আগেই বলা হয়েছে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম আম ও খাসের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়ার কোনো সম্ভাবনা দেখেননি, কারণ যখন একই বিষয়ে দু'টি বিধান থাকে তখন তার একটি আম ও অন্যটি খাস হয়। পরেরটি আগেরটির ব্যাখ্যামূলক এবং উভয়ই বহাল থাকে। সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে, 'আম' জাহিরের মতো, তাই উভয় ধারণামূলক এবং উভয়ে সুনির্দিষ্টকরণ ও তাবিলের জন্য উন্মুক্ত।[৬২]

জাকাত সম্পর্কিত নিম্নোক্ত দু'টি হাদিসে তাখসিসের উপরিউক্ত দু'টি দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধের বিষয় প্রকাশ পেয়েছে। এর একটি হাদিসে বলা হয়েছে :

www.pathagar.com

ما سقته السماء ففيه العشر

'আকাশ থেকে বৃষ্টির পানি দিয়ে চাষাবাদের এক-দশমাংশ জাকাত দিতে হবে।' দ্বিতীয় হাদিসে বলা হয়েছে[৬৩] :

ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة

'পাঁচ আওসাকের নিচে কোনো সাদাকা হয় না।' পরিমাপের একক এক আওসাক হচ্ছে ১০ কিলোগ্রামের সমপরিমাণ। প্রথম হাদিসটিতে যে কোনো পরিমাণ কৃষিজাত পণ্যের বিষয়ে একটি সাধারণ বিধান রয়েছে কিন্তু দ্বিতীয় হাদিসটিতে এ বিষয়টিকে নির্দিষ্টকরণ করা হয়েছে। (ইমাম শাফেয়ীসহ) সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মত হলো, দ্বিতীয় হাদিসটি প্রথম হাদিসটির ব্যাখ্যা প্রদান ও সুনির্দিষ্টকরণ করেছে। প্রথম হাদিসটিতে জাকাতের সাধারণ মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে আর দ্বিতীয়টিতে জাকাতের পরিমাণ (নিসাব) নির্ধারণ করা হয়েছে। অবশ্য হানাফীদের মতে, প্রথম হাদিসটি দ্বিতীয় হাদিসকে রহিত করেছে, কারণ তারা মনে করেন প্রথম হাদিসটি দ্বিতীয়টির পরে উৎপত্তি হয়েছে। হানাফীদের মতে, যখন 'আম' খাসের পরে উৎপত্তি, পরেরটি আগেরটিকে পুরোপুরি রহিত বা মুনসুখ করেছে। তাই এ ক্ষেত্রে তাখসিসের কোনো ঘটনা ঘটছে না। ফলে হানাফীরা সেচ ছাড়াই চাষাবাদের ফসলের ওপর জাকাতে কোনো সর্বনিম্ন পরিমাণ আরোপ করেননি। দু'টি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বেশ পার্থক্য দেখা যাচ্ছে এবং তাদের পরস্পরের সামঞ্জস্য বিধায় কোনো ক্ষেত্র নেই। অবশ্য আগেই আভাস দেয়া হয়েছে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত বেশ যুক্তিসঙ্গত এবং এতে আম ও খাসের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে রহিতকরণ অবলম্বনের কোনো প্রয়োজন নেই। আধুনিক আইনেও প্রায়ই দেখা যায় যে নির্দিষ্ট বিষয় সাধারণ বিষয়কে সুনির্দিষ্ট করে এবং উভয়টি সহাবস্থান করতে পারে। এভাবে আম ও খাস তাদের উৎপত্তির সময়ের পার্থক্য থাকুক বা না থাকুক, পরস্পরের শক্তির মাত্রার মধ্যে কোনোরূপ ব্যতয় না করে নিজ নিজ ক্ষেত্রে কাজ করতে পারে।[৬৪]

শ্রেণি বিভাগ ৩ : নিরঙ্কুশ (মুতলাক) ও শর্ত সাপেক্ষ (মুকাইয়াদ)

মুতলাক এমন শব্দকে বুঝায় যা তার ব্যবহারকে না সুনির্দিষ্ট বা বিশেষিত করে আর না তাকে সীমিত করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আমরা যখন বলি, একটি বই, একটি পাখি, এক ব্যক্তি। এগুলো এক একটি শ্রেণিবাচক বিশেষ্য, যা কোনোরূপ বিধিনিষেধ ছাড়াই যে কোনো বই, পাখি ও মানুষ বুঝাচ্ছে। মূল অবস্থার আলোকে মুতলাক হলো অনির্দিষ্ট ও অসীমাবদ্ধ। মুতলাক ও আম-এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

www.pathagar.com

'আম' যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় সব কিছুই তার অন্তর্ভুক্ত হয়- অন্যদিকে মুতলাক বহুর সবটির নয়, যে কোনো একটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়।[৬৫] মুতলাক ও মুকাইয়াদের ব্যাপারে অবশ্য আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। আল বাইজাবিসহ অনেক আলেম মনে করেন যে, মুতলাকের সাথে আমের এবং মুকাইয়াদের সাথে খাসের মিল রয়েছে। তাই যা কিছু 'আম' কে সুনির্দিষ্ট করে তা মুতলাককে নির্দিষ্ট করে। উভয়ই তাবিলের জন্য উন্মুক্ত এবং মুতলাক/মুকাইয়াদ হচ্ছে আম/খাসের পরিপূরক।[৬৬]

যখন কোনো শব্দ বা শব্দ সমষ্টি মুতলাককে বিশেষায়িত করে তখন তা মুকাইয়াদে পরিণত হয়। যেমন- 'একটি বইকে সীমাবদ্ধ করা হলো সবুজ বই অথবা একটি পাখিকে 'বড় পাখি' অথবা একজন লোককে 'জ্ঞানী ব্যক্তি' বলে। মুকাইয়াদ ও খাসের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে; পূর্বেরটি অনির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে বুঝায় কোনো গুণ বা সীমাবদ্ধতায় তাদের তেমন একটা পার্থক্য দেখা যায় না। কুরআনে মুতলাকের একটি উদাহরণ হলো, ত্রুটিপূর্ণ ওয়াদা করার কাফফরা, তাহলো, একটি দাস মুক্ত করে দেয়া (ফা-তাহরীরু রাকাবাতিন), এ আয়াতটি (সুরা মায়েদায় ৫ : ৯২) উল্লিখিত হয়েছে। এ আদেশে কোন ধরনের দাস মুক্ত করতে হবে, মুসলিম না অমুসলিম তা সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়নি। কুরআনের আরেকটি আয়াতে ভুলবশত কাউকে হত্যা করলে কাফফারা হিসেবে একজন মুসলমান দাসকে মুক্ত করে দিতে হবে ফা-তাহরীরু রাকাবাতিন মু'মিনাতিন, (সুরা নিসা, ৪ : ৯২)। প্রথম আয়াতে নিরঙ্কুশ বিষয় প্রকাশ পেয়েছে, এর বিপরীতে দ্বিতীয় আয়াতে নির্দেশের বিষয়টি সীমাবদ্ধ করা হয়েছে, তাহলো, যে দাসকে মুক্ত করা হবে তাকে অবশ্যই মুসলমান হতে হবে।

মুতলাককে নির্দিষ্ট করার জন্য কোনো সীমাবদ্ধতা আরোপ না করা পর্যন্ত তার ব্যবহার নিরঙ্কুশ থাকবে। এভাবে বিয়ে হারাম সংক্রান্ত কুরআনের বিধানে 'তোমাদের স্ত্রীদের মায়েদের...' (সুরা নিসা, ৪ : ২৩) নিরঙ্কুশ ভাব প্রকাশ পেয়েছে এবং কোনো ব্যক্তির জন্য তার শাশুড়িকে বিয়ে করা হারাম, তার মেয়ের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর শারীরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে কি না, সেটা এখানে ধর্তব্যের বিষয় নয়। যেহেতু কুরআনের এ নির্দেশকে সীমাবদ্ধ করার কোনো আভাস নেই সেহেতু তা যথারীতি কার্যকর হবে। কিন্তু যখন কোনো মুতলাক মাকায়েদে সীমাবদ্ধ করা হয় তখন পরেরটিকে পূর্বেরটির উপর অগ্রাধিকার দেয়া হয়। এভাবে যদি এক ও অভিন্ন বিষয়ে দুইটি আয়াত থাকে এবং উভয়ে যদি একই বিধান (হুকম) ও উভয়ের একই কারণ (সাবাব) থাকে কিন্তু তাদের একটি মুতলাক আর অন্যটি মুকাইয়াদ হয় সে ক্ষেত্রে পরেরটি পূর্বেরটির ওপর বহাল থাকবে। কুরআন থেকে এর উদাহরণ

www.pathagar.com

হিসেবে আমরা রক্ত খাওয়া মানুষের জন্য হারাম সংক্রান্ত দু'টি আয়াতের উল্লেখ করতে পারি। এর মধ্যে প্রথম আয়াতটিতে নিরঙ্কুশ বিষয় প্রকাশ পেয়েছে, 'তোমাদের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছে মৃত জন্তুর রক্ত, (সুরা মায়েদা, ৫ : ৩) কিন্তু কুরআনের অন্য স্থানে একই বিষয়ে আরেক আয়াতে রক্তকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে 'প্রবাহিত রক্ত' (দামান মাসফুহান) বলে (সুরা আন'আম, ৬ : ১৪৫)। দ্বিতীয় আয়াতটি হচ্ছে মুকাইয়াদ আর প্রথমটি মুতলাক; তাই মুকাইয়াদ বহাল থাকবে। এখানে এ কথা বলা দরকার যে, উভয় আয়াতে একই বিধানের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, তাহলো, হারাম এবং তাদের কারণ একই অথবা বিষয়বস্তু অভিন্ন (যেমন- রক্ত পান)। এ রকম হওয়ায় আলেমদের অভিন্ন মত হচ্ছে, মুকাইয়াদ মুতলাককে নির্দিষ্ট করে এবং তার ওপর বহাল থাকে।[৬৭]

অবশ্য একই বিষয়ে দু'টি আয়াতের একটি যদি নিরঙ্কুশ ও অন্যটি নির্দিষ্ট হয় কিন্তু তাদের বিধান ও কারণ অথবা উভয়ই একে অপরের থেকে ভিন্ন হয়, তাহলে তাদের কোনোটি অন্যটি দ্বারা সীমাবদ্ধ হবে না এবং প্রত্যেকটি নিজ নিজ অবস্থান মতো কার্যকর থাকবে। এ হলো হানাফী ও মালেকী মাজহাবের মত এবং শাফেয়ীও এ মত পোষণ করেছেন। কেননা এটি দু'টি আয়াতকে সম্পর্কিত করছে যার নিজ নিজ বিধান ও কারণ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। অবশ্য শাফেয়ী এ মত পোষণ করেন যে, যদি দু'টি আয়াতের বিধানের (হুকম) পার্থক্য থাকে কিন্তু অভিন্ন কারণ থাকে তাহলে মুকাইয়াদ মুতলাককে নির্দিষ্ট করবে। ওজু সংক্রান্ত কুরআনের দু'টি আয়াত থেকে এ বিষয়ে উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। এর একটিতে মুমিনদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, 'তোমাদের মুখমণ্ডল ও দু'হাতের কনুই পর্যন্ত (আইদকুম) ধৌত কর' (সুরা মায়েদা, ৫ : ৭)। এ আয়াতে হাত ধৌত করার বিষয়টি পরের বাক্যাংশ কনুই পর্যন্ত বলার মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কুরআনের দ্বিতীয় বিধানটি তায়াম্মুম সংক্রান্ত আয়াতে বলা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, পানি পাওয়া না গেলে সে ক্ষেত্রে পবিত্র বালু দিয়ে ওজু সম্পন্ন করা যাবে : 'তোমরা পবিত্র মাটির সাহায্য গ্রহণ কর এবং তার দ্বারা মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ কর' (সুরা নিসা, ৪ : ৪৩)। 'আইদিকুম' (তোমাদের হাত) প্রথম আয়াতে মুকাইয়াদ এবং দ্বিতীয় আয়াতে মুতলাক। কিন্তু দু'টি আয়াতের কারণ এক ও অভিন্ন, তাহলো, নামাজের জন্য পবিত্রতা অর্জন। দু'টি বিধানের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। তা হলো, প্রথমটিতে দুই হাত ধৌত করা প্রয়োজন, আর দ্বিতীয়টিতে মাসেহ করা দরকার, কিন্তু এ পার্থক্যের কোনো ফলাফল নেই। প্রথমটি হাতের কোন পর্যন্ত ধৌত করতে হবে সে আলোকে মুকাইয়াদ, অন্য দিকে দ্বিতীয়টি একটি নিরঙ্কুশ অর্থ প্রকাশ করেছে। তাই দ্বিতীয়টি প্রথমটির দ্বারা নির্দিষ্ট হয়েছে এবং মুকাইয়াদ বহাল

থাকবে। এরই ফলোশ্রুতিতে তায়াম্মুমের ক্ষেত্রেও দুই হাতের কনুই পর্যন্ত মাসেহ করতে হবে।

পরিশেষে মুতলাক ও মুকাইয়াদ সম্পর্কিত আরো দুইটি আয়াতের উদাহরণ দিতে চাই। এর উভয়ে একই বিধান নির্দেশ করেছে কিন্তু তাদের কারণ ভিন্ন। আমরা সাক্ষ্য প্রদান সংক্রান্ত কুরআনের দু'টি আয়াত নিয়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করব। এর একটি আয়াতে সব বাণিজ্যিক লেনদেনের ক্ষেত্রে দু'জন সাক্ষী রাখার বিষয়টি নিরঙ্কুশ অর্থে প্রকাশ পেয়েছে আর দ্বিতীয়টিতে নির্দিষ্ট। দু'টি আয়াতের প্রথমটিতে 'মানুষরা' শব্দটি সুনির্দিষ্ট নয়, এতে বলা হয়েছে, 'অতঃপর তোমাদের মধ্য হতে দু'জন পুরুষ লোককে উহার সাক্ষী বানিয়ে নাও' (সুরা বাকারা, ২ : ২৮২)। কিন্তু একই বিষয়ে দ্বিতীয় আয়াতে সাক্ষী সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট আদেশ দেয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, (যখন তোমরা তালাক প্রত্যাহার করবে তখন) এমন দু'জনকে সাক্ষী বানাবে যারা তোমাদের মধ্যে সুবিচারকারী হবে, (সুরা তালাক, ৬৫ : ২)। উভয় আয়াতের বিধান একই। তাহলো, দু'জন সাক্ষী প্রয়োজন; কিন্তু কুরআনের দিক থেকে দু'টি বিধানের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আগেই বলা হয়েছে, প্রথম আয়াতের কারণ হলো বাণিজ্যিক লেনদেন, দু'ব্যক্তি যথারীতি যার সাক্ষী হবে। অন্যদিকে দ্বিতীয় আয়াতের কারণ সুনির্দিষ্ট, আর তা হলো তালাক প্রত্যাহারের বিধান। প্রথম আয়াতে সাক্ষীরা সুনির্দিষ্ট নয়, কিন্তু দ্বিতীয় আয়াতে সুনির্দিষ্ট। পরেরটি পূর্বেরটির ওপর বহাল থাকবে। এর ফলে বাণিজ্যিক লেনদেন ও তালাক প্রত্যাহার উভয় ক্ষেত্রে সাক্ষীদের অবশ্যই সৎ ও ন্যায়পরায়ণ হতে হবে।[৬৮]

উপরের এ দৃষ্টিভঙ্গি হলো সংখ্যাগরিষ্ঠের মত। কিন্তু হানাফীগণ মনে করেন যে যখন কারণের ক্ষেত্রে মুতলাক ও মুকাইয়াদের মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয়, তখন একে অপরকে নির্দিষ্ট করে না, সে ক্ষেত্রে উভয়ই স্বতন্ত্রভাবে কার্যকর থাকবে। হানাফীগণ মৌলিকভাবে একটি ঘটনার ক্ষেত্রে মুকাইয়াদ দ্বারা মুতলাকের নির্দিষ্টকরণের স্বীকৃতি দিয়েছেন। যেমন- যখন উভয়ে একই বিধান প্রদান এবং তাদের কারণও একই হয়। কিন্তু যখন এর কোনো একটি বা উভয়টির মধ্যে পার্থক্য হয় তখন তাদের প্রত্যেকটি পৃথকভাবে নিজ নিজ অবস্থানে বহাল থাকে। অবশ্য হানাফীগণ তায়াম্মুমের সময় ওজুর মতো পানি দিয়ে হাত ধৌত করার অনুরূপ মাসেহ করার শর্ত প্রয়োগের ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের সাথে একমত নন। হানাফীগণের যুক্তি হলো, তায়াম্মুম সম্পর্কে হুকম নিরঙ্কুশ অর্থে এসেছে এবং ঠিক সেভাবে তা কার্যকর করতে হবে। তাদের মতে, তায়াম্মুম ওজুর মতো নয়, এটি একটি শারয়ী সুবিধা এবং হাতের যে এলাকা মাসেহ করতে হবে তাসহ বিস্তারিত শর্তাবলি নির্ধারণে সুবিধাদানের এ চেতনা বিদ্যমান থাকতে হবে।[৬৯]

www.pathagar.com

শ্রেণি বিভাগ ৪ : আক্ষরিক (হাকিকি) ও রূপক (মাজাজি)

কোনো শব্দ আক্ষরিক অর্থে অর্থাৎ মূল বা প্রাথমিক অর্থে কিংবা তার গৌণ বা রূপক অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যখন কোনো শব্দ আক্ষরিক অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন তার মূল অর্থ বজায় থাকে, কিন্তু যখন তা রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন দুই অর্থের মধ্যকার সম্পর্কের ভিত্তিতে তার অর্থ মুখ্য থেকে গৌণে স্থানান্তরিত হয়।[৭০]

সাধারণত কোনো শব্দের আক্ষরিক ও রূপক অর্থের মধ্যে একটি যৌক্তিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। এ সম্পর্কের প্রকৃতি বিভিন্ন ধরনের এবং সম্ভাবনার ব্যাপক ক্ষেত্র পর্যন্ত প্রসারিত। শব্দের রূপক ব্যবহারের সাথে তার আক্ষরিক অর্থের অন্তত ৩০ থেকে ৪০ প্রকারের সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে।[৭১] এভাবে শব্দের রূপক ব্যবহারে মূল থেকে সম্প্রসারিত অর্থের দিকে তার স্থানান্তর ঘটে। একবার এ ধরনের পরিবর্তন ঘটলে একই সময়ে এর মূল ও রূপক অর্থ একসাথে ব্যবহার করা যাবে না।

শব্দসমূহ স্বাভাবিকভাবে আক্ষরিক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং আইনের ভাষার ক্ষেত্রে আক্ষরিক অর্থের ওপরই বহুলাংশে নির্ভর করা হয়। তাই কোনো শব্দ যদি একই সাথে উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয় সে ক্ষেত্রে আক্ষরিক অর্থই বহাল থাকবে। এর উদাহরণ হলো, যখন কোনো ব্যক্তি তার অসিয়তে বলেন যে, 'আমি আমার সম্পত্তি কুরআনের হাফেজদের জন্য দান করছি অথবা 'আমার সন্তানদের' যারা কুরআন হেফজ করেছিল, কিন্তু যারা পরে ভুলে গেছে, তারা এটি পাওয়ার অধিকারী হবে না। অনুরূপভাবে 'সন্তানরা (আওলাদ)' এর প্রাথমিক অর্থ ছেলেমেয়েরা, নাতি-নাতিন/পুতি-পুতনীরা নয়। নাতি-নাতনীদের ক্ষেত্রে আওলাদ শব্দের ব্যবহার হচ্ছে একটি রূপক ব্যবহার যা এর মূল অর্থের গৌণ অর্থ প্রকাশ করছে।[৭২]

পবিত্র কুরআনে হাকিকি ও মাজাজি উভয়ের ব্যবহার দেখা যায় এবং তারা তাদের নিজ নিজ অর্থ প্রকাশ করে। আমরা কুরআনে দেখতে পাই, 'জীবন হত্যা করো না (লা তাকতুলু)', আল্লাহ একে পুতঃপবিত্র হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। এখানে 'লা তাকতুলু' আক্ষরিক অর্থ বহন করছে। অনুরূপভাবে কুরআনে প্রায় রূপক ব্যবহার দেখা যায়। এর উদাহরণ আমরা কুরআনে দেখতে পাই- 'তিনি আসমান থেকে তোমাদের রিজিক দান করেন' (সুরা মুমিনে, ৪০ : ১৩)। এর অর্থ হচ্ছে বৃষ্টি যার কারণে খাদ্য উৎপাদিত হয়। অনেক আলেম মনে করেন যে, প্রকৃতিগত দিক থেকে মাজাজি সমলেখ শব্দ। যার সমন্বয়ে এটি গঠিত হয় তা মিথ্যা হতে পারে অথবা তা বাস্তবতা ও সত্য বর্জিত। কুরআনে এ ধরনের মিথ্যার কোনো স্থান নেই। ইমাম গাজ্জালী এ যুক্তির বিষয়ে আলোচনা করে একে খণ্ডন করে দিয়েছেন এবং

www.pathagar.com

সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমতের প্রতি সমর্থন জানিয়ে কুরআনে মাজাজির অস্তিত্ব থাকার কথা স্বীকার করেন। কুরআনের মাজাজির অনেক উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায় : 'আল্লাহ আকাশমণ্ডল ও যমীনের নূর' (সুরা নূর, ২৪ : ৩৫) এবং 'যখনই তারা (ইহুদিরা) যুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলিত করে আল্লাহ তায়ালা তা নিভিয়ে দেন' (সুরা মায়েদ, ৫ : ৬৪)। এখানে আল্লাহ 'আকাশমণ্ডলের নূর হওয়া' এবং 'যুদ্ধের আগুন নিভিয়ে দেয়া' উভয়ই রূপক ব্যবহার। কুরআনে মাজাজির এ ধরনের অসংখ্য উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়।[৭৩] আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কুরআনে হাকিকি ও মাজাজি উভয়ের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় এবং তারা নিজ নিজ অর্থ প্রকাশ করে। কিন্তু যেসব ব্যবহারের ক্ষেত্রে মাজাজি মুখ্য ভূমিকা পালন করে না, কেবল সেসব ক্ষেত্রেই এমনটি হয়ে থাকে। যে ক্ষেত্রে আক্ষরিক ও রূপক উভয় অর্থের শব্দ রয়েছে এবং পরেরটি সুপ্রতিষ্ঠিত ও মুখ্য সে ক্ষেত্রে পূর্বেরটির ওপর তা বহাল থাকবে। কিছু আলেম অবশ্য এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। তাহলো, সব ক্ষেত্রেই হাকিকিই বহাল থাকবে। এ ছাড়া তৃতীয় একটি মত রয়েছে, তাহলো, উভয়কেই সমান গুরুত্ব দিতে হবে। কিন্তু এসব মতের মধ্যে প্রথমটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মত প্রতিফলিত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, 'তালাক' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে, 'মুক্ত করে দেয়া' অথবা 'বিধিনিষেধ সরিয়ে ফেলা' (ইজালাহ আল কায়াদ) হোক তা বিয়ে, দাসত্ব বা মালিকানার সম্পর্ক ইত্যাদি। কিন্তু যেহেতু 'তালাকের' আইন সংক্রান্ত অর্থ হচ্ছে, বিয়ে ভেঙে যাওয়া বা বিবাহ বিচ্ছেদ, আর এ অর্থই, পুরোপুরি প্রাধান্য পেয়েছে তাই অন্য কোনো অর্থ গ্রহণের প্রমাণ পাওয়া না গেলে তালাকের এ অর্থই বহাল থাকবে বলে মনে করা হয়।[৭৪]

হাকিকিকে কয়েকটি উপভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রকাশের প্রেক্ষাপটের আলোকে একে ভাষাগত (লুগবি) প্রথাগত (উরফী) ও শরয়ী বিধান সংক্রান্ত (শারয়ী) এ তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। ভাষাগত হাকিকি শব্দের ক্ষেত্রে আভিধানিক অর্থ ব্যবহার করা হয়। যেমন- একটি জন্তু বুঝাতে 'সিংহ' এবং মানবজাতির পুরুষ লোক বুঝাতে 'মানুষ' শব্দদ্বয় ব্যবহার করা হয়। প্রচলিত রীতির হাকিকি আবার দুই প্রকার। সাধারণ ও বিশেষ। যখন কোনো শব্দ প্রচলিত রীতির অর্থে ব্যবহার হয় এবং সে রীতি জনগণের মধ্যে সম্পূর্ণ অভিন্ন হলে এ প্রথাগত হাকিকিকে সাধারণ বলা হয়, যা সাধারণ রীতিনীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এর উদাহরণ হচ্ছে আরবি শব্দ 'দাব্বাহ'। এর আভিধানিক অর্থ হলো পৃথিবীতে বিচরণকারী প্রতিটি জীবজন্তু; কিন্তু সাধারণ প্রথা অনুযায়ী তা ভিন্ন অর্থ চতুষ্পদ জন্তু বুঝায়। কিন্তু যখন প্রথাগত হাকিকি কোনো নির্দিষ্ট পেশাজীবী শ্রেণি বা গ্রুপকে বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয় তখন সে প্রথাগত হাকিকিকে বিশেষ শ্রেণিভুক্ত করা হয়। অর্থাৎ তা বিশেষ রীতির

www.pathagar.com

সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এর উদাহরণ হলো, আরবি শব্দ 'রাফ' (কর্তৃকারক) ও 'নসব' (কর্মকারক), এদের প্রত্যেকের পারিভাষিক অর্থ রয়েছে, যা ব্যাকরণবিদ ও ভাষা বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সাধারণ।

শরয়ী বিধিবিধান সংক্রান্ত হাকিকির প্রকৃতির ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। কিছু সংখ্যক আলেম মনে করেন যে, এটি এক প্রকার মাজাজি। কিন্তু এ কথা বলার পর শরয়ী বিধিবিধান সংক্রান্ত হাকিকির সংজ্ঞায় বলা যায় যে, এটি এমন শব্দ যা শরয়ী বিধানসংক্রান্ত অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং প্রথমত, আইনদাতা এ অর্থ প্রদান করেছেন, যেমন- 'সালাত' বা নামাজ। এর আক্ষরিক অর্থ হলো 'প্রার্থনা'। কিন্তু সুপ্রতিষ্ঠিত আইনগত বা শরয়ী অর্থে তাহলো এক ধরনের সুনির্দিষ্ট ইবাদত। অনুরূপভাবে 'জাকাত' শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'পরিশুদ্ধি'। কিন্তু এর শরয়ী অর্থ হলো এক ধরনের বিশেষ দান। শরিয়তে যার বিস্তারিত বিবরণ সুনির্দিষ্ট রয়েছে।[৭৫]

মাজাজির উপবিভাগ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা আমাদের জন্য অনেক বাড়াবাড়ি হবে কেননা প্রথমত, ভাষাগত প্রয়োগ রীতির বিস্তারিত দিকের সাথে আমরা সংশ্লিষ্ট নই। এখানে এ কথা উল্লেখ করা দরকার যে, মাজাজি ও ভাষাগত, প্রথাগত ও শারয়ী বিধান সংক্রান্ত উপভাগে বিভক্ত। অবশ্য আরেকটি শ্রেণি বিভাগও রয়েছে যে বিষয়টির উপর নজর দেয়া দরকার। এতে হাকিকি ও মাজাজিকে সহজবোধ্য (সারিহ) ও পরোক্ষ (কিনাইযাহ) এ দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

শব্দের ব্যবহারে যদি বক্তার ইচ্ছা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় তাহলে তা হবে সহজবোধ্য, অন্যথায় তা পরোক্ষ। সহজবোধ (সারিহ) ও আক্ষরিক (হাকিকি) অর্থের সমন্বয়ে প্রকাশের স্পষ্টতার সর্বোচ্চ মাত্রা অর্জিত হয়। যেমন- 'আহমদ একটি গাড়ি কিনেছে' অথবা 'ফাতিমা আহমদকে বিয়ে করেছে।' সহজবোধ্য আবার রূপক অর্থের সাথেও সমন্বিত হতে পারে, যেমন- 'আমি এ গাছ থেকে খেয়েছি', এর উদ্দেশ্য ছিল এ কথা বুঝানো যে, 'এ গাছ থেকে ফল' পরোক্ষ বা কিনাইয়াহ এ ধরনের উক্তি যাতে বক্তার উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় না। আক্ষরিক ও রূপক অর্থের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে এটি ঘটে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যখন কোনো ব্যক্তি অন্যদের সামনে তার সহকর্মীকে গোপন বিষয় জানানোর ইচ্ছা করে বলল, 'আমি আপনার বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে ওই ব্যাপারে বললাম, যা আপনি জানেন।' এটি হলো আক্ষরিক ও পরোক্ষের সমন্বয়। এতে ব্যবহৃত সব শব্দই আক্ষরিক অর্থ প্রকাশ করেছে, কিন্তু সমগ্র বাক্যটি পরোক্ষ, কারণ তাতে বক্তার উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়নি। ধরুন কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে উদ্দেশ্য

www.pathagar.com

করে আরবিতে বলল, 'ইতাদ্দি', অর্থ গণনা শুরু কর। এ উচ্চারণ পরোক্ষ। কেননা 'গণনা'র আক্ষরিক অর্থ হলো, সংখ্যা সংরক্ষণ করা, কিন্তু এখানে 'ইদ্দত' পালনের অপেক্ষার সময় গণনার উদ্দেশ্যে দিন গণনার কথা বলা হয়েছে। এ বক্তব্যও রূপকধর্মী-যেহেতু 'ইদ্দত' একদিকে যেমন তালাকের কারণ তেমনি তা তালাকের বিকল্প হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। এটি এক ধরনের মাজাজি যার ফল কারণের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়।[৭৬]

যখন কোনো বক্তব্য সহজবোধ্য শব্দে গঠিত হয় তখন সেগুলোর ব্যবহারে বক্তার কী উদ্দেশ্য ছিল তা শব্দগুলো থেকে সংগ্রহ করতে হবে কারণ বক্তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনুসন্ধান ছাড়া আর কোনো পথ খোলা নেই। তাই যখন কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে, 'তোমাকে তালাক দেয়া হয়েছে' তখন সহজবোধ্য শব্দে তালাকের কথা উচ্চারিত হয় এবং স্বামীর উদ্দেশ্য যাই থাকুক না কেন, তালাক হয়ে গেছে। কিন্তু পরোক্ষ শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যক্তির উদ্দেশ্য কি ছিল এবং কোন পরিস্থিতিতে সে তা বলেছিল সেটা নির্ণয় করতে হবে। এভাবে যখন কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে, 'তুমি আমার জন্য হারাম' অথবা যখন সে তাকে বলে, 'তুমি তোমার আত্মীয়স্বজনের কাছে চলে যাও।' এ ক্ষেত্রে স্বামী তালাক দেয়ার উদ্দেশ্যে এসব কথা বলেছিল এমন প্রমাণ দেখানো না গেলে তালাক হবে না।[৭৭]

শরয়ী আইন সংক্রান্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা প্রয়োজন। যেমন- শাস্তির যোগ্য অপরাধের ঘটনা সহজবোধ্য নয় এমন ভাষার দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। উদাহরণ হলো- কোনো ব্যক্তি পরোক্ষ শব্দের মাধ্যমে এ ধরনের অপরাধ করার কথা স্বীকার করলে সে শাস্তির যোগ্য হবে না।[৭৮]

ফকিহগণ একমত হয়েছেন যে, কোনো একটি শব্দের আক্ষরিক অর্থ বজায় থাকা সত্ত্বেও তাকে রূপক অর্থে ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন- আরবি শব্দ 'উম্ম' (মা), অনেক সময় আরবরা দাদী/নানীকে বুঝাতেও রূপকভাবে এ শব্দটি ব্যবহার করে থাকে, অথচ এর আক্ষরিক অর্থ এখনো বহাল রয়েছে। তবে একই শব্দের আক্ষরিক ও রূপক উভয় অর্থ একই সাথে ব্যবহার করা যায় কি না তা নিয়ে উসুলের আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এর উদাহরণ হলো, যখন কোনো ব্যক্তি তার চাকরকে নির্দেশ দেয় সিংহটিকে হত্যা কর, তখন এ কথার মধ্যে কি একজন সাহসী ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। হানাফী ও মুতাজিলাগণ এ প্রশ্নের নেতিবাচক জবাব দিয়েছেন। তারা বলেন, শব্দ স্বাভাবিকভাবে আক্ষরিক অর্থ বহন করে যতক্ষণ না তার পরিবর্তে অন্য অর্থ গ্রহণের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়। অন্যদিকে ইমাম শাফেয়ী ও হাদিস শাস্ত্র বিশারদ অন্য আলেমগণ মনে করেন, শব্দের আক্ষরিক ও রূপক অর্থ একই সাথে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এভাবে তারা

www.pathagar.com

কুরআনের বিধানের উভয় অর্থকে বৈধ বলে গণ্য করেন, 'অথবা তোমরা যখন নারীদেরকে স্পর্শ করেছো' (সুরা নিসা, ৪ : ৪৩)। এর অর্থ হাত দিয়ে নারীদের স্পর্শ করা অথবা তাদের সাথে সহবাস করার অর্থেও স্পর্শ করা বুঝাতে পারে। কুরআনের যে আয়াতে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তাতে পবিত্র অবস্থা ভঙ্গের পরিস্থিতির বিবরণ দেয়া হয়েছে। এভাবে যখন কোনো মুসলমান কোনো নারীকে স্পর্শ করবে তখন পরবর্তী নামাজের জন্য তাকে অবশ্যই নতুন করে ওজু করতে হবে। কিন্তু হানাফীগণের মতে, কুরআনের এ আয়াতে স্পর্শ করার কেবলমাত্র রূপক অর্থ ব্যক্ত হয়েছে, আর তাহলো স্ত্রীর সাথে সহবাস। যেহেতু কোনো ব্যক্তি ওজু অবস্থায় হাত দিয়ে একজন মহিলাকে স্পর্শ করলে তার ওজু ভঙ্গ হবে না। অবশ্য শাফেয়ীদের মতে, এ আয়াতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শব্দটি একই সাথে আক্ষরিক ও রূপক উভয় অর্থ বহন করছে। এর ফলে কেবল সহবাস নয়; পরিবারে সদস্য নয় এমন কোনো নারীকে করমর্দনের মতো নিছক স্পর্শ করলেও পবিত্র অবস্থা ভঙ্গ হবে।[৭৯]

সমলেখ (মুশতারাক)

সমলেখ হলো এমন শব্দ যার একাধিক অর্থ রয়েছে। ইমাম শাফেয়ীসহ অনেক আলেম মনে করেন যে, মুশতারাক বা সমলেখ হলো 'আম-এর একটি রূপ। অবশ্য দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সহজাতভাবে সমলেখের একাধিক অর্থ রয়েছে কিন্তু 'আম-এর ক্ষেত্রে এমনটি হওয়া অপরিহার্য নয়। আরবিতে মুশতারাক শব্দের একটি উদাহরণ হলো 'আইন,' এর অর্থ অনেকগুলো, যার মধ্যে রয়েছে চোখ, জলপ্রপাত, স্বর্ণ ও গোয়েন্দা। অনুরূপভাবে 'কুর' শব্দটির দু'টি অর্থ রয়েছে তাহলো, ঋতুকাল এবং দুই ঋতুকালের মধ্যবর্তী পরিচ্ছন্ন সময়। হানাফী, হাম্বলী ও জায়েদীগণ কুর-এর প্রথম অর্থটি অন্যদিকে শাফেয়ী, মালেকী ও জাফরীগণ দ্বিতীয় অর্থটি সমর্থন করেন।[৮০]

বিভিন্ন আরব গোত্র ও গোষ্ঠীর নানামুখী ব্যবহারের কারণে সমলেখ শব্দ একাধিক অর্থ ধারণ করতে পারে। তাদের কেউ একে এক অর্থে ব্যবহার করে, অন্যরা অন্য অর্থে। অন্যদিকে কোনো শব্দের রূপক অর্থ গ্রহণ করা হয়, যা কালের আবর্তনে আক্ষরিক অর্থে পরিণত হয়। কুরআন-সুন্নাহ্তে যখন মুশতারাক দেখা যায় তখন তার একটিমাত্র অর্থ বুঝায়-একাধিক অর্থ নয়। কারণ আইনদাতা আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্য কোনো প্রদত্ত সময়ে একটি শব্দের একাধিক অর্থ প্রদান নয়। শাফেয়ী ও মুতাজিলাদের কেউ কেউ এর সাথে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তারা মনে করেন যে, মুশতারাকের এক, দুই বা ততোধিক অর্থের সমর্থনে কোনো নির্দেশনা পাওয়া না গেলে একই সাথে তার উভয় বা সব অর্থ সমুন্নত থাকবে- শর্ত হলো, তাদের

www.pathagar.com

পরস্পরের মধ্যে কোনো বিরোধ থাকা চলবে না। অবশ্য আরেকটি ভিন্ন মত রয়েছে, তাহলো নেতিবাচক বা অস্বীকৃতির (নাহি) ক্ষেত্রে একই সাথে শব্দের একাধিক অর্থ অনুমোদনযোগ্য; তবে দৃঢ়োক্তি ও প্রমাণের (ইসবাত) ক্ষেত্রে নয়। এর উদাহরণ হলো, আহমদ যদি বলে, আমি একটি 'আইন' দেখিনি (মা রায়াইতু আইনান)। এ নেতিবাচক বাক্যে আইন-এর সব অর্থের সমন্বয়ে গঠিত হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু আহমদ যদি বলতো, আমি আইন দেখেছিলাম। তাহলে এ বাক্যের 'আইন শব্দটির অনেক অর্থের মধ্যে মাত্র একটি ব্যবহৃত হবে।[৮১]

এ দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্য আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হবে না, কেননা তা এ ধরনের নিশ্চয়তা বা অস্বীকৃতিকে স্বীকার করে না। শরিয়াহর আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রে প্রদত্ত সময়ে কোনো সমলেখের বিভিন্ন অর্থের মধ্যে একাধিক অর্থ সমুন্নত করার কোনো উদ্দেশ্যে আইনদাতার থাকে না। সমলেখের একটি উদাহরণ কুরআনের একটি আদেশ সম্পর্কিত প্রেক্ষাপটে 'ইয়াদ' (হাত) শব্দে দেখতে পাওয়া যায়, 'চোর স্ত্রী হোক বা পুরুষ হোক, উভয়ের হাত কেটে দাও' (সুরা মায়েদা, ৫ : ৩৮)। এ আয়াতে 'হাত' শব্দটি কোনোভাবে নির্দিষ্ট করা হয়নি। তাই হাত বলতে এখানে আঙ্গুলের মাথা থেকে কবজি, কনুই এমনকি কাঁধ পর্যন্ত বুঝাতে পারে। এ ছাড়া বাম বা ডান হাতও বুঝাতে পারে। কিন্তু আলেমগণ এসব অর্থের মধ্যে প্রথম ও শেষটি অর্থাৎ কব্জি পর্যন্ত ও ডান হাতের ব্যাপারে একমত হয়েছেন।[৮২] কুরআনের হারাম নির্দেশের প্রেক্ষাপটে সমলেখের দৃষ্টান্ত হিসেবে 'নাকাহা'র উল্লেখ করা যায় (সুরা নিসায়, ৪ : ২২)। এ শব্দটি দেখতে পাওয়া যায়। আয়াতটিতে বলা হয়েছে : 'এবং ঐ সমস্ত নারীদের বিয়ে করো না যাদেরকে তোমাদের পিতারা বিয়ে করেছে, (মা নাকাহা আবুকুম)। 'নাকাহা' একটি সমলেখ শব্দ যার অর্থ বিয়ে ও সহবাস করা উভয়ই। হানাফী, হাম্বলী, আল আওজায়ী ও অন্যরা নাকাহার পরের অর্থটি সমর্থন করেছেন। অন্যদিকে শাফেয়ী ও মালেকীরা পূর্বের অর্থটি সমর্থন করেছেন। প্রথম মত অনুযায়ী যে নারী কোনো ব্যক্তির সাথে সহবাস করল তাকে বিয়ে করা তার ছেলে ও নাতীদের জন্য হারাম হয়ে যাবে। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া ছাড়া নিছক বিয়ে হলে সে ক্ষেত্রে তা হারাম হবে না। অবশ্য শাফেয়ী ও মালেকীগণ এ মত পোষণ করেন যে, আলোচ্য আয়াতটিতে কেবলমাত্র বিয়ের সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। সে অনুযায়ী কোনো মহিলা কোনো ব্যক্তির সাথে বিয়ের সম্পর্ক স্থাপন করলে, তাদের মধ্যে সহবাসের ঘটনা ঘটুক অথবা না ঘটুক, তাকে বিয়ে করা ওই ব্যক্তির ছেলে ও নাতিদের জন্য হারাম।[৮৩]

মুশতারাকের দুই বা ততোধিক অর্থের মধ্যে কোনটিকে সমুন্নত করা হবে তা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে বিশেষ উক্তি এবং তা সাধারণত যে প্রেক্ষাপট ও

www.pathagar.com

পরিস্থিতিতে উচ্চারিত হয়েছে তার সূত্র ধরে। উক্তিটি যদি শরিয়াহর অংশ হয় তাহলে এর শব্দের সুনির্দিষ্ট অর্থ নির্ধারণে সাধারণ নীতিমালা ও শরিয়াহর উদ্দেশ্যকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। মুশতারাক প্রকৃতিগত দিক থেকে মুশকিল (কঠিন) এবং গবেষণা ও ইজতিহাদের মাধ্যমে মুজতাহিদ সঠিক অর্থ নিরূপণ করেন। যে ক্ষেত্রে মুশতারাক কোনো আইনগত নির্দেশের ভিত্তি গঠন করে সে ক্ষেত্রে এমনটি করা মুজতাহিদের কর্তব্য হয়ে পড়ে।[৮৪] মুজতাহিদ এর প্রেক্ষাপট সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একটি সমলেখের দু'টি অর্থ আছে, একটি আক্ষরিক অন্যটি বিচারিক বা শরয়ী এবং যদি বিচারিক প্রেক্ষাপটে এটি অবতীর্ণ হয়েছে, তাহলে বিধি অনুযায়ী বিচারিক অর্থ বহাল থাকবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, 'সালাত' ও 'তালাক' শব্দ দু'টি। এদের প্রত্যেকটির আক্ষরিক অর্থ রয়েছে, তাহলো যথাক্রমে প্রার্থনা ও 'মুক্ত করে দেয়া।' কিন্তু যখন এগুলো শরয়ী প্রেক্ষাপটে আসে তখন তাতে শরয়ী অর্থ প্রাধান্য পায়। এ কারণে 'সালাত' বলতে বিশেষ ধরনের ইবাদত বুঝায়, আর তালাকের অর্থ 'বিবাহ বিচ্ছেদ।'

সবশেষে বলা যায়, মুশতারাক এমন একটি ধারণা যা কেবল বিশেষ্যের মধ্যেই সীমিত নয়; বরং ক্রিয়াও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পৃথক অধ্যায়ে আদেশ-নিষেধ সংক্রান্ত আলোচনাকালে আমরা দেখিয়েছি যে, অনুজ্ঞাসূচক শব্দ কিভাবে একাধিক অর্থ ব্যক্ত করে। এ ছাড়া জরুরি আদেশের আকারে কুরআনের শব্দগুলো আলোচনা ও তার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছি। তবে তাতে যে শরয়ী মূল্য রয়েছে তা হয় অবশ্য করণীয় নির্দেশ অথবা সুপারিশ কিংবা নিছক অনুমোদন।

টিকা

১. তুলনীয়, আব্দুর ওহিম, Jurisprudence, পৃষ্ঠা ৭৮।

২. বাদরান, বায়ান, পৃষ্ঠা ১২৪।

৩. খাল্লাত, ইলম, পৃষ্ঠা ১৬৭-৬৮।

৪. আমিদী, ইহকাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৩; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৪০০।

৫. আমিদী, ইহকাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৪: বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৪০০-৪০১।

৬. তাবরিজী, মিশকাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৪, হাদিস নম্বর ৩১৭৮: আমিদী, ইহকাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৪; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৪০১।

৭. আমিদী, ইহকাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৬; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৪০১। কষ্ট কল্পিত বিশ্লেষণের আরো উদাহরণ জানতে দেখুন, আমিদী, ইহকাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫-৬৪।

৮. বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৪০২।

৯. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ১৬৬।

www.pathagar.com

১০. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১৬১; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৪০৩; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ৯৩।

১১. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ৯৩; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৪০২।

১২. আবু দাউদ, সুনান, (হাসান অনূদিত), ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫৭, হাদিস নম্বর ২০৬০; খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা, ১৬৩; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ৯৪।

১৩. বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৪০৩; আবু জাহরাহ, উসুল পৃষ্ঠা ৯৪।

১৪. তাবরিজী, মিশকাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২০৩, হাদিস নম্বর ৪১৩২।

১৫. আবু দাউদ সুনান, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪১০, হাদিস নম্বর ১৫৬৭।

১৬. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ১৬৫; আমিদী, (ইহকাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৭) একে তাবিল বলে মনে করেছেন, যা কষ্ট কল্পিত।

১৭. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ১৬৬।

১৮. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ৯৫।

১৯. তুলনীয় খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ১৬৬।

২০. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ৯৬; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৪০৪-৪০৫।

২১. তাবরিজী, মিশকাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১৫, হাদিস নম্বর ৬৮৩; শাতিবী, মাওয়াফাকাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭৮; খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ১৬৭; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৪০৫।

২২. বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৪০৪।

২৩. আবু দাউদ, সুনান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৬, হাদিস নম্বর যথাক্রমে ২৯৪ ও ৩০৪।

২৪. একই গ্রন্থ।

২৫. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ১৬৯; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৪০৮।

২৬. Hughes, Dictioary of Islam, পৃষ্ঠা ৫১৮, বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৪০৬; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ৯৬।

২৭. আবু দাউদ, সুনান, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭০২, হাদিস নম্বর ২৫২৬; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ৯৬।

২৮. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ৯৬; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৪০৬।

২৯. আবু দাউদ, সুনান, (হাসান অনূদিত) ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫৫, হাদিস নম্বর ২০৭৮; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৪০৮।

৩০. বাদরান,.উসুল, পৃষ্ঠা ৪০৯।

৩১. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ১৬২; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৪০৯।

৩২. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ১৭০; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৪১০।

৩৩. শাফেয়ী, আল রিসালাহ, পৃষ্ঠা ৮০।

৩৪. বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৪১১।

৩৫. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ১৭৩; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৪১৩।

www.pathagar.com

৩৬. মুসলিম, সহিহ মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫২, হাদিস নম্বর ৯৪৯; খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ১৭৩-১৭৫; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৪১৪-৪১৫।

৩৭. The Holy Quran (ইউসুফ আলী অনূদিত), পৃষ্ঠা ১১৮; Denffer, উলুম, পৃষ্ঠা ৮৪; আবদুর ওহিম, Jurisprudence, পৃষ্ঠা ১০০।

৩৮. বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৪১৬।

৩৯. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ১৭৬।

৪০. গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৮।

৪১. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ৩১-৩২।

৪২. গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২; আবদুর ওহিম, Jurisprudence, পৃষ্ঠা ৭৯।

৪৩. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ১৭৮; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৩৭৫।

৪৪. বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৩৭০।

৪৫. আবদুর ওহিম, Jurisprudence, পৃষ্ঠা ৭৯।

৪৬. শাতিবী, মুওয়াফাকাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫৪।

৪৭. বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৩৮৬-৩৮৭; খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ১৮৫।

৪৮. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ১৮২; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৭১; আবদুর ওহিম, Jurisprudence, পৃষ্ঠা ৮৬।

৪৯. শাতিবী, মুওয়াফাকাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫৩; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ১২৪; আবদুর ওহিম, Jurisprudence, পৃষ্ঠা ৮২।

৫০. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ১২৫; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৩৮১।

৫১. বায়হাকী, আল-সুনান আল-কুবরা, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৪০; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৩৮৩।

৫২। শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ১৫৭; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ১২৫।

৫৩. আবদুর ওহিম, Jurisprudence, পৃষ্ঠা ৮৩-৮৪; খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ১৮৭; বাদরান উসুল, পৃষ্ঠা ৩৭৫-৩৭৮।

৫৪. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ১২৮; আবদুর ওহিম, Jurisprudence, পৃষ্ঠা ৮৪; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৩৭৯।

৫৫. বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৩৭৬।

৫৬. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ১২৮-১২৯।

৫৭. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১২৯।

৫৮. গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৩-১০৫।

৫৯. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ১৮৩; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ১২৯।

৬০. আবু দাউদ, সুনান (হাসান অনূদিত) ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১৪৯, হাদিস নম্বর ৪১১১; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ১৩০।

৬১. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ১৩০, খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ১৮৯।

www.pathagar.com

৬২. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১৩১; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৩৮৩।

৬৩. আল তাবরিজী, মিশকাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৬৩-৬৫, হাদিস নম্বর ১৭৯৪ ও ১৭৯৭; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ১৩১।

৬৪. তুলনীয়, আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ১৩২।

৬৫. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ১৯২; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৩৫১, ৩৭১।

৬৬. আনসারী, গায়াত আল উসুল, পৃষ্ঠা ৮৪।

৬৭. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ১৯৩; আবদুর ওহিম Jurisprudence, পৃষ্ঠা ৯১-৯২।

৬৮. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১৯৪; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৩৫৪।

৬৯. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১৯৩-১৪।

৭০. আবদুর ওহিম, Jurisprudence, পৃষ্ঠা ৯৩; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৩৯৪।

৭১. বিস্তারিত জানতে দেখুন, শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২৩-২৪।

৭২. বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৩৯৫; Hitu, Wajiz, পৃষ্ঠা ১১৫।

৭৩. গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ১, ৬৭-৬৮।

৭৪. Hitu, Wajiz, পৃষ্ঠা ১১৫।

৭৫. বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৩৯৪; Hitu, Wajiz, পৃষ্ঠা ১১২।

৭৬. মাজাজির বিভিন্ন রূপ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন, আবদুর ওহিম Jurisprudence, পৃষ্ঠা ৯৪-৯৭; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৩৯৭।

৭৭. বাদরান, উসুল, ৩৯৮।

৭৮. আবদুর ওহিম, Jurisprudence, পৃষ্ঠা ৯৮।

৭৯. বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৩৯৭।

৮০. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ১৩২; ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০১।

৮১. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২১; ইসনাবী, নিহাইয়াহ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬৬; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ১৩৩।

৮২. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ১৮০।

৮৩. বাদরান, বায়ান, পৃষ্ঠা ১০৩-১০৪।

৮৪. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ১৩৩; খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ১৭৯।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের নিয়মাবলি - ২
আল দালালাত (মূলপাঠের নিহিতার্থ)

আইন স্বাভাবিকভাবে এর মূলপাঠের স্পষ্ট অর্থই কেবল মেনে চলবে তা নয় উপরন্তু নিহিতার্থও মেনে চলা প্রয়োজন এবং এ থেকে যে পরোক্ষ ইঙ্গিত ও অনুমিতি ধারণ করা যায় তাও গ্রহণ করা যেতে পারে। কুরআন সুন্নাহ্‌র মূলপাঠের অর্থ বা নির্দেশনা থেকে উসুলের আলেমগণ নসের যথাযোগ্য অর্থের বিভিন্ন মাত্রার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। এ ক্ষেত্রে হানাফী ফকিহ্‌গণ চার পর্যায়ের অর্থ নিরূপণ করেছেন। সুস্পষ্ট ও তাৎক্ষণিক অর্থ দিয়ে এ মাত্রার ক্রমের সূচনা হয়েছে। এ ক্রমের পরবর্তীটি হলো, 'পরোক্ষ' (alluded) অর্থ, এরপর রয়েছে 'অনুমিত' অর্থ আর সবশেষে রয়েছে 'প্রয়োজনীয়' অর্থ। পঞ্চম আরো এক প্রকার অর্থ রয়েছে, যাকে বলা যায় 'বিচ্যুত' (Divergent) অর্থ যা কিছুটা বিতর্কিত, কিন্তু নীতিগতভাবে তা গৃহীত হয়েছে। আমরা এসব বিষয় নিয়ে নিম্নে আলোচনা করব। সুস্পষ্ট অর্থ ('ইবারাহ আল-নস) হলো মূলপাঠের শব্দ ও বাক্যের ভিত্তিতে গৃহীত প্রধান ও সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অর্থ। মূলপাঠে শনাক্তযোগ্য অন্যান্য পর্যায়ের সব ফলিতার্থের ওপর এ অর্থকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। মূলপাঠে সুস্পষ্ট অর্থের অতিরিক্ত যেসব লক্ষণ ও পরোক্ষ ইঙ্গিতে যে অর্থ থাকে তাও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। এ গৌণ অর্থকে বলা হয় ইশারাহ আল-নস, এটি হলো পরোক্ষ অর্থ। আইন সংক্রান্ত মূল পাঠে এমন অর্থও প্রকাশ পেতে পারে যা শব্দ বা লক্ষণ দ্বারা নির্দেশিত হয়নি। তথাপি সম্পূরক অর্থ মূলপাঠের যৌক্তিক ও বিচারিক অর্থের ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করতে পারে। এটি দালালাহ আল নস বা অনুমিত অর্থ বলে পরিচিত, যা পরোক্ষ অর্থের থেকে একমাত্রা নিচে অবস্থিত। বস্তুতপক্ষে এটি মূলপাঠের সম্পূর্ণ বহির্ভূত। তবে অনুমিত অর্থ পরোক্ষ অর্থের চেয়ে হীনতর কি না তা নিয়ে হানাফী ও শাফেয়ী ফকিহ্‌দের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে, এ বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। এ ক্রমের পরে রয়েছে ইকতিদাহ আল নস বা প্রয়োজনীয় অর্থ। এটিও যৌক্তিক ও প্রয়োজনীয় অর্থ, যা ছাড়া মূলপাঠ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে এবং প্রত্যাশিত উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যর্থ হবে।[১] প্রথম ও দ্বিতীয় অর্থের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে সে ক্ষেত্রে প্রথমটিকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। অনুরূপভাবে তৃতীয়টির ওপর দ্বিতীয়টি এবং চতুর্থটির ওপর তৃতীয়টি অগ্রাধিকার পাবে। আমরা এখন এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করব।

www.pathagar.com

১. সুস্পষ্ট অর্থ (ইবারাহ আল-নস)

আগেই বলা হয়েছে যে, এটি হলো মূলপাঠের স্পষ্ট অর্থ, যা সুস্পষ্ট শব্দ ও বাক্য থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। সুস্পষ্ট অর্থ মূলপাঠের মূল বিষয় ও উদ্দেশ্য বুঝায়, বিশেষ করে যেসব ক্ষেত্রে মূলপাঠের একাধিক অর্থ থাকে এবং সুস্পষ্ট অর্থের অতিরিক্ত এক বা একাধিক সহায়ক বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত হওয়ার সুযোগ তাতে থাকতে পারে। সুস্পষ্ট ও প্রধান অর্থ বহন করায় 'ইবারাহ আল নসকে সব সময়ই মূলপাঠের গৌণ ও সহায়ক বিষয়ের চেয়ে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। এর দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা বহু বিবাহ সংক্রান্ত কুরআনের আয়াত উল্লেখ করতে পারি, এতে একাধিক অর্থ প্রকাশ পেয়েছে। আয়াতটিতে বলা হয়েছে, 'তোমরা যদি ইয়াতিমদের প্রতি অবিচার করাকে ভয় করো, তাহলে যেসব স্ত্রীলোক তোমাদের পছন্দ হয়, তার মধ্য থেকে দুই দুই, তিন তিন, চার চারজনকে বিয়ে করে নাও। কিন্তু তোমাদের মনে যদি আশঙ্কা জাগে যে, তোমরা তাদের সাথে ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে একজন স্ত্রীই গ্রহণ কর' (সুরা নিসা, ৪ : ৩)। এ আয়াতের অন্তত তিনটি বা চারটি পৃথক অর্থ দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমত, বিয়ের বৈধতা, 'ফানকিহা মাতাবা লাকুম মিন আল নিসা (যেসব স্ত্রীলোক তোমাদের পছন্দ হয় তাদের মধ্য থেকে বিয়ে কর) শব্দগুচ্ছের মাধ্যমে এ অর্থ অভিব্যক্ত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এর অর্থ হচ্ছে, বহু বিয়েকে সর্বোচ্চ চারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। তৃতীয়ত, বহু বিয়ের কারণে সুবিচার করতে না পারার আশঙ্কা থাকলে একজন স্ত্রীই গ্রহণ করতে হবে। চতুর্থত, ইয়াতিম মেয়েদের প্রতি অবশ্যই সদাচরণ করতে হবে। এ অর্থটি আয়াতটির প্রথমাংশে নির্দেশিত হয়েছে। এসব অর্থ আয়াতের প্রকৃত শব্দ ও বাক্য থেকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তবে প্রথম ও শেষ অর্থটি সহায়ক ও প্রাসঙ্গিক, অন্যদিকে দ্বিতীয় ও তৃতীয়টিতে আয়াতের সুস্পষ্ট বিষয় ও অর্থের প্রতিফলন ঘটেছে। আর তাই হলো, 'ইবারাহ আল নস। বহু বিয়েকে সর্বোচ্চ চারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হচ্ছে সুস্পষ্ট অর্থ যা এ আয়াতে অভিব্যক্ত সব নিহিত ও প্রাসঙ্গিক অর্থের ওপর নিরঙ্কুশ অগ্রাধিকার পাবে।[২]

শরিয়াহর অধিকাংশ নুসুস ইবারাহ আল নসের পদ্ধতিতে তাদের বিধিবিধান ব্যক্ত করেছে। এভাবে ফরজ নামাজ আদায়ের আদেশ, রমজান মাসে রোজা পালন, সুনির্দিষ্ট অপরাধের জন্য নির্ধারিত শাস্তির বিধান, মিরাসি সম্পত্তির সুনির্দিষ্ট অংশ বৈধ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন ইত্যাদি হচ্ছে 'ইবারাহ আল নস'- এর উদাহরণ। 'ইবারাহ আর নস'-এর ফল হচ্ছে, নিজ থেকে তা সুনির্দিষ্ট বিধান- হুকম কাতয়ী প্রকাশ করে এবং এজন্য কোনো দৃঢ়ভাবে সমর্থনকারী প্রমাণের দরকার নেই। কিন্তু আয়াতটি যদি সাধারণ বিষয় বুঝায় তাহলে তার নির্দিষ্টকরণের ব্যাপারে

www.pathagar.com

সন্দেহ হতে পারে। সে ক্ষেত্রে তা আইনের সুনির্দিষ্ট বিধানের প্রতি দিকনির্দেশ করে বরং কেবল অনুমানমূলক (যন্নী) দলিল হবে।[৩]

২. পরোক্ষ অর্থ (ইশারাহ আল নস)

পরোক্ষ অর্থ বিশিষ্ট হওয়ায় মূলপাঠটি হয়তো সুস্পষ্ট নয়, তথাপি তা যুক্তিপূর্ণ আনুষঙ্গিক অর্থ ব্যক্ত করে যা পাঠটিতে অন্তর্নিহিত শনাক্তকরণযোগ্য লক্ষণগুলোকে আরো গভীরভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নির্ণয় করা হয়। যেহেতু পরোক্ষ অর্থে মূলপাঠের মূল বিষয়ের প্রতিফলন ঘটে না এবং আবশ্যকীয় অনুমানের বাস্তব রূপায়ন প্রয়োজন হয়, তাই একে ইশারাহ আল নস বলা হয়। পরোক্ষ অর্থ মূলপাঠের শব্দাবলি থেকে সহজে শনাক্ত করা যেতে পারে, আবার গভীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ইজতিহাদের মাধ্যমেও তা অর্জিত হতে পারে। শিশু সন্তানদের লালন-পালন সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতে এর উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায় : 'প্রচলিত রীতি অনুযায়ী খোরপোষের দায়িত্ব হলো তার (পিতার)' (সুরা বাকারা, ২ : ২৩৩)। সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব যে পিতার, এ আয়াতের সুস্পষ্ট অর্থ থেকে সন্দেহাতীতভাবে স্থির হয়েছে। আয়াতের শব্দ প্রয়োগরীতি বিশেষ করে 'লাহু' (তার) সর্বনামের ব্যবহারের থেকে বুঝা গেছে যে, অন্য কেউ নয়, কেবলমাত্র পিতাই এ দায়দায়িত্ব বহন করবে। এতটুকু সহজে নির্ণয়যোগ্য এবং তা আয়াতের সুস্পষ্ট অর্থ গঠন করেছে। তবে ধরুন, শিশুটির বংশ মর্যাদা কেবলমাত্র পিতার থেকে স্বীকৃত হওয়া এবং পিতৃ পরিচয়ে তার পরিচিত হওয়ার বিষয় নির্ধারণ হচ্ছে যৌক্তিক ও আনুষঙ্গিক অর্থ যা আয়াতের শনাক্তযোগ্য লক্ষণসমূহ আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে অর্জন করা হয়েছে।[৪]

অনুরূপভাবে শরয়ী বিধান অনুযায়ী পিতা তার অতি প্রয়োজনের সময় সন্তানের অনুমতি ছাড়াই তার সম্পত্তি থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রহণ করতে পারবে, এটি হচ্ছে আরেকটি অর্থ, যা ইশারাহ আল নস থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াত ও রসুল সা.-এর একটি হাদিসের সমন্বয়ে এ অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। হাদিসটিতে বলা হয়েছে :

أنت ومالك لوالدك

তুমি ও তোমার মাল সম্পদের উভয়ের মালিক তোমার পিতা।[৫]

সুস্পষ্ট ও পরোক্ষ অর্থের সমন্বিত রূপের আরেকটি উদাহরণ দেখতে পাওয়া তালাকের অনুমতি সংক্রান্ত কুরআনের আয়াতে। মুমিনদের উদ্দেশ্য করে আয়াতটিতে বলা হয়েছে : 'তোমাদের নিজেদের স্ত্রীদের স্পর্শ করার কিংবা তাদের

www.pathagar.com

জন্য 'মোহরানা' নির্দিষ্ট করার আগেই তাদেরকে তালাক দিলে তাতে কোনো দোষ নেই' (সুরা বাকারা, ২ : ২৩৬)। এ আয়াতের সুস্পষ্ট অর্থ হলো, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত ও মোহরানা ধার্যের আগে তালাক দেয়া অনুমোদনযোগ্য। এখানে পরোক্ষ অর্থ হচ্ছে মোহরানা ধার্যের আগে বিয়ের চুক্তি সম্পাদন করা বৈধ। কারণ বিয়ে বজায় থাকলেই কেবল তালাকের ঘটনা ঘটতে পারে। আয়াতের আলোচ্য ঘটনায় যে বিষয়টি ইঙ্গিত করা হয়েছে তাহলো, এমনকি মোহরানা ধার্য করা ছাড়াই বিয়ে বৈধভাবে বজায় থাকতে পারে।[৬]

ইশারাহ আল নসের আরেকটি উদাহরণ হিসেবে আমরা পরামর্শ করা (শূরা) সংক্রান্ত কুরআনের আরেকটি আয়াত উদ্ধৃত করতে পারি। রসুল সা.-কে উদ্দেশ্য করে আয়াতটিতে বলা হয়েছে : 'অতএব তাদেরকে (সাহাবিগণকে) মাফ করে দাও। তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া কর এবং কাজকর্মের বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ কর' (সুরা আলে ইমরান, ৩ : ১৫৯)। এ আয়াতের ইশারাহ আল নসের শর্ত হচ্ছে যে সামাজিক বিষয় অবশ্যই শলাপরামর্শের মাধ্যমে সম্পাদন করতে হবে। আর এ আয়াতের পরোক্ষ অর্থ হচ্ছে, সমাজে একটি পরামর্শ সভা গঠন করা, যা আয়াতটির স্পষ্ট শর্ত অনুযায়ী পরামর্শের সুযোগ করে দেবে।

ইশারাহ আল নসের ফলাফল 'ইবারাহ আল নসের মতোই; তাহলো, উভয়ই অবশ্যকরণীয়ের ভিত্তি গঠন করে যদি এর বিপরীত কোন প্রমাণ পাওয়া না যায়। এর দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা কুরআনের আয়াত (সুরা বাকারা, ২ : ২৩৩) উল্লেখ করতে পারি। আয়াতটিতে সন্তান তার পিতৃপরিচয় গ্রহণ করবে এ বিধান বর্ণিত হয়েছে। এটি একটি সুনির্দিষ্ট বিধান (হুকম কাতয়ী) যা দাসত্বের ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত হয়েছে ইজমার দ্বারা, কারণ দাসীর সন্তান আবশ্যকীয়ভাবে তার পিতৃ মর্যাদা অর্জন করে না। এ উদাহরণে ইশারাহ আল নস-এর সুনির্দিষ্ট বিধান আরেকটি সুনির্দিষ্ট দলিল ইজমার দ্বারা দাসত্বের ক্ষেত্রে খারিজ হয়ে গেছে।[৭]

৩. অনুমিত অর্থ (দালালাহ আল নস)

এটি এমন অর্থ যা কোনো বিধিবিধান বা আইন সংক্রান্ত আয়াতের চেতনা ও যুক্তি থেকে পাওয়া যায়; যদিও এর শব্দ ও বাক্যতে তা নির্দেশিত হয় না। স্পষ্ট অর্থ ও পরোক্ষ অর্থ আয়াতের শব্দ ও লক্ষণে নির্দেশিত হয়, এদের মতো অনুমিত অর্থ আয়াতের শব্দ ও লক্ষণে নির্দেশিত হয় না। এর পরিবর্তে এটা কিয়াস ও কার্যকর কারণ (ইল্লাত) শনাক্তকরণের মাধ্যমে পাওয়া যায়। সুস্পষ্ট অর্থ ও অনুমানের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থের মধ্যে ইল্লাত অভিন্ন হয়ে থাকে। কতিপয় আলেম কেন দালালাহ আল নসকে যুক্তিপূর্ণ অনুমান যেমন কিয়াস জলির সাথে তুলনা করেছেন

www.pathagar.com

তার একটি ব্যাখ্যা এখান থেকে পাওয়া যেতে পারে। এর দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর দায়িত্ব সংক্রান্ত কুরআনের আয়াত উল্লেখ করতে পারি। আয়াতটিতে বিশেষ করে বলা হয়েছে, 'তোমরা তাদেরকে 'উহ্ পর্যন্ত বলবে না' (সুরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ২৩)। এতে পিতা-মাতাকে অতি নমনীয় শব্দেও তিরস্কার করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ নিষেধাজ্ঞার মূল কারণ হলো পিতা-মাতাকে শ্রদ্ধা করা এবং তাদেরকে কোনো কষ্ট না দেয়া। অবশ্য নিছক 'উহ্'র মতো ভর্ৎসনার শব্দ উচ্চারণ ছাড়াও অন্যান্য ধরনের কষ্ট দেয়ার যেসব বিষয় রয়েছে সে ক্ষেত্রেও এ নিষেধাজ্ঞার কার্যকর কারণ (ইল্লত) প্রযোজ্য হবে। এ আয়াতের অনুমিত অর্থে এ কথা বুঝানো হয়েছে যে, পিতা-মাতার সাথে সব ধরনের কষ্টদায়ক কথা বলা ও কাজ করা নিষিদ্ধ যদিও আলোচ্য আয়াতে সেগুলো সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়নি।[৮]

ইয়াতিমদের সম্পত্তি সংক্রান্ত কুরআনের আয়াতে এর আরেকটি উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়। এ আয়াতে বলা হয়েছে : 'যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতিমের মাল হরণ করে তারা মূলত আগুন দিয়েই নিজেদের পেট ভর্তি করে' (সুরা নিসা, ৪ : ১২)। এ আয়াতের সুস্পষ্ট অর্থ ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের জন্য নিজেদের হেফাজতে থাকা ইয়াতিমদের মাল-সম্পদ হরণ তাদের অভিভাবক ও নির্বাহকদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু অনুমিতির পন্থায় একই নিষেধাজ্ঞা অন্যান্য ধরনের অনিষ্ট ও অপব্যয়ের কারণের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করা যেতে পারে। যেমন- আর্থিক অব্যবস্থাপনা, এর সাথে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির বিষয় জড়িত নেই, তথাপি তাতে ইয়াতিমের মাল-সম্পদের লোকসান ও ধ্বংসের পথ প্রশস্ত হতে পারে। আয়াতটিতে মাল-সম্পদের ক্ষতির বিভিন্ন কারণ সম্পর্কে কোনো আভাস দেয়া না হলেও সেসবও একইভাবে নিষিদ্ধ। আগেই বলা হয়েছে যে, এ ধরনের অনুমিতি স্পষ্ট যুক্তিপূর্ণ অনুমানের (কিয়াস জলি) সমতুল্য হিসেবে পরিগণিত, যা আয়াতের বিধানের কার্যকর কারণ শনাক্তকরণের মাধ্যমে গঠিত হয় এবং মূল সিদ্ধান্ত শনাক্ত হবে যখন, তখন তা কিয়াস প্রক্রিয়ায় অনুরূপ সব ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হয়। উপরিউক্ত আয়াতের কার্যকর কারণ হলো, ইয়াতিমের মাল-সম্পদ রক্ষা করা এবং তার ধ্বংস বা লোকসানীর কারণ হতে পারে এমন সব ধরনের কাজ একই নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে।[৯]

৪. প্রয়োজনীয় অর্থ (ইকতিদা আলনস)

এটি এমন অর্থ যা সম্পর্কে খোদ আয়াত (মূলপাঠ) নীরব তথাপি যতটা যুক্তিপূর্ণ ততটা অর্থ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে, আর এটি করতে হবে আয়াতটির উদ্দেশ্য

www.pathagar.com

যথাযথ পূরণের লক্ষ্যে। এ ব্যাপারে উদাহরণ পবিত্র কুরআনের বিয়ে হারাম সংক্রান্ত আয়াতে দেখতে পাওয়া যায় : 'তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা ও বোনদেরকে...' (সুরা নিসা, ৪ : ২২)। এ আয়াতে 'বিয়ে' শব্দটি উল্লেখ করা হয়নি, তথাপি আয়াতের অর্থ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করার জন্য এর সাথে ঐ শব্দটি অবশ্য পড়তে হবে। আমরা অনুরূপভাবে কুরআনের অন্যত্র দেখতে পাই : 'তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু ও রক্ত' (আল মায়েদা, ৫ : ৩)। এতে 'তোমাদের জন্য খাওয়া' হারাম কথাটি উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু আয়াতের অর্থ যাতে সম্পূর্ণ হয় সেজন্য এর হারানো উপাদান সরবরাহ করা প্রয়োজন।

ইকতিদা আল নসের একটু ভিন্ন উদাহরণ হিসেবে আমরা নিম্নের হাদিসটি উদ্ধৃত করতে পারি :

لا صيام لمن لم يفرضه من الليل

> 'কেউ পূর্বের রাতে নিয়ত না করলে তার রোজা হবে না।' এখানে হারানো উপাদান হলো 'জায়েজ' বা 'অসম্পূর্ণ'। হানাফীগণ পরেরটি সমর্থন করেছেন অন্যদিকে শাফেয়ীগণ হাদিসটির অর্থের ক্ষেত্রে পূর্বেরটি গ্রহণ করেছেন। যে অর্থটিই গ্রহণ করা হোক না কেন তার ভিত্তিতেই নিয়তের মধ্যে পার্থক্য দেখা দেবে।[১০]

সংক্ষেপে বলা যায়, বিধিবিধান সংক্রান্ত আয়াতের বিশ্লেষণ মূলপাঠের চার প্রকার অর্থের যে কোনো একটি বা একাধিকের মাধ্যমে গ্রহণ করা যেতে পারে। এ অর্থ আয়াতের শব্দসমূহ, তার বিভিন্ন লক্ষণ, অনুমিতি অথবা হারানো উপাদান সংযোজনের মাধ্যমে ব্যক্ত হতে পারে। আইনগত বিধিবিধান বিনির্মাণের এ পদ্ধতি পৃথকভাবে অথবা পরস্পরের সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং এসবেরই লক্ষ্য হচ্ছে আয়াতের যথাযথ ও যৌক্তিক উপসংহারে উপনীত হওয়া।

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'ইবারাহ আল নস ও ইশারাহ আল নসের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে পূর্বেরটি পরেরটির ওপর অগ্রাধিকার পাবে ও বহাল থাকবে। খুনের শাস্তি সম্পর্কিত কুরআনের দু'টি আয়াতে এর দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়। এর একটিতে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, 'নরহত্যার ব্যাপারে কেসাসের বিধান আগে লিখে দেয়া হয়েছে' (সুরা বাকারা, ২ : ১৭৮)। কিন্তু কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি জেনে-বুঝে কোনো মুমিনকে হত্যা করবে, তার স্থান হচ্ছে জাহান্নাম, সে তাতে চিরদিন থাকবে' (সুরা নিসা, ৪ : ১৯৩)। প্রথম আয়াতের স্পষ্ট অর্থ হচ্ছে, 'হত্যাকারীর জন্য অবশ্যই কেসাসের শাস্তি প্রদান করতে হবে, আর দ্বিতীয় আয়াতের স্পষ্ট অর্থ হচ্ছে, হত্যাকারীর শাস্তি হচ্ছে চিরদিনের জন্য

www.pathagar.com

জাহান্নামবাস। দ্বিতীয় আয়াতের পরোক্ষ অর্থ হলো, হত্যাকারীর জন্য কেসাস কোনো অত্যাবশ্যকীয় শাস্তি নয় এবং এ আয়াতের স্পষ্ট অর্থ অনুযায়ী খুনির শাস্তি হবে পরকালে। দু'টি আয়াতের স্পষ্ট অর্থের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই বরং প্রথম আয়াতের স্পষ্ট অর্থ ও শাস্তির কোনটি সমুন্নত রাখা হবে, তা নিয়ে বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু যেহেতু প্রথম সিদ্ধান্তটি আয়াতের সুস্পষ্ট অর্থ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে এবং দ্বিতীয়টি পরোক্ষ অর্থ থেকে, তাই পূর্বেরটি পরেরটির ওপর বহাল থাকবে।[১১]

সুস্পষ্ট ও পরোক্ষ অর্থের মধ্যে বিরোধের আরেকটি উদাহরণ শহীদদের অত্যুচ্চ মর্যাদা সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতে দেখতে পাওয়া যায় : 'যারা খোদার পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে মৃত মনে করো না। প্রকৃতপক্ষে তারা জীবিত, তারা খোদার কাছ থেকে রিজিক পাচ্ছে' (সুরা আলে ইমরান, ৩ : ১৬৯)। আয়াতটির সুস্পষ্ট ঘোষণা হচ্ছে, শহীদরা জীবিত এবং কেউ তাদেরকে মৃত মনে করলে ভুল করবে। এ আয়াতের পরোক্ষ অর্থ হলো, শহীদদের জানাজা করার দরকার নেই, কারণ তাদেরকে জীবিত বলে মনে করা হয়। অবশ্য এ সিদ্ধান্ত কুরআনের আরেকটি আয়াতের সুস্পষ্ট অর্থের পরিপন্থী। যাতে সাধারণভাবে মৃতদের ব্যাপারে বলা হয়েছে : 'তাদের রহমতের জন্য দোয়া কর (সাল্লি আলাইহিম), কেননা তোমার দোয়া তাদের জন্য বড়ই সান্ত্বনার কারণ হবে (সুরা তাওবা, ৯ : ১০৩)। আয়াতটিতে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, প্রত্যেকের জন্য শহীদ বা অন্য কেউ হোক, দোয়া প্রয়োজন কারণ তারা আক্ষরিক ও আইনগত অর্থে মৃত এবং তাদের বৈধ উত্তরাধিকারীরা তাদের সম্পত্তির মিরাসি অধিকার লাভ করেছে ইত্যাদি। এটি হচ্ছে দ্বিতীয় আয়াতের স্পষ্ট অর্থ যা প্রথম আয়াতের পরোক্ষ অর্থের ওপর বহাল থাকবে।[১২]

পরোক্ষ অর্থ ও অনুমিত অর্থের মধ্যে বিরোধের উদাহরণ হিসেবে আমরা কুরআনের ভুলবশত হত্যার কাফফারা সংক্রান্ত আয়াত তুলে ধরতে পারি 'কেউ ভুলবশত কোনো মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করলে তাকে কাফফারা হিসেবে একজন মুসলিম দাসকে মুক্ত করে দিতে হবে' (সুরা নিসা, ৪ : ১৯২)। এ আয়াতের সুস্পষ্ট অর্থ হলো, ভুলবশত কোনো মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করা হলে কাফফারা হিসেবে অবশ্যই একজন মুসলিম দাসকে মুক্ত করে দিতে হবে। অনুমিতির দ্বারা আরো বুঝা যায় যে, অনিচ্ছাকৃত হত্যার জন্যও একজন মুসলিম দাসকে মুক্ত করে দেয়া প্রয়োজন। কাফফারার উদ্দেশ্য হচ্ছে, গোনাহের জন্য ক্ষতিপূরণ দান ও প্রায়শ্চিত্ত করা। যুক্তি দেখানো হয় যে, খুনি একজন পাপিষ্ঠ লোক এবং ভুলবশত যে হত্যা করে সে তার চেয়েও বড় গোনাহগার। এখানে অনুমিত অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে যে, হত্যাকারী

www.pathagar.com

একজন দোষী ব্যক্তি (Liable) এবং তার কাফফারা অন্ততপক্ষে ভুলবশত হত্যাকারীর অনুরূপ হওয়া প্রয়োজন। একই রুকুর পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে : 'যে কেউ জেনে-বুঝে কোনো মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করবে সে জাহান্নামী হবে এবং সে সেখানে চিরকাল থাকবে' (সুরা নিসা, ৪ : ৯৩)। এ আয়াতের পরোক্ষ অর্থ হচ্ছে ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে দাস মুক্তির প্রয়োজন নেই। আয়াতটির সুস্পষ্ট অর্থ থেকে জানা যাচ্ছে যে, ইচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তি হচ্ছে চিরকাল দোযখের আগুনে জ্বলা। এ থেকে এ বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে যে হত্যা হচ্ছে অমার্জনীয় গোনাহ এবং এ কারণে খুনের ঘটনায় কোনো কাফফারার সুযোগ নেই। এটি দ্বিতীয় আয়াতের পরোক্ষ অর্থ এবং এর সাথে প্রথম আয়াতের অনুমিত অর্থের মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছে। খুনির জন্য কাফফারার প্রয়োজন নেই এ পরোক্ষ অর্থ হত্যাকারীকে কাফফারা দিতে হবে সংক্রান্ত প্রথম আয়াতের অনুমিত অর্থের ওপর প্রাধান্য পাবে।[১৩]

অনুমিত অর্থের ওপর পরোক্ষ অর্থকে অগ্রাধিকার প্রদান সংক্রান্ত হানাফীগণের মতের সাথে একমত পোষণ করেন না শাফেয়ীগণ। শাফেয়ীদের মতে, পরোক্ষ অর্থের উপর অনুমিত অর্থ অগ্রাধিকার পাবে। এর কারণ অনুমিত অর্থে আয়াতের ভাষা ও যুক্তি উভয় নিহিত থাকে, কিন্তু পরোক্ষ অর্থে তা পাওয়া যায় না। তাই কোনো ইঙ্গিত বা লক্ষণ থেকে পরোক্ষ অর্থ গ্রহণ করা হয়, যা মৌলিকভাবে আয়াতের শব্দ ও যুক্তির চেয়ে দুর্বল আর যে কারণে অনুমিত অর্থ হচ্ছে অনেক ঘনিষ্ঠ অর্থ। তাই তাকে পরোক্ষ অর্থের ওপর অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। এ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে পূর্বোক্ত উদাহরণের ক্ষেত্রে শাফেয়ীগণ আয়াতের অনুমিত অর্থকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। অর্থাৎ খুনিকেও কাফফারা আদায় করতে হবে।[১৪]

বিচ্ছুরিত অর্থ (মাফহুন আল মুখালাফাহ) ও আল দালালাতের শাফেয়ী শ্রেণি বিভাগ

এখানে শুরুতে এ কথা বলা দরকার যে, মৌলিক নিয়ম হচ্ছে শরয়ী বিধিবিধান সংক্রান্ত আয়াতে কখনোই তার উল্টো অর্থ নিহিত থাকে না এবং যে কারণে কোনো আয়াতের বিচ্যুত অর্থ গ্রহণের লক্ষ্যে যে কোনো বিশ্লেষণ হবে কর্তৃত্বহীন ও অসমর্থনযোগ্য। যদি কোনো আইন সংক্রান্ত আয়াতের কোনো বিচ্যুত অর্থ আদৌ গ্রহণ করার যোগ্য হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে তাকে বৈধতা দেয়ার জন্য আরেকটি পৃথক আয়াতের প্রয়োজন হবে। কিন্তু একই ও অনুরূপ আয়াতের দু'টি ভিন্ন বিচ্যুত অর্থ গ্রহণের যে কোনো চেষ্টা হবে বিশ্লেষণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক ও মূল উদ্দেশ্যের বরখেলাফ। হানাফীগণ অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তারা মৌলিকভাবে মনে করেন যে, মাফহুন আল মুখালাফাহ বিশ্লেষণের কোনো বৈধ

www.pathagar.com

পদ্ধতি নয়।[১৫] অবশ্য কেবল শাফেয়ীগণই নয় হানাফীগণও বিভিন্ন বিধিনিষেধ মানার ভিত্তিতে মাফহুন আল মুখালাফাহকে সমর্থন করেছেন, এ ক্ষেত্রে উভয়ে কতিপয় শর্ত আরোপ করেছেন যা এ পদ্ধতির সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করতে অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

মাফহুন আল মুখালাফাহকে এমন অর্থ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা, যা আয়াতের শব্দসমূহ থেকে এমনভাবে গ্রহণ করা হয় যাতে তা তার সুস্পষ্ট অর্থ থেকে বিচ্যুত হয়।[১৬] এর উদাহরণ হলো, কুরআনে মানুষের অনুমোদনযোগ্য (ইবাহা) খাদ্যদ্রব্যের ব্যাপারে কিছু ব্যক্তিক্রম ছাড়া সাধারণ বিধানের ঘোষণা, নিম্নের আয়াতে যা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে : 'বল, আমার নিকট যে ওহি এসেছে তাতে এমন জিনিস পাইনি যা খাওয়া কারো পক্ষে হারাম, তবে তা যদি মৃত ও প্রবাহিত রক্ত (দামনি মাসফুহান) হয়। (আল আন'আম, ৬ : ১৪৫)। এ আয়াতের শেষাংশের আলোকে কি এ কথা বলা যায় যে, প্রবাহিত নয় এমন রক্ত (দাম গায়ের মাসফুহ) কি মানুষের জন্য খাওয়া হালাল? এ প্রশ্নের উত্তর হলো, না। অন্যথায় আয়াতটির বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন হবে যাতে যকৃত ও প্লিহার মতো অপ্রবাহিত রক্ত খাওয়ার অনুমোদন রয়েছে। এগুলো জমাটবদ্ধ রক্ত দিয়ে গঠিত। আলোচ্য আয়াত নয় বরং অন্য একটি হাদিসে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রসুল সা.-এর হাদিস অনুযায়ী যকৃত ও প্লিহা খাওয়া হালাল। হাদিসটিতে বলা হয়েছে :

أحلّت لنا ميتتان ودمان: الميتتان: الحوت

واجراد والدمان: الكبد والطحال

> আমাদের জন্য দুই ধরনের মৃত জন্তু ও দুই ধরনের রক্ত খাওয়া হালাল। এগুলো হলো, মাছ, পঙ্গপাল, যকৃত ও প্লিহা।[১৭]

আগেই বলেছি যে, শাফেয়ীগণ মাফহুন আল মুখালাফাহ সম্পর্কে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বিষয়টি তার সঠিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী বিবেচনা করার জন্য সার্বিকভাবে কুরআন-হাদিসের অর্থ গ্রহণের (আল দালালাত) ব্যাপারে শাফেয়ীদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা দরকার এবং এ সাধারণ আলোচনার ধারাবাহিকতায় আমরা মাফহুন আল মুখালাফাহর প্রতি বিশেষ নজর দেবো।

কুরআন-হাদিসের মূল অর্থকে শাফেয়ীগণ হানাফীগণের মতো চার ভাগে বিভক্ত করেননি। তারা প্রাথমিকভাবে আল দালালাহকে দু'টি প্রধান ভাগে বিভক্ত করেছেন। তাহলো, দালালাহ আল মানতুক (উচ্চারিত অর্থ) ও দালালাহ আল

www.pathagar.com

মহিফুম (অন্তর্নিহিত অর্থ)। উভয় ধরনের অর্থ আয়াত ও হাদিসের শব্দ ও বাক্য থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। পূর্বেরটি স্পষ্ট আয়াত থেকে এবং পরেরটি তার যৌক্তিক ও আইনগত চিন্তার পুনর্গঠনের মাধ্যমে পাওয়া গেছে। কুরআনের আয়াত থেকে দালালাহ্ আল মানতুকের একটি উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়। আয়াতটিতে বলা হয়েছে : অথচ আল্লাহ ব্যবসায়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন (সুরা বাকারা, ২ : ২৭৫)। আয়াতটিতে স্পষ্ট ভাষায় ব্যবসায় হালাল ও সুদ হারাম হওয়ার কথা বলা হয়েছে। দালালাহ্ আল মানতুককে আবার দু'টি উপভাগে বিভক্ত করা হয়েছে- তাহলো, দালালাহ মান ইকতিদা (আবশ্যিক অর্থ) ও দালালাহ আল-ইশরারাহ (পরোক্ষ অর্থ)। উভয় অর্থ আয়াতের শব্দসমূহ থেকে আভাসিত হয়েছে। অথবা এর প্রয়োজনীয় ও অবিচ্ছেদ্য অংশ গঠিত হয়েছে। এমনকি এ সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, আল দালালাতের শ্রেণি বিভাগের ব্যবহার হানাফী ও শাফেয়ী দৃষ্টির মধ্যে পার্থক্যের বিষয়টি মূলত বাহ্যিক।[১৮] আবু জাহ্রাহ অনেকটা তড়িঘড়ি করে মন্তব্য করেছেন যে, হানাফীগণের চার প্রকার আল দালালাতের সব ক'টিই কোনো না কোনোভাবে আয়াতের প্রকৃত শব্দ বা বাক্যতে দেখতে পাওয়া যায়। চার প্রকার অর্থের মধ্যে হয়তো প্রায়োগিক পার্থক্য রয়েছে; তৎসত্ত্বেও মৌলিকভাবে তাদের সবই আয়াতে দেখতে পাওয়া যায়। এভাবে আল দালালাত সম্পর্কিত হানাফীগণের চারটি বিভাজনের সব ক'টিকেই দালালাহ্ আল মানতিকের অধীনে শ্রেণি বিভাগ করা যেতে পারে।[১৯]

দালালাহ্ আল মাফহুন হচ্ছে অন্তর্নিহিত অর্থ যা আয়াতে আভাসিত হয় না বরং অনুমিতির মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। এটি অনেকাংশেই হানাফীগণের দালালাহ্ আল নসের অনুরূপ। কিন্তু শাফেয়ীগণ দালালাহ্ আল মাফহুন বলতে আরো বেশি কিছু বুঝিয়েছেন। তারা একে পুনরায় দু'টি উপরিভাগে বিভক্ত করেছেন। তাহলো, মাফহুন আল মুওয়াফাকাহ (সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থ) ও মাফহুন আল মুখালাফাহ (বিচ্ছুরিত অর্থ)। পূর্বেরটি হচ্ছে অন্তর্নিহিত অর্থ, হয়তো আয়াতটি এ ব্যাপারে নীরব তৎসত্ত্বেও তা এর ঘোষিত অর্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থ (মাফহুন আল মুওয়াফাকাহ) উচ্চারিত অর্থের (দালালাহ আল মানতুক) সমতুল্য অথবা তার চেয়ে উৎকৃষ্ট হতে পারে। এটি যদি পূর্বেরটির হয় তাহলে তাকে লাবন আল কিতাব (সমান্তরাল অর্থ) বলা হয় এবং যদি পরেরটি হয়-তাহলে তা ফাহওয়া আল কিতাব (উৎকৃষ্ট অর্থ) হিসেবে পরিচিত হয়। এর উদাহরণ কুরআনের সুরা আল নিসার আয়াতে (৪ : ১২) দেখতে পাওয়া যায় যাতে কেবলমাত্র ইয়াতিমের সম্পত্তি গ্রাস করাকে হারাম করা হয়েছে। এর সমান্তরাল অর্থ (লাবন আল কিতাব) হচ্ছে অন্যান্য অব্যবস্থাপনা ও অপচয়। কিন্তু কুরআনের যে আয়াতে 'উহ' শব্দ

www.pathagar.com

উচ্চরণ করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, পিতা-মাতার প্রতি এ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অবমাননাকর শব্দ উচ্চারণের বিষয় হচ্ছে আয়াতের উচ্চারিত অর্থের 'উৎকৃষ্ট অর্থের' উদাহরণ।[২০]

এ ধরনের সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থকে সকল মাজহাবের আলেমগণ (জাহিরিগণ বাদে) অনুমোদন করেছেন এবং তাদের মধ্যে মাফহুন আল মুত্তয়াফাকাহর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সাধারণ মতৈক্য রয়েছে। কিন্তু মাফহুন আল মুখালাফাহর ক্ষেত্রে এমনটি হয়নি-এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।[২১]

উপরেই বলা হয়েছে, মাফহুন আল মুখালাফাহ আয়াতের উচ্চারিত অর্থ (দালালাহ আল মুনতাক) থেকে বিচ্যুত হয়, যা এর সাথে হয় সামঞ্জস্যপূর্ণ অথবা অসামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে এবং মাফহুন আল মুখালাফাহ কেবলমাত্র সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে বৈধ ব্যাখ্যা হিসেবে তা গৃহীত হবে অন্যথায় তা নাকচ হয়ে যাবে। সামঞ্জস্যপূর্ণ বিচ্যুত অর্থের উদাহরণ হিসেবে আমরা একটি হাদিস উদ্ধৃত করতে পারি, যা এর অর্থ উচ্চারিত অর্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। হাদিসটিতে বলা হয়েছে :

إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث

> পানি কুল্লাতায়িন (প্রায় দুই ফুট) পর্যন্ত গভীর হলে তা আর অপরিচ্ছন্ন থাকবে না।[২২]

এভাবে দেখা যাচ্ছে যে, পানি উল্লিখিত পরিমাণ গভীর থাকলে দূষিত জিনিসপত্র পতিত হলে ওই পানি ওজুর জন্য পবিত্র বলে পরিগণিত হবে। এটি হচ্ছে হাদিসটির স্পষ্ট অর্থ। এভাবে এর মাফহুন মুখালাফাহ থেকে বুঝা যায় যে, এর চেয়ে কম গভীর পানিতে নোংরা বা অপবিত্র। এ ব্যাখ্যা তৃতীয়টির উচ্চারিত অর্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে করা হয়েছে।[২৩]

শাফেয়ীদের মতে, এভাবে মাফহুন মুখালাফাহর অর্থ গ্রহণ কেবলমাত্র কতিপয় শর্ত পূরণ সাপেক্ষে গ্রহণযোগ্য হতে পারে। শর্তগুলো হলো, প্রথমত, বিচ্যুত অর্থ উচ্চারিত অর্থের পরিসীমা অতিক্রম করতে পারবে না। এর উদাহরণ হলো, পিতা-মাতাকে 'উহ' বলা নিষিদ্ধ সংক্রান্ত কুরআনের আয়াত। কেউ আয়াতের এ বিচ্যুত অর্থ করতে পারবে না যে তাদেরকে (পিতা-মাতা) শারীরিকভাবে নির্যাতন চালানো অনুমোদনযোগ্য। দ্বিতীয়ত : আশঙ্কা বা অজ্ঞতার মতো কারণে প্রথমেই বিচ্যুত অর্থ পরিত্যাজ্য হবে না। এর উদাহরণ হলো, যদি কোনো ব্যক্তি তার কর্মচারীকে এ নির্দেশ দেয়, 'এসব জিনিসপত্র মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ কর।' কিন্তু এ কথা বলার মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে সে অভাবী লোকদেরকেই বুঝিয়েছে যে মুসলমান হোক বা না হোক এবং স্বজাতি মুসলিমদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির অভিযোগ আসার ভয়ে

www.pathagar.com

সে এ কথা বলেনি। এ ধরনের ভীতির অস্তিত্বের প্রমাণ না থাকলে কোনো বিচ্যুত অর্থ গ্রহণ করা হবে না। অনুরূপভাবে যদি কোনো লোক বলে, 'পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততিদের ভরণপোষণ বাধ্যতামূলক।' অথচ জানতো না যে, একই পরিবারের অন্য লোকরাও ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকারী। এ বিষয় অজ্ঞতার প্রমাণ পাওয়া না গেলে বিচ্যুত অর্থ গ্রহণের চেষ্টা করা উচিত হবে না। এর উদাহরণ হলো, একই পরিবারের অন্যদের ভরণপোষণ বাধ্যতামূলক নয়, এ কথা বলা। তৃতীয়ত: বিচ্যুত অর্থ কদাচিত বা বিরল কিছুর সমর্থনে প্রভাবাপন্ন প্রচলিত রীতির পরিপন্থী হতে পারবে না। এর একটি উদাহরণ হলো, কুরআনে বিয়ে নিষিদ্ধ করা সংক্রান্ত বিধান ঘোষণা করা হয়েছে : আর তোমাদের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছে : '... তোমাদের স্ত্রীদের মেয়েরা যাদের সাথে তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে-কিন্তু যদি (কেবল বিয়ে হয়ে থাকে) স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত না হয়ে থাকে, তাহলে (তাদের পরিবর্তে তাদের মেয়েদের সাথে বিয়ে করায়) তোমাদের কোনো দোষ হবে না' (সুরা নিসা, ৪ : ২৩)। এখানে স্পষ্টত যে কথা বলা হয়েছে তাহলো, সৎ পিতাদের জন্য তাদের অভিভাবকত্বের অধীন সৎ মেয়েদের বিয়ে করা হারাম। এভাবে এই আয়াতের মাফহুন আল মুখালাফাহ হিসেবে এ অর্থ গ্রহণ করা যায় যে, যেসব সৎ মেয়ে তাদের মায়েদের স্বামীর বাড়িতে বসবাস করে না তাদেরকে বিয়ে করা তাদের পিতার জন্য জায়েজ হতে পারে। কিন্তু এটি হবে এমন অর্থ যা কোনো বিরল পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল। এ ঘটনার সম্ভাব্য পরিস্থিতি ও প্রচলিত রেওয়াজ অনুসারে সৎ মেয়ে তার মা ও সৎ পিতার সঙ্গে অবস্থান করে থাকে আর সে কারণেই কুরআনে এ শর্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে এ কথা বুঝানো হয়নি যে, সৎ পিতার সাথে বাস করে না এমন সৎ মেয়েকে বিয়ে করা তার জন্য জায়েজ।[২৪] চতুর্থত, মূল আয়াত কোনো সুনির্দিষ্ট প্রশ্নের জবাব বা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রণীত হয়নি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, এক সময় রসুল সা.-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, মুক্তভাবে চরে বেড়ানো গবাদিপশুর জাকাত হবে কি না এবং তিনি হ্যাঁসূচক জবাব দিলেন। কিন্তু এর উত্তরে আস্তাবলে রেখে পালন করা পশুর জাকাত লাগবে না, এ কথা বুঝাবে না। মূলত একটি প্রশ্নের জবাবে উত্তরটি দেয়া হয় যাতে মুক্তভাবে চরে বেড়ানো পশুর কথা সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে এবং আস্তাবল বা খামারে পালিত পশুকে জাকাত দান থেকে অব্যাহতি প্রদানের উদ্দেশ্যে এ উত্তর দেয়া হয়নি। পঞ্চমত, বিচ্যুত অর্থ বাস্তব অবস্থা অথবা কাজের বিশেষ অবস্থা, আয়াতটিতে যার কথা চিন্তা করা হয়েছে তা জানা গেলে, তা থেকে বিচ্যুত হতে পারবে না। মুসলমান ও অমুসলমানের মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়ে কুরআনের আয়াত থেকে এর উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। আয়াতটিতে বলা হয়েছে :

www.pathagar.com

'মুমিনগণ যেন কখনো ইমানদার লোকদের পরিবর্তে কাফেরদের নিজেদের বন্ধু, পৃষ্ঠপোষক ও সহযাত্রীরূপে গ্রহণ না করে' (আল ইমরান, ৩ : ২৮)। এ আয়াতে দৃশ্যত কাফেরদের সাথে মুমিনদের বন্ধুত্ব হারাম বা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কিন্তু এটি এ আয়াতের উদ্দেশ্য নয়। বস্তুতপক্ষে এ আয়াতে একটি বিশেষ অবস্থার বিষয় প্রকাশ পেয়েছে, কয়েকজন মুমিন সম্পর্কে এ কথা বলা হয়েছে, যারা একান্তভাবে মুনাফিকদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছিল, তাদের জন্য এমনটি করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এর অর্থ এটি নয় যে, অমুসলমানদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। অন্যকথায় আয়াতটিতে বিশেষ পরিস্থিতির কথা চিন্তা করা হয়েছে, কোনো সাধারণ নীতিমালা প্রণীত হয়নি। অতএব, মাফহুম আল মুখালাফাহর অবলম্বনে একে প্রেক্ষাপটের বাইরে বিবেচনা করা উচিত হবে না।[২৫] ষষ্ঠত, বিচ্যুত অর্থ এমন সিদ্ধান্তের পথ প্রশস্ত করবে না, যা অন্য একটি আয়াতের বিধানের পরিপন্থী হবে। আমরা এর উদাহরণ হিসেবে কেসাস গ্রহণ সংক্রান্ত কুরআনের আয়াত উল্লেখ করতে পারি, যাতে বলা হয়েছে : নরহত্যার 'কেসাস'-এর আইন লিখে দেয়া হয়েছে, মুক্ত-স্বাধীন ব্যক্তি কাউকে হত্যা করলে তাকে হত্যা করেই 'কেসাস' নেওয়া হবে, ক্রীতদাস হত্যাকারী হলে, এ হত্যার বিনিময়ে তাকেই হত্যা করেই কেসাস নেয়া হবে, আর কোনো নারী এ অপরাধ করলে তাকে হত্যা করে 'কেসাস' নেয়া হবে' (সুরা বাকারা, ২ : ১৭৮)। এ আয়াতের মাফহুন আল মুখালাফাহ হিসেবে এ অর্থ গ্রহণ করা যাবে না যে, কোনো নারীকে হত্যার জন্য কোনো পুরুষকে 'কেসাস' হিসেবে হত্যা করা হবে না। এ ধরনের সিদ্ধান্তে কুরআনের আরেকটি আয়াতের সুস্পষ্ট বিধান লঙ্ঘিত হবে, তাতে বলা হয়েছে, 'ইচ্ছাকৃত সব নরহত্যার জন্য 'কেসাস'-এর বিধান প্রযোজ্য হবে।' আয়াতটিতে সম্ভাব্য ব্যাপকার্থে বলা হয়েছে, 'জানের বদলে জান' (সুরা মায়েদা, ৫ : ৪৫)।

মাফহুন আল মুখালাফাহর প্রতি হানাফীগণ যে প্রধান বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন তাহলো, অবতীর্ণ বাণী অর্থাৎ কুরআন-হাদিসের ক্ষেত্রে এটি কোনো অবস্থাতেই প্রয়োগ করা যাবে না। এভাবে বিশ্লেষণের একটি পদ্ধতি হিসেবে মাফহুন আল মুখালাফাহ কেবলমাত্র অবতীর্ণ নয় এমন বিষয়ের ক্ষেত্রে বৈধ হবে। এই প্রেক্ষাপটে কেবলমাত্র যৌক্তিক প্রমাণ ও মানবরচিত আইন সম্পর্কে মাফহুন আল মুখালাফাহ হুকুম ও ইজতিহাদের একটি বৈধ ভিত্তি প্রদান করতে পারে। হানাফীগণ তাদের এই মতের সমর্থনে যে প্রধান কারণটি উল্লেখ করেছেন তাহলো, খোদ কুরআন মাফহুন আল মুখালাফাহকে অনুৎসাহিত করেছে কারণ বিচ্যুত বিশ্লেষণ গ্রহণ করা হলে কুরআন-সুন্নাহ্‌র অনেক নির্দেশনার অর্থ বিকৃত হয়ে যাবে। দিনের ভিত্তিতে আল্লাহ তায়ালার মাস নির্ধারণ সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত থেকে এর উদাহরণ দেয়া যেতে

www.pathagar.com

পারে, এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তিনি বিশ্বজাহান সৃষ্টি করেছেন, যাতে বছরে বারটি মাস রয়েছে। এরপর এ আয়াতে আরো বলা হয়েছে, 'এর মধ্যে চারটি মাস পবিত্র, তাই এ মাসগুলোতে নির্যাতনমূলক (জুলুম) কাজ থেকে বিরত থাকো' (সুরা তাওবা, ৯ : ৩৬)।[২৬]

আয়াতের মাফহুম আল মুখালাফাহর পন্থায় এ অর্থ করা যেতে পারে যে, বছরের অবশিষ্ট মাসগুলোতে জুলুম-নির্যাতন চালানোর অনুমতি রয়েছে। এমনটি অর্থ করা হবে এ আয়াতের উদ্দেশ্যে সুস্পষ্ট ব্যত্যয়। কারণ জুলুম সব সময়ই নিষিদ্ধ কোন সময়ে তা করা হলো, তাতে কিছু যায়-আসে না।[২৭] অনুরূপভাবে একটি হাদিসে মুমিনদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে :

لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولايغسلن

فيه من الجنابة

> 'স্থায়ীভাবে স্থির পানিতে তোমাদের কেউ প্রস্রাব করতে পারবে না, তাতে জানাবাতের গোসলও করতে পারবে না।'[২৮]

মাফহুম আল মুখালাফাহর আলোকে বলা যায় যে, জানাবাতের গোসল ছাড়া অন্য সব গোসল এ পানিতে করার অনুমতি রয়েছে এবং প্রবাহমান পানিতে প্রস্রাব করার অনুমতি আছে। এ দু'টি অর্থের কোনোটিই সঠিক নয়। নির্দিষ্ট গভীরতার চেয়ে কম পানি রয়েছে এমন ছোট পুকুরে গোসলের অনুমতি নেই, তা হোক জানাবাত বা অন্য কোনো গোসল।

হানাফীরা আরো বলেছেন যে, যখন প্রয়োজন হয়েছে তখন খোদ কুরআনই তার নিজস্ব বিধানের বিচ্যুত অর্থ করেছে। সে ক্ষেত্রে বিচ্যুত অর্থ কুরআনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে এবং সে অনুযায়ী তা অবশ্যই কার্যকর করতে হবে। কুরআনের বিধিবিধানের বর্ণনাশৈলীতেই এ কথা প্রকাশ পেয়েছে যে, সাধারণভাবে মাফহুম আল মুখালাফাহ অবলম্বন বৈধ হলে কুরআনের আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বিধিবিধানের বিবরণ দেয়ার কোনো প্রয়োজন হতো না। অন্যকথায় কুরআন স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং বিচ্যুত বিশ্লেষণ অবলম্বনের মাধ্যমে এর থেকে বিধিবিধান সংগ্রহের বিষয় আমাদের ওপর ছেড়ে দেয়নি। মাসিক চলাকালে স্ত্রীর সাথে সহবাস পরিহারের জন্য স্বামীকে নির্দেশ প্রদান সংক্রান্ত কুরআনের আয়াতে এর উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়। আয়াতটি তাৎক্ষণিকভাবে তার বিচ্যুত অর্থকে সুস্পষ্ট করে দিয়েছে : 'স্ত্রীদের হতে দূরে থাক ও তাদের কাছে যেও না যতক্ষণ না তারা পবিত্র ও ময়লাবিমুক্ত না হয়। তারা যখন পবিত্র হবে তখন তাদের কাছে যাও...' (সুরা

www.pathagar.com

বাকারা, ২ : ২২২)। একই সুরাতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে এমন পিতার জন্য তার সৎ মেয়েদের বিয়ে করা হারাম করার বিধান বর্ণিত হয়েছে। এরপর আয়াতটিতে এর বিচ্যুত অর্থ সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে, 'যদি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত না হয়, তাহলে সৎ মেয়েদের বিয়ে করা দোষের কিছু নয়' (সুরা বাকারা, ২ : ২৩)। হানাফীগণ এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, মাফহুন আল মুখালাফাহ কুরআন ও সুন্নাহ্র নুসুসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। আমরা নুসুস থেকে শুধুমাত্র এমন বিধিবিধান সংগ্রহ করব যা তার সুস্পষ্ট অর্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।[২৯]

শাফেয়ী ও মালিকীগণ নুসুসের ক্ষেত্রে মাফহুন আল মুখালাফাহ প্রয়োগকে বৈধ বলে মনে করেছেন। তারা পূর্বোল্লেখিত শর্তাবলির সাথে আরো বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন যাতে এ বিশ্লেষণ পদ্ধতি সঠিক কি ধরনের ভাষাগত প্রকাশের ক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হবে তার নির্দেশনা পাওয়া যায়। এ উদ্দেশ্যে শাফেয়ীগণ মাফহুন আল মুখালাফাহকে চারটি উপভাগে বিভক্ত করেছেন। এ বিভাজনের মূল উদ্দেশ্য হলো, মাফহুন আল মুখালাফাহ এর ব্যবহার পুরোপুরি সঠিক হওয়া নিশ্চিত করা। এতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, নিম্নের যে কোনো একটি পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতিতে কোনো বিধান সংগ্রহ করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না :

১. মাফহু আল সিফাহ (গুণ প্রকাশ) : যখন কোনো আয়াতের বিধান কোনো বৈশিষ্ট্য বা গুণ থাকার ওপর নির্ভর করে তখন সেই গুণের উপস্থিতি বজায় থাকলেই কেবল আইনগত বিধানটি প্রতিষ্ঠিত হবে অন্যথায় বাতিল হয়ে যাবে। যাদেরকে বিয়ে করা হারাম সংক্রান্ত কুরআনের আয়াতের এ বিষয়টি দেখতে পাওয়া যায়, এর মধ্যে রয়েছে 'তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীদের' (সুরা নিসা, ৪ : ২৩)। উচ্চারিত অর্থ হচ্ছে, কোনো ব্যক্তির নিজের পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করা হারাম। এভাবে আয়াতটি 'তোমাদের ঔরসজাত' বাক্যাংশ দ্বারা পুত্রকে গুণান্বিত করা হয়েছে। মাফহুন আল মুখালাফাহর পন্থায় এ সিদ্ধান্ত করা যায় যে, কোনো দত্তক ছেলের স্ত্রী অথবা পালিত পুত্রের, যে পুত্র কোনো ব্যক্তির স্ত্রীর বুকের দুধ পান করেছে, তার স্ত্রীকে বিয়ে করা হারাম নয়।[৩০]

২. মাফহুন আল শর্ত (শর্ত প্রকাশ) : যখন কোনো আয়াতের বিধিবিধান শর্ত সাপেক্ষ হয়, তখন শর্তের উপস্থিতির ভিত্তিতে বিধান সংগৃহীত হয় অন্যথায় তা বাতিল হয়ে যায়। ইদ্দত পালনকালে তালাকপ্রাপ্ত নারীদের ভরণপোষণের অধিকার সংক্রান্ত কুরআনের আয়াতে এর দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়। আয়াতটিতে ঘোষণা করা হয়েছে : 'যদি তারা গর্ভবতী অবস্থায় থাকে

www.pathagar.com

তাহলে সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত তাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা কর' (সুরা তালাক, ৬৫ : ৬)। এখানে শর্ত হচ্ছে গর্ভাবস্থা, আর কেবল এ পরিস্থিতি বজায় থাকার শর্তে এ হুকুম কার্যকর হবে। এভাবে মাফহুন আল মুখালাফাহর পদ্ধতিকে যারা বৈধ বলে মনে করেন, অন্তত তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, চূড়ান্তভাবে তালাকপ্রাপ্ত যেসব মহিলা গর্ভবতী নয় তাদেরকে ভরণপোষণ প্রদানের প্রয়োজন নেই। অনুরূপভাবে কুরআনের আয়াতে রোজা পালনের ছাড় দেয়ার শর্তযুক্ত করা হয়েছে সেটি উল্লেখ করা যায়। আয়াতটিতে রোজা পালন করার ফরজ কর্তব্যের কথা বর্ণনার পর আরো বলা হয়েছে : 'যদি কেউ রোগাক্রান্ত থাকে অথবা সফরে থাকে, তাহলে তাকে পরে এ ফরজ রোজা আদায় করতে হবে' (সুরা বাকারা, ২ : ২০)। মাফহুন আল মুখালাফাহর পন্থা অনুযায়ী এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, কেউ রোগাক্রান্ত বা সফরে না থাকলে তার জন্য রোজা ভঙ্গ করার সুযোগ প্রযোজ্য হবে না, এটি হচ্ছে এ আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা।[৩১]

৩. মাফহুন আল গাইয়াহ (অর্থের মাত্রা) : যখন কোনো আয়াতই তার বিধিবিধান বাস্তবায়নের সীমা বা পরিসর নির্দেশ করে তখন ওই বিধান বর্ণিত সীমার মধ্য থেকেই সংগ্রহ করতে হবে এবং সীমা অতিক্রম করে গেলে তা বাতিল হয়ে যাবে। রোজা পালনের সময় সংক্রান্ত কুরআনের আয়াতে এর উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়- যাতে পানাহারের সর্বশেষ সময় নির্দেশ করা হয়েছে তারপর পানাহার গ্রহণ অবশ্য বন্ধ করতে হবে। 'আর রাতের সময় খানাপিনা কর যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের সামনে রাতের বুক হতে প্রভাতের শেষ আভা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে' (সুরা বাকারা, ২ : ১৮৭)। মাফহুন আল মুখালাফাহর পন্থার এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, দিগন্তে প্রভাতের শেষ আভা দেখা যাওয়ার পর আর খানাপিনা করা যাবে না।[৩২]

৪. মাফহুন আল আদাদ (বর্ণিত সংখ্যার অর্থ) : যখন কোনো আয়াতের বিধিবিধানের অর্থ সুনির্দিষ্ট সংখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়, তাই সংখ্যা যেভাবে বর্ণিত হয় সেভাবে তা অবশ্যই সতর্কতার সাথে মেনে চলতে হবে। এভাবে কুরআনে আয়াতে ব্যাভিচারের জন্য শাস্তির এক'শ ঘা দোররা মারার কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে (সুরা নূর, ২৪ : ২)। মাফহুন আল মুখালাফাহর পন্থায় এ আয়াতের অর্থ এমনভাবে বুঝাবে যাতে বর্ণিত দোররার সংখ্যা বেশি বা কম করার কোনো অনুমতি নেই।[৩৩]

www.pathagar.com

উপসংহারে এ কথা বলা যেতে পারে যে, নাজিলকৃত খোদায়ী উৎস থেকে আহকাম সংগ্রহের লক্ষ্যে উপরিউক্ত পদ্ধতিসমূহ সাধারণভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে। এগুলো ফকিহ ও মুজতাহিদকে দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে যাতে তারা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের বিষয় নির্বাচন করাতে পারেন। মুজতাহিদদের স্বাধীনতার ওপর এসব বিধিনিষেধ আরোপ করার স্পষ্ট কারণ হলো যাতে তারা অবশ্যই কুরআন-সুন্নাহ্‌র মূলপাঠের বিধিবিধান অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ব্যবহার করেন এবং সঠিক অর্থের সীমার বাইরে চলে না যান তা নিশ্চিত করা। তথাপি এ দিকনির্দেশনায় প্রধান গুরুত্ব দেয়া হয়েছে নুসুস অনুধাবন ও বাস্তবায়নে যৌক্তিক অনুসন্ধান ও গবেষণা চর্চায় উৎসাহ প্রদানের ওপর। এ অধ্যায়ে এবং পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের যে নিয়মনীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে তাতে বার বার যৌক্তিকতা কারণের চেয়ে খোদায়ী বিধানকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করার নির্দেশনাই প্রকাশ পেয়েছে। তথাপি খোদায়ী বিধানের পাশাপাশি একই সময়ে কারণের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকার বিষয়টিও বিমূর্তভাবে ফুটে উঠেছে। তাহলো, সংশ্লিষ্ট কারণ অবশ্যই খোদায়ী বিধানের পাশাপাশি ভূমিকা পালন করবে এবং এ দু'টি বিষয় প্রায়ই একত্রে ঘটে থাকে এবং একে অপরের পরিপূরক হয়ে থাকে।

টিকা

১. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ১৪৩, বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৪১৭।

২. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ১৪৫।

৩. বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৪১৯-৪২০; খুদারী, উসুল, পৃষ্ঠা ১১৯।

৪. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ১১১; খুদারী, উসুল, পৃষ্ঠা ১২০।

৫. তাবরিজী, মিশকাত, ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ১০০২, হাদিস নম্বর ৩৩৫৪; খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ১৪৬।

৬. বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৪২০।

৭. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৪২১।

৮. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ১১২।

৯. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ১৫০।

১০. ইবনে মাজাহ, সুনান, ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ৫৪২, হাদিস নম্বর ১৭০০; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৪২৪।

১১. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ১১৫; খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ১৫০।

১২. বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৪২৮।

১৩. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৪২৯; খাল্লাফ, ইলম, ১৫৩।

www.pathagar.com

১৪. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ১১৫।

১৫. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ১৫৩।

১৬. Hitu, Wajiz, পৃষ্ঠা ১২৪।

১৭. তাবরিজী, মিশকাত, ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ১২০৩, হাদিস নম্বর ৪১৩২; খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ১৫৪।

১৮. বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৪২৯; খুফারী, উসুল, পৃষ্ঠা ১২১-১২২; ঐরঃঁ, ডধলরু, পৃষ্ঠা ১২০।

১৯. আবু জাহরাহ উসুল, পৃষ্ঠা ১১৬।

২০. Hitu, Wajiz, পৃষ্ঠা ১২৪; সালিহ, মাবাহিথ, পৃষ্ঠা ৩০১।

২১. বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৪৩০।

২২. ইবনে মাজাহ, সুনান, ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ১৭২; হাদিস নম্বর ৫১৮।

২৩. যুহাইর, উসুল, ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ১১৪।

২৪. Hitu, Wajiz, পৃষ্ঠা ১২৫; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৪৩৩।

২৫. Hitu, Wajiz, পৃষ্ঠা ১২৬; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৪৩৪।

২৬. মাসগুলো হলো, মুহররম, জিলহজ, জিলকদ ও রজব।

২৭. বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৪৩৫।

২৮. তাবরিজী, মিশকাত, ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা, ১৪৮, হাদিস নম্বর ৪৭৪।

২৯. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ১১৭-১১৮।

৩০. বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৪৩২; সালিহ, মাবাহিথ, পৃষ্ঠা ৩০২; খুদারী, উসুল, পৃষ্ঠা ১২৩।

৩১. Hitu, Wajiz, পৃষ্ঠা ১২৭।

৩২. খুদারী, উসুল, পৃষ্ঠা ১২৩।

৩৩. খুদারী, উসুল, পৃষ্ঠা ১২৩।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

আদেশ ও নিষেধ

আদেশ-নিষেধ সম্পর্কিত কুরআনের (ও সুন্নাহ্‌র) ভাষা আধুনিক সংবিধিবদ্ধ আইনের থেকে ভিন্ন। কুরআনের বিধান কেবল আদেশ ও নিষেধ এবং তার পরিণামের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; উপরন্তু তাতে লোকদের বিবেকের প্রতি একটি আবেদন নিহিত থাকে। এ নৈতিক আবেদন উদ্বুদ্ধকরণ বা সতর্ককরণ, কোনো আদেশ পালন অথবা লঙ্ঘনের মাধ্যমে সম্ভাব্য কল্যাণ লাভ বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কথা উল্লেখ অথবা পরকালে কোনো পুরস্কার বা শাস্তির প্রতিশ্রুতি আকারে গঠিত হতে পারে। আধুনিক আইন সব সময়ই এ ধরনের আবেদন বিবর্জিত হয়ে থাকে কারণ তা সাধারণত আদেশসূচক আইনকানুন ও তার বাস্তব ফলাফলের বিবরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।[১]

কুরআনে বিভিন্নভাবে আদেশ-নিষেধ অভিব্যক্ত হয়েছে। কোনো আদেশ সাধারণত আদেশসূচক বাক্যে বর্ণিত হয় বলে প্রত্যাশা করা হয়। অনেক সময় এর বিকল্প হিসেবে সাধারণ অতীতকাল ব্যবহার হয়ে থাকে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, 'নরহত্যার জন্য 'কিসাস' এর বিধান লিখে দেয়া হয়েছে' এবং তোমাদের জন্য রোজা ফরজ করা হয়েছে (সুরা বাকারা, ২ : ১৭৮ ও ১৮৩)। উভয় অতীতকাল প্রকাশ করেছে। অনুরূপভাবে নির্দিষ্ট ধরনের আচরণ প্রসঙ্গে নৈতিক নিন্দার আকারে কুরআনের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। যেমন বসতবাড়ির পবিত্রতা বজায় রাখা, যাতে বলা হয়েছে : 'তোমাদের ঘরের পেছনের দিক থেকে প্রবেশ করার মধ্যে কোনো পুণ্য নেই' (সুরা বাকারা ২১ : ১৮৯)।[২] এ ছাড়া এক ধরনের আচরণের পরিণাম সম্পর্কে পরোক্ষভাবেও আদেশ-নিষেধ বর্ণিত হয়েছে, যেমন- পরকালে পুরস্কার বা শাস্তির প্রতিশ্রুতি। উদাহরণ হিসেবে কুরআনের (সুরা নিসার ৪ : ১৩-১৪) উত্তরাধিকারের বিধান সম্পর্কিত বিবরণ তুলে ধরতে পারি। এ আয়াতে যারা এ বিধান মেনে চলবে তাদেরকে পরকালে পুরস্কৃত করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে আর যারা তা লঙ্ঘন করবে তাদের শাস্তিড় দেয়ার হুঁশিয়ারি জানানো হয়েছে।

১. আদেশ

আদেশ (আমর) হচ্ছে কোনো উচ্চতর অবস্থান থেকে অধঃস্তন পর্যায়ের কারোর প্রতি কোনো কিছু করার মৌখিক দাবি বা নির্দেশ।[৩] এ দৃষ্টিতে সনির্বন্ধ প্রার্থনা (দোয়া) ও অনুরোধ (ইলতিমাস) উভয়ের সাথে আদেশের পার্থক্য রয়েছে।

www.pathagar.com

তাহলো- আদেশ হচ্ছে উচ্চতর অবস্থান থেকে অধঃস্তন পর্যায়ের কারোর কাছে কিছু দাবি করা; অন্যদিকে অনুরোধ হচ্ছে সমপর্যায়ের অথবা সমমর্যাদার কাছাকাছি লোকদের মধ্যে কোনো কিছু দাবি করা। তাই মৌখিক আদেশ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রকাশ করতে পারে, যেমন- অবশ্যকরণীয় আদেশ, নিছক সুপারিশ অথবা এমনকি অনুমোদনযোগ্যতা। এর মধ্যে আদেশের কোনটি মুখ্য অর্থ ও কোনটি গৌণ অর্থ সে ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। অনেকের মতে 'আমর' প্রকৃতিগত দিক থেকে সমার্থবোধক (মুশতারাক) যাতে এসব অর্থই নিহিত থাকে। অন্যরা বলেন, আমর এ ক্ষেত্রে ধারণার মাত্র দু'টি অর্থ গ্রহণ করে, তাহলো অবশ্যকরণীয় ও সুপারিশ কিন্তু অনুমোদনযোগ্যতা নয়। এ ছাড়া আরেক দল মনে করেন যে, আমর কোনো কিছু করার অনুমোদন বুঝিয়ে থাকে এবং এটি হলো আমরের সবচেয়ে ব্যাপকতর অর্থ যাতে উপরিউক্ত তিনটি ধারণার প্রত্যেকটিই এর অন্তর্ভুক্ত।[৪]

সংখ্যাগরিষ্ঠের মত হচ্ছে, যখন কোনো আদেশ নিজ থেকে নির্দিষ্ট অর্থ বুঝায় এমন কোনো যোগসূত্র বা পরিস্থিতি প্রকাশ না করে তখন তা কেবল অবশ্যকরণীয় বা জোরালো দাবি বোঝাবে। কিন্তু অন্যান্য ইঙ্গিত উপস্থিত থাকলে সে ক্ষেত্রে এর পরিবর্তন ঘটবে, যা কোনো আদেশ অনুমোদনযোগ্য, সুপারিশ অথবা বিভিন্ন ধরনের অন্য অর্থ বোঝাতে পারে। আমরা কুরআনে আদেশ সম্পর্কিত এ ধরনের আয়াত পাঠ করে থাকি, যেমন- 'কুলু ওয়াআশরাবু' (খাও ও পান কর), (সুরা আ'রাফ, ৭ : ৩১)। এতে যে আভাস দেয়া হয়েছে তা অনুমোদনযোগ্যতা (ইবাহা) ছাড়া কিছু নয়। মানুষের জীবন ধারণের জন্য খাওয়া ও পান করা জরুরি এবং এ সম্পর্কিত কোনো আদেশ যৌক্তিকভাবে কেবল অনুমোদনযোগ্য বুঝায়। অনুরূপ কুরআনের হজ সম্পন্ন করার পর শিকার করার অনুমোদন প্রদানের ঘোষণা করা হয়েছে সুরা আল মায়েদার (সুরা মায়েদা ৫ : ২) আয়াতে (ওয়া ইজা হালালতুম ফাস্তাদু) এবং জুময়ার নামাজ শেষ হওয়ার পর মুমিনদেরকে 'জমিনে ছড়িয়ে পড়তে বলা হয়েছে' 'ফা'ন তাশিরূ ফিল আরদা', (সুরা জুমা, ৬২ : ১০)। উভয় আয়াতের গঠন আদেশ সূচক, কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে এসব কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য হচ্ছে কেবল অনুমোদন দেয়া।[৫]

কোন আদেশ যদি অনুরূপভাবে সুপারিশ বুঝিয়ে থাকে, সে ক্ষেত্রে তাতে এমন সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত থাকতে হবে। এর উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায় ঋণের বিষয় লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত কুরআনের আয়াতে : 'যদি কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য তোমরা পরস্পর ঋণের লেনদেন কর, তাহলে তা লিখে রেখ' (সুরা বাকারা, ২ : ২৮২)। অবশ্য একই সুরার পরবর্তী আয়াত থেকে যে আভাস পাওয়া গেছে তাতে এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, এখানে আদেশ হচ্ছে কেবলমাত্র সুপারিশ

www.pathagar.com

(যনিদব)। আয়াতটিতে বলা হয়েছে : 'তোমাদের কেউ যদি কারোর ওপর নির্ভর করে তার সাথে কোনো কাজ করে, তাহলে যার ওপর নির্ভর করা হয়েছে তার কর্তব্য হবে আমানতের হক যথাযথভাবে আদায় করা।' এখানে নির্ভর করা (আমানাহ্) শব্দটির ব্যবহার এ বিষয়টি বুঝাচ্ছে যে, ঋণদাতা ঋণগ্রহীতাকে এমনকি কোনো লিখিত চুক্তি ছাড়াই বিশ্বাস করতে পারে।[৬] বাণিজ্যিক লেনদেন চুক্তির ক্ষেত্রে সাক্ষীর শর্তের ব্যাপারে অধিকাংশ আলেম একই মত পোষণ করেন। একই আয়াতে (সুরা বাকারা, ২ : ৮২) 'আয়াহ আল মুদাইয়ানাহ' বলে পরিচিত কুরআনের আরেকটি আদেশ দেখতে পাওয়া যায়। এতে বলা হয়েছে : 'ব্যবসায় সম্পর্কিত বিষয় ঠিক করার সময় অবশ্যই সাক্ষী রাখবে। লেখক ও সাক্ষীকে যেন কখনো কষ্ট না দেয়া হয়।' জাহেরি আলেমগণ এ বিধানের সুস্পষ্ট অর্থকে গ্রহণ করেছেন এবং প্রতিটি ঋণ বা যে কোনো ধরনের কিস্তি প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে চুক্তি করাকে অপরিহার্য শর্তে পরিণত করা হয়েছে এবং প্রতিটি বিক্রয়ের জন্য সাক্ষী রাখাকেও অপরিহার্য শর্তে পরিণত করা হয়েছে। চুক্তি পূরণ ও লোকদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি রোধে তাদের এ মত অধিকতর উপযোগী।[৭]

প্রেক্ষাপট ও পারিপার্শ্বিকতায় আভাস পাওয়া গেলে আমর হুমকি বুঝিয়ে থাকতে পারে। যেমন- কুরআনে বলা হয়েছে, কাফেরদের উদ্দেশ্যে 'যা ইচ্ছে তাই কর' ইমালু মাশিউতুম, (সুরা নূর, ২৪ : ৩৩) এবং শয়তানের উদ্দেশ্য 'তুই যাকে যাকে পারিস নিজের কথায় ভুলিয়ে নে', ওয়াস্তাফজিজ মান ইস্তাতা, (সুরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ৬৪)। আমার (আদেশ বা নির্দেশ) অনুরূ ভাবে নিন্দাও (ইহানাহ্) বোঝাতে পারে। যেমন-কুরআনে কাফেরদের উদ্দেশ্যে বিচারের দিন সম্পর্কে বলা হয়েছে : '(আজাবের) স্বাদ গ্রহণ কর তোমরা যারা শক্তিধর ও সম্মানিত ছিলে।' অনেক সময় আমর সনির্বন্ধ প্রার্থনা বা দোয়া বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, যেমন- 'হে প্রভু, তুমি আমাকে ক্ষমা কর।' এ ছাড়া প্রেক্ষাপট ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুযায়ী আরো কয়েকটি অর্থও হতে পারে।[৮] আগেই বলা হয়েছে যে, অধিকাংশ আলেম মনে করেন যে, আমর সাধারণত অবশ্য করণীয় বুঝায়, যদি অন্য কোনো অর্থ বুঝানোর কোনো ইঙ্গিত তাতে নিহিত না থাকে।

আল্লাহ্ তায়ালা অনেক সময় এমন আদেশও দিতে পারেন, যা এখন পর্যন্ত নিষিদ্ধ রয়েছে। অতঃপর প্রশ্ন আসে আমরের সে প্রকৃতি যার সূত্র ধরে আসে নিষেধাজ্ঞা (আল আমর বা'দ আল হাজার)। এটি কি একটি অবশ্যকরণীয় অথবা নিছক অনুমোদনযোগ্যতা বুঝায়? আলেমদের অধিকাংশের মত হচ্ছে- যে আমর নিষেধাজ্ঞা বুঝায় তার অর্থ অনুমোদনযোগ্য, অবশ্যকরণীয় নয়। ইতোমধ্যে উপরে বর্ণিত কুরআনের আয়াতে হজের আনুষ্ঠানিকতা পালনকালে নিষিদ্ধ থাকার পর

www.pathagar.com

শিকারের অনুমতি এবং জুমার নামাজের সময় নিষিদ্ধ থাকার পর ব্যবসাবাণিজ্য করার অনুমতি থেকে এ ধরনের আমরের দু'টি উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায় (সুরা মায়েদা, ৫ : ২ ও সুরা জুমা, ৬২ : ১০)।[৯] রসুল সা.-এর সুন্নাহ্তেও এ ধরনের আমরের উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়। একটি হাদিসে বলা হয়েছে :

كنت نهيتكم عن زيارة القبور , الا فزوروها فانّها

تذكّرالأخرة

> 'আমি তোমাদেরকে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা করবস্থানে যাও কেননা তা তোমাদেরকে পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে'।[১০]

এ প্রসঙ্গে পরে যে প্রশ্নটি আসে তাহলো, একটি আমর কি একবার পালন করা দরকার না বার বার পালন করতে হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠের মত হলো, কেবলমাত্র নির্দেশনার আলোকে এ বিষয়টি নির্ধারণ করা যেতে পারে, যাতে আদেশটি বার বার পালন করা দরকারের বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখিত থাকবে। অবশ্য এ ধরনের নির্দেশনা অনুপস্থিত থাকলে সে ক্ষেত্রে একবার পালনের দৃষ্টান্ত হচ্ছে আমরের সর্বনিম্ন শর্ত, আমর বার বার পালনের যেসব আভাস দেয়া হয় তার মধ্যে রয়েছে আমরটি শর্ত সাপেক্ষে জারি হয়েছে। কুরআনের বিধান থেকে এর উদাহরণ দেয়া যায় : 'তোমরা অপবিত্র অবস্থায় থাকলে গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করবে' (সুরা মায়েদা, ৫ : ৭)। আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে : ব্যাভিচারী পুরুষ ও ব্যাভিচারী নারী উভয়ের প্রত্যেকেই একশটি কোড়া মার যদি তারা ব্যাভিচার করে থাকে, (সুরা নূর, ২৪ : ২)। প্রথম আয়াতে জানাবাত-এর শর্তে গোসল করা প্রয়োজন, তাহলো যৌন মিলন। এভাবে প্রত্যেক যৌন মিলনের ঘটনার পর গোসল করা ফরজ। অনুরূপভাবে কোনো আমর কোনো কারণ বা গুণের ওপর নির্ভরশীল হলে ওই কারণ বা গুণ উপস্থিত হওয়া মাত্রই তা অবশ্যই পালন করতে হবে। উদাহরণ হিসেবে আমরা কুরআনের এ আদেশ উল্লেখ করতে পারি, 'সূর্য হেলে পড়লে নামাজ আদায় কর' (বনি ইসরাইল, ১৭ : ১৮) কারণ উপস্থিত হওয়ার প্রতিটি দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে বার বার আমর পালন প্রয়োজন, তাহলো নামাজে সুনির্দিষ্ট সময় হলেই নামাজ পড়তে হবে।[১১]

প্রশ্ন হচ্ছে, কোন্ আমর তাৎক্ষণিকভাবে অথবা বিলম্বে আদায় করতে হবে। আবারও এ কথা বলা যায় যে, একটি আদেশ নিছক দাবির সমন্বয়ে গঠিত হয়, তাই তা পালনের উপায় এর আভাস ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার আলোকে নির্ধারণ

www.pathagar.com

করতে হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ক খ কে বলল, 'এখন অমুক অমুক কাজ কর।' অথবা পালাক্রমিকভাবে তাকে নির্দেশ দিলো, 'আগামীকাল অমুক অমুক কাজ করবে।' উভয় নির্দেশই বৈধ এবং এদের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। অবশ্য কোনো আদেশ তাৎক্ষণিকভাবে বাস্তবায়ন প্রয়োজন হলে সে ক্ষেত্রে প্রথম নির্দেশে 'এখনই' শব্দটি ব্যবহার হবে 'বাহুল্য' ঠিক তেমনি দ্বিতীয় নির্দেশে 'আগামীকাল' হবে পরস্পরবিরোধী। যখন কোনো ব্যক্তি তৃষ্ণার্ত হয়ে অপর ব্যক্তিকে বলে, 'আমাকে একটু পানি দাও।' তখন এ আভাসের গুণে এ আদেশ তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর করা প্রয়োজন হবে, ঠিক তেমনি 'ভাড়া সংগ্রহ করো, বললে বোঝাবে মাসের মাঝামাঝি সময়ে এ নির্দেশ দেয়া হয়, কেননা ভাড়া মাসের শেষে সংগ্রহ করা হয়, তাই এ আদেশ অবশ্যই বিলম্বিত বাস্তবায়ন বুঝাবে।

এভাবে স্পষ্ট বোঝা গেল যে, আদেশদাতা কোনো বিশেষ সময় সুনির্দিষ্টভাবে বোঝাতে পারেন যে সময়ে আদেশটি অবশ্যই কার্যকর করতে হবে। সময়সীমা কঠোর হতে পারে অথবা নমনীয়ও হতে পারে। ফরজ নামাজের মতো সময়সীমা নমনীয় হলে সে ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের শেষ পর্যন্ত তা পালন বিলম্বিত করা যেতে পারে। কিন্তু যদি আমর কোনো সময়সীমা সুনির্দিষ্টভাবে প্রকাশ না করে, যেমন- কাফফারা আদায় করার নির্দেশ, তাহলে তা কারোর জীবদ্দশার প্রত্যাশিত সময়সীমার মধ্যে অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত বিলম্বিত হতে পারে। অবশ্য কোন ব্যক্তির মৃত্যু কখন আসবে সে ব্যাপারে অনিশ্চয়তার কারণে কাফফারা আগেভাগে আদায় করার সুপারিশ করা হয়েছে।[১২]

সর্বশেষ যে বিষয়টি আসছে তাহলো কোনো কিছু করার আদেশ কি তার বিরোধী কোনো বিষয়কে নিষিদ্ধ করা বুঝায়? সংখ্যাগরিষ্ঠের মত অনুযায়ী, কোনো কিছু করার আদেশ তার বিরোধী কিছু করাকে নিষিদ্ধ বুঝায়, আলোচ্য নিষেধাজ্ঞা কোনো একক কাজ বা একাধিক কাজের সমন্বয়ে গঠিত কি না সেটা এখানে কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়। এভাবে কোনো ব্যক্তিকে যখন যেতে বলা হয়, তখন তার দাঁড়িয়ে থাকা নিষিদ্ধ। অথবা যখন কোনো ব্যক্তিকে দাঁড়িয়ে থাকার আদেশ দেয়া হয়, তখন তার বসে থাকা, হেলান দেয়া বা শুয়ে থাকা ইত্যাদি নানা কাজ করা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। অবশ্য আল জুওয়াইনি, আল গাজ্জালী ও ইবনে আল হাজিবসহ কতিপয় আলেম এবং মুতাজিলারা মনে করেন যে, আদেশ তার বিরোধী কিছু করাকে নিষিদ্ধ করা বুঝায় না। হানাফী ও শাফেয়ী আলেমদের একটি গ্রুপ মনে করেন যে, জ্ঞাত বা অজ্ঞাত অনেক বিরোধী কাজের মধ্যে মাত্র একটি নিষিদ্ধ হবে সব নয়।[১৩] এ ধরনের মতপার্থক্যের কারণে স্পষ্ট প্রশ্ন উঠেছে, কেউ আমরের বিরোধী কোনো কাজ করলে তাকে কি অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে, হলে তার পরিমাণ কেমন হবে? এ ধরনের

www.pathagar.com

প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট উত্তর পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মানসিক অবস্থার আলোকে এবং প্রদত্ত আদেশের মাধ্যমে আইনদাতা/আদেশদাতা কী সাধারণ উদ্দেশ্য অর্জন করতে চান তা নিরূপণের মাধ্যমেই কেবল সঠিকভাবে পাওয়া যেতে পারে।

২. নিষেধ

নিষেধ (নাহি) হচ্ছে আদেশের বিপরীত। এর সংজ্ঞা হিসেবে বলা যায়, নিষেধ হচ্ছে এমন শব্দ বা শব্দ সমষ্টি যাতে উর্ধ্বতন অবস্থান থেকে অধঃস্তন অবস্থানের কারোর প্রতি কোনো কিছু করা থেকে বিরত থাকা বা পরিহার করার দাবি জানানো হয়।[১৪]

আরবি ভাষায় নিষেধের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রকাশ রীতি দেখা যায়। নেতিবাচক আদেশ শুরু হয় 'লা' দিয়ে। যেমন-'লা তাফা'ল' (করো না), অথবা কুরআনে নিষেধের বিষয় দেখতে পাওয়া যায় 'কোনো জীবন হত্যা করো না (লা তাকতুল)', আল্লাহ তায়ালা যাকে সম্মানীত করেছেন' (সুরা আন'আম, ৬ : ১৫১)। কোনো বিবৃতির (যুমলা খবরিয়াহ) মাধ্যমেও নিষেধ বর্ণিত হতে পারে, কুরআনের (সুরা বাকারায় ২ : ২২৩) এর উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায় : 'তোমাদের জন্য মৃত জন্তুর গোশত ও রক্ত হারাম করা হয়েছে।' অনেক সময় আদেশের আকারে তা বর্ণিত হতে পারে যাতে কোনো কিছু পরিহার করা প্রয়োজন বুঝায়। কুরআনের শব্দগুচ্ছ 'ওয়া জারুল বাইয়' (শুক্রবার জুমার নামাজের সময় বেচাকেনা বন্ধ রাখ, (সুরা জুমা, ৬২ : ১০০)। অথবা (সুরা হাজ, ২২ : ৩০) বলা হয়েছে, 'ওয়াজতানিবু কাওল আল জুর' (মিথ্যা বলা পরিহার কর)। এ ছাড়া কুরআনের আরো অনেক স্থানে নানা আকারে এ বিষয়টি দেখতে পাওয়া যায়।

আদেশের মতো নিষেধও বিভিন্ন ধরনের অর্থ ব্যক্ত করে থাকে। নাহির মূল বা প্রাথমিক অর্থ হচ্ছে অবৈধতা বা তাহরিম। এ ছাড়া নিছক তিরস্কার (কারাহাইয়াহ) বা দিকনির্দেশনা (ইরশাদ) বা কঠোর ভাষায় তিরস্কার (তাদিব) অথবা প্রার্থনা (দোয়া) বুঝাতেও নাহি ব্যবহৃত হয়। তিরস্কার বুঝায় এমন একটি উদাহরণ মুমিনদের উদ্দেশ্যে কুরআনের একটি আয়াতে দেখতে পাওয়া যায় : 'যে পাক জিনিসগুলো আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন সেগুলোকে হারাম বানিয়ে নিও না লা তু হাররামু, (সুরা মায়েদা ৫ : ৮৭)। নৈতিক হেদায়েতমূলক নাহির উদাহরণ কুরআনে দেখতে পাওয়া যায়। মুমিনদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন, 'এমন কোনো কথা জিজ্ঞাসা করো না, যা তোমাদের সামনে

www.pathagar.com

জাহির করে দিলে তোমাদের পক্ষে অসহ্য মনে হবে' (সুরা মায়েদা ৫ : ১০৪)। হুমকিও বুঝায় এমন নাহির উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায় অবাধ্য চাকরের প্রতি মনিবের এ বক্তব্য থেকে, 'আমি যা বলি, তা যদি অনুসরণ না কর তাহলে তুমি টের পাবে।' দোয়া বুঝায় এমন নাহির উদাহরণ কুরআনের সুরা বাকারায় (২ : ২৮৬) দেখতে পাওয়া যায়। আয়াতটিতে বলা হয়েছে : 'হে আমাদের খোদা, ভুলভ্রান্তিতে আমাদের যা কিছু ত্রুটি হয়-সেজন্য আমাদেরকে শাস্তি দিও না।' যেহেতু 'নাহি' বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে থাকে যে কারণে এর মধ্য থেকে কোনটি নাহির গৌণ বা রূপক অর্থের বিপরীতে মূল (হাকিকি) অর্থ হবে সে ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। অনেকে মনে করেন, অবৈধতা (তাহরিম) হলো নাহির মূল অর্থ। অন্যরা তিরস্কারকে (কারাইয়াহ) নাহির মূল অর্থ বলে বিবেচনা করেন। আরেকটি মতে, নাহি হচ্ছে এ দু'টি অর্থের সমার্থক। আলেমদের অধিকাংশের (জুমহুর) মতে, নাহির মূল অর্থ হলো তাহরিম, অন্য কোনো অর্থ বুঝানোর কোনো ইঙ্গিত না থাকলে এ অর্থই বহাল থাকবে বলে তারা মনে করেন। কুরআনে নাহির এ উদাহরণে দেখতে পাওয়া যায়। যাতে 'লা তাকতুল' শব্দগুচ্ছের মূল অর্থ বহাল রাখা হয়েছে। আয়াতটিতে বলা হয়েছে, 'কোনো প্রাণ, আল্লাহ যাকে সম্মানিত করেছেন তা হত্যা করবে না।' এ আয়াতের মূল অর্থ 'লা তাকতুলু' থেকে সরে যাওয়ার কোনো ইঙ্গিত দেখতে পাওয়া যায়নি, তাই এ অর্থই বহাল থাকবে। নাহির আলঙ্কারিক অর্থ গ্রহণের পক্ষে যুক্তি থাকলে তার মূল অর্থ পরিত্যাগ করা যেতে পারে। তাই 'লা তু'য়াখিযনা (আমাদেরকে পাকড়াও করো না) দোয়া বুঝানো হয়েছে, কারণ এখানে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে আবেদন জানানো হয়েছে এবং অধঃস্তনের পক্ষ থেকে ঊর্ধ্বতনের অবস্থানের কাছে আবেদনের আভাস পাওয়া গেছে, তাই এ প্রেক্ষাপটে নাহির সঠিক অর্থ হবে প্রার্থনা বা দোয়া।[১৫]

৩. আইনগত আদেশের মূল্য

নিষেধের উদ্দেশ্য ব্যাভিচারের (জিনা) মতো কাজ রোধ করা হতে পারে অথবা এমন কথা উচ্চারণ রোধ করা যাতে প্রস্তাব দান ও গ্রহণের মাধ্যমে মৃত জন্তুর গোশত অথবা স্বাধীন মানুষ বিক্রির অর্থ প্রকাশ করে। উভয় ক্ষেত্রে এ নিষেধাজ্ঞা কোনো ধরনের অধিকার বা আইনগত পরিণতির সৃষ্টি করেনি। তাই জিনার মাধ্যমে জন্ম নেয়া সন্তানের পিতৃত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না, তবে অপরাধী ব্যক্তি শাস্তিযোগ্য হবে। অনুরূপভাবে মরা জন্তু বিক্রির ফলে কোনো চুক্তি সম্পাদিত হয় না এবং তাতে কোনো মালিকানা সত্ত্বের অধিকার অর্জন প্রমাণিত হয় না।

www.pathagar.com

কোনো নিষেধের উদ্দেশ্য যদি কোনো কাজ হয় এবং এতে কাজটির নির্যাসের পরিবর্তে বাহ্যত কোনো গুণ আরোপ করা নিষিদ্ধ হয়, যেমন- 'ঈদের দিন রোজা পালন করা, শাফেয়ীদের মতে, এটি অকার্যকর (বাতিল) তবে হানাফীদের মতে, অনিয়ম (ফাসিদ)। অন্য কথায় শাফেয়ীদের মতে, এ কাজ কোনো আইনগত ফল তৈরি করতে পারে না, অন্যদিকে হানাফীদের মতে, আইনগত পরিণাম সৃষ্টি করে যদিও তা মৌলিকভাবে গোনাহের কাজ। হানাফীগণ এ ধরনের কাজকে ত্রুটিপূর্ণ বলে বিবেচনা করেন এবং বাতিল (ফাসখ) ঘোষণার মাধ্যমে তা অবশ্যই বিলুপ্ত করা হবে অথবা সম্ভব হলে তা অবশ্যই সংশোধন করতে হবে। যদি নিষেধ ক্রয়চুক্তি সম্পাদন মতো শব্দের সমন্বয়ে গঠিত হয় এবং তাতে সুদের মতো বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাহলে শাফেয়ীদের মতে তা বাতিল তবে হানাফীদের মতে তা হবে ফাসিদ, এর অর্থ হলো একে হয় বাতিল করা হবে অথবা এতটা সংশোধন করা হবে যাতে তা সুদের বিষয় থেকে মুক্ত হয়।

অবশ্য ইবাদত-বন্দেগীর বিষয়টি আলাদা যার উদ্দেশ্য হচ্ছে খোদার সন্তুষ্টি লাভ। এ ক্ষেত্রে ফাসিদ বাতিলের সমার্থক। তাই ঈদের দিনে রোজা পালন করে কোনো ফায়দা অর্জন করা যাবে না, না তাতে মুকাল্লাফের কাজা রোজা আদায় হবে।

কিন্তু যদি বাহ্যিক কারণে নিষেধ হয়, যেমন- জুমার নামাজের সময় ব্যবসায়ের চুক্তি সম্পাদিত হয় অথবা অধিকৃত ভূখণ্ডে (আল আরদ মাকসুবাহ) যখন নামাজ আদায় করা হয় এ ক্ষেত্রে আলেমদের সাধারণ মতৈক্য রয়েছে, তাহলো নিষিদ্ধ বিধানের সব আইনগত পরিণতি অনুসৃত হবে তবে অপরাধকারী গোনাহগার হবে। এভাবে বিক্রির মাধ্যমে মালিকানা স্বত্ব অর্জিত হবে এবং ন্যায় ও বৈধ হবে এবং উপরোল্লিখিত নামাজও বৈধ তাই উক্ত নামাজের জন্য কাজা আদায়ের দরকার হবে না।[১৬] আহকাম সংক্রান্ত পৃথক অধ্যায়ে বাতিল ও ফাসিদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, নিষেধের বিষয় তাৎক্ষণিক ও পুনঃপুনঃ পালন প্রয়োজন কি না- এ ব্যাপরে আলেমদের সর্বসম্মত সাধারণ অভিমত হচ্ছে এটি করা দরকার এবং একমাত্র এ পন্থায়ই নিষেধ পালন করা যেতে পারে। যদি নিষেধের উদ্দেশ্য সব সময় পরিহার করা না যায় তাহলে মৌলিকভাবে তা পালন করা হয় না। তাই নিষিদ্ধ কাজ নিষিদ্ধ হওয়ার মুহূর্ত এবং যখনই তা প্রয়োজন হবে তখন থেকেই পরিহার করা প্রয়োজন। যেসব নিষেধ কোনোভাবে নিষিদ্ধ করা হয়নি সেসব ক্ষেত্রে এমনটি হবে, যেমন- কুরআনে ইয়াতিমের সম্পত্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে: 'তোমরা ইয়াতিমের মাল-সম্পদের কাছেও যাবে না (লা তাকরাবু) অবশ্য এমন নিয়ম বা

www.pathagar.com

পন্থায় যা সবচেয়ে ভালো' (সুরা আন'আম, ৬ : ১৫২)। অবশ্য কোনো নিষেধকে শর্ত সাপেক্ষ করা হলে তার তাৎক্ষণিকভাবে পালনের বিষয়টি নাকচ হয়ে যায় এবং তা ওই শর্তের উদ্দেশ্য অনুযায়ী পালিত হতে হবে। কুরআনে (সুরা মুমতাহিনা, ৬০ : ১০) এর একটি উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়। এতে মুমিনদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, 'ইমানদার মহিলারা যখন হিজরত করে তোমাদের কাছে আসবে তখন তাদের (দীনদার হওয়ার বিষয়টি) যাচাই-বাছাই করে নাও, আর তাদের ইমানের প্রকৃত অবস্থা আল্লাহই ভালো জানেন।' তোমরা যদি নিঃসন্দেহে জানতে পার যে তারা মুমিন, তাহলে তাদেরকে কাফেরদের কাছে ফিরিয়ে দিও না।' এ আয়াতে (তাদেরকে ফিরিয়ে দিও না) নিষেধের সাথে শর্ত দেয়া হয়েছে যে, তারা যে মুমিন সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে এবং তা না হওয়া পর্যন্ত এ নিষেধাজ্ঞা স্থগিত থাকবে।[১৭] আদেশ ও নিষেধের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আদেশের উদ্দেশ্য হলো কোনোকিছু সৃষ্টি করা অথবা কোনো কিছুর অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং বাস্তবায়নের মাত্র একটি দৃষ্টান্ত দিয়েই তা সম্পাদন করা যায়। মৌলিকভাবে তা বার বার করার প্রয়োজন নেই। অন্যদিকে নিষেধের লক্ষ্য হচ্ছে কোনো কিছুর অনুপস্থিতি এবং সব সময় তা অনুপস্থিত না থাকলে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। তাই একবার মাত্র অনুপস্থিতির দৃষ্টান্ত নিষেধের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য যথেষ্ট নয়।[১৮]

আগেই বলা হয়েছে যে, আদেশ যদি নিষেধের স্থলাভিষিক্ত হয় তা শুধুমাত্র অনুমোদনযোগ্যতা বুঝায়। নিষেধের সাথে এ বিষয়টিরও তফাৎ রয়েছে : যখনই কোনো নিষেধ আদেশের স্থলাভিষিক্ত হয় তখন তা নিছক অনুমোদনযোগ্যতা বুঝায় না, অবৈধতা বা তাহরিম বুঝায়।[১৯]

কুরআন অথবা সুন্নাহ্র যেখানেই আদেশ-নিষেধ বিদ্যমান হোক না কেন, তা দুই প্রকারে হয়ে থাকে, তাহলো প্রকাশ্য (শারিহ) ও অপ্রকাশ্য (গায়ের শারিহ)। প্রকাশ্য আদেশ ও নিষেধগুলো অবশ্যই পালন করতে হবে। বিশেষ পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং তাতে কোনো যৌক্তিক বিষয় রয়েছে কি নেই সেটা বিবেচনা না করে পুরোপুরিভাবে মেনে চলা প্রয়োজন। কারণ ইবাদত-বন্দেগীর মূলকথা হলো নিঃশর্ত আনুগত্য- কোনো আদেশ-নিষেধ নিঃশর্ত প্রতিপালন যৌক্তিকতা বা অন্য কোনো কিছুর ওপর তা নির্ভরশীল নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, কেউ কি আদেশ-নিষেধ প্রতিপালনে আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করবে অথবা তা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় যৌক্তিক দিকগুলো ও মাসলাহার একটি ভূমিকা পালনের বিষয় বিবেচনার সুযোগ দেয়া হবে। হাদিস থেকে এর উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। হাদিসটিতে বলা হয়েছে, গবাদিপশুর মালিককে 'প্রতি চল্লিশটি মেষের একটিকে' অবশ্যই জাকাত হিসেবে দিতে হবে।[২০]

www.pathagar.com

এ হাদিসের বিধান কি আক্ষরিক অর্থে পালন করা হবে না কি আমরা এ কথাও বলতে পারি যে, এক বা একাধিক মেষের মূল্যের সমতুল্য অর্থও জাকাত হিসেবে দেয়া যেতে পারে। অনুরূপভাবে কুরআনে শুক্রবার জুমার নামাজের জামায়াতে শামিল হতে মুসলমানদের নির্দেশ দান করে বলা হয়েছে : 'আল্লাহ তায়ালার স্মরণের দিকে দৌড়াও এবং কেনাবেচা পরিত্যাগ কর' (সুরা জুমা ৬২ : ৯)। এ স্থলে কি আয়াতের 'দৌড়াও কে (ফামাও)-এর আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা হবে নাকি জুমার নামাজে যোগদানের জন্য জোর তাগিদ দান অর্থে গ্রহণ করা হবে? এ আয়াতের দ্বিতীয় অংশের ক্ষেত্রেও একই প্রশ্ন উঠতে পারে, যাতে 'মুসলমানদেরকে বেচাকেনা পরিত্যাগ' (ওয়াজারুলবায়ু') করতে আদেশ দেয়া হয়েছে। এর অর্থ সুনির্দিষ্ট সময়ে অনুষ্ঠিত বেচাকেনা কি প্রকৃতপক্ষে অবৈধ ও অকার্যকর হবে অথবা আবার এ আদেশকে সেভাবে গ্রহণ করতে হবে যাতে তা সুচারুরূপে পালনের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা হিসেবে গ্রহণ করা হবে? কোনো আদেশ বা নিষেধের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার মূল উদ্দেশ্য অথবা আয়াতের আক্ষরিক দাবির মধ্যে কোনটি অনুসরণ করা উচিত? কুরআনের আদেশ-নিষেধের সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধির জন্য অনেক প্রশ্নের মধ্যে এখানে এগুলি উত্থাপন করা হয়েছে।[২১]

অপ্রকাশ্য উদাহরণ আবার দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথমটিতে কুরআনের কোনো বিধানকে অপ্রকাশ্য অর্থে ব্যক্ত করা হয় কিন্তু তা হাদিসের সুস্পষ্ট অর্থ দ্বারা সমর্থিত হয়, এর ফলে তা প্রকাশ্য বিধানে পরিণত হয়।[২২] দ্বিতীয় ধরনের অপ্রকাশ্য বিধান কুরআনে আদেশ বা নিষেধের আকারে ব্যক্ত হয় না বরং কোনো নির্দিষ্ট আচরণের প্রশংসা বা নিন্দার আকারে অভিব্যক্ত হয়। এ ধরনের বিধানের সুনির্দিষ্ট অর্থ সব সময় নিরূপণ সম্ভব হয় না। কারণ তাতে কোনো আদেশ বা নিষেধ অথবা নিছক হুঁশিয়ারি কিংবা সুপারিশ বুঝানো হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে আমরা কুরআনের এ আয়াতটি তুলে ধরতে পারি যাতে বলা হয়েছে : 'আল্লাহ তায়ালা সীমা লঙ্ঘনকারীদের (আল মুছরিফীন) পছন্দ করেন না' (সুরা আ'রাফ, ৭ : ৩১)। কুরআনের এ আয়াতে অসংযত আচরণের সুনির্দিষ্ট আইনগত ও ধর্মীয় অপরাধের কোনো আভাস দেয়া হয়নি এবং এ থেকে অসংযত আচরণ নিষিদ্ধ অথবা নিছক অনুমোদিত তা নির্ণয় করা সম্ভব হবে না।[২৩]

আদেশ ও নিষেধ সম্পর্কে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে আরেকটি প্রশ্নের দিকেও নজর দেয়া গুরুত্বপূর্ণ- তা হলো কোনো আদেশ পালন বা নিষেধ পরিহারের উপায়ের সাথে সম্পর্কিত কি না। প্রশ্ন হচ্ছে, এ নিয়ন্ত্রণকারী বিধির দ্বারা উপায়ও পরিচালিত হওয়া উচিত কি না। সংক্ষেপে বলা যায়, এ প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ সূচক। কোনো আদেশ

www.pathagar.com

পালন বা নিষেধ পরিহারের জন্য প্রথমত, যেসব বিধিবিধান রয়েছে, পালনের পদ্ধতির ক্ষেত্রেও তা সমভাবে প্রযোজ্য হবে।[২৪]

কুরআন-সুন্নাহ্ থেকে আইন সংগ্রহকারী মুজতাহিদকে অবশ্যই কুরআনের ভাষা সম্পর্কে সঠিকভাবে পরিচিত থাকতে হবে এবং অবশ্যই এ কথা জানতে হবে যে, আহকাম কেবল আদেশ-নিষেধের মাধ্যমেই প্রকাশ করা হয়নি উপরন্তু প্রশংসা ও পুরস্কারের ওয়াদার মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত কথার ফলও আদেশের সমতুল্য। অনুরূপভাবে কোনো আচরণ সম্পর্কে নিছক অভিযোগ পরকালের আজাবের হুমকি, অথবা কঠিন পরিণতির বিষয় উল্লেখও নিষেধের সমতুল্য হতে পারে।[২৫]

কুরআনের কোনো আদেশ অবশ্যকরণীয় (ওয়াজিব), সুপারিশ (নাদব) অথবা নিছক অনুমোদনযোগ্য, (ইবাহা) বুঝায় কি না তা শরিয়াহর সাধারণ উদ্দেশ্য এবং কুরআনের শব্দের অর্থের আলোকে অবশ্যই নির্ণয় করতে হবে। আদেশের মূল্য (হুকম) নির্ণয়ের জন্য কেবল শব্দের বৈয়াকরণিক কাঠামোর প্রতি নজর দিলেই চলবে না উপরন্তু আইনের সাধারণ উদ্দেশ্যের প্রতিও দৃষ্টিপাত করতে হবে। নিষেধসূচক আয়াতের ক্ষেত্রেও এ বিষয়টি পুরোপুরি সঠিক। কোনো নিষেধ প্রকৃতপক্ষে তাহরিম অথবা নিছক তিরস্কার (কারাহা) বুঝায় কি না নুসুসের শব্দ থেকে সব সময় তা সঠিকভাবে সহজে উপলব্ধি করা যায় না। নুসুসের একটি অংশ মাত্র তার ভাষার স্পষ্টতার কারণে সুনির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে থাকে। শাতিবীর হিসাব মতে, কুরআনের নুসুসের বড় অংশের মূল্য যে ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে তার আলোকেই নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তাই মুজতাহিদকে নুসুসের সঠিক মূল্য এবং তাতে নিহিত আদেশ বা নিষেধ নির্ধারণে সক্ষম হওয়ার জন্য অবশ্যই শরিয়াহর উদ্দেশ্যের সাধারণ মূল নীতিমালা সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত থাকতে হবে।

www.pathagar.com

টিকা

১. তুলনীয়, শালতুত, ইসলাম, পৃষ্ঠা ৪৯৯।

২. এটি হলো বসতবাড়ির গোপনীয়তা সম্পর্কে নাজিলকৃত কুরআনের কয়েকটি আয়াতের একটি।

৩. বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৩৬০।

৪. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৩৬১; শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ৯১।

৫. তুলনীয়, শাতিবী, মুওয়াফাকাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৮।

৬. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ১১১।

৭. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ৭৫; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৩১৬২।

৮. বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৩৬১-৩৬২; Hitu, Wajiz, পৃষ্ঠা ১৩৪-১৩৮।

৯. বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৩৬৩; Hitu, Wajiz, পৃষ্ঠা ১৪১।

১০. গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৩; আমিদী, ইহকাম, ৪ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১১; তাবরিজী, মিশকাত, ১ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫৪; হাদিস নম্বর ১৭৬৯।

১১. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ৯৮-৯৯; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৩৬৪।

১২. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ৯৯-১০০; বাদরান উসুল, পৃষ্ঠা ৩৬৫-৩৬৬।

১৩. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ১০১-১০২।

১৪. বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৩৬৬।

১৫. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ১০৯-১১০; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৩৬৬-৩৬৮; Hitu, Wajiz, পৃষ্ঠা ১৫০

১৬. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ১১০; বদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৩৬৯।

১৭. বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৩৭০।

১৮. Hitu, Wajiz পৃষ্ঠা ১৫১।

১৯. একই গ্রন্থ।

২০. আবু দাউদ, সুনান, ২ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪১০, হাদিস নম্বর, ১৫৬৭; গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৫৯।

২১. আদেশ ও নিষেধ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন, আল শাতিবী, মুওয়াফাকাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৯০-১৪০।

২২. একই গ্রন্থ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৯২।

২৩. একই গ্রন্থ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৯৩।

২৪. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ৭২

২৫. শাতিবী, মুওয়াফাকাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৯০।

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

নাছ্খ (রহিতকরণ)

আক্ষরিক অর্থে নাছ্খ মানে 'মুছে ফেলা' যেমন 'নাছ্খাত আল রিহ আসার আল মাশি অর্থ বাতাসে মুছে গেছে পদচিহ্ন। এ ছাড়া নাছ্খ অর্থ প্রতিলিপি বা কোনো কিছু এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় স্থানান্তর (আল নকল ওয়া আল তাহ্বিল) বুঝায়। এ সময় এর নির্যাস অপরিবর্তিত থাকে। এ অর্থেও কুরআনের আয়াতে 'নাছ্খ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, আয়াতটিতে বলা হয়েছে : 'ইন্না কুন্না নাছ্তানশিখু মা কুনতুম তামালুন' অর্থ তোমরা যা কিছুই করছিলে আমরা তা লিখে রাখছিলাম (সুরা জাছিয়া, ৪৫ : ২৯)। অতি পরিচিত আরবি প্রকাশভঙ্গিতে নাছ্খ-এর ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়, তানাসুখ আল আরওয়াহ (পুনর্জন্ম) ও তানাসুখ আল মুওয়ারিশ, ওয়ারিশদের মধ্যে 'মিরাসী' সম্পত্তি হস্তান্তর। নাছ্খ-এর দু'টি অর্থের মধ্যে কোনোটিতে আক্ষরিক (হাকিকি) ও কোনটি রূপক (মাজাজি) অর্থ হবে তা নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। আবু বকর আল বাকিল্লানী ও আল গাজ্জালীসহ কতিপয় আলেম মনে করেন যে, 'নাছ্খ' হলো একটি সমলেখ শব্দ এবং তা দু'টি অর্থের প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হবে। অবশ্য সংখ্যাগরিষ্ঠের মত অনুযায়ী নাছ্খ-এর মূল অর্থ হলো, 'মুছে ফেলা' (আল রাফ ওয়া আল ইজালা) আর প্রতিলিপি/হস্তান্তর হচ্ছে গৌণ অর্থ।[১]

নাছ্খের সংজ্ঞায় এ কথা বলা যেতে পারে যে, শরিয়াহর একটি বিধান দ্বারা আরেকটি বিধানকে রহিতকরণ বা প্রতিস্থাপন করণ। এ শর্তে প্রতিস্থাপনকারী বিধানটি পরে এসেছে এবং দু'টি বিধানই পরস্পর থেকে পৃথকভাবে কার্যকর করা হয়েছে। এ সংজ্ঞা অনুযায়ী নাছ্খের শুধুমাত্র শরিয়াহর বিধিবিধানের ক্ষেত্রে কার্যকর থাকে এটি এমন একটি অনুবিধি যা কেবলমাত্র যৌক্তিকতার (আকল) ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বিধিতে নাছ্খের প্রয়োগ নিরোধ করেছে। এ সংজ্ঞার হুকম বা রায়ে কেবলমাত্র আদেশ ও নিষেধকেই নয় উপরন্তু এর ঠিক পরের তিনটি মধ্যবর্তী বিষয় যেমন- সুপারিশ, তিরস্কার ও অনুমোদনকেও (মুবাহ) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দু'টি বিধান অবশ্যই পৃথক হওয়ার শর্তের অর্থ হলো এর প্রত্যেকটি অবশ্যই পৃথক আয়াতে নির্দেশিত হবে। একই আয়াতে উভয় বিধান বর্ণিত হলে সে ক্ষেত্রে তার একটি অন্যটির সম্পূরক অথবা তাকে নির্দিষ্ট করতে পারে অথবা একটি অন্যটির শর্তের বাস্তবরূপ হতে পারে অথবা অন্যটির একটি ব্যতিক্রমও হতে পারে।[২]

কুরআন ও সুন্নাহ্তে ব্যাপকভাবে রহিতকরণের প্রয়োগ করা হয়েছে; ইজমা ও কিয়াসের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ সাধারণভাবে নাকচ করে দেয়া হয়েছে, এ বিষয়ে

www.pathagar.com

আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। এমনকি কুরআন ও সুন্নাহ্তে নাছ্খের ব্যবহার একটি নির্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ রসুল সা.-এর জীবদ্দশার মধ্যেই সীমিত ছিল। অন্য কথায় বলা যায় যে, রসুল সা.-এর ওফাতের পর আর কোনো নাছ্খ হয়নি। কিন্তু তার জীবদ্দশায় কুরআন-সুন্নাহ্র কিছু বিধিবিধান পরবর্তী বিধিবিধানের দ্বারা আংশিক বা পুরোপুরিভাবে রহিত হওয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে। এর প্রধান কারণ ছিল সমাজে জীবনধারায় পরিবেশ-পরিস্থিতির পরিবর্তনে দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে কুরআন নাজিলের ঘটনা। সুন্নাহ্তে নাছ্খের ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। অবশ্য কুরআনে নাছ্খের মূলনীতি এবং নাছ্খের সংঘটনের সংখ্যা উভয় ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।[৩]

রহিতকরণ মূলত একটি মাদানী ঘটনা। রসুল সা.-এর মদিনায় হিজরতের পর মদিনার সমাজে যে পরিবর্তন ঘটে তার ফলশ্রুতিতে এটি ঘটে। ইসলামের আগমনের প্রথম দিকে মানুষের অন্তর জয় করার লক্ষ্যে কতিপয় বিধি প্রবর্তিত হয়েছিল। এর উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, প্রাথমিকভাবে দৈনিক দুই ওয়াক্ত নামাজ নির্ধারণ করা হয়েছিল কিন্তু পরে তা পাঁচ ওয়াক্ত নির্ধারণ করা হয়। অনুরূপভাবে প্রাথমিকভাবে মুতাহ বিয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছিল, রসুল সা.-এর মদিনায় হিজরতের পর তা নিষিদ্ধ করা হয়।[৪] মুসলিম উম্মাহ্ যখন একটি সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করল এবং মদিনার নতুন পরিবেশে তাদের জীবন পরিচালনার নতুন নতুন বিধানের প্রয়োজন দেখা দিলো, তখন নুসুসে এসব ও অনুরূপ আরো অনেক পরিবর্তন আনা হয়।

হানাফীগণের কেউ কেউ এবং মুতাজিলা ফকিহগণ মনে করেন যে, ইজমা কুরআন ও সুন্নাহ্র বিধানকে রহিত করতে পারে। এ মতের সমর্থকরা দাবি করেন যে, ইজমার আলোকেই ‘উমর ইবনে খাত্তাব রা. মুয়াল্লাফাহ আল কুলুবের জাকাতের অংশ প্রদান বন্ধ করে দেন। এরা ছিল প্রভাবশালী ব্যক্তি যাদের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা ইসলামের জন্য কল্যাণকর বলে মনে করা হতো।[৫] কুরআন তাদেরকে জাকাত হিসেবে একটি অংশ প্রদান করার বিধান করে দিয়েছে (সুরা তাওবা, ৯ : ৬০)। কিন্তু তৎকালীন মুজতাহিদদের দৃশ্যত সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের আলোকে ওই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। অবশ্য সঠিক মত হচ্ছে যে, এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত থাকায় কোনো ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এ কথা দাবি করা যাবে না।[৬] এ ছাড়া সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মত হলো, ইজমা কোনো কিছু না রহিত করতে পারে, না নিজেও রহিত হতে পারে এবং ইজমা কোনো অবস্থাতেই কুরআন ও সুন্নাহ্র কোনো নসকে রহিত করতে পারে না। তাই প্রথমত, কুরআন ও সুন্নাহ্র পরিপন্থী কোনো ইজমা কখনোই গঠিত হতে পারে না। আল আমিদী বিষয়টির বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন, যা এখানে উদ্ধৃত করা হলো : ইজমা যে হুকম রহিত করতে চায় তা

www.pathagar.com

একটি নস, অন্য একটি ইজমা অথবা কিয়াসের ভিত্তিতে গঠিত হতে পারে। এর প্রথমটি হওয়া সম্ভব নয় কারণ, যে ইজমা কুরআন ও সুন্নাহ্র নস রহিত করতে চায় তা হয় দলিলের নির্দেশনার ভিত্তিতে অথবা দলিল ছাড়া গঠিত হয়। যদি তা দলিলের ভিত্তিতে গঠিত না হয় তাহলে তার ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি এবং তা যদি দলিলের ভিত্তিতে গঠিত হয় তাহলে তা হয় নস অথবা কিয়াস হবে। যদি ইজমার ভিত্তি (সনদ) যদি কিয়াস হয়, তাহলে রহিতকরণ অনুমোদনযোগ্য হবে না (বিষয়টি পরে ব্যাখ্যা করা যাবে)। আর ইজমার সনদ যদি একটি নস হয় তাহলে রহিতকরণ হবে ইজমা নয় নসের দ্বারা। উমর ইবনে খাত্তাব রা. মুয়াল্লাফাহ্ আল কুলবের অংশ প্রদান বন্ধ করেন শরিয়াহ্র নীতির আলোকে (আল সিয়াসাহ্ আল শরিয়াহ্)। ব্যাপকভাবে উদ্ধৃত খলিফার একটি প্রবাদ বাক্যে বিষয়টির ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, তাহলো : 'আল্লাহ্ তায়ালা ইসলামকে উচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন; তাদের আনুকূল্যের আর কোনো প্রয়োজন নেই'।[৭]

সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী কোনো দুর্বল হাদিস, ইজমা বা কিয়াস কুরআনের নস অথবা মুতাওয়াতির হাদিসকে রহিত করতে পারে না। কারণ তাদের ক্ষমতা নসের সমান নয়। বস্তুতপক্ষে এ বিধানের সমর্থনে এটি হলো প্রধান যুক্তি। আমরা ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি যে, রসুল সা.-এর ওফাতের পর নুসুসের রহিতকরণ সম্ভব নয়, কারণ তার মৃত্যুর সাথে সাথেই কুরআন-সুন্নাহ্র বিধান অবতরণের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। তাই কুরআন ও সুন্নাহ্র চেয়ে দুর্বল কিছু এই দুই উৎসের কোনোটিকেই রহিত করতে পারে না। রসুল সা.-এর মৃত্যুর সাথে সাথেই রহিতকরণ কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে। নুসুসের তুলনায় ইজমা, কিয়াস ও ইজতিহাদ অনেক দুর্বল এবং তা খোদায়ী বিধানকে রহিত করতে পারে না।[৮]

এই দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুরূপ অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে আলেমগণ এ সাধারণ নিয়মের ব্যাপারে সম্মত হয়েছেন যে, ইজমা না কোনো কিছুকে রহিত করতে পারে, না নিজে রহিত হতে পারে। অন্য কথায় সাধারণভাবে রহিতকরণের ক্ষেত্রে ইজমা প্রাসঙ্গিক নয়। অবশ্য অধিকতর পছন্দনীয় মত হচ্ছে, ইজমা কুরআন ও সুন্নাহ্র কোনো বিধানকে অথবা অন্য কোনো ইজমাকে রহিত করতে পারে না, কারণ কুরআন ও সুন্নাহ্র বিধান অথবা কিয়াসের ভিত্তিতে ইজমা গঠিত হয়। অবশ্য জনস্বার্থ বা মাসলাহা মুরসালাহার বিবেচনায় গঠিত কোনো ইজমা পরবর্তী ইজমার দ্বারা রহিত হতে পারে। তাত্ত্বিকভাবে কেবল এমন ক্ষেত্রেই ইজমা রহিতকরণের নিয়ামক হিসেবে কাজ করতে পারে।[৯]

শেষে বলা যায় যে, যেহেতু কিয়াসের মূল কাজ হলো অনুরূপ ঘটনার ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহ্র বিধিবিধানকে সম্প্রসারিত করা তাই এর বিপরীত কোনো কিছু

www.pathagar.com

যেমন- কুরআন ও সুন্নাহ্‌র বিধানকে রহিত করা কিয়াসের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। ব্যাপকার্থে বলা যায়, নাছ্‌খের ক্ষেত্রে কিয়াসের কোনো স্থান নেই; কিয়াসের রহিতকারক হওয়া সম্ভব নয়, এর মূল কারণ কিয়াস নস ও ইজমার চেয়ে দুর্বল এবং এর কোনোটিকেই রহিত করতে পারে না। এভাবে কিয়াস নিজেকেও রহিত করতে সক্ষম নয়, এর কারণ সাধারণত কুরআন-সুন্নাহ্‌র বিধানের ভিত্তিতে কিয়াস গঠিত হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এর মূল বিষয়টি কার্যকর থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়াসও বৈধ থাকবে। তাই কিয়াস যেসব বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে গঠিত হয়েছে তা কার্যকর থাকা পর্যন্ত কিয়াস রহিত হওয়ার বিষয় অচিন্তনীয়। উপরন্তু কোনো প্রতিষ্ঠিত কিয়াসকে পরবর্তী কিয়াসের দ্বারা যথার্থ অর্থে রহিত করা যাবে না। যদি প্রথম কিয়াস কুরআনের অথবা সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে গঠিত হয় তাহলে তার পরিপন্থী কিয়াস ত্রুটিপূর্ণ হবে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া দু'টি কিয়াস একই সাথে বহাল থাকতে পারে এবং একটির দ্বারা অপরটি রহিতকরণ ছাড়াই দু'টি কিয়াসই ইজতিহাদী মত হিসেবে গণ্য হতে পারে। ইজতিহাদ সংক্রান্ত বিধান অনুযায়ী কোনো মুজতাহিদের ইজতিহাদ প্রচেষ্টায় ভুল হলেও তিনি পুরস্কারের অধিকারী হবেন। সংক্ষেপে বলা যায়, নাছ্‌খ মূলত বাধ্যবাধকতামূলক প্রমাণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয় এবং কিয়াস তার মধ্যে পড়ে না।[১০]

ইমাম শাফেয়ী তার রিসালাহ্ গ্রন্থে এ মত প্রকাশ করেছেন যে, নাছ্‌খ বাতিলকরণ পদ্ধতি (ইলগা) নয় বরং তাহলো একটি বিধানের দ্বারা আরেকটি বিধান সাময়িকভাবে স্থগিত বা সীমাবদ্ধ করা। এ দৃষ্টিতে নাছ্‌খ হচ্ছে এক ধরনের ব্যাখ্যা (বায়ান) যার মূল বিধানকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করার এখতিয়ার নেই।[১১]

এ দৃষ্টিতে নাছ্‌খ ব্যাখ্যামূলক যে, তা কোনো নির্দিষ্ট বিধানের সমাপ্তির পদ্ধতি ও তা পরিসমাপ্তির সময়, সমগ্র বিধানটি অথবা এর একাংশের পরিসমাপ্তি ঘটেছে কি না এবং যে নতুন বিধানটি এর স্থলাভিষিক্ত হয় সে সম্পর্কেও আমাদেরকে অবহিত করে। অবশ্য সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম নাছ্‌খ এক ধরনের বায়ান গঠন করে এ মতকে গ্রহণ করেননি। বস্তুতপক্ষে যখন কোনো বিধানের ইতি টানা ও সমাপ্তি ঘটানোর বায়ান ঘোষণা করা হয় তখন তা আর ব্যাখ্যা করা যায় না। কুরআন-সুন্নাহ্‌র দু'টি বিষয়ের মধ্যে বিরোধ থাকায় এমন ঘটনা ঘটতে পারে; অথচ গভীরভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, প্রকৃতপক্ষে এদের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই বরং বাহ্যত পার্থক্য রয়েছে এবং তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা ও এ বিরোধ দূর করা সম্ভব। এ দু'টির মধ্যে একটি সাধারণ (আম) এবং অন্যটি সুনির্দিষ্ট (খাস) হতে পারে। সে ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব বিরোধ নিরসনে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও তাখসিসের (সুনির্দিষ্টকরণ) বিধিমালা অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে। এভাবে এ দু'টির মধ্যে সমন্বয় করা না

www.pathagar.com

গেলে সে ক্ষেত্রে যথার্থতার (সুরত) দিক থেকে যেটি শক্তিশালী হবে সেটিই অগ্রগণ্য বিবেচিত হবে। এর উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কুরআন ও বিচ্ছিন্ন হাদিসের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে আহাদ হাদিসটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল হওয়ায় অবশ্যই কুরআনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এ ছাড়া মুতাওয়াতির মাশহুর অথবা আরেকটি আহাদ হাদিস দ্বারা রহিত হতে পারে, ওই হাদিসটির অর্থ অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার অথবা তার বর্ণনাক্রম (সনদ) শক্তিশালী। কিন্তু যদি দু'টি বিষয় এসব ক্ষেত্রেই সমান হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে অনুমোদনদায়ক বিষয়ের ওপর নিষেধাত্মক বিষয়কে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। উপরন্তু সব বিরোধের ক্ষেত্রে সময়কাল নির্ণয় করা জরুরি। যদি তা নির্ণয় করা সম্ভব হয় তাহলে পরবর্তীটি পূর্বেরটিকে রহিত করবে। অবশ্য দু'টি বিধানের কালানুক্রমিক দিক কেবলমাত্র নির্ভরযোগ্য হাদিসের মাধ্যমেই নির্ণয় করা যেতে পারে ইজমা বা কিয়াসের দ্বারা নয়।[১২]

সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী কুরআন ও হাদিসের সুস্পষ্ট বিধান যা মুহকামাত নামে পরিচিত তার ক্ষেত্রে নাছ্খ প্রযোজ্য নয়। এ ধরনের আয়াত বা হাদিসে শব্দগুলো এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে যাতে রহিতকরণের সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া আরো কয়েকটি বিষয় রয়েছে যাতে রহিতকরণ প্রয়োগ করা যায় না। এর মধ্যে রয়েছে, আল্লাহর গুণসমূহ, ইমানের মূল নীতিসমূহ, তাওহিদ ও পরকাল সম্পর্কিত বিধিবিধান যা রহিতকরণের আওতায় পড়তে পারে না। আরেকটি বিষয় হলো, সর্বশেষ খোদায়ী আইন-ইসলামি শরিয়াহর অখণ্ডতাকে কখনোই রহিত করা যাবে না।[১৩] আলেমদের মধ্যে এ ব্যাপারে আরো মতৈক্য রয়েছে যে, যৌক্তিক বিষয় ও নৈতিক সত্য যেমন-ন্যায়বিচার করার গুণ অথবা পিতা-মাতাকে ভক্তি করা এবং বিভিন্ন দোষত্রুটি যেমন- মিথ্যা বলার মহাঅপরাধ অপরিবর্তনীয়, তাই এসব রহিতকরণের জন্য উন্মুক্ত নয়। এভাবে নাছ্খ ব্যবহারের মাধ্যমে কোন দোষকে গুণে এবং গুণকে দোষে রূপান্তরিত করা যাবে না। অনুরূপভাবে অতীতের নির্দিষ্ট ঘটনাবলীর সাথে সম্পর্কিত কুরআন-সুন্নাহ্র নুসুস রহিতকরণের জন্য উন্মুক্ত নয়। এর উদাহরণ হলো, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত নাছ্খ প্রয়োগের উপযুক্ত নয় : 'সামুদ এক ভয়ানক তুফানে ধ্বংস হয়ে গেছে আর 'আদকে ধ্বংস করা হয়েছে একটি ভয়াবহ তীব্র ঝঞ্ঝাবাত আঘাতে' (সুরা হাক্কাহ, ৬৯ : ৫-৬)। এ ধরনের ঘটনার ব্যাপারে নাছ্খ প্রয়োগ হবে এর সূত্রের প্রতি মিথ্যা আরোপের শামিল, যা কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।[১৪]

উপরিউক্ত আলোচনার সারসংক্ষেপ হিসেবে বলা যায় যে, নিম্নোক্ত শর্তসমূহ পূরণ না হলে কোন রহিতকরণ সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়। প্রথমত : কুরআনের আয়াত বা সুন্নাহ্তে যদি রহিতকরণের সম্ভাবনা নাকচ করা না হয়। এর উদাহরণ হলো,

www.pathagar.com

মিথ্যা অপবাদ (কাজফ) আরোপের জন্য দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি সম্পর্কে কুরআনের বিধান হলো ওই ব্যক্তিকে কখনো সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না (সুরা নূর, ২৪ : ৪)। অনুরূপভাবে একটি হাদিসে বলা হয়েছে :

الجهاد ماض إلى يوم القيامة

'কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদের বিধান কার্যকর থাকবে।' হাদিসের এ ঘোষণা সুনিশ্চিতভাবে জিহাদের চিরস্থায়ী বৈধতার বিষয় রহিতকরণকে নাকচ করে দিয়েছে।[১৫] দ্বিতীয়ত, ওই সমস্ত বিষয় যা সম্ভাব্য রহিতকরণের জন্য উন্মুক্ত। আল্লাহর গুণাবলি, ইমানের মূলনীতিগুলো, নৈতিক গুণাবলি ও যৌক্তিক সত্য ইত্যাদি রহিতকরণের জন্য উন্মুক্ত নয়। তৃতীয়ত : রহিতকারক আয়াত বা হাদিস রহিত আয়াত বা হাদিসের পরবর্তীকালের হয়। চতুর্থত, যথার্থতা (সুবুত) ও অর্থের (দালালাহ) দিক থেকে সমান শক্তিসম্পন্ন কুরআনের দু'টি বিধানের একটি সমশক্তিসম্পন্ন কুরআনের অন্য একটি আয়াত অথবা মুতাওয়াতির হাদিস এবং চতুর্থত, হানাফীগণের মতে, এমনকি প্রায় মুতাওয়াতির গুণসম্পন্ন মশহুর হাদিসের দ্বারা রহিত করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে একটি মুতাওয়াতির হাদিস আরেকটি মুতাওয়াতির হাদিসকে রহিত করতে পারে। অবশ্য অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত (রাজি) অনুযায়ী কোনো বিচ্ছিন্ন বা আহাদ হাদিসের দ্বারা কুরআনের আয়াত বা মুতাওয়াতির হাদিস রহিত হতে পারে না। ইমাম শাফেয়ীর মতে, মুতাওয়াতির হাদিস বা আহাদ হাদিস যাই হোক না কেন সুন্নাহ্ কুরআনকে রহিত করতে পারবে না।[১৬] পঞ্চমত, কুরআন-সুন্নাহ্র দু'টি বিধানের মধ্যে সত্যিকার অর্থে বিরোধ রয়েছে এবং কোনোভাবেই তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন সম্ভব নয়। ষষ্ঠত, দু'টি আয়াত বা হাদিস পৃথক এবং তারা পরস্পর শর্ত (শার্ত), মান (ওয়াসফ) বা ব্যতিক্রম (ইসতিসনা)-এর আলোকে সম্পর্কিত নয়। এমন ঘটনার ক্ষেত্রে বিষয়টি রহিতকরণ হবে না বরং তা হবে সুনির্দিষ্টকরণ (তাখসিম) বা বিশেষায়িতকরণ (তাকাইদ)।[১৭]

নাছ্খের প্রকারভেদ

রহিতকরণ স্পষ্ট (সারিহ) অথবা অস্পষ্ট (যিম্নী)। স্পষ্ট রহিতকরণের ক্ষেত্রে রহিতকারক আয়াত বা হাদিস একটি বিধানকে স্পষ্টভাবে রহিত করে তদস্থলে আরেকটিকে স্থাপন করে। রহিতকরণের ঘটনার সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দু'টি বিধানের কালানুক্রম বস্তুতপক্ষে উভয়ের মধ্যে যথার্থ বিরোধ, প্রত্যেকটির প্রকৃতি, ইত্যাদির সহায়তায় নিরূপণ করা যেতে পারে। একটি হাদিসে এর উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়, যাতে বলা হয়েছে :

www.pathagar.com

كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، الا فزوروها

فانّها تُذكّرالاخرة

আমি তোমাদেরকে কবরস্থানে যেতে নিষেধ করেছি আর এখন তোমরা যেতে পার কেননা তা তোমাদেরকে কিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।[১৮]

অন্য এক হাদিসে রসুল সা. বলেছেন :

كنت نهيتكم عن ادّخار لحوم الاضاحي لأجل

الدّفة ، الا فادّخروها

অনেক লোক থাকার কারণে আমি তোমাদেরকে কোরবানির গোশত জমা করে রাখতে নিষেধ করেছিলাম এখন তোমরা ইচ্ছা অনুযায়ী মজুদ করতে পার।[১৯]

ঈদের সময় (ঈদুল আজহা) কুরবানির গোশত মজুদ না করার জন্য প্রাথমিক নির্দেশ দেয়া হয়েছিল মদিনায় এই উৎসবকালে বিপুলসংখ্যক লোকের সমাগমের কারণে। এসব লোককে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য প্রদান করা হোক, এটিই রসুল সা. চেয়েছিলেন। পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটায় তিনি পরে এ নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন। উদাহরণ সুন্নাহ্‌র দু'টি বিধানের প্রকৃতি এবং রহিতকরণের অন্যসব প্রাসঙ্গিক দিকের ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। স্পষ্ট রহিতকরণের একটি উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায় কুরআনের সুরা আল বাকারার (২ : ১৪২-১৪৪) জেরুসালেম থেকে মক্কার কাবার দিকে কেবলা পরিবর্তনের প্রসঙ্গে। নতুন বিধান অবতীর্ণের পর পূর্বের ও পরের কেবলার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আয়াতের বক্তব্য স্পষ্ট এবং এতে রহিতকরণের ঘটনা ও সংঘটিত পরিবর্তনের প্রকৃতি সম্পর্কে সন্দেহ করার কোনো অবকাশ নেই।[২০]

অস্পষ্ট রহিতকরণের ক্ষেত্রে রহিতকারী আয়াত বা হাদিস সংশ্লিষ্ট সকল ঘটনা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে না। এর পরিবর্তে আমরা এমন একটা পরিস্থিতি দেখতে পাই যাতে আল্লাহ তায়ালা একটি বিধান প্রবর্তন করেছেন, যা পূর্ববর্তী বিধানের পরিপন্থী এবং এ দু'টি বিধানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে দু'টি বিধানে রহিতকরণের যথার্থ কারণ বর্তমান আছে কি না সে ব্যাপারে কিছুটা সন্দেহ থেকে যায় (সুরা বাকারা ২ : ১৮০)। কারোর পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য

www.pathagar.com

অসিয়ত করে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। পরে আরেকটি আয়াতের (সুরা নিসা, ৪ : ১১) দ্বারা এ বিধানকে রহিত করা হয়। ওই আয়াতে বৈধ ওয়ারিশদেরকে মিরাসি সম্পত্তির সুনির্দিষ্ট হারে উত্তরাধিকারী করা হয়েছে। তৎসত্ত্বেও দু'টি বিধান পরস্পরের সম্পূর্ণ বিপরীত নয় এবং কতিপয় নির্দিষ্ট ক্ষেত্র উভয়ই প্রযোজ্য হতে পারে।[২১] সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মত হচ্ছে, আত্মীয়-স্বজনের জন্য অসিয়ত করার পূর্বেকার বিধানটি উত্তরাধিকারী আইনের দ্বারা রহিত করা হয়েছে। তারা মনে করেন যে উত্তরাধিকারের বিধান সম্পর্কিত আয়াতে বৈধ ওয়ারিশদের মধ্যে সম্পত্তির সুনির্দিষ্ট অংশের উত্তরাধিকার হওয়ার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, যা অখণ্ডভাবে পালন করলেই কেবল যথাযথভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব হবে কেননা উত্তরাধিকারী সংক্রান্ত কুরআনের বিধান সুনির্দিষ্ট ও স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং বাইরের যে কোনো হস্তক্ষেপ প্রত্যেকের অংশকে বিপর্যস্ত করবে আর তাদের মধ্যকার সার্বিক ভারসাম্য বিনষ্ট করবে। তাই এ ধরনের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপে মূল উৎস হিসেবে বৈধ উত্তরাধিকারীদের জন্য অসিয়ত করাকেও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হাদিসের সুস্পষ্ট নির্দেশনায় এ বিশ্লেষণ সমর্থিত হয়েছে, যাতে রসুল সা. বলেছেন :

إن الله أعطى لكل ذي حق حقه ، فلا
وصية لوارث

> 'আল্লাহ তায়ালা সকল উত্তরাধিকারীর জন্য নির্দিষ্ট অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছেন তাই বৈধ ওয়ারিশদের জন্য কোনো অসিয়ত করা যাবে না'।[২২]

অস্পষ্ট রহিতকরণ দু'টি উপবিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, তাহলো সম্পূর্ণ রহিতকরণ (নাছ্খ কুল্লী) ও আংশিক রহিতকরণ (নাছ্খ যুজয়ী)। সম্পূর্ণ রহিতকরণের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট নস আরেকটি নসের দ্বারা পুরোপুরি রহিত হয়ে যায় এবং তদস্থলে নতুন বিধান কার্যকর হয়। এ সম্পর্কে আমরা উদাহরণ হিসেবে কুরআনে নারীদের ইদ্দত পালন সংক্রান্ত দু'টি আয়াত তুলে ধরতে পারি, যাতে প্রাথমিকভাবে ইদ্দতকাল এক বছর নির্ধারণ করা হয়েছিল, কিন্তু পরে তা পরিবর্তন করে চার মাস দশ দিন ধার্য করা হয়। নিম্নের আয়াত দু'টিতে বলা হয়েছে :

১. তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং বিধবা স্ত্রী রেখে যায়, তাদের স্ত্রীদের জন্য এ অসিয়ত করে যাওয়া উচিত যে, এক বছরের জন্য তাদের জীবিকা ও যাবতীয় খরচপত্রের ব্যবস্থা করে দেয়া হয় এবং তাদেরকে যেন ঘর থেকে বিতাড়িত করা না হয়। অবশ্য তারা নিজেরাই যদি

www.pathagar.com

চলে যায় তাহলে তারা নিজেদের ব্যাপারে প্রচলিত সঠিক পন্থায় যা কিছুই করুক না কেন সে জন্য তোমাদের কোনো দায়দায়িত্ব নেই (সুরা বাকারা, ২ : ২৪০)।

২. তোমাদের মধ্যে যারা মারা যায়, তাদের স্ত্রীরা যদি জীবিত থাকে, তাহলে তারা নিজেদেরকে (বিবাহ হতে) চার মাস দশ দিন বিরত রাখবে। যখন তাদের ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে তখন তারা নিজেদের সম্পর্কে সঠিক পথে যা করতে চাইবে তা করার ইখতিয়ার তাদের থাকবে, তোমাদের ওপর তার কোনো দায়িত্ব আসবে না (সুরা বাকারা, ২ : ১৩৪)।

এখানে আমরা দেখতে পেলাম যে, বিধবা মহিলাদের ইদ্দতকাল সম্পর্কিত প্রথম আয়াতের বিধান দ্বিতীয় আয়াতের নতুন বিধান দ্বারা পুরোপুরি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এতে কোনোই সন্দেহ নেই যে, এই দু'টি বিধানেরই মূল একান্তভাবেই একটি বিষয় সম্পর্কিত, আর তাহলো বিধবা। উভয় আয়াতে তাদের জন্য ইদ্দতকাল পালন করার প্রয়োজনের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু প্রত্যেকটিতে এ সময়সীমার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে এবং কাউকে এর একটিকে পালন করতে হবে, উভয়টিকে নয়। এভাবে দু'টি আয়াতের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হওয়ায় পরের আয়াতটি পূর্বের আয়াতটিকে রহিত করেছে। আমরা আগেই বলেছি যে, এটি হলো একটি অস্পষ্ট নাছ্খ। আর এ কারণে দু'টি আয়াতে বিস্তারিত বিবরণের মাধ্যমে রহিতকরণের বিষয় পুরোপুরিভাবে স্পষ্ট হয়নি এবং উভয়ের মধ্যে সত্যিকারার্থে বিরোধ রয়েছে কি না তাও নিশ্চিত নয়। প্রথম আয়াতের এক বছরের জীবিকা ও যাবতীয় খরচ এবং বাড়ি থেকে বিতাড়িত না করার বিষয় দ্বিতীয় আয়াতে উল্লেখিত হয়নি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, এতে আয়াত দু'টিতে যথাক্রমে জীবিকা নির্বাহ ও যাবতীয় খরচ এবং ইদ্দত পালন পৃথক বিষয় সম্পর্কিত কি না সে ব্যাপারে সংশয়ের সৃষ্টি করেছে। অন্য কথায় বলা যায় যে, পার্থক্যের এ মাত্রা দু'টি বিধানের প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রয়োগের সম্ভাবনা দেখা যেতে পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠের মত যা দৃশ্যত আইনে পরিণত হয়েছে তার বিরুদ্ধে এ যুক্তি ধোপে টিকবে না। তবে এ ধরনের রহিতকরণ কেন অস্পষ্ট নাছ্খের শ্রেণিভুক্ত হবে কেবল সে বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে এটি তুলে ধরা হয়েছে।

আংশিক রহিতকরণ (নাছ্খ যুজয়ী) হচ্ছে এমন এক ধরনের নাছ্খ যাতে একটি আয়াত অপর একটি আয়াতের একাংশ রহিত করে এবং আয়াতটির অবশিষ্ট অংশ কার্যকর থাকে। এর উদাহরণ হিসেবে আমরা মিথ্যা অপবাদ দান (কাজফ) সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত তুলে ধরতে পারি, যা অভিসম্পাত দান (লিয়ান)

www.pathagar.com

সম্পর্কিত অপর একটি আয়াতের দ্বারা আংশিকভাবে রহিত হয়েছে। আয়াত দু'টি নিম্নে তুলে ধরা হলো :

১. যারা পবিত্র চরিত্রের স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে মিথ্যা দোষারোপ করবে তারপর চারজন সাক্ষী হাজির করতে পারবে না তাদেরকে আশিটি কোড়ড়া মার (সুরা নূর, ২৪ : ৪)।

২. যারা নিজেদের স্ত্রীদের সম্পর্কে অভিযোগ তুলবে আর তাদের নিকট নিজেদের ছাড়া কোনো সাক্ষী থাকবে না, তাহলে তাদের মধ্যে এক ব্যক্তির সাক্ষ্য, (এই যে সে) আল্লাহ্ তায়ালার নামে চারবার কসম খেয়ে সাক্ষ্য দেবে যে, সে (তার আনীত অভিযোগের ব্যাপারে) সত্যবাদী (সুরা নূর, ২৪ : ৬)।

প্রথম আয়াতটিতে একটি সাধারণ বিধান বর্ণিত হয়েছে, তাহলো যে কোনো ব্যক্তি, সে স্বামী বা অন্য কেউ হোক না কেন, কোনো পবিত্র চরিত্রের নারীর বিরুদ্ধে জিনার অভিযোগ আনবে তাকে তা প্রমাণের জন্য অবশ্যই চারজন সাক্ষী হাজির করতে হবে। দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, অভিযোগকারী যদি স্বামী হয়, যার পক্ষে চারজন সাক্ষী হাজির করানো সম্ভব না হয় তদুপরি যদি সে জিনার অভিযোগের ব্যাপারে অনড় থাকে তাহলে তাকে চারজন সাক্ষীর স্থলে চারবার আল্লাহ্র নামে শপথ করতে হবে। এরপরের আয়াতে বলা হয়েছে, এরপর স্বামী বলছে সে যদি মিথ্যা বলে থাকে তাহলে তার ওপর যেন আল্লাহ্র লানত পড়ে। এভাবে স্বামী-স্ত্রীর বিষয় সম্পর্কিত হওয়ায় দ্বিতীয় আয়াতের দ্বারা প্রথম আয়াতের বিধান আংশিকভাবে প্রতিস্থাপিত হয়েছে।[২৩]

এ কথা বলা দরকার যে, কুরআনের আয়াতের দু'টি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তাহলো আয়াতের শব্দসমূহ ও তাতে বর্ণিত বিধিবিধান বা হুকম। হুকম রহিত হয়ে যাওয়ার পরও কুরআনের শব্দসমূহ পাঠ ও তেলাওয়াতের মধ্যে বিপুল আধ্যাত্মিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এসব শব্দ কুরআনের অংশ হিসেবে গণ্য হয় এবং তা পাঠের মাধ্যমে নামাজ আদায় করা যায়। কুরআনের শব্দ ও বিধিবিধানের এ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নাছ্খকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এর প্রথমটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রহিতকরণকে বলা হয় নাছ্খ আল হুকম বা নাছ্খ, যাতে কেবল বিধানটি রহিত হয়, শব্দসমূহ নয়। আমরা উপরে কুরআনের যেসব উদাহরণ পেশ করেছি তা এ শ্রেণির নাছ্খের আওতায় পড়ে। এভাবে আত্মীয়-স্বজনকে অসিয়ত করা (সুরা বাকারা, ২ : ১৮০) ও বিধবাদের ইদ্দত পালন (সুরা বাকারা, ২ : ২৪০) কুরআনের আয়াত রহিত হওয়া সত্ত্বেও এর শব্দসমূহ এখনো কুরআনের অংশ। অথবা এসব

www.pathagar.com

আয়াত আমরা এখনো তেলাওয়াত করি কিন্তু এতে যে বিধান বর্ণিত হয়েছে তা প্রয়োগ করি না। অন্য দুই প্রকার নাছ্খ হলো নাছ্খ আল তিলওয়াহ (একে অনেক সময় নাছ্খ আল ক্বিরায়াহও বলা হয়) ও নাছ্খ আল হুকম ওয়া তিলওয়াহ। নাছ্খ আল তিলওয়াহ হলো এমন নাছ্খ যাতে আয়াতের শব্দসমূহ রহিত হয় কিন্তু বিধান বহাল থাকে। আর নাছ্খ আল হুকম ওয়া তিলওয়াহতে আয়াতের শব্দ ও বিধান উভয়ই রহিত হয়। এ ধরনের নাছ্খ কদাচিত হয় এবং আমরা এর সমর্থনে সিদ্ধান্তমূলক কোনো উদাহরণ দিতে পারছি না। এসব আলোচনার পর এ কথাও বলা দরকার যে, এ ধরনের নাছ্খের ব্যাপারে মুতাজিলাদের একটি সংখ্যালঘু বিশেষজ্ঞ দল ছাড়া আলেমদের অধিকাংশের সাধারণ মতৈক্য রয়েছে।[২৪]

নাছ্খ আল তিলওয়াহর উদাহরণ হলো, হজরত উমর ইবনে খাত্তাব রা.এর নামে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েত যা কুরআনের অংশ ছিল। অবশ্য আলোচ্য অংশটুকু কুরআনে দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এ আয়াতের বিধানটি এখনও প্রামাণ্য আইন হিসেবে বহাল রয়েছে। আয়াতটির বর্ণিত অংশে বলা হয়েছে :

الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جموهما البتة

نكال من الله ।

'বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিত মহিলা জিনা করলে তাদের জন্য আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি হচ্ছে পাথর নিক্ষেপ।'[২৫]

যে ক্ষেত্রে কোনো বিবরণের শব্দসমূহ ও আইন উভয় রহিত হয়ে যায় সে ক্ষেত্রে বিবরণটির তেমন একটা তাৎপর্যপূর্ণ থাকে না। উম্মুল মুমেনীন আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে উল্লেখ করা হয়েছে, কুরআনে বলা হয়েছে যে, একটি শিশু স্পষ্টত দশবার চোষণ দিয়ে কোনো মহিলার দুধ পান করলে ওই মহিলার দুধ পানকারী অন্যান্য সন্তানের সাথে ওই শিশুটির বিয়ে হারাম হয়ে যাবে। এরপর পাঁচবার চোষণের দ্বারা এ বিধান পুনস্থাপিত হয় এবং এটি যখন করা হয় তখন রসুল সা. জীবিত ছিলেন না। দশবার চোষণ সংক্রান্ত প্রাথমিক বিধানটি পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়। পরে এ বিধান রহিত এবং কুরআনের যে আয়াতে এ বিধানটি রহিত হয় তার শব্দসমূহও বাদ দেয়া হয়। অবশ্য ওই দুই রেওয়ায়েতের কোনোটিই যেহেতু তাওয়াতুর হাদিসের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়নি তাই একে কুরআনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের মত হচ্ছে, স্পষ্টত পাঁচবার চোষণ দিয়ে দুধপান অথবা পেটে গিয়ে পৌঁছেছে এমন যেকোনো পরিমাণ দুধপান করা, এমনকি একবার চোষণে বেশি পরিমাণে দুধপান করলেও তাতে বিয়ে হারাম হয়ে যাবে।[২৬]

www.pathagar.com

সংখ্যাগরিষ্ঠের (জমহুর) মতে, কুরআন ও সুন্নাহ্ নিজের বা একে অপরের দ্বারা রহিত হতে পারে। এ দৃষ্টিতে রহিতকরণকে পুনরায় নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে :

(১) কুরআনের দ্বারা কুরআন রহিতকরণ, ইতোমধ্যে এর উদাহরণ দেয়া হয়েছে। (২) সুন্নাহ্র দ্বারা সুন্নাহ্ রহিতকরণ, এরও উদাহরণ দেয়া হয়েছে। (৩) সুন্নাহ্র দ্বারা কুরআনের রহিতকরণ, এর একটি উদাহরণ হলো (সুরা বাকারার ২ : ২৪০) অসিয়ত সম্পর্কিত আয়াত। হাদিসটিতে বলা হয়েছে: 'একজন উত্তরাধিকারীর জন্য কোনো অসিয়ত করা যাবে না।' সাধারণভাবে মতৈক্য রয়েছে যে কুরআন নিজ থেকে অসিয়ত সংক্রান্ত আয়াত রহিত করেনি এবং সুন্নাহ্র দ্বারা এর রহিত হওয়ার বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।[২৭] (৪) কুরআন দ্বারা সুন্নাহ্র রহিতকরণ, এর উদাহরণ হলো, রসুল সা.এর প্রাথমিক নির্দেশ অনুযায়ী জেরুসালেমকে কেবলা নির্ধারণ করা হয় পরে কুরআন (সুরা বাকারা, ২ : ১৪৪) তা রহিত করে, যাতে মুসলমানদেরকে পবিত্র কাবাহ শরিফের দিকে মুখ করার নির্দেশ দেয়া হয়।[২৮] অন্য কথায় বলা যায়, কুরআন একটি কাজকে রহিত করেছে যা প্রাথমিকভাবে রসুল সা.-এর অনুমোদনের মাধ্যমে করা হতো।

নাছ্খের উপরিউক্ত শ্রেণি বিভাগের ব্যাপারে প্রধান ব্যতিক্রমী মত পোষণ করেন ইমাম শাফেয়ী, মুতাজিলাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এবং আহমদ ইবনে হাম্বল। তারা (দু'টি ভিন্ন রেওয়ায়েতের একটি অনুযায়ী) প্রথম দু'টিকে অনুমোদন করলেও বাকি দু'টিকে নাকচ করে দিয়েছেন। সুন্নাহ্ দ্বারা কুরআন অথবা কুরআন দ্বারা সুন্নাহ্ রহিতকরণ বৈধ হবে না।[২৯] কুরআনের কয়েকটি আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে ইমাম শাফেয়ী এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। এসব আয়াতে আভাস দেয়া হয়েছে যে, কেবল কুরআন দ্বারাই কুরআন রহিত হতে পারে।[৩০] আমরা (সুরা আল নহলে ১৬ : ১০১) দেখতে পাই :

> এবং আমরা যখন এক আয়াতের স্থলে অন্য আয়াত নাজিল করি (আয়াতিল মাকান আয়াতিল) এবং আল্লাহই ভালো জানেন যে, তিনি কি নাজিল করেন।

> আল শাফেয়ীর মতে, এ আয়াতটি কুরআনের কোন আয়াত কেবলমাত্র অন্য একটি আয়াত দ্বারা রহিত বা প্রতিস্থাপন হতে পারার প্রমাণ হিসেবে কাজ করছে। বস্তুতপক্ষে আয়াতটি দু'বার আসায় তা সুন্নাহ্র দ্বারা কুরআন রহিত না হতে পারার চূড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে কাজ করছে। কুরআনের অন্য স্থানে বলা হয়েছে :

www.pathagar.com

আমরা যে আয়াত রহিত করি কিংবা ভুলিয়ে দেই, তদস্থলে তার চেয়ে উত্তম জিনিস পেশ করি কিংবা অন্তত অনুরূপ জিনিস এনে দেই (সুরা বাকারা, ২ : ১০৬)।

আয়াতটি আবারও এ কথা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছে যে, নাছ্খের ক্ষেত্রে কুরআন কেবলমাত্র তার নিজের কথাকেই উল্লেখ করেছে। অন্য কথায়, নাছখের ক্ষেত্রে কুরআন স্বনিয়ন্ত্রিত যা তাকে সুন্নাহ্ দ্বারা রহিত হওয়ার সম্ভাবনাকে নাকচ করে দিয়েছে। ইমাম শাফেয়ীর মতে, কুরআনের নাছ্খ হচ্ছে পুরোপুরিভাবে তার অভ্যন্তরীণ বিষয় এবং সুন্নাহ্ দ্বারা কুরআন রহিত হতে পারার কোনো প্রমাণ কুরআনে নেই। বরং কুরআনের কোনো অংশ পরিবর্তন করার কোনো এখতিয়ার রসুল সা.-এর নেই এ কথা ঘোষণা করতে কুরআনে রসুল সা.-কে বলা হয়েছে। এটি হলো (সুরা ইউনুসের ১০ : ২৫) একটি আয়াতের অর্থ। আয়াতটিতে বলা হয়েছে : ‘বল, আমার কাজ এটি নয় যে, আমার নিজের তরফ থেকে এতে কোনোরূপ বদল করে নেবো। আমি তো শুধু ওহিরই অনুসারী যা আমার কাছে পাঠানো হয়।’ তাই নিজ উদ্যোগে কুরআন রহিত করার কাজ নবির কাজের আওতায় পড়ে না। শাফেয়ী লিখেছেন, ‘নীতিগতভাবে সুন্নাহ্ কুরআনের অনুসরণ, সমর্থন ও সুস্পষ্ট করে, তা আল্লাহ তায়ালার কিতাবকে রহিত করার চেষ্টা করে না।[৩১] ইমাম শাফেয়ী বলেন, কুরআনের আরেকটি আয়াত তার এ অভিমতকে আরো সংহত করেছে, আয়াতটিতে বলা হয়েছে : ‘বস্তুত আল্লাহ তায়ালা যাই চান নিশ্চিহ্ন করে দেন, আর যা ইচ্ছা প্রতিষ্ঠিত করেন। উম্মুল কিতাব (গ্রন্থের মূল উৎস) তো তার নিকটই রক্ষিত’ (সুরা আর রা'দ, ১৩ : ৩৯)। এখানে আবার নাছ্খের প্রসঙ্গ এসেছে যার মূল উৎস হচ্ছে উম্মুল কিতাব অর্থাৎ খোদ কুরআন। সুন্নাহ্ এমনকি মুতাওয়াতির সুন্নাহ্ও কুরআনকে রহিত করতে পারে না। ইমাম শাফেয়ী এ শ্রেণি বিভাগের আরেকটি তত্ত্বের ব্যাপারেও অনুরূপ দ্ব্যর্থহীন মত ব্যক্ত করেছেন, তাহলো কুরআন সুন্নাহ্কেও রহিত করতে পারে না, কেবল সুন্নাহ্ই সুন্নাহ্কে রহিত করতে পারে। মুতাওয়াতির দ্বারা মুতাওয়াতির, আহাদ দ্বারা আহাদ। মুতাওয়াতির দ্বারা আহাদ রহিত হতে পারে তবে আহাদ দ্বারা মুতাওয়াতির রহিত হতে পারে কি না সে বিষয়ে কিছুটা মতানৈক্য রয়েছে। অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত যা শাফেয়ীও সমর্থন করেন, তাহলো আহাদ মুতাওয়াতিরকে রহিত করতে পারে। এর উদাহরণ হিসেবে ইমাম শাফেয়ী কুবা মসজিদে নামাজের জামাতের কেবলা পরিবর্তনের ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। কিছু লোক এক ব্যক্তির কাছ থেকে জানতে পারেন যে, জেরুসালেম থেকে মক্কার দিকে কেবলা পরিবর্তন করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী তারা কেবলা পরিবর্তন করে নামাজ আদায় করে। বস্তুতপক্ষে জেরুসালেমের

www.pathagar.com

কেবলা হওয়ার বিষয়টি অব্যাহতভাবে অনুসৃত বা মুতাওয়াতির সুন্নাহ্ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ছিল কিন্তু জামাতে শামিল সাহাবিগণ রা. বিচ্ছিন্ন হাদিস দ্বারা এ মুতাওয়াতিরকে রহিত করেন।[৩২]

ইমাম শাফেয়ী তার এ নীতির আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যদি সুন্নাহ্ কুরআনকে অথবা কুরআন সুন্নাহ্কে রহিত করার কোনো ঘটনার অস্তিত্ব থাকত তাহলে রসুলই সা. সর্বপ্রথম তা বলতেন। এভাবে যেসব ক্ষেত্রে রহিতকরণ প্রয়োজন হয়েছে সেসব বিষয়েই অবশ্যই রসুল সা.-এর সুন্নাহ্ রয়েছে আর সে ক্ষেত্রে বিষয়টি আপনাআপনি সুন্নাহ্র অংশে পরিণত হয়েছে। অন্য কথায়, সুন্নাহ্ হচ্ছে স্বনিয়ন্ত্রিত এবং কুরআন-সুন্নাহ্র মধ্যে বিরোধ অথবা কুরআন দ্বারা সুন্নাহ্ ও সুন্নাহ্ দ্বারা কুরআনের রহিতকরণের সম্ভাব্য সব ঘটনা এর আওতায় পড়ে। যদি কোনো সুন্নাহ্কে রহিত করা যাবে বুঝাতো তাহলে রসুল সা. নিজেই আরেকটি সুন্নাহ্ দ্বারা তা করতেন, তাই কুরআন দ্বারা সুন্নাহ্কে রহিতকরণের কোনো যুক্তি নেই।[৩৩]

ইমাম শাফেয়ী মনে করেন যে, সুন্নাহ্র রহিতকরণের জন্য প্রয়োজন রসুল সা. কর্তৃক লোকদেরকে সুনির্দিষ্টভাবে তা অবহিত করা। কুরআন যেক্ষেত্রে সুন্নাহ্কে রহিত করতে চেয়েছিল এবং রসুল সা. সে ব্যাপারে কোনো আভাস দেননি এমন ঘটনার উদাহরণ হলো, কুরআনের ব্যবসা-বাণিজ্যের বৈধতা সংক্রান্ত আয়াত (আল বাকারা, ২ : ২৭৫) নাজিল হওয়ার আগে রসুল সা. যেসব পণ্য বেচাবিক্রি নিষিদ্ধ করেছিলেন এ আয়াত অবতীর্ণের পর সেগুলো বৈধতা প্রাপ্ত হয়। অনুরূপভাবে রসুল সা. জিনার জন্য পাথর মারার যে শাস্তির অনুমতি দিয়েছিলেন তা সুরা আল নূরে (২৪ : ২) এক ঘা কোড়ড়া মারার অন্য বিধানের দ্বারা রহিত হয়ে যাবে বলে ধারণা করা হয়েছিল। চুরির ক্ষেত্রে রসুল সা. এক দিনারের চারভাগের-এক ভাগের কম চুরি করলে কাউকে হাত কাটার শাস্তি দিতেন না এবং অরক্ষিত সম্পত্তি (গায়ের মুহরাজ) থেকে চুরির ক্ষেত্রে হাদ শাস্তি দিতেন না। সুরা আল মায়েদায় (৫ : ৫) কী ধরনের চুরির ঘটনা ঘটেছে তার সুনির্দিষ্ট বর্ণনা ছাড়াই চোরের হাত কাটার বিধান নাজিল হলে তার দ্বারা পূর্বের এসব বিধান বাতিল হয়ে যায় বলে মনে করা হয়। আমরা যদি এ প্রক্রিয়াকে উন্মুক্ত করে দেই তাহলে অন্যায্য বিরোধ দেখা দেয়া এবং সুন্নাহ্ থেকে সরে যাওয়ার আশঙ্কা বাড়বে।[৩৪]

শাফেয়ী তার মতবাদের সমর্থনে দৃঢ় যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা সত্ত্বেও সংখ্যাগরিষ্ঠ অলেমগণ কুরআন ও হাদিসের পরস্পরের দ্বারা পরস্পরের রহিতকরণের মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কারণ এমনটি ঘটনার অনেক বাস্তব নিদর্শন রয়েছে। আল

www.pathagar.com

গাজ্জালী এ মতের প্রতিনিধিত্বকারী একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। তিনি লিখেছেন, নাছ্খের জন্য সূত্রের পরিচিতির প্রয়োজন নেই। কুরআন ও হাদিস পরস্পরকে রহিত করেছে কারণ তারা উভয় একই উৎস থেকে এসেছে। শাফেয়ী তত্ত্বের উল্লেখ করে আল গাজ্জালী মন্তব্য করেন : কুরআন জেরুসালেমকে কেবলা হিসেবে কখনোই বৈধতা দেয়নি, সুন্নাহ্ একে বৈধতা দিয়েছে কিন্তু কুরআনের আয়াতের দ্বারা তা রহিত হয়েছে, এমন প্রমাণ থাকার পরও এমন মতের ওপর আমরা কিভাবে অটল থাকতে পারি? অনুরূপভাবে 'আশুরার রোজা পালনকে রমজানে রোজা পালন সংক্রান্ত কুরআনের আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে। আর আশুরার রোজা সুন্নাহ্ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উপরন্তু রমজানের রাতের বেলা স্বামী-স্ত্রীর সহবাস করার অনুমতি সংক্রান্ত কুরআনের আয়াত (সুরা বাকারা, ২ : ১৭৮) সুন্নাহ্র দ্বারা রমজানে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্ক নিষিদ্ধ সংক্রান্ত পূর্বের বিধানটি রহিত করা হয়।[৩৫]

রহিতকরণ (নাছ্খ), সুনির্দিষ্টকরণ (তাখসিস) ও সংযোজন (তাজইজ)

নাছ্খ ও তাখসিসের মধ্যে মিল রয়েছে; উভয়ে কোনো না কোনোভাবে কোনো বিধানের পরিধিকে কমিয়ে আনতে বা নির্দিষ্ট করতে চায়। বিশেষ করে এটি সম্ভবত আংশিক নাছ্খের ক্ষেত্রে সত্য যা সত্যিকারার্থে রহিতকরণ নয় বরং সীমিতকরণ/ নির্দিষ্টকরণ বুঝায়। আমরা ইতোমধ্যে নাছ্খ সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ীর মত নিয়ে আলোচনা করেছি, যা দু'টি বিধানের সহাবস্থানের ধারণার কাছাকাছি এবং এর একটি অন্যটির ব্যাখ্যা হিসেবে কাজ করে। নাছ্খ সম্পর্কে হানাফী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিজনিত মতপার্থক্যের কারণে নাছ্খ ও তাখসিসের মধ্যে কিছুটা সংশয়ও রয়েছে। তারা পরস্পর ভিন্ন ভিন্নভাবে নাছ্খকে বিবেচনা করতে চান। অবশ্য প্রেক্ষাপটের এ পার্থক্য নিয়ে আমরা 'আম' ও 'খাস' অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে আমরা নাছ্খ ও তাখসিস সম্পর্কে বিভিন্ন মাজহাবের মধ্যকার পার্থক্য নিয়ে আলোচনা ছাড়াই এদের মধ্যকার মৌলিক পার্থক্যের বিষয় তুলে ধরতে চাই।

নাছ্খ ও তাখসিস পরস্পর পরস্পর থেকে ভিন্ন এ ক্ষেত্রে যে তাখসিসের মধ্যে সত্যিকারের কোনো বিরোধ নেই। যেমন- দু'টি আয়াত এর একটি সাধারণ আয়াত ও অন্যটি নির্দিষ্ট আয়াত; কার্যত এরা পরস্পর পরস্পরের সম্পূরক। অবশ্য নাছ্খের বিষয়টি আলাদা। এ ক্ষেত্রে দু'টি বিধান সত্যিকার অর্থে পরস্পর বিরোধী, তাই তারা সহাবস্থান করতে পারে না। নাছ্খ ও তাখসিসের মধ্যে আরেকটি পার্থক্য

www.pathagar.com

হলো, নাছ্খ সাধারণ বা সুনির্দিষ্ট উভয় বিধানের যে কোনোটির ক্ষেত্রে ঘটতে পারে, অন্যদিকে তাখসিস কেবলমাত্র সাধারণ বিধানের ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়।[৩৬]

আগেই বলা হয়েছে যে, নাছ্খ মৌলিকভাবে কুরআন ও হাদিসের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং সুস্পষ্ট খোদায়ী বিধানের ক্ষেত্রেই তা কার্যকর হতে পারে। অন্যদিকে তাখসিস যৌক্তিকতা ও পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন প্রমাণের ভিত্তিতে গঠিত হতে পারে। অন্য কথায় কেবলমাত্র শরয়ী দ্বারা নাছ্খ গঠিত হতে পারে, অপরদিকে যৌক্তিকতা (আকল), প্রচলিত রীতিনীতি (উরফ) ও অন্যান্য যৌক্তিক দলিলের দ্বারা তাখসিস গঠিত হতে পারে। এরপর বলা যায় যে, তাখসিস (সাধারণত নির্দিষ্টকরণ ও সীমিতকরণ) কিয়াস ও বিচ্ছিন্ন হাদিসের মতো ধারণামূলক দলিলের সাহায্যে সংঘটিত হওয়া সম্ভব। কিন্তু নাছ্খ হতে হবে সুনির্দিষ্ট বিধানের দ্বারা তাহলো একটি কাতয়ী অন্য একটি কাতয়ী বিধান দ্বারা রহিত হতে পারে। অন্য কথায় ধারণামূলক বিধানের ক্ষেত্রে মৌলিকভাবে রহিতকরণের ঘটনা ঘটে না।[৩৭]

আগেই বলা হয়েছে যে, রহিতকারক (আল নাশিখ) বিধান যাকে রহিত করতে চায় তা তার চেয়ে পরবর্তী সময়ে সংঘটিত হয়। এ ক্রম উল্টো হলে নাছ্খ সংঘটিত হবে না। এমনকি দু'টি বিধান যদি একই সময়ের হয় তাহলে সে ক্ষেত্রেও নাছ্খ হবে না। কিন্তু তাখসিসের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো মত নেই। হানাফীদের মতে তাখসিসের ক্ষেত্রে 'আম'ও 'খাস' অবশ্যই হয় একই সময়ে অথবা সমান্তরাল সময়ে সংঘটিত হতে হবে। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে, 'আম' ও 'খাস' একে অপরের আগে বা পরে হতে পারে, এ ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট কালানুক্রম অনুসরণের কোনো দরকার নেই।

সর্বশেষে বলা যায়, কোনো ঘটনার (আখবার) বাস্তব বিবরণের ক্ষেত্রে নাছ্খ প্রযোজ্য হয় না। অন্যদিকে বাস্তব ঘটনার ক্ষেত্রে তাখসিস ঘটতে পারে, এভাবে খবরের বিবরণ নির্দিষ্ট বা সীমিত করা যেতে পারে, কিন্তু রহিত করা যেতে পারে না। বাস্তব বিবরণ সম্পর্কে রহিতকরণের কাছাকাছি ধারণা হলো তা অস্বীকার করা।

নাছ্খের ব্যাপারে আরেকটি বিষয় রয়েছে- তাহলো নাছ্খ বিরাজমান আয়াত বা রেওয়ায়েতের পরবর্তী সংযোজন (তাজইদ) কি না যা তার থেকে ভিন্ন হতে পারে এবং তাতে রহিতকরণ বুঝায় কি না। কোনো বিদ্যমান আইনের সাথে যখন নতুন বিষয় সংযোজন করা হয় তখন সংযুক্ত বিষয়টি নিম্নের দু'টি শ্রেণির যে কোনো একটির আওতায় পড়বে : (১) সংঘটিত বিষয় মূল আয়াত বা রেওয়ায়েতের থেকে স্বতন্ত্র কিন্তু একই বিষয় সংশ্লিষ্ট হতে পারে, যেমন- বর্তমান পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সাথে আরেক ওয়াক্ত, ষষ্ট ওয়াক্ত নামাজ সংযোজন করা। এতেই কি মূল বিধানের

www.pathagar.com

রহিতকরণ বুঝায়? এ প্রশ্নের জবাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম বলেছেন, না, তা বুঝায় না। তাদের মতে, নতুন বিষয় সংযোজনের কারণে বর্তমান বিধান বাতিল বুঝায় না বরং তাতে নতুন কোনো কিছু সংযোজিত হয়। (২) নতুন সংযোজন মূল বিধানের থেকে স্বতন্ত্র নাও হতে পারে, সে ক্ষেত্রে তা এমন কিছুর সাথে সম্পর্কিত হয় যা মূল বিধানের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ গঠন করে। এর কাল্পনিক উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে ফরজ নামাজের বর্তমান রাকাতের সাথে আরেকটি রাকাত বা সিজদার সাথে আরেকটি সিজদা যোগ করা। আরেকটি উদাহরণ হলো, রোজা ভঙ্গ করার কাফফারা হিসেবে একজন দাসমুক্ত করার বর্তমান বিধানের সাথে নতুন শর্ত হলো, ওই দাসকে মুসলমান হতে হবে। এ ধরনের নতুন সংযোজন কি বর্তমান বিধান রহিত হওয়া বুঝায়? এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, তবে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত হচ্ছে, তা রহিতকরণ বুঝায় না কারণ এতে মূল বিধানকে খারিজ করার চেষ্টা করা হয় না। হানাফীগণ অবশ্য মনে করেন যে, এ ধরনের সংযোজন রহিতকরণ বুঝায়। হানাফীগণ আইনগত মানসম্মত প্রমাণ হিসেবে দু'জন সাক্ষী থাকা সংক্রান্ত কুরআনের বিধান (সুরা বাকারা, ২ : ২৮২) একটি আহাদ হাদিসে রহিত হয়েছে বলে মনে করেন, ওই আহাদ হাদিসে দু'জন সাক্ষীর স্থলে একজন সাক্ষী ও একই সাথে এর দাবিদারের একবার শপথ গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়েছে। এখানে রহিতকরণ ঘটেনি। নতুন সংযোজন অবাস্তব হানাফীদের এ বিবেচনার কারণেই রহিতকরণ ঘটেনি তাই নয় বরং এ কারণে যে আহাদ হাদিস কুরআনের মুতাওয়াতিরকে রহিত করতে পারে না।[৩৮] সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমগণ একে রহিতকরণ বলে মনে করেন না কারণ দু'জন সাক্ষী রাখার কুরআনের বিধানের শর্ত অন্য পদ্ধতিতে প্রমাণ করার সম্ভাবনাকে রুদ্ধ করে দেয়নি, কেননা কুরআনের মূল বিধানে কোনো বাধ্যতামূলক আদেশ দেয়া হয়নি। তাই এতে বিকল্প পদ্ধতিতে সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণের সম্ভাবনা দ্বারা উন্মুক্ত রাখা হয়েছে।[৩৯]

নাছ্খের বিপক্ষে যুক্তি

আগে বলেছি যে, কুরআনের নাছ্খ সংঘটিত হওয়ার বিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আল সুয়ুতী তার গ্রন্থ ইতকান ফি 'উলুম আল কুরআন গ্রন্থে দাবি করেছেন যে, কুরআনে নাছ্খের একুশটি ঘটনা রয়েছে। শাহ ওয়ালী উল্লাহ (মৃত্যু : ১৭৬২) আল সুয়ুতীর একুশটির মধ্য থেকে মাত্র পাঁচটিকে যথার্থ নাছ্খ হিসেবে বহাল রাখেন। তবে তিনি বলেন, বাকিগুলোকে সমন্বিত করা সম্ভব।[৪০] অন্যদিকে আরেকজন বিশেষজ্ঞ আলেম আবু মুসলিম আল ইস্পাহানি (মৃত্যু : ৯৩৪) কুরআনে কোনো ধরনের নাছ্খ সংঘটিত হওয়ার বিষয় অস্বীকার করেছেন।[৪১] তৎসত্ত্বেও

www.pathagar.com

আলেমদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ খোদ কুরআনের কর্তৃত্বাধীনে কুরআনে নাছ্খ সংঘটিত হওয়ার বিষয়কে স্বীকার করেছেন। সংশ্লিষ্ট কুরআনের আয়াত থেকে আলেমগণ এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। অবশ্য এর বিরোধীরাও নাছ্খের বিরুদ্ধে পাল্টা যুক্তি পেশ করেছেন। যেসব আয়াতের ভিত্তিতে নাছখের সমর্থকরা তাদের যুক্তি তুলে ধরেন তাদের বিরোধীরাও তাদের দাবির সমর্থনে সেসব আয়াতই পেশ করেছেন। আয়াত দু'টি নিম্নে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন :

> তদাপেক্ষা আমরা যে আয়াত 'মুনসুখ' করি কিংবা ভুলিয়ে দেই উহার স্থলে উত্তম জিনিস পেশ করি কিংবা অন্তত অনুরূপ জিনিস এনে দেই [মা নানশাখ মিন আয়াতীন আও মুনসিহা না'তী বি-খাইরীন মিনহা ওয়া মিসলিহা] (সুরা বাকারা, ২ : ১০৬)।

আমরা অন্য (সুরা আল নাহলে ১৬ : ১০৬) দেখতে পাই :

> আমরা যখন এক আয়াতের স্থানে অন্য আয়াত নাজিল করি-আর আল্লাহ ভালোই জানেন যে, তিনি কী নাজিল করেন-(ওয়া ইয়া যাছালনা যায়ানান মাকুনা আয়াতিন ওয়াল্লাহু আয়লান বাইনা ইউনাজ্জিল)।

অনেক মুফাচ্ছির মনে করেন যে, উপরিউক্ত আয়াতের 'আইয়াহ' শব্দ দ্বারা কুরআনের অন্য আয়াতকে বুঝানো হয়নি বরং তাওরাত ও ইঞ্জিলসহ পূর্বেকার কিতাবকে বুঝানো হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের এ ধরনের ব্যাখ্যা প্রদান করলে কুরআনে নাছ্খ সংঘটিত হওয়ার বিষয় অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বে। কুরআনের মুফাসসির ও মুতাজিলা বিশেষজ্ঞ আবু মুসলিম আল ইস্পাহানি-তার তাফসিরে (আল যামি আল তাবিল) এমত ব্যক্ত করেছেন যে, কুরআনের তথাকথিত নাছ্খ বা রহিতকরণের কার্যকারিতা সীমিতকরণ একটি আয়াত দ্বারা অন্য একটি আয়াতের তাখসিস বৈ কিছু নয়।[৪২] আল ইস্পাহানির মতে, এসব আয়াতের 'আয়াত' শব্দ কুরআনের কোনো অংশ নয় বরং 'অলৌকিক নিদর্শন।' এভাবে অর্থ করা হলে উপরে উদ্ধৃত দু'টি আয়াতের প্রথমটির অর্থ দাঁড়াবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রত্যেক নবিকে অলৌকিক ক্ষমতা দিয়েছেন কেউ যার অধিকারী হয়নি। আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রত্যেক নবিকে উচ্চতর অলৌকিকতা দান করেছেন, তাদের একজন অন্যজনের চেয়ে উত্তম। আল ইস্পাহানি আয়াতটির এ অর্থ যে সঠিক তার সমর্থনে আয়াতটির (সুরা বাকারায় ২ : ১০৬) পরবর্তী অংশ উল্লেখ করেছেন : 'তোমরা কি জানো আল্লাহই সর্বশক্তিমান' (আলা কুল্লি সাইয়িন কাদির)। এভাবে এখানে আয়াতের একটি দ্বারা অন্যটি রহিত হওয়া নয় বরং অলৌকিক বিষয়ের প্রেক্ষাপটের সঙ্গে আল্লাহর বিশেষ গুণকে অধিকতর সঠিকভাবে সম্পর্কিত করা হয়েছে। একই রুকুর

www.pathagar.com

অন্য আয়াতের (২ : ১০৮) একাংশে এ ব্যাখ্যার সমর্থন দেখতে পাওয়া যায়, তাতে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে : 'তোমরা কি তোমাদের নবির কাছে সেই ধরনের দাবি ও প্রশ্ন পেশ করতে চাও, যেমন ইতঃপূর্বে মুসার কাছে করা হয়েছে?' এরপর এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, বনী ইসরাইল মুসাকে প্রকৃত অর্থে তার অলৌকিকত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল, রহিতকরণ সম্পর্কে নয়।[৪৩] দ্বিতীয় আয়াতে (সুরা নাহল, ১৬ : ১০১) 'আয়াহ' শব্দের অর্থও অলৌকিক। আদতে আয়াহ শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো নিদর্শন বা ইশারা এবং অলৌকিকত্বও একটি নিদর্শন। আল ইস্পাহানি আরো যুক্তি দেন, নাছ্খ হলো ইবতালের সমার্থক, যার অর্থ হলো প্রতারণামূলক পরিবর্তন বা কোনো কিছুকে বাতিল বলে গণ্য করা এবং এ ধরনের ইবতালের স্থান যে কুরআনে নেই তা আমরা কুরআন থেকেই জানতে পেরেছি। সুরা হা-মীম-এ (৪০ : ৪২) বলা হয়েছে : 'বাতিল যা সামনের দিক থেকে এর (কিতাব) ওপর আসতে পারে না, না পেছন হতে (লা ইয়াতীহি আল বাতিল মিন বায়ান ইয়াদাইহি ওয়ালা মিন খালফিহ)। এর জবাবে অবশ্য এ কথা বলা হয়েছে যে, নাছ্খ ও ইবতাল এক জিনিস নয়। কেননা নাছ্খ কার্যত কোনো আয়াতের বিধানকে স্থগিতকরণ বুঝায় এবং আয়াতের শব্দগুলো প্রায় বহাল থাকে এবং তা বাতিল হয় না।[৪৪]

আল ইস্পাহানি তার ব্যাখ্যায় আর যে দু'টি বিষয় সংযুক্ত করেছেন তাহলো, আলোচ্য আয়াত দু'টি রহিতকরণ বুঝায় বলে ধরে নিলেও তা প্রকৃতপক্ষে নাছ্খ সংঘটিত হওয়াকে নিশ্চিত করছে না বরং নিছক তার সম্ভাবনাকে নির্দেশ করছে এবং এ দুইয়ের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। সবশেষে আল ইস্পাহানি মনে করেন যে, কুরআনে বিরোধপূর্ণ বিষয়ের যে দৃষ্টান্ত দেখা যায় তা প্রকৃত নয়, বাহ্যত এবং তার সমন্বয় সাধন ও দূর করা সম্ভব। একই সাথে তিনি আরো বলেন, এটি হলো শরিয়াহর একমাত্র যুক্তি যার অর্থ হচ্ছে সার্বক্ষণিক; অন্যভাবে এ কথা বলা যে তা রহিতকরণের জন্য উন্মুক্ত নয়।[৪৫]

নাছ্খ তত্ত্ব খণ্ডন করে দিয়ে আল ইস্পাহানি যে মন্তব্য করেছেন তার ব্যাখ্যা দেয়ার পরও এ কথা বলা দরকার যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমরা মনে করেন যে, কুরআনে নাছ্খের ঘটনা হচ্ছে একটি প্রমাণিত বিষয়। তবে এ ধরনের ঘটনা যতটি ঘটেছে বলে প্রায়ই দাবি করা হয় আসলে ততটি ঘটেনি। নাছ্খের সমর্থকরা বলেন যে, কুরআনে নাছ্খের ঘটনা প্রমাণিত বিষয়, কেবল কুরআন নয়-চূড়ান্ত ইজমাতেও তা প্রমাণিত হয়েছে। কখনো কোনো ইজমা সঠিকভাবে সম্পন্ন হলে পরবর্তীকালের লোকদের ভিন্নমতের কারণে তা অকার্যকর হবে না।[৪৬] আল ইস্পাহানির মতো ভিন্ন মতকে দৃশ্যত এরই আলোকে বিচার ও উপেক্ষা করতে হবে।

www.pathagar.com

আবদুল হামিদ আবু সোলায়মান তার গ্রন্থ The Islamic Theory of International Relations : New Directions For Islamic Methodology and Thought-এ নাছ্খ-এর সনাতন দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করেছেন এবং তিনি আইনগত দিকের নয় বরং পদ্ধতিগত ও ধারণাগত দিকের ভিত্তিতে নাছ্খ অনুধাবনে একটি নতুন ও ব্যাপকভিত্তিক পদ্ধতি গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। (আবু সোলায়মান মূলত অভিসন্দর্ভ হিসেবে বইটি রচনা করেন)।[৪৭]

লেখকের মতে, নাছ্খের সনাতনী বিবরণ অনাবশ্যকীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণমূলক কারণ তা 'সমৃদ্ধ ইসলামি ও কুরআনের অভিজ্ঞতাকে' সংকীর্ণ পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে। এ ছাড়া কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাতে অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি করার দৃষ্টান্তও রয়েছে।[৪৮]

লেখকের মতে, প্রাথমিকভাবে নাছ্খ হচ্ছে আইন সংক্রান্ত নয় বরং ঐতিহাসিক ঘটনা এবং সে প্রেক্ষাপটেই তাকে অনুধাবন করা উচিত। সরাসরি কুরআন ও হাদিসের দলিলের মাধ্যমে নাছ্খের বৈধতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে যাওয়া ফকিহদের জন্য কঠিন হওয়ার একটি আংশিক কারণ হচ্ছে এটি। তিনি আরো যুক্তি দেন যে, নিম্নে উল্লেখিত উদাহরণে তরবারির আয়াতের ঘটনা ঐতিহাসিক এবং তৎকালীন মুসলিম-অমুসলিম সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিরাজমান পরিস্থিতির দ্বারা তা অনেকাংশে নির্দেশিত হয়েছে। আলেমগণ এখন ওই ঐতিহাসিক পরিস্থিতির আলোকে নাছ্খ উপলব্ধি করার পরিবর্তে স্থায়ী বৈধতার আইনগত মূলনীতির প্রতি মনোনিবেশ করেছেন। স্থায়ী নাছ্খের এ সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গিতে স্পষ্টত স্থান-কালের উপাদান রয়েছে তা যদি বিবেচনা করা হয় তাহলে কেবল ওই সব পরিস্থিতির ক্ষেত্রেই নাছ্খের প্রয়োগকে সীমাবদ্ধ করবে।[৪৯]

অবশ্য এভাবে নাছ্খের ব্যাপক কাটছাঁট করা হলে কুরআনের একটা বড় অংশ অকার্যকর হয়ে পড়বে। এটি সুনির্দিষ্টভাবে তরবারির আয়াতের (আয়াত আল সাইফ) ঘটনা। আয়াতটির সংশ্লিষ্ট অংশে বলা হয়েছে : 'আর মুশরিকদের সাথে সকলে মিলে লড়াই কর, যেমন করে তারা সকলে মিলে তোমাদের সাথে লড়াই করছে। আর জেনে রাখ আল্লাহ তায়ালা মুত্তাকী লোকদের সঙ্গেই রয়েছেন' (সুরা তাওবা, ৯ : ৩৬)। অমুসলিমদের সাথে বিদ্যমান বৈরী সম্পর্কের ধরনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অনেক ফকিহ আয়াতটির ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছেন এবং তারা দাবি করেছেন যে, এ আয়াত সবর, সহনশীলতা ও অন্যদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সংক্রান্ত পূর্বেকার সব আয়াতকে রহিত করেছে।[৫০] এর ফলে ঠিক কতটি আয়াত রহিত হবে সে ব্যাপারে ফকিহগণ একমত নন। মোস্তফা আবু জায়েদ দেখতে পেয়েছেন যে, তরবারির আয়াত কুরআনের

www.pathagar.com

অন্তত ১৪০টি আয়াতকে রহিত করেছে।[৫১] যেসব ফকিহ্ জিহাদের আক্রমণাত্মক দিকগুলোর ওপর জোর দিতে চান তারা এভাবে বিপুলসংখ্যক আয়াতকে রহিত করার মাধ্যমে তা করতে পারেন এবং এর এভাবে রহিতকরণের ব্যবহারের ব্যাপারে আবু সোলায়মান আপত্তি জানিয়ে বলেছেন, এতে কুরআনের অভিজ্ঞতা সংকীর্ণ হয়ে পড়বে।[৫২] এবং এর শিক্ষার সম অধিকারের দিকগুলো ক্ষুণ্ন হবে। কুরআনের বহু আয়াতে শান্তি, সহমর্মিতা, ক্ষমা এবং নমনীয়তা, বিনয়, ধৈর্য ও সহনশীলতার মতো বিভিন্ন নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশের আহ্বান জানানো হয়েছে যার সুযোগকে কেবলমাত্র মুসলিমদের মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখতে বলা হয়নি।

আল জুহাইলির মতো দ্বিতীয় হিজরির মুসলিম ফকিহ্গণ আমাদের জানিয়েছেন যে, তারা অমুসলিমদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে যুদ্ধকে ব্যতিক্রমী ঘটনা নয় বরং সাধারণ নিয়ম হিসেবে বিবেচনা করতেন এবং নাছ্খের প্রয়োগের ক্ষেত্রে কতিপয় অতিরঞ্জনের মাধ্যমে তারা আংশিকভাবে এটি করতে সক্ষম হন। এ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের পেছনে কারণ ছিল ইসলামকে রক্ষায় যুদ্ধের জন্য সার্বক্ষণিক প্রস্তুতি বজায় রাখা। তৎকালীন বিরাজমান পরিস্থিতিতে এমনটি করা প্রয়োজন ছিল।[৫৩] এ ধরনের পরিস্থিতিতে শত্রুর মুখোমুখি অবস্থানকারী মুসলমানদের মনোবল জোরদারের একটি উপায় হিসেবে নাছ্খের ব্যবহার করার বিষয়টি উপলব্ধি করা কঠিন কিছু নয়।[৫৪]

আরো বলা যেতে পারে যে, আল জুহাইলির বর্ণনা মতে, অমুসলমানদের সাথে স্থায়ী সম্পর্কের ধরনের ক্ষেত্রে প্রাচীন ফকিহ্গণের অবস্থানে যুদ্ধের যে বৈশিষ্ট্যের কথা ব্যক্ত করা হয়েছে তা কারোর জন্য বাধ্যতামূলক নয় এবং তা কুরআন ও সুন্নাহ্র ভারসাম্যপূর্ণ দলিল দ্বারা সমর্থিত নয়।[৫৫]

তাই আবু সোলায়মান আমাদেরকে যে কথা বলেছেন তা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছেন, 'নাছ্খের ধারণাকে তার সঠিক প্রেক্ষাপটে পুনঃস্থাপন এবং জেরুসালেম থেকে কা'বার দিকে কেবলা পরিবর্তনের মতো সুস্পষ্ট বিষয়ের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। অবশিষ্ট সব ক্ষেত্রে ইসলামের বিধিবিধান ও শিক্ষা বৈধ ও সীমাহীনভাবে প্রয়োগযোগ্য; কেননা কুরআন-সুন্নাহ্ যে ব্যাপকভিত্তিক মূল্যবোধ ও লক্ষ্যকে সমুন্নত করেছে তারই আলোকে তা মানবজাতির প্রয়োজন পূরণ ও কল্যাণ সাধনের জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে।[৫৬]

www.pathagar.com

টিকা

১. গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৯; আমিদী, ইহকাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০২; Hitu, qajiz, পৃষ্ঠা ২৪১।

২. বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৪৪২।

৩. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ২২২; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ১৪৮।

৪. শাতিবী, মুওয়াফাকাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৩; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৪৪৭।

৫. তাজ, সিয়াসাহ, পৃষ্ঠা ১৪।

৬. বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৪৫৮।

৭. আমিদী, ইহকাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬১; তাজ, সিয়াসাহ, পৃষ্ঠা ২৮।

৮. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ২২৮।

৯. বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৪৫৯।

১০. আমিদী, ইহকাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬৩; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৪৫৯।

১১. শাফেয়ী, রিসালাহ, পৃষ্ঠা ১০৩; আবু জাহরাহ, উসুল, ১৪৮।

১২. গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৩; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৪৫৫।

১৩. গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭২।

১৪. বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৪৫৪; Hitu, Wajiz, পৃষ্ঠা ২৪৪।

১৫. আবু দাউদ, সুনান, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭০১, হাদিস নম্বর ২৫২৬; আবু জাহরাহ, উসুল, ১৫০।

১৬. শাফেয়ী, রিসালাহ, পৃষ্ঠা ৫৪; আমিদী, ইহকাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪৬।

১৭. Hitu, qajiz, পৃষ্ঠা ২৪৪; খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ২২৩।

১৮. তাবরিজী, মিশকাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫২, হাদিস নম্বর ১৭৬২; মুসলিম, সহিহ, পৃষ্ঠা ৩৪০।

১৯. গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৩; আমিদী, ইহকাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮১।

২০. কুরআনে স্পষ্ট নাছখের আরেকটি উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায় সুরা আনফালের (৮ : ৬৫-৬৬) আয়াতে যেখানে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য মুসলমানদের উৎসাহিত করা হয়েছে। এ আয়াতে বলা হয়েছে : 'তোমাদের মধ্যে বিশজন সবরকারী থাকলে ২০০ জনের ওপর বিজয়ী হবে। আর যদি এমনি ধরনের ১০০ জন থাকে তা হলে তারা সত্য অস্বীকারকারীদের মধ্য থেকে এক হাজার জনের ওপর বিজয়ী হবে।' পরবর্তী আয়াতে নিম্নরূপে পর্যালোচনা করা হয়েছে : 'এখন আল্লাহ তোমাদের বোঝা লাঘব করে দিয়েছেন [...] কাজেই যদি তোমাদের মধ্যে ১০০ জন সবরকারী হয় তাহলে তারা ২০০ জনের ওপর এবং এক হাজার লোক এমনি পর্যায়ে হলে তারা দুই হাজার লোকের ওপর আল্লাহর হুকুমে বিজয়ী হবে।'

www.pathagar.com

২১. শাফেয়ী তার গ্রন্থে (রিসালাহ্) এ মত ব্যক্ত করেন যে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আয়াত দ্বারা অসিয়ত সম্পর্কিত আয়াত রহিতকরণের বিষয়টি কেবল একটি সম্ভাবনা মাত্র। তবে তিনি আরো বলেন যে আলেমগণ মনে করেন যে উত্তরাধিকার সম্পর্কিত আয়াত অসিয়তবিষয়ক আয়াতকে রহিত করেছে। একই পৃষ্ঠায় শাফেয়ী একটি হাদিস উদ্ধৃত করেছেন যাতে বলা হয়েছে যে 'উত্তরাধিকারীদের জন্য কোনো অসিয়ত করা যাবে না।' এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে তার দৃষ্টিতে বৈধ উত্তরাধিকারীদের জন্য অসিয়ত রহিতকরণ হচ্ছে কুরআনের একটি সম্ভাবনা, যা এ হাদিস ও এ বিষয়ে অন্যান্য হাদিস দ্বারা নিশ্চিত ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

২২. শাফেয়ী, রিসালাহ্, পৃষ্ঠা ৬৯; আবু দাউদ, সুনান, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮০৮, হাদিস নম্বর ২৮৬৪; খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ২২৪।

২৩. শাফেয়ী, রিসালাহ্, পৃষ্ঠা ৭২; খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ২২৭।

২৪. আমিদী, ইহকাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪১।

২৫. গাজ্জালী ও আমিদী উভয়ে আরবি বিবৃতি 'আল শায়খু ওয়াল শায়খাতু ইযা জানাইয়া ফারযুমুহুমা আলবাত্তাতাস নাকালান মিনাল্লাহ' (গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮০; আমিদী, ইহকাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪১) উদ্ধৃত করেছেন। অপরদিকে 'ওমর ইবনে খাত্তাব রা.-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে যে তিনি বলেছেন, লোকেরা বলবে যে 'ওমর কুরআনে এ কথা যোগ করেছে, এ ভয় যদি না থাকতো তাহলে আমি এ বিবৃতি কুরআনে যোগ করতাম।'

২৬. আমিদী, ইহকাম, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫৪; গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮০; Denffer, 'Ulum, পৃষ্ঠা ১০৮।

২৭. Hitu, Wajiz, পৃষ্ঠা ২৫২; Qadri, Islamic Jurisprudence, পৃষ্ঠা ২৩০।

২৮. একই গ্রন্থ।

২৯. আমিদী, ইহকাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫৩।

৩০. শাফেয়ী, রিসালাহ্, পৃষ্ঠা ৫৪; আমিদী, ইহকাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫৬।

৩১. শাফেয়ী, রিসালাহ্, পৃষ্ঠা ৫৪।

৩২. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১৭৭; গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮১।

৩৩. শাফেয়ী, রিসালাহ্, পৃষ্ঠা ১০২।

৩৪. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৫৭-৫৮। সুন্নাহ্ থেকে সরে যাওয়ার আশঙ্কায় শাফেয়ী সম্ভবত এ কথা ভেবেছিলেন যে কুরআন ও সুন্নাহ্র মধ্যকার সম্ভাব্য বিরোধের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কালানুক্রম নির্ধারণ করা হলে সন্দেহের সৃষ্টি হবে। আর যেহেতু কুরআন নির্ভুল সেহেতু এ ধরনের যে কোনো সন্দেহের ক্ষেত্রে কুরআনের চেয়ে সুন্নাহ্র উপেক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

www.pathagar.com

৩৫. গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮১; আরো দেখুন, আমিদী, ইহকাম, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫০।

৩৬. গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭১; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৪৫২।

৩৭. আমিদী, ইহকাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১৩; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৪৫৩।

৩৮. আমিদী, ইহকাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭০; Hitu, Wajiz, পৃষ্ঠা ২৫৬।

৩৯. আমিদী, ইহকাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭৫; Hitu, Wajiz, পৃষ্ঠা ২৫৭।

৪০. সুবহী আল সালিহ এ অভিমত প্রকাশ করেন যে কুরআনের একুশটি নছখের যে দৃষ্টান্ত আল সুয়ুতী দিয়েছেন তার মধ্যে দশটি যথার্থ এবং এর বাকি সবগুলোর সমম্বয় করা সম্ভব, (মাবাহিস, পৃষ্ঠা ২৮০)।

৪১. আবু জাহরাহ, উসুল, ১৫৫; Denffer, 'Ulum, পৃষ্ঠা ১১০।

৪২. সুবহী আল সালিহ, মাবাহিস, পৃষ্ঠা ২৭৪।

৪৩. আমিদী, ইহকাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২০।

৪৪. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১২৪।

৪৫. আবু জাহরাহ, উসুল, ১৫৫; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৪৪৮।

৪৬. গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭২।

৪৭. আবু সুলায়মান, The Islamic Theory, পৃষ্ঠা ৮৪।

৪৮. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১০৭।

৪৯. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৭৩।

৫০. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৩৬।

৫১. আবু জায়েদ, আল নাছিখ ওয়া আল মানছুখ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮৯ ও ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫০৩।

৫২. আবু সুলায়মান, The Islamic Theory, পৃষ্ঠা ৩৬।

৫৩. ওয়াহাব আল জুহাইলী, আসার আল হারব, পৃষ্ঠা ১৩০।

৫৪. আবু সুলায়মান, The Islamic Theory, পৃষ্ঠা ৭৪।

৫৫. ওয়াহাব আল জুহাইলী, আসার আল হারব, পৃষ্ঠা ১৩৫।

৫৬. আবু সুলায়মান, The Islamic Theory, পৃষ্ঠা ১০৭; তুলনীয়, James Piscatori কর্তৃক Journal of the Muslim Minority Affairs, 10.2 (জুলাই, ১৯৮৯) এ তার গ্রন্থের পর্যালোচনা, পৃষ্ঠা ৫৪২-৪৩

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

ইজমা বা বিশেষজ্ঞদের ঐকমত্য

শুরুতেই এ কথাটি অবশ্যই বলা দরকার যে, কুরআন-সুন্নাহ্‌র মতো ইজমা খোদায়ী বাণীর সরাসরি কোনো অংশ নয়। শরিয়াহর একটি নীতি ও প্রমাণ হিসেবে ইজমা মূলত একটি যৌক্তিক দলিল। তবে ইজমার তত্ত্বে এ বিষয়টিও স্পষ্ট করা হয়েছে যে এটি হচ্ছে একটি বাধ্যবাধকতামূলক দলিল। তাই ইজমাকে যে ধরনের উচ্চমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা হয়েছে তার দাবি হচ্ছে- একমাত্র নিরঙ্কুশ ও সার্বজনীন মতৈক্য। কিন্তু ইজমার যৌক্তিকতার বিষয়ে নিরঙ্কুশ মতৈক্য অর্জন প্রায় কঠিন হয়ে থাকে। আপেক্ষিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইজমাকে একটি বাস্তবতা ও গ্রহণযোগ্য ধারণা হিসেবে গ্রহণ করা কেবল স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত; কিন্তু বাস্তব তথ্য-প্রমাণ ইজমার সার্বজনীনতাকে প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। উসুলের আলেমদের প্রদত্ত ইজমার সনাতনী সংজ্ঞা ও অপরিহার্য শর্তাবলিতে এ বিষয়টি দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুসলিম উম্মাহর ফকিহগণের সার্বজনীন ঐকমত্যে পৌছার কম কিছুকেই সার্বিকভাবে চূড়ান্ত ইজমা হিসেবে গণ্য করা হবে না। তাই দেখা যাচ্ছে যে, ইজমার ধারণার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের ইকতেলাফ বা মতানৈক্য প্রকাশের অবকাশ নেই। ইজমার মতবাদে একইভাবে ফকিহগণের আপেক্ষিকতার ধারণাও অথবা সংখ্যাধিক্যের মতৈক্যের ধারণাও অগ্রহণযোগ্য।

সার্বজনীন ইজমার ধারণা সম্ভবত বিচারিক বিষয়ে পূর্ণ মতৈক্য অর্জন নয় বরং উম্মাহর রাজনৈতিক ঐক্য এবং ইমান ও তাওহিদের ব্যাপারে তাদের মধ্যে ঐক্যের আদর্শে অনুপ্রাণীত হয়ে গ্রহণ করা হয়েছে। নির্দিষ্ট বিষয়গুলো, বিশেষ করে ইজতিহাদের জন্য উন্মুক্ত বিষয়গুলোর ওপর ইজমার তথ্য-প্রমাণ থেকে দেখা যায় যে, এগুলোকে প্রমাণ করা অত্যন্ত কঠিন। এভাবে ইজমার তত্ত্ব ও বাস্তবতার মধ্যে ব্যবধান এ মতবাদের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে রয়েছে। শাফেয়ীর মতে, সার্বজনীন ইজমা থাকলে তা হচ্ছে ফরজ বিষয়সমূহে, যেমন-ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ ও এরূপ অন্যান্য বিষয় এবং এগুলোর ব্যাপারে কুরআন সুন্নাহ্‌র দ্ব্যর্থহীন ও চূড়ান্ত বিধান রয়েছে। অবশ্য যখন কেউ এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, কুরআন সুন্নাহ্‌র চূড়ান্ত বিধানের ক্ষেত্রে অনাবশ্যকীয়ভাবে ইজমা গ্রহণ করা হয়েছে, সে ক্ষেত্রে এ ধরনের পর্যবেক্ষণের দুর্বলতার দিকটি সহজে দৃষ্টিগোচর হয়।

শরিয়তকে প্রায়ই 'বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য' বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। সাধারণ দৃষ্টিতে এটি সঠিক। তাই দেখা যায় যে, আহকামের জরুরি ও ব্যাপকভিত্তিক রূপরেখার মধ্যে ঐক্য রয়েছে; কিন্তু ফকিহদের বিস্তারিত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে এমন

www.pathagar.com

কথা বলা যায় না। তবে এ কথা আবার বলা যায় যে, সর্বজনস্বীকৃত সত্য হলো ফকিহগণের পারস্পরিক অথবা বিভিন্ন মাজহাবের মধ্যকার ইখতিলাফ হচ্ছে একই পবিত্র ইচ্ছার ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। অতএব একে একটি অত্যাবশ্যকীয় ঐক্য হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। কিন্তু 'ইজতিহাদী' বিষয়ে সার্বজনীন ঐকমত্যের প্রত্যাশা করা অবাস্তব, বিশিষ্ট বহু আলেম এ বিষয়টির স্বীকৃতি দিয়েছেন।

ইজমার তত্ত্ব ও বাস্তব প্রয়োগের মধ্যে ব্যবধানে যে পরিস্থিতির প্রতিফলন ঘটেছে তাতে এর তাত্ত্বিক শর্তগুলো বাস্তবায়নে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। অনেক ফকিহ এ কথা স্বীকার করেছেন যে ইজমার সনাতনী সংজ্ঞা নিরঙ্কুশ শর্তাবলি চূড়ান্ত বাস্তব প্রমাণের দ্বারা সব পর্যায়ে ইখতিলাফ পুরোপুরি দূর করা সম্ভব নয়। ইজমা প্রায়ই কোনো বিধানের ব্যাপারে যে ঐকমত্যের দাবি করে তা কেবলমাত্র বিশেষ মাজহাবের ভেতরে বা তার বাইরে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতৈক্য। অন্যদিকে নির্ভরযোগ্য সনদের মাধ্যমে হাদিসের যথার্থতা নিরূপণের জন্য যে ধরনের গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছিল ইজমার প্রমাণ ও যথার্থতার ক্ষেত্রে সে ধরনের দৃষ্টি দেয়া হয়নি। কেবলমাত্র এক প্রকার ইজমাকে সমুন্নত করা হয়েছে তা হলো রসুল সা.-এর সাহাবিগণের রা. ইজমা। এটি করা হয়েছে অংশত তাদের বিশেষ মর্যাদার কারণে, তারা এতে অংশ নেন ও তাদের সর্বসম্মত মতৈক্য ছিল, সব সময় এ কারণে নয়। এ সূচনা বক্তব্যের পর আমরা ইজমার অর্থ ও সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করব এবং এরপর আমরা যেসব বিষয় উত্থাপন করেছি তার কয়েকটি নিয়ে আলোচনা করতে চাই।

ইজমা হচ্ছে আরবি শব্দ 'আজমায়া'র ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য; এর দু'টি অর্থ রয়েছে : নির্ধারণ করা বা কোনো কিছুর ওপর একমত হওয়া। পূর্বেরটির একটি উদাহরণ হলো-

ইজমা এভাবে প্রকাশ করা হয়, 'আ ফুলান আলা কাদহা' যার অর্থ হলো, অমুক অমুক এমন কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কুরআন ও হাদিস উভয় সূত্রে ইজমার এ ধরনের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়।[১] 'আজমায়া'র অপর অর্থ হলো, 'সর্বসম্মত মতৈক্য। যেহেতু শব্দগুচ্ছ আজমায়া' আল কাউম আলা কাদহার অর্থ হচ্ছে, অমুক অমুক বিষয়ে লোকেরা সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে।' ইজমার দ্বিতীয় অর্থ প্রায়ই প্রথমটির আওতাধীন হয়। সে ক্ষেত্রে কোনো বিষয়ে সর্বসম্মত মতৈক্য হলে ওই বিষয়ে সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়।

রসুল সা.-এর ওফাতের পর যে কোনো যুগে যে কোনো বিষয়ে মুসলিম মুজতাহিদগণের সর্বসম্মত মতৈক্যকে ইজমা বলা হয়।[২] এ সংজ্ঞায় মুজতাহিদদের উল্লেখের মাধ্যমে সাধারণের মতৈক্যকে ইজমার আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। অনুরূপভাবে কোনো যুগের মুজতাহিদদের কথা উল্লেখের মাধ্যমে একটা সময়কে

www.pathagar.com

বুঝানো হয়েছে যাতে ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সময় বেশ কয়েকজন মুজতাহিদ বর্তমান ছিলেন। তাই দেখা যাচ্ছে যে ঘটনা সংঘটিত হয়ে যাওয়ার পরে কেবল এক বা একাধিক মুজতাহিদকে যদি পাওয়া যায় তাতে কোনো লাভ নেই। সংজ্ঞায় উল্লেখিত ইজমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিষয়ের মধ্যে থাকবে সব ধরনের বিচারিক (শারয়ী), বুদ্ধিবৃত্তিক (আকলী), প্রচলিত রীতিনীতি (উরফ) ও ভাষাগত (লাগভি) বিষয়।[৩] উপরন্তু এ প্রেক্ষাপটে কেবল শারয়ী -এর বৈপরিত্য বুঝাতে 'হিস্সী' ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ যেসব বিষয় ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য হবে তা ইজমার পরিধির আওতায় পড়বে না। কিছু সংখ্যক আলেম ইজমাকে ধর্মীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখতে চান। আর কিছু আলেম শারয়ী বিষয়ের ক্ষেত্রে রাখতে চান। কিন্তু আলেমদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এর কোনোটির ক্ষেত্রে ইজমাকে সীমাবদ্ধ করেননি। তারা মনে করেন যে, যুক্তিনির্ভর নয় এমন অলঙ্ঘনীয় বিশ্বাসের বিষয় (ইতিকাদিয়াত) ইজমার আওতার মধ্যে পড়বে। তাদের কেউ কেউ এমত প্রকাশ করেছেন যে, আল্লাহ্ তায়ালার অস্তিত্ব অথবা রসুল সা.-এর নবুওয়তের সত্যতার মতো বিষয়ের সমর্থনে ইজমা অবলম্বন করা যাবে না। এর কারণ হলো খোদ ইজমা হচ্ছে এসব বিশ্বাসের অনুসৃতি। উম্মাহর অভ্রান্তির সত্তুতা (ইসমাহ) সংক্রান্ত নুসুস থেকে ইজমার বৈধতার বিষয় গ্রহণ করা হয়েছে। এর বিনিময়ে এসব নুসুস আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব ও মুহাম্মদ সা.-এর নবুওয়াতের গ্যারান্টি দেয়া হয়েছে। কেউ যদি এসব মতবাদের সমর্থনে ইজমার উল্লেখ করতে চেষ্টা করে তাহলে তা হবে ঘুরিয়ে কথা বলার শামিল। এ বিষয়টি আরো পরিষ্কার করতে এ কথা বলা যায় যে, কুরআন সুন্নাহ্‌র দ্বারা প্রমাণিত করতে পারে না, কারণ সুন্নাহ্ হচ্ছে কুরআনের অনুসৃতি।[৪] বাস্তব ধরনের যেসব বিষয় তাশরির (আইন) প্রকৃতির মতো অংশীদার নয় তা ইজমার উপযোগী বিষয় গঠন করে না। এর উদাহরণ হলো, সিরিয়া অথবা পারস্যে সৈন্য পাঠানোর বিষয়ে সাহাবিগণের রা. মতৈক্য অথবা সরকারের কতিপয় দফতর গঠনের বিষয় তাদের মতৈক্য ইত্যাদি ইজমা গঠন করে না। কারণ এগুলো বাস্তব সিদ্ধান্ত যা নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে বৈধ ছিল এবং মুসলিমদের পরবর্তী বংশধরদের জন্য তা বাধ্যতামূলক নয়। অন্যদিকে শারয়ী বিধানের ওপর ইজমা হচ্ছে স্থায়ী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এবং সময়সীমার আবেষ্টনীতে তা সীমাবদ্ধ নয়।[৫]

তাত্ত্বিকভাবে ইজমার বিষয়বস্তুর ওপর অবশ্য কোনোরূপ বিধিনিষেধ আরোপকে অস্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে ইজমার প্রয়োগে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছুটা আপত্তি রয়েছে। উদাহরণ হলো- যৌক্তিক ও ভাষাগত ক্ষেত্রে ইজমার প্রয়োগ অবশ্যই কিছুটা সীমিত হবে। এ কথা বলা যায়, মিথ্যা বলা পাপ এবং 'হাত' অর্থ ক্ষমতাও বুঝায় এবং এগুলোর সমর্থনে ইজমার কোনো দরকার নেই। প্রকৃত অর্থে ইজমা তার বিষয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে সবসময়ই নৈর্বাচনিক। সম্ভবত

www.pathagar.com

ইজমার গতিশীল প্রকৃতি এবং অভ্রান্তি সম্ভ্রতার দৃষ্টিকোণ থেকে আলেমগণ এর পরিধির ক্ষেত্রে আগাম কোনো আপত্তি না করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন।

সংজ্ঞা থেকে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, রসুল সা.-এর ওফাতের পরই কেবল ইজমা গঠন সম্ভব হয়েছে। জীবদ্দশায় রসুল সা. ছিলেন শরিয়াহর সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। তাই কারোর মতৈক্য বা মতপার্থক্য রসুল সা.-এর সর্বসময় কর্তৃত্বের কোনোরূপ বিঘ্নিত করতে পারত না। খুব সম্ভব মদিনার সাহাবিগণের রা. মধ্যে সর্বপ্রথম ইজমা সংগঠিত হয়। রসুল সা.-এর মৃত্যুর পর বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিলে সাহাবিগণ রা. তা নিয়ে পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করতেন এবং তাদের সামষ্টিক মতৈক্য মুসলিম সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য হতো। সাহাবিদের রা. পর নেতৃত্বের এ ভূমিকার দায়িত্ব বর্তায় তাদের পরবর্তী বংশধর তাবেয়ীদের (বহুবচন, তাবীউন) ওপর। অতঃপর তৎপরবর্তী বংশধর দ্বিতীয় প্রজন্ম অর্থাৎ তাবে তাবেয়ীদের ওপর। যখন তাদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিতো তখন তারা স্বাভাবিকভাবে সাহাবি রা. ও তাবেয়ীদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আমলের কথা উল্লেখ করতেন। এভাবে ইজমা তত্ত্ব উদ্ভাবনের একটি উর্বর ক্ষেত্র তৈরি হয়।[৬] ইজমার মূলকথা হচ্ছে মতামতের স্বাভাবিক বিকাশ। প্রত্যেক ফকিহর ব্যক্তিগত ইজতিহাদের মাধ্যমে এর সূচনা হয় এবং একটি বিশেষ মতবাদ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। ঐকমত্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত ভিন্ন মতকে মেনে নেয়া হয় এবং এ প্রক্রিয়ায় জোরজবরদস্তি করা অথবা মুসলিম সমাজের ওপর কোনো মত চাপিয়ে দেয়ার কোনো সুযোগ নেই।

শরিয়াহর বিকাশে ইজমা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ফিকাহ শাস্ত্রের বর্তমান রূপটি হচ্ছে ইজতিহাদ ও ইজমার দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ফসল। যেহেতু সমাজ জীবনের বিভিন্ন মতের স্বাভাবিক বিবর্তন ও গ্রহণের বিষয় ইজমাতে প্রতিফলিত হয় সেহেতু ইজমার মূল চেতনা কখনই বন্ধ হতে পারে না বলে প্রত্যাশা করা যায়। ইসলামের আগমনের পরবর্তী তিনটি প্রজন্মের পর ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়া বলে পরিচিত ঘটনার উপজাত হিসেবে ইজমা বন্ধ হয়ে গেছে বলে ধারণা ব্যক্ত করা হয়। যেহেতু ইজমা ইজতিহাদের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় সেহেতু ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে ইজমা বন্ধ হয়ে গেছে বলে ধারণা করা হয়েছিল। এটি অবশ্য বাহ্যিক বিবেচনা বৈ কিছু নয়। ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ধারণার পরও আইনকে সংহত ও একীভূত করার ক্ষেত্রে ইজমার ভূমিকা পালন খুব সম্ভব অব্যাহত ছিল।[৭]

ইজমা কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, সুন্নাহ্র যথাযথ উপলব্ধি ও প্রচার এবং ইজতিহাদের বৈধ ব্যবহার নিশ্চিত করেছে। প্রশ্ন হচ্ছে, আইনটি কি খোদায়ী

www.pathagar.com

উৎসের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কি না বা তা যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে কি না, এসব বিষয় বিশেষ করে কিয়াস ও ইজতিহাদের মাধ্যমে নতুন বিধিবিধান সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা ও সংশয়ের মাত্রা পরিমাপের সুযোগ সব সময়ই উন্মুক্ত থাকে। কেবলমাত্র ইজমাই কোনো বিধানের প্রতি তার সমর্থন ব্যক্ত করে এ সংশয়ের অবসান ঘটাতে পারে। এতে ওই বিধান চূড়ান্ত ও অভ্রান্ত বিধানে পরিণত হবে। প্রাথমিকভাবে ইজমাকে রক্ষণশীলতা ও অতীতের ঐতিহ্য সংরক্ষণের একটি হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করা হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এটি যথেষ্ট স্পষ্ট যে, গোটা মুসলিম সমাজ, যা কিছু সত্য ও সঠিক বলে গ্রহণ করেছে তাকে অবশ্যই সেইভাবে গ্রহণ করতে হবে। এ ছাড়া সহনশীলতা এবং বিভিন্ন মতের মূল্যায়নেরও উপায় হলো ইজমা। সমাজের নতুন শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সাফল্যের আলোকে বিদ্বান ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন এতে ঘটে। একজন পর্যবেক্ষকের মতে, 'এ মূলনীতি (ইজমা) ইসলামকে জ্ঞানের ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে যোগ্যতার সাথে এগিয়ে যাওয়ার বিপুল ক্ষমতা প্রদান করেছে। ব্যক্তিগত কর্তৃত্বের অপ্রচলিত বিধির বিপরীতে এটি কাঙ্ক্ষিত সংশোধনী প্রদান করেছে। আপনা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, অন্তত অতীতে ইসলামে নতুন কিছু গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ইজমা ছিল এক অসাধারণ সহায়ক উপকরণ।[৮]

যেসব বিধিবিধানের উৎপত্তি ধারণামূলক ইজমা সেগুলোর কর্তৃত্বকে শক্তিশালী করেছে। ধারণামূলক বিধিবিধান বাধ্যবাধকতামূলকের মতো শক্তিশালী নয়, কিন্তু তার সমর্থনে এক সময় ইজমা সংঘটিত হলে তা সুনির্দিষ্ট ও বাধ্যতামূলক বিধানে পরিণত হয়-এর দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সাহাবিগণের রা. ইজমা বিচ্ছিন্ন হাদিসের বিধানকে সমুন্নত করেছে। এ ধরনের ক্ষেত্রে আলোচ্য বিধানটি বাধ্যতামূলক আইনে উন্নীত হয়েছে। এর উদাহরণ হলো কোনো ব্যক্তির জন্য তার স্ত্রীর নিকটাত্মীয় মহিলাদের একই সাথে বিয়ে করা হারাম, এ নির্দিষ্ট বিধানটি ইজমার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। এ ইজমার ভিত্তি হচ্ছে একটি বিচ্ছিন্ন হাদিস। হাদিসটিতে স্ত্রীর খালা বা ফুফুকে একই সাথে বিয়ে করা হারাম করা হয়েছে। অনুরূপভাবে দাদী মিরাসী সম্পত্তির ওয়ারিশ হবেন, এটি হলো ইজমার কাতয়ী বিধান যা একটি বিচ্ছিন্ন হাদিসের ভিত্তিতে গঠিত হয়েছে। আল মুগিরা ইবনে শুবাহ রা. থেকে বর্ণিত আলোচ্য হাদিসটিতে বলা হয়েছে, রসুল সা. দাদীর জন্য সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ বরাদ্দ করেছেন। এ ছাড়া ইজমা হাদিসের ক্ষেত্রে যেসব হাদিস মুজতাহিদদের কাছে সমানভাবে পরিচিত ছিল না, সে ব্যাপারে বিশেষ করে হাদিস সংগ্রহ ও সংকলন পরবর্তী যুগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ইজমার মাধ্যমে কিছুসংখ্যক ফকিহ কতিপয় হাদিসের অস্তিত্বের বিষয় জানতে সক্ষম হন।[৯]।

www.pathagar.com

সবশেষে বলা যায়, ইজমা কর্তৃত্বের প্রতিনিধিত্ব করে। ইজমা একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে তা নিজস্ব অধিকার বলে কর্তৃত্বের অধিকারী হয় এবং প্রাথমিক সূত্রে এর মূল ক্রমান্বয়ে আবছা হয়ে পড়ে এমনকি হারিয়ে যায়। অতঃপর সংশ্লিষ্ট সূত্রের কোনো উল্লেখ ছাড়াই আইনটির উদ্ধৃতি প্রদান সাধারণ অভ্যাসে পরিণত হয়। ইজমার গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্যের কারণে অংশত এমনটি হয়। বস্তুত এতে কর্তৃত্বের উদ্ধৃতি প্রদানের উৎসাহে ভাটা পড়ে। শাহ ওয়ালি উল্লাহর মতে, শরিয়াহর তৃতীয় উৎস হিসেবে ইজমাকে ফকিহগণের স্বীকৃতি প্রদানের পেছনে এটি হলো অন্যতম কারণ।[১০]

ইজমার অত্যাবশ্যকীয় শর্তাবলি (আরকান)

কখনো কোনো সমস্যা দেখা দিলে এবং তা ওই ঘটনার সময়ের মুসলিম সমাজের মুজতাহিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে এবং তারা ওই বিষয়ের বিধানের ব্যাপারে সর্বসম্মত মতৈক্যে উপনীত হলে তাদের সর্বসম্মত ওই সিদ্ধান্ত নিম্নোক্ত শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে শরিয়াহর সঠিক ও প্রমাণিক দলিল হিসেবে গণ্য হবে :

১. ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সময় বেশ কয়েকজন মুজতাহিদের উপস্থিতি বজায় থাকতে হবে। একাধিক মুজতাহিদের অভিন্ন মত পোষণ ছাড়া কখনো সর্বসম্মত ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়। এমন পরিস্থিতি যদি বিরাজ করে যেখানে একাধিক মুজতাহিদকে পাওয়া সম্ভব হয় না অথবা সমাজে মাত্র একজন মুজতাহিদ বর্তমান থাকেন তাহলে সে ক্ষেত্রে কোনো ইজমা গঠিত হওয়া সম্ভব নয় বলে মনে করা হয়।[১১]

২. সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মত অনুযায়ী, সর্বসম্মত মত হচ্ছে ইজমার একটি পূর্বশর্ত। কোনো সমস্যা দেখা দিলে সে সময়ের স্থান, গোত্র, বর্ণ, মাজহাব বা অনুসৃত পন্থা নির্বিশেষে সব মুজতাহিদকে অবশ্যই কোনো বিচার্য বিষয়ে সর্বসম্মত ঐকমত্যে পৌঁছাতে হবে। এমনকি অতি ক্ষুদ্র একটি দলও যদি ভিন্নমত পোষণ করে তাহলেও ইজমা গঠন অসম্ভব হয়ে পড়বে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মক্কা ও মদিনা বা ইরাকের মুজতাহিদগণ অথবা রসুল সা.-এর পরিবারের মুজতাহিদগণ অথবা সুন্নি আলেমগণ একটি বিষয়ে সর্বসম্মত মতৈক্যে পৌঁছলেন, কিন্তু তাদের শিয়া প্রতিপক্ষ সে বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করলেন, তাহলে সে ক্ষেত্রে কোনো ইজমা গঠিত হবে না। সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে, সবার মতকে গ্রহণ করা যাবে না, জ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে কেবলমাত্র বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের অভিমতই ইজমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। আল আমিদী অবশ্য সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকে অগ্রগণ্য বলে

www.pathagar.com

মনে করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি আবু বকর আল বাকিলানী ও অন্যদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, ইজমাতে সাধারণ মানুষ ও মুজতাহিদ উভয় শ্রেণির মতৈক্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে ইজমার মতাদর্শগত ভিত্তি ইসমাহ আর তাহলো সমগ্র মানবজাতির ওপর আল্লাহর করুণার বারিধারা বর্ষিত হয়েছে। তাই গোটা সমাজের সম্মতিকে মুজতাহিদদের বিশেষ সুবিধার বিষয়ে পরিণত করা সঠিক হবে না। অবশ্য সংখ্যাগরিষ্ঠের মত এ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে গৃহীত হয়েছে যে, মুজতাহিদগণ নিজস্ব ক্ষমতাবলে ইজমার অধিকারপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং তারা নিছক সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন না। তাই এখানে 'ইসমাহ'র মূল অবস্থান পরিবর্তনের কোনো প্রস্তাব করা হয়নি।[১২]

৩. কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে নিজেদের প্রকাশিত মতামতের মাধ্যমে মুজতাহিদদের মতৈক্যের বিষয়টি অবশ্যই তুলে ধরতে হবে। তা মৌখিক বা লিখিত হতে পারে। যেমন-এর যে কোনো এক পন্থায় ফতোয়া দান অথবা বাস্তব মতৈক্যও হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একজন বিচারক কোনো বিষয়ে রায় ঘোষণা করলেন অথবা এমন হতে পারে প্রত্যেক মুজতাহিদ একটি মত প্রকাশ করলেন এবং তাদের এসব মতামত সংগ্রহ করে দেখা গেল তারা একমত পোষণ করেছেন। মুজতাহিদগণ সম্মিলিতভাবেও তাদের মত জানাতে পারেন, যেমন মুসলিম বিশ্বের মুজতাহিদগণ কোনো একস্থানে সমবেত হলেন। সে সময় একটা সমস্যা তুলে ধরা হলো এবং তারা সে সম্পর্কে সিদ্ধান্তের ব্যাপারে একটা সর্বসম্মত ঐকমত্যে পৌঁছলেন।

৪. উপরের দ্বিতীয় শর্তের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইজমা সব মুজতাহিদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে হতে হবে, তাদের নিছক সংখ্যাগরিষ্ঠের মতানুযায়ী গঠিত হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত ভিন্নমত থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত একপক্ষে ভুল থাকার সম্ভাবনা বজায় থাকবে এবং সে অবস্থায় কোনো ইজমা গঠিত হতে পারবে না বলে ধরে নেয়া হবে। কারণ ইজমা হচ্ছে চূড়ান্ত দলিল যাকে অবশ্যই নিঃসন্দেহ অবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। অবশ্য ইবনে জারির আল তাবারি, আবু বকর আল রাজি, আহমদ ইবনে হাম্বলের মতে দু'টি মতের একটি এবং শাহ ওয়ালি উল্লাহর মতে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের ভিত্তিতেও ইজমা গঠিত হতে পারে। কিন্তু আল আমিদী এ বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন যাতে সব মুজতাহিদের উপস্থিতি জরুরি।[১৩]

ফিকহর নিয়ম অনুযায়ী কেবলমাত্র ফকিহদের ইজমা বিবেচনায় নেয়া হয়।[১৪]

www.pathagar.com

স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, ফকিহগণ যদি খারেজি বা শিয়া উপদলভুক্ত অথবা এমন ব্যক্তিবর্গ হন যাদের বিরুদ্ধে মুনাফেকী ও বিদাতের অভিযোগ রয়েছে, তারাও কি ইজমার অংশীদার হওয়ার যোগ্য হবেন? সংখ্যাগরিষ্ঠের মত অনুযায়ী কোনো ফকিহই যদি সক্রিয়ভাবে লোকদেরকে বিদাতের দিকে আহ্বান জানানোর জন্য পরিচিত থাকেন তাহলে তাকে ইজমার বহির্ভূত রাখা হবে; অন্যথায় তিনি আহলে আল ইজমার অন্তর্ভুক্ত হবেন।[১৫] বড় ধরনের পাপ কাজে লিপ্ত হয়েছেন এমন ব্যক্তি (ফাসিক) এবং যে ব্যক্তি তার নিজের মতবাদ অনুসারে কাজ করে না তাদেরকে হানাফীর আহল আল ইজমার বহির্ভূত বলে গণ্য করেছেন। অন্যদিকে শাফেয়ী ও কিছুসংখ্যক মালেকী ফকিহ মনে করেন যে, নিছক ফিসকের কারণে কাউকে অযোগ্য বিবেচনা করা যাবে না।[১৬] কিছু সংখ্যক ফকিহ মনে করেন যে, ইজমায় অংশগ্রহণকারী মুজতাহিদগণের সবার মৃত্যুর বা প্রজন্মের অন্তর্ধানের (ইনকিরাদ আল আসর) পরই ইজমা সম্পূর্ণ হয়। তাদের কেউ যদি বেঁচে থাকেন বলে জানা যায়, তাহলে তখনো তার মত পরিবর্তনের একটা সম্ভাবনা থেকে যায়। সে ক্ষেত্রে এই ইজমা কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলবে। এ বিধানের একটি অনুসিদ্ধান্ত হলো, ইজমা একটি অতীত পর্যালোচনামূলক যা কেবলমাত্র পরবর্তী প্রজন্মের জন্য পালন বাধ্যতামূলক, কিন্তু খোদ ইজমা গঠনকারীদের জন্য নয়।[১৭]

অবশ্য ফকিহদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মনে করেন যে, এটি ইজমার কোনো শর্ত হতে পারে না। ইজমা কেবলমাত্র পরবর্তী প্রজন্মের জন্য বাধ্যতামূলক নয়, উপরন্তু এতে অংশগ্রহণকারীদের জন্যও এমনটি হওয়া যুক্তিযুক্ত। কারণ ইজমা যদি তাতে অংশগ্রহণকারীদের জন্য বাধ্যতামূলক না হয়, তাহলে অন্য কারোর জন্যও তা বাধ্যতামূলক হবে না।[১৮] নীরব ইজমার বিষয়েও (নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে) কিছুসংখ্যক ফকিহ মনে করেন যে, কেবলমাত্র অংশগ্রহণকারীদের মৃত্যুর পরই তা সম্পন্ন হবে যাতে তাদের কেউই পরে মত প্রকাশের কোনো সুযোগ না পায়। তাদের কেউ নীরবতা ভঙ্গ করলে তিনি আর নীরব অংশগ্রহণকারী থাকবেন না তখন নীরব ইজমা প্রকাশ্য ইজমায় রূপান্তরিত হবে।

তৎসত্ত্বেও সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম ‘প্রজন্মের অন্তর্ধানকে কোনোরূপ গুরুত্ব দিতে অস্বীকার করেছেন। কারণ কোনো প্রজন্মের প্রসারণকাল (তাদাখুল আল আসার) কোনো একটি প্রজন্মের শেষ ও পরেরটির শুরুর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা অসম্ভব। এ কারণে সাহাবিগণের রা. জামানার শেষ ও তাবেয়ীগণের জামানার শুরুর বিষয়ও স্পষ্টভাবে পার্থক্য করা যায়নি। ঠিক একইভাবে অন্য কোনো যুগে দুটি প্রজন্মের মধ্যে একটির অন্তর্ধান ও অন্যটির সূচনাকালকে পার্থক্য করা সম্ভব হয়নি।[১৯]

www.pathagar.com

আল গাজ্জালী অবশ্য তার এক বক্তব্যের মাধ্যমে কার্যত সমস্যাটি নিরসন করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'ইজমা গঠিত হওয়ার জন্য ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়াই যথেষ্ট, এমনকি তা যদি স্বল্প ক্ষেত্রের জন্যও হয়'।[২০]

ইজমা যখন উপরিউক্ত শর্তাবলি পূরণ করে তখন তা পালন প্রত্যেকের জন্য বাধ্যতামূলক (ওয়াজিব) হয়ে যায়। এর ফলে পরবর্তী যুগের মুজতাহিদগণকে আর একই বিষয়ে নতুন করে ইজতিহাদের জন্য গ্রন্থাগারে বসে অধ্যাবসায় করতে হবে না। ইজমা একবার গঠিত হলে তা আর সংশোধন বা রহিত (নাছ্খ) করার কোনো সুযোগ থাকবে না। নাছ্খের বিধান ইজমার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হবে না এ কারণে যে, তা ইজমাকে না রহিত করে না নিজে রহিত হয়। এটি সংখ্যাগরিষ্ঠের মত। অবশ্য কতিপয় ফকিহ্ বলেছেন যে, ইজমা গঠনকারীগণের নিজেদেরই ইজমা রহিত করার এবং তদস্থল আরেকটি ইজমা কার্যকর করার অধিকার রয়েছে। কিন্তু এক সময় কোনো ইজমা চূড়ান্ত হয়ে গেলে বিশেষ করে যখন ইজমার অংশগ্রহণকারী সবাই মৃত্যুবরণ করেন, তখন ওই একই বিষয়ে আর কোনো ইজমা গঠন করা যাবে না। একই বিষয়ে দ্বিতীয় ইজমা গঠন করা হলে তার কোনো কার্যকারিতা থাকবে না।[২১]

ইজমার প্রমাণ (হুজ্জিয়াহ্)

ইজমা যে আইনের একটি উৎস তার কী প্রমাণ রয়েছে? আলেমগণ কুরআন ও সুন্নাহ্র দলিল এবং যুক্তির সাহায্যে ইজমার যথার্থতা প্রমাণ করার চেষ্টা করে থাকেন। এখন আমরা ইজমার সমর্থনে উদ্ধৃত করা কুরআনের আয়াত ও হাদিস সম্পর্কে আলোচনা করব। শুরুতেই এ কথা বলে রাখা দরকার যে, সার্বিকভাবে আলেমগণ এমত পোষণ করেন যে, ইজমার সমর্থনে কুরআন সুন্নাহ্র তথ্য-প্রমাণ চূড়ান্ত দলিল বুঝায় না। এ কথা বলার পর এ ব্যাপারে আল গাজ্জালী ও আল আমিদীর অভিমত তুলে ধরা যেতে পারে। তারা উভয়ে বলেছেন যে, কুরআনের চেয়ে হাদিসে ইজমার পক্ষে জোরালো যুক্তি রয়েছে।[২২]

১. *কুরআনে ইজমা প্রসঙ্গ*

কুরআনে (সুরা নিসা ৪ : ৫৯) আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর রসুল সা. ও 'যারা দায়িত্বশীল তাদেরকে উলুল আমর হিসেবে আনুগত্য করার প্রয়োজনের কথা স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে।[২৩] এ আয়াতে ইজমার অভ্রান্ততার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করা হয়েছে বলেও মনে করা হয়। আল ফখর আল রাজীর মতে, যেহেতু আল্লাহ তায়ালা উলুল আমরের আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন, তাই উলুল আমরের রায়ও ত্রুটিমুক্ত থাকবে। কেননা আল্লাহ্ এমন কারোর আনুগত্য করার আদেশ দিতে পারেন না যে, ভুলভ্রান্তিতে নিয়োজিত রয়েছে।[২৪] এ প্রেক্ষাপটে 'আমর'-এ সাধারণ ও নিরপেক্ষ

এবং ধর্মীয় উভয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পূর্বের বিষয়টি রাজনৈতিক শাসকবর্গ এবং পরেরটি আলেমগণ সম্পাদন করে থাকেন। ইবনে আব্বাসের রা. উদ্ধৃতি দিয়ে এক তাফসিরে বলা হয়, এ আয়াতে উলুল আমর বলতে আলেম সমাজকে বুঝানো হয়েছে, অন্য তাফসিরকারকগণ মনে করেন, এখানে 'উমারা' অর্থাৎ 'শাসক ও সেনাপতিগণের' কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আয়াতের জাহিরে উভয় অর্থ প্রকাশ পেয়েছে এবং উভয়ে নিজ নিজ ক্ষেত্রে আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী হবে। এভাবে বিচার্য বিষয়ে উলুল আমর অর্থাৎ মুজতাহিদগণ যখন কোনো মতৈক্যে পৌঁছবেন তখন অবশ্যই তা মানতে হবে।[২৫]

এ সিদ্ধান্তের প্রতি আরো সমর্থন দেখতে পাওয়া যায় সুরা নিসার অন্যত্র (৪ : ৮৩)। এ আয়াতে আবারও উলুল আমরের কর্তৃত্বকে খোদ রসুল সা.-এর পক্ষেই বলে নিশ্চিত করা হয়েছে।[২৬]

> কুরআনের একটি আয়াতকে ইজমার সমর্থনে প্রায় উদ্ধৃত করা হয়ে থাকে, সে আয়াতটিও (সুরা নিসার ৪ : ১১৫)।

আয়াতটিতে বলা হয়েছে :

> যে ব্যক্তি রসুলের সা. বিরুদ্ধতা করার জন্য কৃত সংকল্প হবে এবং ইমানদার লোকদের নিয়মনীতির বিপরীত নীতিতে চলবে এমতাবস্থায় যে, প্রকৃত সত্য পথ তার কাছে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে; তাকে আমরা সেই দিকেই চালাবো যেদিকে সে নিজে চলতে শুরু করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব যা হলো নিকৃষ্টতম স্থান।

তাফসিরকারকগণ মনে করেছেন যে, এ আয়াতে ইমানদার লোকদের নিয়মনীতি বলতে তাদের 'মতৈক্য ও নিয়মনীতি যা তারা পছন্দ করেছে বুঝিয়েছে; অন্য কথায় তাদের সমর্থিত মতৈক্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে সমাজের নিয়মনীতি মেনে চলা বাধ্যতামূলক এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া নিষিদ্ধ। ইমানদার লোকদের নিয়মনীতি থেকে সরে যাওয়া হচ্ছে রসুল সা.-এর আনুগত্য প্রায় না করার শামিল যার যে কোনোটি করা জায়েজ নয়। এ আয়াতের কয়েকটি দিক রয়েছে মুফাসসিরগণ যার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করার আগেই ইজমার সমর্থনে উদ্ধৃত কুরআনের অন্য যেসব আয়াত উদ্ধৃত করা হয় সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা সম্ভবত উত্তম হবে।

মুসলিম উম্মাহকে আল্লাহ তায়ালা যে মর্যাদাপূর্ণ স্থান প্রদান করেছেন কুরআনে তার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। (সুরা আল ইমরানে ৩ : ১১০) এ কথাই এভাবে বলা হয়েছে: 'দুনিয়ায় সর্বোত্তম দল তোমরা যাদেরকে মানুষের হেদায়েত ও সংস্কারের

www.pathagar.com

বিধানের জন্য কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ কর, অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোকদেরকে বিরত রাখ এবং খোদার প্রতি ইমান রক্ষা করে চলো।' এ আয়াতে মুসলিম জাতির কয়েকটি অসাধারণ মর্যাদার প্রত্যয়ন করা হয়েছে। তাই এ যুক্তি দেয়া যায় যে, মুসলিম জাতি যদি কোনো অন্যায় বা ভুলের ব্যাপারে সম্মত হতে রাজি থাকত তাহলে কুরআন এ ভাষায় তাদের প্রশংসা করত না। আরো বলা যায় যে, এ আয়াতের বিষয়বস্তুতে 'ইমানদারদের নিয়মনীতি' বাক্যাংশের অর্থের ব্যাপারে কিছু নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

আমরা সুরা বাকারায় (২ : ১৪৩) একই বিষয় দেখতে পাই : 'আমরা এভাবে তোমাদেরকে একটি মধ্যম পন্থানুসারী উম্মত (উম্মাতান ওয়াসাতান) বানিয়েছি যেন তোমরা দুনিয়ার লোকদের জন্য সাক্ষী হও।' আক্ষরিক অর্থে 'ওয়াসাতান' মানে মধ্যম, যা ন্যায়বিচার ও ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থার ইঙ্গিত করছে, এসব গুণাবলি মুসলিম উম্মাহর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ও এর নিয়মনীতির সততা স্বীকৃতির যোগ্য করে তুলেছে। উপরন্তু সততার গুণের কারণে আল্লাহ তায়ালা মুসলমান জাতিকে দুনিয়ার লোকদের জন্য সাক্ষী হওয়ার দায়িত্বে অধিষ্ঠিত করেছেন।[২৭]

কুরআনের (সুরা আল আরাফে, ৭ : ১৮১) মুসলিম উম্মাহর কথা আবারও উল্লেখ করা হয়েছে : 'আমাদের সৃষ্টির মধ্যে একটি উম্মত এখনও রয়েছে যারা পূর্ণ হক অনুযায়ী হেদায়েত করে এবং হক মোতাবেক ইনসাফও করে।' এ সংক্রান্ত আরো তিনটি আয়াত রয়েছে, যা উদ্ধৃত করা প্রয়োজন। আয়াতগুলো হলো :

(সুরা ইমরান, ৩ : ১০২) : 'তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর এবং বিচ্ছিন্ন হয়ো না।'

এ আয়াত সুস্পষ্ট ভাষায় বিচ্ছিন্ন হওয়াকে (তাফাররুক) নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যেহেতু ইজমার বিরোধিতা করা এক ধরনের তাফাররুক, তাই তা হারাম।[২৮]

(সুরা আশ শুরা ৪২ : ১০) : 'এবং তোমাদের মধ্যে যে ব্যাপারে মতভেদের সৃষ্টি হয় তার ফায়সালা করা আল্লাহ তায়ালারই কাজ ।'

এ আয়াত স্পষ্ট তাকেই অনুমোদন করা হয়েছে যে ব্যাপারে উম্মতের মতৈক্য রয়েছে।[২৯]

(সুরা নিসা, ৪ : ৫৯) : 'অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি কোনো বিষয়ে মতবৈষম্যের সৃষ্টি হয় তাহলে তাকে আল্লাহ ও রসুলের দিকে ফিরিয়ে দাও।'

এ আয়াতের অর্থও (নিহিতার্থ-মাফহুন আল মুখাল্লাফাহ) উম্মতের সম্মত সব বিষয়ের কর্তৃত্বকে সমুন্নত রাখা হয়েছে।[৩০]

উপরিউক্ত আয়াতগুলোর উদ্ধৃতি দেয়ার পর আল গাজ্জালী এ মত প্রকাশ করেন, 'এগুলোর সবই দৃশ্যত ইঙ্গিত (জাওয়াহির)। এর কোনোটিই ইজমার বিষয়ে সুস্পষ্ট

www.pathagar.com

নস নয়।' আল গাজ্জালী আরো বলেন, এ আয়াতগুলোর মধ্যে ৪ : ১১৫ আয়াতটি এ বিষয়টির খুবই কাছাকাছি। আয়াতটিতে 'ইমানদার লোকদের নিয়মনীতি' পালনকে বাধ্যতামূলক কর্তব্য হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ইমাম শাফেয়ীও আয়াতটি উদ্ধৃত করেন এবং এ উপসংহারে পৌঁছেছেন যে, আয়াতটি ইজমার সুস্পষ্ট কর্তৃত্ব প্রদান করেছে। তার মতে, ইমানদার লোকদের নিয়মনীতি ছাড়া অন্য নিয়মকানুন পালন হারাম এবং ইমানদার লোকদের নিয়মনীতি পালন হচ্ছে ওয়াজিব।[৩১] তৎসত্ত্বেও আল গাজ্জালী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, এর মূলকথা হচ্ছে, রসুল সা.-এর অবাধ্যতা এবং ইমানদারদের সাথে বৈরিতার বিরুদ্ধে একটি হুঁশিয়ারি। ইমানদার লোকদের কর্তব্য হলো রসুল সা.-কে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করা এবং শত্রুদের হাত থেকে তাকে রক্ষা করা। রসুল সা. যাতে দুঃখকষ্ট (মাশাক্কা) না পান শুধু এতটুকু করাই কোনো ইমানদার লোকের জন্য যথেষ্ট নয় বরং তাকে অবশ্যই সক্রিয়ভাবে রসুল সা.-কে সাহায্য করতে হবে এবং তার সব আদেশ-নিষেধ অবশ্যই মেনে চলতে হবে। এটিই হচ্ছে এ আয়াতের মূল প্রতিপাদ্য। এ আয়াতের প্রকাশ্য (জাহির) অর্থ থেকে সরে আসার মতো কোনো ব্যাখ্যা খোদ রসুল সা. দিয়ে যাননি। অন্য কথায় রসুল সা. এ প্রেক্ষাপটে ইজমার কথা কোনোরূপ উল্লেখ করেননি। এ বিশ্লেষণ থেকে বুঝা যায় যে, এ আয়াতের যে অর্থ ইমাম শাফেয়ী করেছেন আল গাজ্জালী দৃশ্যত তার সে সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেননি।

একই আয়াতের ব্যাখ্যায় জালাল আল দীন আস সুয়্যূতী যা বলেছেন, ব্যাপকার্থে তা আল গাজ্জালীর ব্যাখ্যার অনুরূপ। আল সুয়্যূতীর তাফসির আল জালালাইনে এই আয়াতে ইজমার সুস্পষ্ট কর্তৃত্ব প্রদানের কোনো ইঙ্গিত দেয়া হয়নি।[৩২]

আল সুয়্যূতী ও আল শাওকানী উভয়ের মতে, ইমানদার লোকদের নিয়মনীতি ছাড়া অন্য উপায় অবলম্বনের অর্থ হচ্ছে ইসলাম পরিত্যাগ করা। আল শাওকানী আরো বলেন, অনেক আলেম এ উপসংহারে উপনীত হয়েছেন যে, আয়াতটি ইজমার কর্তৃত্ব প্রদান করেছে। কিন্তু এটি একটি অযৌক্তিক মন্তব্য। কেননা এ আয়াতে ইমানদার লোকদের নিয়মনীতি বাদ দিয়ে অন্য নিয়মনীতি অনুসরণের অর্থ হচ্ছে অবিশ্বাস করা অর্থাৎ অন্য ধর্মের সপক্ষে ইসলাম ত্যাগ করা। আল শাওকানী আরো বলেন, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপটের (শান আল নুজুল) সাথে একটি ধর্ম ত্যাগের ঘটনার সম্পর্ক রয়েছে। বিশেষ করে এ ঘটনার কথা জানা গেছে যে, জনৈক তুমাহ ইবনে উবাইরাক একজন ইহুদির বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ করে অথচ তুমাহ নিজেই চুরি করেছিল। এ আয়াত নাজিলের ফলে ইহুদিকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয় এবং তুমাহ ইসলাম ত্যাগ করে মদিনা থেকে মক্কায় পালিয়ে যায়।[৩৩]

www.pathagar.com

মুহাম্মদ আবদুহু ও তার শিষ্য রশিদ রিদা মনে করেন যে, আলোচ্য আয়াতটিতে রসুল সা.-এর জীবদ্দশায় 'ইমানদার লোকদের নিয়মনীতি' সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং এর ব্যবহার অবশ্যই সে সময়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করতে হবে। কারণ রসুল সা. জীবিত থাকার সময়ে কেবল তার প্রতি বৈরী আচরণ করা সম্ভব ছিল। আবদুহু আরো মন্তব্য করেন যে, ইজমার সমর্থনে এ আয়াতের উদ্ধৃতি প্রদান অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথ প্রশস্ত করতে পারে। কারণ এতে যাদেরকে দোযখের শাস্তির হুমকি দেয়া হয়েছে তাদের সাথে অন্য মুজতাহিদদের সাথে ভিন্নমত পোষণকারী একজন মুজতাহিদকে তাদের অনুরূপ তুলনা করা হয়েছে। এমনকি একজন মুজতাহিদ প্রচলিত মতের ভিন্ন মত পোষণ অথবা অন্যান্য মুজতাহিদের অনুসৃত পন্থার থেকে ভিন্ন পন্থা অনুসরণ করার পরও তিনি মুসলমান থাকবেন এবং এমনকি তার এ প্রচেষ্টার জন্য তিনি পুরস্কৃতও হবেন। আব্দুহু মনে করেন যে, এ আয়াত থেকে আল শাফেয়ী যে সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেছেন এ আয়াতের শানেনজুলে তার প্রতি সমর্থন পাওয়া যায়নি।[৩৪]

আরো আভাস পাওয়া যায় যে, আলোচ্য আয়াতের হুমকির বিষয়টি প্রাথমিকভাবে আয়াতটির প্রথম অংশ অর্থাৎ রসুল সা.-এর আনুগত্য না করার সাথে সম্পর্কিত, আয়াতটির দ্বিতীয় অংশের সঙ্গে মোটেই সংশ্লিষ্ট নয়। তাই রসুল সা.-এর বিরোধিতা না থাকলে ইমানদার লোকদের নিয়মনীতি থেকে বিচ্যুতি বেআইনি হবে না। এই সমালোচনামূলক মন্তব্যের বৈধতা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে কারণ খোদ আয়াতটি এভাবে দুইটি অংশকে পৃথক করেনি; তাই হুমকি উভয়ের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হবে।[৩৫]

আল আমিদী ইজমা সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতগুলো সম্পর্কে আলোচনার পর মন্তব্য করেন যে, তা হয়তো সম্ভাব্যতা (যন্নী) জাগ্রত করতে পারে, কিন্তু ইতিবাচক জ্ঞান সৃষ্টি করে না। আমরা যদি মনে করি যে, ইজমা হচ্ছে একটি চূড়ান্ত দলিল তাহলে ধারণামূলক দলিলের ভিত্তিতে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা যথেষ্ট হবে না। ইজমা ধারণামূলক মূলনীতি বলে ধারণা করা হলেই কেবল তার জন্য ধারণামূলক দলিল যথেষ্ঠ হবে, অথচ বিষয়টি তা নয়।[৩৬]

২. *ইজমা সম্পর্কে সুন্নাহ্*

ইজমার সমর্থনে যে হাদিসটি প্রায়ই উদ্ধৃত করা হয়ে থাকে তাহলো :

لا تجتمع أمتي على الضلالة

'আমার উম্মত কখনো ভ্রান্ত বিষয়ে একমত হবে না'।[৩৭]

www.pathagar.com

এ হাদিসের শেষ শব্দ 'আল দালালাহকে' অনেক বিবরণে আল খাতা বুঝানো হয়েছে। ফকিহ্গণ শব্দ দু'টিকে পারস্পরিক পরিবর্তনযোগ্য হিসেবে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু নির্ভরযোগ্য হাদিস সংকলনে এ হাদিসে আল দালালাহ শব্দটি লিপিবদ্ধ দেখতে পাওয়া যায়।[৩৮] আল গাজ্জালী বলেন, এটি মুতাওয়াতির নয়-তাই এটি কুরআনের মতো নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের অধিকারী নয়। অন্যদিকে কুরআন মুতাওয়াতির কিন্তু তাতে ইজমার ওপর কোনো নস নেই। এ কথাগুলো বলার পর আল গাজ্জালী আরো বলেন, অনেক বিশিষ্ট সাহাবি রা. রসুল সা. থেকে এসব হাদিস বর্ণনা করেছেন। এসব হাদিসে কিছুটা শব্দগত পার্থক্য থাকলেও মুসলিম উম্মাহর অভ্রান্ততা ও ভ্রান্তি থেকে তাদের মুক্ত থাকার বিষয়ে সব ক'টি হাদিসের মূল বক্তব্য একই।[৩৯]

শীর্ষস্থানীয় সাহাবিগণের রা. মধ্যে উমর ইবনে খাত্তাব, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আনাস ইবনে মালিক, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, আবু সাঈদ আল খুদরী, আবু হুরায়রা, হুজায়ফা রা. এ সম্পর্কিত হাদিসগুলো বর্ণনা করেন। এর মধ্যে কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত করা হলো :

لا تجتمع أمتي على الخطا

১. আমার উম্মত কখনো ভ্রান্তিকর বিষয়ে একমত হবে না।

لم يكن الله ليجمع أمتي على الضلالة

২. আল্লাহ তায়ালা আমার উম্মতকে ভুল সিদ্ধান্তের ওপর একমত হতে দেবেন না।

سألت الله تعالى ان لا يجمع أمتي على الضلالة

فأعطانيه

৩. আমি আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করলাম তিনি যেন আমার উম্মতকে ভ্রান্তিকর বিষয়ে একমত না করেন। আল্লাহ আমার এ দোয়া কবুল করেছেন।

من سره أن يسكن بجبوحة الجنة فليلزم

الجماعة ، ان الشطان مع الفرد وهو من

الاثنين أبعد

৪. যারা বেহেশতে বসবাসের সুখ উপভোগ করতে চায়, তারা যেন আমার উম্মতের অনুসরণ করে, শয়তান এক ব্যক্তির পিছু নিতে পারে কিন্তু সে দু'জনের থেকে অনেক দূরে থাকে।

www.pathagar.com

يد الله مع الجماعة ، ولا يبألي بشذوذ من شذ

৫. উম্মতের সাথে আল্লাহর হাত রয়েছে এবং বিচ্ছিন্ন বিরোধিতায় তাকে (নিরাপত্তা) বিপন্ন করবে না।

من خرج عن الجماعة أو فارقالجماعة قيد شبر

فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه

৬. যে উম্মতের সংগ থেকে বেরিয়ে গেল অথবা তা থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল সে ইসলামের সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন করল।

لا تزال طاءفة من أمتي على الحق ظاهرين

لا يضرهم منخالفهم

৭. আমার উম্মতের মধ্যে এমন একটি দল সব সময়ই সত্য পথের ওপর অটল থাকবে। তারা হবে প্রভাবশালী শক্তি হিসেবে থাকবে এবং বিরোধীদের বিরোধিতা তাদের কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না।

من فرق الجماعة ومات فميتته جاهلية

৮. যেই উম্মত থেকে বের হয়ে যাবে এবং সেই অবস্থায় সে মারা যাবে, তার মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু।

৯. এবং সবশেষে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদিসটি উল্লেখ করছি :

ما رأه المسلمون حسناً فهوعند الله حسن

মুসলমানরা যাকে ভালো বলে মনে করবে তা আল্লাহর দৃষ্টিতেও ভালো।[৪০]

এসব ও অন্যান্য হাদিস উদ্ধৃত করার পর আল গাজ্জালী ও আল আমিদী উভয়ে এমত প্রকাশ করেন যে, এগুলোর মূল বক্তব্য ও অর্থের ব্যাপারে সাহাবিগণ রা., তাবেয়ীগণ ও পরবর্তী যুগের অন্য কারোর মধ্যে কোনো বিরোধিতা দেখা যায়নি এবং সবাই তাদের ব্যাপক অর্থের ব্যাপারে একমত হয়েছেন। আলেমগণ শরিয়াহর সাধারণ ও বিস্তারিত বিধিবিধানের ব্যাখ্যার জন্য অব্যাহতভাবে এসব হাদিসের

www.pathagar.com

ওপর নির্ভর করেছেন। এ সংক্রান্ত সব ক'টি হাদিসই একক বা বিচ্ছিন্ন (আহাদ) হাদিস এবং তা সুনির্দিষ্ট দলিল বুঝায় না, এ প্রশ্নের জবাবে একই লেখকগণ এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তৎসত্ত্বেও এসব হাদিসের সারকথা হচ্ছে ইতিবাচক জ্ঞানের অভিব্যক্তি এবং তাদের সম্মিলিত শক্তিতে উম্মাহর অভ্রান্ততার বিষয়টি বহাল রয়েছে।[৪১] এর ব্যাখ্যায় আমরা বলতে পারি যে, আলী রা.-এর সাহসের সাথে হাতিমের দানশীলতার উদাহরণ এবং ফিকাহ শাস্ত্রে ইমাম শাফেয়ীর অগাধ পাণ্ডিত্য সম্পর্কে আমরা জানি এবং এও জানি যে, এ বিষয়ে মুতাওয়াতির রেওয়ায়েত না থাকলেও সাহাবিগণের রা. সম্পর্কে রসুল সা. উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। উপরিউক্ত সব ক'টি হাদিস অবশ্য আহাদ হওয়ায় তা পৃথক পৃথকভাবে বিবেচনা করলে সন্দেহের সৃষ্টি হতে পারে; কিন্তু সবগুলোকে সম্মিলিতভাবে বিবেচনা করলে তার যথার্থতাকে অস্বীকার করা যাবে না।[৪২]

প্রশ্ন হচ্ছে, এসব হাদিসের 'দালালাহ' ও 'খাতাহ' শব্দ দুটি (বিশেষ করে প্রথম চারটি হাদিসে) বলতে কি অবিশ্বাস (কুফর) বা নবোদ্ভাবন (বিদাত) বুঝানো হতে পারে কি না এ দৃষ্টিকোণ থেকে যে, রসুল সা. এটি বুঝায়ে থাকতে পারেন যে, তার উম্মত অবশ্যই কুফরিতে নিমজ্জিত হতে পারবে না। এটি মনে করা হয় যে, খাতাহ হচ্ছে একটি সাধারণ বিষয়, এর মধ্যে কুফরিকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, কিন্তু দালালাহ এরূপ নয়, দালালাহ অর্থ হলো, বিভ্রান্তি বা ভ্রান্ত আচরণ।[৪৩]

দালালাহ যদি কুফর বুঝায় তাহলে আলোচ্য হাদিসগুলো উম্মাহর অভ্রান্ততার ব্যাপারে কোনো কর্তৃত্ব প্রদান করতে পারে না। কিন্তু তা যদি কেবল ভ্রান্তি বুঝায় তাহলে তাদের পক্ষে কেবল ওই ধরনের কর্তৃত্ব প্রদান সম্ভব হবে।[৪৪]

আরো অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে যে, আলোচ্য হাদিসে যে আর্টিকেল 'লা' এর ব্যবহার করা হয়েছে তা হয় অস্বীকৃতি (নাফি) অথবা নিষেধ (নাহি) বোঝাবে। যদি পরেরটি বুঝায় তাহলে তা লোকদের বিচ্যুতিকে নিষিদ্ধ করা বোঝাবে এবং এমনটি হলে সে ক্ষেত্রে এসব হাদিসের উম্মাহর অভ্রান্ততার মতটি টিকতে পারবে না।[৪৫]

আরেকজন পর্যবেক্ষকের মতে, হাদিসের প্রকাশ্য (জাহির) অর্থ হলো, উম্মাহ সম্মিলিতভাবে ভ্রান্তির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পরিহার করবে। অন্যকথায় হাদিসটি একটি ভ্রান্ত বিষয়ে সাধারণ মতৈক্য পোষণকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে কিন্তু ভ্রান্তিকে নয়। হাদিসটির সুনির্দিষ্ট অর্থের ব্যাপারে যেসব সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে এগুলো হলো তার কয়েকটি। এগুলো সঠিকও হতে পারে আবার সঠিক নাও হতে পারে। কিন্তু যত দিন এসব হাদিস এ ধরনের সংশয়ের জন্য উন্মুক্ত থাকবে ততদিন পর্যন্ত তা ইজমার কোনো চূড়ান্ত প্রমাণ/দলিল কাতয়ী হতে পারবে না।[৪৬]

www.pathagar.com

মুহাম্মদ আবদুহুর মতে, আলোচ্য হাদিসে আদৌ ইজমার কথা বলা হয়নি না তাতে উম্মাহর অভ্রান্ততার ধারণা তুলে ধরা হয়েছে। এ হাদিসে যে মতৈক্যের কথা বলা হয়েছে তা ফকিহদের কিংবা ব্যাপকার্থে সাধারণ উম্মাহকে বুঝানো হোক বা না হোক তাতে ইজমার বিষয় দেখতে পাওয়ার কথা বলা হবে অতিরঞ্জিত দাবি।[৪৭]

আরো মত প্রকাশ করা হয় যে, উপরিউক্ত কয়েকটি হাদিসে (বিশেষ করে ৪, ৫ ও ৬ নম্বর হাদিস) সহজভাবে উম্মতের সদস্যদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতিকে উৎসাহিত করা হয়েছে আর এ কারণে তা আইনের একটি উৎস হিসেবে ইজমার ধারণা বুঝায়নি। আমাদের উদ্ধৃত সাত নম্বর হাদিসটি ইজমার প্রাসঙ্গিক নয়-কারণ এর স্পষ্ট অর্থ হচ্ছে, উম্মাহর একটি অংশ সঠিক পথে অটল থাকবে, সমগ্র উম্মাহ নয়। অবশ্য আল গাজ্জালীও হাদিসটি উদ্ধৃত করেছেন। শিয়া ইমামিয়াহরাও হাদিসটিকে তাদের আহল আল বায়িত সম্পর্কিত ইজমার মূলনীতির সমর্থনে উদ্ধৃত করেছেন। এখানে আহল বায়িত বলতে রসুল সা.-এর পরিবারকে বুঝানো হয়েছে।[৪৮]

উপরিউক্ত হাদিসগুলোর 'উম্মাহর' (বা জামায়াত) শব্দের অর্থ হচ্ছে একটি মত অনুসারী মুসলমানদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। সাহাবিদের রা. একাধিক বিবরণ থেকে এ মতের প্রতি সমর্থন পাওয়া গেছে। অপর এক মত অনুযায়ী জামায়াত বলতে কেবলমাত্র সমাজের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গকে বুঝানো হয়েছে। এতে যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, সাধারণ মানুষ তাদেরকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে এবং তাদের থেকে আইন ও ধর্মীয় বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে। তাই উপরিউক্ত হাদিসগুলোতে তাদের মতৈক্যের কথাই অভিব্যক্ত হয়েছে। আরেকটি মত অনুযায়ী বলা হয়েছে যে, উম্মাহ (জামায়াত) বলতে কেবলমাত্র সাহাবিগণকে রা. বুঝানো হয়েছে যারা হলেন মুসলিম উম্মাহর প্রতিষ্ঠাতা। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী উপরিউক্ত হাদিসগুলোতে উম্মাহ ও জামায়াত শব্দ দু'টি কেবলমাত্র সাহাবিগণকেই রা. বুঝানো হয়েছে।[৪৯]

সবশেষে বলা যায়, উম্মাহ ও জামায়াত বলতে সমগ্র মুসলিম উম্মতকে বোঝাচ্ছে তাদের কোনো বিশেষ অংশ বা গ্রুপকে নয়। এ মত অনুযায়ী ইসমাহর করুণাধারা কোনো ধরনের সংরক্ষণশীলতা বা নির্দিষ্টকরণ ছাড়াই সমগ্র উম্মতের ওপর বর্ষিত হয়েছে। এ হলো ইমাম শাফেয়ীর মত। তিনি তার গ্রন্থ রিসালাহতে লিখেছেন : 'আমরা এ কথা জানি যে, সাধারণভাবে জনগণ কোনো ভ্রান্তির বিষয়ে অথবা রসুল সা.-এর সুন্নাহ্র পরিপন্থী কোনো বিষয়ে একমত হতে পারে না।'[৫০]

ইজমা সম্পর্কিত এসব হাদিস নিয়ে আলোচনা করার পর আহমদ হাসান এ মত ব্যক্ত করেন যে, এগুলো নিশ্চায়ক নয়। এর সব ক'টিতেই ঐক্য ও সমন্বয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এদের কয়েকটি ধারণামূলক এবং অন্যগুলো

www.pathagar.com

পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কিত। এগুলো ইজমা বা অন্য কিছুও বুঝাতে পারে। তাই এগুলো ইজমার যে কর্তৃত্ব প্রদান করে বলে যে যুক্তি দেয়া হয় তা 'সুনির্দিষ্টভাবে ধারণামূলক'। লেখক বিষয়টিকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন :

ক. প্রাথমিক যুগে আইনশাস্ত্রের মূলনীতি হিসেবে ইজমার কোনো ধারণা ছিল না।

খ. ফকিহগণ উম্মাহ অথবা জামায়াতের কোনো সুনির্দিষ্ট অর্থ নিরূপণ করতে পারেননি।

গ. এবং যেসব হাদিস সাধারণ অর্থ ব্যক্ত করে সেগুলোকে কোনো নির্দিষ্ট মতের ক্ষেত্রে সীমিত করা যাবে না।[৫১]

ইজমার ক্ষেত্রে নুসুসের ব্যাপারে সংশয় ও অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম এ উপসংহারে উপনীত হয়েছেন যে, কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে সব মুজতাহিদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হচ্ছে একটি নিশ্চিত নির্দেশনা– যাতে তাদের মতপার্থক্যের ওপর সত্য কথাটি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। অর্থাৎ বিষয়টির সত্যতার শক্তির কারণেই ঐ ঐকমত্যে তারা পৌঁছেছেন। ইজমার সমর্থনে শানিত যুক্তিকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে বলা হয়েছে যে, শারয়ী বিধিবিধান সংক্রান্ত সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অবশ্যই সুষ্ঠু ইজতিহাদের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। ইজতিহাদ চর্চার জন্য মুজতাহিদকে সাধারণভাবে কিছু নিয়মনীতি ও নির্দেশনা মেনে চলতে হয়। নস অথবা এর কোনো বিধানের যৌক্তিক সম্প্রসারণের বিষয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রায়ই ইজতিহাদ সংঘটিত হয়ে থাকে। এমনকি নসের অনুপস্থিতিতেও সূত্রের অর্থ ও চেতনা উভয়ের আলোকে ইজতিহাদ সম্পাদন করা হয়, যা মুজতাহিদ তার সাধারণ জ্ঞানের মাধ্যমে আয়ত্ত করেছেন। প্রথমত, কোনো নির্দিষ্ট বিধানের ওপর সব মুজতাহিদের সর্বসম্মত মতৈক্যের দৃঢ় কর্তৃত্বের ওপর ইজতিহাদ প্রতিষ্ঠিত হয় যাতে শরিয়তে তাদের এ সর্বসম্মত মত বজায় থাকার সুস্পষ্ট ক্ষমতার আভাস ফুটে উঠেছে। এ কর্তৃত্ব দুর্বল অথবা ধারণামূলক হলে সে ক্ষেত্রে মতপার্থক্য (ইকতিলাফ) দেখা দিতে পারে বলে আমরা প্রত্যাশা করতে পারি, তা হলে স্বাভাবিকভাবেই তা মতৈক্য বহির্ভূত বলে গণ্য হবে। অন্য কথায় ইজমা নিজেই তার কর্তৃত্বের ব্যাখ্যা দেয়।

ইজমার সম্ভাব্যতা

মুতাজিলা নেতা ইব্রাহিম আল নাজ্জাম ও কতিপয় শিয়া আলেমসহ কিছুসংখ্যক আলেম মনে করেন যে, জমহুর আলেমগণ ইজমার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। স্পষ্ট নয় এমন কোনো বিষয়ে আলেমদের সর্বসম্মত মতৈক্য পৌঁছানোর বিষয়টি নিরূপণ করা কোনো নির্দিষ্ট সময়ে তারা কী বলেন এবং কী খান সে সম্পর্কে মতৈক্যে পৌঁছানোর মতোই অসম্ভব।[৫২]

www.pathagar.com

কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে মুজতাহিদদের মধ্যে মতৈক্যের একটি ব্যাপকভিত্তিক রূপরেখা নিরূপণ করা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু বলা যায় যে, তাদের মধ্যে এভাবে মতৈক্যে পৌঁছার বিষয়টি জানা সম্ভব হলেও তাতে ইতিবাচক জ্ঞান সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। কারণ মুজতাহিদগণ সাধারণত অনেক দূরের স্থান, নগরী বা মহাদেশে অবস্থান করে থাকেন তাই তাদের সবার কাছে পৌঁছানো ও তাদের সবার মতামত গ্রহণ করা বাস্তবতার মধ্যে পড়ে না। অমুজতাহিদদের থেকে মুজতাহিদদের মধ্যে পার্থক্য করাও কঠিন। যেহেতু মুজতাহিদদের সর্বসম্মত মতৈক্যে ইজমা গঠিত হয় সেহেতু তাদেরকে অবশ্যই নিশ্চিতভাবে চেনা প্রয়োজন। মুজতাহিদদের গুণাবলির বিচারের সুস্পষ্ট মাপকাঠি যেমন নেই, তেমনি তাদের মধ্যে এমন অনেকে রয়েছেন যারা তেমন খ্যাতি অর্জন করেননি। এমনকি তাদের পরিচিত বলে ধরে নিলে এবং তাদের বিবেচনার মধ্যে গণ্য করলেও ইজমা গঠিত হওয়ার পূর্বে মত প্রদানকারী মুজতাহিদ যে তার এ মত পরিবর্তন করবেন না এমন কোনো গ্যারান্টি নেই। এমন সম্ভাবনা যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ কোনো ইজমা গঠিত হবে না কারণ ইজমার শর্ত হলো সব মুজতাহিদকে একই সাথে মতৈক্যে উপনীত হতে হবে।[৫৩]

প্রধানত, এসব কারণে ইমাম শাফেয়ী কেবলমাত্র অবশ্য করণীয় বিষয়গুলোর মধ্যে ইজমা গঠনকে সীমিত করেছেন, এ ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে ইজমা গঠনের প্রস্তাব আদৌ বাস্তবসম্মত নয়।[৫৪]

আংশিকভাবে ইজমার বিশ্বাসযোগ্যতার প্রশ্নে উদ্বেগের কারণে জাহিরিগণ ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল কেবলমাত্র সাহাবিগণের রা. মতৈক্যকেই ইজমা বলে উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে ইমাম মালিক কেবলমাত্র মদিনাবাসীর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করেছেন। আর শিয়া ইমামত কেবলমাত্র রসুল সা.-এর পরিবারবর্গের (আহল আল বায়িত) মতৈক্যকে ইজমা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। শিয়া ফিকহতে একে সুন্নাহ্‌র অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এ কারণে আহল আল বায়িতের (তাহলো শিয়াদের স্বীকৃত ইমামগণ) মতৈক্য আপনাআপনি সুন্নাহ্‌র অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হবে। শিয়া মতের ব্যাখ্যায় মুতাহারী বলেছেন, 'ঐকমত্য রসুল সা.-এর সুন্নাহ্ পর্যন্ত প্রসারিত। ঐকমত্য প্রকৃতপক্ষে আপন অধিকার বলে বাধ্যতামূলক নয় বরং এটি সুন্নাহ্‌র আবিষ্কারে ঠিক যতটুকু সহায়ক ঠিক ততটুকুই বাধ্যতামূলক'।[৫৫]

শিয়া আলেমগণ ইজমা আহল আল বায়িতের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ এ যুক্তির সমর্থনে কুরআনের একটি আয়াত (সুরা আহজাব, ৩৩ : ৩৩) উল্লেখ করে থাকেন। তাতে বলা হয়েছে : 'আল্লাহ এটাই চান যে, তোমাদের নবির ঘরের লোকদের হতে অপরিচ্ছন্নতা দূর করে দেবেন এবং তোমাদের পরিপূর্ণরূপে পবিত্র করে দেবেন।'

www.pathagar.com

শিয়াদের এ মূলনীতি রসুল সা.-এর একটি হাদিসের ওপরও নির্ভরশীল। হাদিসটিতে রসুল সা. বলেছেন :

'আমি তোমাদের জন্য দু'টি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস রেখে যাচ্ছি, যা আঁকড়ে ধরে রাখলে তোমরা কখনো গোমরাহীতে পতিত হবে না, তাহলো আল্লাহর কিতাব ও আমার পরিবার।' শিয়া ব্যাখ্যা অনুযায়ী এ হাদিসে আলী, ফাতিমা, হাসান ও হোসাইন রা.-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য সুন্নী আলেমগণ মনে করেন যে, আল আহজাবের আয়াতটি রসুল সা-এর স্ত্রীগণের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এবং এটি অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট ভিন্ন। অনুরূপভাবে উপরিউক্ত হাদিসটি উদ্ধৃত করে আল আমিদী যে অভিমত প্রকাশ করেন তাহলো : 'নিঃসন্দেহে আহল বায়িত অতুচ্চ মর্যাদার অধিকারী। কিন্তু এ মর্যাদা ও বংশধর হওয়ার বিষয় কারোর ইজতিহাদ করার সামর্থ্যের মানদণ্ড হওয়ার জন্য জরুরি নয়।'[৫৬]

আরেকটি মত রয়েছে যাতে বলা হয়েছে যে, ইজমা গঠন সম্ভব নয়। বস্তুত তা জরুরিও নয়। যেহেতু ইজমা ইজতিহাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তাই মুজতাহিদকে অবশ্যই সূত্রের প্রমাণের (দলিল) ওপর নির্ভর করতে হবে, যা হয় চূড়ান্ত (কাতয়ী) না হয় ধারণামূলক (যন্নী)। যদি বিষয়টি পূর্বেরটি হয়-তাহলে মুসলিম উম্মাহর কাছে বিষয়টি অবশ্যই অজানা থাকবে না, কারণ নুসুসের একটি চূড়ান্ত দলিল সমগ্র মুসলিম উম্মাহর কাছে গোপন থাকা সম্ভব নয়। তাই নসের সমর্থন জানানো অথবা তা জনগণকে জানানোর জন্য ইজমার কোনো দরকার নেই। উপরন্তু কাতয়ী দলিল নিজেই কর্তৃত্বের অধিকারী সে ক্ষেত্রে ইজমা গঠন হবে অনাবশ্যক।[৫৭]

অন্য কথায় ইজমা চূড়ান্ত নসের কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে কিছুই সংযোজন করতে পারে না। কিন্তু নসের দলিল ধারণামূলক হলে সে ক্ষেত্রেও কোনো ইজমা গঠিত হবে না, একটি ধারণামূলক দলিল কেবল মতবিরোধ বা ইখতেলাফই বাড়ায়, ইজমা গঠন করে না।[৫৮]

পিতার উদ্ধৃতি দিয়ে আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে হাম্বল একটি বিবরণে জানান : কোনো ব্যক্তির পক্ষে ইজমার অস্তিত্ব থাকার দাবি করা মিথ্যা বৈ কিছু নয়। যিনিই ইজমার দাবি করছেন তিনি মিথ্যা বলছেন।[৫৯] অবশ্য জমহুর আলেমগণের মত হলো, ইজমা গঠন হওয়া সম্ভব এবং অতীতে তা সংগঠিত হয়েছেও। তারা আরো বলেন, যারা একে অস্বীকার করছেন তারা একটি সম্ভাবনার বিষয়কে সংশয়ে নিপতিত করছেন, যা ইতোমধ্যে সংগঠিত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে এক ব্যক্তির ছেলের জেলে থাকা অবস্থায় তার ছেলেকে উত্তরাধিকারীর বাইরে রাখা সংক্রান্ত সাহাবিদের রা. ইজমার কথা তুলে ধরা যায়। এ ছাড়া বিজিত অঞ্চলের ভূখণ্ড বা জমি বিজয়ীদের মধ্যে বণ্টন না করা সংক্রান্ত তাদের ভূমি আইন অথবা আপন

ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে রক্ত সম্পর্কিত ভাইদের পূর্ণ ভাই হিসেবে গণ্য করা সংক্রান্ত তাদের সিদ্ধান্তও উল্লেখ করা যেতে পারে।[৬০] শেষ সিদ্ধান্তটি একটি হাদিসের ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয়, যাতে রসুল সা. তাদের উভয়কে ভাই হিসেবে গণ্য করেছেন এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি।[৬১] এসব বিষয়ে যে ইজমা গঠিত হয় তা চার খলিফার আমলে আদর্শ রেওয়াজ হিসেবে প্রতিপালিত হয়। খলিফাগণ রা. প্রায় বিভিন্ন বিষয়ে সাহাবিগণের রা. সঙ্গে সলাপরামর্শ করতেন এবং তাদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তের কথা জনগণের সামনে ঘোষণা করতেন।[৬২]

আবদুল ওহাব খাল্লাফের মতে, ইজমার সনাতনী সংজ্ঞা অনুযায়ী আধুনিক যুগে ইজমা গঠন সম্ভব নয়। খাল্লাফ বলেন, সরকারের হস্তক্ষেপের কোনো ব্যবস্থা ছাড়া মুসলিম ব্যক্তি ও সমাজের হাতে ন্যস্ত করা হলে ইজমাকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হবে না। কিন্তু ক্ষমতাসীন কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ গ্রহণ করলে ইজমা বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, প্রত্যেক মুসলিম রাষ্ট্রের সরকার মুজতাহিদের পদমর্যাদা অর্জনের জন্য কতিপয় শর্ত নির্দিষ্ট করে দিতে পারে। আর এজন্য তাদের একটি স্বীকৃত সনদ লাভ করতে হবে। এতে প্রত্যেক সরকার মুজতাহিদদের শনাক্ত করতে এবং প্রয়োজন হলে তাদের মতামত গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। যখন সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে সমগ্র মুসলিম ভূখণ্ডের সব মুজতাহিদের সিদ্ধান্ত জানা যাবে তখন ওই বিষয়ে ইজমা গঠিত হবে এবং এভাবে গঠিত বিধান সমগ্র মুসলিম বিশ্বের শরিয়াহর বাধ্যতামূলক আহকামে পরিণত হবে।[৬৩] আবার প্রশ্ন আসছে যে, রসুল সা.-এর ওফাতের পর কোন যুগে কি সনাতনী সংজ্ঞার শর্ত পূরণ করে ইজমা গঠিত হয়েছিল। খাল্লাফ এ প্রশ্নের নেতিবাচক জবাব দিয়েছেন। অবশ্য অনেক আলেম মনে করেন যে, সাহাবিদের রা. ইজমায় এসব শর্ত পূরণ করা হয়েছে। খাল্লাফ এ বিষয়ে বলেন, যে কেউ সাহাবিগণের রা. যুগের ঘটনা গভীরভাবে পরীক্ষা করলে দেখতে পাবেন যে, তাদের মধ্যকার বিদ্বান ব্যক্তিদের মতৈক্যের মাধ্যমে ইজমা গঠিত হয়েছে। কোনো সমস্যা নিয়ে আলোচনার সময় উপস্থিত এসব ব্যক্তিদের মধ্যে এ মতৈক্য হয় এবং এ রায় হলো শূরার একটি সম্মিলিত সিদ্ধান্ত। খলিফা আবু বকর রা. কোনো সমস্যা নিরসনে কুরআন-সুন্নাহ্তে কোনো নির্দেশনা না পেলে তিনি সমাজের নেতাদের ডেকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতেন এবং তারা একটি মতের ব্যাপারে একমত হলে তিনি সে অনুযায়ী কাজ করতেন। এ ধরনের আলোচনা সভায় সমাজের সব নেতাকে ডাকা হতো না। বস্তুত : তাদের অনেকে সে সময় মক্কা, সিরিয়া, ইয়ামেন ইত্যাদি স্থানে বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। সে যুগে বিভিন্ন নগরীতে বসবাসকারী সব মুজতাহিদের ঐকমত্য না হওয়া পর্যন্ত আবু বকর রা. কোনো বিরোধ নিষ্পত্তি স্থগিত রেখেছিলেন এমন কোনো বিবরণ জানা যায়নি। বরং যারা

www.pathagar.com

উপস্থিত ছিলেন তাদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে তিনি কাজ করেছেন। দ্বিতীয় খলিফা ওমর ইবনে খাত্তাবও রা. তার পূর্বসূরির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছেন এবং ফকিহগণ একেই ইজমা বলে উল্লেখ করেছেন। এ ধরনের ইজমা কেবলমাত্র সাহাবিগণের রা. জামানায় এবং আন্দালুসিয়ায় মাঝে মধ্যে চর্চা করা হতো। দ্বিতীয় হিজরি শতকে আন্দালুসিয়ায় প্রতিষ্ঠিত উমাইয়া রাষ্ট্রে আইন সংক্রান্ত বিষয় (তাশরি) নিয়ে আলোচনার জন্য একটি ওলামা পরিষদ গঠন করা হয়েছিল। আন্দালুসিয়ার কয়েকজন আলেমের রচনা থেকে ওই পরিষদের অমুক অমুক 'বিজ্ঞ সদস্য' সম্পর্কে জানা যায়।

ইসলামের ইতিহাসে এ দুই সময়ের ব্যতিক্রম ছাড়া কোথাও বিচার্য বিষয়ে সম্মিলিত ইজমা সংগঠনের কোনো ঘটনা জানা যায়নি। মুজতাহিদগণ ব্যক্তিগতভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্মতৎপর ছিলেন এবং তাদের মতের সাথে অন্য মুজতাহিদগণ হয় ঐকমত্য না হয় ভিন্নমত পোষণ করতেন। নির্দিষ্ট কোনো মুজতাহিদ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো বিষয় সম্পর্কে এ কথা বলতে সক্ষম হতেন যে, এই হুকম অথবা ওই ঘটনার বিষয়ে কোনো মতপার্থক্য নেই।[৬৪]

ইজমার প্রকারভেদ

সংগঠিত হওয়ার পদ্ধতির আলোকে ইজমাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

ক. স্পষ্ট ইজমা (আল ইজমা আল সারিহ)। এতে প্রত্যেক মুজতাহিদ তাদের মতামত মৌখিকভাবে অথবা কাজের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। এবং

খ. নীরব ইজমা (আল ইজমা আল সুকুতি)। এতে কোনো যুগের কিছুসংখ্যক মুজতাহিদ কোনো ঘটনা সম্পর্কে তাদের অভিমত প্রকাশ করেন এবং অন্যরা নীরব থাকেন।

জুমহুর আলেমদের মতে, স্পষ্ট ইজমা সুনির্দিষ্ট এবং তা বাধ্যতামূলক। নীরব ইজমা হচ্ছে অনুমানমূলক ইজমা যা কেবল সম্ভাব্যতা (যন্নী) সৃষ্টি করে এবং ওই বিষয় নতুন করে ইজতিহাদের সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেয় না। যেহেতু নীরব ইজমায় অংশগ্রহণ সবার সুনির্দিষ্ট ঐকমত্য প্রকাশ করে না তাই প্রমাণ হিসেবে এর কর্তৃত্বের ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম শাফেয়ীসহ সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম মনে করেন যে, এটি কোনো প্রমাণ নয় এবং এ কারণে তাকে কতিপয় মুজতাহিদের পৃথক অভিমত ছাড়া বেশি কিছু মনে করা হয় না। তবে হানাফীগণ মনে করেন যে, নীরব ইজমা এ শর্তে প্রমাণ হিসেবে পরিগণিত হবে যে, যেসব মুজতাহিদ ছিলেন তারা অন্য মুজতাহিদদের মতো জানতেন এবং বিষয়টি তদন্ত ও

www.pathagar.com

মত প্রকাশের পর্যাপ্ত সময় পাওয়ার পরও তারা নীরব থাকার সিদ্ধান্ত নেন। যদি জানা যায় যে ভয়ভীতি অথবা তাকিয়া (সত্যিকার মত গোপন রাখা) অথবা বিরাগভাজন ও উপহাসের পাত্র হওয়ার উদ্বেগের কারণে নীরব ছিলেন, এরপর এমন একটি সুযোগ এলো যাতে একজন মুজতাহিদ তার মত প্রকাশ করতে পারবেন, কোনো কিছুই তাকে এ থেকে বাধা দিতে পারবে না, তারপরও তিনি নীরব থাকলে তাকে বর্তমান মতের সাথে ঐকমত্য পোষণের সমতুল্য বলে গণ্য করা হবে।[৬৫]

ইজমার সমর্থকরা আরো উল্লেখ করেন যে, কোনো বিষয়ে সব মুজতাহিদের প্রকাশ্য মতৈক্য অথবা খোলামেলা ভাষণ দান না ছিল রেওয়াজ না সম্ভব ছিল। প্রত্যেক যুগেই নেতৃস্থানীয় আলেমগণ একটি মতব্যক্ত করতেন আর অন্যরা তা মেনে নিতেন। ধরুন সমগ্র উম্মাহ্ একটি স্থানে সমবেত হয়ে চিৎকার করে বলল 'আমরা অমুক অমুক বিষয়ে একমত হয়েছি।' যদি এটি করা সম্ভবও হতো তা হলেও তা ইতিবাচক জ্ঞান গঠন করত না। তাদের কেউ কেউ তখনো ভয়, অনিশ্চয়তা ও তাকিয়ার কারণে নীরব থাকতেন।[৬৬]

এ ছাড়া হানাফীগণ 'ছাড়দান' (রুখসাহ্) ও মর্যাদাবান (আজিমাহ্)-এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন এবং পূর্বেরটির বিষয়ে হলেই কেবল নীরব ইজমা বৈধ হবে বলে বিবেচনা করেছেন। কঠোর আইন প্রতিষ্ঠার জন্য ইজমাকে বিবেচনা অবশ্যই কাজের দ্বারা সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা দিতে হবে বা প্রকাশ করতে হবে। কেবলমাত্র হানাফীগণই নীরব ইজমাকে বৈধতা প্রদান করেছেন। জাহিরিগণ একে পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন। অন্যদিকে আল জুরাইনি, আল গাজ্জালী ও আল আমিদীর মতো কয়েকজন শাফেয়ী বিশেষজ্ঞ কতিপয় আপত্তিসহ একে অনুমোদন করেছেন। আল গাজ্জালী আমাদেরকে বলেছেন, 'এটি ইজমা এ শর্তে যে যারা নীরব ছিলেন তাদের পক্ষ থেকে বিষয়টি অনুমোদনের দলিল নীরব মতৈক্যের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে।[৬৭]

এ বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়। একজন মুজতাহিদের নীরব থাকার পেছনে অনেক কারণ থাকতে পারে। তাদের সবাই মানসিক চাপের মধ্যে ছিলেন এবং তাদের নীরবতা সুনির্দিষ্টভাবে সম্মতি বোঝাচ্ছে এ কথা বলা হবে অযৌক্তিক। কিন্তু বিতর্ক ওঠা সত্ত্বেও নীরব ইজমা ব্যতিক্রমী কোনো কিছু নয়। অন্যদিকে এ কথা মনে করা হয় যে, ইজমা নামে আমাদের কাছে যেসব বিষয় পরিচিত তার অধিকাংশই এ শ্রেণিতে পড়ে।[৬৮]

মালেকী আলেমদের মতে, যেহেতু মদিনা নগরী ছিল ইসলামি শিক্ষার কেন্দ্র, 'হিজরতের আবাসস্থল' (দার আল হিজরাহ্) এবং অধিকাংশ সাহাবি রা. এ নগরীতে বসবাস করতেন তাই এ নগরীর জনগণের ঐকমত্য উচ্চ কর্তৃত্বের দাবি

www.pathagar.com

রাখে। অবশ্য সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম মনে করেন যে, 'মাদানী ইজমা আপনা থেকে কোনো প্রমাণ বহন করে না, যেমনটি ইমাম মালিক মনে করতেন। ইমাম মালিকের মতের ব্যাখ্যার ব্যাপারে তার শিষ্যদের মধ্যেও কোনো কোনো বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। এসব শিষ্যের কয়েকজন এ মত ব্যক্ত করেন যে, ইমাম মালিক কেবলমাত্র মদিনার জনগণের ইজমাকে একটি দলিল বুঝিয়েছেন তাদের বিবরণ ও বাস্তব বর্ণনার আলোকে (মিন জিহাহ আল নকল ওয়াল রিওয়াইয়াহ)। কারণ তারা শরিয়াহর উৎসের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। অন্যান্য মালিকী ফকিহ বলেন যে, ইমাম মালিক শুধু এ কথাই বুঝিয়েছেন যে, মাদানী ইজমা অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য, কিন্তু চূড়ান্ত নয়। আরেকটি দলও রয়েছে যারা বলে থাকে যে, ইমাম মালিক অন্তরে কেবলমাত্র সাহাবিদের রা. ইজমা পোষণ করেছিলেন। মাদানী ইজমার সমর্থকেরা তাদের যুক্তির সপক্ষে হাদিসও পেশ করেছেন। এসব হাদিসের মধ্যে কয়েকটি নিম্নে তুলে ধরা হলো :

المدينة طيبة تنفى خبثها كما ينفي الكير

خبث الحديد

মদিনা পবিত্র স্থান, আগুন যেমন ধাতু থেকে খাদ জ্বালিয়ে দেয়, তেমনি এ নগরীও এর অপবিত্রতা পরিষ্কার করে দেয়।

إن الاسلام ليأرز إلى المدينة كما تأرز

الحية إلى جحرها

ইসলাম মদিনার সাথে এঁটে আছে, যেমন সাপ তার গর্তের সাথে মিশে থাকে।[৬৯]

ফকিহদের অধিকাংশ অবশ্য এমত পোষণ করেন যে, হাদিস দু'টিতে নিছক মদিনার মর্যাদার কথা বলা হয়েছে, এর জনগণের নয়। এমনকি হাদিস দু'টি যদি মদিনার অপবিত্রতা বজায় থাকার বিষয় নাকচ করে দেয় বুঝায় বলে ধরে নেওয়া হয়, তাহলেও তাতে উম্মতের অন্যদের অপবিত্র বোঝাচ্ছে না। এমনকি তাতে কেবলমাত্র মদিনা ইজমার চূড়ান্ত কর্তৃত্ব রয়েছে তাও বুঝানো হয়নি। কোনো স্থানের পবিত্র হওয়ার বৈশিষ্ট্য যদি বৈধ মানদণ্ড হতো তাহলে মক্কার আরো বেশি কর্তৃত্ব থাকত; কারণ মক্কা হচ্ছে কুরআনের নাম অনুযায়ী সবচেয়ে পুণ্যময় নগরী (আফজাল আল বিলাদ)। উপরন্তু জ্ঞান ও ইজতিহাদের যোগ্যতাকে কোনো নির্দিষ্ট স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়নি। রসুল সা.-এর একটি হাদিসে এ বিষয়টি সমর্থিত আছে। তাতে বলা হয়েছে :

www.pathagar.com

أصحابي كالنجوم بأيّهم أقتديتم أهتديتم

আমার সাহাবিরা নক্ষত্রের মতো। তোমাদের মধ্যে যারাই তাদের কাউকে অনুসরণ করবে তারা সঠিক পথের দিশা লাভ করবে।

সাবাহীগণ কোথায় বসবাস করতেন সে বিষয়ের প্রতি এ হাদিসে কোনো গুরুত্ব দেয়া হয়নি।[৭০]

এ বিশ্লেষণের আলোকে ইবনে হাজম বলেছেন যে, আমরা কুরআন থেকে জানতে পেরেছি যে, অন্যান্য নগরীর মতোই মদিনাতেও ফাসেক ও মুনাফিকরা ছিল। সাহাবিগণ রা. মদিনার ভেতরে বা বাইরে যেখানেই থাকুন না কেন, তারা রসুল সা.-এর শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞান রাখতেন কেবল মদিনাতে বসবাসের কারণেই জ্ঞানের দিক থেকে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেত অথবা তাদের ইজতিহাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেত, তা নয়।[৭১]

ইজমার ভিত্তি (সনদ)

সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মত অনুযায়ী ইজমা অবশ্যই কুরআন-সুন্নাহ্‌র কর্তৃত্বে অথবা ইজতিহাদের ভিত্তিতে গঠিত হতে হবে। আল আমিদী উল্লেখ করেছেন যে, মূল সূত্রে যার কোনো ভিত্তি নেই এমন বিষয়ে উম্মাহর সর্বসম্মত মতৈক্যে পৌঁছানোর সম্ভাবনা নেই।[৭২] আলেমদের মধ্যে এ বিষয়ে মতৈক্য রয়েছে যে, ইজমা কুরআন অথবা সুন্নাহ্‌র ভিত্তি গঠিত হতে পারে। অবশ্য কিয়াস অথবা মাস্‌লাহার মতো গৌণ দলিলের ভিত্তিতে কোনো বিধানের ওপর ইজমা গঠিত হতে পারে কি না সে ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে।

এ ব্যাপারে তিনটি মত রয়েছে। প্রথমটিতে বলা হয়েছে, কিয়াসের ভিত্তিতে কোনো ইজমা গঠিত হতে পারে না, এর সহজ কারণ হলো খোদ কিয়াসে নানা ধরনের সংশয় রয়েছে। যেহেতু কিয়াসের কর্তৃত্বকে দলিল হিসেবে গ্রহণের বিষয়ে আলেমগণ একমত নন, সেহেতু কিভাবে তার ভিত্তিতে ইজমা গঠন করা যায়? আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাহাবিগণ রা. কুরআন বা সুন্নাহ্‌র কর্তৃত্ব ছাড়া কোনো বিষয়ে মতৈক্য পোষণ করেননি। সাহাবিগণ রা. মতৈক্যে পৌঁছেছেন বলে জানা গেছে এমন সব বিষয়ের মূলেই প্রাথমিক সূত্রের কিছুটা কর্তৃত্ব ছিল।[৭৩]

দ্বিতীয় মত হচ্ছে, সব ধরনের কিয়াসই মতৈক্যের ভিত্তি গঠন করে। যেহেতু কিয়াস নস নয়, সাদৃশ্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, সেহেতু কিয়াসের ওপর নির্ভরশীলতা নসের ওপর নির্ভরশীলতার সমতুল্য, তাই যখন কিয়াসের ভিত্তিতে ইজমা গঠিত হয়-তখন তা মুজতাহিদের ব্যক্তিগত অভিমত নয় বরং শরিয়াহর নসের ভিত্তিতে গঠিত হয়।

www.pathagar.com

তৃতীয় মত হচ্ছে, যখন কিয়াসের কার্যকর কারণ (ইল্লত) নসে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয় অথবা ইল্লত অবিতর্কিতভাবে স্পষ্ট হয়, তখন কিয়াস বৈধভাবে ইজমার ভিত্তি গঠন করে। কিন্তু যখন কিয়াসের ইল্লত গোপন থাকে, নুসুসে তার কোনো স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় না, তখন তা ইজমার সুষ্ঠু ভিত্তি গঠন করতে পারে না। আবু জাহরাহ একে সঠিক মত বলে গণ্য করেন : যখন কিয়াসের ইল্লত নুসুসে নির্দেশিত হয় তখন ওই কিয়াসের ওপর নির্ভরশীলতা খোদ নসের ওপর নির্ভরশীলতার সমতুল্য হবে।[৭৪]

কিয়াসের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত ইজমার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একজন পিতা তার নাবালক সন্তানের অস্থাবর সম্পত্তির অভিভাবকত্বের অধিকারী। ইজমার মাধ্যমে নাবালক পৌত্র-পৌত্রীর অস্থাবর সম্পত্তির ওপর দাদারও অভিভাবকত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পিতা ও দাদার মধ্যকার সাদৃশ্যের ভিত্তিতে এ ইজমার বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মদ (শরাব) পানের দণ্ড প্রদানের শাস্তির বিধানেও অনুরূপ উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়। এজন্য ৮০টি কোড়া মারার দণ্ডবিধান করা হয় এবং এর সমর্থনে একটি ইজমা দাবি করা হয়। সাহাবিগণ যখন বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছিলেন তখন আলী ইবনে আবি তালিব রা. শরাব পান ও মিথ্যা অপবাদ দানের (কাজফ) মধ্যে সাদৃশ্য দেখতে পান। যেহেতু শরাব পান কাজফের দিকে ধাবিত করে, সেহেতু কিয়াসের মাধ্যমে পরেরটির সুনির্দিষ্ট দণ্ড পূর্বেরটির জন্য নির্দিষ্ট করা হয়। এ কথিত ইজমার বিষয়ে অবশ্য বিতর্কিত মতের সৃষ্টি করেছে, কারণ উমর ইবনে খাত্তাব রা. শরাব পানের দণ্ড ৪০ কোড়া ধার্য করেছিলেন। আর আহমদ ইবনে হাম্বল এ মতটি গ্রহণ করেছেন। তাই এ বিষয়ে ইজমার দাবি করা অযৌক্তিক।[৭৫]

ইজমার প্রচার

এখানে যে বিষয়টি পরীক্ষা করা হবে তাহলো ইজমার দ্বারা যে কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয় নির্ধারিত হয়েছে বাস্তবিক পক্ষে তার সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রকৃতি কেমন ছিল তা প্রমাণ করা যেতে পারে। এই প্রেক্ষাপটে ইজমাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়, তাহলো অর্জিত (মুহাচ্ছাল) ইজমা ও সম্প্রচারিত (মানকুল) ইজমা। প্রথমটি বর্ণনাকারী বা প্রচারকারীদের অংশগ্রহণে গঠিত হয়। এভাবে যখন মুজতাহিদগণ কোনো বিষয়ের ওপর সিদ্ধান্তে ঐকমত্যে উপনীত হন তখন তারা অন্য মুজতাহিদের মত সম্পর্কে সরাসরি জ্ঞান লাভ করতে পারেন। কিন্তু সম্প্রচারিত ইজমা এমন বিবরণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়, যা হয় বিচ্ছিন্ন (আহাদ) অথবা চূড়ান্ত (মুতাওয়াতির)। তাওয়াতির দ্বারা সম্প্রচারিত ইজমা হলেও সে ক্ষেত্রে তা অর্জিত ইজমার মতো একইভাবে প্রমাণিত হবে। কিন্তু বিচ্ছিন্ন বিবরণের দ্বারা গঠিত

www.pathagar.com

সম্প্রচারিত ইজমার ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। আল গাজ্জালীর মতে, ইজমা প্রমাণের জন্য বিচ্ছিন্ন বিবরণ যথেষ্ট নয়। অবশ্য কিছু সংখ্যক ফকিহ এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। এর কারণ হলো, ইজমা হচ্ছে একটি চূড়ান্ত দলিল, অন্যদিকে আহাদ বিবরণ ধারণামূলক দলিল বৈ কিছু নয়। তাই তা ইজমা প্রতিষ্ঠা করতে পারে না।[৭৬]

আল আমিদী এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, শাফেয়ী, হানাফী ও হাম্বলী মাজহাবের অনেক আলেম বিচ্ছিন্ন বিবরণের মধ্যেমে গঠিত ইজমাকে বৈধ প্রমাণ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন, অন্যদিকে হানাফী ও শাফেয়ী মাজহাবের অন্য একদল আলেম তাকে বৈধতা প্রদান করেননি। তৎসত্ত্বেও তাদের সবাই একমত হয়েছেন যে, বিচ্ছিন্ন বিবরণের মাধ্যমে যাই প্রমাণিত হোক না কেন, এমনকি তার বিষয়বস্তু (মতন) সুনির্দিষ্ট হলেও তা হবে ধারণামূলক দলিল (সুবুত)।[৭৭]

কেবলমাত্র সাহাবিগণের রা. ইজমাই তাওয়াতুরের দলিলের মাধ্যমে প্রমাণিত বলে দাবি করা যেতে পারে। এ ছাড়া অন্য কোনো ইজমা তাওয়াতুরের মাধ্যমে সম্প্রচারিত হয়েছে বলে জানা যায়নি। মূলত এ কারণেই সাহাবিগণের রা. ইজমা ছাড়া অন্য কোনো ইজমার ব্যাপারে ফকিহগণ একমত হতে পারেননি। বিপুলসংখ্যক উসুলের আলেম মনে করেন যে একক হাদিসের মাধ্যমে সম্প্রচারিত হলে তা কেবলমাত্র ধারণামূলক দলিল বুঝাবে। এ ধরনের দলিলের ভিত্তিতে ইজমা গঠিত হলে তাতে তার মান লোপ পাবে এবং ইজমা যে হুকমের দাবি করে তাকে অবশ্যই তার সূত্রের নির্দেশ করতে হবে, যা থেকে প্রথমে তা সংগ্রহ করা হয়েছিল।[৭৮]

সংস্কার প্রস্তাব

ইজমার আধুনিক সমালোচকেরা মনে করেন যে এর সনাতনী সংজ্ঞা অনুযায়ী ইজমা আধুনিক যুগে উম্মাহর সমস্যা সমাধান অনুসন্ধান প্রচেষ্টায় সম্পৃক্ত হতে ব্যর্থ হয়েছে। ইজমা একটি অতীতমুখী গতিহীন পদ্ধতি ও অতি ধীর প্রক্রিয়ার কারণে তা সামাজিক পরিবর্তনের সমস্যার সাথে খাপ খাওয়াতে পারছে না। সামাজিক বাস্তবতার আলোকে এসব ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনায় এনে আধুনিক বিশেষজ্ঞরা ইজমার প্রাসঙ্গিকতার ব্যাপারে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। আমরা ইতোমধ্যে ইজমার সম্ভাবনার ব্যাপারে আব্দুল ওহাব খাল্লাফের অভিমত সম্পর্কে আলোচনা করেছি। অবশ্য ইজমার সমালোচকদের মধ্যে খাল্লাফই প্রথম ব্যক্তি নন।

ইজমার প্রাথমিক যুগের সমালোচক হলেন শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (মৃত্যু, ১১৭৬/১৭৬২)। তিনি ইজমাকে বাস্তবতার কাছাকাছি নিয়ে আসার চেষ্টা করেন

www.pathagar.com

এবং ইজমার ধারণার মধ্যে 'আপেক্ষিকতার' প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন। এ ছাড়া দেহলভী আপেক্ষিক ইজমার ক্ষেত্রে সার্বজনীন মতৈক্যের ধারণাকে নাকচ করে দেন। তিনি ইজমা সম্পর্কিত হাদিসের ব্যাখ্যারও সমালোচনা করেন। তিনি যুক্তি দেন যে 'আমার উম্মত কখনো ভ্রান্তিকর বিষয়ে একমত হবে না' এ হাদিসটি আদৌ ইজমা সম্পর্কিত নয়। তাই হাদিসটির সঠিক অর্থ অন্য একটি হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা করতে হবে যাতে বলা হয়েছে, 'আমার উম্মতের মধ্যে এমন একটি দল সব সময়ই সত্য পথের ওপর অটল থাকবে...।' .অন্যকথায় ইজমা কোনো সার্বজনীন মতৈক্য নয় বরং সীমিতসংখ্যক মুজতাহিদের মতৈক্য। ইজমার সমর্থনে উদ্ধৃত করা অন্যান্য হাদিস সম্পর্কে দেহলভী এ অভিমত ব্যক্ত করেন যে এসবের দু'টি প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে উম্মাহর রাজনৈতিক ঐক্য ও শরিয়াহর অখণ্ডতা। তিনি আরো মনে করেন যে, উম্মাহর ঐক্য ও অবিচ্ছেদ্যতা সংরক্ষণে এ ধরনের সব হাদিসের মানদণ্ডে ইজমাকে যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে তিনি এ কথাও বলেন যে ইজমা উম্মাহর সব সদস্যের (অথবা ওই বিষয়ে সমাজের সব জ্ঞানবান ব্যক্তির) সার্বজনীন ঐকমত্যের ভিত্তিতে গঠিত হয়েছে এ কথা কখনোই বুঝানো হয়নি, কেননা সহজ কথায় তা হওয়া কখনোই সম্ভবও নয়। অতীতে কখনো এরূপ ঘটেনি এবং ভবিষ্যতেও হবে না। শাহ ওয়ালি উল্লাহর মতে ইজমা হচ্ছে বিভিন্ন শহর ও এলাকার আলেম ও কর্তৃপক্ষের সর্বসম্মত মত। এ অর্থে যে কোনো স্থানে যে কোনো সময় ইজমা গঠিত হতে পারে। ওমার ইবনে খাত্তাব রা. এর খেলাফতকালে সাহাবিগণের রা. ইজমা এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে মক্কা শরিফ ও মদিনা মনোয়ারায় যেসব ইজমা সম্পাদিত হয় তার সবই হলো আপেক্ষিক অর্থে ইজমার উদাহরণ।[৭৯]

মুহাম্মদ ইকবাল প্রধানত আধুনিক সংবিধিবদ্ধ আইন প্রক্রিয়ায় ইজমার অন্তর্নিহিত শক্তিকে কিভাবে প্রয়োগ করা যায় তার চিন্তা করেছিলেন। তিনি একে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হিসেবে বিবেচনা করেন অথচ তা প্রধানত তত্ত্বীয় রয়ে গেছে। ইকবাল লিখেছেন, বিস্ময়ের বিষয় হলো এ গুরুত্বপূর্ণ নীতিটি কদাচিৎ একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের রূপ নিতে পেরেছে। এরপর তিনি আধুনিক যুগের ইজমা গঠনের একমাত্র সম্ভাব্য উপায় হিসেবে মাজহাবের ব্যক্তি প্রতিনিধির পরিবর্তে একটি মুসলিম আইন পরিষদের কাছে ইজতিহাদের ক্ষমতা হস্তান্তর করার পরামর্শ দেন।[৮০] এ ধরনের আইন পরিষদে আলেমগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন, তবে সাধারণ জনগণকেও এর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে কারণ তারাও সব বিষয়ে প্রতি ঘনিষ্ঠ দৃষ্টি রাখে। ইকবাল ইজমার দু'টি কাজের মধ্যে যে পার্থক্য করেছেন তা নিম্নে তুলে ধরা হলো :

www.pathagar.com

> আইন উদ্ভাবন ও আইন বাস্তবায়ন করা। পূর্বেরটি ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট আর পরেরটি আইনের সাথে সম্পর্কিত। পূর্বেরটির উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যখন প্রশ্ন দেখা দেয় যে মুয়াজ্জাতান নামে পরিচিত দু'টি ছোট্ট সুরা কুরআনের অংশ গঠন করেছিল কি না এবং সাহাবিগণ রা. সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নেন যে তা করেছে। আমরা তাদের সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য, স্পষ্টত এ কারণে যে কেবলমাত্র সাহাবিগণ রা. এ ঘটনা জানার অবস্থানে ছিলেন। পরের ঘটনা হলো শুধু ব্যাখ্যার বিষয়। পরবর্তী প্রজন্ম সাহাবিগণের রা. সিদ্ধান্ত মেনে চলতে বাধ্য নয় বলে কারখী যে মন্তব্য করেছেন সে বিষয়ে আমি চিন্তাভাবনা করেছি।[৮১]

এভাবে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে ইকবাল ঘটনার সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে ইজমা বহাল রেখেছেন কিন্তু বিচার্য বিষয়ে ইজতিহাদের ভিত্তিতে গঠিত ইজমা নয়। ইকবাল বাস্তব ঘটনা ও বিচারিক ইজমার পার্থক্যে যে প্রস্তাব করেছেন তা ইজমার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে না বলে ধরে নেয়া যায়; আইনের বিষয়ে আইন পরিষদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত স্বাভাবিকভাবে বাধ্যতামূলক হবে।

অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা ইকবালের সংস্কার প্রস্তাবকে ব্যাপকভাবে সমর্থন করেছেন। এটি মৌলিকভাবে একটি সুষ্ঠু প্রস্তাব। কিন্তু এর সাথে বাস্তব ঘটনা ও ইজতিহাদী ইজমার মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কিত করার বিষয়টি দৃশ্যত প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে। বিচার্য বিষয়ে ইজমা থেকে ঘটনা সম্পর্কিত ইজমাকে পৃথক করা কঠিন হওয়া ছাড়াও ইজতিহাদী বিষয়ে সাহাবিগণের রা. ইজমা বাধ্যতামূলক নয়, এ মতের প্রতিও সমর্থন পাওয়ার কোনো আশা করা যায় না।

অবশ্য অন্যান্য কারণেও ইকবালের মতকে সমালোচনা করা হয়েছে। এস এম ইউসুফের মতে, ইকবাল ইজমাকে আধুনিক আইন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করে ভুল করেছেন। ইউসুফ যুক্তি দেখান যে ইজতিহাদ ও ইজমা কখনোই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের একচ্ছত্র আধিপত্যের আওতায় ছিল না এবং প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের যে কোনো চেষ্টা ইজমার প্রকৃতিকে পরিবর্তন করে দিতে বাধ্য এবং এতে এর মৌলিক উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে। আর ইজতিহাদ হচ্ছে প্রত্যেক বিদ্বান ব্যক্তির অস্থানান্তরযোগ্য অধিকার এবং একটি সময় ধরে মেধা ও গুণাবলির জন্য পরিচিতি অর্জনের মাধ্যমে একজন মুজতাহিদ তার সমাজের কাছ থেকে তার স্বীকৃতি পেয়ে থাকেন; নির্বাচনী প্রচারণা বা সরকারি সনদের মাধ্যমে তিনি তা লাভ করেন না। ইজমা গঠনের পদ্ধতি আধুনিক রাষ্ট্রের আইন সভার আইন প্রণয়নের পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ইজমা স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গঠিত হয়, যা অনেকটা 'যোগ্যতমের টিকে থাকার' সমতুল্য। এ প্রক্রিয়ায়

www.pathagar.com

বিরোধিতার কণ্ঠরোধ অথবা সংখ্যালঘু মতকে পর্যুদস্ত করার কোনো চেষ্টা করা হয় না। সত্য উদ্ভাসিত ও প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত বিরোধিতাকে সহ্য করা হয়। ইজমা হচ্ছে সমাজের বিবেকের প্রকাশ এবং মূলত ইজমার স্বাভাবিক শক্তি ও কঠোর সংগঠনের অনুপস্থিতির কারণে এটি সম্ভব হয়েছে, যাতে কেউ ইসলামের গায়ে হাত দিতে সমর্থ হয় না; যখনই কেউ ইসলামের ওপর আঘাত হানার চেষ্টা করেছে তখনই সে মর্ম বেদনার সাথে দেখতে পেয়েছে যে সে আসলে কেবল শূন্যে আঘাত হেনেছে।[৮২]

আহমদ হাসান এস এম ইউসুফ কর্তৃক ইকবালের সমালোচনার কিছু দুর্বল দিক দেখতে পেয়েছেন। তার মতে, ড. ইউসুফ সম্ভবত ইকবালের মতকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। হাসান মনে করেন, মুজতাহিদদের ব্যক্তিগত পর্যায়ে সংরক্ষিত রাখার পরিবর্তে সম্মিলিতভাবে ইজতিহাদ চর্চা সম্পর্কিত ইকবালের মত মৌলিকভাবে সঠিক। বর্তমানে বিচ্ছিন্নভাবে ইজতিহাদ করা সম্ভব নয়। আধুনিক পরিস্থিতির দাবি হচ্ছে ইজতিহাদ সম্মিলিতভাবে চর্চা করতে হবে। মুজতাহিদ ইসলামি শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হতে পারেন কিন্তু তিনি একটি দেশের সামাজিক অবস্থা ও সমস্যার বহুমুখী অবস্থা সম্পর্কে সঠিকভাবে অবহিত থাকার দাবি করতে পারেন না।[৮৩] আহমদ হাসান এ ব্যাপারে আরো বলেন যে সম্মিলিত ইজতিহাদের জন্য 'উপযুক্ত স্থান' হচ্ছে আইন পরিষদ যা জরুরি সমস্যার সমাধান অর্জনে একটি কার্যকর পদ্ধতি হতে পারে।[৮৪]

আল আজহারের মরহুম শায়েখ মাহমুদ শালতুত মনে করেন যে চূড়ান্ত ইজমার শর্ত– বিশেষ করে যাতে উম্মাহর সব মুজতাহিদের মতৈক্য জরুরি তা একটি তাত্ত্বিক প্রস্তাবনা বৈ কিছু নয় যা কখনোই বাস্তবে প্রকাশ পায়নি। বাস্তবে ইজমা বলতে হয় মতানৈক্যের অনুপস্থিতি ('আদাম আল ইলম বিল মুখাল্লিফ) অথবা কেবলমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের মতৈক্য (ইত্তিফাক আল কাসরাহ) বুঝায়। এর উভয়ই গ্রহণযোগ্য প্রস্তাবনা যা সাধারণ আইনের ভিত্তি গঠন করতে পারে। শালতুত তার এ বক্তব্যের সমর্থনে কুরআনের সুরা বাকারার একটি আয়াত (২ : ২৮৬) উদ্ধৃত করেন যাতে বলা হয়েছে : 'আল্লাহ কোনো প্রাণীর ওপরই তার শক্তি-সামর্থ্যের অতিরিক্ত দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেন না।' শালতুত ইজমার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের বিরোধী নন, শর্ত হচ্ছে মত প্রকাশের স্বাধীনতা লঙ্ঘন করা যাবে না এবং সব পরিস্থিতিতেই অবশ্যই ইজমা গঠনকারী পরিষদের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। রাজনৈতিক ক্ষমতার স্বেচ্ছাচারী প্রয়োগে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা অবদমিত হলে সে পরিস্থিতিতে কখনোই মতৈক্য অর্জন সম্ভব নয়। শালতুত আরো বলেন যে, ইজমার লক্ষ্য হচ্ছে ঐকমত্যের মাধ্যমে মাসলাহা অর্জন করা, অপরদিকে সময় ও স্থানের

www.pathagar.com

ব্যবধানের ভিত্তিতে মাসলাহারও তারতম্য হতে বাধ্য। তাই ইজমায় অংশগ্রহণকারী মুজতাহিদগণ ও তাদের উত্তরসূরিরা যদি পরিস্থিতির পরিবর্তনের বিষয় বিবেচনায় আনতে সক্ষম হন এবং ইজমার পর্যালোচনা যদি মাসলাহা অর্জনের একমাত্র উপায় বলে মনে হয় তাহলে তাদের পক্ষে বিগত সময়ের ইজমার পর্যালোচনা করা সম্ভব হতে পারে। যদি তারা দ্বিতীয় ইজমা গঠন করেন তাহলে তা প্রথমটিকে বাতিল করে দিয়ে তার স্থলাভিষিক্ত হবে এবং উম্মাহর সব সদস্যের জন্য তা পালন বাধ্যতামূলক হবে।[৮৫]

উপসংহার

ইজমা ও ইজতিহাদ উভয়ের সনাতনী সংজ্ঞায় যেসব শর্ত আরোপ করা হয়েছে তা কার্যত তাদেরকে এক কল্পনার রাজ্যে নিয়ে গেছে। আধুনিক যুগে সংবিধিবদ্ধ আইনের মাধ্যমে শরিয়াহর কতিপয় দিকের সংস্কার করার মুসলিম দেশগুলোর উদ্যোগে এসব সূত্রের অবাস্তবতার বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, পবিত্র কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াতের নতুন করে ব্যাখ্যার মাধ্যমে বিয়ে ও তালাকের ক্ষেত্রে কতিপয় আধুনিক সংস্কারের আইনগত ভিত্তি প্রদান করা হয়েছে। এসব সংস্কারে অনেকগুলো হয়তো আধুনিক যুগের ইজতিহাদের সঠিক দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তথাপি এসব দৃষ্টান্ত, তা সংবিধিবদ্ধ আইনের বিধি বা বিবরণের ব্যাখ্যা যাই হোক না কেন, তার কোনোটিকেই প্রকাশ্যে ইজতিহাদ বা ইজমা বলে উল্লেখ করা হয়নি। এসব ধারণার কঠোর সংজ্ঞার কারণে আধুনিক আইনের বিধানে এসব পরিভাষার অনুপস্থিতির ঘটনা হচ্ছে এর অবাস্তবতার এক বেদনাদায়ক প্রতিফলন। ইজতিহাদ ও ইজমার সনাতনী সংজ্ঞা হয়তো এক সময় মাত্রাতিরিক্ত মতবিরোধ নিরুৎসাহিত করার উদ্দেশ্য সাধনে কাজ করেছিল যা শরিয়াহর ঐক্য ও সংহতির প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু ইজতিহাদ বন্ধ করার লক্ষ্যে যে বিষয়টির চর্চার সূত্রপাত করা হয়েছিল তা অব্যাহতভাবে বহাল রাখার পক্ষে কোনো জোরাল যুক্তি থাকতে পারে না। ইজতিহাদ ও ইজমার ওপর অত্যন্ত কঠোর শর্ত আরোপের কারণে এ অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। শর্ত আরোপ প্রায়ই স্বাভাবিক কর্মতৎপরতা ও সৃজনশীলতার চেতনার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় অথচ এ স্বাধীন ও সৃজনশীল চেতনা খোলাফায়ে রাশেদীনের জামানা ও প্রাথমিক যুগের ফিকাহর ইমামদের সময়ের অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল।

ড. ইউসুফ সন্দেহজনক অনুমানের ভিত্তিতে ইকবালের প্রস্তাবিত সংস্কারের সমালোচনা করেছেন। ড. ইউসুফের মতে, নির্বাচিত আইন পরিষদে সমাজের মানুষের সম্মিলিত চেতনার প্রতিফলন ঘটবে না এবং তা অপরিহার্যভাবে ক্ষমতার রাজনীতির একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হবে। এ ধরনের অনুমানভিত্তিক

www.pathagar.com

সন্দেহের ব্যাপারে সতর্ক পরামর্শের বিষয়টি বোধগম্য, তথাপি এর পেছনে যে সন্দেহ কাজ করছে তা মাসলাহার চেতনা ও ইজমার ধারণার পরিপন্থী যাতে মুসলিম উম্মাহকে খোদায়ী আস্থায় অভিষিক্ত করা হয়েছে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও যোগ্যতা তাদের রয়েছে। যদি কেউ সমাজের 'ইসমাহর সমর্থনে খোদায়ী বিধানের মূল বক্তব্য অনুধাবন করেন তাহলে তাকে অবশ্যই এ আস্থা রাখতে হবে যে সমাজ কেবল এমন ব্যক্তিদের নির্বাচিত করবে যারা তাদের সম্মিলিত আবেগ-চেতনা ও মাসলাহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে। এ ছাড়া ইকবালের সমালোচনা করে ড. ইউসুফ নিছক এ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে সমসাময়িক জীবনের বাস্তবতার সাথে ইজমাকে সম্পৃক্ত করতে কিছু করা উচিত হবে না। এ সমালোচক ইজমা ও ইজতিহাদকে বর্তমান যুগের ব্যক্তি ও সমাজের ধরা ছোঁয়ার বাইরে রাখার ধারণার মধ্যে পরিতৃপ্তি বোধ করেছেন। এর বিপরীতে ইজমার ব্যাপারে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের যুক্তির প্রতি ব্যাপক সমর্থন রয়েছে। শরিয়াহর আইনের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিকের মধ্যে ব্যবধান বেড়ে আশঙ্কাজনক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে এবং একে আরো প্রলম্বিত করার যে কোনো চেষ্টা হবে অস্বাভাবিক প্ররোচনা দান। ইজমার সঠিক চেতনা ও স্বাভাবিক শক্তি সংরক্ষণে প্রতিটি পদক্ষেপ পুরোপুরি যুক্তিসঙ্গত। তবে এর অর্থ পুরোপুরি নিষ্ক্রিয়তা নয়। ইজমার প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা সম্পর্কে শালতুত যথার্থই বলেছেন যে ইজমায় অংশগ্রহণকারীদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতার বিষয়টি অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে যেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে এটি হলো তার মূল। ইজতিহাদ ও ইজমার প্রতি অবাধ আচরণের মাধ্যমে নয় বরং মত প্রকাশের স্বাধীনতা সংরক্ষণে সঠিক পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া উদ্ভাবনে সুবিবেচনাপ্রসূত আচরণের মাধ্যমে এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে। এ চেতনার মাধ্যমে কোনো বিষয়ে মতৈক্যে পৌঁছলে তাতে ইজমার সব না হলেও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধিকাংশ বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন থাকবে, এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

টিকা

১. পবিত্র কুরআনের (সুরা ইউনুসে ১০ : ৭১) শব্দাবলি ফাজমাউ আমরাকুম দেখতে পাওয়া যায়, এর অর্থ হলো, 'তোমার পরিকল্পনা ঠিক করো'। অনুরূপভাবে সুরা ত্ব-হাতে (২০ : ৬৪) অপরিচিত অনুসারীদের উদ্দেশ্যে আল্লাহর নবি নূহ আ. এর বক্তব্যে ফাজমাউ কায়দাকুম এর অর্থ হলো, 'তোমাদের কৌশল নির্ধারণ করো। লা সিয়ামা লিমান লাম ইয়াজমা' আল সিয়ামা মিন আল লাইল, এ হাদিসের অর্থ হলো, আগেই অর্থাৎ পূর্বের রাতেই ঠিক (নিয়ত) করা না হলে রোজা হবে না। বিস্তারিত জানতে দেখুন, আমিদী, আহকাম, ১, ১৯৫; শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ৭০।

www.pathagar.com

২. আমিদী, ইহকাম, ১, ১৯৬; শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ৭১; আবু জাহরাহ ও 'আব্দুল ওহাব খাল্লাফের ইজমার সংজ্ঞা একটি বিষয়ে আমিদী ও শাওকানীর সংজ্ঞা থেকে আলাদা। আর তা হলো ইজমার বিষয়বস্তু যা কেবলমাত্র শারয়ী বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকবে (দেখুন, আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ১৫৬ ও খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৪৫।

৩. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ৭১।

৪. কাজী আব্দুল জব্বারের উল্লিখিত আরেকটি মতে বলা হয়েছে, যুদ্ধ, কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা হচ্ছে পার্থিব বিষয় তাই এগুলোর ব্যাপারে ইজমার কিছু করার নেই। এ মতের সমর্থনে যে যুক্তি দেয়া হয় তা হলো, খোদ রসুল সা. এসব বিষয়কে সুন্নাতের আওতার বাইরে রেখেছেন, ইজমার ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য হবে। আমিদী অবশ্য সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকে সমর্থন করেছেন। তিনি বলেছেন, এসব বিধিনিষেধ ইজমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না (তার গ্রন্থ ইহকাম, ১, ২৮৪)।

৫. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ১৬৫।

৬. তুলনীয়, Aghnides, Muhammedan Theories, পৃষ্ঠা ৩৭-৩৮।

৭. তুলনীয়, আহমদ হাসান, Early Development, পৃষ্ঠা ১৬০।

৮. Goldziher, Introduction, পৃষ্ঠা ৫২।

৯. সহিহ মুসলিম, পৃষ্ঠা ২১২, হাদিস নম্বর ৮১৭; ইবনে মাজাহ, সুনান, ২, ৯১০, হাদিস নম্বর ২৭২৪; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ১৫৯-১৬১।

১০. শাহ ওয়ালীউল্লাহ, কুররাহ, পৃষ্ঠা ৪০।

১১. ইজমার জরুরি শর্তাবলি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন, খাল্লাফ, ইলম. পৃষ্ঠা ৪৫; শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ৭১।

১২. আমিদী, ইহকাম, ১, ২২৬; বাজদাবী অবশ্য যেসব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের প্রয়োজন নেই তা থেকে অন্য বিষয়গুলোকে আলাদা করে বলেছেন যে ইমানের সাথে সংশ্লিষ্ট জরুরি বিষয়াবলির ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ ও ফকিহদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা যাবে না। তাই যেসব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের প্রয়োজন সেসব কেবল মুজতাহিদদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। বিস্তারিত জানতে দেখুন, বাজদাবী, উসুল, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৯।

১৩. আমিদী, ইহকাম, ১ম খণ্ড, ২৩৫।

১৪. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ৭১।

১৫. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ১৬২।

১৬. আমিদী, ইহকাম, ১, ২৬১; আব্দুর ওহিম, Jurisprudence, পৃষ্ঠা ১২২।

১৭. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ১৬৪।

১৮. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ৭১।

১৯. আমিদী, ইহকাম, ১, ২৫৭; ইবনে হাজম, ইহকাম, ৪, ১৫৪।

২০. গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ১, ১২১।

www.pathagar.com

২১. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৪৬-৪৭; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ১৬৭।

২২. গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ১, ১১১; আমিদী, ইহকাম, ১, ২১৯।

২৩. আয়াতটিতে (সুরা নিসা ৪ : ৫৯) বলা হয়েছে : 'হে ইমানদারগণ তোমরা আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করো, তার রসুল সা.-এর আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যে যারা দায়িত্বশীল তাদের আনুগত্য করো।'

২৪. রাজী, তাফসির, ৩, ২৪৩।

২৫. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৪৭।

২৬. আয়াতটিতে (সুরা নিসা ৪ : ৮৩) বলা হয়েছে : 'তারা যদি এটা রসুল সা. ও তাদের জামায়াতের দায়িত্বশীল লোকদের কাছে পৌছিয়ে দেয় তাহলে তা এমন লোকদের গোচরীভূত হয় যারা তাদের মধ্যে কথা বলার যোগ্যতা রাখে এবং তা থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা রাখে।' (আরভিং অনূদিত)

২৭. আমিদী, ইহকাম, ১, ২১১।

২৮. একই গ্রন্থ, ১. ২১৭; গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ১, ১১৭।

২৯. গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ১, ১১১।

৩০. একই গ্রন্থ।

৩১. একই গ্রন্থ।

৩২. সুয়ুতী, তাফসির, ১, ৮৭।

৩৩. শাওকানী, ফাতহ আল ক্বাদীর, ১, ৫১৫; একই লেখক, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ৭৫। এ বিষয়ে শাওকানীর মতের চমৎকার সার-সংক্ষেপ জানতে দেখুন, সদর, ইজমা, পৃষ্ঠা ৩০-৪০।

৩৪. রশীদ রিদা, তাফসির আল মানার, ৫, ২০১। অনুরূপ মত সম্পর্কে জানতে দেখুন, সদর, ইজমা, পৃষ্ঠা ৪০।

৩৫. আমিদী, ইহকাম, ১, ২০৫।

৩৬. একই গ্রন্থ, ১, ২১৮।

৩৭. ইবনে মাজাহ, সুনান, ২, ১৩০৩, হাদিস নম্বর ৩৯৫০। গাজ্জালী ও আমিদী উভয়ে ইজমা সম্পর্কে এ হাদিস ও অন্যান্য হাদিস উদ্ধৃত করেছেন যা নিম্নে ৪১ নম্বর ফুটনোটে দেখানো হয়েছে।

৩৮. তুলনীয়, আহমদ হাসান, Doctrine, পৃষ্ঠা ৬০।

৩৯. গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ১, ১১১।

৪০. আমিদী মনে করেন যে এ হাদিসের সনদ রসুল সা. পর্যন্ত গিয়ে পৌছেছে (দেখুন, ইহকাম, ১, ২১৪)। আহমদ হাসান উল্লেখ করেন যে মুহাম্মদ ইবনে হাসান আল শাইবানী প্রাথমিকভাবে একে হাদিস হিসেবে বর্ণনা করেন তবে পরে বলা হয় যে, এটি ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত (দেখুন, Doctrine, পৃষ্ঠা ৩৭)।

৪১. গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ১, ১১১; আমিদী, ইহকাম, ১, ২২০-২২১।

www.pathagar.com

৪২. গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ১, ১১২।

৪৩. একই গ্রন্থ, ১, ১১২, উদাহরণ হিসেবে পবিত্র কুরআনে রসুল সা.-এর উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে : 'তিনি তোমাকে পথ না পাওয়া অবস্থায় (দাল্লান) পান, তারপর তিনিই পথ দেখান' (সুরা দুহা ৯৩ : ৭)। কুরআনের অন্য এক স্থানে নিম্নলিখিত ভাষায় বলা হয়েছে : 'মুসা জবাব দিলো, সেই সময় আমি (মিসরে অবস্থানকালে) সেই কাজ অজ্ঞতাবশত করেছিলাম' (সুরা আশ-শুআরা ২৬ : ২০)। উভয় উদাহরণে দাল্লান শব্দটি অবিশ্বাস বুঝায়নি। অনুরূপভাবে আরবি ভাষায় দল্লা ফুলান 'আন আল তুরিক (অমুক পথ হারিয়ে ফেলেছে) উচ্চারণে আল দাল্লান এর একই অর্থের বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে।

৪৪. একই গ্রন্থ।

৪৫. সদর, ইজমা পৃষ্ঠা ৪৩ নিষিদ্ধ 'লা'এর একটি কুরআনিক উদাহরণ হলো ব্যভিচার হারাম হওয়া সম্পর্কিত আয়াত যাতে বলা হয়েছে, লা তাকরাবু আল জিনা (জিনার ধারে কাছেও যেয়ো না)। হাদিসে নিষিদ্ধ 'লা' সরল অর্থে মুসলিম উম্মতকে ভ্রান্তির ব্যাপারে একমত না হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৪৬. সদর, ইজমা, পৃষ্ঠা ৪৩।

৪৭. রিদা, তাফসির আল মানার, ৫, ২০৫।

৪৮. সদর, ইজমা, পৃষ্ঠা ৪৪-৪৫।

৪৯. তুলনীয়, হাসান, Doctrine, পৃষ্ঠা ৫৯।

৫০. শাফেয়ী, রিসালাহ (খাদ্দুরী অনূদিত), পৃষ্ঠা ২৮৫।

৫১. হাসান, Doctrine, পৃষ্ঠা ৫৯-৬০।

৫২. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ৭৯; খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৪৮।

৫৩. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৪৯।

৫৪. শাফেয়ী, রিসালাহ, পৃষ্ঠা ২০৫; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ১৫৮।

৫৫. আমিদী, ইহকাম, ১, ২০৫; মুতাহারী, Jurisprudence, পৃষ্ঠা ২০।

৫৬. আমিদী, ইহকাম, ১, ২৪৬।

৫৭. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৪৯।

৫৮. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৪৯; শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ৭৯।

৫৯. আমিদী, ইহকাম, ১, ১৯৮; শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ৭৩।

৬০. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ১৫৯।

৬১. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১৬৫।

৬২. হাসান, Doctrine, পৃষ্ঠা ১৬৪।

৬৩. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৪৯-৫০।

৬৪. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৫০।

www.pathagar.com

৬৫. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৫১; শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ৭২।

৬৬. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ৭২; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ১৬৩।

৬৭. গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ১, ১২১; Encyclopedia of Islam (New Edition) ৩, ১০২৪।

৬৮. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৫১।

৬৯. সহিহ বুখারি, (ইস্তাম্বুল সংস্করণ), ২, ২২১; সহিহ মুসলিম, পৃষ্ঠা ১৭ হাদিস নম্বর ৩৮; আমিদী, ইহকাম, ১, ২৪৩; ইবনে হাজম ইজমা আহল আল মদিনা সম্পর্কে মোটামুটি আলোচনা করলেও আমিদী ও অন্যরা যেসব হাদিস উদ্ধৃত করেছেন তার একটিও উল্লেখ করেননি। তিনি কেবল এ কথা বলেছেন যে, মালেকীর মতের সমর্থনে উদ্ধৃত এসব হাদিসের কয়েকটি নির্ভুল (সহিহ) এবং জনৈক 'মুহাম্মদ ইবনে হাসান ইবনে যাবালাহ বর্ণিত অন্যগুলো জাল' (মাকযুব/ মাওদু'), (ইহকাম, ৪, ১৫৪-৫৫।)

৭০. আমিদী, ইহকাম, ১, ২৪৩।

৭১. ইবনে হাজম, ইহকাম, ৪, ১৫৫।

৭২. আমিদী, ইহকাম, ১, ২৬১।

৭৩. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ১৬৫-১৬৬।

৭৪. একই গ্রন্থ।

৭৫. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১৬৬, ১৯৩।

৭৬. গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ১, ১২৭; সদর, ইজমা, পৃষ্ঠা ৯৭-৯৮।

৭৭. আমিদী, ইহকাম, ১, ২৮১।

৭৮. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ১৬৭-১৬৮।

৭৯. শাহ ওয়ালিউল্লাহ, ইজালাহ, ১, ২৬৬।

৮০. ইকবাল, Reconstruction, পৃষ্ঠা ১৭৩-১৭৪।

৮১. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১৭৫। ইকবাল হানাফী ফকিহ আবুল হাসান আল কারখীর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন : 'কিয়াসের দ্বারা সুস্পষ্ট করা হয়নি এমন বিষয়ে সাহাবিগণের রা. সুন্নাহ্ অনুসরণ বাধ্যতামূলক কিন্তু কিয়াসের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিষয়ের ক্ষেত্রে তা হবে না, (এ বিষয়ে কারখী কোনো নির্দিষ্ট রচনার কথা উল্লেখ করেনি)।

৮২. ইউসুফ, Studies, পৃষ্ঠা ২১২-২১৮।

৮৩. হাসান, Doctrine, পৃষ্ঠা ২৪৪।

৮৪. একই গ্রন্থ।

৮৫. শালতুত, ইসলাম, পৃষ্ঠা ৫৫৮-৫৫৯।

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

কিয়াস (সাদৃশ্যলব্ধ সিদ্ধান্ত)

আভিধানিক অর্থে কিয়াস মানে কোনো কিছুর দৈর্ঘ্য ওজন বা গুণাগুণ পরিমাপ বা নিরূপণ করা, আর এ কারণে মানদণ্ড বা স্কেলকে মিকিয়াস বলা হয়ে থাকে। এভাবে আরবি বাক্য 'কাসাত আল-সাওব বিল জিরা'-এর অর্থ হলো গজকাঠি দিয়ে কাপড় মাপা।[১] কিয়াসের অর্থ তুলনা করাও হয় যাতে দু'টি জিনিসের মধ্যে সমতা বা সাদৃশ্য বুঝানো হয়ে থাকে। এভাবে আরবি বাক্য 'জিয়াদ ইউকাস ইলা খালিদ ফী আকলিহি ওয়া মাসাবিহ-এর অর্থ হচ্ছে বুদ্ধিমত্তা ও বংশমর্যাদার দিক থেকে জিয়াদের সাথে খালেদের তুলনা করা যায়।[২] এভাবে কিয়াস দু'টি জিনিসের মধ্যে সমতা বা ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য বুঝায় যার একটিকে মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করে অপরটির মূল্যায়ন করা হয়।

পারিভাষিক অর্থে কিয়াস হচ্ছে মূল বিষয় বা আসল থেকে নতুন বিষয় বা ফারাতে শরিয়াহর একটি হুকুমকে সংযোজন করা। কারণ পরেরটিতে পূর্বেরটির অনুরূপ কার্যকারণ বিদ্যমান থাকে। মূল বিষয় খোদা প্রদত্ত হুকুম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং কিয়াস নতুন বিষয়ে একই খোদায়ী বিধান সংযোজন করার চেষ্টা করে।[৩] মূল ও নতুন বিষয়ের মধ্যে অভিন্ন কার্যকর কারণ বা ইল্লত বিদ্যমান থাকার কারণে কিয়াসের প্রয়োগের যথার্থতা প্রতিপন্ন হয়েছে।

কুরআন-সুন্নাহ্ বা সুনির্দিষ্ট ইজমাতে কোনো নতুন বিষয়ের সমাধান পাওয়া না গেলেই কেবল কিয়াস অবলম্বন করার অনুমতি রয়েছে। বিদ্যমান আইনের বিধানের সাহায্যে কোনো নতুন ঘটনা নিষ্পত্তি করা সম্ভব হলে সে ক্ষেত্রে কিয়াস অবলম্বন হবে নিরর্থক চেষ্টা। নুসুস ও ইজমাতে যেসব বিষয় পাওয়া যায় না কেবল সেসব বিষয়ের ক্ষেত্রে সাদৃশ্যপূর্ণতা প্রয়োগের মাধ্যমে এসব উৎসের কোনো একটি থেকে আইন সংগ্রহ করা যেতে পারে।[৪]

ফকিহগণ অনেক সময় 'কিয়াস' শব্দটিকে একটি সাধারণ মূলনীতি বুঝাতেও ব্যবহার করেছেন। তাই আমরা প্রায়ই এমন বক্তব্য দেখতে পাই যে, এই বা ওই আইনটি প্রচলিত নীতি বা সাধারণ মূলনীতির পরিপন্থী এবং তা সাদৃশ্যপূর্ণতার কোনো উল্লেখ ছাড়াই বলা হয়ে থাকে। কিয়াস ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। প্রাথমিকভাবে কিয়াস কুরআন-সুন্নাহ্ সম্পর্কিত কোনো বিষয়ে যৌক্তিক সম্প্রসারণের সাথে সংশ্লিষ্ট, যা তার শব্দের অর্থের মধ্যে নাও পড়তে পারে। তাই দেখা যাচ্ছে যে, কিয়াস ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পরিসীমা থেকে এক ধাপ বাইরে রয়েছে। কিয়াসে দু'টি বিষয়ের মধ্যে সাদৃশ্য বা মিল খুঁজে বের করার ওপর স্পষ্টত

www.pathagar.com

গুরুত্ব প্রদান করা হয়, যা খোদায়ী বিধানের মূলপাঠের ভাষাতে নির্দেশিত হয় না। কার্যকর কারণ বা ইল্লত শনাক্তকরণের জন্য প্রায় ফকিহ্গণকে বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্লেষণে নিয়োজিত হতে হয়। তিনি কেবলমাত্র ভাষার অর্থ অবলম্বনে তা নির্ণয় করেন না, একই সাথে তাকে আইনের সাধারণ লক্ষ্যও অনুধাবন করতে হয়।

যেহেতু এটি বিদ্যমান আইনের একটি সম্প্রসারণ, তাই ফকিহ্গণ কিয়াস প্রক্রিয়ায় আইনের সম্প্রসারণের মাধ্যমে নতুন আইন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা স্বীকার করেন না। কিয়াস অর্থ হলো বিদ্যমান আইন আবিষ্কার, সম্ভবত তার বিকাশ সাধনও। কিয়াসে সৃজনশীলতা ও মানোন্নয়নের বিপুল সম্ভাবনা নিহিত থাকলেও প্রাথমিকভাবে এর লক্ষ্য কুরআন-সুন্নাহ্র মূল চেতনার সঙ্গতি বিধান নিশ্চিত করা। এ দৃষ্টিকোণ থেকে কিয়াসকে শরিয়াহর একটি উৎস (মাসাদির) বলা সম্ভবত ততটা যুক্তিসঙ্গত হবে না, বরং তাকে একটি প্রমাণ (হুজ্জাহ) বা সাক্ষ্য (দলিল) বলাই উত্তম হবে যার প্রাথমিক লক্ষ্য হচ্ছে, শরিয়াহর বিকাশে খোদায়ী বাণী ও যুক্তির মধ্যে সঙ্গতি বিধান নিশ্চিত করা। সর্বজনস্বীকৃত মতে কিয়াস হচ্ছে একটি যুক্তিবাদী মতবাদ; কিন্তু তাতে ব্যক্তিগত মত (রায়) সব সময়ই খোদায়ী বিধানের অধীনস্ত থাকে। কিয়াসে মানবীয় বিচার বুদ্ধির প্রধান কাজ হচ্ছে আসল ও নতুন ঘটনার মধ্যে অভিন্ন ইল্লত শনাক্ত করা। ইল্লত শনাক্ত করা সম্পন্ন হলে কিয়াসের বিধি অনুযায়ী প্রদত্ত খোদায়ী মূলপাঠের বিধানের কোনোরূপ হস্তক্ষেপ বা পরিবর্তন ছাড়াই তা পালন করা অপরিহার্য বলে গণ্য হবে। অতএব কোনো বিশেষ পরিস্থিতি বা ব্যক্তিগত পছন্দকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে খোদায়ী মূলপাঠের বিধানের পরিবর্তন করার হাতিয়ার হিসেবে কিয়াসকে ব্যবহার সম্ভব হবে না।

শরিয়াহর বিধিবিধানে কতিপয় উদ্দেশ্য (মাকাসিদ) অনুসৃত হয়ে থাকে। যেসব ফকিহ কিয়াসে অংশ নেন তারা এসব মাকাসিদের সাথে যুক্তির সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। আল্লাহর উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় আবিষ্কার ও শনাক্তকরণের যৌক্তিক উপস্থাপনের সঙ্গে আহকামের মূল্যায়নে মানবীয় বুদ্ধিমত্তা ও বিচার-বিবেচনা সম্পৃক্ত করা জরুরি। প্রকৃতপক্ষে তালীল বলে উল্লেখিত খোদায়ী আদেশের শুদ্ধতা অথবা অশুদ্ধতা নিরূপণে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার কারণে মুতাজিলা, জাহিরি, শিয়া ও কিছুসংখ্যক হাম্বলী আলেম কিয়াসের সমালোচনা করেছেন। যেহেতু খোদায়ী আদেশের কারণ ও উদ্দেশ্য অনুসন্ধানে প্রায়ই সুবিবেচনাপূর্ণ অনুমানের বিষয় সংশ্লিষ্ট থাকে, তাই কিয়াসের বিরোধীরা এর আবশ্যকীয় বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। তাদের যুক্তি হচ্ছে আইন অবশ্যই নিশ্চয়তার ভিত্তিতে হতে হবে, অন্যদিকে কিয়াস প্রধানত ধারণামূলক ও

www.pathagar.com

অনাবশ্যকীয়। যদি দু'টি ঘটনা একই রকম হয় এবং এর একটি বিষয়ে আইন বিদ্যমান থাকে সে ক্ষেত্রে কোনো কিয়াস হবে না, কারণ একই আইন উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। যদি তারা ভিন্ন হয় কিন্তু একটির সাথে আরেকটির মিলও থাকে তাহলে মূল ঘটনার হুকমের দ্বারা পরবর্তী বিবেচ্য ঘটনা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার খোদার অভিপ্রায় ছিল কি না তা জানা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিয়াসে অনিশ্চয়তার উপাদানকে আবারও স্বীকৃতি দিয়ে সব মাজহাবের আলেমগণ কিয়াসকে ধারণামূলক দলিল' হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। *সম্ভাবত এক প্রকার* কিয়াসের ব্যতিক্রম যাতে আয়াত থেকে কিয়াসের ইল্লত সুস্পষ্টভাবে শনাক্ত করা যায়। সাধারণভাবে কিয়াস কখনো নস বা সুনির্দিষ্ট ইজমার সমতুল্য নয়, কারণ এগুলো চূড়ান্ত দলিল (আদিল্লাহ কাতয়ীয়াহ); অন্যদিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিয়াস কেবলমাত্র সম্ভাব্যতা বুঝায়। অন্যকথায় এটা নিছক সম্ভাবনা, নিশ্চিত কিছু নয়। কিয়াসের ফলাফল আল্লাহ তায়ালার অভিপ্রায়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। এভাবে কিয়াসের শুদ্ধতার বিষয়টি সবসময়ই নুসুসের কতটা কাছাকাছি ও তার সাথে সামঞ্জস্যতার মাত্রার পরিমাপ করা হয়। কিয়াসের পদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের এ আলোচনা থেকে তাৎক্ষণিকভাবে এটি স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এ পদ্ধতির আরেকটি উদ্দেশ্য হলো, এ বিষয়টি নিশ্চিত করা যে, যেকোনো পরিস্থিতিতেই সাদৃশ্যলব্ধ বিধান বা কিয়াস নুসুস থেকে পৃথকভাবে কাজ করতে পারবে না। শুরুতে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলে আমাদের এ আলোচনা ফলপ্রসূ হবে।

১. কুরআন (আল জুমাআ, ৬২ : ৯) শুক্রবার জুমার নামাজের আজান শেষ থেকে নামাজ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত জিনিসপত্র বেচাকেনা নিষিদ্ধ করেছে। কিয়াসের মাধ্যমে এ নিষেধাজ্ঞা সব ধরনের লেনদেনের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করা হয়েছে। কারণ সব ক্ষেত্রে অভিন্ন কার্যকারণ বা ইল্লত হলো, নামাজ থেকে দৃষ্টি ভিন্ন দিকে চালিত করা।[৫]

২. রসুল সা. থেকে বর্ণিত হয়েছে :

لا يرث القاتل

'হত্যাকারী ব্যক্তি (নিহত ব্যক্তির) ওয়ারিশ হতে পারবে না।' কিয়াসের মাধ্যমে এ বিধানকে উইলের মাধ্যমে দান বা অসিয়তের ক্ষেত্রে সংযোজন করা হয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে হত্যাকারী হত্যার শিকার ব্যক্তির অসিয়তের মাধ্যমে কোনো সুফল পেতে পারবে না।[৬]

৩. আরেকটি হাদিসে বলা হয়েছে :

www.pathagar.com

لا يخطب الرجل على خطبة حتى ينكح
أو يترك

কোনো পুরুষের জন্য একজন বাগদত্তা নারীর কাছে বাগদানের প্রস্তাব করা নাজায়েজ, কারণ ইতোমধ্যে বাগদানকারী ব্যক্তি তাকে বাগদান করার অনুমতি প্রদান অথবা তার প্রস্তাব পুরোপুরি প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত ওই মহিলাকে বাগদান করা অন্য কোনো পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ। এ বিধানের ইল্লত হলো লোকদের মধ্যে সংঘাত ও বৈরিতা রোধ করা। কিয়াসের মাধ্যমে একই বিধানকে অনুরূপ ইল্লত রয়েছে এমন সব লেনদেনের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করা হয়েছে।[৭]

সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমগণ কিয়াসের সংজ্ঞায় বলেছেন, কেবল মূল ঘটনার (আসল) শরিয়াহর একটি হুকমকে এমন নতুন ঘটনায় (ফার) সংযোজন করা যে বিষয়ে শরিয়ত নীরব রয়েছে। কারণ উভয় ঘটনার মধ্যে অভিন্ন কার্যকারণ বা ইল্লত রয়েছে।[৮] কিয়াসের হানাফী সংজ্ঞাও মূলত অনুরূপ। অবশ্য সামান্য কিছু সংযোজন রয়েছে যার লক্ষ্য হলো, কয়েক প্রকার কিয়াসকে (যেমন- কিয়াস আল আওলা, কিয়াস আল মুসায়ী-কিউ, ভি,) কিয়াসের আওতার বাইরে রাখা। হানাফী ফকিহ সদর আল শরিয়ত তার গ্রন্থ তাউদিহ্তে কিয়াসের সংজ্ঞায় বলেছেন, মূল বিষয়ে (আসল) শরিয়াহর একটি হুকমে নতুন একটি বিষয়ে (ফার) উভয়ের মধ্যকার অভিন্ন কার্যকারণ বা ইল্লতের ভিত্তিতে সংযোজন করা, কারণ কেবল মূল হুকম প্রকাশের সাহায্যে নতুন বিধানটি উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না।[৯] এ সংজ্ঞায় সংযোজন করা কিয়াসের যেসব অত্যাবশ্যকীয় শর্ত রয়েছে তা নিম্নে উল্লেখিত হলো :

১. কুরআন-সুন্নাহ্তে মূল ঘটনা বা আসলের হুকম বর্ণিত রয়েছে এবং এর কিয়াসের মাধ্যমে নতুন ঘটনায় এ হুকমকে সম্প্রসারিত করা হয়।

২. নতুন ঘটনার (ফার) ব্যাপারে হুকম চাওয়া হয়।

৩. কার্যকারণ বা ইল্লত হচ্ছে আসলের একটি গুণ (ওয়াসফ) যা মূল ও নতুন উভয় হুকমের ক্ষেত্রে অভিন্ন বৈশিষ্ট্য বহন করে।

৪. মূল ঘটনা নিয়ন্ত্রণকারী হুকম নতুন ঘটনায় সম্প্রসারিত করা হয়।[১০]

এর দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা কুরআনের একটি আয়াত (সুরা মায়েদা ৫ : ৯৩) উদ্ধৃত করতে পারি। এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় মদপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিয়াসের মাধ্যমে যদি এ নিষেধাজ্ঞা সব মাদকদ্রব্যের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করতে হয়, তাহলে কিয়াসের চারটি স্তম্ভ থাকবে :

www.pathagar.com

আসল	ফার	ইল্লত	হুকম
মদপান,	মাদক গ্রহণ	ক্ষতিকর প্রভাব	হারাম

কিয়াসের চারটি অত্যাবশ্যকীয় শর্তের (আরকান) প্রতিটিকে অবশ্য আরো কয়েকটি শর্তের মানোত্তীর্ণ হতে হবে যার লক্ষ্য হচ্ছে কিয়াসের ব্যবহারের ক্ষেত্রে এর বিশুদ্ধতা ও যথার্থতা নিশ্চিত করা। আমরা এক এক করে এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।

১. মূল বিষয়ের (আসল) সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলি

আসলের দু'টি অর্থ রয়েছে। প্রথমত, এর উৎস যেমন কুরআন অথবা সুন্নাহ্ যা কোনো নির্দিষ্ট বিধান প্রকাশ করে। আসলের দ্বিতীয় অর্থ ওই বিধানের বিষয়বস্তু। উপরিউক্ত দু'টি অর্থের উদাহরণ হলো কুরআনের মদপান হারাম হওয়ার বিধান। কুরআনে আসলের উভয় অর্থই দেখতে পাওয়া যায়, তাহলো হারাম হওয়ার উৎস এবং প্রকৃত ঘটনা ও বিষয়বস্তু মদ। অবশ্য আসলের দু'টি অর্থের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে, সমকেন্দ্রীয়মুখিতা। আমরা উৎস ও মূল ঘটনা উভয় বুঝাতে আসলকে ব্যবহার করতে চাই। যেহেতু প্রকৃত ঘটনা উৎসের বিষয়বস্তু সেহেতু এর একটি থেকে অন্যটিকে পৃথক করা সম্ভব নয়।[১১]

অলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, কুরআন ও সুন্নাহ্ হচ্ছে কিয়াসের উৎস বা আসল। সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহর মতে, ইজমার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত বিধানের ওপর কিয়াস গঠিত হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, ইজমা নাবালকের সম্পত্তির অভিভাবকত্ব গ্রহণকে বৈধতা প্রদান করেছে, এ বিধানের ওপর কিয়াস করে নাবালকের বিয়ের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক অভিভাবকত্বের (উইলাইয়াহ আল ইজবার) কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়েছে।[১২]

ইজমা কিয়াসের বৈধ আসল গঠন করে কি না সে ব্যাপারে অবশ্য মতভেদ রয়েছে। যারা কিয়াসের ভিত্তি হিসেবে ইজমার বৈধতার বিরোধিতা করেন তারা যুক্তি দেখান যে, যেসব বিধিমালার ভিত্তিতে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় তাতে ইজমার ভিত্তি হওয়ার শর্তের প্রয়োজন নেই। অন্য কথায় ইজমা সবসময় তার নিজস্ব যথার্থতা বা যুক্তির ব্যাখ্যা দিতে পারে না। এ ধরনের তথ্যের অনুপস্থিতিতে কিয়াস গঠন করা কঠিন হয়ে পড়ে। বিশেষ করে এতে ইল্লত শনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়বে এবং ইল্লত ছাড়া কিয়াস গঠন সম্ভব নয়।[১৩] কিন্তু কিয়াসের ইল্লত সব সময়ই উৎসের মধ্যে শনাক্ত হয়ে থাকে, এ ধারণার ভিত্তিতেই ঐ অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে যা ঠিক নয়।

অনেক সময় উৎসের মধ্যে ইল্লত নির্দেশিত হতে পারে; কিন্তু এরূপ না হলে সে ক্ষেত্রে মুজতাহিদকেই আল্লাহপাকের উদ্দেশ্যের (মাকাসিদ) আলোকে একে শনাক্ত

www.pathagar.com

করতে হবে। অন্য কথায় মুজতাহিদ ইজমা অথবা নুসুস যেখান থেকেই ইল্লত সংগ্রহ করুন না কেন সে ক্ষেত্রে তাকে ওই একই অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে। উপরন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে, ইজমার ভিত্তিতে কিয়াস বৈধ, কারণ খোদ ঐকমত্য একটি ভিত্তি (সনদ); তাই ঐকমত্যের ভিত্তিতে সাব্যস্ত কোনো বিধানের কার্যকারণ (ইল্লত) ইজতিহাদের মাধ্যমে শনাক্ত করা যেতে পারে।[১৪]

সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের মতে, একটি কিয়াস অন্য একটি কিয়াসের আসল বা ভিত্তি গঠন করতে পারে না। দ্বিতীয়ত, কিয়াস একই ইল্লতের ভিত্তিতে গঠিত হয়েছে, উল্লেখ করে এর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এটি যদি মূল ইল্লতের মতোই হয় তাহলে কিয়াসের সমগ্র কর্মকাণ্ড হবে অনাবশ্যক। এর উদাহরণ হলো, যদি ধরে নেওয়া হয় যে, খাওয়ার উপযোগিতা হচ্ছে একটি কার্যকারণ (ইল্লত) খাদ্যর কোনো বস্তুকে সুদের (রিবা) আওতাধীন বিবেচনা করা হয়, তাহলে গম ও চালের মধ্যে কিয়াস করা যুক্তিসঙ্গত হবে। কিন্তু রিবার বিধান সম্প্রসারণের জন্য চাল ও ভোজ্যতেলের মধ্যে দ্বিতীয় কিয়াস করা হবে অপ্রয়োজনীয়। কারণ গম ও ভোজ্যতেলের মধ্যে সরাসরি কিয়াস করার অগ্রাধিকারযোগ্য বিবেচিত হবে যা চালের সাথে মধ্যবর্তী কিয়াসের সম্ভাবনা তিরোহিত করবে।[১৫]

অবশ্য বিখ্যাত মালেকী ফকিহ ইবনে রুশদ (যার দৃষ্টিভঙ্গিকে মালেকী মাজহাবের মতের প্রতিনিধিত্ব বলে গণ্য করা হয়ে থাকে) এবং কয়েকজন হাম্বলী আলেম মনে করেন যে, একটি কিয়াস অন্য একটি কিয়াসের আসল গঠন করতে পারে। যখন একটি কিয়াস অপর একটি কিয়াসের ভিত্তিতে গঠিত হয় তখন দ্বিতীয় কিয়াসের ফার স্বতন্ত্র আসলে পরিণত হয়, যা থেকে পৃথক ইল্লত সংগ্রহ করা যেতে পারে। এ প্রক্রিয়ায় সীমাহীনভাবে অব্যাহত থাকতে পারে কেবলমাত্র এ শর্তে যে, কুরআনের ভিত্তিতে এ কিয়াস গঠিত হতে হবে অন্য কোনো কিয়াস অবলম্বনে নয়।[১৬]

তবে আল গাজ্জালী একটি কিয়াসের আসলের ভিত্তিতে অন্য একটি কিয়াস হওয়ার বিষয়টি পুরোপুরি নাকচ করে দিয়েছেন। তিনি একে কোনো ব্যক্তির বেলাভূমিতে একই ধরনের নুড়ি খুঁজে পাওয়ার চেষ্টার সাথে তুলনা করেছেন। এ যেন মূল নুড়ির সাথে মিল রয়েছে এমন একটি নুড়ি পাওয়ার পর আসলটি ছুড়ে ফেলে দিয়ে এরপর দ্বিতীয়টির সাথে মিল রয়েছে এমন আরেকটি পাওয়ার চেষ্টা করা, এভাবে চলতে থাকল মিল দেয়ার অবিরাম চেষ্টা। এর মধ্যে সে দশমটি পেয়ে গেল। কিন্তু এটি যদি অনুসন্ধানের প্রথমটির থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হয় তাহলে বিস্ময়ের কিছুই থাকবে না। আল গাজ্জালীর মতে, এভাবে একটি কিয়াসের ভিত্তিতে আরেকটি কিয়াস গঠন হচ্ছে, একটি ধারণার ভিত্তিতে আরেকটি ধারণা পোষণ করা এবং এ প্রক্রিয়া চলতে থাকলে প্রকৃত সত্য ত্রুটিপূর্ণ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।[১৭]

www.pathagar.com

সংক্ষেপে ইবনে রুশদের 'আসল' সম্পর্কে আলোচনার পর আবু জাহ্‌রাহ্‌ এ অভিমত প্রকাশ করেন যে, ফিকাহ্‌র দৃষ্টিকোণ থেকে এর সাথে দ্বিমত পোষণ করার কোনো সুযোগ নেই। আধুনিক বিচার কার্যক্রমে এর উদাহরণের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। আদালতের সিদ্ধান্তে প্রায়ই বিদ্যমান সিদ্ধান্তের কার্যকারণ (i.e. ratio decidendi) নতুন ঘটনায় সম্প্রসারিত করা হয়। নতুন সিদ্ধান্ত পূর্ববর্তী ঘটনার যৌক্তিকতার ভিত্তিতে হতে পারে কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার মধ্যে পার্থক্য দেখা দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে নতুন ঘটনার নিজস্ব অধিকার বলে কর্তৃত্ব দান করতে পারে। এর উদাহরণ হলো মিসরের সেশন কোর্ট (মাহ্‌কুমা আল নকদ) কোনো বিচারের রায় অনুমোদন করলে খোদ এ রায় সূত্রে পরিণত হয় এবং যখনই উপযুক্ত বলে মনে হবে তখনই এর আসলের কোনো অনুসন্ধান ছাড়াই এর ওপর কিয়াস করা যাবে। আবু জাহ্‌রাহ্‌ যা বলতে চেয়েছেন তাহলো, কতিপয় ইসলামি বিচার ব্যবস্থায় আংশিকভাবে stare decisis এর মূলনীতিকে গ্রহণ করা হয়েছে যাতে একটি কিয়াস আরেকটি কিয়াসের আসলে পরিণত হতে পারে, এ ধারণাকে নিশ্চিত করা হয়েছে।[১৮]

সিরীয় ফকিহ্‌ মুস্তাফা আল জারকার মতে, একটি কিয়াসের ওপর আরেকটি কিয়াস গঠনের ফরমুলার মধ্যে উন্নতি সাধন ও সমৃদ্ধি লাভের বীজ নিহিত রয়েছে। অতএব, কিয়াস ও শরিয়াহ্‌র গুরুত্বপূর্ণ অবদানের ক্ষেত্রে অনাবশ্যক বিধিনিষেধ আরোপ করা উচিত হবে না।[১৯]

২. হুকম এর অংশ হওয়ার শর্ত

হুকম হচ্ছে বিধিবিধান, যেমন আদেশ বা নিষেধ যা কুরআন, সুন্নাহ্‌ বা ইজমার মাধ্যমে প্রদান করা হয় এবং কিয়াস নতুন ঘটনার ক্ষেত্রে তা সম্প্রসারণের চেষ্টা করে। কিয়াসের বৈধ ভিত্তি গঠনের জন্য হুকমকে অবশ্যই নিম্নলিখিত শর্তাবলি পূরণ করতে হবে।

১. এটিকে অবশ্যই একটি বাস্তবধর্মী শরয়ী বিধান হতে হবে। বাস্তব ঘটনার ক্ষেত্রেই কেবল কিয়াস কার্যকর হয়, সামগ্রিকভাবে ফিকাহ্‌র ক্ষেত্রেও ঠিক এমনটি হয়। শরয়ী উৎসে হুকম পাওয়া গেলেই কেবল কিয়াস গঠনের চেষ্টা করা যেতে পারে। একটি ঘটনার বিষয়ে তিনটি উৎসের কোনোটিতে কোনো হুকম পাওয়া না গেলে এবং দায়দায়িত্ব থেকে মৌলিক স্বাধীনতার (আল বারায়াহ্‌ আল আসলিয়্যহা) মতো সাধারণ নিয়মের উদ্ধৃতি দিয়ে এর বৈধতা সাব্যস্ত হলে সে ক্ষেত্রে কোনো হুকম নেই বলা যেতে পারে। দায়দায়িত্বমুক্ত মৌলিক স্বাধীনতাকে হুকুম শরয়ী বলে বিবেচনা করা হয় না তাই তা কিয়াসের কোনো ভিত্তিও গঠন করে না।[২০]

www.pathagar.com

২. হুকম অবশ্যই কার্যকর হবে, এর অর্থ হলো হুকম এখনো রহিত হয়নি। অনুরূপভাবে কিয়াসের দ্বারা হুকমের যে বৈধতা সম্প্রসারিত করার চেষ্টা করা হয় সে বিষয়ে অবশ্যই কোনো মতপার্থক্য বা বিতর্ক থাকতে পারবে না।[২১]

৩. হুকম অবশ্যই জ্ঞানের ভিত্তিতে যুক্তিগ্রাহ্য হতে হবে, যাতে মানবজ্ঞান বিধিবদ্ধ আইনের কারণ বা উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে পারে অথবা খোদ মূলপাঠে ইল্লত স্পষ্টভাবে দেয়া থাকে। উদাহরণ হলো, জুয়া ও অপরের সম্পদ তসরুফের মতো নিষেধের ইল্লত সহজ বোধগম্য; কিন্তু নামাজের সিজদার সংখ্যা অথবা জাকাতের পরিমাণের মতো বিষয় যখন অতটা সহজে উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না তখন তা কিয়াসের ভিত্তি গঠন করতে পারে না। সামগ্রিকভাবে ইবাদত-বন্দেগী কিয়াসের সঠিক বিষয় নয়, এর সহজ কারণ হলো, এসবের ইল্লত বা কার্যকারণ মানববুদ্ধির দ্বারা নির্ণীত হতে পারে না। অবশ্য ইবাদত-বন্দেগীর সাধারণ উদ্দেশ্য প্রায় অনুধাবনযোগ্য হয়ে থাকে। কিন্তু তা কিয়াসের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যথেষ্ট নয়। যেহেতু ইবাদত-বন্দেগীর সুনির্দিষ্ট কারণ (আল ইল্লাহ আল যুজইয়াহ) কেবলমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালাই জানেন সেহেতু এর ভিত্তিতে কোনো ধরনের কিয়াস হতে পারে না।

সব যৌক্তিক আহকাম (আল আহকাম আল মা'কুলাহ) অর্থাৎ যেসব আইনের কারণ মানববুদ্ধির দ্বারা বোধগম্য তা কিয়াসের সঠিক ভিত্তি গঠন করে। ইমাম আবু হানিফার মতে, শরিয়াহর সব নুসুসই যৌক্তিক এবং এসবের কারণ নির্ণয় করা যেতে পারে, তবে সেসব বিষয় ছাড়া যা ইবাদতের বিধানের আওতায় পড়ে বলে নির্দেশিত হয়েছে। এটি সংখ্যাগরিষ্ঠের মতও। অন্যদিকে জাহিরিগণ এবং আবু হানিফার সমসাময়িক উসমান আল বাত্তির মতে, খোদ নুসুসে নির্দেশনা না থাকলে নুসুসের ইল্লত নির্ণয় করা সম্ভব নয়। এ মতে স্পষ্টতই শরিয়াহর বিধানের কারণ অনুসন্ধানের বিষয়টিকে অনুৎসাহিত করা হয়েছে এবং যথার্থতা ও যুক্তির বিষয়ে কোনোরূপ সন্ধান ছাড়াই তা পুরোপুরি মেনে চলার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।[২২] ইবনে হাজম লিখেছেন, 'আমরা এ কথা অস্বীকার করি না যে, আল্লাহ তায়ালা তার কিছু আইনের কিছু কারণ নির্দেশ করেছেন। কিন্তু আমরা কেবল তখনই এ কথা বলব যখন কোনো নস তা নিশ্চিত করবে। তিনি এরপর এ ব্যাপারে রসুল সা.-এর একটি হাদিস উদ্ধৃত করেন :

إن أعظم المسلمين في المسلين جرماً من سأل

عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم

من أجل مسألته

www.pathagar.com

'ইসলামে বড় গোনাহগার ব্যক্তি হলো সেই লোক যে, এমন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে যা হারাম নয় এবং তার প্রশ্ন করার কারণে এরপর তা হারাম হয়ে যায়।' ইবনে হাজম আরো বলেন, 'কারণের ভিত্তিতে শরিয়াহর সব আহকামের ব্যাখ্যা প্রদান ও যৌক্তিক রূপদান করা যেতে পারে, এ কথা আমরা দৃঢ়তার সাথে অস্বীকার করছি। সর্বশক্তিমান আল্লাহ স্বীয় ইচ্ছানুসারে আইন কার্যকর করেছেন। তার এ ইচ্ছার ক্ষেত্রে 'কিভাবে ও কেন' প্রশ্ন কোনোক্রমেই করা যাবে না। তাই খোদায়ী আইনের কারণ আয়াতে স্পষ্ট না থাকলে তাতে তার অনুসন্ধান করা উচিত হবে না। যেই খোদার নির্দেশের কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করবে ও তা অনুসন্ধানের চেষ্টা করবে 'সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহকে অস্বীকার করবে এবং কবীরা গোনাহ করবে'।[২৩] কারণ এটি করলে তা হবে কুরআনের অর্থের পরিপন্থী। স্বয়ং আল্লাহ এর বিবরণ দিয়ে বলেছেন, 'তিনি তার কাজের ব্যাপারে (কারোর কাছে) দায়বদ্ধ নন বরং তারা সবাই তাঁর কাছে দায়বদ্ধ' (সুরা আম্বিয়া, ২১ : ২৩)। ইবনে হাজম মন্তব্য করেন, এভাবে জানা গেল যে, আল্লাহ তায়ালার কাজ ও বাণীর কোনো কারণ অনুসন্ধান করাকে নাকচ করে দেয়া হয়েছে। তাই যথার্থতার যৌক্তিকতা অনুসন্ধান ও তালিল হচ্ছে দুর্বল ও বাধ্যানুগত ব্যক্তির (মুদতারর) রুখসাতের কাজ এবং আল্লাহ তায়ালা এসবের অনেক ঊর্ধ্বে।[২৪]

খোদা প্রদত্ত বিধিবিধানের কারণের বিষয়টি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এর সহজ কারণ হলো রসুল সা.-এর ওফাতের সাথে সাথে ওহি নাজিল বন্ধ হয়ে গেছে এবং অবতীর্ণ বিধানের ব্যাখ্যা প্রদান ও কারণ শনাক্ত করার জন্য তিনি আর উপস্থিত নেই। অন্যান্য ইমানদার মুসলমানের মতোই মুসলিম ফকিহগণও খোদা প্রদত্ত আইনের হেতু বা কারণ শনাক্তকরণের প্রচেষ্টা ব্যাপারে স্বাভাবিকভাবে তেমন একটা অগ্রসর ভূমিকা পালনে অনাগ্রহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ বা মানুষের তৈরি আইনের বিষয়টি এভাবে পেশ করা হয় না। আধুনিক আইনের নিয়মানুযায়ী এর শনাক্তযোগ্য কারণ থাকতে হবে, যা যুক্তিসঙ্গত নিশ্চয়তার মাধ্যমে নির্ণয় করা সম্ভব। অনুরূপভাবে আধুনিক আইনের প্রেক্ষাপটে সাদৃশ্যলব্ধ আইন বা কিয়াস হচ্ছে অপেক্ষাকৃত সহজ প্রস্তাব। কিন্তু কিছু বিধিনিষেধ রয়েছে, যা এমনকি আধুনিক আইনেও কিয়াসের উদার ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করে। আরেকটি ব্যাপার হলো, আধুনিক আইনে কিয়াস কার্যকর করার সুযোগ কেবলমাত্র দেওয়ানি আইনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ-কারণ অপরাধের ক্ষেত্রে সাংবিধানিক মূলনীতির বৈধতা কিয়াসের মাধ্যমে উক্ত বিধানের সম্প্রসারণকে অনুৎসাহিত করেছে। আরও উল্লেখ্য যে, সংবিধিবদ্ধ আইনের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হলে এবং এ আইনে সংশ্লিষ্ট অপরাধ অথবা শাস্তির কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত না থাকলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনো অপরাধ হবে না, শাস্তিও হবে না। তাই দেখা যাচ্ছে, আইনের মূলধারা অনুযায়ী অপরাধ ও দণ্ড

www.pathagar.com

নিয়ন্ত্রিত হয়, আইনের সাদৃশ্যজনিত সম্প্রসারণ বা কিয়াসের দ্বারা নয়। এ কথা বলা দরকার যে, আধুনিক আইনে সংবিধিবদ্ধ আইনের ব্যাপকতা কিয়াসের ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাকে আনুপাতিক হারে হ্রাস করেছে। কিয়াস আধুনিক আইনের চেয়ে শরিয়াহর বিধিবিধানের ব্যাপারে কেন অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, সে প্রশ্নের জবাবে এখানে নিহিত রয়েছে।

শরিয়াহর আইনেও অপরাধ ও শাস্তির ক্ষেত্রে কিয়াসের প্রয়োগের ওপর বিধিনিষেধ রয়েছে যে বিষয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করব। আর এ বিধিনিষেধের কারণেই কাজী মদপান ও হাসিস গ্রহণের মধ্যে সাদৃশ্য টানতে পারেন না যদিও মানব বুদ্ধির ওপর তার ফল একই ধরনের। একইভাবে জিনার অপরাধকে কিয়াসের ভিত্তি সাব্যস্ত করে তার দণ্ডের বিধান অনুরূপ ঘটনার ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ করা যাবে না।[২৫]

৪. সংশ্লিষ্ট হুকমের চতুর্থ শর্ত হলো, তা কোনো বিশেষ পরিস্থিতি অথবা নির্দিষ্ট ঘটনার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ হতে পারবে না। কিয়াসে মূলত আইনের বিধিবিধান সাধারণ বিষয়ে সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সাব্যস্ত হয়, ব্যতিক্রমী ঘটনার ক্ষেত্রে নয়। এভাবে রসুল সা. যখন খুজায়মাহ রা. সাক্ষ্য গ্রহণ করলেন তখন তা ছিল দুইজন সাক্ষীর সমতুল্য। তিনি এটি গ্রহণ করেন ব্যতিক্রমী পন্থায়। তাই এ ঘটনার নজীর কিয়াসের ক্ষেত্রে সম্প্রসারণযোগ্য নয়।[২৬] কুরআনের কিছু বিধান রয়েছে, যা একান্তভাবে রসুল সা. সম্পর্কিত। যেমন- চারটির অধিক বিয়ে করা অথবা রসুল সা.-এর বিধবা স্ত্রীদের বিয়ে করা হারাম (সুরা আহজাব, ৩৩ : ৫৬) ইত্যাদি বিষয়ও অনুরূপভাবে কিয়াসে সম্প্রসারণযোগ্য নয়। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এসব বিষয়ে সাধারণ আইন বর্ণিত হয়েছে যাতে সাক্ষীর সংখ্যা দুইজন নির্ধারণ, সর্বোচ্চ চার নারীকে বিয়ে করা এবং ইদ্দতকাল অতিক্রমের পর বিধবাকে বিয়ে করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

৫. সর্বশেষ শর্ত হলো, প্রথমত, কিয়াসের সাধারণ নিয়মাবলির ক্ষেত্রে খোদায়ী বিধান থেকে কোনোক্রমেই বিচ্যুত হওয়া যাবে না। উদাহরণ হলো, রমজান মাসে সফরে থাকলে মুসাফিরকে রোজা ভঙ্গ করার সুযোগ দেয়া হয়েছে। এ সুবিধা প্রদান হচ্ছে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। সাধারণ নিয়ম হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তিই রোজা পালন করবে। তাই এ বিষয়টি কষ্টকর অন্যান্য ঘটনার ক্ষেত্রে সম্প্রসারণের জন্য কিয়াসের ভিত্তি গঠন করবে না। অনুরূপভাবে ওজুর ক্ষেত্রে সুবিধা দেয়া হয়েছে, তাহলো- চামড়ার জুতা পরা থাকলে পা ধৌত করার পরিবর্তে মুছে নিলেই চলবে। এ ব্যতিক্রম কিয়াসের মাধ্যমে মোজা পরা অবস্থার মতো ক্ষেত্রে সম্প্রসারণযোগ্য নয়।

তবে শাফেয়ীদের মতে, কোনো বিধানের ইল্লত যদি স্পষ্টভাবে শনাক্ত করা যায়, এমনকি তা ব্যতিক্রমী হলেও তার ভিত্তিতে কিয়াস সাব্যস্ত করা যায়। উদাহরণ

www.pathagar.com

হচ্ছে, শুকনা খেজুরের সাথে গাছে থাকা কাঁচা খেজুর বা আরাইয়ার লেনদেন হচ্ছে একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা যার অনুমতি হাদিসে দেখতে পাওয়া যায়। তৎসত্ত্বেও এ লেনদেন অনেকটা সুদি প্রকৃতির। সুদের বিধানে একই ধরনের পণ্যের কমবেশি লেনদেন হারাম করা হয়েছে। এ অনুমোদন যোগ্যতার ইল্লত হচ্ছে কাঁচা খেজুরের মালিককে শুকনা খেজুরের চাহিদা পূরণ করা। কিয়াসের মাধ্যমে শাফেয়ীগণ অনুরূপ চাহিদার ক্ষেত্রে আঙ্গুরের সাথে কিসমিস লেনদেনকে বৈধ বলে বিবেচনা করেছেন। তবে হানাফীগণ এর সাথে একমত নন, কারণ প্রথমত, 'আরাইয়া' হচ্ছে ব্যতিক্রমী ঘটনা।[২৭]

৩. নতুন ঘটনা (ফার)

ফার হচ্ছে এমন ঘটনা বা সমস্যা কিয়াসের মাধ্যমে যার সমাধান অনুসন্ধান করা হয়। ফারকে অবশ্যই নিম্নের তিনটি শর্ত পূরণ করতে হবে :

১. নতুন ঘটনা অবশ্যই কুরআন-সুন্নাহ্ বা ইজমার আওতায় পড়বে না। এসব সূত্রে কোনো সমাধান পাওয়া গেলে কিয়াস গঠনের প্রয়োজন হবে না। অবশ্য কতিপয় হানাফী ও হাম্বলী ফকিহ্ এমনকি উপরিউক্ত সূত্রগুলো সমাধান থাকা সত্ত্বেও কোনো কোনো সময় কিয়াস অবলম্বন করেছেন। তবে যেসব ক্ষেত্রে উল্লিখিত সমাধান খবরে ওয়াহেদের মতো অনুমানমূলক ধরনের কেবল সেসব ক্ষেত্রেই তারা এটি করেছেন। আমরা পরে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

২. আসলের ক্ষেত্রে কিয়াসের ইল্লত যেভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে নতুন ঘটনার ক্ষেত্রেও অবশ্যই তা অনুরূপভাবে প্রযোজ্য হবে। উভয়ের মধ্যে যদি মিল অথবা ব্যাপকভিত্তিক সমতা না থাকে তাহলে পারিভাষিক এ কিয়াসকে কিয়াস মায়াল ফারিক অথবা 'অসম কিয়াস' বলা হয়, যা অকার্যকর। উদাহরণ হলো, মদপান হারাম হওয়ার ইল্লত হচ্ছে উন্মত্ততা, তাই যে পানীয়দ্রব্য কেবলমাত্র স্মৃতিভ্রষ্ট করে তা ইল্লতের প্রয়োগের আলোকে মদ থেকে ভিন্ন ধরনের এবং এ বিষয়টি কিয়াসকে অকার্যকর করে দিয়েছে।[২৮]

   আরেকটি উদাহরণ দেয়া যায়, তাহলো, হানাফীদের মতে একজন সুস্থ ও বয়স্ক নারী নিজেই নিজের বিয়ে সম্পাদন করতে সক্ষম। কুরআনের বিধানের (সুরা নিসা ৪ : ৬১) আলোকে তারা এ অনুমান করেন। ওই আয়াতে একজন নারীকে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী স্বাধীনভাবে ব্যবসায়িক লেনদেন করার অধিকার প্রদান করা হয়েছে। অবশ্য ফকিহ্দের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এর সাথে একমত নন, তারা মনে করেন, উল্লিখিত বিষয়ে কিয়াস

www.pathagar.com

হচ্ছে অসম কিয়াস। ব্যবসায়িক লেনদেন আর বিয়ে এক জিনিস নয়, কারণ ব্যবসায়িক লেনদেন হচ্ছে ব্যক্তিগত বিষয় আর বিয়ে সাদীর সাথে পরিবার এবং পিতা-মাতা বা অভিভাবকের সামাজিক মর্যাদার বিষয় জড়িত রয়েছে। তাই বিয়ে ও অন্যান্য লেনদেনের সঙ্গে কিয়াস গঠন সঠিক নয়।[২৯]

৩. নতুন ঘটনায় (ফার) কিয়াসের প্রয়োগের ফলে আল্লাহর বিধানের অবশ্যই কোনো পরিবর্তন করা যাবে না। এমনটি হওয়ার অর্থ হচ্ছে কিয়াসের মাধ্যমে খোদায়ী বিধানকে রহিত করা যা কিয়াসের খেলাফ। উদাহরণ হলো– মিথ্যা অপবাদ (কাজফ) দেয়া একটি প্রকাশ্য নস (সুরা নূর ২৪ : ৪) যা কারোর সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রের ওপর স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। ইমাম শাফেয়ী মিথ্যা অপবাদ দান ও অন্যান্য বড় গোনাহর (কবীরা) মধ্যে কিয়াস করে বলেছেন, কবীরা গোনাহর জন্য কোনো ব্যক্তি দণ্ড ভোগ করার পর তওবা করলে তাকে সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। মিথ্যা অপবাদের ক্ষেত্রেও তওবা সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করার ওপর নিষেধাজ্ঞা অপসারিত করতে পারে। হানাফীগণ এর জবাবে বলেছেন, এ ধরনের কিয়াস করা হলে তা খোদায়ী আইনকে রহিত করবে যাতে মিথ্যা অপবাদ দানকারীর সাক্ষ্য গ্রহণ চিরতরের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[৩০]

অনুরূপভাবে বলা যায় যে, একটি হাদিসে বিক্রয় চুক্তির বৈধতার বিষয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাতে এক নির্দিষ্ট তারিখে কোনো পণ্য সরবরাহের জন্য অগ্রিম বিক্রয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু শাফেয়ীগণ মনে করেন যে এমনকি সরবরাহের তারিখ স্থির করা না হলেও এ ধরনের চুক্তি বৈধ হবে। তারা কুরআনের আইনের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন বলে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে।[৩১]

কার্যকরকরণ (*ইল্লত*)

ইল্লত হচ্ছে সম্ভবত কিয়াসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। উসুলের আলেমগণ বিভিন্নভাবে ইল্লতের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠের মত অনুযায়ী এটি হলো আসলের একটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য, যা অপরিবর্তনীয় ও স্পষ্ট এবং কুরআনিক আইনের (হুকম) সাথে সঠিক (মুনাসিব) সম্পর্ক বজায় রাখে। এটি কোনো ঘটনা, পরিস্থিতি অথবা একটি বিবেচ্য বিষয় হতে পারে, যা আল্লাহ তায়ালা কোনো হুকম প্রদানের সময় উপযুক্ত মনে করেছিলেন। উসুলের কিতাবগুলো ইল্লতের বিকল্প হিসেবে মানাত আল হুকম (হুকমের কারণ), আমরাহ আল হুকম (হুকমের লক্ষণ), সাবাব (কারণ) এর উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।[৩২] কোনো কোনো আলেম ইল্লতের অনেক শর্ত আরোপ করেছেন। কিন্তু তার বেশির ভাগই বিতর্কিত। নিম্নের পাঁচটি শ্রেণিতে এর সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হলো[৩৩] :

www.pathagar.com

১. সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে, ইল্লতকে অবশ্যই অপরিবর্তনীয় গুণের (মুনদাবিত) অধিকারী হতে হবে, যা ব্যক্তি, স্থান, কাল ও পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত হওয়া ছাড়াই সব ঘটনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। অবশ্য হাম্বলী ও মালেকীগণ এ শর্তের ব্যাপারে একমত নন। তারা মনে করেন যে ইল্লতের অপরিবর্তনীয় হওয়ার প্রয়োজন নেই এবং হুকমের সাথে ইল্লতের সঠিক অথবা যুক্তিসঙ্গত সম্পর্ক বজায় থাকাই যথেষ্ট। দু'টি মতের মধ্যে পার্থক্য হলো এই যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ আইনের উদ্দেশ্য (হিকমত) থেকে ইল্লতকে পৃথক করেছেন এবং অন্যরা হিকমতকে ইল্লতের আওতার বাইরে রেখেছেন।[৩৪]

পরিবেশ-পরিস্থিতির পরিবর্তন নির্বিশেষে সব ক্ষেত্রে ইল্লত ব্যবহার করতে চাইলে একে অপরিবর্তনীয় রাখতে হবে। উদাহরণ হলো, ক্রয়াগ্রাধিকার নীতি (শুফ) অনুযায়ী কোনো জমির যৌথ মালিক অথবা প্রতিবেশী অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। সম্পত্তির মালিক বা প্রতিবেশী তা বিক্রি করতে চাইলে যৌথ মালিক বা প্রতিবেশী তা কেনার ব্যাপারে অগ্রাধিকার পাবে। ক্রয় অগ্রাধিকারের ইল্লত হচ্ছে খোদ যৌথ মালিকানা স্বত্ব। অন্যদিকে এ বিধানের হিকমত হলো সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে অংশীদার বা প্রতিবেশীকে রক্ষা করা। তৃতীয় কোনো পক্ষের কাছে বিক্রির কারণে এ ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। আল্লাহ তায়ালা যে অনিষ্টতা রোধ করতে চেয়েছেন তা বাস্তবে রূপায়িত হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে। এখানে দেখা যাচ্ছে, হিকমত অপরিবর্তিত নয়, তাই তা ক্রয় অগ্রাধিকারের ইল্লত গঠন করতে পারেনি। সে কারণে এখানে ইল্লত হচ্ছে খোদ যৌথ মালিকানা স্বত্ব যা হিকমতের মতো নয় বরং স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয়। কারণ পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে সাথে তা অস্থিত হয়ে পড়ে না। সংখ্যাগরিষ্ঠের মত হচ্ছে, শরিয়াহর বিধিবিধানগুলো তার কারণের (ইল্লত) ভিত্তিতে গঠিত হয়েছে, উদ্দেশ্যের (হিকমত) ভিত্তিতে নয়। এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ইল্লত বিদ্যমান থাকলে হুকম শারয়ী বর্তমান থাকবে, এমনকি হিকমত না থাকলেও এবং হিকমত বিদ্যমান থাকার পরও ইল্লতের অনুপস্থিতিতে হুকম শারয়ী অনুপস্থিত থাকবে। অতএব, আইনের হিকমতে বিদ্যমান থাকুক বা না থাকুক ফকিহ ও বিচারকগণ যখনই ইল্লতের অস্তিত্ব জানতে পারবেন তখন অবশ্যই তা কার্যকর করবেন। তাই দেখা যাচ্ছে, কোনো নির্দিষ্ট ক্রেতার কাছে সম্পত্তি বিক্রি করার মাধ্যমে মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে নিছক এ ধারণার বশবর্তী হয়ে বিচারক অংশীদার অথবা প্রতিবেশী নয় এমন কাউকে ক্রয় অগ্রাধিকারের সুযোগ দিলে ভুল করবেন।[৩৫]

অন্যদিকে মালেকী ও হাম্বলীগণ ইল্লত ও হিকমতের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি। তাদের মতে, হিকমতের লক্ষ্য হচ্ছে স্পষ্টত কল্যাণের দিকে আকৃষ্ট করা অথবা

স্পষ্ট অনিষ্ট রোধ করা এবং এটিই হচ্ছে বিধিবিধান বা আইনের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য। এর উদাহরণ হলো, শরিয়াহর বিধানে অসুস্থ ব্যক্তির রোজা পালন না করার অনুমতি দেয়া হয়েছে, এখানে হিকমত হচ্ছে তার কষ্ট লাঘব করা। অনুরূপভাবে নরহত্যার বদলা গ্রহণ (কিসাস) অথবা চুরির হাদ দণ্ডের বিধানের হিকমত হচ্ছে জনগণের জানমালের হেফাজত করা। যেহেতু কল্যাণ সাধন (মাসলাহা) ও অনিষ্ট থেকে রক্ষা করা (মাফসাদা) হচ্ছে শরিয়াহর সব বিধিবিধানের মূল উদ্দেশ্য সেহেতু হিকমতের ভিত্তিতে কিয়াস করা সঠিক হবে।[৩৬]

হানাফী ও শাফেয়ী উভয়ই এ মত পোষণ করেন যে, ইল্লতকে অবশ্যই সুস্পষ্ট ও অপরিবর্তনীয় হতে হবে। তাদের মতে, অধিকাংশ সময় ইল্লত হিকমত নিশ্চিত করে, কিন্তু সব সময় নয়। হিকমত কিয়াসের ভিত্তি হওয়ার ব্যাপারে তাদের আপত্তি হলো এজন্য যে, আইনের হিকমত প্রায়ই একটি লুকায়িত বিষয় যা বুদ্ধির সাহায্যে শনাক্ত করা যায় না আর এ কারণে এর ওপর ভিত্তি করে কিয়াস গঠন সম্ভব হয় না। এ ছাড়া হিকমত পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তনশীল এবং এটি তার কিয়াসের ভিত্তি হওয়াকে আরো কঠিন করে তুলেছে। অন্য কথায় হিকমত না অপরিবর্তনীয় না সুসংজ্ঞায়িত। তাই কিয়াসের ভিত্তি হিসেবে এর ওপর নির্ভর করা যায় না।

এর উদাহরণ হলো, ভ্রমণকালে মুসাফিরের কষ্ট লাঘব করার জন্য রোজা ভঙ্গ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এটি হচ্ছে বিধানটির হিকমত। কিন্তু কষ্ট হচ্ছে একটি লুকায়িত বিষয় এবং প্রায়ই ব্যক্তি ও পরিস্থিতি অনুযায়ী তার মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়; তাই তা কিয়াসের ইল্লত গঠন করতে পারে না। সে কারণে এখানে খোদ সফরের প্রতি সুবিধা প্রযুক্ত হয়েছে, প্রত্যেক সফরকারীর কষ্টের মাত্রা নির্বিশেষে তাই এখানে ইল্লত হচ্ছে।[৩৭]

এর আরেকটি উদাহরণ হলো, লালবাতি জ্বলার পর যান চলাচল নিষিদ্ধের ইল্লত হচ্ছে খোদ লালবাতি জ্বলে উঠা। এর হিকমত হচ্ছে, যানবাহন চলাচলের অনিয়ম ও দুর্ঘটনা রোধ করা। লালবাতি জ্বলা অবস্থায় কেউ রাস্তা অতিক্রম করলে সে অপরাধ করবে, এমনকি এর ফলে দুর্ঘটনা না ঘটলেও। ইল্লতও হিকমত পরস্পরের থেকে পৃথকভাবে বিদ্যমান রয়েছে এবং পরেরটি পূর্বেরটির চেয়ে অপেক্ষাকৃত অল্প আয়াসে নির্ণয়যোগ্য। অনুরূপভাবে ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আইনের ওপর ডিগ্রি লাভ এবং তাতে প্রয়োজনীয় নম্বর লাভ হচ্ছে ইল্লত। আর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানের নির্দিষ্ট মান অর্জন হচ্ছে হিকমত। এখন এটি প্রয়োজনীয় যে অপরিবর্তনীয়তা ও নির্ভরযোগ্যতার ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ডিগ্রি প্রদান করা হয় তা হচ্ছে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া। আইন সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন কিন্তু সব সময়ই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সামর্থ্যের সঙ্গে একত্রে অগ্রসর হয় না কিন্তু তা পরীক্ষার ফলাফলের মতো অনায়াসে নির্ণয়যোগ্য নয়।

www.pathagar.com

২. ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, যে ইল্লতের ভিত্তিতে কিয়াস সাব্যস্ত করা হয় তাকে অবশ্যই সুস্পষ্ট (জাহির) হতে হবে। ইচ্ছা, শুভেচ্ছা, সম্মতি দান ইত্যাদির মতো লুকায়িত বিষয় স্পষ্টভাবে নির্ণয়যোগ্য নয়– তাই এসব কিয়াসের ইল্লত গঠন করতে পারে না। সাধারণ নিয়ম হচ্ছে ইল্লত অবশ্যই সুনির্দিষ্ট ও জ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধির যোগ্য হতে হবে। উদাহরণ হলো, যেহেতু দুইপক্ষের মধ্যে চুক্তির বিষয়টি প্রকৃতিগতভাবে অনেকটা অপ্রত্যক্ষযোগ্য তাই এ সংক্রান্তায় আইন, প্রস্তাব পেশ ও গ্রহণের মাধ্যমে বিষয়টি সুরাহা করেছে। অনুরূপভাবে কোনো শিশুর পিতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ইল্লত হচ্ছে বিবাহোত্তর সহবাস (কিয়াম ফিরাশ আল যাওজিয়াহ) অথবা পিতৃত্বের স্বীকারোক্তি (ইকরার) যে দুটোর উভয়ই বাহ্যিক বিষয় এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ ও দলিলের মাধ্যমে তা গ্রহণযোগ্য। যেহেতু স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্কের মাধ্যমে সন্তান ধারণ স্পষ্ট বিষয় নয়, তাই তা হয়তো পিতৃত্বের ইল্লত গঠন করতে পারে না। অনুরূপভাবে বলা যায় যে, আইনগত বয়োজ্যেষ্ঠতার ইল্লত হিসেবে গৃহীত আইন বুদ্ধিবৃত্তিক পরিপক্বতা অর্জন বুঝায় না বরং নির্দিষ্ট বয়সসীমা অতিক্রমকে বুঝায় যা স্পষ্ট এবং দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য।[৩৮]

৩. ইল্লতের তৃতীয় মত হচ্ছে, এর একটি সঠিক বৈশিষ্ট্য (আল ওয়াসফ আল মনাসিব) অবশ্যই বজায় থাকতে হবে, অর্থাৎ তা খোদায়ী আইনের (হুকম) সঙ্গে সঠিক ও যৌক্তিক সম্পর্ক বজায় রাখবে। আল্লাহর উদ্দেশ্য অর্জনের (হিকমত) জন্য এ সম্পর্ক কাজ করলে তা হবে মুনাসিব। এ উদ্দেশ্য হলো, জনগণের কল্যাণ সাধন ও অনিষ্ট থেকে তাদের রক্ষা করা। এর উদাহরণ হলো, হত্যাকাণ্ডের ঘটনা হচ্ছে একজন ওয়ারিশকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার সঠিক কারণ। উত্তরাধিকারের ভিত্তি হচ্ছে আত্মীয়তার বন্ধন যা মৃত ব্যক্তির সঙ্গে তার উত্তরাধিকারীদের সম্পর্কিত করে। হত্যার ঘটনার দ্বারা তা ছিন্ন ও বাতিল হয়ে যায়। একইভাবে মদের উন্মত্ততার প্রভাব তা নিষিদ্ধ হওয়ার সঠিক কারণ। কোনো গুণ যদি হুকমের সাথে সঠিক সম্পর্ক বজায় না রাখে তাহলে তা ইল্লত হিসেবে উত্তীর্ণ হতে পারে না। এর উদাহরণ হলো, খুনের অপরাধের জন্য অবশ্যই মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে, তাকে একারণে এ দণ্ড দেয়া হবে না যে হত্যাকারী একজন নিগ্রো অথবা একজন আরব বরং এ কারণে যে সে ঠাণ্ডা মাথায় আরেক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। অনুরূপভাবে রঙ বা স্বাদের জন্য মদ নিষিদ্ধ করা হয়নি বরং এ কারণে যে, তা উন্মত্ততার সৃষ্টি করে।[৩৯]

৪. ইল্লত অবশ্যই ক্ষণস্থায়ী (মুতায়াদ্দী) হবে, অর্থাৎ তা হবে বস্তুনিষ্ঠ গুণসম্পন্ন যা অন্যান্য ঘটনার ক্ষেত্রে স্থানান্তরযোগ্য। যে ইল্লত কেবলমাত্র মূল ঘটনার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে তার ভিত্তিতে কিয়াস গঠন সম্ভব নয়। হানাফীগণ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, ইল্লতের মূল তাৎপর্যের মতো কিয়াসেরও মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে নতুন নতুন

www.pathagar.com

ঘটনায় তার সম্প্রসারণ ক্ষমতা; এর অর্থ হচ্ছে ইল্লতের অবশ্যই স্থানান্তরযোগ্য গুণ থাকতে হবে। এর উদাহরণ হলো, রোজা পালন সম্পর্কিত সুবিধা প্রদানের ইল্লত হচ্ছে সফর। এটি হচ্ছে এমন ইল্লত, যা আসলের সঙ্গে সীমাবদ্ধ এবং অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে একইভাবে তার ব্যবহার সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে আমরা যদি কেবল আঙ্গুর থেকে তৈরি মদের ক্ষেত্রে মদ হারামের ইল্লতকে সীমাবদ্ধ রাখি তাহলে আমরা অন্য ধরনের সব মদকে হারামের আওতা বহির্ভূত করে দেবো।

অবশ্য শাফেয়ীগণের মতে, ইল্লতের স্থানান্তর যোগ্যতার (তাদাইয়া) প্রয়োজন নেই; তারা ইল্লতের ভিত্তিতে কিয়াসকে বৈধতা প্রদান করেছে, যা মূল ঘটনার (যেমন- ইল্লাহ কাসিরা) সাথে সীমাবদ্ধ। শাফেয়ীগণ (ও হানাফী ফকিহ ইবনে আল হুমাম) যুক্তি দেখান যে, তাদাইয়া ইল্লতের কোনো শর্ত নয় কারণ ইল্লত যে মূল ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ, সম্ভবত আল্লাহ তায়ালা চেয়েছেন, এটি যেন এমন অবস্থায়ই থাকে। নিছক তাদাইয়ার অভাবের কারণে কিয়াসের সম্ভাব্যতাকে উপেক্ষা করা যেতে পারে না। এটি এমন শর্ত যা খোদ আইনের সুনির্দিষ্ট পরিভাষার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদান ব্যতিরেকেই একটি বুদ্ধিবৃত্তিক চাহিদা মাত্র। শাফেয়ীগণ আরো যুক্তি দেখান যে, কেবলমাত্র স্থানান্তর যোগ্যতার ভিত্তিতে ইল্লতের প্রয়োগের চেষ্টা করা উচিত হবে না। তাদের মূল ঘটনার সাথে ইল্লতের সীমাবদ্ধ থাকার সম্ভাব্যতার ব্যাপারে সহজাত কোনো আপত্তি নেই। অবশ্য আলেমগণ একমত যে, খোদায়ী বিধানের নির্দেশিত কারণ সহজাতভাবে অপরিবর্তনীয় হোক বা না হোক তা অবশ্যই গ্রহণীয় হবে।

তাদাইয়ার শর্ত এটি বুঝাচ্ছে যে, কিয়াসের ইল্লত বিমূর্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং তা কোনো বাস্তব কার্যক্রম বা বস্তু নয়। এটি বুঝানোর জন্য আমরা উপরিউক্ত উদাহরণ আবারও দিতে পারি। সফরের সময় রোজার সুবিধা প্রদান হচ্ছে একটি বাস্তব কার্যক্রম অন্যদিকে উন্মত্ততা হচ্ছে একটি বিমূর্ত বৈশিষ্ট্য, যা এর প্রয়োগের সঙ্গে সীমাবদ্ধ নয়। অনুরূপভাবে সুদ (রিবা) সম্পর্কিত হাদিসে সুদের বিধানের ইল্লতে ৬টি নির্দিষ্ট পণ্য বিক্রির ক্ষেত্রে কমবেশি গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এসব পণ্য ওজনে বা তার মূল্যমানের ভিত্তিতে বিক্রয়যোগ্য, কিন্তু এই নির্দিষ্ট পণ্যের সাথে বিনিময় করা যাবে না। হাদিসে বলা হয়েছে :

الذهب بالذهب والفضة بالفضة ، والبر بالبر

والشعيربالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح

مثلا بمثل سواءً بسواء يداً بيد

www.pathagar.com

স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রুপার বিনিময়ে রুপা, গমের বিনিময়ে গম, বার্লির বিনিময়ে বার্লি, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণের বিনিময়ে লবণ, অবশ্য সমান হতে হবে- এক হাতের বিনিময়ে এক হাত...। অন্য কথায় এসব পণ্য লেনদেনের ক্ষেত্রে অবশ্যই কোনো পক্ষ অধিক গ্রহণ করতে পারবে না এবং তাৎক্ষণিকভাবে তা সরবরাহ করতে হবে, অন্যথায় এ লেনদেন সুদি কারবার বলে গণ্য হবে, যা হারাম। এ নিষেধাজ্ঞায় ইল্লতের সুনির্দিষ্ট কোনটি বাস্তব বস্তু নয় বরং একটি গুণ বা ধারণা যা সব কিছুর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়; আর তা হলো মূল্যমান বা ওজনের সাহায্যে বিক্রয়যোগ্যতা।[৪০]

৫. শেষ শর্তটি হলো, ইল্লতের এমন বৈশিষ্ট্য অবশ্য থাকতে পারবে না, যা খোদায়ী বিধানের বিপরীত হবে অথবা তা পরিবর্তনের চেষ্টা করবে। এর উদাহরণ হিসেবে একজন বিচারকের কাহিনী উল্লেখ করা যেতে পারে। একজন আব্বাসী শাসক আন্দালুসিয়ার ইমাম ইয়াহিয়ার কাছে রমজানে দিনের বেলা স্ত্রী সহবাসের কাফফারা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। ইমাম জবাবে বললেন, এর কাফফারা হচ্ছে একটানা ৬০ দিন রোজা পালন। এ উত্তর সঠিক ছিল না, কারণ এতে হাদিসের বিধানকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে এর কাফফারা হিসেবে একজন দাসকে মুক্ত করা অথবা ৬০ দিন রোজা পালন অথবা ৬০ জন গরিবকে খাওয়ানোর বিধান কার্যকর করা হয়েছে। বিচারকের দেয়া ফতোয়া সন্দেহজনক ধারণার বশবর্তী হয়ে অগ্রাধিকারক্রম পরিবর্তনের চেষ্টা করা হয়েছে, কারণ দাস মুক্ত করা (অথবা ৬০ জন মিসকিনকে খাওয়ানো) একজন শাসকের জন্য সহজ বিষয় তাই তার জন্য কেবল রোজা পালন করা প্রয়োজন। এ ঘটনার কাফফারার ইল্লত খোদ রোজা ভঙ্গ করা- রমজান মাসের প্রতি অসম্মান করা অথবা স্ত্রীর সাথে সহবাস করা নয়, যা বিচারকের ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে ঘটে থাকতে পারে।[৪১]

আমরা পরবর্তীতে ইল্লত কিভাবে শনাক্ত করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করব। খোদা প্রদত্ত আইনের সঠিক কারণ বা যুক্তি অনুসন্ধানে ফকিহগণ আর কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারবেন কী?

ইল্লত শনাক্তকরণ

শরিয়াহর কোনো বিধানের ইল্লত নসের হুকমের দ্বারা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়; নস থেকেও এর আভাস ইঙ্গিত পাওয়া যায় অথবা ঐকমত্যের দ্বারাও তা নির্ণীত হয়। যখন খোদায়ী বিধানে ইল্লত স্পষ্টভাবে শনাক্ত থাকে তখন মতানৈক্যের কোনো অবকাশ থাকে না। খোদায়ী বিধানের সূত্রে ইল্লত শনাক্ত করা সম্ভব না হলেই কেবল মতপার্থক্য দেখা দেয়। উদাহরণ হলো, (সুরা আন নিসার ৪ : ৪৩) আয়াতে ইল্লত

www.pathagar.com

স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। আয়াতটিতে বলা হয়েছে : হে ইমানদারগণ, মাতাল অবস্থায় তোমরা নামাজের কাছে যেও না। (সুরা মায়েদায় ৫ : ৯৩) মদ হারাম হওয়া সংক্রান্ত সাধারণ বিধান ঘোষণার আগে এ আয়াত নাজিল হয়েছিল। তৎসত্ত্বেও এতে স্পষ্টভাবে উন্মত্ততার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে এবং হাদিসেও তা নিশ্চিত করা হয়েছে :

كل مسكر خمر وكل خمر حرام

'উন্মত্ততা সৃষ্টিকারী প্রতিটি বস্তুই খিমার (মদ) এবং সব ধরনের খিমারই হারাম।'[৪২]

অন্য আরেক স্থানে কুরআন গণিমতের মালের এক-পঞ্চমাংশ গরিব ও অভাবীদের মধ্যে বিতরণ করার বিধানের ইল্লতের ব্যাখ্যা দিয়েছে, যাতে সম্পদ ধনীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না থাকে' (সুরা আল হাশর, ৫৯ : ৭)।

হাদিসেও এর দৃষ্টান্ত দেখাত পাওয়া যায়, যাতে এর বিধানের যৌক্তিকতাকে শনাক্ত করা হয়েছে। কারো বসতবাড়িতে প্রবেশের অনুমতি চাওয়ার ইল্লত হাদিসে বর্ণিত হয়েছে :

انما جعل الاذن لأجل البصر

'দৃষ্টিগোচর হওয়ার কারণে এ অনুমতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।' এভাবে অনুমতি চাওয়ার ইল্লত অনধিকার দৃষ্টিদানের হাত থেকে বাড়িতে বসবাসকারীদের গোপনীয়তা রক্ষা করেছে।[৪৩]

এসব উদাহরণে তালিলের ধারণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কেই-লা (এমনটি যেন না হয়) লি-আজলী (কারণ), ইত্যাদির মতো আরবি শব্দ উচ্চারিত হয়েছে এবং যাতে প্রদত্ত বিধানের সুনির্দিষ্ট ইল্লত নির্দেশিত হয়েছে।[৪৪]

উপযুক্ত বিষয়ের বিকল্প হিসাবে বলা যায় যে খোদায়ী বিধান যে ইল্লাত নির্দেশ করে তা সুস্পষ্ট নস (আল নস আল জাহির), যা প্রকৃতিগতভাবে সম্ভাব্যতা বা পরোক্ষ উল্লেখ (আল ইমা' ওয়াল ইশারাহ) নির্দেশ করে। এ ধরনের নির্দেশনা বা ইঙ্গিত খোদায়ী বিধানের ভাষা থেকেও উপলব্ধি করা যায় এবং এ ক্ষেত্রে লি, ফা,' বি, আন্না, ইন্নার'র মতো কতিপয় আরবি অব্যয় ব্যবহার করা হয়, যা তালিলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলে পরিচিত। উদাহরণ হলো, কুরআনে সুরা আল মায়েদার (৫ : ৩৮) আয়াত। এতে বলা হয়েছে : 'চোর নারী হোক বা পুরুষ উভয়েরই হাত কেটে দাও (ফাকাতাই)।' খোদ চুরি হচ্ছে হাত কাটার শাস্তির কারণ। সুরা আল নূরের (২৪ : ৩৪) আয়াতেও এ ধরনের উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়। এ আয়াত দু'টিতে

যথাক্রমে জিনা ও মিথ্যা অপবাদ দানের শাস্তির বিধান বর্ণিত হয়েছে। (সুরা নিসার, ৪ : ৩৪) আয়াতে আরেকটি উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়, এতে বলা হয়েছে : 'যদি স্ত্রীলোকের বিদ্রোহমূলক (নুশুজ) ভাবধারা সম্পন্ন হওয়ার তোমরা আশঙ্কা কর তবে তাদের তোমরা বুঝানোর চেষ্টা কর (ফা-ইজুবুন্না) এবং বিছানা পৃথক করে দাও এবং তাদেরকে মারধর কর।' এ আয়াতে নুশুজ হচ্ছে শাস্তির ইল্লত।[৪৫] উসুলের উপর গ্রন্থ প্রণয়নকারীরা বিভিন্ন ঘটনা থেকে ইল্লতের অসংখ্য উদাহরণ দিয়েছেন। এসব ঘটনার ক্ষেত্রে কুরআনের নির্দেশনায় অবশ্য শরিয়াহর বিধানের ইল্লত পরোক্ষভাবে উল্লেখিত হয়েছে।[৪৬]

হাদিসে শরিয়াহর বিধানের ইল্লত পরোক্ষভাবে বর্ণিত হয়েছে। এর একটি উদাহরণ হলো বিড়ালের এঁটোর পবিত্রতা সম্পর্কিত হাদিস। হাদিসটিতে এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে :

إنها من الطوافين عليكم والطوافات

'যেহেতু বিড়াল সাধারণত বাড়িতে তোমাদের চারপাশে ঘোরাফেরা করে।' অন্য কথায় বলা যায় যে, এ সুবিধা দানের ইল্লত হচ্ছে বিড়ালের গৃহে অবস্থান। এভাবে কিয়াস করা যায় যে অপবিত্র বলে নির্দেশিত না হলে সব গৃহপালিত প্রাণীর এঁটো পবিত্র বলে বিবেচিত হবে এবং সবশেষে আরেকটি হাদিস উদ্ধৃত করা যায় যাতে বলা হয়েছে :

لا يقضي القاضي وهو غضبان

'রাগান্বিত অবস্থায় কাজী রায় প্রদান করতে পারবেন না।' এখানে রাগ হচ্ছে এ নিষেধাজ্ঞার ইল্লত।[৪৭] কিয়াসের মাধ্যমে সাহাবিগণ রা. রাগের সাদৃশ্য বিষয় যেমন প্রচণ্ড ক্ষুধা ও মানসিক চাপের ক্ষেত্রে এ বিধান সম্প্রসারণ করেছেন।[৪৮]

অনেক সময় ইল্লতের স্থলে সাবাব শব্দ ব্যবহৃত হয়। সাবাব ইল্লতের সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং অনেক লেখক একে সেভাবেই ব্যবহার করেছেন। তৎসত্ত্বেও সাধারণত সাবাব ইবাদত-বন্দেগী সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য সংরক্ষিত যার কারণ মানববুদ্ধির ধারণাতীত অনেক সময় খোদায়ী বিধানের মধ্যে তার সাবাবের ইঙ্গিত দেখতে পাওয়া যায়। আমরা (সুরা আল ইস্‌রা ১৭ : ৭৮) আয়াতে এ নির্দেশ দেখতে পাই : 'নামাজ কায়েম কর সূর্য ঢলে পড়ার (লি-দুলুক আল শামস) সময় হতে রাতের আঁধার আচ্ছন্ন হওয়ার সময় পর্যন্ত।' এখানে নামাজের সাবাব (কারণ) হচ্ছে সময় যখন নামাজ আদায় করা প্রয়োজন হবে। যেহেতু এ আয়াতের বিধানের কারণ মানববুদ্ধির উপলব্ধির যোগ্য নয় তাই একে সাবাব হিসেবে উল্লেখ

www.pathagar.com

করা হয়েছে কিন্তু ইল্লত হিসেবে নয়। এ পার্থক্য ছাড়া প্রতিটি ইল্লতই হচ্ছে সাবাব, কিন্তু প্রতিটি সাবাব ইল্লত নয়।[৪৯]

তারপরের বিষয় হচ্ছে, ঐকমত্যের ভিত্তিতেও কোনো বিধানের ইল্লত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এর উদাহরণ হলো, উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে রক্ত সম্পর্কের ভাইয়ের ওপর সম্পর্কীয় ভাইয়ের অগ্রাধিকার প্রদান। মায়ের ওপর সৎ ভাইয়ের অগ্রাধিকার প্রদানের বিষয়কে এখানে ইল্লত হিসেবে ধরা হয়েছে। ইজমার বিধান পরে অভিভাবকত্বের (ওয়ালিমা) ক্ষেত্রে রক্ত সম্পর্কীয় ভাইয়ের ওপর সৎ ভাইকে অগ্রাধিকার প্রদান কিয়াসের ভিত্তি করা হয়েছে। এ ছাড়া ইজমা শিশুর নাবালকত্ব পিতাকে তার নাবালক শিশুর সম্পত্তির অভিভাবকত্বের অধিকার প্রদানের ইল্লত নির্ধারণ করেছে। আবারও কিয়াসের মাধ্যমে দাদার জন্যও এ নাবালক নাতির অভিভাবকত্বের অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে।[৫০] নাবালক মেয়ের সম্পত্তির ওপর পিতার অধিকারের ইল্লত রয়েছে বলে কোনো ইজমা দেখতে পাওয়া যায় না। সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমগণ মনে করেন যে, এ ঘটনার ইল্লত হচ্ছে নাবালকত্ব, শাফেয়ীগণের মতে, ইজবারের ইল্লত হচ্ছে অবিবাহিত অবস্থা। তাই মেয়েটি নাবালক থাকা সত্ত্বেও বিয়ে হয়ে গেলে ইজবারের অধিকার বাতিল হয়ে যাবে।[৫১]

খোদায়ী বিধানে ইল্লত বর্ণিত না হলে বা ইঙ্গিত দেয়া না থাকলে তা শনাক্ত করার একমাত্র উপায় হবে ইজতিহাদ। তাই ফকিহগণ মূল ঘটনার বৈশিষ্ট্য বা গুণকে বিবেচনা করেন এবং কেবলমাত্র সে বৈশিষ্ট্য সঠিক (মুনাসিব) বলে বিবেচিত হলে তাকেই ইল্লত বলে শনাক্ত করেন। এর উদাহরণ হলো রোজার সময় দিবালোকে সহবাস করার কাফফারা সংক্রান্ত উপরোল্লিখিত হাদিস। এতে সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায়নি যে, এ কাফফারার ইল্লত রোজা ভঙ্গ করা (ইফতার) নাকি সহবাস করা। যদিও স্ত্রীর সঙ্গে কোনো ব্যক্তির সহবাস করা বৈধ তবে এ ক্ষেত্রে তা রমজানের পবিত্রতার প্রতি এক ধরনের অবজ্ঞা প্রদর্শন বুঝাচ্ছে। কিন্তু একইভাবে এ কথা বলাও যৌক্তিক যে, এ ক্ষেত্রে সহবাস (এর মাধ্যমে রোজা ভঙ্গ) আরেক ধরনের ইফতার থেকে ভিন্ন কিছু নয়; তাই এ ক্ষেত্রে খোদ ইফতার হচ্ছে কাফফারার ইল্লত।[৫২] এ ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে ইল্লত নির্ণয়ে মুজতাহিদগণ যে পদ্ধতি অবলম্বন করেন তাকে বলা হয়, তানকীহ আল মানাত বা ইল্লতকে পৃথক করা। অন্য দু'টি পদ্ধতিতে একে পৃথক করা যায়, তাহলো যথাক্রমে তাখরীজ আল মানাত (ইল্লত উদঘাটন) ও তাহকীক আল মানাত (ইল্লত নির্ণয় করা)। এ অনুসন্ধান প্রক্রিয়াকে উসুলের কতিপয় আলেম মোটামুটিভাবে আল সিদর ওয়াল তাকছীম বা হুকমের ইল্লতের ভুল দূর ও যথার্থতা নির্ধারণ বলে উল্লেখ করেছেন।

www.pathagar.com

তানকীহ্ আল মানাত বলতে বুঝায় যে কোনো বিধানের একাধিক কারণ রয়েছে এবং মুজতাহিদকে তার মধ্য থেকে কোনটি সঠিক (মুনাসিব) তা শনাক্ত করতে হবে। উপরের উদাহরণে আমরা সেটি দেখতে পেয়েছি। আক্ষরিক অর্থে তানকীহ মানে 'পরিশুদ্ধকরণ' আর মানাত হচ্ছে ইল্লতের সমার্থক শব্দ। পারিভাষিক অর্থে তানকীহ আল মানাত মানে আসল ও নতুন ঘটনার মধ্যকার বৈশাদৃশ্য দূর করে তাদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা (ইলহাক আল ফার বিল আসল বি-ইলগাহা আল ফারিক)।[৫৩]

বস্তুতপক্ষে ইল্লত শনাক্তকরণ সম্পর্কিত অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার সূচনাবিন্দু হচ্ছে ইল্লত উদঘাটন বা তাখরীজ আল মানাত এবং প্রায়ই তা তানকীহ্ আল মানাত-এর অগ্রগামী হয়। যেসব ক্ষেত্রে খোদায়ী বিধান অর্থাৎ কুরআন-সুন্নাহ্ বা ইজমাতে ইল্লত শনাক্ত করা হয়নি সেসব ক্ষেত্রে ফকিহ্ ইজতিহাদের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক কারণগুলো বিশ্লেষণ করে ইল্লত উদঘাটন করেন। তিনি একাধিক কারণ শনাক্ত করে থাকতে পারেন, সে ক্ষেত্রে তিনি তাখরীজ আল মানাতের ধাপ সম্পন্ন করেছেন এবং এখন তাকে অবশ্যই পরবর্তী ধাপে পদার্পণ করতে হবে; তাহলো সঠিক কারণটি পৃথক করা। এর দৃষ্টান্ত হলো, হাদিসে গম ও অন্য পাঁচটি পণ্যে গমের মতো সুদ হারাম হওয়ার বিধান। ফকিহ এর উদাহরণ স্বরূপ গম ও কিসমিসের মধ্যে কিয়াস করার মাধ্যমে কিসমিসের ওপর এক-দশমাংশ কর ধার্য করা যায় কি না তা খতিয়ে দেখেন; সে ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ইল্লতগুলো হতে পারে, উভয় পণ্য জীবন বাঁচায়, অর্থাৎ উভয়ই আহার্য পণ্য, উভয়ই মাটিতে জন্মে, অথবা উভয়ই ওজনের মাধ্যমে বিক্রি হয়। এভাবে ফকিহ্ প্রথম দফা অর্থাৎ ইল্লত উদঘাটনের কাজ (তাখরীজ আল মানাত) সম্পন্ন করলেন। এরপর তিনি তানকীহ্ আল মানাত অবলম্বনের মাধ্যমে এসব কারণের কয়েকটি বর্জন করবেন। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ছয়টি পণ্যের একটি লবণ যা জীবন বাঁচায় না; তাই প্রথম ইল্লত বর্জিত হলো। স্বর্ণ ও রৌপ্য আহার্য পণ্য নয়, তাই দ্বিতীয় কারণটিও রহিত হলো। লবণ ও মূল্যবান ধাতব পদার্থ মাটিতে জন্মে না, তাই তৃতীয় কারণও টিকতে পারল না। অতএব, ইল্লত হচ্ছে হাদিসে উল্লিখিত নির্দিষ্ট পণ্যগুলোর সর্বশেষ বৈশিষ্ট্য, তাহলো সুদ (রিবা)। দুই ধাপের যুক্তি প্রদর্শনের পার্থক্য হচ্ছে। ফকিহ্ তাখরীজ আল-মানাতে পরিস্থিতি বিচার-বিশ্লেষণ ও বিবেচনা করেন যাতে ইল্লত শনাক্ত হয় না, অন্যদিকে তানকীহ্ আল মানাতে একাধিক কারণ শনাক্ত করা হয় এবং তার কাজ হচ্ছে সঠিক ইল্লত নির্বাচন করা।[৫৪]

ইল্লত নির্ণয় বা তাহকীক আল মানাত অনুসন্ধানের দু'টি আগ্রগামী ধাপ অনুসরণ করে যাতে প্রতিটি ঘটনাতেই ইল্লতের উপস্থিতি নির্ণয় করতে হয়। উদাহরণ হলো,

www.pathagar.com

মদ ও হার্বাল পানীয়র মধ্যে কিয়াস করার ক্ষেত্রে অনুসন্ধানে এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, আলোচ্য বস্তুতে মাদকাসক্তের বৈশিষ্ট্য মদের অনুরূপ, যা প্রকৃতিগতভাবে তাহকীক আল মানাত। অনুরূপভাবে চোর ও পকেটমারের মধ্যে কিয়াস করার ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করা হবে যে, তাহকীক আল মানাতের প্রকৃতিতে পকেটমার চুরির সংজ্ঞার আওতায় পড়বে কি না।[৫৫]

কিয়াসের শ্রেণি বিভাগ

ইল্লতের দৃঢ়তা ও দুর্বলতার আলোকে শাফেয়ী ফকিহ্গণ কিয়াসকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন :

ক. 'উচ্চতর কিয়াস' (কিয়াস আল আউলা)। এ ধরনের কিয়াসের ইল্লত মূল ঘটনার (আসল) চেয়ে নতুন ঘটনায় (ফার) অনেক বেশি স্পষ্ট, আর এ কারণেই একে কিয়াস আল-আউলা বলা হয়। উদাহরণ হিসেবে আমরা পবিত্র কুরআনের (সুরা ইস্‌রা, ১৭ : ২৩) উল্লেখ করতে পারি, যে আয়াতে পিতা-মাতা সম্পর্কে বলা হয়েছে : ''তাদেরকে 'উহ্' পর্যন্ত বলবে না। তাদেরকে ভর্ৎসনা করবে না, বরং তাদের সাথে বিশেষ মর্যাদা সহকারে কথা বলবে।'' এ আয়াত কিয়াসের মাধ্যমে এ বিধান গ্রহণ করা যায় যে, মৌখিক নির্যাতনের চেয়ে আঘাত বা প্রহার করা হারাম হওয়ার বিষয় আরো স্পষ্ট। অনুরূপভাবে কিয়াসের মাধ্যমে ভুলবশত হত্যাকাণ্ডের কাফফারা ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে; কেননা সীমালঙ্ঘনের ঘটনায় কাফফারার বিষয়টি অধিকতর স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে। এ হলো শাফেয়ীদের অভিমত, কিন্তু হানাফীগণ প্রথম উদাহরণটিকে এক ধরনের কিয়াস বলে মনে করেন না বরং এটি আয়াতটির নিছক নিহিতার্থ, (দালাল আল-নস) যা কিয়াস নয় বরং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের আওতায় পড়ে। অনুরূপভাবে হানাফীগণের মতে, ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডের জন্য কাফফারার প্রয়োজন নেই। এর দণ্ডের বিধান কিয়াস নয় বরং ব্যাখ্যার আলোকে নির্ধারণ করা হয়েছে।[৫৬]

খ. 'সমপর্যায়ের কিয়াস' (কিয়াস আল-মুসায়ী), এ ধরনের কিয়াসের ইল্লত মূল ঘটনা ও নতুন বিষয় উভয়ের ক্ষেত্রে সমভাবে কার্যকর কারণ কিয়াসের মাধ্যমে হুকম সাব্যস্ত হয়েছে। কুরআনের (সুরা নিসার ৪ : ২) থেকে এর উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। আয়াতটিতে ইয়াতিমের সম্পত্তি গ্রাস করাকে হারাম করা হয়েছে। কিয়াসের মাধ্যমে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে, এ ধরনের সম্পত্তির ক্ষতি হতে পারে এমন সব ধরনের ধ্বংসাত্মক কাজ ও

www.pathagar.com

অব্যবস্থাপনাও সমভাবে হারাম। হানাফীগণ আবারও বলেছেন যে, এটি কিয়াস নয় বরং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের আওতায় পড়বে। এর আরেকটি উদাহরণ আমরা হাদিস থেকে দিতে পারি। হাদিসটিতে বলা হয়েছে :

إذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه

سبع مرت ...

'কোন পাত্রে কুকুর মুখ দিলে তা সাতবার ধুতে হবে।' শাফেয়ীগণ কিয়াসের মাধ্যমে কুকুরে চাটা পাত্রের ক্ষেত্রে একই বিধান সম্প্রসারিত করেছেন। প্রথমত, হানাফীগণ হাদিসটিকে অনুমোদন করেননি।[৫৭]

গ. 'নিম্নতরের কিয়াস' (কিয়াস আল আদনা), এ ধরনের কিয়াসে মূল ঘটনার চেয়ে নতুন বিষয়ে ইল্লত অপেক্ষাকৃত অস্পষ্টভাবে কার্যকর। তাই এ ক্ষেত্রে মূল ঘটনায় প্রযোজ্য বিধানের আওতায় নতুন ঘটনায় পড়ে কিনা তা ততটা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় না। উদাহরণ হিসেবে সুদের (রিবা) বিধানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। রিবার বিধানে গম ও অন্য কয়েকটি সুনির্দিষ্ট পণ্যের দু'টি যদি সমপরিমাণে ও তাৎক্ষণিক সরবরাহ করা না হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে লেনদেন হারাম করা হয়েছে। কিয়াসের মাধ্যমে এ বিধান আপেলের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করা হয়েছে কারণ, গম ও আপেল উভয় আহার্য পণ্য, (শাফেয়ীগণের মতে) এবং ওজনের সাহায্যে পরিমাপযোগ্য (হানাফীগণের মতে)। কিন্তু এ ধরনের কিয়াসের ইল্লত দুর্বল কারণ আপেল গমের মতো প্রাধান খাদ্যশস্য নয়।[৫৮]

এ ধরনের কিয়াসকে সর্বসম্মতভাবে সঠিক কিয়াস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। তবে আগেই বলা হয়েছে, হানাফী ও জাহিরিগণ মনে করেন যে, প্রথম দুই প্রকার কিয়াস আয়াতের অর্থের আওতায় পড়ে। দৃশ্যত হানাফীগণ 'কিয়াস' পরিভাষাকে কেবলমাত্র সেসব বিধানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে মনে করেছেন যা সংগ্রহে ইজতিহাদের প্রয়োজন হয়।[৫৯]

কিয়াসকে পুনরায় দুইভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। তাহলো, 'স্পষ্ট কিয়াস' (কিয়াস জলি) ও 'সুপ্ত কিয়াস' (কিয়াস খফি)। মূলত এটি হচ্ছে হানাফীগণের শ্রেণি বিভাগ। পূর্বেরটিতে আসল ও ফার-এর সমতা স্পষ্ট এবং তাদের মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট দলিলের সাহায্যে দূরীভূত করা হয়েছে। আলেমগণ এ সমতার উদাহরণ হিসেবে দাস মুক্ত করার বিধানের ক্ষেত্রে দাস ও দাসীর মধ্যে তুলনা করেছেন। তাই দেখা যাচ্ছে যে, দুই ব্যক্তি যদি যৌথভাবে একজন দাসের মালিক হয় এবং তাদের

www.pathagar.com

একজন দাসকে মুক্ত করে দেয় তাহলে ইমামের দায়িত্ব হবে অপর মালিককে তার অংশের মূল্য পরিশোধ করে দিয়ে দাসকে মুক্ত করে দেয়া। এ বিধান স্পষ্টভাবে পুরুষ দাসের ক্ষেত্রে কিন্তু 'স্পষ্ট কিয়াসের' মাধ্যমে এক দাসীর ক্ষেত্রেও এ বিধান প্রযোজ্য করা হয়েছে। এখানে দাস মুক্তির ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যকার পার্থক্যে কোনো সমস্যার সৃষ্টি হয়নি। 'সুপ্ত কিয়াস' (কিয়াস খফি) 'স্পষ্ট কিয়াস' থেকে ভিন্ন ধরনের। এ ক্ষেত্রে অনুমানের (যন্নী) মাধ্যমে আসল ও ফার-এর মধ্যকার পার্থক্য দূর করা হয়। আল শাওকানী দুই প্রকার মদ নাবিজ ও খামারের মাধ্যমে এ কিয়াসের উদাহরণ দিয়েছেন। নাবিজ খেজুর থেকে তৈরি হয় আর খামার আঙ্গুর থেকে। এ দুইয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও হারামের বিধান কিয়াসের মাধ্যমে নাবিজে সম্প্রসারিত করা হয়েছে।[৬০] কিয়াস খফির আরেকটি উদাহরণ হলো, জিনার হাদের শাস্তি সমকামের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করা। হানাফীগণ ব্যতিরেকে অধিকাংশ আলেম এটি সমর্থন করেছেন যদিও দু'টি বিষয়ের মধ্যে বেশ পার্থক্য রয়েছে। উপরের বিশ্লেষণ থেকে সবশেষে এ কথা বলা যায় যে, কিয়াস খফি ও কিয়াস আল আদানা মূলত একই ধরনের।

কিয়াসের প্রমাণ (হুজ্জিয়াত)

পবিত্র কুরআনে কিয়াসের স্পষ্ট কর্তৃত্বের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও চারটি সুন্নি মাজহাব ও জায়েদী শিয়া আলেমগণ কিয়াসের বৈধতা প্রদান করেছেন এবং তারা তাদের মতের সমর্থনে কুরআনের কয়েকটি আয়াত উদ্ধৃত করেছেন। (সুরা নিসা, ৪ : ৪৯) আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে যাতে মুমিনদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে, 'অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি কোনো বিষয়ে মতবৈষম্যের সৃষ্টি হয়, তাহলে তাকে আল্লাহ ও রসুল সা.-এর দিকে ফিরিয়ে দাও যদি তোমরা প্রকৃতই খোদা ও পরকালের প্রতি ইমানদার হয়ে থাক।'

কিয়াসের সমর্থকরা যুক্তি দেখান যে, কুরআন ও সুন্নাহ্তে আমরা যেসব আভাস-ইঙ্গিত ও নির্দেশনা দেখতে পাই সেসব অনুসরণের মাধ্যমেই আমরা কেবল খোদা ও তার রসুল সা.-এর দিকে ফিরে আসতে পারি। এটি অর্জনের একটি উপায় হচ্ছে আহকামের যুক্তি শনাক্ত করা এবং বিরোধপূর্ণ বিষয়ে তা প্রয়োগ করা এবং কিয়াসের মাধ্যমে মূলত এটিই করা হয়।[৬১] সুরা আল নিসার আয়াতে (সুরা নিসা, ৪ : ১০৫) একই যুক্তি পেশ করা হয়েছে। আয়াতটিতে ঘোষণা করা হয়েছে : 'হে নবি! আমরা এ কিতাব পূর্ণ সত্যতা সহকারে তোমার প্রতি নাজিল করেছি-যেন আল্লাহ তোমাকে যে সত্য পথ দেখিয়েছেন সে অনুসারে লোকদের মধ্যে বিচারফায়সালা করতে পার।' তাই বিচার ফয়সালা খোদার দেয়া স্পষ্ট নির্দেশনা

www.pathagar.com

অথবা তার সাথে ঘনিষ্ঠ অনুরূপ নির্দেশনার ভিত্তিতে প্রদান করতে হবে।[৬২] কুরআনে প্রায়ই তার বিধিবিধানের যৌক্তিকতা স্পষ্টভাবে অথবা তার উদ্দেশ্যের উল্লেখের মাধ্যমে নির্দেশ করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কিসাসের যুক্তি হলো, মানুষের জীবনের নিরাপত্তা বিধান, (সুরা বাকারায়, ২ : ৭৯) এ বিষয়টি স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ হয়েছে। অনুরূপভাবে জাকাতের বিধান হচ্ছে কতিপয় লোকের হাতে অর্থ-সম্পদ পুঞ্জিভূত হওয়া বোধ করা, এ বিষয়টিও কুরআনের (সুরা আল হাশরে, ৫৯ : ৭) স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। কুরআনের অন্যত্র আমরা তায়াম্মুম (পানির অবর্তমানে মাটি বা বলু দিয়ে ওজু করা) করার অনুমতির বিধান দেখতে পাই, এতে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জীবনকে সংকীর্ণ করে দিতে চান না' (সুরা মায়েদা, ৫ : ৬)।

এসব উদাহরণে কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে যাতে কিয়াস অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। কুরআন সুন্নাহ্তে সুস্পষ্ট নির্দেশনা পাওয়া না গেলে আইনদাতার সাধারণ উদ্দেশ্য অর্জনের একটি উপায় হিসেবে কিয়াসকে অবশ্যই ব্যবহার করা যাবে। তাই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, কারণ ও উদ্দেশ্যের নির্দেশনা, মিল ও গরমিলকে আহকাম নির্ণয়ের একটি নিয়ামক বিধান হিসেবে পালন ও অনুসরণ করা না হলে তা হবে অর্থহীন।[৬৩]

কিয়াসের সমর্থকরা তাদের মতের সমর্থনে সুরা হাশরের আয়াত (সুরা হাশর, ৫৯ : ২) উদ্ধৃত করে থাকেন- এতে বলা হয়েছে : 'অতএব শিক্ষা গ্রহণ কর হে দৃষ্টিবান ব্যক্তিরা,' এখানে দৃষ্টিবান অর্থ হচ্ছে একই ধরনের বিষয়ের মধ্যে মিল ও তুলনা করার প্রতি দৃষ্টি প্রদান। অন্য দু'টি আয়াত আলেমগণ বিভিন্ন সময় উদ্ধৃত করেন। একটি (সুরা নাযিয়াত, ৭৯ : ১৩), যাতে বলা হয়েছে : 'বস্তুত এমন প্রত্যেক লোকের জন্য এতে বড় উপদেশ রয়েছে, যারা ভয় করে।' (সুরা আলে ইমরানে, ৩ : ১৩) বলা হয়েছে : 'বস্তুত দৃষ্টিবান লোকদের জন্য এতে খুবই শিক্ষার বস্তু নিহিত রয়েছে।'

কিয়াসের সমর্থকরা সুন্নাহ্ থেকে দুই ধরনের নির্দেশনার উল্লেখ করে থাকেন :

১. কিয়াস হচ্ছে এক ধরনের ইজতিহাদ যা মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. বর্ণিত একটি হাদিসে স্পষ্টভাবে বৈধতা প্রদান করা হয়েছে। হাদিসটিতে বলা হয়েছে :

لما أراد رسول الله ان يبعث معاذ بن جبل إلى اليمن

قال له: كيف تقضي إذا عرض لك الضاء ؟

قال: أقضي بكتاب الله ، فان لم أجد فبسنة رسول

الله ، ، فان لم أجد اجتهدرأيي ولا آلو، فضرب

رسول الله على صدره قال: الحمد الله الذي

وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله

'ইয়েমেনের বিচারক নিযুক্ত হওয়ার পর বিদায়ের সময় রসুল সা.-এর এক প্রশ্নের জবাবে মুয়াজ বললেন, তিনি কোনো বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ্‌র নির্দেশনা না পেলে তা মীমাংসার জন্য নিজস্ব ইজতিহাদের আশ্রয় গ্রহণ করবেন এবং তার এ জবাবে রসুল সা. সন্তোষ প্রকাশ করেন। যেহেতু হাদিসটিতে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ধরনের যুক্তির কথা বলা হয়নি, তাই সাদৃশ্যজনিত আইন গ্রহণ বা কিয়াস এ হাদিসের আওতায় পড়ে'।[৬৪]

২. সুন্নাহ্ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে ওহি নাজিল না হলে স্বয়ং রসুল সা. সে বিষয়ে কিয়াস অবলম্বন করেছেন। এমনই একটি ঘটনা হলো, আল খাশয়াইমা নাম্নী এক মহিলার ঘটনা। সে রসুল সা.-এর কাছে এসে বলল, তার পিতা হজ আদায় না করে মারা গেছেন, সে যদি তার পক্ষ থেকে হজ আদায় করে তাতে তার কী কল্যাণ হবে? রসুল সা. জবাবে বললেন :

قوله عليه الصلاة والسلام للخثعمية: أرأيت لو

كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك ؟

قالت: نعم ، فقال لها: فدين الله أحق

> 'মনে কর, তোমার পিতা ঋণী ছিলেন, তুমি যদি তার পক্ষ থেকে সে ঋণ শোধ করে দাও, তাহলে কি তার উপকার হবে?' সে হ্যাঁ সূচক জবাব দেয়ার পর রসুল সা. বললেন, আল্লাহর কাছে ঋণ এর চেয়ে আরো বেশি গুরুত্ব পাওয়ার যোগ্য'।[৬৫]

এ ছাড়া আরেকটি হাদিসে বলা হয়েছে, ওমর ইবনে আল খাত্তাব রা. রসুল সা.-এর কাছে জানতে চাইলেন যে, রমজানে রোজা পালনকালে চুম্বন করলে রোজা হালকা হয়ে যায় কি না। রসুল সা. তাকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'রোজা পালনকালে তুমি যদি গড়গড়া কর তাহলে কি হবে? ওমর রা. জবাবে বললেন, 'এতে কিছু হবে না'। রসুল সা. বললেন, 'তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তরও অনুরূপ'।[৬৬]

সাহাবিগণ রা. 'কিয়াসের বৈধতার বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছেছিলেন বলে জানা গেছে। আমরা প্রথম খলিফা আবু বকর রা. থেকে এর উদাহরণ দেখতে পাই।

www.pathagar.com

তিনি ওয়ারেশি সম্পত্তির ক্ষেত্রে পিতা ও দাদার অধিকারের বিষয়ে কিয়াস করেন। অনুরূপভাবে ওমর ইবনে আল খাত্তাব রা. কিয়াসের ক্ষেত্রে সাদৃশ্যের বিষয় নির্ণয় করার জন্য আবু মুসা আল আশআরীকে নির্দেশ দেন বলে জানা গেছে।[৬৭] উপরন্তু সাহাবিগণ আবু বকর রা. এর কাছে বাইয়াত (আনুগত্যের অঙ্গীকার) করার মাধ্যমে ওমর রা. দুই ধরনের নেতৃত্বের ব্যাপারে কিয়াস করে তাকে শক্তিশালী করেন। ওমর রা. সাহাবিগণকে জিজ্ঞাসা করেন, 'রসুল সা. যে ব্যক্তির প্রতি ধর্মীয় বিষয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন তোমরা কি তার প্রতি দুনিয়াবী বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকবে না? রসুল সা.-এর উত্তরাধিকারী নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হওয়া সত্ত্বেও তারা ওমর রা.-এর সাথে একমত পোষণ করেন।[৬৮] পুনরায় সাহাবিগণ রা.- যখন একটি সম্মেলন ডেকে মদপানের শাস্তি নির্ধারণ করেন তখন আলী ইবনে আবি তালিব রা. পরামর্শ দেন যে, কিয়াসের মাধ্যমে মিথ্যা অপবাদকারীর ক্ষেত্রে মদপানকারীর শাস্তি প্রযোজ্য হওয়া উচিত। 'যখন কোন ব্যক্তি মদপান করে তখন সে মাতাল হয়ে যায় এবং যখন সে উন্মত্ত হয়ে যায় তখন সে মিথ্যা অপবাদ দেয়'।[৬৯] উপসংহারে এ কথা বলা যায় যে, কুরআন, সুন্নাহ্ এবং সাহাবি রা.-দের ইজমায় কিয়াসের অনুমোদন করা হয়েছে।

কিয়াসের বিপক্ষে যুক্তি

প্রধানত জাহিরিগণ ও মুতাজিলা নেতা ইব্রাহিম আল নাজ্জামসহ কয়েকজন মুতাজিলা আলেম কিয়াসের বিরোধিতা করেছেন। শীর্ষ স্থানীয় জাহিরি ফকিহ্ ইবনে হাজম কিয়াসের বিপক্ষে সবচেয়ে সোচ্চার ছিলেন। তার যুক্তির প্রধান দিকগুলোর সারসংক্ষেপ নিম্নে তুলে ধরা হলো :

১. শরিয়াহর বিধিবিধানসমূহ আদেশ-নিষেধের আকারে এসেছে। এ ছাড়া মাঝারি পর্যায়ে রয়েছে সুপারিশকৃত (মানদুব) ও তিরস্কারযোগ্য (মাকরূহ), এগুলো হলো মূলত দুই প্রকারের মুবাহ (অনুমোদনযোগ্য)। তাই কেবলমাত্র তিন প্রকারের আহকাম রয়েছে, তাহলো, আদেশ, নিষেধ ও অনুমোদনযোগ্যতা। কোনো বিষয়ে কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত পাওয়া না গেলে সে ক্ষেত্রে তা ইবাহার মূলনীতি অনুযায়ী মুবাহর (অনুমোদনযোগ্যতা) আওতায় পড়বে, যা কুরআনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[৭০] কুরআন, সুন্নাহ্ অথবা ইজমার সুস্পষ্ট নির্দেশনার দ্বারা আদেশ-নিষেধ নির্ধারিত হয়। এর অনুপস্থিতিতে কোনো কিছুই অবশ্য কর্তব্য বা নিষিদ্ধ বিধান বলে নির্ধারিত হওয়া সম্ভব নয় এবং তা স্বাভাবিকভাবেই মুবাহ শ্রেণির আওয়তায় পড়বে।

www.pathagar.com

তাই দেখা যাচ্ছে আহকাম নির্ধারণে কিয়াসের জন্য কোনো অবকাশ রাখা হয়নি।[৭১]

২. ইবনে হাজমের মতে, কিয়াসের সমর্থকরা ধারণার ভিত্তিতে অগ্রসর হন। এর অর্থ হচ্ছে, শরিয়ত প্রতিটি বিষয়ে নস প্রদানে ব্যর্থ হয়েছে, আর এমন ধারণা পোষণ কুরআনের সুস্পষ্ট বিধানের পরিপন্থী। ইবনে হাজম এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো উদ্ধৃত করেন : 'আমরা এ কিতাবে কোনো কিছুই অবহেলা করিনি' (সুরা আন'আম, ৬ : ৮৯) এবং 'এ কিতাব নাজিল করেছি, যা প্রত্যেকটি বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী' (সুরা নাহল, ১৬ : ৮৯)। এ ছাড়া অন্য আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে : 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে সম্পূর্ণ করে দিয়েছি এবং আমার নেয়ামত তোমাদের প্রতি পূর্ণ করেছি' (সুরা মায়েদা, ৫ : ৩)।

যেহেতু আল্লাহর আহকাম সর্বব্যাপী এবং সব বিষয়ে পরিপূর্ণ নির্দেশনা রয়েছে তাই আমাদের একমাত্র কর্তব্য হলো তা আবিষ্কার ও বাস্তবায়ন করা। কিয়াসকে অতিরিক্ত প্রমাণ বলে বিবেচনা করা হচ্ছে কুরআন পূর্ণ নির্দেশনা প্রদানে ব্যর্থ হয়েছে বলে স্বীকার করে নেয়ার নামান্তর।[৭২]

৩. ইল্লত থেকে কিয়াসের যথার্থতা প্রতিপন্ন করা হয় যা মূল ঘটনা ও নতুন ঘটনা উভয় ক্ষেত্রেই অভিন্ন। আয়াতে ইল্লত নির্দেশিত হলে সে ক্ষেত্রে বিধানটি খোদ আয়াত থেকেই গৃহীত হয় এবং কিয়াস সহায়ক বা বিকল্প হয়ে থাকে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে ইল্লত এমনভাবে নির্দেশিত হয় না এবং তাতে নিশ্চিতভাবে তা জানার কোনো উপায় থাকে না সেখানে কিয়াস অনুমানের ওপর নির্ভর করে, যাকে কোনোক্রমে আইনগত বিধানের ভিত্তি গঠন করার সুযোগ দেয়া যেতে পারে না। ইবনে হাজমের মতে, এটিই হলো কুরআনের আয়াতের (সুরা নাজম, ৫৩ : ২৮) বক্তব্য। আয়াতটিতে ঘোষণা করা হয়েছে : 'ধারণা-অনুমান দৃঢ় প্রত্যয়ের পরিবর্তে কোনো কাজই দিতে পারে না।' কিয়াসের ইল্লত শনাক্তকরণ হচ্ছে অনুমানের চর্চা অথচ কুরআনে আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, 'এমন কোনো জিনিসের পেছনে লেগো না যে বিষয়ে তোমাদের কোনো জ্ঞানই নেই' (সুরা ইস্‌রা, ১৭ : ৩৬)[৭৩]

৪. সর্বশেষে বলা যায় ইবনে হাজমের মতে, কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় কিয়াস করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[৭৪]

(সুরা হুজরাতে ৪৯ : ১) আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন : 'হে ইমানদারগণ, আল্লাহ ও তাঁর রসুলের অগ্রে অগ্রসর হইও না। আর আল্লাহকে ভয় কর।' এর অর্থ

www.pathagar.com

হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা যেসব বিষয়ে নীরব থাকাকে পছন্দ করেছেন সেসব বিষয়ে ইমানদারদের আইন প্রণয়ন অবশ্যই পরিহার করতে হবে। একই কথা হাদিসেও বলা হয়েছে। এতে রসুল সা. মুমিনদের নির্দেশ দিয়েছেন :

دعوني ما تركتكم ، فانماهالك من قبلكم
بكثرة مساءلهم واختلافهم على نبيهم ، فإذا
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا
نميتكم عن شيء فاجتنبوء

'আমি যে বিষয় তোমাদের সামনে উত্থাপন করিনি সে বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করো না। অতীতে নবিদের কাছে অতিরিক্ত প্রশ্ন ও বিতর্ক করার কারণে অনেক জাতি ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছিল। আমি যখন তোমাদের কিছু করার আদেশ দেই তখন তোমরা সাধ্যমতো তা করার চেষ্টা কর এবং আমি যা করতে নিষেধ করি তা পরিহার কর'।[৭৫]

তাই দেখা যাচ্ছে যেসব বিষয়ে নস নীরব সেসব বিষয়ে হুকম বের করার চেষ্টা করা মুসলমানদের জন্য সঠিক হবে না। কারণ তাকে এরূপ করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। অতএব, কিয়াসে কুরআন ও সুন্নাহ্র স্পষ্ট শর্ত লঙ্ঘিত হয়েছে।

সারকথা হলো, ইবনে হাজম দু'টি প্রধান বিষয়ের ভিত্তিতে এ যুক্তি পেশ করেছেন, যার একটি হলো সব বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ্র নুসুস রয়েছে। আর দ্বিতীয়টি হলো কিয়াস হচ্ছে এ নুসুসের অনাবশ্যক সংযোজন। প্রথম বিষয়টির ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মত হলো, নুসুস বহির্ভূত কোনো বিষয় নেই, সকল বিষয়ে নুসুস রয়েছে, তা হয় স্পষ্টত: নির্দেশিত হয়েছে অথবা পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অবশ্য জাহেরীরা স্পষ্ট নুসুসের ওপর নির্ভর করেন, পরোক্ষ ইঙ্গিতের ওপর নয়। অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ আক্ষরিকতাবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেননি এবং শরিয়াহর সাধারণ উদ্দেশ্যের আলোকে কিয়াসকে বৈধ বলে অনুমোদন করেছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে, কিয়াস নুসুসের কোনো সংযোজন বা অবাঞ্ছিত আরোপ নয় বরং তার যৌক্তিক সম্প্রসারণ। তাই কিয়াসে নুসুসের অখণ্ডতা লঙ্ঘিত হওয়া সম্পর্কিত জাহিরিগণের যুক্তির কোনো ভিত্তি নেই।[৭৬]

কিয়াসের বিরোধীদের বিশেষ করে আইনের ধারণামূলক দলিলের বিষয়ে উদ্ধৃত কুরআনের কতিপয় আয়াত সম্পর্কে এ মত ব্যক্ত করা যায় যে, আলোচ্য আয়াতসমূহে কেবলমাত্র ইমান সংক্রান্ত বিষয়ে ধারণা বা অনুমান (যন্নী) অবলম্বন

www.pathagar.com

নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ফিকহর অধিকাংশ কার্যকর বিধি যন্নীর অংশ এবং খোদ নুসুস -এর বড় অংশ অন্তর্নিহিত অর্থ ও উপলক্ষ্যের (যন্নী আল দলালাহ) দিক থেকে ধারণামূলক। তবে এতে এ অর্থ বলা হচ্ছে না যে, তার ওপর আমল করা অবশ্যই বন্ধ রাখতে হবে। এর বিপরীতে শরিয়াহর বাস্তব বিধিবিধানের বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতার ব্যবস্থাকে কেবল মেনেই নেয়া হয়নি বরং একে আল্লাহ তায়ালার কর্তৃত্বের নিদর্শন এবং শরিয়াহর নমনীয়তার নির্যাস হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।[৭৭]

নীতিগতভাবে শিয়া ইমামত কিয়াসের বৈধতার স্বীকৃতি দেয়নি। তাদের মতে, কিয়াস হচ্ছে পুরোপুরি ধারণামূলক বিষয়, যা অবশ্যই পরিহার করতে হবে। এ ছাড়া শিয়া আলেমদের মতে, কুরআন, সুন্নাহ্ এবং ইমামদের বিধানে যথেষ্ট পথ নির্দেশনা রয়েছে– তাই কিয়াসের বিষয় উল্লেখ করা অপ্রয়োজনীয় ও অন্যায়।[৭৮] এ হলো দ্বাদশ শিয়া উপদলের আখবারী শাখার মত। তাদের কিয়াস প্রত্যাখ্যানের বিষয়টির সাথে জাহিরিদের মতের ঘনিষ্ঠ মিল রয়েছে। তবে শিয়াদের উসুলি শাখা কতিপয় কিয়াসের ওপর আমল করাকে বৈধ বলে গণ্য করেছে, যেমন- যে কিয়াসের ইল্লত কোনো বিধানে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে (কিয়াস আল মানসুস আল ইল্লাহ)। উচ্চতর কিয়াস (কিয়াস আল আওলা) ও স্পষ্ট কিয়াস (আল যন্নী আল কাওয়ী)। তাদের মতে, এ শ্রেণির কিয়াস নিছক ধারণামূলক নয়। এগুলো হয় খোদায়ী বিধানের অর্থের আওতায় পড়ে অথবা দৃঢ় সম্ভাব্যতা (আল জাল আওকাওয়ী) গঠন করে। তাই এগুলোকে আমলের পথ নির্দেশনা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে এগুলোকে স্বতন্ত্রভাবে কিয়াসের মাধ্যমে নয় বরং ইজতিহাদ ও আকলের দ্বারা বৈধতা দান করা হয়েছে।[৭৯]

দণ্ডপ্রদানের ক্ষেত্রে কিয়াস

বিভিন্ন মাজহাবের আলেমগণ বিচারিক, ধর্মীয়, ভাষাগত, যুক্তিগ্রাহ্য ও সাধারণভাবে প্রচলিত রীতির ক্ষেত্রে কিয়াসের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তবে এখানে যে প্রধান বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন তাহলো নির্ধারিত শাস্তি (হুদুদ) ও প্রায়শ্চিত্তের (কাফফারা) ক্ষেত্রে কিয়াসের ব্যবহার।

সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম এ বিষয়ে কোনো পার্থক্য করেননি এবং তারা এসব প্রমাণ করেন যে, শরিয়াহর অন্যান্য বিধিবিধানের মতো একইভাবে হুদুদ ও কাফফারার ক্ষেত্র কিয়াস প্রযোজ্য হবে। কিয়াসের সমর্থনে উদ্ধৃত করা কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদিস উল্লেখ করে এর ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। এসব আয়াত ও হাদিসের শব্দগুলোর অর্থ পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পেয়েছে এবং তাতে কোনোটিতেই

www.pathagar.com

দণ্ডের ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য করা হয়নি এবং যেহেতু খোদায়ী উৎসের দলিলে কিয়াসের ক্ষেত্রে কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়নি সেহেতু তা শরিয়াহ্‌র সব ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে।[৮০]

হুদুদের ক্ষেত্রে কিয়াসের একটি উদাহরণ হলো, চুরির শাস্তি মুর্দার কাফন চোর বা নাবাশের ক্ষেত্রে কার্যকর হওয়া। এ ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে অভিন্ন ইল্লত হচ্ছে না জানিয়ে অপরের সম্পত্তি হরণ করা। এই সিদ্ধান্তের সমর্থনেও একটি হাদিস উদ্ধৃত করা হয়ে থাকে।[৮১] অনুরূপভাবে (হানাফীগণ ব্যতিরেকে) সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম জিনা ও সমকামিতার মধ্যে কিয়াস করে পূর্বের হাদ পরেরটির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন।[৮২]

হানাফীগণ তাজিরের শাস্তির ক্ষেত্রে কিয়াসের কার্যকারিতার বৈধতার বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের সাথে একমত পোষণ করলেও তারা নির্ধারিত শাস্তি (হাদ) ও কাফফারার ক্ষেত্রে কিয়াস প্রয়োগের ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। উদাহরণ হলো, তারা গাল দেয়া (সাব) ও মিথ্যা অপবাদ (কাজফ) মধ্যে কিয়াসকে অনুমোদন করেছেন, কিন্তু জিনার নির্ধারিত শাস্তি কিয়াসের মাধ্যমে অন্যান্য যৌন অপরাধের ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ অনুমোদন করেননি। হানাফীগণের মতে, কিয়াসের মাধ্যমে তাজিরের আওতায় শাস্তি দেয়া যেতে পারে, কিন্তু হুদুদের নয়। এর প্রধান যে কারণটি হানাফীগণ উল্লেখ করেছেন, তাহলো- কিয়াস ইল্লতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় হুদুদের ক্ষেত্রে যার শনাক্তকরণে ধারণা ও সংশয়ের সংশ্লিষ্টতার অবকাশ থাকে। এ সম্পর্কিত একটি হাদিসে বলা হয়েছে :

إدر ؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان

له مخرج فتخلّوا سبيله ، قال الامام ان يخطيء في

العفو خير من ان يخطيء في العقوبة

> 'যতদূর সম্ভব সংশয়ের ক্ষেত্রে হুদুদ বর্জন কর। দণ্ডদানের ক্ষেত্রে মওকুফের কোনো সুযোগ থাকলে, তা গ্রহণ করবে, নমনীয়তার অনুকূলে বিচারকের কোনো ভুল কঠোরতার পক্ষে তার কোনো ভুলের চেয়ে উত্তম'।[৮৩]

তাই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, হাদ শাস্তির ইল্লত নির্ণয়ে যে কোনো পর্যায়ের সংশয় অনুরূপ ঘটনায় কিয়াসের বিধান সম্প্রসারণ অবশ্যই নিবৃত্ত করবে।[৮৪]

www.pathagar.com

উপরে বলা হয়েছে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম কাফফারার ক্ষেত্রে কিয়াস প্রয়োগকে অনুমোদন করেছেন। তাই রমজানে দিবালোকে ইচ্ছাকৃত আহার করা এবং সহবাসের মাধ্যমে রোজা ভাঙার মতো দুই ধরনের রোজা ভঙ্গের কিয়াস করে পূর্বেরটির কাফফারা পরেরটির ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ করা যাবে। অনুরূপভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে ভুলবশত হত্যাকাণ্ডের কাফফারা সম্প্রসারণকে বৈধতা প্রদান করেছেন। কুরআনে কেবলমাত্র ভুলবশত হত্যাকাণ্ডের কাফফারার বিধান বর্ণিত হয়েছে এবং একে কিয়াসের মাধ্যমে ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। উভয়ের অভিন্ন ইল্লত হচ্ছে মানুষ হত্যা। ভুলবশত হত্যার ক্ষেত্রে যদি কাফফারা লাগে সে ক্ষেত্রে উচ্চতর কিয়াসের (কিয়াস আল আওলা) ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ইল্লত আরো সুস্পষ্ট। তাই উভয় ক্ষেত্রে কাফফারা দিতে হবে এবং তা হলো একটি দাসকে মুক্ত করে দেয়া। অথবা দুই মাস রোজা পালন কিংবা ৬০ ব্যক্তিকে খাবার খাওয়ানো। হানাফীরা এ ব্যাপারেও সংখ্যাগরিষ্ঠের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। তাদের মতে, কিয়াসের উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে কাফফারা হাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়। আর যেহেতু ইল্লত শনাক্তকরণে সন্দেহ পুরোপুরি দূর করা সম্ভব হয় না, সেহেতু কিয়াসের মাধ্যমে কাফফারা সম্প্রসারণ সম্ভব নয়।[৮৫]

তৎসত্ত্বেও ফকিহগণ দণ্ডের ক্ষেত্রে কিয়াসের ব্যবহারের ব্যাপারে একমত নন। তবে উল্লেখ করতে হয়, সার্বিকভাবে আলেমগণ ফৌজদারি আইনের ক্ষেত্রে কিয়াস অবলম্বনকে নিরুৎসাহিত করেছেন। সে কারণে এ ক্ষেত্রে প্রকৃত কিয়াস তেমন একটা দেখতে পাওয়া যায় না। আধুনিক আইনের ক্ষেত্রেও এ কথা বলা যায় যা দণ্ডের ক্ষেত্রে কিয়াসকে অনুৎসাহিত করা হয়ে থাকে। কিন্তু নাগরিকদের লেনদেন ও আচার-আচরণের (মুয়ামালাত) ক্ষেত্রে অবস্থা ভিন্ন ধরনের, তাই সাধারণভাবে এ ক্ষেত্রে কিয়াস অনুমোদন করা হয়েছে।[৮৬]

নস ও কিয়াসের মধ্যে বিরোধ

যেহেতু কিয়াসের ইল্লত হচ্ছে একটি সাধারণ গুণ যা অনুরূপ সকল ঘটনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় সেহেতু নসের সাথে কিয়াসের বিরোধ দেখা দেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, এ ধরনের বিরোধ কিভাবে দূর করা যায়? এর জবাবে, আলেমগণ দু'টি মত প্রকাশ করেছেন, যার সারসংক্ষেপ নিচে তুলে ধরা হলো :

১. ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ইবনে হাম্বল এবং আবু হানিফার নামে উল্লেখিত একটি মত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে নস থাকলে সে ক্ষেত্রে কিয়াসের কোনো

www.pathagar.com

প্রয়োজন নেই। খোদায়ী বিধানে কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশনা পাওয়া না গেলে কেবল সে ক্ষেত্রেই কিয়াস প্রযোজ্য হবে। যেহেতু নসের উপস্থিতিতে কিয়াস অবলম্বনের কোনো প্রয়োজন নেই সেহেতু নস ও কিয়াসের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়ার প্রশ্ন করাও অপ্রাসঙ্গিক।[৮৭]

২. দ্বিতীয় মতটি হলো মালিকীদের। এতেও কিয়াস ও সুস্পষ্ট খোদায়ী বিধানের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়ার সম্ভাবনার বিষয় নাকচ করে দেয়া হয়েছে, তবে এতে ধারণামূলক বিধান ও কিয়াসের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির আশঙ্কাকে উড়িয়ে দেয়া হয়নি। এ মত অনুযায়ী কুরআনের 'আম'ও খবরে ওয়াহেদের সাথে কিয়াসের বিরোধ সৃষ্টি হতে পারে।

হানাফীগণের মতে, অর্থের দিক থেকে আম সুনির্দিষ্ট (কাতয়ী আল দালালাত) আর কিয়াস ধারণামূলক। নিয়ম অনুযায়ী ধারণামূলক বিষয় সুনির্দিষ্ট বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। এর অর্থ হলো, কিয়াস কুরআনের 'আমকে সুনির্দিষ্ট করতে পারে না। হানাফীগণ কেবলমাত্র এমন পরিস্থিতিতে কিয়াস ও কুরআনের 'আম-এর মধ্যে বিরোধ দেখতে পায় যেখানে কিয়াসের ইল্লত স্পষ্ট নসে-এ বর্ণিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কুরআনের আমও কিয়াসের মধ্যে বিরোধ হবে একটি কাতয়ীর সাথে অন্য একটি কাতয়ীর। অবশ্য কিয়াসের অধিকাংশই ধারণামূলক দলিল এবং সে কারণে তা কুরআনের আমকে নির্দিষ্ট করতে পারে না। কিন্তু আম যদি এক সময় যে কোনোভাবে সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তা আপনা থেকেই ধারণামূলকে পরিণত হয়, অন্তত ওই অংশের ক্ষেত্রে যা তখনো অনির্দিষ্ট থেকে গেছে। অন্যকথায় নির্দিষ্টকরণের প্রথম দৃষ্টান্তের পর আম ধারণামূলকে পরিণত হয় এবং কিয়াসের মাধ্যমে পুনরায় সুনির্দিষ্টকরণের পথ উন্মুক্ত হয়। এর উদাহরণ হলো, কুরআনে আয়াতের বায়উ (বিক্রয়) শব্দটি। এতে বলা হয়েছে 'আল্লাহ্ ব্যবসা কে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন' (সুরা বাকারা, ২ : ২৭৫)। এটি একটি আম, কিন্তু তা খবরে ওয়াহেদ দ্বারা সুনির্দিষ্ট হয়েছে যাতে নির্দিষ্ট ধরনের ব্যবসায়কে হারাম করা হয়েছে। একবার কোনো আয়াত সুনির্দিষ্ট হলে তা কিয়াসের দ্বারা আরো সুনির্দিষ্ট করার জন্য উন্মুক্ত থাকে।[৮৮]

কুরআন সুন্নাহ্‌র সাধারণ (আম) ও কিয়াসের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে এটি হলো হানাফীগণের মত। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের প্রতিনিধিত্বকারী মালেকীগণের মতে, প্রথমত, কুরআনের আয়াত আম বা ধারণামূলক হয়ে থাকে। তাই বিরোধের বিষয় নাকচ করে দেয়া যায় না এবং নস ও কিয়াসের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়। এ ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মতে ধারণামূলক মূলনীতির প্রয়োগ করতে হবে যাতে একটি ধারণামূলক নীতি অন্য একটি দ্বারা সুনির্দিষ্ট হতে পারে।

www.pathagar.com

এ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমগণ মনে করেন যে, কিয়াস কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আমকে নির্দিষ্ট করতে পারে।[৮৯]

বিচ্ছিন্ন হাদিস বা খবরে ওয়াহেদের ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী, ইবনে হাম্বল ও আবু হানিফা কিয়াসকে এ হাদিসের ওপরে অগ্রাধিকার দেননি। এর উদাহরণ হলো :

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه أمر رجلاً
ضحك بالصلاة ان يعيد الوضوء ولصلاة

> নামাজের সময় উচ্চস্বরে হাসলে ওজু ভঙ্গ হওয়া, কিয়াসের পরিপন্থী হওয়া সত্ত্বেও হানাফী মাজহাব একে গ্রহণ করেছে। এখানে যে বিধান রয়েছে তা যেহেতু খবরে ওয়াহেদের ভিত্তিতে হয়েছে, সেহেতু তা কিয়াসের চেয়ে অগ্রাধিকার পেয়েছে। তাই কেবল নামাজ ভঙ্গের ক্ষেত্রে কিয়াস প্রয়োজন, ওজুর ক্ষেত্রে নয়।[৯০]

তিন ইমাম নীতিগত খবরে ওয়াহেদকে কিয়াসের ওপর অগ্রাধিকার দিতে সম্মত হওয়া সত্ত্বেও হানাফীগণ কেবল এ নির্দিষ্ট হাদিসের ক্ষেত্রে তা সমুন্নত রেখেছেন। ইমাম শাফেয়ীসহ অধিকাংশ একে মুরসাল বিবেচনা করেছেন এবং এর ওপর আমল করেননি।

এ ছাড়া এ ব্যাপারে আরো কিছু মত রয়েছে, যা সংক্ষিপ্ত বিবেচনার দাবি রাখে। উদাহরণ হিসেবে, আবুল হোসাইন আল বসরী কিয়াসকে চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। নিম্নে তা তুলে ধরা হলো :

১. চূড়ান্ত নসের ওপর গঠিত কিয়াস, যাতে নসে আসল ও ইল্লত উভয়ই বিবৃত হয়েছে, এ ধরনের কিয়াস খবরে ওয়াহেদের ওপর অগ্রাধিকার পাবে।

২. যে কিয়াস ধারণামূলক দলিলের ভিত্তিতে সাব্যস্ত হয়েছে। যেমন- ধারণামূলক আয়াত বা হাদিস থেকে আসল পাওয়া যায় এবং যৌক্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে (ইস্তিনবাত) ইল্লত নির্ণয় করা হয়। এ ধরনের কিয়াস খবরে ওয়াহেদ চেয়ে নিম্নমানের এবং এর ওপর খবরে ওয়াহেদ অগ্রাধিকার পাবে। আল বসরী ওপরের দুই শ্রেণির ব্যাপারে একটি ‘ইজমা থাকার দাবি করেছেন।

৩. যে কিয়াসের আসল ও ইল্লত উভয়ই ধারণামূলক নুসুসের ভিত্তিতে সাব্যস্ত হয় তা ধারণামূলক দলিল বৈ কিছু নয় এবং খবরে ওয়াহেদের সাথে এর বিরোধ দেখা দিলে খবরে ওয়াহেদ অগ্রাধিকার পাবে।

www.pathagar.com

৪. যে কিয়াসের ইল্লত ইস্তিনবাতের মাধ্যমে নির্ণয় করা হয় কিন্তু আসল কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত বা মুতাওয়াতির হাদিস। এ ধরনের কিয়াস ওপরের তিন প্রকার কিয়াসের মধ্যে দুই প্রকারের চেয়ে শক্তিশালী এবং খবরে ওয়াহেদের চেয়েও অগ্রাধিকার পাবে কি না সে ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।[৯১]

মালেকী ও কতিপয় হাম্বলী আলেমের মতে কিয়াস ও খবরে ওয়াহেদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে শরিয়াহর অন্য আরেকটি মূলনীতি অথবা আসল দ্বারা কিয়াস সমর্থিত হলে কিয়াস খবরে ওয়াহেদের ওপর অগ্রাধিকার পাবে। উদাহরণ হলো- কিয়াসের ইল্লত যদি 'কষ্ট লাঘবের জন্য হয়' যা কয়েকটি আয়াত দ্বারা সমর্থিত হয় তাহলে তা কিয়াসের শক্তি বৃদ্ধি করে এবং খবরে ওয়াহেদের ওপর অগ্রাধিকার পাবে। যথার্থতার মানদণ্ডে এ ধরনের দলিলের চেয়ে আলোচ্য হাদিস দুর্বল।[৯২] অনুরূপভাবে কতিপয় হানাফী ফকিহও এ মত প্রকাশ করেন যে, কোনো খবরে ওয়াহেদের সাথে কিয়াসের বিরোধ দেখা দিলে, এর সমর্থনে আরেকটি কিয়াস পাওয়া গেলে, বিরোধপূর্ণ কিয়াসটি অবশ্যই খবরে ওয়াহেদের চেয়ে অগ্রাধিকার পাবে। ইমাম মালিকও এ মত পোষণ করেছেন বলে ইবনে আল আরাবি জানিয়েছেন। তিনি এ ব্যাপারে তার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, যখন কোনো খবরে ওয়াহেদ অন্য একটি নীতির দ্বারা সমর্থিত হয় তখন তা কিয়াসের ওপর অগ্রাধিকার পাবে। কিন্তু এ ধরনের কোনো সমর্থন পাওয়া না গেলে খবরে ওয়াহেদ পরিত্যক্ত হবে। এর উদাহরণ হিসেবে নিম্নের হাদিসটির সাথে অন্য একটি নীতির বিরোধ দেখতে পাওয়া যায় :

إذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه

سبع مرت...

'কুকুর কোনো পাত্রে মুখ দিলে, তা সাতবার ধৌত করবে, এর মধ্যে একবার পরিষ্কার বালু দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে...।'[৯৩] দেখা যাচ্ছে যে বিচ্ছিন্ন হাদিসটি কুকুরের সাহায্যে শিকার করা জন্তুর গোশত খাওয়ার অনুমোদন যোগ্যতার বিরোধ দেখা দিয়েছে। বস্তুটি কুকুরের লালার সংস্পর্শে আসা সত্ত্বেও তা খাওয়া বৈধ। অন্যদিকে এই দু'টি বিধানের সমর্থনে কোনো নীতি উদ্ধৃতি করা সম্ভব হয়নি, তাই কিয়াস খবরে ওয়াহেদের ওপর অগ্রাধিকার পাবে। আমাদের দ্বিতীয় উদাহরণ হলো, যদি খবরে ওয়াহেদ একটি মূলনীতির বিরোধী

www.pathagar.com

কিন্তু অন্য একটি মূলনীতি দ্বারা সমর্থিত হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে তা বহাল থাকবে। এটি হলো 'আরাইয়া' হাদিস, এতে বলা হয়েছে :

عن زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه

وسلم رخص في العرية

'রসুল সা. গাছে অবস্থিত খেজুর সমপরিমাণ শুষ্ক খেজুরের বিনিময়ে বিক্রির অনুমতি দিয়েছেন।' রিবার বিধানের সাথে বিরোধ দেখা দেওয়া সত্ত্বেও এ বিক্রির অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা 'দাফ আল হারাজ' বা কষ্ট দূর করা মূলনীতির সমর্থনে অনুমোদনযোগ্যতা প্রাপ্ত হয়েছে; তাহলো, চাহিদা পূরণের জন্য 'আরাইয়া লেনদেন অনুমোদনযোগ্য, এ ক্ষেত্রে তা কিয়াসের ওপর অগ্রাধিকার পাবে, যদিও তা সুদের বিধানের আওতায় পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।[৯৪]

টিকা

১. আমিদী, ইহকাম, ৩, ১৮৩।

২. গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ২, ৫৪।

৩. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ১৯৮।

৪. তুলনীয়, আব্দুর ওহিম, Jurisprudence, পৃষ্ঠা ১৩৭।

৫. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৫২; আব্দুর ওহিম, Jurisprudence, পৃষ্ঠা ১৩৮।

৬. ইবনে কাইয়্যিম, ইলাম, ২, ২৪২; খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৫৩।

৭. আবু দাউদ, সুনান (হাসান অনূদিত), ২, ৫৫৬, হাদিস নম্বর ২০৭৫; তাবরিজী, মিশকাত, ২, ৯৪০, হাদিস নম্বর ৩১৪৪; মূসা, আহকাম, পৃষ্ঠা ৪৫।

৮. আমিদী, ইহকাম, ৩, ১৮৬।

৯. 'উবায়দুল্লাহ ইবনে মাসউদ সদর আল শরিয়াহ, আল তাওদিহ ফী হাল গাওয়ামিদ আল তানতীহ, পৃষ্ঠা ৪৪৪; Aghnides, Muhammedan Theories, পৃষ্ঠা ৪৯।

১০. আমিদীর মতে (ইহকাম, ৩, ১৯৩) কিয়াসের ফলাফল অর্থাৎ এর বিধান নতুন ঘটনার ক্ষেত্রে (যেমন- হুকম আল ফার) প্রয়োগ করা হয় যাতে কিয়াসের জরুরি শর্তাবলি (আরকান) অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। কেবলমাত্র এ প্রক্রিয়ার শেষে হুকম আসে তাই তা রুকন হতে পারবে না । অন্যদিকে ইসনাবী হুকম আল ফারকে কিয়াসের জরুরি বিষয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এ মতপার্থক্য মূলত তাত্ত্বিক বিষয়। কারণ নতুন ঘটনার হুকম কার্যত সবদিক থেকেই আসল ঘটনার অনুরূপ। তুলনীয়, যুহাইর, উসুল, ৪, ৫৮-৫৯।

১১. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২০৪-২০৫; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ১৮০।

www.pathagar.com

১২. আবু জাহরাহ্, উসুল, পৃষ্ঠা ১৮১।

১৩. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৫৩; শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২১০।

১৪. আবু জাহরাহ্, উসুল, পৃষ্ঠা ১২৮।

১৫. গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ২, ৮৭; শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২০৫।

১৬. ইবনে রুশদ, বিদাইয়াহ, ১, ৪-৫; আবু জাহরাহ্, উসুল, পৃষ্ঠা ১৮০; নূর, 'কিয়াস', ২৯।

১৭. গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ২, ৮৭।

১৮. তুলনীয়, আবু জাহরাহ্, উসুল, পৃষ্ঠা ১৮৪।

১৯. আল জারকার ধারণাবলি আমার কাছে না থাকায় তার মত সম্পর্কে আমার জ্ঞান তার সম্পর্কে নূরের উদ্ধৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে, নূর, 'কিয়াস', ২৯।

২০. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২০৫; খুদারী, উসুল, ২৯৫।

২১. আমিদী, ইহকাম, ৩, ১৯৬-৯৭।

২২. আবু জাহরাহ্, উসুল, পৃষ্ঠা ১৮৫; খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৬১-৬২।

২৩. ইবনে হাজম, ইহকাম, ৮, ১০২; মুসলিম, সহিহ মুসলিম, ১, ৪২৩, হাদিস নম্বর ১৫৯৯।

২৪. একই গ্রন্থ, ৮, ১৯৩।

২৫. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২২২; আবু জাহরাহ্, উসুল, পৃষ্ঠা ১৮৫।

২৬. প্রসঙ্গিক হাদিসে বলা হয়েছে : 'খুজাইমা যদি যে কোনো ব্যক্তির পক্ষে সাক্ষী দিতেন তা হলেও তা প্রমাণ হওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল।' গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ২, ৮৮; আবু দাউদ, সুনান, ৩, ১০২৪, হাদিস নম্বর ৩৬০০।

২৭. মুসলিম, সহিহ মুসলিম, পৃষ্ঠা ২৪৭, হাদিস নম্বর ৯২০; শাবান, উসুল পৃষ্ঠা ১৩০।

২৮. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২০৯।

২৯. শাবান, উসুল পৃষ্ঠা ১৩৪।

৩০. Aghnides, Muhammedan Theories, পৃষ্ঠা ৬২।

৩১. বোখারী, সহিহ, (ইস্তাম্বুল সংস্করণ), ৩, ৪৪, (কিতাব আল সালাম, হাদিস নম্বর ৩); আল সারাখসী (উসুল পৃষ্ঠা ১৫২) লিখেছেন : 'রসুল সা. বিক্রয়ের সময় অস্তিত্ব ছিল না এমন বস্তুর বেচাকেনা নিষিদ্ধ করেছেন কিন্তু সালামের ব্যতিক্রম। এ শর্তে সালাম বৈধ বা জায়েজ যে তা সরবরাহের তারিখ নির্ধারিত থাকতে হবে এবং দুই পক্ষই এসব শর্ত পূরণে সমর্থ হবে। দেখুন, আব্দুর ওহিম, Jurisprudence, পৃষ্ঠা ১৪৫।

৩২. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২০৭; আবু জাহরাহ্, উসুল, পৃষ্ঠা ১৮৮।

৩৩. উদাহরণ হিসেবে দেখুন, শাওকানী (ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২০৭-২০৮) ইল্লতের ২৪টি শর্তের তালিকা প্রণয়ন করেছেন অন্যদিকে ইবনে হাজম মাত্র ১১টি শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন।

www.pathagar.com

৩৪. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৬৪; আবু জাহ্‌রাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ১৮৮।

৩৫. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২০৭-২০৮; খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৮৮-৯৭।

৩৬. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ১৮৮।

৩৭. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৬৪।

৩৮. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২০৭; আব্দুর ওহিম, Jurisprudence, পৃষ্ঠা ১৪৯; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ১৮৯; খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৬৯।

৩৯. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ১৮৯; খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৬৯-৭০।

৪০. মুসলিম, সহিহ মুসলিম, পৃষ্ঠা ২৫২, হাদিস নম্বর ৯৪৯; গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ২, ৯৮; খুদারী, উসুল, পৃষ্ঠা ৩২০; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ১৯০; আব্দুর ওহিম, Jurisprudence, পৃষ্ঠা ১৫১-৫২।

৪১. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ১৮৭, ১৯০, ১৯৪।

৪২. আবু দাউদ, সুনান , ৩, ১০৪৩, হাদিস নম্বর ৩৬৭২।

৪৩. মুসলিম, সহিহ মুসলিম, পৃষ্ঠা ৩৭৫, হাদিস নম্বর ১৪২৪; গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ২, ৭৪; ইবনে হাজম, ইহকাম, ৮, ৯১; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ১৯৩। এ ছাড়া পবিত্র কুরআনে ইশতিহান অর্থাৎ কারোর বাড়িতে প্রবেশের আগে অনুমতি গ্রহণ করার বিষয়ে আয়াত রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে (সুরা আল নূরের এ আয়াত ২৪ : ২৭) উদ্ধৃত করা যেতে পারে : 'হে ইমানদার লোকেরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য লোকদের ঘরে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ পর্যন্ত ঘরের লোকদের কাছ থেকে অনুমতি না পাবে ও ঘরের লোকদের প্রতি সালাম না পাঠাবে।'

৪৪. শাওকানী এ ধরনের আরো অনেকগুলো শব্দের তালিকা প্রদান করেছেন, যেমন- লি-আল্লা, মিন-আজলি, লা'আল্লাহু কাজা, বি-সাবাব কাফহা, ইত্যাদি। এদের সবই কারণ ব্যাখ্যার ধারণার সাথে সংশ্লিষ্ট (ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২১১)।

৪৫. ইমাম মালিক কিয়াসের মাধ্যমে স্ত্রীর সাথে খারাপ আচরণকারী স্বামীর ক্ষেত্রে ওই একই দণ্ড প্রয়োজন বলে মনে করেন। প্রথমে তাকে তিরস্কার করা হবে, এরপরও যদি সে ওই ধরনের আচরণ করা অব্যাহত রাখে তা হলে তাকে অবশ্যই তার ভরণ-পোষণের ব্যয় বহন করতে হবে কিন্তু স্ত্রীর তার বাধ্যগত থাকার দরকার হবে না। সবশেষে তাকে শারীরিকভাবে শাস্তি দেয়া যেতে পারে, দেখুন, আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ১৯৩।

৪৬. উদাহরণ হিসেবে হায়েজকালে স্ত্রীর সাথে কোনো ব্যক্তির দাম্পত্য সম্পর্কের বিষয়ে দেখুন, (সুরা বাকারা ২ : ২২২), ওই সময়ে এ সম্পর্ক এড়িয়ে চলতে হবে। আয়াত থেকে আভাস পাওয়া গেছে যে এখানে এ বিধানের ইল্লত হচ্ছে হায়েজ। আল শাওকানী কুরআন-সুন্নাহ্‌র উদাহরণ দিয়ে এর তালিল-এর বিষয়গুলোর বিস্তারিত তালিকা প্রদান করেছেন (ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২১২-২১৩)।

www.pathagar.com

৪৭. আবু দাউদ, সুনান , ৩, ১০১৮, হাদিস নম্বর ৩৫৮২; গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ২, ৭৫; শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২১০, ২১২।

৪৮. শা'বান, উসুল পৃষ্ঠা ১৫১।

৪৯. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৬৭-৬৮।

৫০. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২১০।

৫১. নবোবী, মিনহাজ (হাওয়ার্ড অনূদিত), পৃষ্ঠা ২৮৪।

৫২. গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ২, ৫৪; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ১৯৪; খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৭৮।

৫৩. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২২১-২২; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ১৯৪।

৫৪. গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ২, ৫৫; খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৭৭।

৫৫. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ১৯৫; খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৭৮। অন্যান্য উদাহরণ দেখতে দেখুন, শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২২২।

৫৬. মুসলিম, সহিহ মুসলিম, পৃষ্ঠা ৪১, হাদিস নম্বর ১১৯; ইবনে হাজম, ইহকাম, ৭, ৫৪-৫৫; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ১৯৫-৯৬; যুহাইর, ৪, ৪৪।

৫৭. একই গ্রন্থ।

৫৮. যুহাইর, ৪, ৪৪-৪৫; নূর,'কিয়াস', ২৪-৪৫।

৫৯. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২২২; ইবনে কাইয়িম, ইলাম, ১, ১৭৮; যুহাইর, উসুল, ৪, ৪৫-৬০।

৬০. একই গ্রন্থ।

৬১. ইবনে কাইয়িম, ইলাম, ১, ১৯৭; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ১৭৫; খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৫৪।

৬২. গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ২,৬৪; শাতিবী, মাওয়াফাকাত; ৩,২১৭; ইবনে কাইয়িম, ইলাম, ১, ১৯৮।

৬৩. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ১৭৬।

৬৪. আবু দাউদ, সুনান (হাসান অনূদিত), ৩, ১০৯, হাদিস নম্বর ১০৩৮; খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৫৬।

৬৫. গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ২, ৬৪; শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২১২; ইবনে কাইয়িম, ইলাম, ১, ২০০।

৬৬. ইবনে হাজম, ইহকাম, ৭, ১০০; ইবনে কাইয়িম, ইলাম, ১, ২০০; খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৫৭।

৬৭. ইবনে হাজম, ইহকাম, ৭, ১৪৭; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ১৭৭।

৬৮. ইবনে হাজম, ইহকাম, ৭, ১৬০; ইবনে কাইয়িম, ইলাম, ১, ১৮২।

৬৯. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২২৩; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ১৭৭।

৭০. ইবাহার বৈধতা প্রদান কুরআনের দু'টি আয়াত নিম্নে উদ্ধৃত হলো : 'একমাত্র তিনিই তোমাদের জন্য পৃথিবীর সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করেছেন' (আল বাকারা, ২ : ২৯) এবং

www.pathagar.com

'হে ইমানদার লোকেরা যে পাক জিনিসগুলো আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন তোমরা সেগুলো হারাম করে নিওনা' (আল মায়েদা, ৫ : ৮৭)।

৭১. ইবনে হাজম, ইহকাম, ৮, ৩।

৭২. একই গ্রন্থ, ৮, ১৮।

৭৩. একই গ্রন্থ, ৮, ৯।

৭৪. একই গ্রন্থ।

৭৫. একই গ্রন্থ, ৮, ১৫।

৭৬. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ১৭৯-৮০।

৭৭. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৭৯।

৭৮. Mutahhari, Jurisprudence, পৃষ্ঠা ২১।

৭৯. আরো বিস্তারিত জানতে দেখুন, আসগারী, কিয়াস, পৃষ্ঠা ১১৯, ১৩৯।

৮০. যুহাইর, উসুল, ৪, ৫১; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ২০৫।

৮১. নিম্নের হাদিসখানা আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন (সুনান, ৩, ১২২৯, হাদিস নম্বর ৪৩৯৫) : 'যে কবর তছনছ করবে তার হাত কেটে দিতে হবে কারণ সে একজন মুর্দার ঘরে প্রবেশ করেছে।'

৮২. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২২২।

৮৩. তাবরিজী, মিশকাত, ২, ১০৬১, হাদিস নম্বর ৩৫৭০; আবু ইউসুফ, কিতাব আল খারায, পৃষ্ঠা ১৫২; ইবনে কাইয়িম, ইলাম, ১, ২০৯।

৮৪. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ২০৫।

৮৫. যুহাইর, উসুল, ৪, ৫১।

৮৬. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ২০৬।

৮৭. একই গ্রন্থ ,২০০।

৮৮. একই গ্রন্থ, ২০১-২০২।

৮৯. একই গ্রন্থ, ২০৩।

৯০. বোখারি, সহিহ, (ইস্তাম্বুল সংস্করণ), ১, ৫১ (কিতাব আল ওজু, হাদিস নম্বর ৩৪); খিন, আসার, পৃষ্ঠা ৪০৩।

৯১. বসরী, মুতামাদ, ২, ১৬২-৬৪।

৯২. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ২০৪।

৯৩. ইবনে হাজম, ইহকাম, ৮, ৭৯; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ২০৫।

৯৪. আবু দাউদ, সুনান (হাসান অনূদিত), ২, ৯৫৫, হাদিস নম্বর ৩৩৫৫; ইবনে হাজম, ইহকাম, ৮, ১০৬; যুহাইর, উসুল, ৪, ৫০-৫৮; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ২০৫।

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়

ইসলামি শরিয়াহ্ পূর্ব অবতীর্ণ আইন

আল্লাহ তায়ালার তরফ থেকে অবতীর্ণ সব আইনই নীতিগতভাবে এক ও উৎস অভিন্ন অর্থাৎ এগুলো সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে এসেছে। এ কারণে এতে একটি মৌলিক বাণী রয়েছে, যা এসব বিধানের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই একই রকম। খোদার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সব ধর্মের উদ্দেশ্য ও সার কথা হলো, আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন এবং মানব আচার-আচরণ, নৈতিকতা ও ন্যায়বিচারের মূল্যবোধগুলো নিয়ন্ত্রণে খোদায়ী কর্তৃত্ব ও নির্দেশনা মেনে চলা প্রয়োজন। এ অত্যাবশ্যকীয় ঐক্যের বিষয়টি পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে, রসুল সা.কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে : 'তিনি তোমাদের দীনের সেই নিয়ম-বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যার হুকুম তিনি নুহকে দিয়েছিলেন। আর যা (হে মুহাম্মদ) এখন তোমার প্রতি আমরা ওহির মাধমে পাঠিয়েছি। আর যার হেদায়াত আমরা ইব্রাহীম, মুসা ও ঈসাকে দিয়েছিলাম–এ তাকিদ সহকারে যে কায়েম কর এ দীনকে এবং এতে কোনো মতবিরোধ কর না' (সুরা আল শুরা, ৪২ : ১৩)। আল কুরআন আরো সুনির্দিষ্টভাবে তাওরাতের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে একে অনুপ্রেরণা ও নির্দেশনা হিসেবে এর কর্তৃত্ব নিশ্চিত করেছে : 'আমরা তাওরাত নাজিল করেছি যাতে হেদায়াত ও আলো বর্তমান ছিল। সব নবি যারা ছিল মুসলিম–তদানুযায়ী এ ইয়াহুদি মত অবলম্বনকারীদের যাবতীয় ব্যাপারে ফায়সালা করত' (সুরা মায়েদা, ৫ : ৩৮)। তাই একজন রসুল হিসেবে মুহাম্মদ সা. তাওরাতে প্রাপ্ত হেদায়াত বা নির্দেশনা মেনে চলতে বাধ্য। খোদার তরফ থেকে অবতীর্ণ আইনের মৌলিক ঐক্যের বিষয়টি কুরআনের আয়াতে আবারও নিশ্চিত করা হয়েছে। এ আয়াতে পূর্ববর্তী নবিদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ইসলামের নবিকে তাদের হেদায়াত অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে : 'তারাই আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াত প্রাপ্ত ছিল, তাদের পথে (হেদায়াত) তুমি চল' (সুরা আল আনআম, ৬ : ৯০)। এসব আয়াত ও কুরআনের অন্যান্য ঘোষণার ভিত্তিতে আলেমগণের সর্বসম্মত মত হলো, খোদার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সব ধর্মই হচ্ছে মৌলিক ঐক্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ।[১] অবশ্য এর অর্থ এটি বুঝাচ্ছে না যে, তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যেহেতু অবতীর্ণ দীনের প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোকদের কাছে বিভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ হয়েছিল তাই তাদের প্রতেকের পৃথক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা পরস্পরকে পরস্পরের থেকে পৃথক করেছে। এর উদাহরণ হলো, হালাল-হারামের ব্যাপারে বিভিন্ন ধর্মের বিধান অভিন্ন নয়। অনুরূপভাবে ধর্মের মূলকথা এক হলেও

www.pathagar.com

ইবাদত-বন্দেগী ও ধর্মীয় উপাসনার মধ্যে তারতম্য রয়েছে। ইসলামি শরিয়তে পূর্ববর্তী অনেক আইন বহাল রাখা হয়েছে এবং অন্যগুলোকে রহিত বা বাতিল করা হয়েছে। এর উদাহরণ হলো, তাওরাতে বর্ণিত খুনের বদলা (কিসাস) ও অন্য কয়েকটি হাদ শাস্তি যা কুরআনের বিধানেও বহাল রাখা হয়েছে।[২]

এখানে অবশ্য সাধারণ নিয়মের কথা বর্ণনা হচ্ছে, যা নীতিগতভাবে বৈধতা থাকা সত্ত্বেও ইসলামের আগমনের পূর্বে অবতীর্ণ বিধিবিধানগুলো মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। এরূপ হওয়ার বিশেষ কারণ হলো, শরিয়াহর বাস্তব বিধিবিধানগুলো অর্থাৎ আহকামের ক্ষেত্রে ইসলামি শরিয়ত স্বয়ংসম্পূর্ণ। ফকিহগণ খোদ ইসলামি শরিয়ত ব্যতিরেকে অন্য কোনো সূত্র থেকে পূর্ববর্তী ধর্মগুলোর আইন গ্রহণ না করার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। মুসলমানদের জন্য অন্যান্য ধর্মের বিধিবিধান পালন বাধ্যতামূলক হবে না। অন্য কথায় বলা যায় যে মুসলমানদের জন্য সব আইনের একান্ত উৎস হচ্ছে শরিয়ত।

এ বিষয়ে দলিল বা সাক্ষ্য প্রমাণের সাদৃশ্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কারণে মূলনীতির প্রকৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে : শরিয়তে সুনির্দিষ্টভাবে রহিত না করা পর্যন্ত ইসলামি শরিয়তপূর্ব আইনগুলো বৈধ থাকবে কি না, অথবা সুনির্দিষ্টভাবে বহাল রাখা না হলে তা মূলত বাতিল বলে গণ্য হবে কি না। এসব প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলা হয় যে, পূর্ববর্তী কিতাবে যেসব আইন প্রবর্তন করা হয়েছিল কিন্তু শরিয়তে তা সুনির্দিষ্টভাবে সমুন্নত করা হয়নি এবং কুরআন সুন্নাহ্তে সে ব্যাপারে কোনো নির্দেশনা নেই, সে ক্ষেত্রে সাধারণ মতৈক্য অনুযায়ী তা মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য হবে না।[৩]

আবারো প্রশ্ন উঠছে যে উপরিউক্ত বক্তব্য কী কুরআনের উদ্ধৃত ঘোষণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? এর সাধারণ উত্তর হলো, ইসলামের নবি কেবলমাত্র ইমানের মূল বিষয় অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও একত্ববাদের মতো বিষয়ে পূর্ববর্তী অবতীর্ণ বিধানকে হিদায়েতের উৎস হিসেবে গ্রহণের জন্য তার উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন। উপরে উদ্ধৃত দ্বিতীয় আয়াতে 'হুদা' বা 'নির্দেশনা' শব্দটি এবং তৃতীয় আয়াতে 'হুদহিমা' বা 'তাদের পথ' শব্দটি কেবলমাত্র তাওহিদ বা একত্ববাদে বিশ্বাস বুঝাচ্ছে, যা নিঃসন্দেহে ইসলামি শরিয়াহরও মূলনীতি। তাদের কিছু কিছু আইন রহিত করা সম্পর্কিত স্পষ্ট দলিল থাকার কারণে তাদের হিদায়াত হুবহু সমুন্নত করা সম্ভব নয়। তাই এ ক্ষেত্রে বলা যায়, ইসলাম ও পূর্ববর্তী ধর্মগুলোর মধ্যকার অভিন্ন হেদায়াতের বিষয় এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন- তাওহিদ। উপরে উদ্ধৃত দ্বিতীয় আয়াতে উল্লিখিত 'নবিগণ' বলতে সুনির্দিষ্ট বুঝানো হয়েছে, ওই আয়াতে বলা হয়েছে, 'বনী ইসরাইলের নবিগণ' এবং পবিত্র নবি মুহাম্মদ সা. তাদের অন্তর্ভুক্ত নন।[৪]

www.pathagar.com

অনেক ঘটনায় কুরআনে সুনির্দিষ্ট বিষয়ে পূর্বে অবতীর্ণ বিধানের উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু যে পদ্ধতিতে এসব প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে তা একই রকম নয়। কুরআনে নিম্নের তিন প্রকারে এ ধরনের আইন পরোক্ষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে :

১. কুরআনে (অথবা সুন্নাহ্য়) পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের বিধানের উল্লেখ থাকতে পারে এবং একই সাথে তাকে মুসলমানদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হতে পারে, সবক্ষেত্রে ওই বিধান সন্দেহাতীতভাবে সমুন্নত রাখা হয়েছে তাই তা ইসলামি শরিয়াহরও অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। এর একটি উদাহরণ হলো, 'তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর করা হয়েছিল' (সুরা বাকারা ২ : ১৮৩)। সুন্নাহ্ থেকেও অনুরূপ উদাহরণ দেয়া যেতে পারে যাতে পূর্ববর্তী ধর্মের বিধানকে সমর্থন করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আমরা পশু কোরবানি করা জায়েজ হওয়া সংক্রান্ত একটি হাদিস উল্লেখ করতে পারি। তাতে মুমিনদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে :

ضحوا فأنه سنة أبيكم ابراهم عليه السلام

'কুরবানি কর, তা হলো তোমাদের পিতা ইব্রাহীম আ. এর সুন্নত'।[৫]

২. কুরআন অথবা সুন্নাহ্তে পূর্ববর্তী ধর্মের বিধানের উল্লেখ থাকতে পারে কিন্তু একই সময়ে তা রহিত ও বাতিল করা হয়, সে ক্ষেত্রে আলোচ্য বিধান পরিত্যক্ত ও বাতিল হয়ে যাবে। কুরআন থেকে এর উদাহরণ দেয়া যেতে পারে, যাতে ইহুদিদের কয়েক প্রকার খাদ্য গ্রহণ হারাম করা হয়। আয়াতটিতে এ কথা এভাবে বলা হয়েছে : 'আর যারা ইহুদিবাদ অবলম্বন করেছে তাদের জন্য নখরধারী প্রাণী হারাম করেছিলাম এবং গরু ও ছাগলের চর্বিও... বল, মৃত জন্তু, বহমান রক্ত ও শূকরের মাংস ছাড়া কিছুই হারাম নয়' (সুরা আন'আম ৬ : ১৮৬)। এ আয়াতের দ্বিতীয় অংশে ইহুদিদের জন্য যা খাওয়া হারাম করা হয়েছিল মুসলমানদের জন্য স্পষ্টত তা হালাল করা হয়েছে। সুন্নাহ্তে অনুরূপ উদাহরণ দেখতে পওয়া যায়। যুদ্ধলব্ধ মাল বা গণিমতের মাল বৈধ হওয়া সংক্রান্ত একটি হাদিসে রসুল সা. ঘোষণা করেছে-

أحلت لي الغناءم ولم تحلل لأحد من قبلي

আমার জন্য গণিমতের মাল গ্রহণ জায়েজ করা হয়েছে কিন্তু পূর্বে কারোর জন্য তা জায়েজ ছিল না।[৬] অনুরূপভাবে তাওরাতের বিধানে গুনাহের জন্য কাফ্ফারা গ্রহণযোগ্য ছিল না এবং যখন পোশাকের কোনো অংশ অপরিষ্কার হতো তখন ইহুদিদের বিধান মতে তা কেটে ফেলতে হতো। কিন্তু ইসলামি শরিয়াহর বিধানে এ বিধিনিষেধ তুলে

www.pathagar.com

নেওয়া হয়েছে এবং কেবলমাত্র পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে ময়লা সাফ করা যেতে পারে।[৭]

৩. কুরআন বা সুন্নাহ্তে অতীতের ধর্মের কোনো বিধান পরিত্যক্ত অথবা বহাল রাখা হলো কি না তা পরিষ্কারভাবে জানানো ছাড়াই উল্লেখ করা হতে পারে। উপরের দুই প্রকারের ঘটনার ব্যাপারে ফকিহগণের মধ্যে তেমন একটা মতপার্থক্য না থাকলেও এ তৃতীয় প্রকারের ব্যাপারে তাদের মধ্যে ব্যাপক মতপার্থক্য রয়েছে। এর একটি উদাহরণ হলো, খুনের বদলা গ্রহণের আইন। তাওরাতেও এ বিধান কার্যকর করা হয়েছিল : 'আমি তাদের জন্য এ বিধান লিখে দিয়েছিলাম যে জানের বদলে জান, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং সব ধরনের যখমের বদলে সমপর্যায়ের বদলা' (সুরা মায়েদা, ৫ : ৪৫)। এখানে এ একই আইন মুসলমানদের পালন করতে হবে কি না তা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। কুরআনের একই সুরার আরেকটি আয়াতে খুনের ভয়াবহতা তুলে ধরে বলা হয়েছে : 'আমি বনী ইসরাইলের জন্য এ ফরমান লিখে দিয়েছিলাম যে নরহত্যা অথবা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করা ছাড়া অন্য কোনো কারণে যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করল সে যেন দুনিয়ার সব মানুষকে হত্যা করল' (সুরা মায়েদা, ৫ : ৩২)। এ আয়াতে পুনরায় পূর্ববর্তী ধর্মের আইনের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু তা ইসলামি শরিয়াহর অংশ গঠন করেছে কি না তা স্পষ্ট করে বলা হয়নি।

হানাফী, মালেকী ও হাম্বলী মাজহাবের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এবং শাফেয়ী ফকিহগণের কারো কারো মতে, উপরিউক্ত বিধানগুলো ইসলামি শরিয়াহর অংশ এবং কুরআনে এর উল্লেখ রয়েছে, নিছক এটুকুই খুনের বদলা গ্রহণের বিধান মুসলমানদের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক হওয়ার জন্য যথেষ্ট। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের তাওরাতের আইন সম্পর্কে অবহিত করেছেন এবং ইসলামি শরিয়তে বিষয়টি রহিত করা হয়নি অথবা তা থেকে সরে যাওয়ার ঘোষণা দেয়া হয়নি। এ হচ্ছে আল্লাহর আইন তিনি যে সম্পর্কে আমাদের বলেছেন, সেহেতু তার এ কথা মেনে চলতে হবে। এ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে হানাফীগণ একজন অমুসলিমকে (যেমন- জিম্মি) হত্যার জন্য মুসলমানকে মৃত্যুদণ্ড দান এবং কোনো নারীকে হত্যার জন্য পুরুষের মৃত্যুদণ্ড প্রদানকে বৈধ বলে অনুমোদন করেছেন কারণ এগুলো 'জানের বদলে জান' বিধানের আওতায় পড়ে।[৮] এ বিষয়ে অবশ্য কিছু ভিন্নমত রয়েছে। এমনকি এ বিষয়ে হানাফীদের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণকারীরাও একই মূলনীতি প্রশ্নে একমত, যা কুরআনের অন্যত্র উচ্চারিত হয়েছে। এ বিষয়ে বিশেষ করে দুইটি আয়াত রয়েছে যার একটিতে বলা হয়েছে : 'এবং মন্দের প্রতিফল সেই রকম মন্দই' (সুরা আশ শুরা, ৪২ : ৪০)। এবং অন্য আয়াতে বলা হয়েছে : 'যে ব্যক্তি

www.pathagar.com

তোমার ওপর হস্তক্ষেপ করবে তুমিও তার ওপর ঠিক তেমনিভাবে হস্তক্ষেপ করো, তবে আল্লাহকে ভয় করতে থাক' (সুরা বাকারা, ২ : ১৯৬)। তাই এ উপসংহারে পৌঁছানো যায় যে, পূর্বে অবতীর্ণ বিধানের উল্লেখ ছাড়াই এসব আয়াতের দলিল বদলা গ্রহণ আইনের সমর্থনের জন্য যথেষ্ট।

শাফেয়ীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, আশারি ও মুতাজিলারা এ মত পোষণ করেন যে যেহেতু ইসলাম পূর্ববর্তী আইনগুলো রহিত করেছে সেহেতু তা আর মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, তাই এসব আইন যদি সুনির্দিষ্টভাবে বৈধ ও নিশ্চিত করা না হয় তা হলে তা ইসলামি শরিয়াহর অংশ গঠন করবে না। তারা মনে করেন যে পূর্ববর্তী ধর্মের আইন সম্পর্কে শরিয়াহর নিয়ম হচ্ছে, বিশিষ্টতা (খুসুস), এর অর্থ হলো– যখন তা সুনির্দিষ্টভাবে বহাল করা হবে কেবল তখনই তা অনুসরণ করা হবে। অন্যদিকে শরিয়াহর বিষয়ে নিয়ম হলো, খোদ শরিয়ত হলো 'সাধারণ বিষয়' ('উমুম) অর্থাৎ এটি সাধারণভাবে প্রযোজ্য হয়, সে ক্ষেত্রে অতীতের সব কিতাব রহিত হয়ে গেছে।[৯] অতীতের কিতাবগুলো আমাদের কাছে যথাযথভাবে পরিবেশন করা হয়নি এবং এতে উল্লিখিত অনেক বিচ্যুতি ঘটেছে, এ কারণে এ বিধিনিষেধ আরোপ করা প্রয়োজন।[১০] এ মতের সমর্থকরা তাদের মতের সপক্ষে কুরআনের একটি আয়াত উদ্ধৃত করে থাকেন যাতে বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে : 'তোমাদের প্রত্যেকের জন্য একটি শরিয়ত ও একটি কর্মপদ্ধতি নির্বাচন করে রেখেছি' (সুরা মায়েদা, ৫ : ৪৮)। এখানে এ কথা বলা হয়েছে যে প্রত্যেক জাতির জন্য নিজস্ব একটি শরিয়ত রয়েছে, তাই ইসলাম পূর্ব অবতীর্ণ আইনগুলো মুসলিম উম্মতের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. বর্ণিত একটি হাদিসে এ ব্যাপারে আরো প্রমাণ পাওয়া যায়। এ হাদিসে শরিয়াহর মাত্র তিনটি উৎসের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।[১১] বস্তুতপক্ষে এ হাদিসে পূর্বে অবতীর্ণ আইনের কোনো উল্লেখ নেই, এতে এ কথাই বুঝানো হচ্ছে যে, এগুলো ইসলামের অনুসারীদের জন্য আইনের কোনো উৎস নয়। এ শেষ বিষয়টি নিয়েও অবশ্য বিতর্ক রয়েছে, মুয়াজ রা. কুরআনের কথা উল্লেখ করেছেন, আর এটি উল্লেখই যথেষ্ট। কারণ পবিত্র কুরআনেই তো অসংখ্যবার পূর্ববর্তী কিতাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উপরন্তু বিশেষ বিষয়ের ব্যাপারে খোদায়ী বিধান অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে রসুল সা. তাওরাত ও ইনজিলের আশ্রয় অবলম্বন করেননি বরং ওই বিষয়ে ওহি নাজিলের আশায় তা স্থগিত রাখতেন। এতে বুঝা যায় যে রসুল সা. তার উম্মতের জন্য পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর বিধানকে বাধ্যতামূলক বলে গণ্য করেননি।[১২]

এ ব্যাপারে সঠিক মত হলো, ইসলামি শরিয়ত কেবলমাত্র সেই সব বিধিবিধান রহিত করেছে, যা তার শিক্ষার বিরোধী, এটি হলো সংখ্যাগরিষ্ঠের মত।

www.pathagar.com

সার্বিকভাবে কুরআন তাওরাত ও ইনজিলের সত্যতা প্রতিপালন করেছে এবং রহিতকরণ ছাড়াই যখন পূর্ববর্তী কিতাবের উদ্ধৃত করা হয়েছে তখন তা ইসলামি শরিয়াহর অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে।[১৩] আবু জাহরাহর বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে এ কথা বলা যায় যে, পূর্বে অবতীর্ণ আইনের কর্তৃত্বের ব্যাপারে ফকিহদের মধ্যে নিছক মতপার্থক্য বিদ্যমান থাকা ছাড়া বাস্তবে ইসলামি শরিয়তে এর কোনো গুরুত্ব নেই। কারণ ইসলামি শরিয়ত স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং এর আইনগুলো স্পষ্টভাবে চিহ্নিত। এর উদাহরণ হিসেবে কিসাস সম্পর্কে বলা যায়, এ বিষয়ে কুরআনের আয়াতের সুনির্দিষ্ট অর্থ সম্পর্কে ফকিহগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে, তৎসত্ত্বেও সুন্নাহ্তে বিষয়টি চিরতরে নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। সুন্নাহ্তে কিসাসের বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে এবং তা যে ইসলামি শরিয়াহর অবিচ্ছেদ্য অংশ সে ব্যাপারে সন্দেহের কোনোই অবকাশ নেই।[১৪]

টিকা

১. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ২৪১; কাশিম, উসুল, পৃষ্ঠা ১৭৩।

২. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ২৪২; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ২৩৭।

৩. বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ২৩৪; ইসমাঈল, আদিল্লাহ, পৃষ্ঠা ৩২০।

৪. গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ১, ১৩৪; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ২৪২; ইসমাঈল, আদিল্লাহ, পৃষ্ঠা ৩২৫।

৫. তাবরিজী, মিশকাত, ১, ৪৬৬, হাদিস নম্বর, ১৪৭৬; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ২৩৫।

৬. মুসলিম, সহিহ, পৃষ্ঠা ৩০১, হাদিস নম্বর ১১৩৭; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ২৩৪।

৭. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৯৩; ইসমাঈল, আদিল্লাহ, পৃষ্ঠা ৩২০।

৮. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৯৪; শালতুত, আল ইসলাম, পৃষ্ঠা ৪৮৯; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ২৩৫।

৯. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২৪০; শালতুত, আল ইসলাম, পৃষ্ঠা ৪৮৯ ; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ২৩৬।

১০. আব্দুর ওহিম, Jurisprudence, পৃষ্ঠা ৭০।

১১. আবু দাউদ, সুনান, (হাসান অনূদিত), ৩, ১০১৯, হাদিস নম্বর, ৩৫৮৫।

১২. গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ১, ১৩৪। এ প্রসঙ্গে উল্লিখিত একমাত্র ব্যতিক্রম হলো রসুল সা. ব্যাভিচারির জন্য ইহুদিদের পাথর মারার তাওরাতের বিধানের কথা উল্লেখ করেছেন। গাজ্জালী এর ব্যাখ্যায় বলেন, পাথর নিক্ষেপ (রাজম) তাদের ধর্মের বিরোধী নয় এ কথা বুঝাতে কেবল রসুল সা. এটি করেন, তাওরাত আইনের উৎস বুঝাতে নয়।

১৩. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৯৪।

১৪. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ২৪২।

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়

সাহাবিদের রা. ফতোয়া

সুন্নিহ আলেমগণ একমত হয়েছেন যে রসুল সা.-এর সাহাবিগণের রা. সর্বসম্মত মত (ইজমা) হচ্ছে একটি বাধ্যতামূলক দলিল, যা ইজমার সবচেয়ে কর্তৃত্বশীল রূপ প্রকাশ করে। প্রশ্ন হচ্ছে, মাত্র একজন সাহাবির রা. কথা বা ফতোয়াকে কি দলিল হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হবে এবং কিয়াস ও অন্য মুজতাহিদদের ফতোয়ার মতো দলিলের ওপর অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে? বিভিন্ন মাজহাবের শীর্ষস্থানীয় অনেক ফকিহ এ ব্যাপারে হাঁ-সূচক জবাব দিয়েছেন। তাদের মত হলো যে সাহাবিগণের মত একটি প্রমাণ (হুজ্জাহ) যা অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। তাদের যুক্তি হচ্ছে, রসুল সা.-এর ওফাতের পর মুসলিম সমাজের দায়িত্ব সাহাবিদের কাঁধে এসে পড়ে এবং বহু সুবিজ্ঞ সাহাবি রা. কুরআন ও রসুল সা.-এর শিক্ষা সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের আলোকে ফতোয়া দিতে সক্ষম ছিলেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে তারা তাদের সিদ্ধান্ত প্রদান করেছিলেন। সাহাবিগণ রসুল সা.-এর জীবদ্দশায় সরাসরি তার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেন এবং কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময়কার পরিবেশ-পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট বা আসবাব আল নুজুল সম্পর্কে সুপরিচিত ছিলেন, যা তাদের সে সময়ের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে ইজতিহাদ গঠন ও ফতোয়া প্রদানে এক অনন্য মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। অনেক আলেম ও হাদিস বিশারদ সাহাবিগণের রা. ফতোয়াকে এমনকি রসুল সা.-এর সুন্নাহর সমার্থক বলে তুলনা করেছেন। সুবিজ্ঞ সাহাবিগণ-বিশেষ করে চার খলিফা ফিকহর বিস্তারিত বিধিবিধান নির্ণয়ে অবদান ও প্রভাবের জন্য এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছেন। তারা যে পরিস্থিতি ও সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন তা নিরসনে তাদের গৃহীত ব্যবস্থা থেকে এসব বিধিবিধান পাওয়া গেছে।[১] অনেক সময় সহাবীদের রা. অভিমতকে সমুন্নত ও সমর্থন করে কুরআনের আয়াত নাজিলের ঘটনার দ্বারা এ বিষয়টিকে প্রত্যয়ন করা হয়েছে। এ বিষয়ে কুরআনের আয়াত উল্লেখ করা যেতে পারে। বদর যুদ্ধের পর যুদ্ধবন্দীদের সাথে কী ধরনের আচরণ করতে হবে সে বিষয়ে এ আয়াত নাজিল হয়। এ বিষয়ে ওমর ইবনে খাত্তাব রা. যে অভিমত ব্যক্ত করেন, এ আয়াতে (সুরা আনফাল, ৮ : ৬৭) তাকে সমর্থন করা হয়েছে বলে জানা গেছে।[২] তৎসত্ত্বেও প্রশ্ন উঠেছে, সাহাবিগণের ফতোয়াকে কী শরিয়াহর একটি দলিল বা নিছক ইজতিহাদ হিসেবে গণ্য করা হবে, যা পরবর্তী যুগের মুজতাহিদ ও সার্বিকভাবে মুসলিম উম্মাহ গ্রহণ করতে পারে অথবা নাও করতে পারে? এ প্রশ্নের একই ধরনের জবাব পাওয়া যায়নি। তবে এ ব্যাপারে আলেমগণের ভিন্ন ভিন্ন জবাব নিয়ে আলোচনা করার

www.pathagar.com

আগেই প্রকৃতপক্ষে কে সাহাবি তা নির্ণয় করা আমাদের জন্য সহায়ক বলে বিবেচিত হবে।

আলেমদের অধিকাংশের (*জুমহুর*) মত হচ্ছে, রসুল সা.-এর ওপর ইমান এনে যেই তার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এমনকি এক মুহূর্তের জন্য হলেও এবং ইমানদার হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছেন সেই-ই সাহাবি, তিনি রসুলের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করুন বা না করুন তাতে কিছু যায় আসে না। অন্যদের মত হলো, 'সাহাবি' শব্দটি 'সুহবাব' থেকে এসেছে, এর অর্থ 'সাহচার্য' যা রসুল সা.-এর সংসর্গে থাকা এবং তার কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করার অর্থ প্রকাশ করে। এ থেকে এ কথা বলা যায় যে, কোনো ব্যক্তির সাহাবির পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার জন্য এসব বৈশিষ্ট্যের একটি বা অন্যগুলো, যেমন– দীর্ঘকাল রসুল সা.-এর সাথে থাকা অথবা ঘন ঘন হাদিস বর্ণনা করার শর্ত অবশ্যই পূরণ করতে হবে।[৩] কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ সাহাবির পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার জন্য রসুলের সঙ্গে দীর্ঘকাল অবস্থান নির্ণয়ের জন্য প্রচলিত প্রথার (উরফ) উল্লেখ করেছেন। কতিপয় ভিন্ন মত এসব বৈশিষ্ট্যকে নাকচ করে দিয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তিকে সাহাবি হতে হলে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অর্থাৎ এক থেকে দুই বছর রসুল সা.-এর সাথে সাহচার্যে অবস্থান করতে হবে অথবা রসুল সা.-এর সাথে অন্তত একটি যুদ্ধে অংশ নিতে হবে।[৪] তৎসত্ত্বেও 'সাহাবি' শব্দের আক্ষরিক অর্থের দিক থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতই অগ্রাধিকার পেয়েছে, অর্থাৎ রসুল সা.-এর সাহচার্যে অব্যাহতভাবে থাকা অথবা নির্দিষ্ট মেয়াদে থাকা এ ক্ষেত্রে কোনো শর্ত নয়। কতিপয় আলেম মনে করেন যে, রসুল সা.-এর সাথে কোনো ব্যক্তির সাক্ষাতের সময় তাকে অবশ্যই সাবালক হতে হবে, কিন্তু এ মতও অত্যন্ত দুর্বল, এতে অনেকে বাদ পড়ে যেতে পারেন কারণ যারা রসুলের সা. সাথে সাক্ষাৎ ও হাদিস বর্ণনা করেন তাদের মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন যারা রসুল সা.-এর ওফাতের পরে সাবালক হয়েছিলেন। অনুরূপভাবে রসুলকে স্বচক্ষে দেখা কোনো শর্ত নয় কারণ সাহাবিদের মধ্যে ইবনে উম্মে মাকতুম রা.-এর মতো অনেকে অন্ধ ছিলেন কিন্তু তারপরও তাদের সাহাবি হিসেবে গণ্য করা হয়।

সাহাবি হওয়ার বিষয় অব্যাহত সাক্ষ্যের বা তাওয়াতুরের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, এটি হচ্ছে সবচেয়ে বিখ্যাত সাহাবিবর্গ যেমন- খোলাফায়ে রাশেদা ও তাদের মতো অন্যদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এমনকি সুখ্যাতির মাধ্যমেও সাহাবি হওয়ার বিষয় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, কিন্তু তা তাওয়াতুরের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে না। অনুরূপভাবে অন্য কোনো সুপরিচিত সাহাবির সমর্থনেও এ বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আল বাকিলানীসহ অনেক আলেমের মতে, সাহাবির নিজস্ব ঘোষণাকেও আমরা গ্রহণ করতে পারি, কারণ তাদের সবই সত্যনিষ্ঠ (উদুল) ছিলেন, যা তাদের

www.pathagar.com

ওপর মিথ্যা আরোপ করাকে নাকচ করে দিয়েছে। অবশ্য এ বিষয়ে ভিন্ন মত রয়েছে। এ ব্যাপারে অধিকতর পছন্দনীয় মত হচ্ছে যে, তার বক্তব্যকে যথার্থ প্রতিপন্ন করার সমর্থনে প্রমাণ পেশ করতে হবে, যা নিজ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দাবিকে সমুন্নত বা খণ্ডন করে দিতে পারে। মিথ্যা অভিযোগ রোধ এবং সাহাবিদের কাতারে স্বঘোষিত লোকদের শামিল হওয়ার পথ বন্ধ করতে এ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।[৫]

সাহাবির কথাকে কাউল আল সাহাবি এবং ফতোয়া আল সাহাবি হিসেবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। স্বাভাবিকভাবে এর অর্থ হচ্ছে– সাহাবির মত, যা তিনি ইজতিহাদের পন্থায় লাভ করেছেন। এটি কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমাতে অনুপস্থিত কোনো বিধানের ব্যাপারে সাহাবির সুচিন্তিত অভিমত (ফতোয়া) অথবা বিচারিক সিদ্ধান্ত হতে পারে। তবে উল্লেখিত উৎসসমূহে কোনো বিধান পাওয়া গেলে সাহাবির ফতোয়া ওই বিষয়ে কর্তৃত্বের বিবেচনায় প্রাধিকার পাবে না, সে ক্ষেত্রে বিষয়টি সূত্রে অবশ্যই স্বপ্রমাণিত হবে না। অন্যকথায় বলা যায় যে, ওই সম্পর্কে সাহাবি তার অভিমত প্রকাশ না করলে বিষয়টি অনুধাবন করা আমাদের জন্য কঠিন হতো।[৬] ফতোয়াটি যদি কুরআন ও সুন্নাহর সংগে সম্পর্কিত হয় তবে এটি এমন ক্ষেত্রে হতে হবে যা, অবশ্যই উক্ত উৎসে স্বপ্রমাণিত হবে না।

আগেই বলা হয়েছে, ফকিহগণ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, কোনো সাহাবির বক্তব্যকে অন্য সাহাবিরা বিরোধিতা না করলে তা হবে এমন দলিল, যা মেনে চলার দাবি রাখে। যেসব সমাধানের ব্যাপারে সাহাবিগণ একমত পোষণ করেছেন বলে জানা গেছে তা মেনে চলা বাধ্যতামূলক। এর উদাহরণ হলো, দাদীর ওয়ারেশি সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ লাভ, এ ব্যাপারে সাহাবিগণ ঐকমত্যে পৌঁছেছেন, তাই এটি একটি কর্তৃত্বপূর্ণ ইজমা। ব্যক্তিগত অভিমত (রাই) ও ইজতিহাদের ভিত্তিতে গঠিত বিধান এবং যেসব বিষয়ে সাহাবিদের নিজেদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে সেসব বিষয়ে অবশ্য আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।[৭]

উসুলের আলেমদের মধ্যে সাধারণ মতৈক্য রয়েছে যে একজন সাহাবির সিদ্ধান্ত অন্যের জন্য বাধ্যতামূলক নয়, সে সিদ্ধান্ত তাদের মধ্যকার একজন খলিফা, বিচারক অথবা নেতৃস্থানীয় কোনো মুজতাহিদ প্রদান করুন না কেন, তাতে কিছু যায় আসে না। এর কারণ ইজতিহাদের বিষয়ে সাহাবিদের পরস্পরের সাথে ভিন্নমত পোষণ করার অনুমতি ছিল। একজন সাহাবির সিদ্ধান্ত কি অন্যের জন্য দলিল ছিল না, তাদের মধ্যকার মতপার্থক্য কী সহ্য করা হতো না? আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন সাহাবির সিদ্ধান্ত তাদের উত্তরসূরি (তাবিউন) ও পরবর্তী জামানার

www.pathagar.com

মুজতাহিদদের জন্য দলিল হবে কি না সে ব্যাপারে উসুলের আলেমদের মতপার্থক্য রয়েছে।[৮] এ ব্যাপারে তিনটি মত রয়েছে, নিম্নে তার সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হলো :

১. একজন সাহাবি রা. ফতোয়া হচ্ছে একটি নিরঙ্কুশ প্রমাণ এবং তা কিয়াসের ওপর অগ্রাধিকার পাবে, তা আলোচ্য কিয়াসের সাথে একমত হোক বা না হোক। এটি হলো ইমাম মালিকের মত, ইমাম শাফেয়ীর দুইটি মতের একটি এবং ইমাম আহমদ ও কতিপয় হানাফী ফকিহর দুইটি মতের একটি। এ মতের সমর্থকেরা তাদের মতের সপক্ষে কুরআনের আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যাতে সাহাবিদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে : 'সেই সব মোহাজির ও আনসার যারা সর্বপ্রথম ইমানের দাওয়াত কবুল করার জন্য অগ্রসর হয়েছিল তারা ও যারা পরে ঐকান্তিক সততার সাথে তাদের পেছনে পেছনে এসেছিল আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি রাজি ও সন্তুষ্ট হলেন এবং তারা আল্লাহ তায়ালার প্রতি রাজি ও খুশি হলো (সুরা আত তাওবা, ৯ : ১০০)। এ আয়াতে তাদের প্রশংসা করা হয়েছে যারা সাহাবিগণের অনুসরণ করেছে। যারা সাহাবিদের অনুসরণ করেছে তদের যেভাবে প্রশংসা করা হয়েছে তাতে এ উপসংহারে উপনীত হওয়া যায় যে, প্রত্যেকের উচিত সাহাবিদের অনুসরণ করা। অন্য কথায় সাহাবিদের ফতোয়া হচ্ছে একটি দলিল। এ মতের সমর্থকরা আরেকটি আয়াতও উদ্ধৃত করে থাকেন, তাতে সাহাবিদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে : 'এখন দুনিয়ার সর্বোত্তম দল তোমরা যাদেরকে মানুষের হেদায়াত সংস্কার বিধানের জন্য কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত করা হয়েছে। তোমরা সৎ পথের আদেশ কর এবং অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোকদের বিরত রাখ' (সুরা আল ইমরান, ৩ : ১০৯)। রসুল সা.-এর নেতৃত্বে ইসলাম প্রচারে প্রচেষ্টার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল আমর বিল মারুফ (সৎকাজের আদেশ প্রদান), এতে সাহাবিগণ সক্রিয় ও একনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং তারা তা অনুসরণ করেন। কুরআন তাদেরকে 'সর্বোত্তম সমাজ' হিসেবে প্রশংসা করেছে এবং সে কারণে তারা দৃষ্টান্ত, কর্তৃত্ব ও সম্মানের অধিকারী।[৯]

অবশ্য সাহাবিদের ব্যাপারে কুরআনের সব উদ্ধৃতিই বহুবচনে এসেছে, এ কারণে এমতও প্রকাশ করা হয়েছে যে, তাদের ব্যক্তিগত মত কোনো ক্রমেই প্রমাণ বা দলিল হিসাবে সাব্যস্ত হয় না। কিন্তু এর জবাবে যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, শরিয়তে ব্যক্তিগতভাবেই তাদের সততা (আদালাহ) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং যারা ব্যক্তি ও দলগত উভয় ক্ষেত্রে তাদের মত ও বিচার-ফায়সালাকে ভালো কাজ হিসেবে অনুসরণ করেছে কুরআনে তাদের প্রশংসা করা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে যে, যারা সাহাবিদের অনুসরণ করেছে তাদের প্রশংসা করা হয়েছে এ কারণে যে, তারা সাহাবিদের ব্যক্তিগত অভিমত অনুসরণ করেছে- তারা কুরআন সুন্নাহ অনুসরণ

www.pathagar.com

করেছিল এ জন্য নয়। এটি যদি কারণ হতো তাহলে কুরআনের এ প্রশংসার কোনো তাৎপর্য থাকতো না, কারণ কুরআন সুন্নাহ অনুসরণ করে এমন প্রত্যেকের জন্য, সে সাহাবি হোক বা না হোক, তা প্রযোজ্য হতো। অন্যকথায় যারা সাহাবিদের অনুসরণ করে তাদের প্রশংসা করার কোনো কারণ থাকলে তা হচ্ছে সাহাবিদের ব্যক্তিগত মতকে অনুসরণ করা। এভাবে এ উপসংহারে পৌঁছানো যায় যে, সাহাবি রাদি আল্লাহু আনহুর ফতোয়া অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক, যদি তা না হতো তা হলে কুরআনে সাহাবিদের অনুসরণকারীদের এমন ভাষায় প্রশংসা করা হতো না।[১০]

এ মতের সমর্থকরা কয়েকটি হাদিসও উদ্ধৃত করেছেন। এর একটিতে বলা হয়েছে :

اصحابي كالنجوم بايهم أقتديتم أهتديتم

> আমার সাহাবিরা নক্ষত্রের মতো, তাদের যাকেই তোমরা অনুসরণ করবে তাতে সঠিক পথের দিশা পাবে। এ ব্যাপারে আরেকটি হাদিস প্রায় উদ্ধৃত করা হয়ে থাকে :

اكرموا أصحابي فنهم خيركم , ثم الذين يلونهم , ثم

الذين يلونهم ثم يظهرالكذب

> আমার সাহাবিদের সম্মান করবে, তোমাদের মধ্যে তারাই সর্বশ্রেষ্ঠ, এরপর যারা তাদের অনুসরণ করবে তারা, অতঃপর তাদের পরবর্তী বংশধর, এরপরে মিথ্যা প্রাধান্য বিস্তার করবে ...।[১১]

এভাবে যুক্তি দেখান হয় যে, উপরোল্লিখিত হাদিস অনুযায়ী সাহাবিদের জীবনযাপন পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে সঠিক হেদায়েত অনুসরণের সমতুল্য যার অর্থ হলো, তাদের কথা, শিক্ষা ও ফতোয়া দলিল গঠন করে যা মেনে চলার দাবি রাখে। অবশ্য এখানে এ কথা বলা যায় যে, সাধারণভাবে এসব হাদিসে সাহাবিগণের উচ্চমর্যাদার বিষয় প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু তাদের সিদ্ধান্ত অবশ্যই মেনে চলতে হবে, এ কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা হয়নি। এ ছাড়া এসব হাদিসে নিরঙ্কুশ ভাষায় সব সাহাবিকে হেদায়েতের উৎস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, এখানে রসুল সা. সম্ভবত কেবল সেই সব সাহাবিকে বুঝিয়েছেন যারা হাদিস বর্ণনা ও তার শিক্ষাকে প্রচার করেছেন, সে ক্ষেত্রে এ সূত্র উল্লেখের কর্তৃত্ব খোদ রসুল সা.-এর। এ অর্থে সাহাবিগণকে কেবল রসুল সা.-এর সুন্নাহর প্রচারক ও সঞ্চালক হিসেবে দেখা হয়েছে।[১২]

আরো বলা যায় যে, আল গাজ্জালীর মতে, সাহাবিদের ব্যাপারে উপরিউক্ত কথাগুলো প্রকৃতিগত দিক থেকে প্রশংসা বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহর চোখে তাদের

www.pathagar.com

সুগভীর ধর্মানুরাগ ও আচার-আচরণের উচ্চমর্যাদার বিষয় নির্দেশিত হয়েছে। তবে তাতে তাদের মতকে বাধ্যতামূলকভাবে মেনে চলার কথা বুঝানো হয়নি। আল গাজ্জালী অনেকগুলো হাদিস উদ্ধৃত করেন যাতে রসুল সা.-এর নাম ধরে অনেক সাহাবির প্রশংসা করেছেন। তার সবই ছিল প্রশংসা, তাতে এ কথা বুঝানো হয়নি যে সাহাবিদের কথা বাধ্যতামূলক দলিল (*হুজ্জাহ*)।[১৩]

> দ্বিতীয় মত হচ্ছে, সাহাবি রা. ইজতিহাদ কোনো দলিল বা প্রমাণ নয় এবং তা পরবর্তী জামানার মুজতাহিদদের বা অন্য কারোর জন্য বাধ্যতামূলক নয়। আশয়ারী, মুতাজিলা, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও হানাফী ফকিহ আবুল হাসান আল কারখী এ মত পোষণ করেন।[১৪] এ মতের সমর্থকরা তাদের মতের সপক্ষে কুরআনের একটি আয়াত (সুরা আল হাশর, ৫৯ : ২) উদ্ধৃত করেন, এতে বলা হয়েছে : 'অতএব শিক্ষা গ্রহণ কর হে দৃষ্টিবান লোকেরা'। এ থেকে যুক্তি দেয়া হয়েছে যে, এ আয়াতে ইজতিহাদ করতে সক্ষম প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তা করাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং মুজতাহিদ সাহাবি বা অন্য কেউ হবে কি না সে ব্যাপারে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। এতে খোদ ইজতিহাদকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, বিশেষ কোনো ব্যক্তির ইজতিহাদ নয়। এ আয়াতে আরো আভাস দেয়া হয়েছে যে, মুজতাহিদ অবশ্যই সরাসরি উৎসের ওপর নির্ভর করবে এবং সাহাবিসহ কারোর অনুকরণ করবে না। এ মতের সমর্থকরা উপরোল্লিখিত সাহাবিদের ইজমার উল্লেখ করেছেন যাতে বলা হয়েছে, সাহাবিদের মধ্যকার একজন মুজতাহিদের ফতোয়ার মতো অবশিষ্ট সাহাবিগণের জন্য বাধ্যতামূলক হবে না।[১৫]

আল গাজ্জালী ও আল আমিদি উভয়ই এ মতকে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত মত বলে মনে করেন। তারা বলেন, যারা এ ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করেন তারা এ ক্ষেত্রে যেসব দলিল অবলম্বন করেছেন সেগুলো দুর্বল। আল শাওকানীও মনে করেন যে, সাহাবির রা. ফতোয়া দলিল নয়। তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, উম্মাহর জন্য কুরআন সুন্নাহর অনুসরণ করা প্রয়োজন। শরিয়তে রসুল সা.-এর সুন্নাহকে অনুসরণ করা মুমিনদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, অন্য কোনো ব্যক্তির অনুসরণ নয়, তিনি সাহাবি বা অন্য যে কেউই হোন না কেন; এরূপ করা হলে তাকে রসুল সা: এর অনুরূপ মর্যাদা দেয়া হবে।[১৬] আল শাওকানীর এ মন্তব্যের সমালোচনা করে আবু জাহরাহ বলেছেন, আমরা যখন সাহাবার কথা বলি তখন তা কর্তৃত্বব্যঞ্জক প্রমাণ হিসেবেই বলি, এর অর্থ এটি বুঝায় না যে, রসুল সা.-এর প্রতিদ্বন্দ্বী সৃষ্টি করা হয়েছে। অপরদিকে কুরআন সুন্নাহর বিধান প্রতিপালনে সাহাবিগণ সবচেয়ে

www.pathagar.com

নিষ্ঠাবান ও নিবেদিত প্রাণ ছিলেন এবং রসুল সা.-এর ঘনিষ্ট সাহচর্যে থেকে তা সম্পাদন করার কারণে তাদের ফতোয়া অনেক বেশি কর্তৃত্ব ও তাৎপর্য বহন করে।[১৭]

তৃতীয় মতটি ইমাম আবু হানিফার। এতে বলা হয়েছে, যখন কিয়াসের সাথে সাহাবির সিদ্ধান্তের বিরোধ দেখা দেবে তখন তা দলিল হবে কিন্তু যখন কিয়াসের পক্ষে হবে তখন তা দলিল হবে না। এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, কিয়াসের সঙ্গে সাহাবির রা. সিদ্ধান্তের বিরোধ দেখা দিলে সে ক্ষেত্রে সাধারণভাবে কোনো কারণ থাকবে এবং এর বিরুদ্ধে সাহাবির রায় কিয়াসের দুর্বলতা নির্দেশ করে, তাই সাহাবির মতকে এ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। কিয়াসের সাথে সাহাবির মত মিলে গেলে তা দলিলের সঙ্গে নিছক মিলে যায়, এতে কিয়াস প্রথম স্থানে স্থাপিত হয়, তাই সাহাবির রা. রায় কোনো পৃথক কর্তৃত্বের অধিকারী হয় না।[১৮] আরেকটি মতও রয়েছে, এতে বলা হয়েছে, কেবলমাত্র খোলাফায়ে রাশেদার চার খলিফার রায়ই কর্তৃত্বের অধিকারী। এ মতের সমর্থনে রসুল সা.-এর 'হাদিস উদ্ধৃত করা হয়েছে যাতে বলা হয়েছে :

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الرشدين من بعدي

> 'তোমরা আমার সুন্নাত অনুসরণ করবে এবং আমার পরে খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাত'। অন্য এক হাদিসে একে আরো সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে :

أقتدوا بالذي من بعدي أبي بكر و عمر

> 'যারা আমার উত্তরাধিকারী হবে তাদের মধ্যে আবু বকর ও ওমরকে অনুসরণ করবে'। দ্বিতীয় হাদিসটির যথার্থতার বিষয়ে প্রশ্ন রয়েছে। সে যাই হোক, উপরিউক্ত হাদিস দুইটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইসলামের ওই সব জ্যোতিষ্কের আনুগত্য ও ত্যাগের প্রশংসা করা এবং তাদের অনবদ্য আচরণের উচ্ছ্বসিত গুণকীর্তন করা।[১৯]

ইমাম শাফেয়ীর রচনাবলি থেকে জানা যায় যে, কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমাতে কোনো বিধান পাওয়া না গেলে সে ক্ষেত্রে সাহাবির ফতোয়া অনুসরণ করতে হবে। এ বিষয়ে ইমাম শাফেয়ীর মত অনেকটা দ্ব্যর্থবোধক। এ কারণে ফকিহগণ তার এ মতকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আল রাবীর সঙ্গে আলাপচারিতায় আল শাফেয়ী বলেন : 'আমরা দেখতে পাই যে আলেমগণ অনেক সময় সাহাবির ফতোয়া

www.pathagar.com

অনুসরণ করেন আবার অন্য সময় তা বর্জন করেন, আর যারা তা অনুসরণ করেন তারাও সব সময় তা করেন না।' এ সময় আলোচনায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি ইমামকে প্রশ্ন করেন, তা হলে আমি তাদের কোন কোন দিক অনুসরণ করব? উত্তরে ইমাম শাফেয়ী বলেন, আমি কুরআন, সুন্নাহ বা ইজমাতে এবং এসব সূত্রের নিহিতার্থের মধ্যে কোনো সমস্যার সমাধান খুঁজে না পেলে সে ক্ষেত্রে সাহাবিদের রা. ফতোয়া অনুসরণ করি।' ইমাম শাফেয়ী আরো বলেন, তিনি অন্যান্য সাহাবির সিদ্ধান্তের চেয়ে খোলাফায়ে রাশেদার তিন খলিফার সিদ্ধান্তকে অগ্রাধিকার প্রদান করেন, কিন্তু আমরা যখন সাহাবিগণের মধ্যে মতপার্থক্য দেখতে পাবো তখন আমাদের এর কারণ অনুসন্ধান করতে হবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবিগণ যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা নির্ণয় করতে হবে। উপরন্তু ইমাম শাফেয়ীর মতে, কিয়াসের সাথে সাহাবির সিদ্ধান্ত মিলে গেলে তা অসমর্থিত ভিন্ন ভিন্ন কিয়াসের চেয়ে অগ্রাধিকার পাবে।[২০]

জানা গেছে যে, ইমাম আবু হানিফাও এ কথা বলেছেন, 'আমি যখন আল্লাহর কিতাব ও রসুল সা.-এর সুন্নাহতে কোনো সমস্যার সমাধান দেখতে না পাই তখন আমি সাহাবিদের বক্তব্য অবলম্বন করি। আমার কাছে আকর্ষণীয় মনে হলে তাদের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করি অন্যথায় করি না, কিন্তু আমি কখনোই তাদের মত পুরোপুরি বর্জন করি না এবং তাদের মতের ওপর অন্যদের মতকে অগ্রাধিকার দেই না।' এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আবু হানিফা কিয়াসের ওপরে সাহাবির রা. সিদ্ধান্তকে অগ্রাধিকার দিতেন, যদিও তিনি একে বাধ্যতামূলক প্রমাণ বলে বিবেচনা করতেন না। এটি স্পষ্ট যে আবু হানিফা অন্যদের ইজতিহাদের ওপর সাহাবির রা. ফতোয়া অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচনা করতেন।[২১]

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল সাহাবিদের ফতোয়াকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। এর মধ্যে এক ধরনের ফতোয়া হলো এমন ধরনের যাকে কোনো সাহাবিই বিরোধিতা করেননি অথবা ওই বিষয়ে কোনো ইজতিহাদ পেশ করা হয়নি। ইবনে হাম্বল এ ধরনের ফতোয়াকে কর্তৃত্বব্যঞ্জক বলে গণ্য করেছেন। এর একটি উদাহরণ হলো, দাসদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা। এ ব্যাপারে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল সাহাবি আনাস ইবনে মালিক রা. ফতোয়াকে অনুসরণ করেন। এ ব্যাপারে ইমাম ইবনে হাম্বলের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, তিনি দাসদের সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করেছেন এমন কাউকে দেখতে পাননি, তাই এটি গ্রহণযোগ্য। ইমাম ইবনে হাম্বলের শ্রেণি বিভক্ত করা দ্বিতীয় প্রকার ফতোয়ার ব্যাপারে সাহাবিগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন এবং একই সমস্যার ব্যাপারে দুই বা তিনটি ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন। এ ক্ষেত্রে ইমাম ইবনে হাম্বল এসব সিদ্ধান্তকে বৈধ ও সমভাবে কর্তৃত্বব্যঞ্জক বলে

www.pathagar.com

বিবেচনা করেছেন, যতক্ষণ না এ কথা জানা যায় যে, খোলাফায়ে রাশেদা এর একটিকে অন্যটির চেয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করেছিলেন এবং তা জানা গেলে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল খোলাফায়ে রাশেদাকেই অনুসরণ করতেন। এ ধরনের মতানৈক্যের একটি উদাহরণ হলো দাদার বর্তমানে পোষ্য ভাইদের মধ্যে ওয়ারেশি সম্পত্তির অংশ বন্টন। আবু বকর রা.-এর মতে, এ ক্ষেত্রে দাদা পিতার মতো বলে গণ্য হবেন এবং সম্পর্কীয় ভাইয়েরা পুরোপুরি এর বহির্ভূত হবে। অন্যদিকে আহমদ ইবনে সাবিত রা. দাদাকে ভাইদের একজন বলে গণ্য করেছেন, যাকে সম্পত্তির সর্ব নিম্ন এক-তৃতীয়াংশ প্রদান করতে হবে। হজরত আলী ইবনে আবি তালিব রা. দাদাকে একজন ভাই হিসেবে গণ্য করেছেন যিনি ওয়ারেশি সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশের কম অংশীদার হবেন না। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল তিনটি মতকেই বৈধ বলে গ্রহণ করেছেন, এর প্রতিটিতে হেদায়াত ও আলো প্রকাশ পেয়েছে, যা তারা তাদের নেতা রসুল সা.-এর কাছ থেকে লাভ করেছিলেন এবং এগুলো অন্যদের ইজতিহাদের চেয়ে অগ্রাধিকার পাওয়ার অধিকারী।[২২]

হাম্বলী বিশেষজ্ঞ ইবনে কাইয়ুম আল জাওজিয়াহ ইমাম শাফেয়ীর উদ্ধৃতি দিয়ে জানান, শাফেয়ী বলেছেন, 'আমাদের জন্য নিজস্ব অভিমতের চেয়ে সাহাবির রা. রায় অনুসরণ করা উত্তম। ইবনে কাইয়ুম কোনোরূপ আপত্তি ছাড়াই একে মেনে নিয়েছেন এবং এর সমর্থনে সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। এরপর তিনি এর ব্যাখ্যায় আরো বলেন, সাহাবির ফতোয়া নিম্নের ছয় প্রকারের যে কোনো এক প্রকারের মধ্যে পড়বে। প্রথমত, সাহাবির ফতোয়া রসুল সা.-এর কোনো কথার ভিত্তিতে হতে হবে, যা তিনি রসুল সা.-এর কাছ থেকে জেনে থাকতে পারেন। ইবনে কাইয়ুম এর ব্যাখ্যায় বলেন, হাদিস আকারে রসুল সা.-এর শিক্ষা সাহাবিগণ রা. বর্ণিত হাদিসের মাধ্যমে যতটুকু আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে তার চেয়ে অনেক বেশি সাহাবিগণ জানতেন। এর উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, আবু বকর সিদ্দিক রা. সুন্নাহ সম্পর্কে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন এবং কেবল নবুওতি মিশনকালে নয়, তারও অনেক আগে থেকে রসুল সা.-এর সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন, তৎসত্ত্বেও তিনি ১০০টির বেশি হাদিস বর্ণনা করেননি। দ্বিতীয়ত, কোনো সাহাবির ফতোয়া তিনি অন্য সাহাবির কাছে যা শুনেছিলেন তার ভিত্তিতে হতে পারে। তৃতীয়ত, কুরআন সম্পর্কে তার উপলব্ধির ভিত্তিতে এমন পন্থায় এটি হতে পারে, যেমন পন্থায় সাহাবির ফতোয়া পাওয়া না গেলে বিষয়টি হয়তো আমাদের কাছে পরিষ্কার হতো না। চতুর্থত, সাহাবির ফতোয়া সাহাবিগণের সম্মিলিত মতৈক্যের ভিত্তিতে হতে পারে, যদিও তা আমাদের কাছে পৌঁছেছে কেবলমাত্র একজন সাহাবির মাধ্যমে। পঞ্চমত, সাহাবির ফতোয়া জ্ঞানপূর্ণ অভিমত ও সাধারণ

www.pathagar.com

জ্ঞানের ভিত্তিতে হতে পারে যা তিনি নিজ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জন করেন। ষষ্ঠত, সাহাবির ফতোয়া তার নিজ উপলব্ধির ভিত্তিতে হতে পারে, যা প্রত্যক্ষ দর্শনজনিত জ্ঞানের ফসল নয়, পরোক্ষভাবে তিনি তা অর্জন করেছেন এবং তার এ অভিমত সঠিক না হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সাহাবির ফতোয়া কোনো দলিল হবে না এবং অন্যদের জন্য তা অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই।[২৩]

সবশেষে বলা যায়, ইমাম মালিক সাহাবির ফতোয়াকে কেবল সমুন্নতই করেননি উপরন্তু তাকে রসুল সা.-এর সুন্নতের সমার্থক বলে গণ্য করেছেন। ইতোমধ্যে সুন্নাহ সম্পর্কিত আলোচনায় উল্লেখ করেছি যে ইমাম মালিক সংকলিত হাদিস গ্রন্থ 'মুয়াত্তা'য় যে ১৭০০টি হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে তার অধিকাংশই হচ্ছে সাহাবিদের কথা ও ফতোয়া।

আবু জাহরাহ অনুরূপভাবে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, চার মাজহাবের ইমামগণের সবাই নীতিগতভাবে সাহাবির ফতোয়া সমুন্নত রেখেছেন ও অনুসরণ করেছেন এবং তাদের সবাই সাহাবির ফতোয়াকে কর্তৃত্বপূর্ণ বলে গণ্য করেছেন, যদিও এসব ইমামের কিছু কিছু অনুসারী তাদের মতের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। অতঃপর লেখক আল শাওকানীর উদ্ধৃতি দিয়েছেন যাতে বল হয়েছে সাহাবির রা. ফতোয়া কোনো প্রমাণ বা দলিল নয়। আবু জাহরাহ আল শাওকানির মতকে খণ্ডন করে দিয়ে বলেছেন, 'এ বিষয়টি অতিরঞ্জন মুক্ত নয়।' আমরা ইতোমধ্যে আল শাওকানির মত সম্পর্কে আবু জাহরাহর সমালোচনার বিষয়ে আলোচনা করেছি। আবু জাহরাহ এ ব্যাপারে ইবনে আল কাইয়ুমের বক্তব্যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, এ প্রসঙ্গেও আমরা ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি, এতে সাহাবির রা. ফতোয়ার কর্তৃত্বপূর্ণ হওয়ার বিষয় সমর্থন করা হয়েছে। কিন্তু এ আলোচনার মর্মার্থ এবং সার্বিকভাবে বিষয়বস্তুর প্রকৃতি থেকে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে তা হলো, সাহাবির ফতোয়া একটি ধারণামূলক দলিল।[২৪] অবশ্য মাজহাবসমূহের শীর্ষস্থানীয় ইমামগণ একমত হয়েছেন যে, সাহাবির ফতোয়া কর্তৃত্বব্যঞ্জক তবে তাদের কেউই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ কথা বলেননি যে তা একটি বাধ্যতামূলক প্রমাণ। তৎসত্ত্বেও চারজন শীর্ষস্থানীয় ইমাম সাহাবির ফতোয়াকে হেদায়াতের মনোহর উৎস হিসেবে বিবেচনা করেছেন, এ কারণে যে তা কর্তৃত্বের এক ধরনের পরিমাপ যা আন্তরিক বিবেচনার দাবি রাখে এবং অন্যান্য মুজতাহিদের ইজতিহাদের ওপর অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য।

www.pathagar.com

টিকা

১. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা, ৯৪; মাহমাসসানী, ফালসাফাহ, পৃষ্ঠা ৮; ইসমাঈল, আদিল্লাহ, পৃষ্ঠা ২৮১।

২. আল গাজ্জালী মুস্তাস্ফা, ১, ১৩৬।

৩. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ৭০।

৪. ইসমাঈল, আদিল্লাহ, পৃষ্ঠা ২৮২।

৫. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ৭১; ইসমাঈল, আদিল্লাহ, পৃষ্ঠা ২৮৩।

৬. তুলনীয়, ইসমাঈল, আদিল্লাহ, পৃষ্ঠা ২৮৪-৮৫।

৭. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা, ৯৫।

৮. আমিদী, ইহকাম, ৪,১৪৯; শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২৪৩।

৯. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ১৬৮; যুহাইর, উসুল, ৪, ১৯২।

১০. ইসমাঈল, আদিল্লাহ, পৃষ্ঠা ২৯১-৯২।

১১. তাবরিজি, মিশকাত, ৩য় খণ্ড, ১৬৯৩, হাদিস নম্বর ৬০০১ ও ৬০০৩; আল গাজ্জালী মুস্তাস্ফা, ১, ১৩৬; আমিদী, ইহকাম, ৪,১৫২।

১২. জুহাইর, উসুল, ৪, ১৯২; ইসমাঈল, আদিল্লাহ, পৃষ্ঠা ২৮৭।

১৩. আল গাজ্জালী মুস্তাস্ফা, ১, ১৩৬-৩৭।

১৪. ইসমাঈল, আদিল্লাহ, পৃষ্ঠা ২৯৪; যুহাইর, উসুল, ৪, ১৯৩।

১৫. আল গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ১, ১৩৫; আমিদী, ইহকাম, ৪,১৪৯।

১৬. শাওকানী, ইরশাদ, ৬২, ২১৪।

১৭. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ১৭২; ইসমাঈল, আদিল্লাহ, পৃষ্ঠা ২৯৯।

১৮. জুহাইর, উসুল, ৪, ১৯৪; ইসমাঈল, আদিল্লাহ, পৃষ্ঠা ৩০১।

১৯. ইবনে মাজাহ, সুনান, ১, ৩৭, হাদিস ন; ৯৭; আল গাজ্জালী মুস্তাস্ফা, ১, ১৩৫; আমিদী, ইহকাম, ৪, ১৫২।

২০. শাফেয়ী, রিসালাহ, পৃষ্ঠা ২৬১; শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২৪৩; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ১৭০।

২১. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ১৭০।

২২. আবু জাহরাহ, ইবনে হাম্বল, পৃষ্ঠা ২৮৭; ইসমাঈল, আদিল্লাহ, পৃষ্ঠা ২৯৫-৯৬।

২৩. ইবনে কাইয়ুম, ইলাম, ২, ১৯১; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ১৬৯-৭০।

২৪. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ১৭২।

www.pathagar.com

বিআইআইটি থেকে প্রকাশিত বইয়ের তালিকা (পার্ট - ১)

ক. অর্থনীতি ও ব্যবসা প্রশাসন

এম. উমর চাপড়া *পিএইচডি*

ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ	২৫০/-
ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন	১৬০/-
ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে : অর্থশাস্ত্রের ভবিষ্যৎ	৩০০/-
প্রফেসর খুরশিদ আহমদ	
উন্নয়ন ও ইসলাম	৩৫/-
এম আকরাম খান এবং এম রকিবুজ জামান	
ইসলামী অর্থনীতিতে পণ্য বিনিময় ও স্টক এক্সচেঞ্জ	৭০/-
এম. রুহুল আমিন অনূদিত	
ইসলাম ও নয়া আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা - সামাজিক প্রেক্ষাপট	১০০/-
কাজী মোরতুজা আলী	
ইসলামি জীবন বীমা : বর্তমান প্রেক্ষিত	১৭৫/-
মাহমুদ আহমদ *পিএইচডি*	
ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ : তত্ত্ব ও প্রয়োগ	৬০/-
রফিক ইসা বীকুন	
ইসলামি ব্যবসায় নৈতিকতা	১০০/-
প্রফেসর ড. মাহফুজুর রহমান	
কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা	২০০/-
Prof. M. Raihan Sharif	
Guidelines to Islamic Economics : Nature, Concept and Principles	২৫০/-
M. Zohurul Islam *FCA*	
Accounting Philosophy Ethics and Principles: The Islamic Perspective	২০০/-
Al-Zakah : A Hand book of Zakah Administration	২০০/-
An Analysis of the Development of Socio-Economic Development	১০০/-
M. Kabir Hasan *PhD*	
On Openness, Integration and Economic Growth	২০০/-
Globalization and the Muslim World	৪০০/-
M. Azizul Huq	
Profits Payout to Mudaraba Depositors (Bangladesh Perspective)	১০০/-
Masudul Alam Chowdhury	
A Dynamic Analysis of Trade and Development in Islamic Countries	৩০০/-

www.pathagar.com

দ্বাদশ অধ্যায়

ইসলামি আইনের ন্যায়পরায়ণতা বা ইস্তিহ্ছান

আমি এ অধ্যায়ের জন্য যে শিরোনাম দিয়েছি তাতে 'ইকুইটি' বা ন্যায়পরায়ণতার ধারণা ও ইস্তিহ্ছানের মধ্যে স্পষ্ট সাদৃশ্যের বিষয় প্রকাশ পেয়েছে যার ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন। এ দু'টি শব্দের মধ্যে ঘনিষ্ঠ মিল থাকলেও তা অভিন্ন নয়। 'ন্যায়পরায়ণতা হচ্ছে পশ্চিমা আইনগত ধারণা, যা পক্ষপাতহীনতা ও বিবেকবোধের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এবং ইতিবাচক আইনের বাইরে স্বাভাবিক অধিকার (natural right) বা ন্যায়বিচারের বিশ্বাস থেকে এর বৈধতা পেয়েছে।[১] ইসলামি আইনে ইস্তিহ্ছান ও পশ্চিমা আইনের ন্যায়পরায়ণতা উভয়ই ন্যায্যতা, নিরপেক্ষতা ও বিবেকবোধের মূলনীতির দ্বারা অনুপ্রাণীত হয়েছে এবং আইনের ইতিবাচক বিধান প্রয়োগ করলে যে ক্ষেত্রে অন্যায্য ফল পাওয়ার পথ প্রশস্ত হতে পারে বলে মনে হয়েছে সে ক্ষেত্রে তা থেকে সরে যাওয়ার বিষয় উভয়ই অনুমোদন করেছে। এর মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো, ন্যায়পরায়ণতার ধারণার বিষয় সার্বিকভাবে প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক আইনের (natural justice) ওপর নির্ভরশীল আর ইস্তিহ্ছানে শরিয়াহর মূল্যবোধ ও মূলনীতির ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কিন্তু শরিয়ত ও প্রাকৃতিক আইনের মূল্যবোধে সমকেন্দ্রমুখিতার বিষয় কেউ যদি স্মরণে রাখেন তাহলে দেখা যাবে যে, এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। তৎসত্ত্বেও ন্যায় ও অন্যায় প্রশ্নে তাদের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। প্রাকৃতিক আইন ও খোদা প্রদত্ত ইসলামি আইনে যেসব মূল্যবোধ সমুন্নত রাখা হয়েছে তা অবশ্য অনেকটা একই রকম। সংক্ষেপে বলা যায়, উভয়ই মনে করে যে, ন্যায় ও অন্যায় ব্যক্তির আপেক্ষিক সুবিধার কোনো বিষয় নয় বরং তা চিরন্তন বৈধ গুণ থেকে সঞ্চারিত হয়, যা চূড়ান্তভাবে মানব জ্ঞানতা ও বিশ্বস্ততা থেকে নিরপেক্ষ। তবে ন্যায় ও অন্যায় সহজাত প্রকৃতির হওয়া সম্পর্কিত প্রাকৃতিক আইনের ধারণার সাথে খোদায়ী আইনের বিধানের পার্থক্য রয়েছে।[২]

ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে ন্যায়-অন্যায় বা ভালো-মন্দ 'বস্তুর প্রকৃতির' সূত্রে নির্ধারিত হয় না বরং আল্লাহ তায়ালা তা ওইভাবে নির্ধারণ করেছেন। শরিয়ত হচ্ছে বিশ্বজাহানের মালিক ও মূল্যবোধের সর্বোচ্চ নিয়ন্তা মহান আল্লাহর ইচ্ছার মূর্ত প্রকাশ। যদি এ ন্যায়পরায়ণতার সংজ্ঞায় এ কথা বলা হয় যে, প্রকৃতির আইন হচ্ছে উচ্চতর আইন যা অন্য সব বৈধ আইন, লিখিত বা অলিখিত আইনের উর্ধ্বে তাহলে তা স্পষ্টত ইস্তিহ্ছান যা বুঝায় তা হবে না। ইস্তিহ্ছান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ ওহির ওপর অন্য কোনো আইনের শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকৃতি দেয় না এবং তাতে খোদায়ী

www.pathagar.com

আইনে সমুন্নত মূলনীতির ভিত্তিতে সমাধান পেশ করা হয়েছে। উচ্চতর আইনের স্বীকৃতি দিয়ে ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠার মতো ইস্তিহছানে শরিয়ত বহির্ভূত কোনো স্বতন্ত্র কর্তৃপক্ষ গঠনের চেষ্টা করা হয়নি। অন্য কথায় ইস্তিহছান হচ্ছে শরিয়াহর অবিচ্ছেদ্য অংশ যা ন্যায়পরায়ণতা থেকে ভিন্ন। কারণ ন্যায়পরায়ণতায় প্রাকৃতিক আইনের স্বীকৃতি দান ছাড়াও একে মূলত মানবসৃষ্ট আইনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলেও গণ্য করা হয়েছে।[৩]

ইস্তিহছানের সাধারণ তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনাকালে এ অধ্যায়ে এর সাথে সংশ্লিষ্ট দু'টি প্রধান বিষয় সম্পর্কেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এর একটি হলো ইস্তিহছান কোনো কিয়াস গঠন করে কি না। একে কী এক ধরনের কিয়াস বলে গণ্য করা হবে অথবা নিজস্ব অধিকার বলে ন্যায়পরায়ণতার একটি মূলনীতি হিসেবে তা টিকে থাকার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে? অন্য যে বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে তাহলো- ইস্তিহছানের বৈধতা সম্পর্কিত বিতর্ক। ইমাম শাফেয়ীর এ মূলনীতির দ্ব্যর্থহীন প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে এ বিতর্কের সূচনা হয়েছে। বিরাজমান ফিকাহ সাহিত্যে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে যে, আলেমগণ ইস্তিহছানের বিষয়ে বিতর্কে কতটা আচ্ছন্ন রয়েছেন এবং তারা এর প্রায় সব বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। তাই আমি ইস্তিহছানের সাধারণ বৈশিষ্ট্য বর্ণনার মধ্য দিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করতে চাই, এরপর এর সমর্থনে উদ্ধৃতির মাধ্যমে এর কর্তৃত্ব, অতঃপর এর সাথে সংশ্লিষ্ট ধারণা রায় ও কিয়াস নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব। ইস্তিহছানের ওপর বিতর্কের বিবরণ দেয়ার মাধ্যমে আমি আলোচনা শেষ করব এবং উপসংহারে আমি ইস্তিহছানের একটি প্রেক্ষাপট গঠনের লক্ষ্যে বিষয়টি নতুনভাবে দেখার চেষ্টা করব।

ইস্তিহছান হচ্ছে ইজতিহাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা এবং তা সমাজের পরিবর্তিত পরিস্থিতির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ইসলামি আইন গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি ইসলামি আইনকে প্রয়োজনীয় উপায় উপকরণ প্রদান করেছে যা নমনীয়তা ও সম্প্রসারণকে উৎসাহিত করেছে। তৎসত্ত্বেও মূলত সহজ ধারণার ক্ষেত্রে বিচারিক কলাকৌশলগত খুঁটিনাটি ব্যবস্থার প্রয়োগের কারণে মৌলিকভাবে ইস্তিহছান নমনীয় রয়ে গেছে এবং তাকে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে, যা পরে আলোচনা করা হবে। অপরিহার্য নমনীয়তার কারণে ফকিহগণ ইস্তিহছানের ওপর অধিক নির্ভরশীল হওয়াকে নিরুৎসাহিত করেছেন যাতে এর ফলাফল শরিয়াহর বিধান কার্যকর করা স্থগিত করা এবং সাধারণ মূলনীতি পাশ কাটিয়ে যাওয়ার একটি হাতিয়ারে পরিণত না হয়। আমাদের ফকিহগণের মধ্যে ইস্তিহছান একটি অতি বিতর্কের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। একদিকে হানাফী, মালেকী ও হাম্বলী ফকিহগণ আইনের একটি সহায়ক উৎস হিসেবে ইস্তিহছানকে বৈধতা প্রদান

করেছেন অন্য দিকে শাফেয়ী, জাহিরি ও শিয়া আলেমগণ একে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং একে তাদের উসুলে ফিকহর আইনগত তত্ত্ব গঠনে কোনো ধরনের কৃতিত্ব প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।[৪]

ইস্তিহছানের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে 'অনুমোদন করা' অথবা কোনো কিছুকে অধিকতর পছন্দনীয় বলে মনে করা। 'তাসুনা' শব্দ থেকে ইস্তিহছান শব্দটি এসেছে, যার অর্থ হলো, ভালো বা সুন্দর হওয়া। বিচারিক বা আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে ইস্তিহছান হচ্ছে ব্যক্তিগত অভিমত চর্চার একটি পদ্ধতি যার লক্ষ্য হচ্ছে প্রচলিত আইন আক্ষরিক অর্থে প্রয়োগের ফলে কঠোরতা ও অন্যায় ঘটে যাওয়ার যে আশঙ্কা থাকে তা পরিহার করা। ইস্তিহছানের সঠিক অর্থ হলো, 'বিচারিক অগ্রাধিকার'। কারণ এতে সুবিচারের নিশ্চয়তা বিধান ও জনস্বার্থের অনুকূলে উত্তম পন্থায় কাজ করে বলে এর বিপরীতে প্রতিষ্ঠিত কিয়াসকে প্রত্যাখ্যান করা হয়।

বিদ্যমান আইন বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করলে তার ফল অনিষ্টকর বলে প্রমাণিত হতে পারে এবং কোনো নির্দিষ্ট সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধান অর্জনে ওই আইন প্রয়োগ পরিহার করাই একমাত্র উপায় হতে পারে। ইস্তিহছান অবলম্বনকারী বিচারক হয়তো দেখতে পেয়েছেন যে, প্রচলিত আইন যে একেবারেই সাধারণ অথবা অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট ও অনমনীয়। উভয় ক্ষেত্রে ইস্তিহছান কষ্ট লাঘবের উপায় হিসেবে কাজ করতে এবং এমন সমাধানের পথ তৈরি করতে পারে যা, শরিয়াহর উচ্চতর উদ্দেশ্য অর্জনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। দ্বিতীয়ত খলিফা হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব রা. বড় ধরনের দুর্ভিক্ষের সময় চুরির নির্ধারিত শাস্তি হাত কর্তন করার বিধান কার্যকর বন্ধ রাখেন; দাস-মাতাদের (উম্মাহাত আল আওলাদ) বিক্রি করা এবং কতিপয় ক্ষেত্রে কিতাবিয়াতের সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ করেন। তার এসব পদক্ষেপের সবই ছিল ইস্তিহছানের উদাহরণ।[৫] ওমর রা. জনস্বার্থ, ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচারের স্বার্থে এসব ক্ষেত্রে প্রচলিত বা বিদ্যমান আইনকে পরিহার করেন।[৬]

হাম্বলী ফকিহ আর সারাখসী (মৃত্যু ৪৮৩/১০৯০) মনে করেন যে ইস্তিহছান হচ্ছে আইনগত আদেশকে সহজ ও শিথিল করার একটি পদ্ধতি। এর মাধ্যমে এমন রায়ের অনুকূলে কিয়াস পরিহার করা হয়, যা দুর্দশা দূর করে এবং ঘটনাকে জনগণের অনুকূলে নিয়ে যায়। আল সারাখসি আরো বলেন, ধর্মের প্রধান মূলনীতি হচ্ছে দুর্দশা লাঘব করা (রাফ আল হারায)। কুরআনে এ বিষয়টির স্পষ্ট উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়, যে ক্ষেত্রে মুমিনদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে : 'আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সাথে নমনীয় নীতি অবলম্বন করতে চান, কঠোর নীতি অবলম্বন করতে চান না' (সুরা বাকারা, ২ : ১৮৫)। আল সারাখসি এ সম্পর্কিত একটি হাদিসও উদ্ধৃত করেছেন, তাহলো :

www.pathagar.com

خير دينكم أيسره

তোমাদের ধর্মের সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তা জনগণের সামনে সহজভাবে তুলে ধরা হয়েছে।[৭]

আল খুদারি এর যথার্থই ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন যে, সমস্যার সমাধান অন্বেষণে সাহাবি রা. ও তাবেয়ীগণ প্রথমে কুরআন, এরপর রসুল সা.-এর সুন্নাহর প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু যখন তারা এ দু'টি উৎসে কারণ সমাধান খুঁজে পাননি তখন তারা ব্যক্তিগত অভিমতের (রায়) চর্চা করেছেন। তারা শরিয়াহর সাধারণ নীতিমালা ও উদ্দেশ্যের আলোকে তাদের প্রণীত পদ্ধতি অনুসারে এটি করেছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, মুহাম্মদ ইবনে সালামার রা. ঘটনার ব্যাপারে উমর ইবনে খাত্তাব রা.-এর রায়ে এ বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। ইবনে সালামার প্রতিবেশী খলিফার কাছে এসে ইবনে সালামার জমির মধ্য দিয়ে সেচনালা সম্প্রসারণ করার অনুমতি চাইলেন। সেচনালা সম্প্রসারণে ইবনে সালামার কোনো ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা না থাকা এবং তার প্রতিবেশীর কল্যাণ লাভের বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাওয়ায় খলিফা তার আবেদন মঞ্জুর করলেন।[৮]

এতে প্রতীয়মান হয় যে, ইস্তিহছান হচ্ছে মূলত এক ধরনের রায় যা নির্দিষ্ট কোনো সমস্যার বিভিন্ন ধরনের সমাধানের মধ্য থেকে সর্বোত্তমটিকে অগ্রাধিকার প্রদান করে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ইস্তিহছান হচ্ছে ইসলামি আইন বিজ্ঞানের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ বরং তা মানবজ্ঞানের অন্য অনেক ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত। তাই 'ইস্তিহছানকে মানবজ্ঞানের দশ ভাগের-নয় ভাগ বলে ইমাম মালিকের মন্তব্যে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। এ কথা উদ্ধৃত করার সময় আবু জাহরাহ বলেন, ইমাম মালিক যখন এ মন্তব্য করেন তখন দৃশ্যত তিনি ইস্তিহছানের আওতার মধ্যে মাসলাহার ব্যাপকভিত্তিক ধারণাকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, 'কারণ মাসলাহাই দশ ভাগের- নয় ভাগেরও বড় অংশ জুড়ে রয়েছে'।[৯]

বিভিন্ন সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে বুঝা যায় যে, সাহাবি রা. ও তাবেয়ীগণ নিছক অক্ষরবাদী ছিলেন না। তারা তাদের দেয়া প্রতিটি আইনগত মতামতের (ফতোয়া) ব্যাপারে খোদায়ী উৎসের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা অনুসন্ধান করতেন। অন্যদিকে তারা সবসময় শরিয়াহর সাধারণ চেতনা ও উদ্দেশ্যের উপলব্ধির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন, কোনোভাবেই এর মূলনীতির সংকীর্ণ ও আক্ষরিক অর্থে নয়। এই চেতনার ভিত্তিতে ইস্তিহছান গঠিত হয়েছে; এটি হচ্ছে অক্ষরবাদের প্রতিরোধক এবং আইনের ব্যাপকভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ, যা অবশ্যই সুবিচারের আদর্শ ও ন্যায্যতার পক্ষে কাজ করে, কাউকে আশাহত করে না।

www.pathagar.com

এর একটি উদাহরণ– মৌখিক সাক্ষ্য হলো ইসলামি আইনের প্রমাণের আদর্শরূপ। এ সম্পর্কে সর্বসম্মত মত (ইজমা) রয়েছে বলে দাবি করা যেতে পারে। এজন্য স্বাভাবিক অবস্থায় দুইজন সৎ (আদল) সাক্ষী থাকা প্রয়োজন যদি আইনে ভিন্ন কিছু না বুঝায় (উদাহরণ হলো, জিনার প্রমাণের জন্য চারজন সাক্ষী প্রয়োজন)। এসব ঘটনায় সাক্ষীর সংখ্যা কত হবে তা কুরআনে নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে, কিন্তু মৌখিকভাবে সাক্ষ্য দিতে হবে এ বিষয়টি ইজমার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়েছে। মুসলিম আইনজ্ঞরা মৌখিক সাক্ষ্যদানের ওপর জোর দিয়েছেন এবং দোষ স্বীকার ও দালিলিক সাক্ষ্যসহ অন্যান্য সাক্ষ্যের পদ্ধতির চেয়ে একে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাদের দৃষ্টিতে বিচারকের সামনে দাঁড়িয়ে মৌখিকভাবে সরাসরি ও ব্যক্তিগত সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী কিছু থাকে না এবং এটিই হচ্ছে সত্য উদঘাটনে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উপায়। অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে যে, সে সময়ে অন্যান্য পদ্ধতি যেমন ছবি, সাউন্ড রেকর্ডিং, ল্যাবরেটরি বিশ্লেষণ ইত্যাদি সত্য প্রতিষ্ঠায় অধিকতর না হলেও অন্তত সমপর্যায়ের নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি থাকার পরও কি মৌখিক সাক্ষ্য দেয়ার ওপর জোর দেয়া উচিত হবে? এখানে আমি মনে করি এ ক্ষেত্রে আমাদের ইস্তিহ্ছান অবলম্বন করা উচিত, যা আমাদের এসব নতুন ও প্রায় আরো অধিকতর নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্যের পদ্ধতির ওপর অগ্রাধিকার প্রদান করবে। এর অর্থ হবে নতুন পরিস্থিতির আলোকে অধিকতর যথার্থ বলে বিবেচিত বিকল্প বিধানের অনুকূলে সাক্ষ্যের প্রতিষ্ঠিত বিধান থেকে সরে যাওয়া। এ ইস্তিহ্ছানের যুক্তি হবে সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য আইনের সাক্ষ্য প্রয়োজন নিজের কারণে মৌখিক সাক্ষ্য নয়। যদি এটি আইনের প্রকৃত চেতনা হয়ে থাকে তাহলে ইস্তিহ্ছান অবলম্বন এ চেতনাকে সমুন্নত করতে উত্তম উপায় হিসেবে কাজ করতে পারে।

ফকিহ্গণ ইস্তিহ্ছানের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞার ব্যাপারে একমত নন। হানাফীগণ সার্বিকভাবে আবুল হাসান আল কারখীর (মৃত্যু : ১৪০/৯৪৭) দেয়া সংজ্ঞাকে গ্রহণ করেছেন। তারা একে সঠিক ও ব্যাপকভিত্তিক বলে মনে করেছেন। এ সংজ্ঞা অনুযায়ী ইস্তিহ্ছান হচ্ছে একটি মূলনীতি, যা প্রতিষ্ঠিত পূর্বের দৃষ্টান্ত থেকে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অনুকূলে সরে যাওয়ার কর্তৃত্ব প্রদান করেছে, কারণ তা ওই দৃষ্টান্ত থেকে প্রাপ্ত রায়ের চেয়ে শক্তিশালী। এ উদ্ধৃতি প্রদানকালে আল সারাখসী বলেন যে, ইস্তিহ্ছানের দ্বারা পরিহার করা দৃষ্টান্ত সাধারণত প্রতিষ্ঠিত ইজমার ভিত্তিতে গঠিত হয়, যা উচ্চতর দলিল যেমন– কুরআন, সুন্নাহ্, প্রয়োজনীয়তা (জরুরাত) অথবা অধিকতর শক্তিশালী কিয়াসের দ্বারা পরিত্যাজ্য হতে পারে।[১০]

হাম্বলী সংজ্ঞায়ও ইস্তিহ্ছানকে কুরআন ও সুন্নাহর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। ইবনে তাইমিয়ার মতে, ইস্তিহ্ছান হচ্ছে একটি আইনগত বিধান

www.pathagar.com

(হুকম) বর্জন করে আরেকটিকে গ্রহণ করা, যেটি কুরআন, সুন্নাহ্ বা ইজমার ভিত্তিতে বেহেতর বা উত্তম বলে বিবেচিত হয়।[১১]

মালেকী ফকিহ্গণ ইসলাহকে (জনস্বার্থের বিবেচনায়) ইস্তিহ্ছানের ওপর এবং ইস্তিহ্ছান সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ওপর ততটা গুরুত্ব আরোপ না করা সত্ত্বেও নীতিগতভাবে তারা একে বৈধতা প্রদান করেছেন। তবে মালেকীদের দৃষ্টিকোণ থেকে ইস্তিহ্ছান হচ্ছে একটি ব্যাপকভিত্তিক মূলনীতি যা অনেকটা ইসতিসলাহ এর অনুরূপ, তবে তা হানাফী ও হাম্বলীগণের মতের মতো কুরআন সুন্নাহর সাথে অতো ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত নয়। তাই দেখা যায় যে, ইবনে আল আরাবির মতে, ইস্তিহ্ছান হচ্ছে আইনের প্রয়োজনে ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন বর্জন করা। কারণ ওই আইন প্রয়োগ করা হলে তার নিজস্ব উদ্দেশ্যের কিছু পরিত্যাজ্য হবে। ইবনে আল আরাবি বলেন যে, ইস্তিহ্ছানের সার কথা হচ্ছে, দু'টি নির্দেশনার (দলিলাইন) মধ্য থেকে শক্তিশালীটির ওপর আমল করা। অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমগণ কঠোরতার কারণে সমালোচিত হয়েও যে ক্ষেত্রে কিয়াসকেই বহাল রেখেছেন, মালিক ও আবু হানিফা মাসলাহা ও অন্যান্য দলিলের ভিত্তিতে কিয়াসকে বর্জন অথবা কিয়াসের সাধারণ দিকটিকে সুনির্দিষ্ট করেছেন।[১২]

এসব সংজ্ঞার মধ্যে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে, যা আমাদের আলোচনার গতিধারায় পরিষ্কার হয়ে যাবে বলে আশা করছি। তবে এটি স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলোর সবগুলোতেই ইস্তিহ্ছানের অভিন্ন বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, জোরালো কারণ থাকায় বর্তমান আইনের উদাহরণ পরিত্যাগ করা হয়। আবু জাহরাহর মতে, হানাফীগণ আল কারখীর সংজ্ঞাকে গ্রহণ করেছেন, কারণ এতে ইস্তিহ্ছানের সব রূপের মধ্যেই তার সারকথাটি প্রকাশ পেয়েছে। আবু জাহরাহর মতে, ইস্তিহ্ছানের মূলকথা হচ্ছে এমন একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, যা একটি প্রতিষ্ঠিত কিয়াসকে পরিত্যাগ করে কারণ এ ধরনের বর্জন যুক্তিসঙ্গত এবং এতে শরিয়াহর উচ্চতর মূল্যবোধ সমুন্নত করার চেষ্টা করা হয়।[১৩]

ইস্তিহ্ছানে বিকল্প বিধানের পক্ষে প্রতিষ্ঠিত বিধান পরিত্যাগের বিষয় প্রকাশ্য কিয়াস (কিয়াসে জলী) থেকে লুকায়িত কিয়াস (কিয়াসে খফি) অথবা নসে (কুরআন বা সুন্নাহ) প্রদত্ত বিধান থেকে ইজমা ইত্যাদি। প্রচলিত রীতি বা জনস্বার্থের অনুকূলে হতে পারে। কুরআন অথবা সুন্নাহ কোনোটিতেই ইস্তিহ্ছানের পক্ষে কোনো সরাসরি কর্তৃত্ব নেই। কিন্তু ফকিহ্গণ এর পক্ষে তাদের যুক্তি হিসেবে উভয়ের থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। অন্যদিকে ইস্তিহ্ছানের বিরোধীরা যুক্তি দেন যে, ইস্তিহ্ছান শরিয়াহর মনোনীত থেকে একটি বিচ্যুতি বুঝায়। এটি হচ্ছে মানব পছন্দের একটি আদর্শ চর্চা; যা অবতীর্ণ খোদায়ী বিধানের ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল থাকার

www.pathagar.com

কর্তব্যের পথ থেকে আমাদের বিচ্যুত করে। উভয়পক্ষ তাদের যুক্তির সমর্থনে কুরআন ও সুন্নাহর থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করেছে। তারা এরূপ করতে পেরেছে এ কারণে যে, সার্বিকভাবে কুরআনের আয়াতে এ বিষয়টির ওপর বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার সুযোগ রয়েছে।

হানাফী ফকিহগণ প্রধানত কুরআনের দু'টি আয়াত উদ্ধৃত করেছেন। উভয় আয়াতে মূল শব্দ হাসুনা-এর একটি রূপভেদ রয়েছে এবং তাতে মুমিনদের সর্বোত্তম যা কিছু শুনেছে, লাভ করেছে তা অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে :

১. যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং তার উত্তম (আহসানাহু) দিকগুলো অনুযায়ী আমল করে, এরাই সেই সব লোক যাদের আল্লাহ হেদায়েত দিয়েছেন। আর এরাই বুদ্ধিমান (সুরা জুমার, ৩৯ : ১৮)।

২. আর অনুসরণ কর তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে পাঠানো কিতাবের উত্তম নির্দেশগুলো (আহসান) (সুরা জুমার, ৩৯ : ৫৫)।

প্রথম আয়াতের কাউল ('শাব্দিক' অর্থ 'শব্দ' বা 'কথা') দ্বারা আল্লাহ তায়ালার বাণী বা অন্য কারোর কথা বুঝানো হতে পারে। যদি এর দ্বারা আল্লাহর বাণী বুঝানো হয়ে থাকে, এটিই হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে, কেউ কি আল্লাহর বাণী যা আহসানের (সর্বোত্তম) বিপরীত বা কেবল হাসানের (উত্তম) মধ্যে কোনো পার্থক্য করতে পারে কি না। কতিপয় বিশ্লেষক বলেন, এখানে উচ্চতর বিধি ও সাধারণ আচরণবিধির মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, অপরাধীকে শাস্তি প্রদান হচ্ছে শরিয়াহর একটি সাধারণ নির্দেশনা, কিন্তু অনেক সময় ক্ষমা অধিকতর পছন্দনীয় (আহসান) হতে পারে এবং তাতে উচ্চতর আরচণবিধির প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। অন্যথায় ইস্তিহছানের মৌলিক ধারণার বিষয় কুরআনে দেখতে পাওয়া যায়, যদিও ফিকাহর আলেমগণ একে যে পরিভাষায় উপস্থাপন করেছেন তা সেভাবে পরিবেশিত হয়নি।[১৪]

ইস্তিহছানের সমর্থনে নিম্নোক্ত দু'টি হাদিসও উদ্ধৃত করা হয়েছে :

ما راء المسلمون حسناً فه عند الله حسن

১. মুসলমানরা যাকে ভালো মনে করেন আল্লাহ তায়ালার চোখেও তা ভালো।[১৫]

لا ضرر ولا ضرار في الاسلام

২. ইসলামে কেউ অন্যের ওপর জুলুম করবে না এবং নিজেও জুলুমের শিকার হবে না।[১৬]

www.pathagar.com

ইস্তিহ্ছানের সমালোচকরা যুক্তি দেন যে, ওপরের কোনো উদ্ধৃতিই এ মতের সমর্থনে কোনো সুনির্দিষ্ট কর্তৃত্ব প্রদান করেনি। কুরআনের দু'টি আয়াতের প্রথমটির কথাই ধরুন, আল আমিদী বলেছেন, এতে যারা যেসব কথা শুনেছে তার মধ্য থেকে সর্বোত্তমটি অনুসরণ করেছে তাদের নিছক প্রশংসা করা হয়েছে। এ আয়াতে 'সর্বোত্তম কথা' মেনে চলাকে একটি আবশ্যকীয় কর্তব্য মনে করার কোনো নির্দেশনা নেই। না দ্বিতীয় আয়াতে অবতীর্ণ ওহির মধ্য থেকে কারোর জন্য সর্বোত্তম পথ অনুসন্ধানকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। খোদায়ী বিধানের উৎসসমূহে কোনো আদেশ দেয়া হলে তা ওহির মধ্যকার সর্বোত্তম আদেশ বা অন্য ধরনের হোক না কেন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তা অনুসরণ করা হবে বাধ্যতামূলক।[১৭] 'মুসলমানরা যা ভালো মনে করে, আল্লাহ্ তায়ালার দৃষ্টিতে তা ভালো।' এ হাদিস সম্পর্কে আল গাজ্জালী ও আমিদী উভয়ই এ মত প্রকাশ করেন যে, যদি এতে কোনো কিছুর কর্তৃত্ব প্রদান করা হয় তাহলে তা হবে মতৈক্য (ইজমা)। এ হাদিসে এমন কোনো কথা বলা হয়নি যে কোনো মুসলিম ব্যক্তি যা ভালো মনে করে আল্লাহ্ তায়ালার দৃষ্টিতেও তা ভালো, আসলে এ ধরনের কথা বলা অযৌক্তিক।[১৮]

ইস্তিহ্ছানের সমালোচকরা আরো বলেন, কতিপয় জরুরি পরিস্থিতির নিষ্পত্তির লক্ষ্যে হানাফী ফকিহগণ প্রাথমিকভাবে এই তত্ত্ব প্রবর্তন করেন। এবং হানাফীরা তাদের এ পদক্ষেপকে যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ করতে এর সপক্ষে কুরআন ও হাদিসের উদ্ধৃতি প্রদান করেন। অন্য কথায় ইস্তিহ্ছানের কুরআনিক ভিত্তি দুর্বল এবং সুন্নাহতেও এর সপক্ষে সুস্পষ্ট কর্তৃত্বের বিষয় দেখতে পাওয়া যায়নি।[১৯]

ইস্তিহ্ছানের ঐতিহাসিক উৎপত্তির বিষয়টিও অনেকটা অনিশ্চিত। Goldziher-এর মতে আবু হানিফা সর্বপ্রথম একে প্রবর্তন করেন এবং একে বিচারিক অর্থে প্রয়োগ করেন। Joseph Schacht-এর মতে আবু হানিফার শিষ্য আবু ইউসুফ ইস্তিহ্ছান প্রবর্তন করেন। ফজলুর রহমান Golziher-এর মতকে সমর্থন করেন। তিনি মনে করেন যে আবু হানিফার আরেক শিষ্য আল শাইবানী অনেক ঘটনায় ইস্তিহ্ছানের ব্যাপারে আবু হানিফার অবদানের কথা উল্লেখ করেছেন এবং এতে বিষয়টি আরো শক্তিশালী হয়েছে।[২০]

রায়, কিয়াস ও ইস্তিহ্ছান

রায় ও কিয়াসের সাথে ইস্তিহ্ছান ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। ইতোমধ্যে বলা হয়েছে যে, প্রথমত ইস্তিহ্ছান সচরাচর একটি কিয়াস থেকে সরে যাওয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং এখানে বর্জন অর্থে সাধারণত একটি কিয়াসের ওপরে আরেকটি কিয়াসকে অগ্রাধিকার প্রদান করা বুঝায়। ব্যাপকার্থে বলতে গেলে, কিয়াস হচ্ছে একই ধরনের

www.pathagar.com

ঘটনার ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহর (অথবা এমনকি ইজমার) মূল বিধানের যৌক্তিক সম্প্রসারণ; কেননা ওই ঘটনা সম্পর্কে এসব সূত্রে সরাসরি কোনো বিধান পাওয়া যায়নি। এভাবে কিয়াস মানব যুক্তির চর্চার মাধ্যমে খোদায়ী বিধানের যুক্তিপূর্ণ সম্প্রসারণ করে। অন্যকথায় বলা যায় যে, কিয়াসে খোদায়ী বিধানের আনুপাতিক যুক্তিপূর্ণ উপাদান রয়েছে যার অধিকাংশ বিষয় ব্যক্তিগত অভিমত (রায়) অবলম্বনে গঠিত হয়েছে। ইস্তিহছানের ক্ষেত্রেও এটি সত্য যে, তা রায়র ওপর এমনকি এর চেয়েও অনেক বেশি পরিমাণে নির্ভরশীল। কিয়াস ও ইস্তিহছান উভয়ই ব্যক্তিগত অভিমতের ভিত্তিতে গঠিত হয়েছে এবং তাদের যৌক্তিকতার এ প্রবণতা শাফেয়ী ও অন্যদের সমালোচনার মূল টার্গেটে পরিণত হয়েছে। তাই দেখা যাচ্ছে যে, ইস্তিহছানের বৈধতার বিষয়ে বিতর্ক কিয়াসের বৈধতার ব্যাপারে যে ধরনের বিতর্ক দেখা দিয়েছিল তার অনুরূপ।[২১] অবশ্য কুরআন ও সুন্নাহর সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচিতির কারণে কিয়াস ইসলামি আইন বিজ্ঞানের একটি মূলনীতি হিসেবে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কিয়াস ও ইস্তিহছান উভয়ই আইন ব্যবস্থায় যৌক্তিক প্রবণতা প্রকাশের একটি বিষয় বলে বিবেচিত হয়েছে যাকে অবশ্যই খোদায়ী বিধানের মূলের (আসল) সাথে নিজেদের ঘনিষ্ঠ পরিচিতি বজায় রাখতে হবে। এ বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে শরিয়াহর বৈধতার প্রশ্নটি অথবা শরিয়াহর বিকাশে ব্যক্তিগত অভিমত (রায়) অবলম্বনের যথার্থতা।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দেখা যাবে যে, সাহাবিগণ রা. ব্যক্তিগত অভিমত অবলম্বনের ক্ষেত্রে সুন্নাহর বিনিময়ে রায় চর্চা না করার ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন। সুন্নাহর সম্ভাব্য লঙ্ঘনের ব্যাপারে তাদের এ উদ্বেগ সবচেয়ে বেশি ছিল সেসব দিনগুলোতে যখন হাদিস না সংকিলত হয়েছিল না সংহত হয়েছিল। উমাইয়া যুগে ইসলামি রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সম্প্রসারণ এবং হাদিস বিশারদ ফকিহ ও সাহাবিগণের রা. বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ার কারণে সরাসরি তাদের কাছে পৌঁছানো ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ে। সুন্নাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কার কারণে ফকিহগণের নেতৃত্বে কতিপয় বিধান প্রণীত হয় যাতে অবাধে রায় অবলম্বনের ওপর কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। রায়ের বৈধতা লাভের জন্য তাকে অবশ্যই শরিয়াহর মূলনীতি থেকে কর্তৃত্ব গ্রহণ করতে হবে এবং কুরআন ও সুন্নাহতে এর ব্যাখ্যা থাকতে হবে বলে ফকিহগণ নিয়ম করে দেন। এ ছিল কিয়াসের সূচনাবিন্দু যা ছিল প্রাথমিকভাবে রায়ের সুশৃঙ্খল রূপ। অবশ্য ইসলামি আইনশাস্ত্রের গঠন পর্যায়ে অপেক্ষাকৃত উদার ধরনের রায়ের চর্চা শুরু হয় এবং ইতঃপূর্বে ফকিহদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে উল্লেখযোগ্য মতপার্থক্য দেখা দেয়। যারা ঘনিষ্ঠভাবে হাদিস অনুসরণের আহ্বান জানান তাদের বলা হয়, আহল আল হাদিস। তারা মক্কা শরিফ ও মদিনা মনোয়ারার মতো পবিত্র নগরীতে বসবাস করতেন। আহল আল হাদিস সুন্নাহকে

www.pathagar.com

কুরআনের সম্পূরক বলে মনে করতেন। তারা সুন্নাহকে কঠোরভাবে মেনে চলার ওপর জোর দিতেন। তাদের দৃষ্টিতে এটি ছিল ইমানের একটি মৌলিক শর্ত। তারা যুক্তি দেখাতেন যে, ইমান গ্রহণ হতে হবে যৌক্তিকতা ও এর হুকুমের কোনো কারণ (তালিল) উল্লেখ ছাড়াই গভীর বিশ্বাসের ভিত্তিতে। অন্য কথায়, তারা ছিলেন আক্ষরবাদী এবং শরিয়াহর বিধানের মৌলিক যুক্তি পেশের ব্যাপারে মুজতাহিদদের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করতেন। যখন তারা কোনো সমস্যার ব্যাপারে উৎসগুলো স্পষ্ট নির্দেশ দেখতে পেতেন না তখন তারা নীরব থাকাকে পছন্দ করতেন এবং রায় অবলম্বন পরিহার করতেন। তারা একে খোদা পরস্তির নির্যাস বলে বিবেচনা করতেন এবং আল্লাহর কাছে বিনা প্রশ্নে আত্মসমর্পণ করেতন।[২২]

অন্যদিকে ইরাকের ফকিহগণ অধিকতর উদারতার সাথে ব্যক্তিগত অভিমত অবলম্বন করতেন। এ কারণে তারা আহল আল রায় বলে পরিচিতি লাভ করেন। তাদের মতে, শরিয়ত হুকমের কারণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। তাই তারা শরিয়াহর হুকমের অর্থ ও চেতনা উভয়ের আলোকে আইনগত সমস্যা সমাধানে তাদের প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করতে মোটেই দ্বিধা করতেন না। এভাবে আহল আল রায় প্রায় কিয়াস ও ইস্তিহছানের আশ্রয় গ্রহণ করতেন বলে জানা গেছে। পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে ইস্তিহছানে আইন বা ধর্মীয় বিষয়ে ফকিহগণের অবাধে রায় চর্চা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যাবে। ইস্তিহছানের ওপর কোনো ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ, যেমন- ইস্তিহছানকে একটি কৌশল প্রয়োগ পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করার চেষ্টা, মৌলিকভাবে যার লক্ষ্য হচ্ছে রায় ও আক্ষরিক অর্থ প্রয়োগের চলমান বিতর্কের ভারসাম্যকে পরেরটির দিকে ঝুঁকিয়ে দেয়া। তথাপি যারা ইস্তিহছানকে প্রধানত যুক্তিবাদী তত্ত্ব বলে বিবেচনা করেন তারাও এর ওপর বিধিনিষেধ আরোপের ব্যাপারে আপত্তি করেন কারণ তা এর যুক্তিবাদী উপাদানকে নষ্ট করবে এবং ইস্তিহছানকে কিয়াসের নিছক একটি উপবিভাগে পরিণত করবে।

যদিও উসুল আল ফিকহের সনাতনী তত্ত্বেও মৌনভাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে যে, কোনো কোনো ঘটনার ক্ষেত্রে কিয়াসে অবিচার হয়ে থাকতে পারে, সে ক্ষেত্রে ইস্তিহছান অবলম্বন অনুমোদনযোগ্য। অবশ্য এর অর্থ এ নয় যে, 'মানব যুক্তির সার্বভৌম ভূমিকা রয়েছে।' সে কারণে কুরআন বা সুন্নাহতে সুনির্দিষ্ট বিধানের অনুপস্থিতিতে ইস্তিহছান ও মাসলাহাকে অত্যন্ত কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।[২৩]

কিয়াস জলি, কিয়াস খফি ও ইস্তিহছান

কিয়াস জলি বা 'প্রকাশ্য বা স্পষ্ট কিয়াস' হচ্ছে সহজবোধ্য কিয়াস যা সহজে মনে বোধগম্য হয়। এ ব্যাপারে প্রায়ই যে উদাহরণ দেয়া হয়, তাহলো, মদ ও মাদকতা

www.pathagar.com

সৃষ্টিকারী অন্য বস্তু, যেমন- হার্বাল পানীয়, উভয়ের মধ্যকার অভিন্ন কার্যকারণ (ইল্লত) হচ্ছে উন্মত্ততা। তাই মদ হারাম হওয়ার বিধান কিয়াসের মাধ্যমে আলোচ্য পানীয়র ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। কিন্তু কিয়াস খফি বা 'লুকায়িত কিয়াস' হচ্ছে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ধরনের কিয়াস এ অর্থে যে খোলা চোখে তা স্পষ্ট নয় বরং অন্তর্দৃষ্টি ও গভীর চিন্তাভাবনীর মাধ্যমে কেবল তা বোধগম্য হয়ে থাকে। কিয়াস খফিকে ইস্তিহ্ছান বা কিয়াস মুস্তাহশানও (অধিকতর শ্রেয় কিয়াস) বলা হয়ে থাকে। এ কিয়াস দুর্দশা দূর করার ক্ষেত্রে কিয়াস জলির চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী। কারণ সাদৃশ্যের বাহ্যিক পর্যবেক্ষণ থেকে নয় বরং গভীর অন্তর্দৃষ্টি, চিন্তাভাবনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে এটি নির্ধারিত হয়।

সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহ্গণের মতে, ইস্তিহ্ছান কিয়াস জলি ও কিয়াস খফি থেকে সরে গিয়ে ভিন্নভাবে গঠিত হয়। কোনো ফকিহ্ যখন কোনো সমস্যার সম্মুখীন হন এবং সুনির্দিষ্ট আয়াত বা হাদিসে (নস) তার সমাধান খুঁজে পান না তখন তিনি কিয়াসে তার দৃষ্টান্ত অনুসন্ধানের মাধ্যমে তা সমাধানের চেষ্টা করেন। তার এ বিকল্প অনুসন্ধানের দু'টি ভিন্ন সমাধান পাওয়া যেতে পারে, তার একটি স্পষ্ট কিয়াসের ভিত্তিতে অন্যটি লুকায়িত কিয়াসের ভিত্তিতে। এ দুইয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ থাকলে তাকে লুকায়িত কিয়াসের সমর্থনে স্পষ্ট কিয়াস অবশ্যই বর্জন করতে হবে, কারণ লুকায়িত কিয়াস অধিকতর কার্যকর বলে বিবেচনা করা হয়। তাই তা স্পষ্ট কিয়াসের ওপর অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। এটি হচ্ছে এক ধরনের ইস্তিহ্ছান। কিন্তু আরেক ধরনের ইস্তিহ্ছানও রয়েছে, যা প্রধানত প্রচলিত আইনের সাধারণ বিধির ব্যতিক্রমী হিসেবে গঠিত হয়। ওই ক্ষেত্রে যখন কোনো বিচারকের মনে এ দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে যে, এ ধরনের ব্যতিক্রমী করা হলে সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার উদ্দেশ্য আরো ভালোভাবে অর্জিত হবে। বিচারকের ব্যক্তিগত ইজতিহাদের ফলে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে থাকতে পারেন অথবা নিম্নোক্ত যে কোনো একটি বিষয় থেকে ইতোমধ্যে তা অনুমোদিত হতে পারে: নস, ইজমা, অনুমোদিত রীতিনীতি, জরুরি প্রয়োজন (জরুরিয়াত) অথবা জনস্বার্থ বিবেচনা (মাসলাহা)।[২৪] নিম্নের উদাহরণগুলো এসব বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। এখানে যেসব নির্বাচিত উদাহরণ দেয়া হয়েছে তাতে ফিকহর বিকাশে ইস্তিহ্ছান যে ভূমিকা পালন করেছে তা আরো স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাবে :

১. কিয়াস জলি ও কিয়াস খফি থেকে সরে গিয়ে গঠিত ইস্তিহ্ছানের উদাহরণ হিসেবে ওয়াকফ সম্পর্কে হানাফী আইন উল্লেখ করা যেতে পারে। আবাদি জমি ওয়াকফের (দাতব্য কাজে দান করা সম্পত্তি) মধ্যে রয়েছে সম্পত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট সহায়ক সব অধিকার হস্তান্তর করা।

www.pathagar.com

(তথাকথিত সব ধরনের আরাম-আয়েশ) যেমন- পানির অধিকার (হাক আল কুরব) যাতায়াতের সুবিধা (হাক আল মুরুর) ও প্রবাহের অধিকার (হাক আর মাসিল), এমনকি ওয়াকফ দলিলে এসব কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা না থাকলেও। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে কিয়াস খফির (বা ইস্তিহছানের) ভিত্তিতে। আমি এখন এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করব। ক্রয় চুক্তিসহ চুক্তি সংক্রান্ত ইসলামি আইনের বিধান হচ্ছে, চুক্তির বিষয় অবশ্যই সুস্পষ্ট ভাষায় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে হবে। অন্যকথায় যা চুক্তিতে সুনির্দিষ্ট করা হয়নি তা চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে না। এখন আমরা যদি বিক্রয় চুক্তি ও ওয়াকফের মধ্যে সরাসরি কিয়াস (কিয়াস জলি) করি তাহলে দেখা যায় যে, উভয় ক্ষেত্রে মালিকানা হস্তান্তর করা হয়। আমরা অবশ্যই এ উপসংহারে আসতে পারি যে, এদের স্পষ্টভাবে শনাক্ত করা হলে দেখা যাবে যে, সংযুক্তি অধিকার কেবলমাত্র ওয়াকফতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অবশ্য যুক্তি দেখানো হয় যে, এ ধরনের কিয়াস অন্যায্য ফলাফলের পথ প্রশস্ত করবে। সহায়ক অধিকার ছাড়া আবাদযোগ্য জমির ওয়াকফ করা হলে ওয়াকফের মৌলিক উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে- আর তা হলো, সেবামূলক কাজের উদ্দেশ্যে এ সম্পত্তির ব্যবহারের সুযোগ করে দেয়া। কষ্ট বা দুরবস্থা লাঘবের লক্ষ্যে এ ক্ষেত্রে একটি বিকল্প কিয়াস, যেমন- কিয়াস খফি অবলম্বন করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রে লুকায়িত কিয়াসে ওয়াকফর সাথে বিক্রয় চুক্তি নয় বরং ইজারার চুক্তির সাথে তুলনা করা হয়। উভয় ক্ষেত্রে ভোগের অধিকার (ইনতিফা) হস্তান্তর করা হয়েছে। ইজারার অত্যাবশ্যকীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে ভোগদখল। একটি হাদিসে একে বৈধতা দেয়া হয়েছে। এমনকি তাতেও ভোগদখলের কথা উল্লেখ করা হয়নি। ইজারার সাথেও বিকল্প কিয়াস আমাদের এ কথা বলতে সক্ষম করবে যে, এমনকি সম্পত্তির সংযুক্ত অধিকারের বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা না হলেও ওয়াকফ বৈধভাবে সম্পন্ন হতে পারে।

এর আরেকটি উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ধরুন ক ৪০ হাজার পাউন্ড মূল্যে একক লেনদেনের মাধ্যমে খ এবং গ-এর কাছ থেকে কিস্তির ভিত্তিতে একটি বাড়ি কিনল। ক প্রথম কিস্তিতে খ-কে দুই হাজার পাউন্ড দিলো এ কথা মনে করে যে, সে গ-এর অংশ তার কাছে হস্তান্তর করবে। কিন্তু তার আগে খ দুই হাজার পাউন্ড হারিয়ে ফেলে, এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ হারানোর ক্ষতি কে বহন করবে? কিয়াস জলি প্রয়োগ করলে খ ও গ কে ক্ষতির অংশীদার হতে হবে কারণ খ কেবল নিজের তরফ থেকে নয় অংশীদার হিসেবে দু'জনের জন্য ওই অর্থ গ্রহণ করেছিল। অন্য কথায় প্রথমত,

অংশীদার হিসেবে সমমর্যাদার কারণে ক্ষতির অংশীদার হিসেবে তাদের অবস্থান সমান। কিন্তু ইস্তিহছান প্রয়োগ করা হলে কেবল অর্থ গ্রহণকারী খ এ লোকসানের ভাগীদার হবে। অংশীদার হওয়া সত্ত্বেও গ, খ-এর কাছ থেকে দুই হাজার পাউন্ড থেকে তার অংশগ্রহণ করার কোনো বাধ্যবাধকতা মৌলিকভাবে গ-এর নেই। এটি কেবলমাত্র তার অধিকার/সুবিধা। তবে দাবি ছেড়ে দেয়ার স্বাধীনতা তার রয়েছে। এর ফলে দুই হাজার পাউন্ডের কিস্তির মধ্যে গ-এর অংশ মূল্যের অবশিষ্ট পাওনার (বা ঋণের) অংশে পরিণত যা উভয়ের কাছে ক ঋণী রয়েছে। তাই দেখা যাচ্ছে যে, কেবল খ ক্ষতির ভাগীদার হবে। লুকায়িত কিয়াসের ভিত্তিতে এ সমাধান অর্জিত হয়েছে। আর তা হলো, যার কোনো দায়দায়িত্ব নেই তাকে কোনো পরিণতির দায়ভার গ্রহণ করতে হবে না।[২৫]

২. দ্বিতীয় প্রকারের ইস্তিহ্ছান বিদ্যমান আইনের সাধারণ বিধির ব্যতিক্রমী হিসেবে গঠিত হয়। কারণ এ জন্য অনেকে একে বলেছেন, ব্যতিক্রমী ইস্তিহছান (ইস্তিহছান ইস্তিহছনাই) যা সাদৃশ্যপূর্ণ ইস্তিহছানের (ইস্তিহছান কিয়াসী) বিপরীত। পরেরটি একটি কিয়াস পরিত্যাগ করে অন্য একটি কিয়াস গ্রহণের মাধ্যমে ইহা গঠিত হয়।[২৬] এ দুইয়ের মধ্যে ব্যতিক্রমী ইস্তিহছানকে অধিকতর শক্তিশালী বলে বিবেচনা করা হয়। কারণ তা আরেকটি স্বীকৃত উৎসের বিশেষ করে কুরআন বা সুন্নাহর সমর্থন লাভ করে। বিভিন্ন মাজহাবের বিশেষজ্ঞ আলেমগণ স্বাভাবিকভাবে প্রাথমিক উৎসের সমর্থন প্রাপ্ত ইস্তিহছানের বৈধতার ব্যাপারে একমত; তবে কেবলমাত্র কিয়াস খফির ভিত্তিতে গঠিত ইস্তিহছানের বৈধতার বিষয়ে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। বস্তুতপক্ষে কিয়াস খফির ভিত্তিতে গঠিত ইস্তিহছানের ওপরই ইস্তিহছান সংক্রান্ত সব বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।[২৭] এ ক্ষেত্রে আরো কয়েকটি বিষয় রয়েছে, যা ব্যতিক্রমী ইস্তিহছানের কর্তৃত্ব প্রদান করে, তা হয় নস বা স্বীকৃত অন্য যে কোনো একটি দলিল, যেমন- ঐকমত্য বা ইজমা, জরুরি প্রয়োজন (জরুরিয়াত), প্রচলিত রীতি (উরফ বা 'আদাহ) ও জনস্বার্থ (মাসলাহা)। আমরা নিম্নে এর প্রতিটি বিষয় পৃথকভাবে আলোচনা করব :

২.১. কুরআনের নসের ভিত্তিতে ব্যতিক্রমী ইস্তিহছানের একটি উদাহরণ হলো আত্মীয়স্বজনের জন্য অসিয়ত করা : 'তোমাদের কারোর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে এবং সে ধন সম্পত্তি ত্যাগ করে যেতে থাকলে পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনদের জন্য প্রচলিত ন্যায়নীতি অনুযায়ী অসিয়ত করে যাওয়াকে তার জন্য ফরজ করা হয়েছে' (সুরা আল বাকারা, ২ : ১৮০)।

www.pathagar.com

কুরআনের এ বিধান শরিয়াহর সাধারণ মূলনীতির একটি ব্যতিক্রম যেমন- অসিয়ত করা মৌলিকভাবে জায়েজ নয়, যেহেতু অসিয়ত কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার সম্পত্তির বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করে। সে কারণে তাকে এ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার অনুমতি দেয়া হয়নি। জীবদ্দশায় কোনো ব্যক্তি অসিয়ত করে গেলে তা হবে মৃত্যুর পর তার ওয়ারিশদের অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করার শামিল যা নাজায়েজ। অবশ্য কুরআন সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হিসেবে অসিয়ত করাকে অনুমোদন করেছে, যা করা হয়েছে ব্যতিক্রমী ইস্তিহ্ছানের মাধ্যমে। এতে ব্যতিক্রমী বিষয়ের অনুকূলে সাধারণ নিয়মকে পরিহার করা হয়েছে। পরিবারের মধ্যে সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টনের কথা চিন্তা করে এ ব্যতিক্রমী বিষয় অনুমোদন করা হয়েছে। বিশেষ করে যেসব ক্ষেত্রে দুস্থ আত্মীয়স্বজন রয়েছে কিন্তু অন্যান্য ওয়ারিশদের উপস্থিতির কারণে তাদের উত্তরাধিকারী হওয়ার বিষয় বাতিল হয়ে গেছে।[২৮]

২.২. সুন্নাহর ভিত্তিতে ব্যতিক্রমী ইস্তিহ্ছানের উদাহরণ হিসেবে ইজারা চুক্তির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। শরিয়াহর আইনের চুক্তির সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী চুক্তির সময় বর্তমান ছিল না এমন জিনিস নাও বিক্রি করা যেতে পারে। চুক্তি সম্পাদনের সময় সাধারণত যে জিনিস ছিল না তা (ভাড়ার বিনিময়ে) বিক্রি করা হলেও ইজারা বৈধতা হারাবে না। কারণ কিয়াস ইজারাকে অকার্যকর করে দিলেও ইস্তিহ্ছান ব্যতিক্রমীভাবে সুন্নাহর (ওই ইজমা) ভিত্তিতে তাকে বৈধতা প্রদান করে যা কিয়াসের চেয়ে শক্তিশালী এবং কিয়াস পরিহারকে যথার্থ প্রতিপন্ন করে।[২৯]

অনুরূপভাবে চুক্তি বাতিল করার সুযোগে (খিয়ার আল শার্ত) ব্যতিক্রমী ইস্তিহ্ছানের বিষয় প্রতিফলিত হয়েছে। এর পক্ষে সুন্নাহর সমর্থন রয়েছে। কোনো ব্যক্তি একটি জিনিস খরিদ করার সময় এ শর্ত আরোপ করে যে, সে আগামী তিন দিন বা এমন এক মেয়াদের মধ্যে এ চুক্তি বাতিল করতে পারবে। এ বিষয়টি শরিয়াহর চুক্তি আইনের সাধারণ নিয়মের পরিহার বোঝাচ্ছে। তাতে বলা হয়েছে, চুক্তি সম্পাদনের পর তা বাধ্যতামূলক হবে। এ হাদিসের ভিত্তিতে ইস্তিহ্ছানের মাধ্যমে এ আইনের ব্যতিক্রম করা হয়েছে। হাদিসে বলা হয়েছে :

قوله عليه الصلاة والسلام: إذا بايعت فقل

www.pathagar.com

لا خلابة ولى الخيار ثلاثة أيام

যখন তুমি চুক্তির শর্তাবলির ব্যাপারে একমত হবে তখন বলবে, এটি বাধ্যতামূলক নয় এবং আমি এ ব্যাপারে তিন দিন সময় চাই।[৩০]

২.৩. ইজমার ভিত্তি গঠিত ব্যতিক্রমী ইস্তিহ্ছানের উদাহরণ হিসেবে আমরা ইস্তিশনা বা পণ্য তৈরি চুক্তির বিষয় উল্লেখ করতে পারি। এ ধরনের ইস্তিহ্ছান গঠন করতে হয় তখন যখন কোনো ব্যক্তি কিছু পণ্য তৈরির জন্য কারিগরের কাছে ফরমায়েশ দেয় যার দাম চুক্তির সময়ে নির্ধারিত হয়। ইস্তিহ্ছান এ লেনদেন অনুমোদন করে যদিও ফরমায়েশ দেয়ার সময় ওই বস্তুর কোনো অবস্থান ছিল না। এ ধরনের ইস্তিহ্ছান প্রচলিত রীতির সমর্থনের সঙ্গে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ। এ বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব।[৩১]

২.৪. জরুরি প্রয়োজনের (জরুরিয়াত) ভিত্তিতে গঠিত ব্যতিক্রমী ইস্তিহ্ছানের উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায় নাপাক দূষিত কূপের পানি পাক করার পদ্ধতিতে। কোনো কূপ বা পুকুরের পানিতে নাপাক দ্রব্য পড়লে তো নাপাক হয়ে যাবে এবং তা আর ওজুর কাজে ব্যবহার করা যাবে না। এ কথা বলা দরকার যে, কূপের পানির যে অংশটুকু নাপাক তা সরিয়ে কূপের পানি কোনোভাবে পাক করে ফেলা সম্ভব নয়। কারণ এতে যে পানি প্রবাহিত হয় তার সাথে অব্যাহত সংযোগ বজায় থাকে। ইস্তিহ্ছানের মাধ্যমে এর একটি সমাধান পাওয়া গেছে। যাতে বলা হয়েছে, কূপ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি অপসারণ করলে তা পাক হয়ে যাবে। ধরুন, ১০০ বালতি পানি (কত বালতি পানি অপসারণ করতে হবে তার সঠিক সংখ্যা নির্ভর করছে নাপাকির ধরন ও মাত্রার ওপর)। এ ক্ষেত্রে ইস্তিহ্ছানকে প্রয়োজন ও জনগণের কষ্ট দূর করার কারণের ভিত্তিতে অনুমোদন করা হয়েছে।[৩২]

অনুরূপভাবে কঠোর কিয়াস অনুযায়ী সব ক্ষেত্রে সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে অবশ্যই 'আদল', অর্থাৎ সৎ ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি হতে হবে। বিচারিক সিদ্ধান্ত অবশ্যই সত্যের ভিত্তিতে হতে হবে এবং তা সৎ সাক্ষীদের সাক্ষ্যের মাধ্যমে প্রদান করা যায়। যদি কাজী এমন স্থানে থাকেন যেখানে 'আদল' সাক্ষী পাওয়া সম্ভব হয় না সে ক্ষেত্রে কাজী ইস্তিহ্ছান অবলম্বনের মাধ্যমে পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয় এমন লোকদের সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করবেন যাতে সৎ লোকদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়।[৩৩]

www.pathagar.com

একইভাবে সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী কাজী হিসেবে একজন মুজতাহিদকে নিয়োগ দিতে হবে, কিন্তু কোথাও যদি মুজতাহিদ না পাওয়া যায়, সে ক্ষেত্রে অমুজতাহিদকে কাজী পদে নিয়োগ দেয়া যেতে পারে।

২.৫. প্রচলিত রীতিনীতির ভিত্তিতে গঠিত ব্যতিক্রমী ইস্তিহ্ছানের উদাহরণ হিসেবে আমরা অস্থাবর ওয়াকফ বস্তুর কথা উল্লেখ করতে পারি। যেহেতু সংজ্ঞা অনুযায়ী সম্পত্তি দান করা হয় স্থায়ী ভিত্তিতে এবং অস্থাবর বস্তু ধ্বংস, নষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত হয় সে কারণে অবস্থাবর বস্তু ওয়াকফ করা হয় না। অবশ্য হানাফী ফকিহ্গণ এ সাধারণ নিয়মকে উপেক্ষা করে জনপ্রিয় রীতিকে গ্রহণ করে বইপত্র, যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্রের মতো অস্থাবর বস্তুগুলো ওয়াকফ করাকে অনুমোদন করেছেন।[৩৪] অনুরূপভাবে কিয়াসের কঠোর বিধান অনুযায়ী বিষয়বস্তুর সঠিক বিবরণ দেয়া ও পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে। অবশ্য জনপ্রিয় রীতি অনুযায়ী গণগোসলখানায় প্রবেশের ক্ষেত্রে এ নিয়ম উপেক্ষিত হয়েছে। ব্যবহারকারীর থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিয়ে গোসলখানায় প্রবেশ করতে হয় এবং তারা কি পরিমাণ পানি ব্যবহার করা হবে অথবা কতক্ষণ সেখানে অবস্থান করবে সে সম্পর্কে কোনো চুক্তির ব্যবস্থা এতে নেই।[৩৫] বায়-আল তায়াতি বা দেয়া-নেয়ার পদ্ধতিতে বিক্রির আরেকটি উদাহরণ হলো, সাধারণ নিয়ম হলো বিক্রির প্রস্তাব দেয়া ও গ্রহণ করার বিষয় মৌখিকভাবে প্রকাশ করতে হবে, কিন্তু প্রচলিত রীতিতে তা অনুসৃত হয় না।

২.৬. এবং সর্বশেষে জনস্বার্থ (মাসলাহা) বিবেচনায় গঠিত ইস্তিহ্ছানের উদাহরণ হিসেবে আমরা নিজ হেফাজতে থাকা পণ্যের ক্ষতির ক্ষেত্রে এর সংরক্ষক বিশ্বাসী ব্যক্তির (আমিন) দায়িত্বের কথা উল্লেখ করতে পারি। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী সংরক্ষকের ব্যক্তিগত ত্রুটি ও অবহেলার (তাকসীর) কারণে এ ক্ষতি বা লোকসান না হলে সে জন্য দায়ী হবে না। তাই একজন দর্জি, জুতা প্রস্তুতকারক বা কারিগর তার হেফাজতে থাকা বস্তুর ক্ষতির জন্য দায়ী হবে না, তা চুরি হোক বা আগুনে পুড়ে যাক। কিন্তু আবু ইউসুফ ও আল শাইবানীর মতো ফকিহ্গণ সাধারণ নীতিকে উপেক্ষা করে ইস্তিহ্ছানের অবলম্বন করে বলেছেন যে, এ ধরনের ক্ষতির ক্ষেত্রে সংরক্ষণকারী দায়ী হবে যদি তা অগ্নিকাণ্ড বা বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে না ঘটে। কারণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। জনস্বার্থের বিষয় বিবেচনা করে এ ইস্তিহ্ছান

www.pathagar.com

করা হয়েছে যাতে সংরক্ষণকারী ও ব্যবসায়ীরা লোকদের সম্পদ রক্ষায় অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করে।[৩৬]

ইস্তিহ্ছান নিয়ে হানাফী-শাফেয়ী মতবিরোধ

ইমাম শাফেয়ী ইস্তিহ্ছানের বিরুদ্ধে মারাত্মক আপত্তি উত্থাপন করেছেন। তিনি একে ধর্মীয় বিষয়ে এক ধরনের খেয়ালখুশি (তালাজ্জুজ ওয়া হাওয়া) ও স্বেচ্ছাচারমূলক আইন বলে মনে করেছেন।[৩৭] একজন মুসলমান সব সময়ই আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুল সা.-এর আনুগত্য করবে এবং সুস্পষ্ট খোদায়ী বিধান (নুসুস) অনুসরণ করবে। কোনো বিষয়ে সমস্যা বা মতবিরোধ দেখা দিলে তারা অবশ্যই তা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তা সমাধান করবে। এ মতের সমর্থনে ইমাম শাফেয়ী (সুরা নিসার, ৪ : ৫৯) থেকে কুরআনের নসের উদ্ধৃতি প্রদান করেন : 'তোমাদের মধ্যে যদি কোনো ব্যাপারে মতবিরোধ সৃষ্টি হয় তাহলে তোমরা তা আল্লাহ ও তার রসুল সা.-এর দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা প্রকৃতই খোদা ও পরকালের প্রতি ইমানদার হয়ে থাক।' ইমাম শাফেয়ী তার গ্রন্থের একই পৃষ্ঠায় আরো বলেন : কোনো ব্যক্তি নস বা নসের কিয়াসের ওপর নির্ভর করে গঠিত ইজতিহাদের ভিত্তিতে কোনো বিধান বা ফতোয়া প্রদান করলে সে তার কর্তব্য পূরণ করল এবং আল্লাহ তায়ালার আদেশ পালন করল। কিন্তু কেউ যদি এমন বিষয় অগ্রাধিকার দেয় যা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুল সা. আদেশ দেননি অথবা অনুমোদন করেননি, তাহলে আল্লাহ বা রাসূলের কাছে তার ওই সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমাম শাফেয়ীর মতে, ইস্তিহ্ছানে একজন ফকিহর ব্যক্তিগত অভিমত, তার স্বেচ্ছাচার বা ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ চর্চার প্রতিফলন ঘটে, যা কুরআনের এ আয়াতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, যাতে বলা হয়েছে : 'মানুষ কী মনে করে নিয়েছে তাদেরকে এমনিতেই ছেড়ে দেয়া হবে?' (সুরা আল কিয়ামাহ, ৭৫ : ১৬)।

মুফাসসিরগণ একমত হয়েছেন যে, এ আয়াতে 'সুদা'র অর্থ হলো এমন আইনহীন অবস্থা যাতে লোকেরা কোনো বিধিবিধান প্রণয়ন, আদেশ বা নিষেধের আওতাধীন থাকে না। এ অর্থের বিষয় স্মরণ রেখে ইমাম শাফেয়ী এ অভিমত প্রকাশ করেন : প্রত্যেক বিচারক ও প্রত্যেক মুফতি যদি নিজ নিজ মত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত প্রদান করতে থাকেন তাহলে সহজেই যে কেউ অনুমান করতে পারেন যে, এ আত্মতুষ্টি ও নৈরাজ্য উম্মতের জীবনকে বিষিয়ে তুলবে। ইস্তিহ্ছান কিয়াসের মতো নয়, কিয়াসের বিষয়বস্তু একটি পদ্ধতিতে পরীক্ষা করা হয়, যাকে অবশ্যই খোদায়ী উৎসের দ্বারা সমর্থিত হতে হবে, কিন্তু ইস্তিহ্ছানের ক্ষেত্রে এ ধরনের নিয়ন্ত্রণের কোনো ব্যবস্থা নেই। যেহেতু ইস্তিহ্ছান নস বা কিয়াসের নসের দ্বারা গঠিত হয়নি এটা মূল্যহীন এবং তা অবশ্যই পরিহার করতে হবে।[৩৮]

www.pathagar.com

এ সমালোচনার জবাবে হানাফীগণ জোর দিয়ে বলেন যে, ইস্তিহ্ছান ব্যক্তিগত অগ্রাধিকারের স্বেচ্ছাচারমূলক কোনো চর্চা নয়। এটি এক ধরনের কিয়াস (যেমন কিয়াস খফি) এবং কিয়াসের চেয়ে কোনো অংশে কম কর্তৃত্বপূর্ণ নয়। তাই দেখা যাচ্ছে যে, এতে শাফেয়ী ফকিহ্গণের অভিযোগের বিপরীতে এ অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে যে ইস্তিহ্ছান আইনের কোনো স্বতন্ত্র উৎস নয় বরং কিয়াসের একটি শাখা এবং শরিয়তে এর দৃঢ় ভিত্তি রয়েছে। এই যুক্তি যদি গ্রহণ করা হয় তাহলে কিয়াসের ক্ষেত্রে যে বিধান রয়েছে ইস্তিহ্ছানের ক্ষেত্রেও তা অবশ্যই প্রযোজ্য হবে এবং ইস্তিহ্ছান নিজ অধিকার বলে তার বিচারিক মূলনীতি হওয়ার মর্যাদা হারাবে। এর ফলশ্রুতিতে ইস্তিহ্ছানের ব্যাপ্তি ও নমনীয়তা নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়বে এবং এর অর্থ হবে ইস্তিহ্ছান প্রধানত ন্যায়পরায়ণতার মূলনীতি থেকে এক ধরনের কিয়াসের দিকে পরিবর্তিত হবে। এতে ইস্তিহ্ছান কেবলমাত্র সেসব বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে যার অনুরূপ বিধান প্রাথমিক উৎসসমূহে পাওয়া যায়। এসব কথা বলার পরও ইস্তিহ্ছান সত্যিই এক ধরনের কিয়াস কি না সে বিষয়েও সংশয় রয়ে গেছে।

আহমদ হাসান এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, ইস্তিহ্ছান কিয়াস খফির চেয়ে অনেক বেশি সাধারণ, কারণ ইস্তিহ্ছান ব্যাপক বিস্তৃত এবং কিয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ বিষয়ের বাইরে তা প্রযোজ্য হতে পারে।[৩৯] Aghnides ও অনুরূপ মত প্রকাশ করে বলেন যে, ইস্তিহ্ছান হচ্ছে নতুন মূলনীতি যা কিয়াসের পরিধির বাইরে বিস্তৃত, বিষয়টি প্রকাশ্যে স্বীকার করা হোক বা না হোক।

> আবু হানিফা ও তার প্রথম দিকের শিষ্যবৃন্দ ইস্তিহ্ছানকে এক ধরনের কিয়াস বলে বিবেচনা করেননি। [...] না কোনো পারিভাষিক অর্থে শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন। এই যদি ঘটনা হয়, তাহলে তার অসংখ্য মতের মতো সম্ভবত এটিও একটি মত হিসেবে লিপিবদ্ধ থাকবে। প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে এই যে, তিনি ইস্তিহ্ছান শব্দটিকে তার স্বাভাবিক অর্থে ব্যবহার করেছেন, তাহলো কোনো মত সামাজিক স্বার্থের অধিকতর অনুকূল বলে মনে হলে তার সমর্থনে কিয়াস পরিত্যাগ করা।[৪০]

Aghnides আরো বলেন যে, যখন শাফেয়ী ফকিহ্গণ ইস্তিহ্ছানে খোদায়ী বিধান উপেক্ষিত হয়েছে বলে সমালোচনা করেন, তখন আবু হানিফার শিষ্যগণ বলেন যে, এ ক্ষেত্রে এমন কিছু করা হয়নি। বরং তারা বলেন ইস্তিহ্ছান এক ধরনের কিয়াস বৈ কিছু নয়। আরেকজন পর্যবেক্ষকের মতে, ইস্তিহ্ছানকে কিয়াসের আওতাধীন আনার চেষ্টা অযৌক্তিক। কারণ, ইস্তিহ্ছান সত্যিকার অর্থে কিয়াসের সংকীর্ণ পরিসীমার বাইরে অবস্থিত; তাই একে আইন প্রণয়নের একটি বিশেষ রূপ হিসেবে অবশ্যই স্বীকৃতি দিতে হবে'।[৪১]

www.pathagar.com

আল গাজ্জালী ভিন্ন কারণে ইস্তিহছানের সমালোচনা করেছেন। তিনি মত প্রকাশ করেন যে, শাফেয়ী ফকিহগণ কুরআন বা সুন্নাহর দলিলের ভিত্তিতে গঠিত ইস্তিহছানের বৈধতাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। যখন এ ধরনের কোনো দলিল থাকবে তখন ওই ঘটনা ইস্তিহছান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না বরং সরাসরি খোদ কুরআন বা সুন্নাহর বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।[৪২] উপরন্তু আল গাজ্জালী বেশ কয়েকটি ঘটনার ব্যাপারে সহিহ্ হাদিস থাকা সত্ত্বেও কিয়াস বা ইস্তিহছানের পক্ষে তা পরিত্যাগ করায় আবু হানিফার সমালোচনা করেছেন।[৪৩] আল গাজ্জালী জনপ্রিয় প্রচলিত রীতিনীতির ভিত্তিতে গঠিত ইস্তিহছানকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, কারণ খোদ প্রথা আইনের কোনো উৎস নয়। তিনি মত প্রকাশ করেন যে, অনুমোদিত প্রথাগুলো ইস্তিহছান নয় ও অন্যান্য দলিল উল্লেখের মাধ্যমে যথার্থ বলে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। পানি ব্যবহারের পরিমাণ উল্লেখ ছাড়া নির্ধারিত মূল্য দিয়ে পাবলিক টয়লেটে প্রবেশের প্রসঙ্গ উল্লেখকালে আল গাজ্জালী প্রশ্ন করেন : 'ইস্তিহছানের মাধ্যমে জনগণ এ নিয়ম পালন করছে তা কিভাবে জানা গেল? রসুল সা.-এর জামানায় তা প্রচলিত প্রথা ছিল, সে ক্ষেত্রে জনগণের কষ্ট লাঘবের জন্য সুন্নাহর দ্বারা তা নীরবে অনুমোদিত (সুন্নাহ্ তাকারিরীয়া) হওয়ার বিষয়টি কি সত্য নয়?'[৪৪]

আরেকজন শাফেয়ী ফকিহ আল আমিদী বর্ণনা করেন যে, স্পষ্ট ভাষায় ইস্তিহছানের নিন্দা জানানো সত্ত্বেও ইমাম শাফেয়ী নিজেও ইস্তিহছান অবলম্বন করেছেন। জানা গেছে যে, ইমাম শাফেয়ী বিভিন্ন সময়ে ইস্তিহছানের ভিন্ন রূপের ব্যবহার করেছেন। এর মধ্যে এ বিধানও রয়েছে যাতে তিনি বলেছেন : আমি অনুমোদন করেছি (আস্তাহসিনু) মুতয়াহ (সান্ত্বনা পুরস্কার) ৩০ দিরহাম পর্যন্ত এবং আমি অনুমোদন করেছি (সাস্তাহসিনু) অগ্রক্রয়াধিকারের প্রমাণের (শুফ) জন্য তিন দিন সময় (দাবিদারের কানে আলোচ্য সম্পত্তি বিক্রির বিষয় আসার তারিখ থেকে)। আল আমিদী এভাবে ঐ উপসংহারে উপনীত হন যে, ইস্তিহছানের মূল বক্তব্যের ব্যাপারে দুই মাজহাবের মধ্যে কোনো মতপার্থক্য নেই।[৪৫] যার অর্থ হচ্ছে তাদের মধ্যে পার্থক্য শব্দের চুলচেরা বিশ্লেষণ বৈ কিছু নয়।

মালেকী ফকিহ আল শাতিবীর মতে, ইস্তিহছান অর্থ কারোর ইচ্ছার অনুসরণ নয়, অন্যদিকে যে ফকিহ ইস্তিহছান অনুধাবন করতে পারেন তিনি আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্য গভীরভাবে উপলব্ধির অধিকারী হয়ে থাকেন। যখন একজন ফকিহ দেখতে পান যে, নতুন সমস্যার ক্ষেত্রে কিয়াসের কঠোর প্রয়োগ মাসলাহার ক্ষতিসাধন এমনকি অন্যায়ের পথে (মাফসাদা) ধাবিত করার আশঙ্কা রয়েছে তখন তিনি অবশ্যই কিয়াস পরিহার করে ইস্তিহছান অবলম্বন করবেন।[৪৬]

www.pathagar.com

ইস্তিহ্ছানের ব্যাপারে বিতর্কের বিষয় সম্পর্কে আলোচনাকালে আরেকজন পর্যবেক্ষক শায়েখ আল খুদারী লিখেছেন, যারাই ফিকাহ্র আলেমদের রচনা সম্পর্কে পরিচিত রয়েছেন তারা এ ব্যাপারে একমত পোষণ করবেন, কেবল আবু হানিফা ও তার শিষ্যরাই ইস্তিহ্ছানের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন না, সব ফকিহ্ ইস্তিহ্ছান অবলম্বন করেছেন, যার হয়তো ধরন ছিল ভিন্ন ভিন্ন এবং বিভিন্ন মাজহাবের চিন্তাধারার মূল্যায়ক অবশ্যই দেখতে পাবেন যে তাদের মাজহাবের অভিমতের ওপর ভিত্তি করেই ইস্তিহ্ছান করা হয়েছে।[৪৭]

এ মতের প্রতি আরো সমর্থন জানিয়েছেন ইউসুফ মুসা। তিনি যথার্থই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, ইস্তিহ্ছানের ব্যাপারে ফকিহ্দের পার্থক্যের বিষয় একান্তভাবে শব্দের ব্যাপারে যুক্তি দেখানো ছাড়া আর কিছু নয়। প্রতিটি প্রধান মাজহাবের ফকিহ্গণ একই পন্থায় একই বা ভিন্ন ধরনের ইস্তিহ্ছান অবলম্বন করেছেন।[৪৮]

যদি এটি মেনে নেয়া হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবে কেউ ভাবতে পারেন যে, আলোচ্য বিতর্কের কারণ কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। আল তাফতাজানীর মতে, ইস্তিহ্ছান নিয়ে বিতর্কের কোনো পক্ষই অপর পক্ষকে উপলব্ধি করেনি, ভুল বোঝাবুঝির কারণেই গোটা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। যারা ইস্তিহ্ছানের পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন তারা এর বিপক্ষে যারা যুক্তি দেখিয়েছেন তাদের থেকে ভিন্নভাবে এ মূলনীতিকে চিন্তা করেছেন। আল তাফতাজানী আরো বলেন, ইস্তিহ্ছানকে যদি সঠিকভাবে উপলব্ধি করা হতো তাহলে এর মৌলিক বৈধতার ব্যাপারে কখনো কোনো বিতর্ক দেখা দিত না।[৪৯]

আল-তাফতাজানীর মূল্যায়নকে খাল্লাফ, আবু জাহ্রাহ ও ইউসুফ মুসাসহ ইস্তিহ্ছানের ওপর আধুনিক লেখকগণ ব্যাপকভাবে অনুমোদন করেছেন। খাল্লাফের মতে, ইস্তিহ্ছানের মৌলিক বৈধতার বিষয় অনস্বীকার্য, কারণ তা দৃশ্যত আইনের সাধারণ বিধান বর্জন করে ব্যতিক্রমী ভিন্ন বিধান গ্রহণে সক্ষম করে তোলে, যা এর যথার্থতা প্রতিপন্ন করে। প্রত্যেক বিচারক ও ফকিহ্কে প্রতিটি ঘটনার পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে এবং অনেক সময় তিনি মাসলাহা বা ন্যায়বিচারের প্রয়োজনে নির্দিষ্ট আইন প্রয়োগ না করার অথবা ব্যতিক্রমী কিছু করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।[৫০]

সব শেষে বলা যায়, আবু জাহ্রাহ এ মত প্রকাশ করেন যে, 'একটি ব্যতিক্রমী বিষয় ছাড়া ইস্তিহ্ছান সম্পর্কিত হানাফীদের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ীর সব সমালোচনা প্রাসঙ্গিক নয়।' ব্যতিক্রমী বিষয়টি হলো, প্রচলিত রীতিনীতি বা প্রথার ভিত্তিতে ইস্তিহ্ছান গঠনের বিষয়, এ ব্যাপারে শাফেয়ীদের সমালোচনা গ্রহণ করা

www.pathagar.com

যেতে পারে কারণ সামাজিক প্রথা আইনের কোনো স্বীকৃত উৎস নয় এবং যে কোনো ক্ষেত্রে এ সমর্থনে কিয়াস উপেক্ষা করা যথেষ্ট কর্তৃত্বের অধিকারী নয়।[৫১]

উপসংহার

কিয়াসের সাথে ইস্তিহ্ছানকে সংযুক্ত করার প্রচেষ্টায় যেসব জটিল যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে তা তেমন একটা বিশ্বাসযোগ্য হতে পারেনি। এ বিষয়ে ফকিহ্দের কিছু মতপার্থক্য এক পন্থায় নিষ্পত্তি করতে হলে ইস্তিহ্ছানের মূলে ফিরে যেতে হবে এবং ইমাম আবু হানিফা এবং ফিকাহ্র প্রাথমিক আলেমগণ এর যে অর্থ প্রদান করেছিলেন তা স্মরণ করতে হবে। এ ব্যাপারে যে প্রমাণ রয়েছে তাতে এ কথা বোঝা গেছে যে, আবু হানিফা (মৃত্যু, ১৫০/৭৬৭) ইস্তিহ্ছানকে এক ধরনের কিয়াস বলে মনে করতেন না। তার প্রায় অর্ধশত বছর পরে ইমাম শাফেয়ী তার গ্রন্থ রিসালাহ্ ও কিতাব আল উম্ম রচনা করেন। এসব গ্রন্থেও ইস্তিহ্ছান ও কিয়াসের মধ্যে সম্পর্ক থাকার তেমন একটা আভাস দেখতে পাওয়া যায়নি। বস্তুতপক্ষে ইমাম শাফেয়ী এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব ছিলেন। ইমাম শাফেয়ী যদি জানতেন যে, ইস্তিহ্ছান হচ্ছে কিয়াসেরই একটি রূপ, তাহলে যে কেউ এ কথা মনে করতে পারেন যে, তিনি ইস্তিহ্ছানের ব্যাপারে তার অবস্থানকে নমনীয় করতেন। প্রাথমিক অবস্থায় ইস্তিহ্ছানের ব্যাপকভিত্তিক ও অপেক্ষাকৃত সহজ রূপ ছিল এবং এর অর্থ এর আক্ষরিক অর্থের কাছাকাছি ও জটিলতা মুক্ত ছিল, যা পরে জটিল রূপ ধারণ করে। এখানে ইমাম মালিকের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিবৃতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া যেতে পারে যাতে তিনি ইস্তিহ্ছানকে মানবজ্ঞানের দশভাগের-নয়ভাগ বলে অভিহিত করেছেন। এ বিবৃতিতে কিয়াসের আওতার ভেতরে অথবা তার বাইরের উভয় ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাবলির অপেক্ষাকৃত উত্তম ও অধিকতর ন্যায়পরায়ণ বিকল্প সমাধান অনুসন্ধানের পদ্ধতি হিসেবে ইস্তিহ্ছানের সঠিক নির্যাস প্রকাশ পেয়েছে। মৌলিকভাবে ইস্তিহ্ছান কিয়াসের বিরোধী, তার অংশ নয়। ইস্তিহ্ছান ফকিহ্গণকে কিয়াসের বিধানের কঠোর নিয়মের বাইরে আসার সুযোগ করে দিয়েছে, বিশেষ করে যখন এ ধরনের নিয়ম পালনের ফলে অবিচারের পথ প্রশস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মূলত ইস্তিহ্ছান আরেক ধরনের কিয়াস হিসেবে গঠিত হয়নি বরং একটি মূলনীতি হিসেবে প্রণীত হয়েছে, যা ফকিহ্গণকে বিশেষ করে কিয়াসের কঠোর নিয়ম যে ক্ষেত্রে শরিয়াহ্র উচ্চতর উদ্দেশ্য অর্জনের সাথে সাংঘর্ষিক হলে সে ক্ষেত্রে কিয়াসের কঠোর নিয়ম থেকে মুক্ত করে দিয়েছে।

এ কথা স্মরণ করা দরকার যে এক সময় ইমাম শাফেয়ী কঠোর আইনগত তত্ত্ব বা বিধিবিধান চূড়ান্তভাবে প্রণয়ন করেন এবং পরে ক্রমান্বয়ে অন্যরা তা মেনে নেয়, এরপর এসব বিধানের সাথে সঙ্গতি বিধানের চাপের কারণে ইস্তিহ্ছানের বিষয়ে

www.pathagar.com

অধিকাংশ বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। উসুলের আইনগত তত্ত্ব প্রণয়নে ইমাম শাফেয়ীর প্রচেষ্টার যুক্তি বনাম অবতীর্ণ খোদায়ী বিধানের ভূমিকার সংজ্ঞা প্রদানের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী আইনের ক্ষেত্রে মানব যুক্তি প্রয়োগের সুযোগকে কেবলমাত্র কিয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রেখেছেন। ইজতিহাদ ও কিয়াস সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ীর সুপরিচিত বিবৃতি রয়েছে। এতে তিনি বিশেষ করে এ দু'টি বিষয়কে সমার্থক হিসেবে বিবেচনা করেছেন, আর মানব যুক্তির ব্যবহারকে কেবলমাত্র কিয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার তার প্রচেষ্টা কারো দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়ার মতো নয় :

> মুসলমানের জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট সব সমস্যার সঠিক সমাধান হিসেবে হয় কোনো বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্ত অথবা নির্দেশনা রয়েছে। কোনো সিদ্ধান্ত থাকলে তাই অনুসরণ করতে হবে কিন্তু যদি নির্দেশনা না থাকে তাহলে সঠিক সমাধান কি হবে ইজতিহাদের মাধ্যমে তা নির্ণয় করতে হবে এবং ইজতিহাদই কিয়াস।[৫২]

আল শাফেয়ীর এ বিবৃতিতে তার সময়ের প্রভাব বিস্তারকারী মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে পরে উসুলের আইন সংক্রান্ত তত্ত্বের যুক্তিবাদী মূলনীতির যে কোনো বিধান কিয়াসের মাধ্যমে যথার্থতা প্রতিপন্নের চেষ্টা করা হয়। সম্ভবত এটি ছিল ইস্তিহছানের পক্ষে সমর্থনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের একমাত্র উপায়। আইনগত তত্ত্বের আওতায় ইস্তিহছানকে যথার্থতা প্রতিপন্ন করতে প্রাথমিক অবস্থায় একে কিয়াসের সমতুল্য বিবেচনা করা হয় এবং পরে একে কিয়াসের একটি উপবিভাগ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

ফকিহদের মধ্যে আরেকটি মতপার্থক্যের বিষয় হচ্ছে যে, কুরআন, সুন্নাহ অথবা ইজমার ভিত্তিতে গঠিত ইস্তিহছানকে কি আদৌ ইস্তিহছান বলা উচিত কিংবা বিকল্প বিধানের পক্ষে হাদিসের অনুমোদনে প্রচলিত কিয়াস উপেক্ষা করা হলে সে ক্ষেত্রে এ বর্জনের বিষয়টি খোদ হাদিসের জন্য হয়েছে, তাই এ ধরনের কিয়াস বর্জনের ক্ষেত্রে ইস্তিহছান শব্দের প্রয়োগ করাকে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়। যখনই কুরআনে (অথবা সুন্নাহতে) কোনো বিধিবিধান পাওয়া যাবে তখনই ফকিহগণ তা অনুসরণ করতে বাধ্য এবং সে ক্ষেত্রে মৌলিকভাবে কিয়াস বা ইস্তিহছান অবলম্বনের কোনোই সুযোগ নেই। যদি কুরআনেই অধিকতর পছন্দনীয় বিকল্প বিধান গ্রহণের সুযোগ থাকে তাহলে ওই বিকল্প বিধানও কুরআনেরই বিধান, ইস্তিহছান নয়।

এটি প্রতীয়মান হয় যে, ফকিহগণ প্রাথমিক অবস্থায় ইস্তিহছানকে আক্ষরিক অর্থের কাছাকাছি 'অধিকতর পছন্দনীয়' অথবা এমন কিছু যা অধিকতর পছন্দনীয় বোঝাতে

www.pathagar.com

ব্যবহার করেছেন। ইস্তিহ্ছানের আক্ষরিক অর্থ স্বাভাবিকভাবে ছিল বিধিনিষেধমুক্ত। পরে ফকিহ্গণ বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ করেন। ফকিহ্গণের ব্যবহারে ইস্তিহ্ছান পারিভাষিক অর্থ অর্জন করার পর থেকে সম্ভবত ইস্তিহ্ছানের আক্ষরিক ও পারিভাষিক অর্থের মধ্যে সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। ইস্তিহ্ছানের এ আক্ষরিক ও ফিকাহ্গত অর্থের মধ্যে পার্থক্য থেকে কতিপয় আলেম কেন কুরআন, সুন্নাহ্ বা ইজমার বিধানের ক্ষেত্রে ইস্তিহ্ছান শব্দ প্রয়োগ করেছিলেন তার একটা ব্যাখ্যা লাভে সহায়ক হতে পারে। যখন আমরা বলি যে, ইস্তিহ্ছানের পন্থায় কোনো অসিয়তকারীকে তার জীবদ্দশায় অসিয়ত করে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেছে কুরআন। এখানে আমরা অবশ্যই ইস্তিহ্ছানকে পারিভার্ষিক/ফিকাহ্গত অর্থে ব্যবহার করছি না। তাহলো একটি কিয়াসের ওপর অন্য একটি কিয়াসকে অগ্রাধিকার প্রদান অথবা বিবদমান কোনো আইনি বিধানের ব্যতিক্রমী পন্থা অবলম্বন করা, অথবা আমরা কদাচিৎ বলে থাকি যে, ওই নির্দিষ্ট বিষয় কুরআনের দু'টি সমাধানের একটিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। যখন কুরআন অসিয়তকে অনুমোদন করে তখন থেকেই এ কথা বলতে পারেন যে, নিজস্ব অধিকার বলে এ আইনগত বিধান প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। একে অন্য বিধানের ব্যতিক্রমী বা অন্য কিছু বলে আখ্যায়িত করা হোক না হোক তাতে কিছু যায় আসে না। কুরআনের এ বিধানের ক্ষেত্রে ইস্তিহ্ছানের আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করা হলে ইস্তিহ্ছান যথার্থ ইস্তিহ্ছান বলে বিবেচিত হবে। ইসলামি আইন বিজ্ঞানের একটি মূলনীতি হিসেবে ইস্তিহ্ছান কুরআন ও সুন্নাহ্র কর্তৃত্বের সাথে কোনো কিছু সংযোজন করতে পারে না। যে কেউ পবিত্র কুরআনে ইস্তিহ্ছানের সূচনা দেখতে পারেন, এর সাথে একটি বিকল্প হিসেবে অথবা কিয়াস থেকে সরে আসার কৌশল হিসেবে ইস্তিহ্ছান গঠনের ধারণার কোনো ভূমিকা নেই। উপরন্তু কুরআনের এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা ইস্তিহ্ছান সম্পর্কে অধ্যয়ন করলে একে উসুলের আইনগত তত্ত্বের মোকাবেলায় অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হবে, কারণ নুসুস-এ কোনো বিধান পাওয়া গেলে সে ক্ষেত্রে তাতে ইস্তিহ্ছানের মতো যুক্তিবাদী নীতি অবলম্বনের কোনো সুযোগ নেই।

তৎসত্ত্বেও অনেক পর্যবেক্ষক আবুল হাসান আল কারখীর সংজ্ঞাকে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেছেন। আমি অনুসন্ধান থেকে এ উপসংহারে উপনীত হয়েছি যে, ইস্তিহ্ছান সম্পর্কে মালেকীদের দৃষ্টিভঙ্গিও এ সম্পর্কে আল 'আরাবির সংজ্ঞা ব্যাপকতর সুযোগ অবারিত করেছে এবং সম্ভবত তা ইস্তিহ্ছানের মূল ধারণার সবচেয়ে কাছাকাছি। এতে ইস্তিহ্ছান ও কিয়াসের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের কোনো চেষ্টা করা হয়নি। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইস্তিহ্ছান ইসলামি আইন বিকাশে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, অনেক ক্ষেত্রে এ ভূমিকা এমনকি কিয়াসের

www.pathagar.com

ভূমিকার চেয়েও বেশি অবদান রেখেছে। ইস্তিহছানের ভূমিকাকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে আলেমগণ বাক সংযমনীতি অনুসরণ করেছেন। তৎসত্ত্বেও বাস্তবে এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আইন ও সামাজিক বাস্তবতার মধ্যে ব্যবধান দূর করা। নির্দিষ্ট সমস্যার পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিকতা বৈচিত্র্যের প্রতি বিচারককে পৃথকভাবে নজরদানে সক্ষম করে তোলার মাধ্যমে ইস্তিহছান এ ব্যবধান দূর করে। ফকিহগণ ইস্তিহছান ব্যবহারের ক্ষেত্রে কেন সংযম প্রদর্শন করেছেন সে বিষয়টি ইতোমধ্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর এর ফলে ইস্তিহছানের সম্ভাবনার পুরোপুরি ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। তাই এ কথা বলা বিস্ময়কর হবে না যে, এতে ইসলামি আইনের তত্ত্ব ও বাস্তবতার মধ্যে এক ধরনের ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে।[৫৩] ইস্তিহছানে কর্তৃত্বহীনতার সংযোজন দূর না করা পর্যন্ত এর সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপদান করা সম্ভব হবে না। ইস্তিহছানের ক্ষেত্রে একমাত্র যে বিষয়টি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করা দরকার, তাহলো বিরাজমান আইন উপেক্ষা করার মতো অধিকতর বাধ্যবাধকতামূলক যুক্তি রয়েছে কি না। যেসব যুক্তি ইস্তিহছান অবলম্বনের যথার্থতা প্রতিপন্ন করে তা কেবল শরিয়াহর দৃষ্টিতে বৈধই নয় উপরন্তু তা অবশ্যই এর উচ্চতর লক্ষ্য অর্জনে কাজ করবে। তাই অন্যায্য বলে প্রতীয়মান বিরাজমান অন্যান্য আইনের ওপর একে অবশ্যই অগ্রাধিকার দিতে হবে। যেহেতু ইস্তিহছান বিকল্প সমাধানগুলোর মধ্য থেকে একটিকে বেছে নেয়ার পথ করে দেয় সেহেতু এতে প্রতিটি বিকল্পের গুণাগুণ বিবেচনা করা হয়। ইস্তিহছানের মাধ্যমে যে বিকল্প উদ্ভাবন করা হয় সব সময়ই তার ভিত্তি হয়ে থাকে বিরাজমান আইন। এ অর্থে ইস্তিহছান আইনগত সমস্যার সৃজনশীল ও কল্পনা শক্তিসম্পন্ন সমাধান অর্জনে বিপুল সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত করে। প্রশ্ন হচ্ছে, ইস্তিহছান নির্দিষ্ট সমস্যার কেবল নিছক সমাধান অনুসন্ধান করে না উপরন্তু ইতোমধ্যে বিরাজমান সমাধানের চেয়ে উত্তম সমাধান পেশ করে। অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, ইস্তিহছান উচ্চতর পর্যায়ের বিশ্লেষণ, সূক্ষ্ম ও পরিশীলিত উৎকর্ষতা অর্জনের পথ রচনা করে, যা মানের দিক থেকে অবশ্যই বিরাজমান আইন ও কিয়াসকে অতিক্রম করে যায়।

যদি ইস্তিহছানকে কিয়াসের শর্তাবলির অধীনে ন্যস্ত করা হয় তাহলে নতুন বিকল্পের সম্ভাবনা ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়বে। এ দু'টি বিষয়কে মূলত ভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এর প্রত্যেকটিকে অবশ্যই তার সর্বোচ্চ ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করার সুযোগ করে দিতে হবে। কিয়াস মূলত কুরআন ও সুন্নাহর যুক্তিকে সম্প্রসারণ করে; অন্যদিকে ইস্তিহছানের উদ্দেশ্য হচ্ছে কিয়াসের অনিয়ম দূর করা। তাই এ দু'টি বিষয়কে একই নিয়মের মধ্যে মিলিয়ে ফেলা পদ্ধতিগতভাবে সঠিক হবে না বলে মনে করা হয়।

www.pathagar.com

এ কথা সত্য যে, আমাদের সময়ের আইনগত ও বিচার বিভাগীয় কার্য সম্পাদনে ইস্তিহছান দৃষ্টিগোচরযোগ্য কোনো ভূমিকা পালন করেনি। আগে যেমনটি ছিল তেমনি তা বিতর্কের বিষয় হিসেবে রয়ে গেছে। ইস্তিহছানের ব্যাপারে আইনজ্ঞ ও বিচারকদের দৃষ্টিভঙ্গি বিনির্মাণে তাকলিদের ঘটনার প্রাধান্যের দিকটির মাধ্যমে এর আংশিক ব্যাখ্যা প্রদান করা যেতে পারে। কেবলমাত্র অতীতের ফকিহ্গণের রায়ে ইস্তিহছান সমুন্নত রাখা হয়েছিল, এমনকি তাও পুরোপুরি দ্বিধামুক্ত ছিল না। মুসলিম শাসক ও বিচারকগণ বিরাজমান আইনের উন্নয়ন অথবা দৈনন্দিন বিচার কাজে ইস্তিহছান তেমন একটা অথবা মোটেই ব্যবহার করেননি। বিশেষ করে ন্যায়বিচার ও ন্যায়পরায়ণ সমাধান অর্জনে ইস্তিহছানের বিপুল উপযোগিতার বিষয় বিবেচনা করে এ কথা বলা যায় যে, এটি ছিল স্পষ্ট অন্যায়।

ন্যায়পরায়ণতার একটি পদ্ধতি হিসেবে ইস্তিহছানের সর্বোত্তম ব্যবহার করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে বর্তমান আইনের উন্নয়ন, এর অবাস্তব ও অবাঞ্ছিত উপাদানসমূহ দূর করা এবং প্রয়োজনীয় ব্যতিক্রমী পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে তা পরিশুদ্ধ করা যেতে পারে। অন্যকথায় বলা যায় যে, ইস্তিহছান সাধারণত বিরাজমান আইনগত অবস্থার সীমার মধ্য থেকে কাজ করে এবং প্রচলিত আইনের আমূল পরিবর্তন চায় না, যদিও এতে সৃজনশীলতা ও পরিশোধনের বিপুল সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত রয়েছে।

বিচারক ও আইনজ্ঞরা সাধারণত প্রচলিত আইনকে উপেক্ষা করতে অথবা এর ব্যতিক্রমী কিছু করতে আগ্রহী নন, এমনকি এ ধরনের উপেক্ষা সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার স্বার্থের অনুকূলে হবে এ ব্যাপারে প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও। এ ধরনের পরিস্থিতিতে বিচারকরা কি ভূমিকা পালন করবেন সে ব্যাপারে আইনে সুনির্দিষ্টভাবে বাকসংযমের কথা বলা হয়েছে, আর আইনের এ বাকসংযমের কারণে প্রায়ই তারা এ অনীহা প্রকাশ করেন। বিচারকরা সাধারণত যে কোনো মূল্যে আইন প্রয়োগ করতে চান বলে মনে করা হয় এবং প্রায়ই পরিবেশ পরিস্থিতির বিষয় অথবা ফলাফল কী হবে তা তারা তেমন একটা বিবেচনা করেন না। বিকল্পভাবে এমনটিও হতে পারে যে, বাস্তবে বিচারকগণ স্পষ্ট অবিচার বলে মনে হলে আইনকে উপেক্ষা করছেন, তারা যা করছেন প্রকাশ্যে তা স্বীকার করা ছাড়াই করছেন। আইনসভা যদি স্পষ্ট ভাষায় ইস্তিহছান অবলম্বনের অনুমোদন দেয় তাহলে বিচারক তার ক্ষেত্রে বিচার্য মামলার ন্যায়সঙ্গত সমাধান অর্জনে ইস্তিহছানকে একমাত্র উপায় বিবেচনা করলে তার জন্য তা করার পরামর্শ দেয়া যেতে পারে। এ পন্থায় দৈনন্দিন বিচার ফায়সালার কাজে ইস্তিহছান একটি আশাব্যঞ্জক অবস্থান লাভ করতে পারে এবং এর ফলে আইন ও বিচার ফায়সালার ক্ষেত্রে নমনীয়তা গ্রহণ ও ন্যায়বিচারের বিষয়টি

www.pathagar.com

উৎসাহিত হবে। এর ফলশ্রুতিতে বিচারিক সিদ্ধান্ত আইনকে প্রভাবিত করবে এবং তা অধিকতর পরিশুদ্ধ ও ন্যায়পরায়ণ আইন পদ্ধতি অর্জনে অবদান রাখবে। ইস্তিহছানের সুস্পষ্ট ও সুনির্ধারিত ভূমিকা ইসলামি আইনের বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করবে আশা করা যায়।

টিকা

১. Osborn-এর Concise Law Dictionary-এর ১২৪ পৃষ্ঠায় ন্যায়বিচারের (equity) সংজ্ঞায় বলা হয়েছে : 'প্রাথমিকভাবে ন্যায়বিচার বা প্রাকৃতিক সুবিচার। মূল আইনের পাশাপাশি নতুন বিধিবিধানের ব্যবস্থা যা নির্দিষ্ট মূলনীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এসব মূলনীতি সহজাত উচ্চতর শুচিতার গুণে বিদ্যমান আইনকে অতিক্রম করে গেছে বলে দাবি করা হয়। ন্যায়পরায়ণতা হচ্ছে সাধারণ আইন (Common law) ও বিচার কার্যক্রমের সম্পূরক হিসেবে প্রধান বিচারপতির দফতর থেকে প্রণীত ও পরিচালিত আইনি ব্যবস্থা।'

২. আলোচনার জন্য দেখুন, Kerr, Islamic Reform, পৃষ্ঠা ৫৭।

৩. আলোচনার জন্য দেখুন, John Makdisi, 'Legal Logic,' পৃষ্ঠা ৯০।

৪. বিস্তারিত জানতে দেখুন, সাবুনী, মাদখাল, পৃষ্ঠা ১১৯।

৫. উম্ম আওলাদ একজন দাসী ছিল, সে তার মনিবের ঔরসজাত ছিল এবং মনিবের মৃত্যুর পর সে মুক্ত মানুষ হয়ে যায়। কিতাবিয়া হচ্ছে একজন নারী যিনি অবতীর্ণ খোদায়ী ধর্ম যেমন খ্রিষ্টান ও ইহুদি ধর্মের অনুসারী।

৬. তুলনীয়, আহমদ হাসান, Early Development, পৃষ্ঠা ১৪৫।

৭. সারাখসী, মাবসুত, ১০, ১৪৫; ইবনে হাম্বল, মুসনাদ, ৫, ২২।

৮. খুদারী, তারিখ, পৃষ্ঠা ১৯৯।

৯. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ২০৭ ও ২১৫; ইমাম মালিকের ইস্তিহছানের বৈশিষ্ট্য বর্ণনার বিষয়টি শাতিবীর গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়, মুওয়াফাকাত (দিরাজ সংস্করণ), ৪, ২০৮।

১০. সারাখসী, মাবসুত, ১০, ১৪৫;

১১. ইবনে তাইমিয়া, মাসালাহ আল ইস্তিহছান, পৃষ্ঠা ৪৪৬।

১২. আল ইস্তিহছান হুওয়া তার্ক মুকতাদায়া আল দলিল আলা তারিক আল ইস্তিহছান ওয়াল তারাখখুস লি-মুয়ারাদাহ মা ইউয়ারাদ বিহী ফী বাদ মুকতাদাইয়াতিহ। দেখুন, ইবনে আল আরাবি, আহকাম আল কুরআন, ২, ৫৭। ইবনে আল আরাবির সংজ্ঞা সম্পর্কে আরো আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়, শাতিবী, মুওয়াফাকাত (দিরাজ সংস্করণ) ৪, ২০৮।

১৩. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ২০৭।

১৪. ইউসুফ আলীর তাফসির, The Holy Qura'n, পৃষ্ঠা ১২৪১, ফুটনোট, ৪২৬৯।

www.pathagar.com

১৫. আমিদী (ইহকাম, ১, ২১৪) একে হাদিস বলে মনে করেছেন তবে এটি প্রখ্যাত সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর কথা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি; দেখুন, শাতিবী, ইতিসাম, ২, ৩১৯।

১৬. ইবনে মজাহ, সুনান, ২, ৭৮৪, হাদিস নম্বর ২৩৪০; শাতিবী, মুওয়াফাকাত (দিরাজ সংস্করণ) ৩, ১৭; খুদারী, তারিখ, পৃষ্ঠা ১৯৯।

১৭. আমিদী (ইহকাম, ৪, ১৫৯।

১৮. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১৬০; গাজ্জালী মুস্তাস্ফা, ১, ১৩৮।

১৯. আহমদ হাসান, 'The Principle of Istihsan', পৃষ্ঠা ২০৭।

২০. ফজলুর রহমান, Islamic Methodology,' পৃষ্ঠা ৩২।

২১. কিয়াস সম্পর্কে আরো দেখুন, কামালী, 'কিয়াস (Analogy)', Encycloppedia of Religion, ১২, ১২৮।

২২. খুদারী, অরিখ, পৃষ্ঠা ২০০।

২৩. Coulson, Conflicts, পৃষ্ঠা ৭-৮।

২৪. শাবান, উসুল, পৃষ্ঠা ১০০।

২৫. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৮২; আল নাভানী, মুকাদ্দিমাহ, পৃষ্ঠা ৬৭।

২৬. উদাহরণ হিসেবে এ পরিভাষার ব্যবহার দেখুন, সাবুনি, মাদখাল, পৃষ্ঠা ১২৩।

২৭. এভাবে মালেকী ফকিহ ইবনে আল হাজিব ইস্তিহছানকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন, তা হলো, গ্রহণীয় (মকবুল), উপেক্ষিত (মারদুদ) ও অনিশ্চিত (মুতারাদ্দিদ) তিনি আরো বলেন, ইস্তিহছান দৃঢ়ভিত্তির ওপর গঠিত এবং সবার কাছে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু যেসব ইস্তিহছান নস, ইজমা বা কিয়াস দ্বারা সমর্থিত হয়নি সেসব ইস্তিহছানের ব্যাপারে সাধারণভাবে বিতর্ক রয়েছে। দেখুন, ইবনে আল হাজিব, মুখতাছার, ২, ৪৮৫।

২৮. তুলনীয়, সাবুনি, মাদখাল, পৃষ্ঠা ১২৩।

২৯. তুলনীয়, মুসা, মাদখাল, পৃষ্ঠা ১৯৭; খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৮২। যেসব হাদিসে বিভিন্ন ধরনের ইজারা (জমি, শ্রম, পশু ইত্যাদি) বৈধতা দেয়া হয়েছে তা জানতে দেখুন, ইবনে রুশদ, বিদাইয়া, ২, ২২০-২২১।

৩০. বুখারি, সহিহ, (খান অনূদিত), ৩, ৫৭৫, হাদিস নম্বর ৮৯৩; সাবুনি, মাদখাল, পৃষ্ঠা ১২৩-২৪।

৩১. দেখুন আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ২১১।

৩২. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ২১১-২১২।

৩৩. তুলনীয়, সাবুনি, মাদখাল, পৃষ্ঠা ১২৪।

৩৪. একই গ্রন্থ

৩৫. শাতিবী, ইতিসাম, ২, ৩১৮।

www.pathagar.com

৩৬. সাবুনি, মাদখাল, পৃষ্ঠা ১২৫।

৩৭. শাফেয়ী, কিতাব আল উম্ম, 'কিতাব ইবতাল আল ইস্তিহছান'. ৭, ২৭১।

৩৮. একই গ্রন্থ, ৭, ২৭২।

৩৯. আহমদ হাসান, 'The Principle of Istihsan', পৃষ্ঠা ৩৫২।

৪০. Aghnides, Muhammedan Theories, পৃষ্ঠা ৭৩।

৪১. Paret, 'Istihsan and Istislah', Encyclopedia of Islam, new ed., ৪, ২৫৬।

৪২. গাজ্জালী মুস্তাস্ফা, ১, ১৩৭।

৪৩. উদাহরণ হিসেবে বলা যায় গাজ্জালী চার ব্যক্তির সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আবু হানিফার জিনার শাস্তি কার্যকর করার সমালোচনা করেছেন যাতে সাক্ষীদের জিনা সংঘটিত হওয়ার কথিত কক্ষের চার কোণায় দাঁড় করানো হয়। গাজ্জালীর মতে, এমনটি যদি করা হয় তা হলে জিনার ঘটনা প্রমাণের ক্ষেত্রে সন্দেহের (শুবহা) সৃষ্টি হবে যা হাদ শাস্তি প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত করবে। একটি হাদিসে বলা হয়েছে, সন্দেহজনক সব ঘটনার ক্ষেত্রে হাদ বাতিল করতে হবে। আবু হানিফা কর্তৃক দৃশ্যত একজন মুসলমানকে অবিশ্বাস করা (তাকজীব আল মুসলিমীন) তিরস্কারযোগ্য। এ কারণের ভিত্তিতে ইস্তিহছানের এ সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। আল গাজ্জালী আবু হানিফার এ সিদ্ধান্তকে খেয়ালখুশি বলে গণ্য করেন এবং তার মতে, এ ধরনের ইস্তিহছান অনুসরণ করা উচিত নয়, (মুস্তাস্ফা, ১, ১৩৯।

৪৪. একই গ্রন্থ, ২, ১৩৮।

৪৫. আমিদী, ইহকাম, ৪, ১৫৭।

৪৬. শাতিবী, মুওয়াফাকাত (দিরাজ সংস্করণ) ৪, ২০৬।

৪৭. খুদারী, তারিখ, পৃষ্ঠা ২০১।

৪৮. মুসা, মাদখাল, পৃষ্ঠা ১৯৮।

৪৯. তাফতাজানী, তালভীহ, পৃষ্ঠা ৮২। তাফতাজানী হানাফী না শাফেয়ী ছিলেন তা জানা যায়নি। তাফতাজানীর এক জীবনবৃত্তান্তে বলা হয়েছে, তাকে কখনো হানাফী আবার কখনো শাফেয়ী বলে মনে করা হতো। দেখুন, আল মাওসুয়াহ আল ফিকাইয়াহ, ১, ১৩৯।

৫০. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৮৩; মুসা, মাদখাল, পৃষ্ঠা ১৯৭।

৫১. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ২১৫।

৫২. শাফেয়ী. রিসালাহ, পৃষ্ঠা ২০৬।

৫৩. 'Theory and Practice' শিরোনামে একটি অধ্যায়ে Joseph Schacht আইন ও সামাজিক বাস্তবতার মধ্যে ব্যবধান ব্যাপক বৃদ্ধির বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, An Introduction, পৃষ্ঠা ৭৬-৮৬।

www.pathagar.com

ত্রয়োদশ অধ্যায়

মাসলাহা মুরসালাহা (জনস্বার্থ বিবেচনা)

মাসলাহার আক্ষরিক অর্থ হলো 'কল্যাণ' বা 'স্বার্থ'। যখন তা মাসলাহা মুরসালাহাতে উন্নীত হয় তখন তা অবারিত জনকল্যাণ বুঝায়, এ অর্থে যে আল্লাহ তায়ালা তা নিয়ন্ত্রণ করে দেননি, কারণ এর বৈধতার পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো আয়াত দেখতে পাওয়া যায়নি।[১] এটি ইস্তিস্লাহর সমার্থক এবং অনেক সময় একে মাসলাহা মুতলাকা হিসেবেও উল্লেখ করা হয়, এর কারণ শরিয়াহর প্রতিষ্ঠিত বিধিবিধানে এ বিষয়টি নিরূপিত হয়নি। আল গাজ্জালীর মতে, কল্যাণ লাভ অথবা অকল্যাণ বা ক্ষতি রোধের চিন্তার সমন্বয়ে মাসলাহা গঠিত হয়েছে, যা একই সাথে শরিয়াহর উদ্দেশ্যের (মাকাসিদ) সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। তিনি আরো বলেন, এর উদ্দেশ্য পাঁচটি। অত্যাবশ্যকীয় মৌলিক মূল্যবোধ সংরক্ষণের সমন্বয়ে এগুলো গঠিত হয়েছে। আর এগুলো হলো ধর্ম, জীবন, প্রজ্ঞা, বংশধারা ও সম্পত্তি। এসব মূল্যবোধ সংরক্ষণের জন্য গৃহীত যে কোনো ব্যবস্থা মাসলাহার আওতায় পড়বে আর এর লঙ্ঘন ঘটে এমন যে কোনো পদক্ষেপ হবে মাফসাদা ('পাপ') এবং মাফসাদা রোধ করাও মাসলাহা।[২] অধিকতর প্রয়োগিক অর্থে মাসলাহা মুরসালাহার সংজ্ঞা হিসেবে বলা যায় যে, এ হলো এক ধরনের বিচার-বিশ্লেষণ যা আল্লাহ প্রদত্ত উদ্দেশ্যের সাথে সঠিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ (ওয়াসফ মুনাসিব মুলাইম), যা কল্যাণ লাভ ও অকল্যাণ রোধ করে এবং শরিয়তে এর বৈধতা বা অবৈধতার কোনো আভাস দেয়া হয়নি।[৩] উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, সাহাবিগণ রা. মুদ্রা প্রচলন, জেলখানা প্রতিষ্ঠা এবং অধিকৃত ভূখণ্ডের কৃষি জমিতে কর আরোপ (খারাজ) করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যদিও বস্তুতপক্ষে এসবের পক্ষে কুরআন-সুন্নাহতে কোনো কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা প্রদানের বিষয় দেখতে পাওয়া যায়নি।[৪]

আলেমগণ একমত হয়েছেন যে, ইবাদত-বন্দেগীর বিষয় এবং শরিয়াহর সুনির্দিষ্ট নির্দেশের (মুকাদ্দারাত) ক্ষেত্রে ইস্তিস্লাহ কোনো দলিল নয়। এভাবে সুনির্দিষ্ট শাস্তি (হুদুদ) ও জরিমানা (কাফফারা), সম্পত্তির নির্ধারিত উত্তরাধিকার (ফারাইজ), তালাকপ্রাপ্ত নারীর নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অত্যাবশ্যকীয় ইদ্দত পালনের মত নুসুস-এর আহকামসমূহ সুস্পষ্ট ও চূড়ান্ত এবং এসব ইস্তিস্লাহর আওতায় পড়বে না। যেহেতু মানব বুদ্ধিজ্ঞানের দ্বারা ইবাদত-বন্দেগীর সঠিক মূল্যায়ন ও কারণ জানা সম্ভব নয় সেহেতু এসব ক্ষেত্রে ইজতিহাদ প্রয়োগ করা যাবে না- তা ইস্তিস্লাহ, বিচারিক অগ্রাধিকার (ইস্তিহছান) বা কিয়াস, যে কোনো আকারেই হোক না কেন। উপরন্তু ইবাদত-

www.pathagar.com

বন্দেগী ও অন্যান্য সুস্পষ্ট নির্দেশকে ইমানদারগণ যথাযথভাবে অনুসরণ করাকে বাধ্যতামূলক কর্তব্য বলে মনে করে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রের বাইরের বিষয়গুলোর ব্যাপারে আলেমগণ নিজস্ব অধিকার বলে শরিয়াহর দলিল হিসেবে ইস্তিস্লাহর ওপর নির্ভর করাকে বৈধ বলে গণ্য করেছেন।[৫]

ইসলামে আইনের (তাশরি) সাধারণ নিয়ম থেকে ইস্তিস্লাহ বৈধতা লাভ করেছে। তাশরির মৌলিক উদ্দেশ্য হলো, জনগণের কল্যাণ সাধন। তাদের মঙ্গলজনক কাজ জোরদার বা অনিষ্ট রোধের মাধ্যমে এটি করা হয়। যেসব উপায়-উপকরণে ও পন্থায় জনগণের কল্যাণ সাধন করা হয় তা প্রকৃতপক্ষে সীমাহীন। অন্য কথায় মাসালিহ (মাসলাহার বহুবচন) আগে ভাগে গণনা বা অনুমান করা সম্ভব নয়। কারণ সময় ও পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে সাথে এগুলোরও পরিবর্তন ঘটে। কোনো আইন প্রবর্তন একসময় কল্যাণকর হলেও অন্য সময় এমনকি একই সময়েও তা অনিষ্টকর মনে হতে পারে।[৬] বিশেষ পরিস্থিতিতে যে আইন কল্যাণকর বিবেচিত হতে পারে, ভিন্ন পরিস্থিতিতে তা অনিষ্টকর প্রমাণিত হতে পারে। অতএব, এমন অবস্থার উদ্ভব হলে উপস্থিত শাসক ও মুজতাহিদদের মাসালিহ অর্জনে একসাথে কাজ করতে হবে।[৭]

সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মত হলো, ইস্তিস্লাহ হচ্ছে আইনের সঠিক কারণ। যখন কোনো মাসলাহা শনাক্ত করা হয় এবং মুজতাহিদ নুসুস এবং সুস্পষ্ট বিধান দেখতে না পান তখন তাকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের মাধ্যমে তা অর্জনে অবশ্যই কাজ করতে হবে। এ কথা বলার মাধ্যমে এর যথার্থতা প্রতিপন্ন করা যায় যে, শরিয়াহর বিধান নাজিলে আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্য হলো মানবকল্যাণ জোরদার এবং পৃথিবীতে দুর্নীতি রোধ করা। কুরআনের সুরা আল আম্বিয়ার একটি আয়াত (সুরা আম্বিয়া, ২১ : ১০৭) উদ্ধৃত করে আল শাতিবী এ অর্থ ব্যক্ত করেছেন। এ আয়াতে মুহাম্মদ সা.-এর নবুওতির উদ্দেশ্য নিম্নোক্ত ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে : 'হে নবি, আমরা তোমাকে দুনিয়াবাসীর কাছে রহমত হিসেবে পাঠিয়েছি।' আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে : 'হে মানবসমাজ! তোমাদের কাছে তোমাদের খোদার কাছ থেকে নসিহত এসে পৌছেছে। এ হলো দিলের যাবতীয় রোগের নিরাময়কারী...' (সুরা ইউনুস, ১০ : ৫৭)। এখানে খোদার এ বাণীতে মানবজাতিকে বিভক্তকারী সব বাধা অপসারিত হয়েছে এবং মানবজাতির জন্য করুণা ও কল্যাণ লাভের পথে কেউই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা ধর্ম অবতীর্ণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে বলেছেন, 'দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর সংকীর্ণতা চাপিয়ে দেয়ার কোনো ইচ্ছা তাঁর নেই' (সুরা আল হাজ, ২২ : ৭৮)। (সুরা মায়েদা, ৫

www.pathagar.com

: ৬) এ বিষয়টি আরো নিশ্চিত করা হয়েছে। এখানে আরো সহজ ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে : 'আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের জীবনকে সংকীর্ণ করে দিতে চান না'।[৮]

কুরআনের এসব উদ্দেশ্যকে মাসলাহার নির্যাস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলো বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে স্থায়ী এবং এর ওপর মাসলাহার বিরোধীদের প্রস্তাবিত বিধিনিষেধ আরোপ করা হলে ঐ সব উদ্দেশ্য নিষ্ফল হয়ে যাবে। এখানে আমরা বিরোধীদের মত সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব। তবে এ বিষয়টি উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে, তারা যে যুক্তির অবতারণা করেছেন তাতে মনে হয় যে, তাদের মতে, কুরআনের সাধারণ উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট ঘটনাবলির ক্ষেত্রে কেবল মাত্র তখনই প্রয়োগযোগ্য হবে যখন তার সমর্থনে অন্য নস থাকে। একে আল্লাহ্ তায়ালার সাধারণ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে খামাখা বিধিনিষেধ আরোপ বলে মনে হবে। কারণ কুরআনে এসব বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। যাতে মাসলাহার ভিত্তিতে কাজ করার অনুমোদন রয়েছে আলেমগণ এমন অনেক হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন- অবশ্য প্রকৃতিগত দিক থেকে এর কোনোটি এ বিষয়ের সুস্পষ্ট নস নয়। এ প্রসঙ্গে নিম্নের হাদিসটির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে :

لا ضرر ولا ضرار في الاسلام

যার অর্থ হলো, 'ইসলামে কেউ কারোর প্রতি জুলুম করবে না এবং নিজেও জুলুমের শিকার হবে না'।[৯]

একাধিক হাদিসে এ হাদিসের সারকথা তুলে ধরা হয়েছে এবং যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, এ হাদিসে সব ধরনের মাসলাহার নির্যাসকে ধারণ করা হয়েছে।[১০] এ বিষয়ে হাম্বলী ফকিহ্ নজম আল দীন আল তুফি (মৃত্যু, ৭১৬ হি) এতদূর বলেছেন যে, এ হাদিসটি ইস্তিস্লাহর ওপর চূড়ান্ত নস প্রদান করেছে। আমরা এ নিয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করব। রসুল সা.-এর বিধবা পত্নী আয়েশা রা.-এর থেকে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে :

إنه ما خير بين أمرين الا اختارأيسرهما

ما لم يكن إثما

'রসুল সা. দুইটি বিকল্পের কেবল সহজটিকে গ্রহণ করতেন যতক্ষণ না তা কোনো গোনাহের পর্যায়ে পড়তো।[১১] আরেকটি হাদিসে বলা হয়েছে :

المسلمون على شر وطهم إلا شرطاً أحلَّ حر

www.pathagar.com

اماً أو حرّم حلالً

রসুল সা. বলেছেন, 'মুসলমানরা শর্তাবলি মেনে চলতে বাধ্য থাকবে যতক্ষণ না তা হারামকে হালাল এবং হালালকে হারামে পরিণত না করবে'।[১২]

এ থেকে প্রতীয়মান হয়েছে যে, মুসলমানদের নিজেদের কল্যাণের চেষ্টা করার উদ্দেশ্যে কাজ করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে, তবে শর্ত হচ্ছে, শরিয়াহর সুস্পষ্ট আদেশ ও নিষেধ লঙ্ঘন করা যাবে না। উদ্ধৃত আরেকটি হাদিসে বলা হয়েছে রসুল সা. এরশাদ করেছেন :

إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب ان

تؤتى عزاءمه

'আল্লাহ তায়ালা তাঁর দেয়া সুবিধা (রুখাছ) পালন করা হচ্ছে তা দেখতে তেমনই ভালোবাসেন ঠিক যেমনটি তিনি তাঁর কঠোর আইন (আজাইম) প্রতিপালন দেখতে ভালোবাসেন।[১৩]

হাদিসে এ মূলনীতির প্রতি সমর্থন করা হয়েছে যাতে আহকাম প্রতিপালনে কোনো অপ্রয়োজনীয় কঠোরতা অবলম্বন না করার সুপারিশ করা হয়েছে এবং মুসলমানদের উচিত আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য যে নমনীয়তা ও সুযোগসুবিধা মঞ্জুর করেছেন তার সদ্ব্যবহার ও সার্বিক কল্যাণ অর্জনে তা প্রয়োগ করা। মাসলাহার বিষয়ে জাহিরি আলেমগণ যে কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন তা এ হাদিসের অর্থের পরিপন্থী বলে প্রতীয়মান হয়েছে। আমরা এ সম্পর্কে আলোচনা করব।

মাসলাহা মুরসালাহার ধারণা প্রায়োগিক অর্থে রসুল সা. কর্তৃক প্রদত্ত বিধিবিধানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়নি। যখনই কোনো মাসলাহার অনুকূলে রসুল সা.-এর নির্দেশনা পাওয়া গেছে তখন তা প্রতিষ্ঠিত আইনের অংশে পরিণত হয়েছে। সে কারণে তা আর মাসলাহা মুরসালাহা থাকেনি। ঐতিহাসিকভাবে সাহাবিগণের রা. কার্যক্রমে মাসলাহা মুরসালাহার ধারণার উদ্ভব হয়েছে। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, রসুল সা. মাসলাহার পক্ষে রায় প্রদান করেননি বরং নিছক এ কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইসলামি আইন শাস্ত্রের একটি মূলনীতি হিসেবে মাসলাহা মুরসালাহা সুন্নতের বিধিবিধানে প্রয়োগ করা হয় না।

সাহাবি রা., তাবেয়ী ও অতীতকালের শীর্ষস্থানীয় মুজতাহিদগণ এ মত ব্যক্ত করেছেন যে, মাসলাহার অনুমোদন সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহর সমর্থনের কিছুটা অভাব থাকা সত্ত্বেও তারা তা দ্বারা আইন প্রবর্তন ও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

www.pathagar.com

উদাহরণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, খলিফা আবু বকর রা. বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা কুরআন শরিফের লিপিবদ্ধ অংশগুলো সংগ্রহ ও একখণ্ডে সঙ্কলিত করেন। তিনি জাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং উমর ইবনে খাত্তাবকে রা. তার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন।[১৪] অনুরূপভাবে উমর ইবনে খাত্তাব রা. সরকারি ক্ষমতা অপব্যবহার করে যেসব কর্মকর্তা সম্পদ সঞ্চয় করেছিল সে ব্যাপারে তাদেরকে জবাবদিহি করেন এবং ওই ধরনের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেন। এ ছাড়া ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অসততা রোধের শাস্তি হিসেবে তিনি পানি মিশ্রিত দুধ ঢেলে ফেলে দিতেন। এ ছাড়া ওমর ইবনে খাত্তাব রা. দুর্ভিক্ষের এক বছর চুরির সুনির্দিষ্ট শাস্তি (হাদ) কার্যকর স্থগিত করেন এবং এক ব্যক্তিকে হত্যার দায়ে একদল লোকের মৃত্যুদণ্ড দেয়ার সাহাবিগণের রা. অভিমত অনুমোদন করেন।[১৫] কুরআনের সুস্পষ্ট বিধান থাকা সত্ত্বেও এসব সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করেছিলেন। হত্যার বদলে হত্যার (কিসাস) বিষয়ে কুরআনে বলা হয়েছে, 'জীবনের বদলে জীবন' এবং চুরির অপরাধে হাত কর্তনের কথা আয়াতে বলা হয়েছে, যা এখানে কোনোভাবেই সীমিত করা হয়নি। বরং কিসাস সম্পর্কে খলিফা ওমর রা.-এর সিদ্ধান্ত ঐ যুক্তির ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয় যে, হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের কিসাস থেকে অব্যাহতি দেয়া হলে জনগণ নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়বে। এভাবে তিনি জনস্বার্থে একটি হত্যাকাণ্ডে জড়িত সবার জন্য কিসাসের বিধান প্রয়োগকে নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন। উপরন্তু তৃতীয় খলিফা উসমান ইবনে আফফান রা. নির্ভুল কুরআন বিতরণ করেন এবং ভিন্ন ধরনের অন্যসব সংস্করণ ধ্বংস করে ফেলেন। এ ছাড়া তিনি ওই মহিলার উত্তরাধিকার হওয়াকে বৈধ বলে ঘোষণা করেন যার স্বামী উত্তরাধিকারী হওয়া থেকে বঞ্চিত করতে তাকে তালাক দিয়েছিল। চতুর্থ খলিফা আলী রা. কারিগর ও ব্যবসায়ীদের তাদের কাছে রক্ষিত জিনিসের ক্ষতির জন্য তাদেরকে দায়ী করেছেন। তিনি জনগণের মাসলাহার কথা ভেবে এটি করেছেন যাতে ব্যবসায়ীরা তাদের কাছে রক্ষিত জিনিসপত্রের নিরাপত্তার ব্যাপারে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করে।[১৬] অনুরূপভাবে বিভিন্ন মাজহাবের আলেমগণ জনগণকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাতে অজ্ঞ চিকিৎসক, মুর্খ মুফতি ও দেউলিয়া প্রতারকের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপকে বৈধতা প্রদান করেছেন। এ ছাড়া মালিকীগণ অপরাধের ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সাক্ষ্য প্রমাণের অভাব থাকলেও গ্রেফতার করা ও তাজিরের আওতায় শাস্তি প্রদান করাকে অনুমোদন করেছেন।[১৭] এসব দৃষ্টান্ত আলেমগণ শরিয়াহর অনুকূল নীতি (সিয়াসা শরিয়া) অনুসরণের মাধ্যমে মাসলাহা মুরসালাহা অর্জনের চেষ্টা করেছেন, যা মূলত মাসলাহার নির্দেশনার অনুরূপ। ইবনে আল কাইয়িমের মতে, জনগণকে কল্যাণের (সালাহ) কাছে নিয়ে যাওয়া এবং দুর্নীতি (ফাসাদ) থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়,

www.pathagar.com

এমনকি এসব বিষয়ে কুরআন বা রসুল সা.-এর সুন্নাহতে অনুমতি না পাওয়া গেলেও এর সব কিছুর সমন্বয়েই সিয়াসা শরিয়াহ গঠিত হয়েছে।[১৮]

আইনের (তাশরি) দলিল ও ভিত্তি হিসেবে ইস্তিস্লাহর প্রতি প্রধান সমর্থন পাওয়া গেছে ইমাম মালিকের কাছ থেকে। তিনি এর পক্ষে নিম্নের যুক্তিগুলোর উল্লেখ করেছেন :

১. সাহাবিগণ রা. একে অনুমোদন করেছেন এবং এর ভিত্তিতে শরিয়াহর বিধিবিধান প্রণয়ন করেছেন।

২. যখন মাসলাহা আল্লাহর উদ্দেশ্যের (মাকাসীদ আল শরিয়া) সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে অথবা আল্লাহ তায়ালা প্রকাশ্যে যা বৈধ ঘোষণা করেছেন তার আওতায় বা শ্রেণিভুক্ত হবে, সে ক্ষেত্রে তা অবশ্যই মেনে চলতে হবে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে একে উপেক্ষা করা হবে আল্লাহর উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করার নামান্তর, যা অবশ্যই পরিহার করতে হবে। তাই দেখা যাচ্ছে মাসলাহা নিজ অধিকার বলে শরিয়াহর একটি নিয়ম, কোনোক্রমে এটি শরিয়াহর বাইরের জিনিস নয় বরং এর অবিচ্ছেদ্য অংশ।

৩. যখন মাসলাহা অনুমোদিত মাসালিহর শ্রেণিভুক্ত হয় এবং তা পালন না করা হয়, তাহলে তার ফল হিসেবে জনগণের কষ্ট হতে পারে, যা অবশ্যই রোধ করতে হবে।[১৯]

মাসলাহার শ্রেণি বিভাগ

মাসলাহাকে সাধারণত তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়ে থাকে, যথা : জরুরি (জরুরিয়াত), পূর্ণতাদায়ক বা সম্পূরকতাদায়ক (হাজিয়াত) ও অলঙ্করণ/বিলাস প্রবণ (তাহসিনিয়াত)। শরিয়াহর সব অংশের লক্ষ্য হচ্ছে এসব মাসালিহর একটি না একটি অর্জন করা। 'জরুরি' মাসালিহ ওই সব বিষয় যার ওপর জনগণের জীবন নির্বাহ নির্ভর করে এবং এসবের অবহেলা বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলার পথে ধাবিত করে। পাঁচটি অতি জরুরি বিষয় (আল জরুরিয়াত আল খামছা) নিয়ে এগুলো গঠিত হয়েছে। তাহলো ধর্ম, জীবন, বুদ্ধিবৃত্তি, বংশধারা ও ধন-সম্পদ। এসব বিষয় কেবল উন্নতি বিধান করলেই চলবে না উপরন্তু এগুলোর নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারে এমন যে কোনো বাস্তব বা অপ্রত্যাশিত হুমকি থেকেও রক্ষা করতে হবে। ধর্ম বিশ্বাসকে সমুন্নত রাখতে হলে নির্ধারিত নিয়মে 'ইবাদত-বন্দেগী' পালন করা প্রয়োজন হবে, অন্যদিকে বৈধ পন্থায় খাদ্য-পানীয় সংগ্রহের ব্যবস্থা এবং দণ্ডবিধির প্রয়োগের মাধ্যমে জীবন ও বুদ্ধি-বিবেকের নিরাপত্তা বিধান করতে হবে, এগুলোকে ধ্বংস ও অনিষ্টের হাত থেকে রক্ষার জন্য শরিয়তে মাসলাহার বিধান প্রদান করা হয়েছে।[২০]

www.pathagar.com

হাজিয়াত হচ্ছে সার্বিকভাবে পাঁচটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের পরিপূরক এবং যেসব বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে তার প্রতি অবহেলা করলে সমাজজীবন যদিও ভেঙে পড়ে না তবে সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। এভাবে শরিয়তে 'ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে যে সুবিধা (রুখাস) প্রদান করা হয়েছে তার লক্ষ্য হচ্ছে কষ্ট লাঘব করা। যেমন অসুস্থ অবস্থায় রোজা ভাঙার এবং সফরকালে সংক্ষিপ্ত নামাজ (কসর) আদায় করার অনুমতি রয়েছে। অনুরূপভাবে খাবার ও পানীয় গ্রহণ এবং শিকার করার আনন্দের মতো বিষয়ে মৌলিক অনুমোদনযোগ্যতা (ইবাহা) হচ্ছে জীবন ও বুদ্ধি-বিবেকের নিরাপত্তা বিধানের মূল উদ্দেশ্যের পরিপূরক।[২১]

'অলঙ্করণ' (তাহসিনিয়াত) 'কামালিয়াত' বলেও পরিচিত। এটি এমন জিনিস যা এমন সব বিষয়ের প্রতি আগ্রহের সৃষ্টি করে যার বাস্তবায়ন কাম্য বস্তুর উন্নয়ন ও অর্জনের পথ প্রশস্ত হয়। এভাবে ব্যক্তির বাহ্যিক চেহারা-সুরতের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও ইবাদত-বন্দেগীতে নৈতিক গুণাবলি বজায় রাখা, আহার-বিহারে সংযমী আচরণ করা এবং দণ্ডবিধি প্রয়োগে নমনীয়তা অবলম্বন তাহসিনিয়তের আওতার মধ্যে পড়ে।

এ কথা বলা দরকার যে, অবাধ মাসলাহা আপনা থেকে উপরিউক্ত শ্রেণি বিভাগের কোনো সুনির্দিষ্ট রকমের/ধরনের প্রতিনিধিত্ব করে না। এর স্পষ্ট কারণ হলো, তা তিন প্রকার মাসলাহার যে কোনো একটির আওতায় পড়তে পারে। কোনো ক্ষেত্রে মাসলাহা মুরসালাহা বাস্তবায়ন যদি অত্যাবশ্যকীয় মাসলাহার অপরিহার্য শর্ত হয় তাহলে ওই মাসলাহা মুরসালাহা অত্যাবশ্যকীয় মাসলাহার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হবে। অনুরূপভাবে মাসলাহা মুরসালাহা যদি দ্বিতীয় শ্রেণির কোনো মাসালিহ অর্জনের উপায় হিসেবে ব্যবহার করা হয়-তাহলে তা ওই ক্যাটাগরির আওতায় পড়বে ইত্যাদি। উপরন্তু আল শাতিবী তার দীর্ঘ আলোচনায় যে কথাটি বলেছিলেন আমরা সংক্ষেপে এখানে তা উল্লেখ করতে পারি, তাহলো, সব মাসালিহ আপেক্ষিক (নিসবী, ইজাফী) তাই অত্যাবশ্যকীয় মাসলাহাসহ সব শ্রেণির মাসলাহা দুর্ভোগ এমনকি মাফসাদার পরিমাপের অংশ হয়ে থাকে। যেহেতু নিরঙ্কুশ কোনো মাসলাহা নেই তাই যে কোনো ধরনের মাসলাহার মূল্য এর থেকে প্রাপ্ত কল্যাণের আধিক্যের ভিত্তিতে নিরূপিত হয়। এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, আলোচ্য কল্যাণ আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।[২২]

প্রাপ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে বা অন্য কথায় এর পক্ষে খোদায়ী বিধানের অনুমোদনের আলোকে মাসলাহাকে পুনরায় তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথমটি হলো এমন মাসলাহা আল্লাহ তায়ালা যাকে সমুন্নত করেছেন এর বাস্তবায়নে আইন প্রবর্তন

www.pathagar.com

করেছেন। একে বলা হয়, আল মাসলাহা আল মুতাবারাহ বা সুনিশ্চিত অনুমোদিত মাসলাহা, যেমন- জানের বদলে জান (কিসাস) আইন করে জীবনের নিরাপত্তা বিধান অথবা চোরের শাস্তি বিধানের মাধ্যমে মালিকানা অধিকার রক্ষা অথবা ব্যাভিচারী ও মিথ্যা অপবাদকারীর শাস্তি দেয়ার মাধ্যমে ব্যক্তির মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করা। অন্যথায় আল্লাহ তায়ালা উল্লিখিত শাস্তির জন্য এর প্রতিটি অপরাধের সঠিক কারণ (ওয়াসফ মুনাসিব থাকায় বিষয়টি সমুন্নত) করেছেন। এসব ক্ষেত্রে মাসলাহার বৈধতার বিষয় সুনিশ্চিত এবং তা বিতর্কের জন্য আর উন্মুক্ত নয়। আলেমগণ একমত হয়েছেন যে, এসব মূল্যবোধের বিকাশ ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য আইন প্রণয়নের সঠিক কারণ সৃষ্টি হয়েছে। বস্তুতপক্ষে আল্লাহ তায়ালা এগুলো সমুন্নত করেছেন যা এগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আইন প্রণয়নসহ গৃহীত সব ব্যবস্থার প্রতি তার অনুমতি ও অনুমোদনের সমতুল্য।[২৩]

ওহি নাজিল বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর যেসব মাসলাহাকে বৈধতা প্রদান করা হয়েছে সেগুলো দ্বিতীয় শ্রেণির মাসলাহার অন্তর্ভুক্ত হবে। একে বলা হয়, মাসলাহা মুরসালাহা। যদিও প্রয়োজনীয় আইন হিসেবে স্পষ্ট বলে প্রতিষ্ঠিত করার সঠিক কারণের (ওয়াসফ মুনাসিব) ভিত্তিতে এগুলোও গঠিত হয়েছে। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা একে সমুন্নত অথবা বাতিল করেননি সেহেতু তা দ্বিতীয় শ্রেণির মাসলাহা গঠন করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, সাম্প্রতিক সময়ে অনেক মুসলিম দেশে বিবাহের পণ অথবা সম্পত্তির মালিকানা সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন ত্বরান্বিত করেছে মাসলাহা। কেবলমাত্র একটি সরকারি দলিলের মাধ্যমে এটি প্রমাণ করা যায়, শরিয়তে সুস্পষ্ট ভাষায় এর বৈধতা প্রদানের বিষয় দেখতে পাওয়া যায় না। এসব বিষয়ে আইন অবাধ মাসলাহাকে সমুন্নত করেছে, আরো স্পষ্টভাবে বলা যায়, এর লক্ষ্য হচ্ছে মাফসাদা (কষ্ট বা ক্ষত) প্রতিরোধ করা, যেমন দাবির প্রমাণ হিসেবে ব্যাপকভাবে প্রচলিত মিথ্যা হলফ (শাহাদাহ আল জুর) রোধ করা।[২৪]

তৃতীয় শ্রেণির মাসলাহা হচ্ছে অনানুমোদিত মাসলাহা বা মাসলাহা মুলগা। আল্লাহ তায়ালা এ মাসলাহাকে হয় স্পষ্ট ভাষায় বাতিল করেছেন অথবা নির্দেশনা দিয়েছেন যা শরিয়তে দেখতে পাওয়া যায়। আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, এ ধরনের স্বার্থ অর্জনের পক্ষে আইন অবৈধ এবং এর পক্ষে কোনো বিচারিক রায় দেয়া যাবে না। এর একটি উদাহরণ হলো, জনস্বার্থ রক্ষা হবে এ কথা ভেবে ছেলে ও মেয়ে সন্তানের উত্তরাধিকারের সমাধিকার প্রদান করার চেষ্টা। কিন্তু কুরআনে (সুরা আন নিসা, ৪ : ১১) এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট নস রয়েছে যাতে পুত্র সন্তানকে মেয়ে সন্তানের চেয়ে দ্বিগুণ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করা হয়েছে। তাই এ ঘটনার অনুমিত মাসলাহা স্পষ্টভাবে বাতিল (মুলগা) ঘোষিত হয়েছে।[২৫]

www.pathagar.com

উপরিউক্ত আলোচনার সার কথা হলো, শরিয়ত প্রত্যক্ষ বা ইঙ্গিতের মাধ্যমে যে মাসলাহাকে বৈধতা প্রদান করেছে, তা অনুমোদিত মাসলাহার অন্তর্ভুক্ত হবে। এর বিপরীত হচ্ছে মাসলাহা মুলগা যা অনুরূপ শরিয়াতি নির্দেশনার মাধ্যমে বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। এ ছাড়া শরিয়তে অনুমোদিত বা বাতিল হয়নি এমন সব বিষয়ের অবাধ মাসলাহা প্রযোজ্য হবে।

মাসলাহা মুরসালাহার শর্তাবলি (শুরুত)

মাসলাহা মুরসালাহার ওপর নির্ভরশীলতা বৈধতা দানের জন্য নিম্নোক্ত শর্তাবলি অবশ্যই পূরণ করতে হবে। এসব শর্তের লক্ষ্য হচ্ছে, আইনের ক্ষেত্রে মাসলাহা যাতে স্বেচ্ছাচারমূলক খায়েশ বা ব্যক্তি বিশেষের পক্ষপাতিত্বের হাতিয়ারে পরিণত হতে না পারে তা নিশ্চিত করা।

১. মাসলাহা অবশ্যই সঠিক (হাকিকিয়া) হতে হবে, এর বিপরীত হচ্ছে আপাত দৃষ্টিতে যথার্থ প্রতীয়মান মাসলাহা (মাসলাহা ওয়াহমিয়া) যা আইন প্রণয়নের সঠিক কারণ সৃষ্টি করে না। মাসলাহা ওয়াহমিয়া নিছক ক্ষীণ আভাস বা আপাত সঠিক বলে অনুমান (তাওয়াহুম) করা হয়, কোনো নির্দিষ্ট আইনের সম্ভাব্য লাভ বা ক্ষতির প্রয়োজনীয় হিসাব নিরূপণ করা ছাড়াই এভাবে তা উপকারী হবে বলে মনে করা যথেষ্ট নয়। অন্য কথায় এর পেছনে অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত সম্ভাবনা থাকতে হবে, তাহলো, মাসলাহা অর্জনে কোনো হুকম কার্যকর করলে তা থেকে যে কল্যাণ পাওয়া যাবে তা ক্ষতির চেয়ে অনেক বেশি হবে। খাল্লাফের মতে আপাত সঠিক মাসলাহার একটি উদাহরণ হলো, স্বামীর তালাক দেয়ার অধিকার বিলুপ্ত করে তা পুরোপুরি আদালতের ওপর ন্যস্ত করা।[২৬]

সঠিক মাসালিহ হলো সেগুলো যা উপরোল্লিখিত পাঁচটি অত্যাবশ্যকীয় মূল্যবোধকে রক্ষা করবে বলে মনে করা হয়। উদাহরণ হলো– ধর্ম বিশ্বাসকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে বিদ্রোহ (ফিতনা) এবং ধর্মীয় বিষয়ে নবোদ্ভাবনীর (বিদাত) প্রচার রোধ করা। এ ছাড়া এর অর্থ কুরআনের মূলনীতি অনুযায়ী ধর্ম বিশ্বাসের স্বাধীনতাও রক্ষা করা। কুরআনে বলা হয়েছে, 'ধর্মের ব্যাপারে কোনো জোরজবরদস্তি নেই' (আল বাকারা ২ : ২৫৬)। অনুরূপভাবে বেঁচে থাকার অধিকার, এর মধ্যে রয়েছে মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের উপায়-উপকরণের নিরাপত্তা বিধান, যেমন– কাজ করার স্বাধীনতা, কথা বলার স্বাধীনতা ও চলাচলের স্বাধীনতা। বুদ্ধি বিবেকের (আকল) স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রয়োজন শিক্ষার উন্নয়ন এবং সমাজকে

www.pathagar.com

অপশিক্ষার বিপর্যয় থেকে রক্ষা করা, যা ব্যক্তিকে দুর্নীতিপরায়ণ করে তোলে এবং তাকে সমাজের জন্য বুঝায় পরিণত করে। উপরন্তু বংশধারার শুদ্ধতা (নাসল) রক্ষার জন্য পরিবারকে রক্ষা এবং এমন অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা যাতে শিশুদের পরিচর্যা ও হেফাজত করা সম্ভব হয়। এবং শেষোক্ত বিষয়টি হচ্ছে সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান, এ জন্য মালিকানার অধিকার রক্ষা করা প্রয়োজন। এ ছাড়া এর অর্থ হলো, সমাজে সুষ্ঠু ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বৈধ পন্থায় পণ্য ও সেবা বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি করা।[২৭]

২. দ্বিতীয় শর্ত হলো, মাসলাহা অবশ্যই সবার জন্যই (কুল্লিয়াহ্) হতে হবে, অর্থাৎ তা বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জন্য নয়। তা সার্বিকভাবে সব মানুষের জন্য, কল্যাণ লাভ নিশ্চিত করবে ও অনিষ্ট রোধ করবে। এর অর্থ হলো ইস্তিস্লাহর ভিত্তিতে হুকম কার্যকর করার ক্ষেত্রে অবশ্যই জনগণের সম্ভব বৃহত্তম অংশের কল্যাণ প্রদানের কথা চিন্তা করতে হবে। যদি সামাজিক ও রাজনৈতিক মর্যাদা বিবেচনা ছাড়াই কিছু লোকের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করা হয় তাহলে তা মাসলাহা হবে না। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণ লাভের ধারণা থেকেই মাসলাহার ধারণার সার্বিক বৈধতা পাওয়া গেছে।[২৮]

৩. সব শেষে নস ও ইজমায় সমুন্নত মূলনীতির সাথে মাসলাহার অবশ্যই কোনো বিরোধ দেখা দিতে পারবে না। এর উদাহরণ হলো, যুক্তি দেখানো হয় যে, আধুনিক যুগের মাসলাহায় সুদকে বৈধ করা প্রয়োজন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যেভাবে সুদের চর্চা হচ্ছে সে কারণে এটি করা দরকার। কিন্তু বিষয়টি কুরআনের সুস্পষ্ট নসের বিরোধী। আবু জাহরাহ্ উল্লেখ করেন যে, আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় যেভাবে সুদের ব্যবহার করা হচ্ছে তা কুরআনের নিষিদ্ধের আওতায় পড়ে না। এ মতে নস লঙ্ঘিত হয়েছে তাই মাসলাহার এ ধারণা নাকচ হয়ে গেছে।[২৯]

ইমাম মালিক উপরের শর্তাবলির সাথে আরো দু'টি শর্ত যোগ করেছেন, তার একটি হলো, মাসলাহা অবশ্যই যুক্তিযুক্ত (মাকুনা) হতে হবে এবং সুষ্ঠু জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তিদের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হবে। আরেকটি শর্ত হলো, মাসলাহা অবশ্যই লোকদের কষ্ট দূর করবে যা হলো উপরে উদ্ধৃত কুরআনের (সুরা মায়েদা, ৫ : ৬) প্রধান উদ্দেশ্য।[৩০]

এ ছাড়া আল গাজ্জালীর মতে, মাসলাহার বৈধতা প্রাপ্তির জন্য তা অবশ্যই জরুরি বিষয় (মাসলাহা আল জরুরিয়াত) হতে হবে। এ বিষয়ে আল গাজ্জালী উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, যুদ্ধ ক্ষেত্রে যদি কাফেররা একদল মুসলমানকে জিম্মি হিসেবে আটক

www.pathagar.com

করে এবং পরিস্থিতি যদি এমন হয় যে, সব মুসলমানের নিরাপত্তা ও যুদ্ধে জয়ের জন্য এদের জীবনদান প্রয়োজন হয়ে পড়ে, সে ক্ষেত্রে আল গাজ্জালী মাসলাহা আল জরুরিয়াত হিসেবে তা করার অনুমতি দিয়েছেন।[৩১] অবশ্য আল গাজ্জালীর এ যুক্তির দুর্বলতা রয়েছে। তার এ উদাহরণের অনুমিত মাসলাহায় নিরীহ মুসলমানদের হত্যার সুযোগ করে দেয়া হয়েছে এবং শরিয়তে এর বৈধতার কোনো ইঙ্গিত দেখতে পাওয়া যায় না।[৩২]

মাসলাহা মুরসালাহা সম্পর্কে আল তুফীর অভিমত

ফকিহদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট নির্দেশনার উপস্থিতিতে ইস্তিস্লাহ অবলম্বনের অনুমতি না দেয়া সত্ত্বেও বিশিষ্ট হাম্বলী ফকিহ নজম আল দীন আল তুফী এর বিপরীতে স্বমতে অটল রয়েছেন। তিনি নসের উপস্থিতি থাকুক বা না থাকুক মাসলাহা অবলম্বনকে অনুমোদন করেছেন। 'আল মাসালিহ আল মুরসালাহা' নামক গবেষণা গ্রন্থে 'ইসলামে কেউ কারোর ওপর জুলুম করে না এবং নিজেও জুলুমের শিকার হয় না', এ হাদিসের ব্যাখ্যায় আল তুফী যুক্তি দেখান যে, এ হাদিসটি হচ্ছে মাসলাহার পক্ষে একটি সুস্পষ্ট নস। এতে ইসলামের প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি অভিব্যক্ত হয়েছে এবং অন্যান্য সব বিষয় বিবেচনায় মাসলাহাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। আল তুফী ইবাদত-বন্দেগী ও সুনির্দিষ্ট আদেশ-নিষেধ, যেমন– সুনির্দিষ্ট শাস্তিকে মাসলাহার আওতার বহির্ভূত রেখেছেন। এসব ক্ষেত্রের বিধিবিধান কেবলমাত্র নস ও ইজমার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবে। ইবাদতের বিষয়ে নস ও ইজমা পরস্পরকে অনুমোদন করলে তা হবে চূড়ান্ত দলিল এবং অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। নস ও ইজমার মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে সে ক্ষেত্রে উভয়ের কোনোটির অখণ্ডতায় হস্তক্ষেপ ছাড়াই সমন্বয় করা সম্ভব হলে তা করতে হবে। কিন্তু যদি তা করা সম্ভব না হয় তাহলে অন্যান্য নির্দেশনার চেয়ে ইজমাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।[৩৩]

লেনদেনে ও পার্থিব বিষয় (আহকাম আল মুয়ামালাত ওয়া আল সিয়াসিয়াত আল দুনাইয়াহ) সম্পর্কে আল তুফীর অভিমত হচ্ছে, কোনো নির্দিষ্ট ব্যাপারে কুরআনের আয়াত ও শরিয়াহর অন্যান্য দলিল যদি জনগণের মাসলাহার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে তা প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু তা যদি এর বিপরীত হয় তাহলে মাসলাহাকে এগুলোর ওপর অগ্রাধিকার দিতে হবে। এখানে প্রকৃতপক্ষে নসের সাথে মাসলাহার বিরোধ ঘটেনি বরং এক নসের সাথে অন্য নসের বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। পরেরটি হচ্ছে ওই হাদিস 'লা দাররা ওয়ালা দিরারা ফিল ইসলাম'।[৩৪] তাই মাসলাহা অর্জন সম্পর্কিত আয়াতের আলোকে কাজ করতে কোনোক্রমে ব্যর্থ হওয়া চলবে না। এ প্রক্রিয়া একটি নসের প্রয়োগ অন্য একটি নসের কারণ দ্বারা

www.pathagar.com

নিয়ন্ত্রিত করা বোঝাচ্ছে, তা স্থগিত বা রহিত করা বোঝাচ্ছে না। এ হচ্ছে সুনির্দিষ্টকরণ (তাকসিছ) ও ব্যাখা (বায়ান), ঠিক যেমনটি অনেক সময় সুন্নাহকে কুরআনের চেয়ে অগ্রাধিকার দেয়া হয় কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যাদান পদ্ধতির দ্বারা।[৩৫]

লেনদেন ও সরকারি কাজকর্মের প্রসঙ্গে আল তুফী বলেছেন, মাসলাহা লক্ষ্য গঠন করে; আর অন্যান্য দলিল হচ্ছে তার মাধ্যম বা উপায়। তাই লক্ষ্য উপায়ের চেয়ে অগ্রাধিকার পাবে। এ ব্যাপারে শরিয়াহর বিধান জনগণের মাসালিহ্ অর্জন নিশ্চিত করার জন্য প্রবর্তন করা হয়েছে এবং 'লা দাররা ওয়ালা দিরারা ফিল ইসলাম' হাদিসের নস থেকে স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে যে, মাসলাহা অবশ্যই অগ্রাধিকার পাবে।[৩৬] তুফীর এ মূলনীতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আল মাহাসানীর মন্তব্য হচ্ছে, তার এ কথার অর্থ হচ্ছে কুরআনের আয়াতের প্রতিটি বিধানের লক্ষ্য হলো 'জনস্বার্থে এ বিধান ছাড়া অন্যকোনো বিধানের প্রয়োজন নেই'।[৩৭]।

ইস্তিস্লাহ্, কিয়াস ও ইস্তিহছানের মধ্যে পার্থক্য

ফকিহ্ কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে শরয়ী বিধান কী হবে তা নির্ণয়ের জন্য অবশ্যই কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার কথা উল্লেখ করবেন। এসব উৎসে কোনো সমাধান পাওয়া না গেলে সে ক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই খোদায়ী বিধান ও উদ্ভূত সমস্যার অভিন্ন ইল্লত শনাক্ত করে কিয়াস অবলম্বন করতে হবে। অবশ্য কিয়াসের মাধ্যমে প্রাপ্ত সমাধান দুর্ভোগ বা অনাকাঙ্ক্ষিত পরিণামের পথ প্রশস্ত করে, সে ক্ষেত্রে তিনি পছন্দনীয় সমাধানের উপযোগী বিকল্প কিয়াসের সপক্ষে এ সমাধান উপেক্ষা করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে ইল্লত অপেক্ষাকৃত কম স্পষ্ট হলেও চলবে। এ বিকল্প কিয়াস হলো পছন্দনীয় কিয়াস বা ইস্তিহছান। অবশ্য যে ক্ষেত্রে কোনো কিয়াস প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না সে ক্ষেত্রে ফকিহ্ মাসলাহা মুরসালাহা অবলম্বন করতে এবং একটি বিধান প্রণয়ন করতে পারেন, যা তার মতে, কল্যাণকর উদ্দেশ্য পূরণ করতে অথবা সম্ভাব্য ক্ষতি রোধ করতে পারে।[৩৮]

এভাবে দেখা যাচ্ছে যে, মাসলাহা মুরসালা ও কিয়াসের অভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তাহলো যেসব বিষয়ে নুসুস ও ইজমার সুস্পষ্ট কোনো বিধান পাওয়া যায় না সেসব ক্ষেত্রে উভয়ই প্রয়োগযোগ্য। তাদের পরস্পরের মধ্যে এ অর্থে মিল রয়েছে যে, উভয়ে যে কল্যাণ অর্জনের চেষ্টা করে তা সম্ভাব্যতা বা যন্নীর ভিত্তিতে করা হয়। কিয়াসের ক্ষেত্রে ইল্লত বা যৌক্তিক বিবেচনার আকারে বা মাসলাহা মুরসালাহার ক্ষেত্রে কল্যাণ অর্জনে ব্যবহৃত হয়। অবশ্য নির্দিষ্ট কয়েকটি ক্ষেত্রে কিয়াস ও মাসলাহা মুরসালাহার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কিয়াসের থেকে যে কল্যাণ লাভ হয়

www.pathagar.com

তা আল্লাহ তায়ালার একটি নির্দেশনার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নসের সাথে কিয়াসের যথার্থতা প্রতিপন্ন করার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট ইল্লত শনাক্ত করা হয়। কিন্তু মাসলাহা মুরসালাহার মাধ্যমে যে কল্যাণ লাভের চেষ্টা করা হয় প্রতিষ্ঠিত আইনে তার পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো ভিত্তি নেই। অন্য কথায় মাসলাহা মুরসালাহা নিজেই তার যথার্থতা প্রতিপন্ন করে, অন্যদিকে কিয়াস হচ্ছে একটি বিরাজমান বিধানের সম্প্রসারণ।

এ ব্যাখ্যায় মাসলাহা মুরসালাহা ও ইস্তিহছানের মধ্যকার প্রধান পার্থক্যও স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। মাসলাহা-মুরসালাহা যে বিধানের ভিত্তিতে গঠিত তা এ অর্থে মৌলিক যে তা বিরাজমান দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে না, আবার তা উপেক্ষাও করে না। ইস্তিহছান কেবলমাত্র এমন ঘটনায় প্রয়োগ করা হয় যার দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায় (সাধারণত কিয়াসের আকারে)। কিন্তু ইস্তিহছান বিকল্প বিধানের পক্ষে একে উপেক্ষাও করতে চায়। এটা বিকল্প লুকায়িত কিয়াসের (কিয়াস খফি) আকারে হতে পারে অথবা বিরাজমান আইনের একটি ব্যতিক্রমও হতে পারে এবং এর প্রত্যেকটিতে ইস্তিহছানের ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রকাশ পেয়েছে।[৩৯]

মাসলাহা নিয়ে বিতর্ক

ইস্তিস্লাহর বিরোধীরা যেসব যুক্তি দেখান তার প্রধান দিক হলো শরিয়ত সব মাসলাহার বিষয়কে পরিপূর্ণভাবে স্বীকৃতি দেয়। এর সব কিছুই পুরোপুরি এর আওতাধীন এবং শরিয়াহর বহির্ভূত কোনো মাসলাহা নেই। এ হলো জাহেরি ও আল আমিদীর মতো অনেক শাফেয়ী এবং মালেকী ফকিহ ইবনে আল হাজিবের মত। তারা মাসলাহাকে নিজ অধিকার বলে দলিল হিসেবে স্বীকৃতি দেননি। তাদের মতে, মাসালিহর সব কিছুই একান্তভাবে নুসুসের মধ্যে নিহিত রয়েছে। শরিয়ত যখন কোনো বিষয়ে পুরোপুরি নীরব থাকে তখন এটি নিশ্চিত হয়ে যায় যে, আলোচ্য মাসলাহা আপতদৃষ্টিতে সঠিক মাসলাহা (মাসলাহা ওয়াহমিয়া) ছাড়া কিছু নয় এবং তা আইনের বৈধ কারণও নয়।[৪০]

অন্যদিকে হানাফীগণ এবং শাফেয়ীদের অধিকাংশ ফকিহ অপেক্ষাকৃত নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন। তাদের মতে, মাসালিহ হয় সুস্পষ্ট নুসুসের দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে অথবা প্রদত্ত আয়াতের যুক্তিতে (ইল্লত) কিংবা এমনকি আল্লাহ তায়ালার সাধারণ উদ্দেশ্যও নির্দেশিত হতে পারে। কেবলমাত্র কুরআন-সুন্নাহর সমর্থন বা নির্দেশনার উপস্থিতিই মাসলাহা আইনের বৈধ ভিত্তি গঠন করতে পারে। এই মত অনুযায়ী কারণ (ইলাল) শনাক্তকরণ ও উদ্দেশ্য নির্ণয় ইল্লতের এক ধরনের অনুসন্ধান বুঝায়, যা কিয়াসের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়। এ মত ও জাহিরিদের মতের

www.pathagar.com

মধ্যে প্রধান পার্থক্য হচ্ছে, এ মতে এমনকি সুনির্দিষ্ট নসের অনুপস্থিতিতেও যৌক্তিকতা ও স্পষ্টভাবে উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে মাসলাহাকে বৈধতা প্রদান করা হয়েছে। উভয় মত এ যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, মাসলাহা যদি নুসুসের সমুন্নত মূল্যবোধের দ্বারা পরিচালিত না হয় তাহলে স্বেচ্ছাচারমূলক খায়েশের সাথে মাসলাহা গুলিয়ে যেতে পারে। এতে দুর্নীতি ও পাপের (মাফসাদা) পথ প্রশস্ত হতে পারে। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, শাসক ও প্রশাসকদের নির্দেশে এ ধরনের ঘটনা বারবার ঘটেছে। তারা মাসলাহার নামে ব্যক্তিগত ইচ্ছা পূরণকে যথার্থ বলে চালিয়ে দিয়েছেন। এটি পরিহারের উপায় সম্পর্কে কুরআনের (সুরা কিয়ামায়, ৭৫ : ৩) নির্দেশনা হয়েছে। এ আয়াতে বলা হয়েছে : 'মানুষ কী মনে করে নিয়েছে যে, তাদেরকে এমনিতেই ছেড়ে দেয়া হবে?' অতএব মাসলাহা অবশ্যই আল্লাহ্ তায়ালা যে মূল্যবোধ সমুন্নত করেছেন তার দ্বারা পরিচালিত হবে। তাই শরিয়াহ্র নির্দেশনার দ্বারা সত্য বলে প্রমাণিত না হলে তা কোনো মাসলাহা হবে না।[৪১] ইস্তিহ্ছান সম্পর্কে মন্তব্যকালে ইমাম গাজ্জালী লিখেছেন : 'আমরা জানি যে মাসলাহা সব সময়ই শরিয়াহ্র নির্দেশনা অনুসরণ করে। ইস্তিহ্ছান এ ধরনের নির্দেশনার দ্বারা পরিচালিত হয় না সে কারণে তা একটি খেয়ালি অভিমত বৈ কিছু নয়।' মাসলাহা মুরসালা সম্পর্কে গাজ্জালীর মত হচ্ছে, যখন আল্লাহ্ তায়ালা কর্তৃক অনুমোদিত হয় না তখন তা ইস্তিহ্ছানের মতোই হয়।[৪২] আল গাজ্জালী 'শরিয়ত স্বীকৃত' মাসলাহার স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং তাহলো কোনো নসে ওই মাসলাহা নির্দেশিত হয়েছে। এ ছাড়া তিনি সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনে মাসলাহা মুরসালাহা অনুমোদন করেছেন এবং সেগুলো হলো মাসলাহা জরুরিয়াত। গাজ্জালী সুনির্দিষ্ট জরুরি প্রয়োজন ছাড়া মাসলাহাকে বৈধ বলে মনে করেননি। এরই ভিত্তিতে আল গাজ্জালী অন্য দুই প্রকার মাসলাহা, সম্পূর্ণ মাসলাহা (হাজিয়াত) ও অলঙ্করণ মাসলাহা (তাহাসিনাত) অনুমোদন করেননি।[৪৩] আল গাজ্জালী মাসলাহা বৈধ হওয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট জরুরি প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। অবশ্য তিনি মাসলাহা মুরসালাহা সম্পর্কে আর কিছু বলেননি। কিন্তু প্রয়োজন (জরুরি) সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস এবং দু'টি বিষয় ভিন্ন ধরনের সুনির্দিষ্ট বিধিবিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।[৪৪] তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দেখা যাবে যে, এ মত কেবলমাত্র মাসলাহা মুতাবারাহ্ বলে উল্লেখিত মাসলাহাকে বৈধতা প্রদান করেছে।

ইস্তিস্লাহর বিরোধীরা আরো বলেন যে, ইস্তিস্লাহকে শরিয়াহ্র দলিল হিসেবে মেনে নিলে বৈষম্য, এমনকি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পথ প্রশস্ত হবে। হালাল ও হারাম বিধান কোন কোন স্থানে বা কোন কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এবং অন্যদের ক্ষেত্রে হবে না। এটিতে কেবল শরিয়াহ্র স্থান ও কাল নির্বিশেষে বৈধতা লঙ্ঘিত হবে তা নয় উপরন্তু দুর্নীতির দ্বার উন্মোচিত করবে।[৪৫]

আগে বলা হয়েছে যে, হানাফী ও শাফেয়ীগণ ইস্তিস্লাহকে একটি স্বতন্ত্র দলিল হিসেবে গ্রহণ করেননি। শাফেয়ীগণ কেবলমাত্র কিয়াসের সাধারণ পরিধির মধ্যে মাসলাহাকে অনুমোদন করেছেন অন্যদিকে আবু হানিফা এক ধরনের ইস্তিহছান হিসেবে একে বৈধতা প্রদান করেছেন। হানাফী ও শাফেয়ী উভয়ে মাসলাহার শর্তের ব্যাপারে নীরব কেন তার ব্যাখ্যা এখানে পাওয়া গেছে। কারণ তারা উভয়ে একে যথাক্রমে কিয়াস ও ইস্তিহছান হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তারা তাদের অবস্থানকে যেভাবে বিবেচনা করেছেন তা হলো : নুসুসে মাসলাহার অনুমোদন থাকলে তা হবে অনুমোদিত মাসলাহা এবং তা আপনাআপনি কিয়াসের পরিধির আওতায় পড়বে। নুসুসে এ ধরনের অনুমোদন পাওয়া না গেলে সে ক্ষেত্রে তা হবে মাসলাহা মুলগা এবং তার কোনো গুরুত্ব থাকবে না। নসে ও নসের কিয়াসের পরিধির বাইরে এক প্রকার মাসলাহা থাকতে পারে এমন কথা বলা সঠিক হবে না। মাসলাহা মুরসালাহাকে একটি দলিল হিসেবে বহাল রাখার অর্থ হবে কুরআন ও সুন্নাহর নুসুসকে অসম্পূর্ণ রাখার শামিল।[৪৬]

ইস্তিস্লাহর বিরোধীরা আরো যুক্তি দেখান যে, আল্লাহ তায়ালা কিছু মাসালিহকে অনুমোদন করেছেন এবং অন্যগুলোকে বাতিল করে দিয়েছেন। তাদের মাঝে রয়েছে মাসলাহা মুরসালাহা যা এ দুই প্রকারের কোনোটির মধ্যেই পড়ে না। তাই তার বৈধ (মুতাবারা) বা অবৈধ (মুগলা) হওয়ার সম্ভাবনা সমভাবে উন্মুক্ত রয়েছে। যেহেতু এর বৈধতার ব্যাপারে কোনো নিশ্চয়তা নেই সেহেতু এর ভিত্তিতে কোনো আইন হতে পারে না, কারণ আইন অবশ্যই কোনো সন্দেহ নয়, নিশ্চয়তার ভিত্তিতেই গঠিত হতে হবে।

এর উত্তরে যুক্তি দেখানো হয় যে, আল্লাহ তায়ালা কতিপয় মাসালিহ নিষিদ্ধ করেছেন এ কারণে নয় যে, তাতে কোনো কল্যাণ নেই বরং অন্য ও উচ্চতর মাসালিহর সাথে তাদের বিরোধের কারণে অথবা তাদের বড় ধরনের গোনাহের পথ প্রশস্ত করার কারণে। এসব বিবেচনায় কোনোটিই মাসলাহা মুরসালাহার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়নি, কারণ এর থেকে যে কল্যাণ পাওয়া যায় তা সম্ভাব্য ক্ষতির চেয়ে বেশি। এ কথা মনে রাখা দরকার যে, আল্লাহ তায়ালা প্রকাশ্যে যেসব মাসালিহ নিষিদ্ধ করেছেন (মাসালিহ মুলগা) তা সমুন্নত মাসালিহর তুলনায় খুবই নগণ্য। যখন আমরা কোনো মাসলাহা মুরসালাহার বিষয়ে উৎসসমূহে কোনো স্পষ্ট অনুমোদন দেখতে পাই না, তবে দৃশ্যত কল্যাণকর মনে হয়, সে ক্ষেত্রে তা অধিকতর ব্যাপক ও প্রাচুর্যের (কাসির আল গালিব) অংশ হিসেবে অনুমিত হয়, সীমিত ও বিরলের (কালিল আল নাদির) অংশ নয়।[৪৭]

www.pathagar.com

জাহিরিগণ ধারণামূলক কোনো সাক্ষ্যকে শরিয়াহর কোনো দলিল হিসেবে মেনে নেয়নি। মাসলাহা দূরে থাক, এমনকি কিয়াসকেও তারা অবৈধ বলে গণ্য করেছেন এ কারণে যে, কিয়াস ধারণামূলকের অংশ। শরিয়াহর বিধিবিধান অবশ্যই নিশ্চয়তার ভিত্তিতে গঠিত হতে হবে এবং কেবলমাত্র কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার সুস্পষ্ট নির্দেশের ক্ষেত্রে এটি সত্য। এগুলো ছাড়া অন্য কিছু হচ্ছে নিছক অনুমান-যা পরিহার করা প্রয়োজন।[৪৮] সাহাবিগণ তাদের নিজস্ব রায় অনুযায়ী যেসব ফতোয়া জারি করেছেন তা মাসলাহার অংশ হতে পারে। ইবনে হাজম দ্ব্যর্থহীনভাবে এ কথা বলেছেন যে, 'এসব বিবরণ কারোর জন্য বাধ্যতামূলক নয়'।[৪৯] তাই দেখা যাচ্ছে যে, জাহিরিগণ মাসলাহা মুরসালাহাকে গ্রহণ করেননি, তাদের মতে, তা ব্যক্তিগত মতের (রায়) ভিত্তিতে গঠিত হয়েছে।[৫০]

অন্যদিকে মালেকী ও হাম্বলীগণ মনে করেন যে, মাসলাহা মুরসালাহা কর্তৃত্ব প্রদায়ক এবং এর ভিত্তিতে কাজ করাকে বৈধতা প্রদানের জন্য যেটি করা দরকার তা হলো এর শুদ্ধতা নিশ্চিত করার সব শর্ত পূরণ করতে হবে। যখন এসব শর্ত পূরণ করা হবে তখন এমনকি নির্দিষ্ট নসের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও মাসলাহা আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হবে। আহমদ ইবনে হাম্বল ও তার অনুসারীগণ মাসলাহার ভিত্তিতে অনেক ফতোয়া প্রদান করেছিলেন বলে জানা গেছে। তারা শরিয়াহর একটি দলিল এবং ধর্ম বিশ্বাস সুরক্ষা, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা ও মাফসাদা রোধের একটি উপায় হিসেবে একে সমুন্নত রেখেছিলেন। এভাবে তারা গোয়েন্দাগিরির জন্য মৃত্যুদণ্ড দানকে বৈধতা প্রদান করেছেন, কারণ তাদের কর্মকাণ্ডে মুসলিম জনগণের মাসলাহাকে লঙ্ঘিত হয়। হাম্বলীগণও জনগণের মাসলাহার রক্ষার প্রয়োজনে মাসলাহার ভিত্তিতে বেদাত প্রচারকারীদের মৃত্যুদণ্ড দানকে বৈধতা প্রদান করেছেন। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে মালিকীদের মতো হাম্বলীরাও মাসলাহার প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করার ওপর জোর দিয়েছেন। মাসলাহা অবশ্যই শরিয়াহর বৈধ উদ্দেশ্য অর্জন এবং সঠিক বুদ্ধিবৃত্তিক নির্দেশনা দান করবে এবং এমন সব বিষয়ের ওপর কাজ করবে যা কল্যাণকর উদ্দেশ্য পূরণ করবে অথবা জনগণের অনিষ্ট রোধ করবে।[৫১] মালিকী মূলনীতির আলোকে মাসলাহার কতিপয় সুদূরপ্রসারী উদাহরণের সারসংক্ষেপ নিম্নে তুলে ধরা যেতে পারে :

১. ইমাম মালিক মাফদুলের কাছে অর্থাৎ ইমাম পদে অধিষ্ঠিত দু'জন যোগ্য প্রার্থীর মধ্য থেকে অপেক্ষাকৃত কম যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীর কাছে বাইয়াত গ্রহণকে (আনুগত্যের শপথ) বৈধতা প্রদান করেছেন যাতে মুসলিম সমাজ জীবনে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য রোধ করা যায়।[৫২]

www.pathagar.com

২. বায়তুলমালে (রাজকোষ) যখন অর্থ সঙ্কট দেখা দেয় তখন ইমাম সরকারের জরুরি প্রয়োজন পূরণে ধনাঢ্য ব্যক্তিদের ওপর অতিরিক্ত করারোপ করতে পারবেন কারণ, এটি করা না হলে সমাজে ব্যাপকভাবে অবিচার ও বিদ্রোহ (ফেতনা) ছড়িয়ে পড়তে পারে।[৫৩]

৩. কোনো মুসলমানের বেঁচে থাকার জন্য যদি বৈধ পন্থায় উপার্জনের সব পথ রুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং ওই পরিস্থিতিতে সে যদি অন্যত্র চলে যেতে না পারে, তাহলে তার বেঁচে থাকার জন্য একমাত্র উপায় হবে অবৈধ পেশায় জড়িত হওয়া, ওই ক্ষেত্রে সে তা করতে পারবে, তবে সে অতটুকুই করতে পারবে যতটুকু করা তার বেঁচে থাকার জন্য অত্যন্ত জরুরি।[৫৪]

উপসংহার

মাসলাহা সম্পর্কে ভিন্ন মত থাকা সত্ত্বেও চারটি আহলে সুন্নাত আল জামায়াতের নেতৃস্থানীয় আলেমগণ নীতিগতভাবে একমত হয়েছেন যে, আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যের (মাকাসিদ) পরিপন্থী নয় এমন সব মাসালিহ্ অবশ্যই সমুন্নত করা হবে। খাল্লাফ ও আবু জাহরাহ উভয়ে তাদের অনুসন্ধান থেকে এ উপসংহারে উপনীত হয়েছেন।[৫৫] মাসলাহা সম্পর্কে শাফেয়ী ও হানাফী দৃষ্টিভঙ্গি মূলত একই রকম, মালেকী ও হাম্বলী মাজহাবের ক্ষেত্রেও একই কথা, তবে শাফেয়ী ও হানাফী মাজহাবের ক্ষেত্রে একমাত্র পার্থক্য হলো তারা মাসলাহা ও কিয়াসের মধ্যে একটি অভিন্ন কারণ শনাক্তযোগ্য ইল্লত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। শিহাব আল দীন আল কারাফীসহ অনেক মালেকী ফকিহর মতে, সব ফকিহ মাসলাহা মুরসালাহার ধারণা ও এর বৈধতার ব্যাপারে মূলত একমত পোষণ করেছেন। তারা কেবলমাত্র পদ্ধতির ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। তাদের কেউ কেউ মাসলাহাকে সরাসরি গ্রহণ করেছেন অন্যরা কিয়াসের আওতাধীন এনে তাকে গ্রহণ করেন।[৫৬] কিন্তু মাসলাহা সম্পর্কে ইমাম মালিকের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে চারটি সুন্নিহ মাজহাবের মধ্যে সবচেয়ে সুদূরপ্রসারী। যেহেতু মাসলাহা সব সময়ই আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয় সেহেতু তা নিজেই একটি নিয়মে পরিণত হয়েছে। মাসলাহা মুরসালাহা কুরআনের সাধারণ (আম) নির্দিষ্টকরণের মতো, যেমন কুরআনের 'আম' কিয়াসের দ্বারা নির্দিষ্ট হতে পারে। সঠিক মাসলাহা ও খবরে ওয়াহেদ (হাদিস) এর মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে পূর্বেরটি পরেরটির চেয়ে অগ্রাধিকার পাবে।[৫৭]

জীবনের পরিবর্তনশীল অবস্থায় নতুন নতুন কল্যাণ অর্জনের পথ কখনো রুদ্ধ হয়ে যায় না। যদি আল্লাহ তায়ালা প্রকাশ্যে যেসব মূল্যমান ঘোষণা করেছেন কেবল তার মধ্যেই আইনকে সীমাবদ্ধ করে রাখা হতো তাহলে শরিয়ত অনিবার্যভাবে সমাজের

www.pathagar.com

মাসালিহ পূরণে বেশি দূর অগ্রসর হতে পারত না। মাসালিহর দরজা বন্ধ করে দেয়া হলে তা হতো সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে শরিয়াহর খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে অচলাবস্থা সৃষ্টি এবং অপ্রয়োজনীয় বিধিনিষেধ আরোপের শামিল। আবদুল ওয়াহাব খাল্লাফ যথার্থই বলেছেন যে, শরিয়াহর নুসুসে সব কিছুই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং তা সব পরিস্থিতি মোকাবেলায় সমর্থ এ কথা মোটেই সঠিক নয়। একই লেখক আরো বলেছেন : 'অনেক মাসালিহ রয়েছে যাকে শরিয়ত সুনির্দিষ্টভাবে না অনুমোদন করেছে না দোষণীয় বলেছে'।[৫৮]

মাসলাহা মুরসালাহার বিরোধীরা এ ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে, এ নীতি বৈধতা প্রদান করা হলে স্বেচ্ছাচারী ও আপন স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টাকারীরা মাসলাহার ব্যানারে নিজেদের ইচ্ছা পূরণের পথ তৈরি করতে সক্ষম হবে। তাদেরকে কেবল এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া দরকার যে, মাসলাহার সাথে যেসব শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে তা সতর্কতার সাথে পালন করা হলে কেবলমাত্র জনগণের যথার্থ স্বার্থ নিশ্চিত হবে, যা শরিয়াহর উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি হওয়ার মানোত্তীর্ণ হবে। এ উদ্বেগ যে যথার্থ তা স্বীকার করছি, কিন্তু এ বিষয়টি কেবল মাসলাহার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করা যেতে পারে না। কোনো সমাজে ও কোনো বিচারব্যবস্থা থেকে স্বেচ্ছাচারিতা ও আপন স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা কখনোই পুরোপুরি নির্মূল করা সম্ভব হয়নি। এটি হচ্ছে একটি স্থায়ী হুমকি যা অবশ্যই সতর্কতার সাথে দমন করতে এবং সম্ভব সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু ইস্তিস্লাহর ভিত্তিতে গঠিত আইনের বৈধতাকে অস্বীকার করা হলে এ প্রচেষ্টা মুখ থুবড়ে পড়বে। মাসলাহার ব্যানারে স্বেচ্ছাচারী স্বার্থসিদ্ধির অসদুদ্দেশ্য মোকাবেলা করতে হলে মুজতাহিদ ও ইমামকে সমাজ থেকে অন্যায় ও পাপ রোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন প্রবর্তন করতে সক্ষম হতে হবে, আর তাহলেই এ ক্ষেত্রে নিশ্চিত ব্যাপক সাফল্যের সম্ভাবনা রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে মাসলাহার বিরোধীদের উত্থাপিত যুক্তিগুলো বাহ্যত আকর্ষণীয় ও আত্মপরাজয়মূলক বলে মনে হবে।

টিকা

১. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৮৪; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ২০৯।

২. গাজ্জালী মুস্তাস্ফা, ১, ১৩৯-৪১।

৩. বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ২১০; সাবুনি, মাদখাল, পৃষ্ঠা ১৩১।

৪. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৮৪।

৫. বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ২১০; সাবুনি, মাদখাল, পৃষ্ঠা ১৩৪।

৬. শাতিবী, মুওয়াফাকাত, ২, ২-৩; মাদখাল, পৃষ্ঠা ১৩৪।

www.pathagar.com

৭. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৮৪; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ২১১।

৮. তুলনীয়, শাতিবী, মুওয়াফাকাত, ২, ৩; মুস্তাফা জায়েদ, মাসলাহা, পৃষ্ঠা ২৫।

৯. ইবনে মাজাহ, সুনান, হাদিস নম্বর ২৩৪০।

১০. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৮৪; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ২২২।

১১. মুসলিম, সহিহ মুসলিম, পৃষ্ঠা ৪১২, হাদিস নম্বর ১৫৪৬।

১২. আবু দাউদ, সুনান (হাসান অনূদিত) ৩, ১০২০, হাদিস নম্বর ৩৫৮৭।

১৩. ইবনে আল কাইয়িম, ইলাম, ২, ২৪২; মুস্তাফা জায়েদ, মাসলাহা, পৃষ্ঠা ১২০।

১৪. শাতিবী, ইতিসাম, ২, ২৮৭; খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৮৬।

১৫. ইবনে আল কাইয়িম, ইলাম, ১, ১৮৫; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ২২২-২২৩; মুস্তাফা জায়েদ, মাসলাহা, পৃষ্ঠা ৫২।

১৬. শাতিবী, ইতিসাম, ২, ২৯২, ৩০২; ইবনে আল কাইয়িম, ইলাম, ১, ১৮২; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ২২৩।

১৭. শাতিবী, ইতিসাম, ২, ২৯৩; খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৮৬; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ২২৩।

১৮. ইবনে আল কাইয়িম, তুরুক, পৃষ্ঠা ১৬।

১৯. শাতিবী, ইতিসাম, ২, ২৮২-৮৭, আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ২২৩।

২০. শাতিবী, মুওয়াফাকাত, ২, ৩-৫; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ২০৮।

২১. শাতিবী, মুওয়াফাকাত, ২, ৫; মুস্তাফা জায়েদ, মাসলাহা, পৃষ্ঠা ৫৪-৫৫।

২২. একই গ্রন্থ, ২, ২৭।

২৩. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৮৪; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ২০৯-১০।

২৪. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৮৫; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ২১৫।

২৫. বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ২০৯।

২৬. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৮৬।

২৭. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ২২০।

২৮. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৮৭; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ২১৪।

২৯. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ২১৯; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ২১৫।

৩০. শাতিবী, ইতিসাম, ২, ৩০৭-১৪; মুস্তাফা জায়েদ, মাসলাহা, পৃষ্ঠা ৫১।

৩১. গাজ্জালী মুস্তাস্ফা, ১, ১৪১।

৩২. বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ২১৫-১১৬।

৩৩. তুফী, মাসালিহ, পৃষ্ঠা, ১৩৯।

www.pathagar.com

৩৪. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা, ১৪১; মুস্তাফা জায়েদ, মাসলাহা, পৃষ্ঠা ২৩৮-৪০। এ গ্রন্থে একান্তভাবে মাসলাহা সম্পর্কে তুফীর মতবাদ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৩৫. তুলনীয়, মুস্তাফা জায়েদ, মাসলাহা, পৃষ্ঠা ১২১; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ২২৩। এ ছাড়া তুফীর মতবাদ সম্পর্কে অন্য যে গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে তা হলো, Kerr, Islamic Reform, পৃষ্ঠা ৯৭।

৩৬. তুফী, মাসালিহ, পৃষ্ঠা, ১৪১; মুস্তাফা জায়েদ, মাসলাহা, পৃষ্ঠা ১৩১-৩২।

৩৭. মাহমাসানী, ফালসাফাহ আল তাশরি, পৃষ্ঠা ১১৭। এ লেখকও তার মতের সমর্থনে শায়েখ মুস্তাফা আল গালাইনীর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন।

৩৮. তুলনীয়, সাবুনি, মাদখাল, পৃষ্ঠা ১৩৪-৩৫।

৩৯. তুলনীয়, বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ২১৬-১৭; সাবুনি, মাদখাল, পৃষ্ঠা ১৩৫।

৪০. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৮৮; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ২১৩।

৪১. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ২২১, ২২৪; খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৮৮; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ২১৩।

৪২. গাজ্জালী মুস্তাস্ফা, ১, ১৩৮।

৪৩. একই গ্রন্থ, ১, ১৩৯-৪০।

৪৪. তুলনীয়, বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ২১১।

৪৫. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৮৮।

৪৬. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ২২২; মুস্তাফা জায়েদ, মাসলাহা, পৃষ্ঠা ৬১; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ২১৩।

৪৭. বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ২১৪।

৪৮. ইবনে হাজম, ইহকাম, ৫, ২৫৫-৫৬।

৪৯. একই গ্রন্থ, ৬, ৪০।

৫০. মুস্তাফা জায়েদ, মাসলাহা, পৃষ্ঠা ৬২।

৫১. একই গ্রন্থ, ৬০।

৫২. শাতিবী, ইতিসাম, ২, ৩০৩।

৫৩. একই গ্রন্থ, ২, ২৯৫।

৫৪. একই গ্রন্থ, ২, ৩০০।

৫৫. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ২২৪; খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৮৫।

৫৬. কারাফী, ফুরুক, ২, ১৮৮; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ২২৫।

৫৭. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ২২৫।

৫৮. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৮৮।

www.pathagar.com

চতুর্দশ অধ্যায়

উরফ (প্রচলিত প্রথা)

মূল আরবি শব্দ 'আরাফা' (জানা বা চেনা) থেকে উরফ বিশেষ্যটি গঠিত হয়েছে। এর আক্ষরিক অর্থ হলো, 'ওই বিষয় যা জানা আছে'। প্রাথমিক অর্থে এটি হলো– জানা বিষয়, অজানার বিপরীত। পরিচিত ও প্রথানুগ যার বিপরীত হচ্ছে অপরিচিত ও আগন্তুক। উরফ ও আদা অনেকটা সমার্থক শব্দ এবং আলেমদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এদের এভাবে ব্যবহার করেছেন। কতিপয় পণ্ডিত এ দুই শব্দের মধ্যে পার্থক্য করেছেন এভাবে যে, আদা অর্থ বারবার অথবা ঘনঘন চর্চা করা এবং তা ব্যক্তি ও গোষ্ঠী উভয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আমরা ব্যক্তির অভ্যাসকে ব্যক্তিগত 'আদা' বলে উল্লেখ করি, কিন্তু উরফ এভাবে ব্যবহৃত হয় না। আমরা কারোর ব্যক্তিগত অভ্যাসকে তার উরফ বলে উল্লেখ করি না। বিপুলসংখ্যক মানুষের সম্মিলিত কাজের অভ্যাসকে উরফ বলা হয়ে থাকে। অল্প কিছু লোক– এমনকি একটি গোষ্ঠীর বেশ ছোট সংখ্যালঘু অংশের অভ্যাস উরফ গঠন করে না।[১]

উরফের সংজ্ঞায় বলা যায় অভ্যাসের পুনঃপুনঃ চর্চা যা সুষ্ঠু বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষজনের কাছে গ্রহণযোগ্য। এ সংজ্ঞা থেকে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে তা হলো, আইনগত সিদ্ধান্তের বৈধ ভিত্তি হওয়ার জন্য প্রচলিত প্রথাকে অবশ্যই সুষ্ঠু ও যুক্তিপূর্ণ হতে হবে। তাই কিছুসংখ্যক লোকের মধ্যে ঘনঘন চর্চায় কোনো কল্যাণ না হলে অথবা যা কোনো কুসংস্কার ও দুর্নীতির অংশ তাকে উরফের সংজ্ঞার বহির্ভূত রাখা হয়েছে।[২] উরফ ও এর ব্যুৎপন্ন শব্দ মারুফ কুরআনে দেখতে পাওয়া যায়। এ দুই শব্দের মধ্যে পরেরটি অপেক্ষাকৃত ঘনঘন উচ্চারিত হয়েছে। মারুফ শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো, পরিচিত। এর কুরআনিক প্রয়োগ ভালো-এর সমার্থক। এর বিপরীত হচ্ছে 'মুনকার' বা অপরিচিত বা 'অদ্ভুত' যা মন্দের সমার্থক। প্রধানত এ অর্থে কুরআনে উরফ ও মারুফ শব্দ ব্যবহৃত হতে দেখতে পাওয়া যায়। মুফাসসিরগণ সাধারণভাবে কুরআনে মারুফের যে অর্থ ব্যক্ত করেছেন তা হলো– আল্লাহর ও তাঁর রসুল সা.-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং আল্লাহর আদেশ মেনে চলা। এভাবে কুরআনের একটি আয়াত 'তা'মারুনা বি আল মারুফ ওয়া তানহাওনা 'আনিল মুনকার' (আল ইমরান ৩ : ১১০) মানসম্মত তাফসিরে এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, 'তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি ইমান আন এবং তাঁর আইন বলবৎ কর আর কুফরির কাজ ও হারাম কাজের প্রশ্রয়দান থেকে বিরত রাখ'।[৩] (সুরা আল আরাফ ৭ : ১৯৯) আয়াতে উরফ শব্দের একই ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে : নম্রতা ও ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন কর। উরফের আদেশ কর (ওয়ামুর বিল-

www.pathagar.com

উরফ) এবং মূর্খ লোকদের সাথে জড়িয়ে পড়ো না।' ব্যাখ্যা অনুযায়ী এ প্রেক্ষাপটে উরফ অর্থ হচ্ছে আল্লাহকে ভয় করা এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা। কিন্তু কখনো কখনো কুরআনের মারুফ শব্দটি বিশেষ করে কোনো বিশেষ পরিস্থিতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হলে এর অর্থ দাঁড়ায়, সদাচরণ, দয়া ও সুবিচার। যে সময় কোনো বিশেষ বিষয়, পরিস্থিতি বা সমস্যার উল্লেখ ছাড়া উরফ বা মারুফ কেবল সাধারণ আদেশ বুঝায় তখন তা কেবল আল্লাহর আদেশ পালন করা বুঝায়। কেউ যদি ভালো ও মন্দের (হুসন ওয়া কুব্‌হ) বিষয়ে ইসলামি প্রেক্ষাপট স্মরণ রাখেন যা নীতিগতভাবে খোদায়ী বিধান অবতরণের মাধ্যমে নির্ণিত হয়েছে, তাহলে তার কাছে এ ব্যাখ্যার মাধ্যমে যে অবস্থান গ্রহণ করা হয়েছে তা স্পষ্ট হয়ে যাবে। তাই দেখা যাচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা যখন মারুফ কাজ জোরদারের আদেশ দেন তখন তিনি তা ভালো এ কথা বোঝাতে চান না যা যুক্তি বা প্রচলিত প্রথায় এরূপ আদেশ দেয়া হয়েছে বরং তিনি এতে যা আদেশ করেছেন তা-ই বোঝাবে।[৪] উসুল আল ফিকহর আইনগত তত্ত্বে প্রচলিত প্রথা অর্থে উরফকে কেন গুরুত্ব দেয়া হয়নি এ থেকে তার একটি ব্যাখ্যাও পাওয়া যাবে। অবশ্য উরফ-এর কিছুটা কর্তৃত্বের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এবং আমরা এখন তা নিয়ে আলোচনা করব।

যেসব প্রচলিত রীতি বা প্রথায় শরিয়াহর নীতি লঙ্ঘিত হয় না তা বৈধ ও কর্তৃত্বব্যঞ্জক এবং আইন আদালত অবশ্যই তা মেনে নেবে ও বহাল রাখবে। শাফেয়ী ফকিহ আল সুয়ূতীর বিখ্যাত গ্রন্থ আল আসবাব ওয়া আল নাজাইর-এ লিখিত একটি আইনগত নীতি অনুযায়ী উরফ দ্বারা যা প্রমাণিত হয়, তা শারয়ী দলিল দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার অনুরূপ।' এই আইনগত নীতি হানাফী ফকিহ আল সারাখসীও লিপিবদ্ধ করেন এবং পরে ওসমানী মাজাল্লাহ্ তা গ্রহণ করেন। এতে বলা হয় যে, সাধারণ বা বিশেষ কোনো প্রচলিত প্রথা কার্যকর উপযোগী হবে এবং বিচারিক সিদ্ধান্তের ভিত্তি গঠন করবে।[৫] আলেমগণ সাধারণভাবে কুরআনের ব্যাখ্যা প্রদানের নিমিত্তে একটি বৈধ মানদণ্ড হিসেবে উরফকে গ্রহণ করেছেন। এর একটি উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কুরআনের তাফসিরকারকগণ স্ত্রীর ভরণপোষণের জন্য স্বামী ঠিক কী পরিমাণ অর্থ প্রদান করবে তা নির্ধারণের জন্য উরফ-এর কথা উল্লেখ করেছেন। এ হচ্ছে (সুরা তালাক, ৬০ : ১৭) এর একটি বিষয়- যাতে বলা হয়েছে : 'সচ্ছল অবস্থার লোক নিজের সচ্ছলতা অনুযায়ী ব্যয়ভার বহন করবে।' কুরআনের এ আয়াতে ঠিক কী পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে হবে তা বলা হয়নি, ভরণপোষণের সঠিক পরিমাণ প্রচলিত প্রথার আলোকে নির্ধারণ করতে হবে। ছেলেমেয়েদের ভরণপোষণের বিষয়টিও অনুরূপ, কুরআনে সুনির্দিষ্টভাবে কেবল এ কথা বলা হয়েছে যে, এ দায়িত্ব পিতার। তবে ভরণপোষণের পরিমাণ কী হবে তা নির্ধারণের বিষয়টি প্রচলিত প্রথার (বিল-মারুফ) আলোকে নির্ধারণ করতে হবে

www.pathagar.com

(সুরা বাকারা, ২ : ২৩৩)। শরিয়ত নীতিগতভাবে হালাল ও হারাম সম্পর্কিত বিধিবিধান নির্ধারণের ক্ষেত্রে সর্বজনস্বীকৃত একটি অনুমোদিত প্রচলিত প্রথাকে একটি বৈধ ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে। এরই ফলশ্রুতিতে ফকিহগণের বাস্তব কাজকর্মে এর প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। তারা শরিয়াহর আহকাম নির্ণয়ের একটি বৈধ মানদণ্ড হিসেবে সাধারণ বা নির্দিষ্ট যাই হোক না কেন, উরফকে গ্রহণ করে নিয়েছেন।[৬] ব্যক্তিগত সুচিন্তিত অভিমত (রায়) বা অনুমানমূলক কিয়াস ও ইজতিহাদ হচ্ছে ফিকহর বিধিবিধানের ভিত্তি। আর এগুলো প্রায় বিরাজমান রসম রেওয়াজের আলোকে প্রণীত হয়ে থাকে। তাই দেখা যাচ্ছে কালের ও পরিস্থিতির আবর্তনে এসব প্রথার পরিবর্তন ঘটেছে দেখা গেলে তার ভিত্তিতে গঠিত বিধান উপেক্ষা করার অনুমতি রয়েছে। ফিকহর বিধিবিধান প্রণয়নে সামাজিক পরিবর্তনের বিষয়ে যথাযথ স্বীকৃতি দানের অস্বীকৃতি জানালে তা হবে জনগণকে দুর্দশার মধ্যে নিপতিত করার শামিল, শরিয়ত যা নিষিদ্ধ করেছে। এমনকি অনেক সময় একই মুজতাহিদ প্রচলিত প্রথার সাথে সঙ্গতি বিধানের জন্য তার পূর্বের ইজতিহাদ পরিবর্তন করেছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, এ কথা সুবিদিত যে, ইমাম শাফেয়ী ইরাকে তার মাজহাব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন; কিন্তু পরে তিনি মিসর যাওয়ার পর মিসরীয় সমাজের ভিন্ন ধরনের প্রথার সংস্পর্শে এসে নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি তার পূর্বেকার কিছু মত পরিবর্তন করেন।[৭]

রসুল সা.-এর জীবদ্দশায় যেসব রীতিনীতি বা প্রথা প্রচলিত ছিল এবং তিনি প্রকাশ্যে তা বাতিল না করলে তা তার নীরব অনুমোদন লাভ করেছে বলে মনে করা হয় এবং তা সুন্নাহ আল তাকরিরি বলে পরিচিত সুন্নাহর অংশে পরিণত হয়েছে। এভাবে রসুল সা. কর্তৃক অনুমোদিত প্রাক ইসলামি আরব প্রথাকে পরে সাহাবিগণ রা. বহাল রেখেছেন এবং তারা প্রায়ই একে ‘রসুলকে সা. তার জীবদ্দশায় এরূপ করতে দেখেছি’ বলে উল্লেখ করতেন।[৮] ইসলাম প্রাক ইসলামি বহু আরব প্রথাকে যেমন বহাল রেখেছে তেমনি একই সময় ওই সমাজের নিবর্তনমূলক ও দুর্নীতিপরায়ণ কাজের চর্চা বাতিল করে দিয়েছে। এ ছাড়া ইসলাম কতিপয় প্রচলিত অবৈধ আইনকে শরিয়াহর মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে সেগুলোর সংশোধন ও নিয়মিত করার চেষ্টা করেছে। এক অর্থে এর বিপরীত দিকটিও সত্য, তাহলো আরবের অনেক প্রাক ইসলামি প্রথা শরিয়তকে বিকাশের গঠন পর্যায়ে প্রভাবিত করেছিল। এমনকি মৌখিক ও প্রকৃত সুন্নাহতেও আরব রীতি সমুন্নত রাখা হয়েছে এবং রসুল সা.-এর সুন্নাতের সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছে। এর একটি উদাহরণ হলো, রক্তমূল্য বা দীয়াত পরিশোধ করার জন্য অপরাধী ব্যক্তির স্বজনদের (যেমন, ‘আকিলাহ) দায়দায়িত্ব সম্পর্কিত সুন্নাহর বিধান। অনুরূপভাবে সুন্নাহর কতিপয় লেনদেন যেমন- বন্ধক দান (রাবন), আগাম বিক্রি (সালাম) এবং বিবাহের ক্ষেত্রে

সক্ষম হওয়ার প্রয়োজনীয়তা (কাফাআহ) নিয়মিত করা হয়েছে, এগুলোর মূল নিহিত রয়েছে প্রাক ইসলামি আরব প্রথায়। এ ছাড়া উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রাক ইসলামি রীতির চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। যেমন- উত্তরাধিকারের বিধানে 'আসাবাহ বলে পরিচিত পুরুষ ধারার সম্পর্কের ওপর গুরুত্ব প্রদান। আরব সমাজের ইসলাম পরবর্তী প্রথার ক্ষেত্রে ইমাম মালিক এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হন যে, তিনি 'আমল আহল আল মদিনা' অর্থাৎ মদিনায় জনগণের আমলকে ইজমার সমতুল্য বলে গণ্য করেন। এ ধরনের আমল (বাস্তব কাজকর্ম) কুরআন- সুন্নাহর সুস্পষ্ট বিধানের অনুপস্থিতিতে আইনের একটি উৎস গঠন করে। এ ছাড়া বিচারিক অগ্রাধিকার (ইস্তিহছান) ও জনস্বার্থ বিবেচনার (মাসলাহা) মাধ্যমেও প্রচলিত প্রথা শরিয়তে প্রবেশের পথ তৈরি করে নিয়েছে। অবশ্য ইজমার বৃহদার্থে শরিয়াহর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ প্রচলিত প্রথার বিধিবিধান আত্তীকরণের একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে অথবা অত্যাবশ্যকীয় (জরুরিয়াত) ভিত্তিতে তা শরিয়াহর সাধারণ সীমার মধ্যে স্থান করে নিয়েছে।[৯]

বৈধ উরফের শর্তাবলি

উরফ সুষ্ঠু বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য হওয়া ছাড়াও কর্তৃত্বব্যঞ্জক হওয়ার জন্য অবশ্যই নিম্নোক্ত শর্তগুলো পূরণ করতে হবে :

১. উরফে অবশ্যই সাধারণ ও পুনঃ পুনঃ সংঘটিত বিষয়ের প্রতিফলন থাকতে হবে। কতিপয় ব্যক্তি বা বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মধ্যকার ছোট একটি অংশের কাজ কর্তব্য উরফ বলে গণ্য হবে না এবং শরিয়তি আদালতের বিচারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রথাকে ভিত্তি হিসেবে সমুন্নত রাখা যাবে না। এ শর্তের সারসংক্ষেপ মাজাল্লাহ আল আহকাম আল 'আদালিয়াহর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, 'নিয়মিতভাবে সংঘটিত হয় যে প্রথা কেবল তাকেই কার্যে পরিণত করা হবে' (আর্টিকল, ১৪)। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, যখন কোনো ব্যক্তি বলে যে, সে একটি বাড়ি বা গাড়ি কিনবে, প্রশ্ন হচ্ছে, এর যে কোনো একটির ক্ষেত্রে কী কী শর্ত অন্তর্ভুক্ত করা হবে তা অন্য কোনোভাবে চুক্তির শর্তাবলিতে সুনির্দিষ্ট করা না হলে প্রধানত প্রচলিত প্রথার দ্বারাই তা নির্ণীত হবে। আরো পরিষ্কার করে বলা যায়, ভূসম্পত্তি বিক্রেতা কোম্পানির এজেন্ট বা গাড়ি ব্যবসায়ী তাদের নিজ নিজ সাধারণ আচারের বিষয়টি উল্লেখ করা প্রয়োজন হবে। কিন্তু এ ধরনের কোনো রীতি যদি প্রতিষ্ঠিত করা না যায় অথবা যদি বিভিন্ন ধরনের রীতি ভিন্ন ভিন্নভাবে চর্চা করা হয়, তাহলে বলা যায় যে, কোনো প্রচলিত রীতির অস্তিত্ব নেই এবং তার ভিত্তিতে কোনো আইনগত নির্দেশও নেই। প্রচলিত রীতি সমুন্নত

www.pathagar.com

রাখার জন্য তা কেবল সুসঙ্গতিপূর্ণই হবে না উপরন্তু তা প্রাধান্য বিস্তার করেও থাকে, অর্থাৎ যেসব ক্ষেত্রে প্রয়োগ হতে পারে তার সব অথবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা পালন করা হয়। যদি তা কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে হয় না, তাহলে তা কর্তৃত্বব্যঞ্জক হবে না। অনুরূপভাবে একই বিষয়ে দুইটি পৃথক প্রচলিত প্রথা কার্যকর থাকলে সে ক্ষেত্রে যেটি প্রাধান্য প্রাপ্ত সেটিকে সমুন্নত রাখতে হবে। উদাহরণ হলো, যে নগরীতে বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন করা হয় সেখানে দুই বা তিনটি মুদ্রা সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে আলোচ্য চুক্তির ক্ষেত্রে প্রাধান্য প্রাপ্ত সাধারণ মুদ্রাটি প্রযোজ্য বলে মনে করা হবে।[১০]

২. লেনদেন সম্পাদন করার সময়ও প্রথাগত রীতিনীতি অবশ্যই বর্তমান থাকবে। চুক্তি ও বাণিজ্যিক লেনদেনের ক্ষেত্রে কেনাবেচা চুক্তি সম্পাদনের সময় বিদ্যমান রীতিনীতিই কেবল কার্যকর হবে, পরে উদ্ভাবিত প্রথা নয়। বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক চুক্তির দলিল ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এ শর্ত প্রযোজ্য হবে, যা লিখিত হওয়ার সময় বিরাজমান প্রথার আলোকে উপলব্ধি করা হবে। এরই ফলশ্রুতিতে ব্যাখ্যার সময় বিরাজমান প্রথার বিধান যদি চুক্তি সম্পাদনের পরে প্রচলিত হয় তাহলে তা প্রাসঙ্গিক হবে না। এ কারণে সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, যেসব চুক্তি স্বপ্রমাণিত নয় এবং ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় তাহলে তা কেবলমাত্র ওই ধারণাই প্রকাশ করতে পারে যা চুক্তি লিপিবদ্ধ হওয়ার সময় সাধারণ ছিল।[১১]

৩. প্রচলিত প্রথা অবশ্যই চুক্তির সুস্পষ্ট শর্তের বিষয়ে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। সাধারণ বিধান হচ্ছে, সম্পাদিত চুক্তি প্রচলিত প্রথার ওপর অগ্রাধিকার পাবে এবং চুক্তিটির অনুপস্থিতিতেই কেবল প্রচলিত প্রথা অবলম্বন বৈধ হবে। সম্পাদিত চুক্তি প্রচলিত প্রথার চেয়ে শক্তিশালী হওয়ায় উভয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ দেখা দিলে সে ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে সম্পাদিত চুক্তির পক্ষে সমর্থন ব্যক্ত হবে। উদাহরণ হলো, প্রচলিত প্রথা অনুসারে বিয়ের কাবিন হওয়ার সময় মোহরানার অর্ধেকটা পরিশোধ করতে হবে এবং অবশিষ্ট অংশ পরের কোনো তারিখে দেয়া হয়। কিন্তু চুক্তিতে স্পষ্ট ভাষায় তাৎক্ষণিক পুরো মোহরানা শোধ করার শর্ত জুড়ে দেয়া থাকলে সে ক্ষেত্রে এ শর্তের মোকাবেলায় প্রচলিত প্রথার বিধানের কোনো গুরুত্ব পাবে না। যখন কোনো সুনির্দিষ্ট বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য কোনো স্পষ্ট বিধান পাওয়া যায় না কেবল তখনই প্রচলিত প্রথার সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে এবং যখনই কোনো স্পষ্ট আয়াত বা হাদিস পাওয়া যাবে তখন প্রচলিত প্রথা

www.pathagar.com

অবলম্বন করার প্রশ্নই উঠবে না। আরেকটি উদাহরণ হলো, সম্পত্তি বা জমিজমা বিক্রির ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশনের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী ক্রেতা খরচ বহন করে। কিন্তু চুক্তিতে যদি সুস্পষ্ট শর্ত রাখা হয় যে, বিক্রেতাকে রেজিস্ট্রেশনের ব্যয়ভার বহন করতে হবে তাহলে প্রচলিত প্রথার কোনো গুরুত্ব থাকবে না এবং ক্রেতাকে রেজিস্ট্রেশনের খরচ বহন করতে হবে না।[১২]

৪. সবশেষ কথা হলো, প্রচলিত প্রথা অবশ্যই আইনের সুনির্দিষ্ট নীতি লঙ্ঘন করতে পারবে না। প্রচলিত প্রথার বিরোধীরা মনে করেন নস হয় নিরঙ্কুশ অথবা আংশিক হয়। যদি তা নিরঙ্কুশ হয় তাহলে নিঃসন্দেহে প্রচলিত প্রথাকে পরিহার করতে হবে। এ ধরনের বিরোধের উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়, নারী উত্তরাধিকারীদের মিরাসী অধিকার বাতিল করার বেদুইনদের কর্মকাণ্ড অথবা সুদি (রিবা) লেনদেন ও মদ্যপান। বস্তুতপক্ষে এসব বিষয় ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল কিন্তু এগুলোর প্রত্যেকটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা নস বা আদেশ থাকায় এগুলোর কোনো গুরুত্ব আর নেই। এসব নস ও আদেশ সবসময়ই অগ্রাধিকার পাবে ওই সবের চর্চায় এবং এ ব্যাপারে কোনো ছাড় বা সুবিধা দেয়া হবে না। কিন্তু যদি প্রচলিত প্রথা ও খোদায়ী বিধানের মধ্যে বিরোধ নিরঙ্কুশ না হয় তা কেবল ওই বিধানের কোনো কোনো দিকের বিরোধী হয়, তাহলে প্রচলিত প্রথাকে খোদায়ী বিধানের সীমিতকরণের কারণ হিসেবে কাজ করার অনুমতি দেয়া হবে। ইস্তিসনার চুক্তি অর্থাৎ সম্মত মূল্যে পণ্য তৈরি করা সংক্রান্ত ফরমায়েশ এখানে উদাহরণ হিসেবে কাজ করতে পারে। এক হাদিসে বলা হয়েছে :

نهى عن بيع ما ليس عند الانسان

ورخص في السلم

'রসুল সা. অস্তিত্বহীন জিনিস বিক্রি করা নিষিদ্ধ করেছেন, তবে তিনি সালাম অর্থাৎ অগ্রিম বিক্রি যাতে মূল্য নির্ধারণ করা হয় কিন্তু সরবরাহ স্থগিত থাকে, তার অনুমতি দিয়েছেন'।[১৩] এটি একটি সাধারণ হাদিস যা সব ধরনের জিনিসপত্র বিক্রির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, এতে বিক্রির বস্তু চুক্তি সম্পাদন করার সময় উপস্থিত থাকে না। ব্যতিক্রমীভাবে সালামের অনুমতি দেয়া হয়েছে এ কথা চিন্তা করে যে, এতে জনগণ উপকৃত হবে। হাদিসের সাধারণ নিষেধাজ্ঞা ইস্তিসনার ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য, কেননা এখানেও চুক্তির সময় বিক্রীত পণ্য অস্তিত্ববিহীন রয়েছে। কিন্তু যেহেতু এ ইস্তিস্‌না সব যুগের লোকদের মাঝে

www.pathagar.com

সাধারণভাবে চর্চা করা হয়েছে সেহেতু ফকিহগণ সাধারণ প্রথার ভিত্তিতে একে বৈধতা প্রদান করেছেন। ইস্তিসনা ও এ হাদিসের নির্দেশনার মধ্যে বিরোধ নিরঙ্কুশ নয় কারণ হাদিসটিতে স্পষ্ট ভাষায় সালামের বৈধতা দেয়া হয়েছে। যদি জনগণের কল্যাণ লাভের বিষয় সালাম মঞ্জুরের ক্ষেত্রে সুবিধা প্রদানের প্রধান কারণ হয়ে থাকে, তাহলে ইস্তিসনাতেও একই বিষয়ের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। ফলে ইস্তিসনা সম্পর্কিত প্রচলিত প্রথাকে হাদিসের বিধানের সীমিতকরণ কারণ হিসেবে কাজ করার অনুমোদন দেয়া হয়েছে, তাই দেখা যাচ্ছে, ইস্তিসনা সম্পর্কিত প্রথা হাদিসটিকে নির্দিষ্ট করেছে।

প্রচলিত প্রথার দ্বারা সাধারণ খোদায়ী বিধান নির্দিষ্টকরণের আরেকটি উদাহরণ কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বিক্রয় বা বিবাহের মতো কোনো নির্দিষ্ট চুক্তির জন্য অন্য ব্যক্তিকে প্রতিনিধি (উকিল) নিয়োগের ঘটনায় দেখতে পাওয়া যায়। চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষমতা নিয়োগ দান শর্তে যদিও সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয় না তৎসত্ত্বেও প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী তা নির্দিষ্ট থাকে। উদাহরণ হিসেবে

نهى عن بيع ما ليس عند الانسان

ورخص فيالسلم

বিক্রির ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত মূল্য বাজার অনুযায়ী ন্যায্যমূল্য হতে হবে এবং বিনিময়ের ক্ষেত্রে স্থানীয় মুদ্রায় গ্রহণ করা হবে।

এক হাদিস থেকে জানা গেছে যে, রসুল সা. শর্তসাপেক্ষে বিক্রি নিষিদ্ধ করেছেন। মূলত শর্তযুক্ত বিক্রি এ ধরনের চুক্তির প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এর উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১০ হাজার ডলার মূল্যে ক তার গাড়িটি খ-এর কাছে বিক্রি করল এ শর্তে যে, খ ৫০ হাজার ডলার মূল্যে তার বাড়িটি ক-এর কাছে বিক্রি করবে। এ ব্যাপারে উদ্ধৃত হাদিসে বলা হয়েছে :

إن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى

عن بيع وشرط

'রসুল সা. শর্তযুক্ত বিক্রি নিষিদ্ধ করেছেন।' অবশ্য হানাফী ও মালেকী ফকিহদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য শর্ত যা প্রচলিত আদর্শ প্রথার প্রতিনিধিত্ব করে তা বৈধ বলে গণ্য করেছেন। এখানেও সাধারণ নিষেধাজ্ঞা বহাল রয়েছে তবে উরফ দ্বারা গৃহীত শর্তই কেবল

www.pathagar.com

বহাল রাখা হয়েছে, অন্য কথায় হাদিসের সাধারণ শর্ত প্রচলিত প্রথার দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়েছে।[১৪]

এখানে উরফ ও ইজমার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা হলে তা উপকারী বিবেচিত হতে পারে। উভয়ের মধ্যে অনেক বেশি মিল রয়েছে, এ কারণে অনেক সময় তারা তালগোল পাকিয়ে ফেলে। উরফ ও ইজমার মধ্যে মিল থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে অনেক পার্থক্যও রয়েছে যা নিম্নে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো :

১. সবার অথবা জনগণের বড় অংশের মতৈক্যের দ্বারা উরফ বাস্তবায়িত হয় এবং কিছু ব্যতিক্রম বা কিছু ব্যক্তির মতানৈক্যের কারণে এর অস্তিত্বের কোনো ক্ষতি হয় না। অন্যদিকে ইজমা গঠনের জন্য ওই সময়ের সব মুজতাহিদের ও সবার অথবা যাদের মধ্যে বাস্তবায়ন করা হবে তাদের সবার মতৈক্য প্রয়োজন। ইজমাতে অনৈক্য ও অমিলের কোনো স্থান নেই এবং মুজতাহিদদের মধ্যে কোনো পর্যায়ে মতপার্থক্য সৃষ্টি হলে ইজমা বৈধতা হারিয়ে ফেলবে।

২. মুজতাহিদদের মতৈক্যের ওপর উরফ নির্ভরশীল নয় বরং তা মুজতাহিদসহ জনগণের বৃহদাংশের কাছে অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হতে হবে। অন্যদিকে সাধারণ মানুষের ইজমার বিচারিক বিষয়ে কিছুই বলার নেই যাতে সমাজের কেবলমাত্র বিদ্বান ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণ প্রয়োজন হয়।

৩. উরফ-এর নিয়মকানুন পরিবর্তনশীল। একটি প্রথা কালের আবর্তনে আরেকটি প্রথার জন্ম দিতে পারে অথবা পরিস্থিতির পরিবর্তনে তা একেবারেই হারিয়ে যেতে পারে। কিন্তু ইজমার ক্ষেত্রে এমনটি ঘটে না। একবার ইজমা গঠিত হয়ে গেলে একই বিষয়ে নতুন ইজমা গঠনের পথ রুদ্ধ হয়ে যায় এবং তা বাতিল ও সংশোধনের জন্য উন্মুক্ত থাকে না। অন্যদিকে উরফ সম্ভাব্য নতুন ইজতিহাদের জন্য উন্মুক্ত থাকে এবং উরফের ভিত্তিতে গঠিত ইজতিহাদও পরিবর্তিত হতে পারে যদি যে উরফের ভিত্তিতে তা গঠিত হয়েছিল তার অস্তিত্ব না থাকে।

৪. সব শেষে বলা যায়, উরফের টিকে থাকতে হলে অব্যাহত থাকার মতো একটি উপাদান থাকা দরকার, আর সেটি হলেই কেবল তা একটি সময় ধরে টিকে থাকবে। অন্যদিকে মুজতাহিদগণ সর্বসম্মত মতৈক্য পৌঁছলেই ইজমা গঠিত হয় এবং নীতিগতভাবে এর অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে কোনো শর্ত নেই।[১৫]

প্রথার প্রকারভেদ

প্রাথমিকভাবে উরফ বা প্রচলিত প্রথাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, তাহলো মৌখিক (কাউলী) ও কার্যকরী (ফিলী)। মৌখিক উরফ কোনো উদ্দেশ্য পূরণে

www.pathagar.com

শব্দগুলোর ব্যবহার ও অর্থের ব্যাপারে জনসাধারণের সাধারণ মতৈক্যের ভিত্তিতে গঠিত হয়, যা আক্ষরিক অর্থের থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। এ ধরনের মতৈক্যের ফলে প্রথাগত অর্থ প্রাধান্য লাভ করে এবং মৌলিক বা আক্ষরিক অর্থ ব্যতিক্রমী অর্থ ধারণ করে। কুরআন ও সুন্নাহতে বহু শব্দ রয়েছে, যা তার আক্ষরিক অর্থের থেকে ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। জনপ্রিয় ব্যবহারের ফলে তা সাধারণভাবে গ্রহণীয় হয়েছে। কুরআনে সালাত, জাকাত, হজ প্রভৃতি শব্দ তাদের আক্ষরিক অর্থ থেকে ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এ ব্যবহার পরে এতটাই প্রাধান্য পেয়েছে যে, এসব শব্দের আক্ষরিক অর্থ অনেকটা অজ্ঞাত হয়ে পড়েছে। এসব শব্দ ব্যবহার সম্পর্কিত মৌলিক প্রথা এভাবে কুরআন থেকে শুরু হয়েছে এবং পরে জনপ্রিয় প্রথায় গ্রহণ করে নেওয়া হয়েছে। কুরআনের শব্দগুলোর আক্ষরিক ও প্রথাগত অর্থের ভিন্ন হওয়ার দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়, যাতে আক্ষরিক অর্থ প্রচলিত প্রথার কথা বিবেচনা ছাড়াই ব্যবহৃত হয়। এর উদাহরণ হলো, 'ওয়ালাদ' শব্দটি। কুরআনে আক্ষরিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যার মানে 'সন্তান' তা ছেলেও হতে পারে আবার মেয়েও হতে পারে (আন নিসা, ৪ : ১১), কিন্তু 'ওয়ালাদ'-এর জনপ্রিয় ব্যবহার কেবলমাত্র ছেলেদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আরেকটি উদাহরণ হলো- লাহম, অর্থাৎ গোশত। কিন্তু কুরআনে লাহম শব্দটি মাছের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু প্রথাগত ব্যবহারে এ শব্দটি মাছ ছাড়া কেবলমাত্র অন্য প্রাণীর গোশত বুঝায়। এ ধরনের শব্দসমূহ যার প্রচলিত ব্যবহারে ভিন্ন অর্থ রয়েছে তা যদি চুক্তি শপথ বা লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে তাদের প্রচলিত প্রথার অর্থ বহাল রাখতে হবে। উদাহরণ হলো, কোনো ব্যক্তি যখন ওয়াদা বা শপথ করে বলল, 'সে অমুকের বাড়িতে পা দেবে না।' প্রচলিত অর্থ অনুযায়ী এ কথা উচ্চারণের মাধ্যমে সে যা বলেছে তার অর্থ হলো, প্রকৃতপক্ষে বাড়িতে প্রবেশ না করা, এ অর্থে ওই ব্যক্তি বাড়িতে প্রবেশ করলে তার ওয়াদা ভঙ্গ হবে। যদি সে কিছুতে চড়ে বাড়িটিতে প্রবেশ করে তাহলে কখনোই 'পা দেয়া' হবে না। কিন্তু সে যদি বাড়িতে প্রবেশ করা ছাড়াই কৌশলে পা দেয় তাহলে তাকে ওয়াদা ভঙ্গের দণ্ড (কাফফারা) ভোগ করতে হবে না।[১৬] কারণ তাতে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী বাড়িতে 'পা দেয়া' বুঝাবে না।

আমলি উরফ হচ্ছে সাধারণভাবে বার বার চর্চা হয় এমন বিষয়, যা জনগণ মেনে নিয়েছে। আমলি উরফ-এর একটি উদাহরণ হলো, লেনদেন বিক্রয় বা বাই' আল তাআতি যা সাধারণ বিক্রির প্রস্তাব দান ও গ্রহণ ছাড়াই করা হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে প্রচলিত প্রথার রীতি অনুযায়ী বিয়ের ক্ষেত্রে মোহরানার একটি অংশ চুক্তির সময় এবং অবশিষ্ট অংশ পরের কোনো তারিখে শোধ করা প্রয়োজন। এ ধরনের প্রথার বৈধতা আইনি বিধানে অনুমোদন করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে : উরফে যা গ্রহণ করা হয়েছে তা চুক্তির শর্তের সমতুল্য (আল মারুফ উরফান কাল

www.pathagar.com

মাশরুত শারতান)। এরই ফলশ্রুতিতে চুক্তির অনুপস্থিতির বিপরীতে আমলি উরফকে সমুন্নত রাখা ও প্রয়োগ করা হয়।

উরফ আমলি বা কাউলি যাই হোক না কেন, একে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে, তাহলো- যথাক্রমে, সাধারণ (আল উরফ আল আম) ও বিশেষ (আল উরফ আল খাস)। সাধারণ উরফ হলো এমন প্রচলিত প্রথা যা সবস্থানে প্রচলিত এবং কাল বিশেষে সব মানুষ মেনে চলে। এর একটি আদর্শ উদাহরণ হলো, বাই আল তাআতি। ইতোমধ্যে ওপরে এ বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে নির্দিষ্ট মূল্য দিয়ে গণগোসলখানায় প্রবেশের প্রথাগত বিষয়টি সাধারণ উরফের আরেকটি উদাহরণ, যা বিক্রির সুনির্দিষ্ট নিয়মের ব্যতিক্রম (কারণ এতে অনির্দিষ্ট পরিমাণ পানি ব্যবহারের বিষয় সংশ্লিষ্ট রয়েছে)। কিন্তু জনগণ একে মেনে নিয়েছে, তাই তা বৈধ। এখানে আরো উল্লেখ করা দরকার যে, হানাফী ফকিহগণ ইস্তিহছান সংক্রান্ত মূলনীতি প্রণয়নের সময় সাধারণ উরফের অনুকূলে কিয়াস উপেক্ষা করাকে বৈধ বলে গণ্য করেছেন। ইস্তিহছান সংক্রান্ত পৃথক অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।[১৭]

বিশেষ প্রচলিত প্রথা হলো এমন উরফ যা নির্দিষ্ট অঞ্চল, পেশা বা বাণিজ্যে প্রচলিত থাকে। প্রকৃতিগত কারণে এ ধরনের উরফ সব এলাকায় মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্ত নয়। এ ব্যাপারে হানাফী মাজহাবের মতই অপেক্ষাকৃত গ্রহণযোগ্য। তাতে বলা হয়েছে, বিশেষ উরফ নসের সাধারণ শর্ত উত্তীর্ণ হয়নি, অবশ্য কতিপয় হানাফী ফকিহ এ ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। এরই ফলশ্রুতিতে নসের সাথে বিরোধ দেখা দিলে এ ধরনের উরফ পুরোপুরি উপেক্ষা করতে হবে। এখানে যে সাধারণ নিয়মের কথা বলা হয়েছে তা হলো, শরিয়াহর আহকাম উরফকে যে কর্তৃত্ব/অনুমোদন যোগ্যতা প্রদান করেছে তা কেবলমাত্র সাধারণ উরফের বিধানের কথা ভেবে। কিয়াসের বিধানের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে যে কিয়াসের ইল্লত নসে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় না অর্থাৎ কিয়াস গাইর মুনসুখ আল-ইল্লা হলে সে ক্ষেত্রে সাধারণ উরফের অনুকূলে কিয়াস উপেক্ষা করা যেতে পারে। কিন্তু বিশেষ উরফের সাথে বিরোধের ক্ষেত্রে কিয়াস বহাল থাকবে। অবশ্য কিছুসংখ্যক বিশিষ্ট আলেমের দেয়া এক ফতোয়ায় বলা হয়েছে যে, এ ক্ষেত্রে বিশেষ উরফের সাধারণ উরফের মতোই কর্তৃত্ব থাকবে। সাধারণ উরফকে কেন কিয়াসের চেয়ে অগ্রাধিকার দেয়া হয়– এ প্রশ্নের উত্তর হলো, সাধারণ উরফ হচ্ছে জনগণের চাহিদার একটি নির্দেশক যা অগ্রাহ্য করলে জনগণের দুর্ভোগের সৃষ্টি হতে পারে। ইবনে আল হুমামের মতো কতিপয় হানাফী ফকিহ মনে করেন, এ ধরনের পরিস্থিতিতে উরফ ইজমার অনুরূপ কর্তৃত্বের অধিকারী হয়; আর সে কারণেই একে কিয়াসের চেয়ে অগ্রাধিকার দিতে

www.pathagar.com

হবে। সম্ভবত এ কথা বলা প্রাসঙ্গিক হবে যে, আবু হানিফার সাহেবান আল শায়াবানীর মতে, মৌমাছি ও রেশম পোকা বিক্রি বৈধ, কারণ তার যুগে এটি সাধারণভাবে করা হতো, যদিও এ ব্যাপারে আবু হানিফার কিয়াসী সিদ্ধান্ত এর বিপক্ষে ছিল। এর কারণ ওগুলো মূল্যবান পণ্য (মাল) ছিল না। উপরন্তু আলেমগণ এ মত প্রকাশ করেছেন যে, কিয়াস কুরআন ও সুন্নাহর নুসুস থেকে গঠিত হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু তার ওপর উরফকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে, তাই জনস্বার্থ (মাসলাহা) বিবেচনায় একে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে যদিও তার যথার্থ কারণ তার নুসুসে গ্রথিত নেই। এ কথা বলার পর মনে হয় এ কথা বলা যায় যে, সাধারণ উরফ ও মাসলাহার মধ্যে বিরোধ হবে খুবই বিরল ঘটনা। সংজ্ঞানুযায়ী উরফ অবশ্যই সুষ্ঠু, যুক্তিযুক্ত ও সুবিবেচনাপূর্ণ হতে হবে, যা একে মাসলাহার অতি ঘনিষ্ঠ পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। সর্বোপরি উরফ ও মাসলাহা তাদের নিজ নিজ সাধ্য অনুযায়ী জনগণের কল্যাণ সাধন ও তাদের দুর্ভোগ লাঘবে কাজ করে থাকে।

সর্বশেষে বলা যায়, শরিয়াহর সাথে মিল ও অমিলের ভিত্তিতে উরফকে পুনরায় দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। তা হলো- বৈধ প্রথা (আল উরফ আল সহিহ) ও অননুমোদিত প্রথা (আল উরফ আল ফাসিদ)। এ বিভক্তির মধ্য দিয়ে এদের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। বৈধ প্রথা সর্বত্র লোকজন পালন করে এবং শরিয়াহর নীতির সাথে এর বিরোধ থাকার কোনো ইঙ্গিত শরিয়তে দেখা যায় না। অননুমোদিত প্রথাও লোকেরা পালন করে কিন্তু তা প্রায়ই শরিয়াহর নীতির সংগে সংগতিপূর্ণ হয় না বলে দেখতে পাওয়া যায়। আমরা ইতোমধ্যে নারী উত্তরাধিকারীদের মিরাসী ওয়ারেশী অধিকার বঞ্চিত করার বেদুঈনদের প্রচলিত প্রথা ও সুদ প্রচলনের কথা উল্লেখ করেছি যাতে সুস্পষ্টভাবে শরিয়াহর নীতির লঙ্ঘন ঘটেছে। এগুলো হলো-উরফ আল ফাসিদের উদাহরণ।[১৮]

উরফের প্রমাণ (হুজ্জিয়াত)

আলেমগণ কুরআনে উরফের ব্যাপারে খোদায়ী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন কিন্তু তাদের সে প্রচেষ্টা সঙ্কটমুক্ত ছিল না। সাধারণত কুরআনের সুরা হাজ-এর আয়াত (২২ : ৭৮) উল্লেখ করে এর সূচনা করা হয়। আয়াতটিতে বলা হয়েছে : 'দীনের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর সংকীর্ণতা চাপিয়ে দেননি।' এ আয়াতে অবশ্য এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ কোনো কর্তৃত্ব ব্যক্ত হয়নি তবে যুক্তি দেখানো হয় যে, শরিয়াহর নুসুসের সাথে সাংঘর্ষিক নয় এমন প্রচলিত উরফ উপেক্ষা করা হলে জনগণের জীবনযাত্রা সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ার পথ প্রশস্ত হতে পারে, যা অবশ্যই পরিহার করতে হবে। উরফের সমর্থনে দ্বিতীয় যে আয়াতটি উদ্ধৃত করা হয় তা সুরা আল আরাফের একটি আয়াত (৭ : ১৯৯)। তবে এতে যদিও সরাসরি উরফের উল্লেখ

www.pathagar.com

রয়েছে তথাপি একে প্রধান কর্তৃত্ব প্রদানকারী হিসেবে শনাক্ত করা বেশ কঠিন। ইতোমধ্যে উল্লেখ করা এ আয়াতে রসুল সা.-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, 'হে নবি, নম্রতা ও ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন কর। ভালো কাজের আদেশ দান করতে থাক এবং মূর্খ লোকদের সাথে জড়িয়ে পড়ো না'। মালিকী ফকিহ্ শিহাব আল দীন আল কারাফীর মতে, এ আয়াত সুস্পষ্ট এবং তা উরফের পক্ষে স্পষ্ট কর্তৃত্ব প্রদান করেছে। এ মত অনুসারে শরিয়াহর একটি দলিল হিসেবে কুরআনে স্পষ্টভাবে উরফ সমুন্নত করা হয়েছে এবং তা শরিয়াহর অবিচ্ছেদ্য অংশ।[১৯] অবশ্য আলেমদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মতে এ আয়াতে উল্লিখিত উরফ আক্ষরিক অর্থে এসেছে। তাহলো পরিচিত ও ভালো, প্রচলিত প্রথা অর্থে নয়। কিন্তু এরপর তারা বলেছেন, মনে রাখা দরকার যে অনুমোদিত প্রথা সাধারণত সুষ্ঠু প্রকৃতি ও বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ স্বাভাবিকভাবে সমর্থন করে, উরফ সম্পর্কে কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি এ শব্দের পারিভাষিক অর্থের কাছাকাছি। অন্য কথায় উরফের আক্ষরিক বা কুরআনিক অর্থ এর পরিভাষিক অর্থকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে এবং শব্দটির দুই ধরনের ব্যবহারের ক্ষেত্রে পস্পরের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় মিল বজায় রয়েছে। মুফাসসিরগণ আরো বলেছেন যে, এ আয়াতের উরফ শব্দটিতে যেহেতু অনেক অর্থ প্রকাশ পেয়েছে, যেমন- 'ইমানের ঘোষণা দান, লোকজন যেসব জিনিস ভালো বলে মনে করে' এবং 'ওসব জিনিস যা জনপ্রিয় ও পরিচিত' এবং প্রথা অর্থেও, সেহেতু একে শুধু প্রথা অর্থে খোদায়ী কর্তৃত্ব প্রদান বলে উদ্ধৃত করা যেতে পারে না।[২০]

উরফের সমর্থনের পরোক্ষ প্রমাণ হিসেবে আঁলেমগণ বিশিষ্ট সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা-এর নিম্নোক্ত উক্তিও উদ্ধৃত করে থাকেন :

ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله

'মুসলমানেরা যাকে ভালো বলে মনে করে আল্লাহর দৃষ্টিতেও তা ভালো'। অবশ্য অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে, এ হলো রসুল সা.-এর একটি হাদিস। আল শাতিবীর মতে, এটি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের রা. বক্তব্য হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।[২১] সমালোচকরা অবশ্য বলেছেন যে, এ বক্তব্য/হাদিসে 'আল মুসলিমুন'-এর অনুমোদন বলতে সব মুসলমানকে বুঝানো হয়েছে। অন্যদিকে স্থান বিশেষে উরফের পার্থক্য দেখা যায় এবং এর পক্ষে সব মুসলমানের অনুমোদন লাভের নিশ্চয়তা দেয়া যেতে পারে না। এর জবাবে আবারো এ মত প্রকাশ করা যায়, এই প্রেক্ষাপটে 'আল মুসলিমুন' বলতে কেবলমাত্র তাদের মধ্যকার সুষ্ঠু বুদ্ধিজ্ঞান ও বিচারবোধ সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে বুঝানো হয়েছে, মুসলিম সমাজের প্রত্যেক সদস্যকে নয়।[২২]

www.pathagar.com

উরফের কর্তৃত্ব-ক্ষমতা নিয়ে সমগ্র বিতর্কের পরিণাম হচ্ছে, শরিয়াহর বিকাশে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করা সত্ত্বেও তা নিজ অধিকার বলে কোনো স্বতন্ত্র দলিল নয়। উরফকে একটি দলিল হিসেবে স্বীকৃতি দানে আলেমদের অনাগ্রহের আংশিক কারণ হচ্ছে নীতি হিসেবে এর পারিপার্শ্বিক বৈশিষ্ট্য। তাহলো, স্থান ও কালের পরিবর্তনের সাথে উরফের পরিবর্তন ঘটা। এর অর্থ হলো প্রচলিত যে প্রথার আলোকে ফিকহর বিধিবিধান প্রণীত হয়, ওই প্রথা আর প্রচলিত না থাকলে ওই বিধানেরও পরিবর্তন ঘটবে। বিভিন্ন মাজহাবের পরে আলেমগণের দেয়া বিভিন্ন সময়ে একই বিষয়ে তাদের পূর্ববর্তীদের ফতোয়ার বিরোধী ফতোয়া দানের ঘটনা প্রচলিত প্রথার পরিবর্তনের বিষয়টির প্রতিফলন ঘটেছে যার ওপর ভিত্তি করে প্রথম ফতোয়া দেয়া হয়েছিল। উরফ মৌলিকভাবে অস্থিতিশীল হওয়া ছাড়াও প্রায় তার সুনির্দিষ্ট অর্থ অনুধাবনও বেশ কঠিন হয়। এসব অর্থ স্বপ্রমাণিত নাও হতে পারে এবং প্রায়ই লিখিত বিবরণ ও দলিলের অনুপস্থিতি তা যাচাই করাও কঠিন হয়ে দাঁড়াতে পারে।[২৩]

আধুনিক যুগে সম্ভবত বিষয়টি এমনকি আরো জটিল রূপ ধারণ করেছে। নিত্যনতুন বিভিন্ন কারণে আধুনিক সমাজকাঠামোর ঐতিহ্যবাহী রীতিতে ভাঙন দেখা যাচ্ছে। আধুনিক যুগে সামাজিক পরিবর্তনের গতি আরো বৃদ্ধি পেলে সামাজিক প্রথা ও সংস্থার স্থিতিশীলতা আরো বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর্থসামাজিক অবস্থার আলোকে ব্যক্তির গতিশীলতা, ব্যাপক নগরায়ণ, বড় বড় নগরীতে ব্যাপকহারে লোকজনের চলে যাওয়া ইত্যাদি উরফের স্থিতিশীলতা ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ প্রেক্ষাপটে আরেকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। তাহলো আধুনিক যুগের সরকারের একটি হাতিয়ার হিসেবে সংবিধিবদ্ধ আইনের বিকাশ। আইনে স্বয়ংসম্পূর্ণ বিধিবদ্ধ আইন সংকলিত করার প্রচেষ্টা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তি হিসেবে সামাজিক প্রথার ওপর নির্ভরশীলতা অনেকাংশে কমিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তা হওয়া সত্ত্বেও আইনের উৎস এবং বিচারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তি উভয় বিষয়ে প্রথা তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হারিয়ে ফেলেছে এ কথা বলা মোটেই সঠিক হবে না। অনেক মুসলিম দেশের দেওয়ানি বিধিতে প্রচলিত প্রথার সাধারণ উল্লেখ আইনের সম্পূরক উৎস হিসেবে বজায় থাকায় সম্ভবত এ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। এ ধরনের বিধিবদ্ধ আইনে প্রচলিত প্রথার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উল্লেখ থেকে এটি প্রতীয়মান হয়েছে যে, নির্দিষ্ট বিরোধের বিষয়ে সংবিধিবদ্ধ আইনের বিধানের অনুপস্থিতিতে প্রচলিত প্রথা কর্তৃত্ব লাভ করে।

www.pathagar.com

পরবর্তী যুগের ফকিহগণ (মুতাখ্‌খিরুন) প্রচলিত প্রথার ভিত্তিতে প্রণীত পূর্ববর্তী ফকিহগণের সিদ্ধান্তসমূহ পরে ওই প্রথারই পরিবর্তন ঘটার কারণে পরিবর্তন করছেন বলে প্রমাণ রয়েছে। নিম্নে প্রদত্ত উদাহরণগুলো থেকে দেখা গেছে যে, ফকিহগণ উরফকে কেবল সর্বান্তকরণে বৈধ ভিত্তি হিসেবেই গ্রহণ করেননি উপরন্তু তাকে আইনগত সংস্কারের গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবেও বিবেচনা করেছেন :

১. ফিকহর বিধান অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি অন্য আরেক ব্যক্তিকে মিথ্যা তথ্য দিয়ে তার ক্ষতি বা অনিষ্ট সাধন করলে সেজন্য সে দায়ী হবে না। এ ধরনের ঘটনায় ফিকহর যে বিধান প্রয়োগ করা হয় তাহলো, মুবাশ্বির অর্থাৎ যে ব্যক্তি সরাসরি কাজ করেছে সে-ই ওই ক্ষতির জন্য দায়ী হবে। কিন্তু পরের ফকিহগণ অসততা ও দুর্নীতির বিস্তার ঘটানোর কারণে ওই ক্ষতির জন্য মিথ্যা খবরদাতাকে দায়ী করার সপক্ষে পূর্বের বিধানকে উপেক্ষা করাকে বৈধ বলে ঘোষণা করেছেন।[২৪] ইমাম আবু হানিফার মতে, যখনই কাজী তার সামনে সাক্ষ্যদাতাকে ব্যক্তিগতভাবে নির্ভরযোগ্য বলে বিশ্বাস করল সে ক্ষেত্রে জেরা করার বা তাজকিয়ার কোনো প্রয়োজন হবে না। একটি হাদিসের ভিত্তিতে তিনি ওই সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেছেন। হাদিসটিতে বলা হয়েছে :

المسلمون عدول بعضهم على بعض

মুসলমানেরা পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে 'উদুল (অর্থাৎ সৎ ও বিশ্বাসযোগ্য)।

২. আবু হানিফা যে সময়ে এ বিধান প্রণয়ন করেন তখন তা যথার্থ ছিল। কিন্তু পরে সাক্ষীদের অসততা ও মিথ্যার ব্যাপারে উদ্বেগ দেখা দেয়। এরই ফলশ্রুতিতে মিথ্যা হলফ বা সাক্ষ্য রোধের জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি বলে বিবেচনা করা হয় এবং আলেমগণ এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন যে, সব সাক্ষীর ক্ষেত্রে আদর্শ ব্যবস্থা হিসেবে তাজকিয়া প্রয়োগ করতে হবে। আবু হানিফার সাহেবানগণ তাজকিয়াকে নৈমিত্তিক বিচার কাজে প্রয়োগ করার পক্ষে ফতোয়া প্রদান করেছেন। এর ফলে তাজকিয়া সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণের শর্তে পরিণত হয়েছে এবং তাজকিয়া ছাড়া কোনো সাক্ষ্য গৃহীত হবে না মর্মে বিধান প্রণীত হয়েছে, যা আদালতের সিদ্ধান্তের ভিত্তি গঠন করতে পারে।[২৫]

৩. হানাফি মাজহাবের গৃহীত বিধান যা আবু হানিফার নিজের বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে- কুরআন বা ইমানের নিয়মনীতি শিক্ষাদানের জন্য পারিশ্রমিক ধার্য

www.pathagar.com

করার অনুমতি কাউকে দেয়া যাবে না। কারণ ওসব বিষয়ে শিক্ষাদান হচ্ছে এক ধরনের ইবাদত এবং আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারোর কাছ থেকে এজন্য কেবল পুরস্কার আশা করা যেতে পারে না। কিন্তু পরে দেখা গেল যে, কিছু ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা দিতে অনাগ্রহ প্রকাশ করে এবং ইসলামের শিক্ষা প্রদানকে উৎসাহিত করার জন্য পারিশ্রমিক প্রদানের পন্থাকে উৎসাহিত করাকে জরুরি বলে বিবেচনা করা হয়। এর ফলশ্রুতিতে ফকিহগণ কুরআন শিক্ষাদানের মাধ্যমে ফি আদায়ের পক্ষে ফতোয়া প্রদান করেন।[২৬]

৪. ফিকহর যেসব বিধান 'প্রথার পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তন ঘটেছে' তার একটি হলো বয়স নির্ণয়ের মাধ্যমে একজন নিখোঁজ ব্যক্তিকে (মাফকুদ) মৃত্যু বলে ঘোষণা করা। সাধারণভাবে গৃহীত মত অনুযায়ী নিখোঁজ ব্যক্তির সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গ সাধারণত যে বয়সে মৃত্যুবরণ করেন তার চেয়ে কম বয়সে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা যাবে না। এরই ফলশ্রুতিতে হানাফী মাজহাবের ফকিহগণ ভিন্ন ভিন্নভাবে তার বয়স সত্তর, নব্বই ও একশ' বছর ধার্য করেন। নতুন নতুন বিধান প্রণয়নের সময় পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও সার্বিক অবস্থা যা ওই সব সময়ে বিরাজমান ছিল তা বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।[২৭]

৫. এবং সর্বশেষে বলা যায়, লেনদেনের ক্ষেত্রে আল গাবন আল ফাহিশের ধারণা হচ্ছে কোনো পণ্যের বাজার মূল্য ও ক্রেতার ওপর ধার্য করা প্রকৃত মূল্যের মৌলিক পার্থক্যের বিষয় যা উরফ-এর সূত্রে নির্ণয় করা হবে। নির্দিষ্ট লেনদেনের ক্ষেত্রে কী পরিমাণ পার্থক্য নির্ণয় আল গাবন আল ফাহিশ বোঝাবে তা অনুরূপ লেনদেনে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী ও লোকদের কাজের আলোকে নির্ধারণ করা হবে। যেহেতু এ ধরনের লেনদেনে পরিবর্তন ঘটে তাই কী পরিমাণে আল গাবন আল ফাহিশ বোঝাবে তা নির্ধারণে এ পরিবর্তনের প্রতিফলন ঘটতে হবে।[২৮]

টিকা

১. বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ২২৪; জিয়াদেহ, Urf and Law, পৃষ্ঠা ৬০; ইসমাঈল, আদিল্লাহ, পৃষ্ঠা ৩৮৯।

২. মাহমাসানী, ফালসাফাহ (জিয়াদেহ অনূদিত), পৃষ্ঠা ১৩২; ইসমাঈল, আদিল্লাহ, পৃষ্ঠা ৩৮৮; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ২২৪।

৩. তাবারি, তাফসির, (বুলাক, ১৩২৩-২৯), ৪, ৩০; জিয়াদেহ, Urf and Law, পৃষ্ঠা ৬০-৬১; ইসমাঈল, আদিল্লাহ, পৃষ্ঠা ৪০১।

৪. তুলনীয়, জিয়াদেহ, Urf and Law, পৃষ্ঠা ৬২।

৫. The Mejelle, (Tyser অনূদিত) (Art. 36); আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ২১৬; মাহমাসানী, ফালসাফাহ পৃষ্ঠা ১৩২।

www.pathagar.com

৬. সাবুনি, মাদখাল, পৃষ্ঠ ১৩৮; ইসমাঈল, আদিল্লাহ, পৃষ্ঠা ৪০৩।

৭. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ২১৭; Aghnides, Muhammedan Theories, পৃষ্ঠা ৮২।

৮. জিয়াদেহ, Urf and Law, পৃষ্ঠা ৬২; আব্দুর রহিম, Jurisprudence, পৃষ্ঠা ১৩৭; মাহমাসানী, ফালসাফাহ পৃষ্ঠা ১৩২।

৯. মাহমাসানী, ফালসাফাহ পৃষ্ঠা ১৩২; সাবুনি, মাদখাল, পৃষ্ঠা ১৪৩; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ২৪২।

১০. মাহমাসানী, ফালসাফাহ পৃষ্ঠা ১৩৩-৩৪; সাবুনি, মাদখাল, পৃষ্ঠা ১৩৯-৪০; ইসমাঈল, আদিল্লাহ, পৃষ্ঠা ৩৯৮-৯৯।

১১. মাহমাসানী, ফালসাফাহ পৃষ্ঠা ১৩৪; সাবুনি, মাদখাল, পৃষ্ঠা ১৪৩।

১২. ইসমাঈল, আদিল্লাহ, পৃষ্ঠা ৪০০।

১৩. সহিহ, বুখারি, ৩, ৪৪ (কিতাব আল সালাম হাদিস নং ১-৩); বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ১২১।

১৪. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ১৬১; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ২১৭; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ২৩০।

১৫. বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ২২৫; ইসমাঈল, আদিল্লাহ, পৃষ্ঠা ২৯১।

১৬. ইসমাঈল, আদিল্লাহ, পৃষ্ঠা ৩৯২-৯৩; সাবুনি, মাদখাল, পৃষ্ঠা ১৩৭; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ২২৬।

১৭. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ২১৭; সাবুনি, মাদখাল, পৃষ্ঠা ১৩৮; Aghnides, Muhammedan Theories, পৃষ্ঠা ৮১।

১৮. বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ২৩১; ইসমাঈল, আদিল্লাহ, পৃষ্ঠা ৩৯৩।

১৯. কারাফী, ফুরুক, ২, ৮৫; সাবুনি, মাদখাল, পৃষ্ঠা ১৪৩; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ২২৬।

২০. তাবারি, তাফসির, ৪, ৩০; ইসমাঈল, আদিল্লাহ, পৃষ্ঠা ৪০১-৪০২; জিয়াদেহ, Urf and Law, পৃষ্ঠা ৬১-৬২।

২১. শাতিবী, ইতিসাম, ২, ৩১৯। মাহমাসানীও এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে এ হলো 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদের রা. বক্তব্য (ফালসাফাহ পৃষ্ঠা ৭৭)। তবে আমিদী একে হাদিস হিসেবে উদ্ধৃত করেন (ইহকাম, ১,১২৪)।

২২. তুলনীয়, ইসমাঈল, আদিল্লাহ, পৃষ্ঠা ৪০২।

২৩. তুলনীয়, বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ২৩৩।

২৪. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ২১৮।

২৫. বায়হাকী, আল সুনান আল কুবরা, ১০, ১৫৫-৫৬; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ২১৯; সাবুনি, মাদখাল, পৃষ্ঠা ১৪৪-৪৫।

২৬. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ২১৯।

২৭. সাবুনি, মাদখাল, পৃষ্ঠা ১৪৫।

২৮. একই গ্রন্থ।

www.pathagar.com

পঞ্চদশ অধ্যায়

ইস্তিশাব (ধারাবাহিকতার অনুমিতি)

ইস্তিশাবের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে 'সহচার্য দান' বা 'সাথী হওয়া'। ইস্তিশাবের পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে, যৌক্তিক প্রমাণ যা অন্যান্য নির্দেশনার অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে, বিশেষ করে যেসব ঘটনা, আইনি বিধিবিধান ও কারণের অস্তিত্ব অতীতে বজায় থাকা বা না থাকার বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণিত এবং তাতে পরিবর্তন ঘটার প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করা না গেলে তা পূর্বের অবস্থায় বহাল রয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। ইস্তিশাবের পারিভাষিক অর্থের সাথে আক্ষরিক অর্থের সম্পর্ক রয়েছে। এ অর্থে যেকোনো ধরনের হস্তক্ষেপ বা পরিবর্তন না ঘটলে অতীত বর্তমানের 'সহচর' হয়।[১] শাফেয়ী মাজহাব এবং হাম্বলী, জাহেরী ও শিয়া ইমামিয়ারা ইস্তিশাবকে অনুমোদন করেছেন। তবে হানাফী ও মালেকীগণ এবং আবু আল হুসাইন আল বসরীসহ মুতাকাল্লিমগণ একে নিজ অধিকার বলে কোনো দলিল বলে মনে করেন না। ইস্তিশাবের বিরোধীদের মতে, কোনো ঘটনার অতীত অস্তিত্বের বিষয় প্রতিষ্ঠা তার ওই অস্তিত্ব অব্যাহতভাবে বজায় থাকার প্রমাণ বহন করে না। মূল অবস্থার অব্যাহত অস্তিত্বের বিষয়টি ওই একই পন্থায় প্রমাণ করা প্রয়োজন যে পন্থায় মূল অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে বলে দাবি করে তা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়।[২]

শাফেয়ী ও হাম্বলীগণের মতে, ইস্তিশাব বলতে ওই বিষয় অব্যাহত থাকা বুঝায় যা প্রমাণিত এবং যার কোনো অস্তিত্ব ছিল না তার অস্বীকৃতি বুঝায়। অন্যকথায় ইস্তিশাব ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় বিষয় ধারাবাহিকভাবে বজায় রয়েছে বলে মনে করে যতক্ষণ না প্রমাণের দ্বারা তার বিপরীত কিছু প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিবাচক অর্থে ইস্তিশাবের প্রয়োজন রয়েছে। এ উদাহরণ হলো, কোনো বিক্রয় (অথবা বিয়ে সংক্রান্ত) চুক্তি সম্পাদন করা হলে তাতে কোনো পরিবর্তন না ঘটা পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে বলে মনে করা হয়। এভাবে ক্রেতার মালিকানা, মালিকানা হস্তান্তর, দম্পতির বৈবাহিক অবস্থা ও বিয়ে ভেঙে না যাওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকার বিষয় সাক্ষ্য প্রমাণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে। যেহেতু শরিয়তে এ দুই চুক্তির উভয়ই স্থায়ীভাবে বৈধ এবং এতে কোনো সময়সীমা বেঁধে দেয়ার কথা স্বীকৃত হয়নি, সেহেতু এটি যৌক্তিক হবে যে বিপরীত কোনো প্রমাণ পাওয়া না গেলে তা অব্যাহত থাকবে। সম্পত্তি বিক্রি করে দেয়া হতে পারে অথবা বিয়ে ভেঙে যেতে পারে, নিছক এ সম্ভাবনা ইস্তিশাবের অনুমিতিকে খণ্ডন করার জন্য যথেষ্ট নয়।[৩] অবশ্য আইন যদি লিজ বা ভাড়ার (ইজারা) মতো অস্থায়ী ভিত্তিতে চুক্তি করা বৈধ

www.pathagar.com

করে নেয়, সে ক্ষেত্রে ইস্তিশাব স্থায়ী ভিত্তিতে অব্যাহত থাকবে বলে মনে করা যায় না। এ ক্ষেত্রে চুক্তি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বহাল থাকবে এবং ওই সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর তা বাতিল হয়ে যাবে।

ইস্তিশাবে নেতিবাচক বিষয়ও অব্যাহত থাকে বলে মনে করা হয়। এ উদাহরণ হলো, ক একটি শিকারী কুকুর কিনল খ এর কাছ থেকে এ শর্তে যে সে ওই কুকুরকে শিকার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এরপর ক দাবি করল যে কুকুরটি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নয়। ইস্তিশাব অনুসারে ক এর দাবি প্রমাণিত হবে যদি এর বিপরীত কোনো কিছু প্রমাণিত না হয়। ইস্তিশাব কোনো বিষয়ের স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখে, প্রাণীর ক্ষেত্রে তা হচ্ছে প্রশিক্ষণ না থাকা।[৪]

কোনো নির্দিষ্ট ঘটনার ক্ষেত্রে আইনের বিধানের বৈধতা অব্যাহতভাবে বজায় থাকা এবং ইস্তিশাবের আওতায় ধারাবাহিকভাবে তা বজায় থাকার অনুমিতির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এর উদাহরণ হলো, মিথ্যা অপবাদদাতাকে কখনই সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করা হবে না। কুরআনের আয়াতে (সুরা আল নূর, ২৪ : ৪) স্পষ্ট ভাষায় এ বিধানের কথা উল্লেখিত হয়েছে। এখানে এ হুকমের স্থায়ী বৈধতা খোদায়ী আদেশের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা অনুমান করার কোনো প্রয়োজন নেই। ইস্তিশাব কেবল সেসব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে যাতে কোনো দলিল পাওয়া যায় না। সুস্পষ্ট খোদায়ী বিধান থাকার ক্ষেত্রে কোনোক্রমেই ইস্তিশাব প্রয়োগের চিন্তাই করা যাবে না।[৫]

যেহেতু ইস্তিশাব সম্ভাবনার সমন্বয়ে গঠিত হয় যেমন- অতীত সামাজিক অবস্থা অব্যাহত থাকার বিষয় অনুমান করা সেহেতু তা শরিয়াহর বিধান বিয়োজনের কোনো শক্ত কারণ হতে পারে না। তাই যখন অন্য কোনো দলিল থাকে এবং তার সাথে ইস্তিশাবের বিরোধ দেখা দিলে ওই দলিল অগ্রাধিকার পাবে। ইস্তিশাব হচ্ছে ফতোয়ার সর্বশেষ ভিত্তি। কোনো নির্দিষ্ট ঘটনার ব্যাপারে ফকিহর কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস থেকে তার সমাধান প্রদানের চেষ্টা করবেন। এরপরও যদি সমাধান পাওয়া না যায় সে ক্ষেত্রে তিনি ইতিবাচক বা নেতিবাচক উভয় দিক হতে ইস্তিশাবের শরণাপন্ন হতে পারেন। কোনো জিনিসের অস্তিত্ব না থাকার ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দিলে তা বজায় আছে বলে ধরে নেয়া হবে। কিন্তু কোনো বিষয়ে প্রমাণের ক্ষেত্রে সন্দেহ দেখা দিলে এ অনুমানের বিষয়টি অপ্রমাণিত বলে বিবেচিত হবে। এর উদাহরণ হলো, নিখোঁজ ব্যক্তির ক্ষেত্রে পরিস্থিতি যদি এমন হয় যে তার বেঁচে থাকার বা মৃত্যুর বিষয়টি নির্ণয়ে শরিয়াহর কোনো প্রমাণ প্রয়োগ করা গেল না। এ ক্ষেত্রে নিখোঁজ লোকটির বিষয়ে সন্দেহের প্রধান বিষয় হবে তার মৃত্যুর সম্ভাবনা। ইস্তিশাব মনে করে যে লোকটি এখনো বেঁচে

www.pathagar.com

আছে। কিন্তু প্রমাণবিহীন দাবিকে অপ্রমাণীত বলে গণ্য করা হয়। এর উদাহরণ হলো, ক দাবি করল যে খ এর কাছে তার কিছু টাকা পাওনা আছে। এখানে দেনার অস্তিত্বের প্রমাণের বিষয়ে কিছুটা সন্দেহ আছে, যা অপ্রমাণীত বলে মনে করা হবে।[৬]

কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রয়োগযোগ্য হতে পারে এমন আইনের বিধান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ইস্তিশাবের অনুমিতিও শরিয়াহর সাধারণ নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয়। উদাহরণ হিসেবে বল যায় যে, খাদ্য, পানীয় ও পোশাক সম্পর্কে আইনগত বিধিবিধান অনুমোদনযোগ্য (ইবাহা)। যখন কোনো বিশেষ পানীয় বা খাদ্যের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠে এবং তার মান নির্ণয়ে আর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না, সেক্ষেত্রে ইস্তিশাবের আশ্রয় গ্রহণ করা যেতে পারে। তা হলো, ওই খাবার অনুমোদনযোগ্য বলে মনে করতে হবে। কিন্তু তা নারী ও পুরুষের একত্রে বসবাস করার মতো হারাম বা নিষিদ্ধ বিষয়ের ক্ষেত্রে হয়, তা হলে তা হারাম বা নিষিদ্ধ বিষয় বলে মনে করা হবে যতক্ষণ না তার বৈধতার ব্যাপারে কোনো প্রমাণ দেখতে পাওয়া যাবে।

শরিয়ত ও যৌক্তিকতা (আকলী) উভয় তথ্য প্রমাণে ইস্তিশাবের প্রতি সমর্থন দেখতে পাওয়া যায়। যুক্তি থেকে আমরা অবশ্য এ কথা জানতে পারি যে, আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টির নিয়মাবলি ও জনপ্রিয় প্রথা অনুযায়ী সম্ভবত স্বাভাবিকভাবে প্রতিশ্রুতি, চুক্তি ও আইন অব্যাহতভাবে বজায় থাকবে, যতক্ষণ না এর বিপরীত প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়। অনুরূপভাবে এটিও স্বাভাবিক যে, যেসব জিনিসের অস্তিত্ব বজায় নেই এবং এর বিপরীত প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তা ওইভাবে বজায় থাকবে বলে আশা করা যায়। আল আমিদীর মতে, যখন কোনো যুক্তিজ্ঞান সম্পন্ন মানুষ (উকালা) এবং যেসব মানুষ সমাজ গ্রহণ করে নিয়েছে এমন রীতিনীতি মেনে চলে (আহল আল উরফ), তারা কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকা ও না থাকার বিষয়ে অবগত থাকেন এবং তারা যতটুকু জানেন তার ভিত্তিতেই তারা তাদের সিদ্ধান্ত প্রদান করেন, যতক্ষণ না তারা নিজস্ব পর্যবেক্ষণ অথবা প্রমাণের সাহায্যে তাতে পরিবর্তন ঘটার বিষয়টি নিশ্চিত জানতে পারেন।[৭] যুক্তি-বুদ্ধি থেকে আমরা এ কথা জানতে পারি যে, উপযুক্ত তথ্য-প্রমাণ দ্বারা কোনো অবস্থার পরিবর্তন ঘটার বিষয়টি জানা না গেলে তা পূর্বাবস্থায়ই রয়ে গেছে বলে আশা করা যায়। একজন সৎ ও পুণ্যবান লোক (আদিল) পাপী (ফাসিক) হয়ে গেছে নিছক এ দাবি কোনো গুরুত্ব বহন করে না এবং যতক্ষণ না এর বিপরীত কোনো প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করা যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত ওই ব্যক্তি আদিল হিসেবেই বিবেচিত হবেন। অনুরূপভাবে কোনো ছাত্র যদি ডিগ্রি কোর্সে ভর্তি হয় ও নাম নিবন্ধন করে তাহলে তার ছাত্রত্ব নেই এমন প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত সে ছাত্রই থেকে যাবে। এর আগে প্রতি সপ্তাহ বা প্রতি মাসে তার ছাত্রত্ব বজায় থাকার বিষয় প্রমাণ করার কোনো দরকার হবে না।[৮]

www.pathagar.com

আল আমিদী বলেছেন যে, কোনো কিছু অতীতে বর্তমান বা অনুপস্থিত ছিল এমন ধারণা করা যন্নীর সমতুল্য, যা বিচারিক (শারয়ী) বিষয়ে বৈধ দলিল এবং তার ভিত্তিতে কাজ করা যুক্তিসঙ্গত।[৯] শরিয়াহর বিধিবিধান ততক্ষণ পর্যন্ত বহাল থাকবে যতক্ষণ না ওই আইন বা যে বিষয়ে তা প্রয়োগ করা হয়েছিল তাতে পরিবর্তন ঘটে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, মদ খাওয়াকে নিষিদ্ধ বা হারাম করা হয়েছে, জরুরি পরিস্থিতি সৃষ্টি অথবা মদ তার বৈশিষ্ট্য না হারানো পর্যন্ত যেমন- ভিনেগারে পরিণত হওয়া, মদ সম্পর্কে এ বিধান অপরিবর্তিত থাকবে।

ইস্তিশাবের শ্রেণি বিভাগ

অব্যাহত থাকবে বলে মনে করার অবস্থা বা শর্তের ওপর ভিত্তি করে ইস্তিশাবকে চার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। নিম্নে এ শ্রেণি বিভাগ নিয়ে আলোচনা করা হলো:

১. আদি অনুপস্থিতির অনুমিতি (ইস্তিশাব আল 'আদাল আল আসলি) : এর অর্থ হচ্ছে এমন ঘটনা বা আইনের বিধান যার অস্তিত্ব অতীতে ছিল না, তার বিপরীত কোনো কিছু প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তা অস্তিত্বহীন থাকবে বলে মনে করা হবে। এভাবে একটি শিশু ও একজন অশিক্ষিত মানুষ তাদের অবস্থার পরিবর্তন না ঘটা, অর্থাৎ সাবালকত্ব প্রাপ্ত হওয়া ও শিক্ষা লাভ না করা পর্যন্ত তাদের পূর্বের ওই অবস্থাই বজায় থাকবে বলে ধরে নেওয়া হবে। অনুরূপভাবে যদি খ এর ব্যবসায়ী শরিক ক দাবি করে যে সে কোনো মুনাফা অর্জন করেনি তা হলে খ এর বিপরীত কোনো প্রমাণ দিতে না পারা পর্যন্ত ক এর দাবিই বজায় থাকবে বলে মনে করা হবে। আদি অনুপস্থিতি বজায় থাকার আরেকটি ক্ষেত্র হলো দায়দায়িত্ব থেকে আদি মুক্ত অবস্থা বা নিষ্পাপ বলে মনে করা। আমরা পরে পৃথকভাবে এ নিয়ে আলোচনা করব।[১০]

২. আদি উপস্থিতির অনুমিতি (*ইস্তিশাব আল ইউজুদ আল আসলি*) : এ ধরনের ইস্তিশাবে এমন বিষয়ের উপস্থিতি বা অস্তিত্ব বজায় থাকার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে, যা আইন বা যুক্তির দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। এর উদাহরণ হলো, ক খ এর কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করেছে বলে জানা গেছে। ক এ ঋণ পরিশোধ করেছে অথবা এ থেকে তাকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে বলে প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত সে ঋণগ্রস্ত রয়েছে বলেই মনে করতে হবে। খ এর কাছে ক এর ঋণের কথা বাস্তব ঘটনা হিসেবে প্রথমত একটি জানা বিষয়, এটিই তার ঋণী থাকার বিষয়টি বজায় রয়েছে বলে অনুমান করার জন্য যথেষ্ট, মাসের প্রতিদিনই খ এর পাওনার বিষয়টি প্রমাণ করার কোনো দরকার

www.pathagar.com

নেই। অনুরূপভাবে আদি উপস্থিতি বজায় থাকার অনুমান করার আওতায় ক্রেতা ক্রয় চুক্তির উপস্থিতির বলে কেনা পণ্যের দাম পরিশোধ করতে বাধ্য বলে অনুমান করা হয়, যতক্ষণ না প্রমাণিত হয় যে সে তা পরিশোধ করেছে। একইভাবে স্বামী তার স্ত্রীর মোহরানা বিয়ের বৈধ চুক্তির (কাবিননামা) মাধ্যমে পরিশোধ করতে বাধ্য। এসব উদাহরণ থেকে দেখা গেল যে, ইস্তিশাবে অনুমান করা হয় যে, দায়দায়িত্ব বা অধিকার বজায় থাকবে যতক্ষণ না তার বিপরীত প্রমাণ দেখতে পাওয়া যায়। আলেমগণ এ ধরনের ইস্তিশাবের বৈধতার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যার বিপরীত কোনো কিছু প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তা অবশ্যই বজায় থাকবে।[১১]

৩. *ইস্তিশাব আল হুকম* বা এমন ইস্তিশাব যাতে আইনের সাধারণ বিধান ও মূলনীতি অব্যাহত রয়েছে বলে অনুমান করা : আগেই বলা হয়েছে যে, ইস্তিশাব কেবলমাত্র ঘটনার অনুমিতির বিষয়ের সাথেই সংশ্লিষ্ট নয় উপরন্তু তা প্রতিষ্ঠিত বিধিবিধান ও আইনের মূলনীতির সাথেও সংশ্লিষ্ট। এভাবে ইস্তিশাব শরিয়াহর অনুমোদিত ও নিষিদ্ধ (হালাল ও হারাম) বিধানের বৈধতা অব্যাহতভাবে বজায় থাকার বিষয় নিশ্চিত করেছে। যখন আইনের কোনো সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়, তাতে কোনো কিছু অনুমোদন বা নিষিদ্ধ যাই করা হোক না কেন, তা অব্যাহতভাবে বজায় থাকবে বলে মনে করা হবে যতক্ষণ না তার বিপরীত কিছু প্রমাণিত হবে। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে এ ধরনের সিদ্ধান্ত পাওয়া যাবে না সে ক্ষেত্রে ইবাহার মূলনীতি অবলম্বন করতে হবে। তা হলো– কোনো বিষয়ে শরিয়াহর সাধারণ নিয়ম যাকে কল্যাণকর ও খারাপ পরিণাম থেকে মুক্ত বলে মনে করা হয়। যখন কোনো বিষয়ে আইন 'নীরব' থাকে এবং যুক্তি জ্ঞানের আলোকে অপছন্দনীয় নয়, তখন তা অনুমোদনযোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে। এ হলো সংখ্যাগরিষ্ঠের মত। অবশ্য মুতাজিলাদের কেউ কেউ এ ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করেন; আর তাদের মত হলো, শরিয়াহর সাধারণ নিয়ম হচ্ছে নিষিদ্ধ বিষয় তার বিপরীত নির্দেশনা না পাওয়া পর্যন্ত বজায় থাকবে। অনুমোদনযোগ্যতার মূলনীতি (ইবাহা) পবিত্র কুরআন, বিশেষ করে ওই সব আয়াত থেকে উৎসারিত হয়েছে যাতে পৃথিবী ও তার সম্পদকে মানুষের অধীন করে দেয়া হয়েছে। আমরা (সুরা বাকারা, ২ : ২১) দেখতে পাই : 'একমাত্র তিনিই তোমাদের জন্য পৃথিবীর সমগ্র জিনিস সৃষ্টি করেছেন।' (সুরা আল যাসিয়াতে, ৪৫ : ১৩) বলা হয়েছে : 'আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে তার সব কিছুকেই আল্লাহ তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। 'কুরআনের

www.pathagar.com

এসব ঘোষণাকে মানুষের অগ্রগতি ও কল্যাণে তার চারপাশের বিশ্বের সব সম্পদকে ব্যবহার করার নিশ্চয়তা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। একে অন্যভাবে বলা যায় যে, সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ না করা পর্যন্ত কল্যাণের পথে কাজ করার জন্য সাধারণভাবে মানুষকে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। তাই দেখা যাচ্ছে যে, যেসব বস্তু, আইনগত বিধিবিধান, চুক্তি এবং পণ্য ও সেবা মানুষের জন্য কল্যাণকর তা মূল ইবাহার আলোকে বৈধ।[১২] কিন্তু যখন আইনগত বিধানে কোনো কিছু হারাম বুঝালে তা হারাম নয় মর্মে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহতভাবে হারাম হিসেবেই বহাল থাকবে।

৪. ইস্তিশাব আল ওয়াসফ বা অব্যাহত থাকার গুণ, যেমন– পানি পরিষ্কার বলে মনে করা (পবিত্রতা একটি গুণ) যার বিপরীত কিছু প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত যেমন- রঙ বা স্বাদের পরিবর্তন না ঘটলে তা অব্যাহতভাবে পরিষ্কার বলে মনে করা হবে। অনুরূপভাবে যখন কোনো ব্যক্তি নামাজ আদায়ের জন্য অজু করে তখন সে ইবাদত-বন্দেগির জন্য পবিত্রতার গুণ (তাহরাত) অর্জন করে, যা অজু ভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। অজু ভেঙে গেছে বলে নিছক সন্দেহ অজু ভঙ্গের জন্য যথেষ্ট নয়। একই দৃষ্টান্ত অনুযায়ী একজন জামিনদাতা (কফিল-কাফালাত বিচারিক গুণ অর্জনের কারণে) সে যে ঋণের জন্য জামিন হয়েছে ঋণ গ্রহীতা যতক্ষণ না ওই ঋণ পরিশোধ করবে অথবা ঋণদাতা তাকে দায় থেকে মুক্ত করে না দেবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে ঋণের জন্য দায়ী থাকবে।[১৩]

ফকিহগণ প্রথম তিন প্রকার ইস্তিশাবের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তবে তাতেও বাস্তবায়নের বিস্তারিত দিকের ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। আমরা এখন সে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। গুণের সাথে সংশ্লিষ্ট চতুর্থ প্রকার ইস্তিশাবের ব্যাপারে ফকিহদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। শাফেয়ী ও হাম্বলী মাজহাব একে নিরঙ্কুশভাবে সমর্থন করেছে অন্যদিকে হানাফী ও মালেকী মাজহাব একে কিছু আপত্তিসহ মেনে নিয়েছে। নিখোঁজ ব্যক্তির প্রসঙ্গ এ শ্রেণির ইস্তিশাবে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে প্রধান প্রশ্ন হচ্ছে তার জীবিত থাকার বিষয়। জীবন হচ্ছে এখানে গুণ। যেহেতু নিখোঁজ ব্যক্তি (মাফকুদ) হারিয়ে যাওয়ার সময় জীবিত ছিল সেহেতু সে মারা গেছে বলে প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত সে জীবিত রয়েছে বলেই মনে করতে হবে। তাই শাফেয়ী ও হাম্বলী মূলনীতি অনুযায়ী সে নিখোঁজ থাকা সত্ত্বেও মৃত স্বজনদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। এবং সে জীবিত রয়েছে বলে মনে করার কারণে কেউ তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারবে না। হানাফী ও মালেকী মাজহাবের আইন অনুযায়ী নিখোঁজ ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সম্পত্তির

www.pathagar.com

উত্তরাধিকারী হতে পারবে না এবং অন্যরাও তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারবে না। হানাফী ও মালেকীরা ইস্তিশাব আল ওয়াসফকে কেবলমাত্র প্রতিরক্ষার উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং অস্তিত্বের অব্যাহত উপস্থিতিকে তারা একটি গুণ হিসেবে সংরক্ষণ করেছেন। তবে তাকে নতুন অধিকার ও নতুন গুণ অর্জনের প্রমাণের উপায় হিসেবে নয়। তাই দেখা যাচ্ছে, ইস্তিশাব নিখোঁজ ব্যক্তির নতুন অধিকার অর্জনের উপায় হিসেবে নয় বরং তার সব বর্তমান অধিকার রক্ষার কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। তবে অভিন্ন যে মত প্রকাশ করা হয় তা হলো, ইস্তিশাবকে কেবল ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে তলোয়ার হিসেবে নয়। উদাহরণ হলো, নিখোঁজ ব্যক্তি হারিয়ে যাওয়ার সময় সম্পত্তির মালিক হয়ে থাকলে তার সে মালিকানা বহাল থাকবে। অনুরূপভাবে তার বৈবাহিক অধিকারও বহাল থাকবে এবং সে ঠিক আগের মতোই তার দায়দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে দায়ী থাকবে যতক্ষণ না তার মারা যাওয়ার বিষয়টি প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হবে অথবা আইনগতভাবে তা ঘোষণা করা হবে। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত লোকটি নিখোঁজ হয়ে থাকবে ততদিন পর্যন্ত সে উত্তরাধিকার বা অসিয়তি সম্পত্তির অংশ পাবে না; তবে তার জীবিত থাকা বা মৃত্যুর বিষয়টি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এ অংশ সংরক্ষিত থাকবে। যদি তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয় তাহলে তার অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের মাঝে তার এ অংশ বণ্টন করে দেয়া হবে এ কথা বিবেচনা করে যে, ওই স্বজনের মৃত্যুর সময় সে জীবিত ছিল না। তার মৃত্যু হয়েছে বলে ঘোষণা দেয়া হলে তার সম্পত্তি ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হবে, কারণ সেসময় আদালত তার মৃত্যুর এ ঘোষণা প্রদান করবে। এ হলো হানাফী ও মালেকী মাজহাবের মত। এতে বলা হয়েছে যে, মাফকুদকে যদিও জীবিত বলে অনুমান করা হয়, এটি বাস্তব নয়। তাই একে নতুন অধিকার সৃষ্টির ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।[১৪] এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে : মাফকুদের উত্তরাধিকারীরা কেন তার অংশীদার হতে পারবে না? যদি কোনো কিছুই নিশ্চিত না হয় তা হলে তার উত্তরাধিকারীদের তাদের অংশ প্রদান করা যেতে পারে অথবা প্রকৃত ঘটনা না জানা পর্যন্ত তা তাদের নামে সংরক্ষিত রাখা যেতে পারে। এর জবাবে হানাফীগণ 'আদি অনুপস্থিতির' নীতি অবলম্বন করেন, এখানে যার অর্থ হচ্ছে, উত্তরাধিকারীদের অধিকার আদিতে অনুপস্থিত ছিল তাই তাদের এ অধিকার অর্জিত হয়েছে এমন কোনো প্রমাণ হাজির না করা পর্যন্ত তা অব্যাহতভাবে অনুপস্থিত থাকবে বলে মনে করা হবে।[১৫]

অন্যদিকে শাফেয়ী ও হাম্বলীগণ ইস্তিশাবের আত্মরক্ষামূলক (লি-দাফ) ও হা-সূচক (লি-কাসব) উভয় সামর্থ্যকে বৈধতা প্রদান করেছেন। অর্থাৎ তা হলো একদিকে ঢাল আর অন্যদিকে তলোয়ার। তাই মনে করা হয় যে, নিখোঁজ হওয়ার সময়

www.pathagar.com

লোকটির যেসব অধিকার ছিল মৃত্যু ঘোষণা না করা পর্যন্ত সে একইভাবে সেসব অধিকার ভোগ করতে থাকবে। মাফকুদের নিজের সব অধিকার কেবল বহালই থাকবে না উপরন্তু সে উপঢৌকন, উত্তরাধিকার ও অসিয়তের অধিকারের মতো নতুন অধিকারও অর্জন করতে পারবে।[১৬] এভাবে দেখা যাচ্ছে যে, ফকিহগণ ইস্তিশাবের নীতির ক্ষেত্রে এবং এর বিস্তারিত প্রয়োগের প্রশ্নে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। হানাফী ও মালেকীগণ নিয়ন্ত্রিতভাবে ইস্তিশাবকে গ্রহণ করেছেন। তারা যুক্তি দেখিয়েছেন যে, অতীতে কোনো কিছুর অস্তিত্ব বজায় থাকা ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকার প্রমাণ বহন করে না। তারা আরো যুক্তি দেখান যে, ইস্তিশাবের ওপর মাত্রাতিরিক্ত নির্ভরশীলতা আহকাম নির্ণয়ে অনিশ্চয়তা, এমনকি বিরোধ সৃষ্টির দ্বার উন্মোচন করতে পারে। এ ব্যাপারে বিচারিক মতপার্থক্যের প্রধান বিষয় হচ্ছে, আদি অবস্থা শনাক্ত করা, যা ভবিষ্যতে বজায় থাকবে বলে সম্ভবত ইস্তিশাবের ভিত্তিতে মনে করা হয়। এ কারণে হাম্বলী ফকিহ ইবনে আল কাইয়ুম অতিমাত্রায় ইস্তিশাবের ওপর নির্ভরশীলতা এবং যারা এর যতটুকু ব্যবহার করা উচিত তার চেয়ে বেশি ব্যবহার করেছেন তাদের সমালোচনা করেছেন।[১৭] নিম্নের উদাহরণগুলো আইন সংক্রান্ত মূলনীতির প্রেক্ষাপটে ইস্তিশাব থেকে গঠিত হয়েছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ মূলনীতির প্রয়োগে আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছে। ইস্তিশাবের ওপর ভিত্তি করে গঠিত সুপরিচিত এ ধরনের মূলনীতিগুলোর সারসংক্ষেপ নিম্নে তুলে ধরা হলো :

১. সন্দেহ দ্বারা নিশ্চয়তা অপ্রমাণিত হয় না (আল ইয়াকীন লা-ইয়াজুল বিল শাক্ক)। এর উদাহরণ হলো, কোনো ব্যক্তি যখন সুস্থ মানুষ হিসেবে বিবেচিত হবে তখন সে পাগল হয়ে গেছে বলে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সে সুস্থ মানুষই থাকবে বলে মনে করা হবে। কোনো অনুমিতি কেবলমাত্র নিশ্চয়তার দ্বারাই উপেক্ষিত হতে পারে, নিছক সন্দেহের দ্বারা নয়। অনুরূপভাবে কোনো ব্যক্তি রমজান মাসে সেহরি খেতে দেরি করে ফেলল, এতে তার সন্দেহ হলো যে, তার খাওয়া শেষ হওয়ার আগেই হয়তো সুবহে সাদেক হয়ে গিয়েছিল, এরপরও তার রোজা ঠিক থাকবে এবং কাফফারা হিসেবে আর রোজা পালন করতে হবে না। এ উদাহরণ থেকে আলোচ্য মূলনীতির দুইটি উপাদান- নিশ্চয়তা ও সন্দেহ শনাক্ত করতে হবে। এখানে রাত নিশ্চয়তা বুঝাচ্ছে, অন্যদিকে দিনের সূচনা হচ্ছে সন্দেহজনক অবস্থা, তাই দিনের সূচনার চেয়ে রাতই এখানে অগ্রাধিকার পাবে। অবশ্য একই বিধানে আবার সম্পূর্ণ ভিন্ন ফল দেখতে পাওয়া যায়, তা হলো, কোনো ব্যক্তি যদি রমজানে দিনের শেষে এমন অবস্থায় ইফতার বা রোজা ভঙ্গ করে যাতে সূর্য অস্ত গেছে কি না সে ব্যাপারে সন্দেহের সৃষ্টি হয়, সে ক্ষেত্রে তার রোজা নষ্ট

www.pathagar.com

হয়ে যাবে এবং কাফফারা হিসেবে তাকে কাজা রোজা আদায় করতে হবে। এখানে নিশ্চয়তা দিবালোক যা অগ্রাধিকার পাবে এবং তা অব্যাহত ছিল বলে মনে করা হবে, আর সূর্যাস্তের মাধ্যমে রাতের সূচনা হচ্ছে সন্দেহ। এ ঘটনায় সন্দেহের ওপর নিশ্চয়তা অগ্রাধিকার পেয়েছে, তা হলো, দিনের বেলায় রোজা ভঙ্গ হয়েছে, যা নিশ্চয়তা বজায় থাকা অবস্থা নির্দেশ করে।[১৮]

আলোচ্য নীতি বাস্তবায়নে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তার ব্যাখ্যা দিতে আমরা ওই ব্যক্তির উদাহরণ তুলে ধরতে পারি যে তার স্ত্রীকে তালাকের মাধ্যমে পরিত্যাগ করেছে। কিন্তু তালাকের কথাটি সে ঠিক কিভাবে উচ্চারণ করেছে সে ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে : তা এক না তিন তালাক বুঝাবে। ফকিহদের সংখ্যাগরিষ্ঠের মত অনুযায়ী কেবলমাত্র একবার তালাক দেয়ার ঘটনা ঘটেছে যার অর্থ হলো, স্বামী এখনো ওই তালাক প্রত্যাহার (রিজাহ) করে নেয়ার অধিকার রাখে এবং স্বাভাবিক দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরায় স্থাপন করতে পারে। অন্যদিকে ইমাম মালিকের মতে, তিন তালাকের ঘটনা ঘটেছে, তাই তা প্রত্যাহার করার দরজা রুদ্ধ হয়ে গেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠের মত ও ইমাম মালিকের মতের মধ্যে এখানে যে পার্থক্য দেখা দিয়েছে তা নিশ্চয়তা ও সন্দেহের বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যার কারণে হয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠের মত হলো, বিয়ে হচ্ছে একটি অব্যাহত অবস্থা এবং দলিলের সাহায্যে তা ভেঙে যাওয়া প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত তা বহাল থাকবে। এখানে সন্দেহ হচ্ছে তালাক উচ্চারণ করা। সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে, সন্দেহজনক তালাকের মাধ্যমে বিয়ের নিশ্চিত ঘটনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে দেয়া যাবে না। বিয়ে হচ্ছে নিশ্চিত ঘটনা আর তালাক হচ্ছে সন্দেহজনক বিষয়, তাই বিয়ে তালাকের ওপর অগ্রাধিকার পাবে। অন্যদিকে ইমাম মালিক মনে করেন যে, এ ঘটনায় তালাক দেয়ার বিষয়টি নিশ্চিত প্রতীয়মান হয়েছে আর সন্দেহের বিষয় হচ্ছে স্বামীর তালাক প্রত্যাহারের অধিকার। তালাকের সঠিক সংখ্যা নির্ণয়ের বিষয়টি এখানে প্রত্যাহারের অধিকারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ইমাম মালিক মনে করেন যে, নিছক সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তালাক প্রত্যাহারের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তাই স্বামীর তালাক প্রত্যাহার করার কোনো অধিকার নেই, এর অর্থ হলো, তালাকের বিষয়টি চূড়ান্ত হয়ে গেছে।[১৯]

ফকিহদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মনে করেন যে, এ ক্ষেত্রে বিয়ে হচ্ছে একটি নিশ্চিত বিষয়, আর ইমাম মালিকের মতে তা হলো তালাক সম্পর্কিত প্রকৃত ঘোষণা। তা কিভাবে দেয়া হয়েছে সে বিষয়টি ধর্তব্যের মধ্যে পড়বে না, যা নিশ্চিত অবস্থা বুঝায়। আর এর ভিত্তিতেই ইস্তিশাব অবশ্যই কাজ করবে। এ

www.pathagar.com

মতপার্থক্য সম্পর্কে ইবনে আল কাইয়ুম ও আবু জাহরাহ উভয়ে মনে করেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠের মত অগ্রাধিকার পাওয়ারযোগ্য। তাই এ ক্ষেত্রে সন্দেহজনক তালাকের দ্বারা বিয়েকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার অনুমতি দেয়া যাবে না।[২০] এ ব্যাপারে আরেকটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে, যখন কোনো ব্যক্তি তার দুই স্ত্রীর একজনকে পরিত্যাগ করল কিন্তু কোন স্ত্রীকে সে তালাক দিলো তা নিশ্চিত নয়। মালেকীদের মতে, এখানে নিশ্চিত বিষয় হচ্ছে, তালাকের কথা ঘোষণা করা হয়েছে এবং অনিশ্চয়তার বিষয় হচ্ছে তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীর পরিচয়। তাই এ ক্ষেত্রে ইস্তিশাবের বিধান অনুযায়ী উভয় স্ত্রী তালাক হয়ে গেছে, এখানে নিশ্চয়তাকে সন্দেহের ওপর অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। অবশ্য সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে, এখানে নিশ্চিত বিষয় হচ্ছে ওই ব্যক্তির দুই স্ত্রী থাকার বিষয় অর্থাৎ উভয় স্ত্রীর সাথে বৈধ বিয়ের সম্পর্ক বজায় থাকবে। এখানে সন্দেহ হচ্ছে, তালাকপ্রাপ্ত নারীর পরিচয় যা কোনোক্রমেই নিশ্চিত বিষয় বিয়েকে মিথ্যা প্রমাণ করতে পারে না। তাই দুই স্ত্রীর কেউই তালাক প্রাপ্ত হয়নি।[২১] নিশ্চিত অবস্থা নিরূপণের ক্ষেত্রে আলেমদের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এ ঘটনায় আবারো মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়েছে, যা নিরসনে ইস্তিশাবের বিধান অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে।

২. সাধারণ অবস্থা সুনির্দিষ্ট হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তা আগের অবস্থায় বজায় থাকবে বলে অনুমান হচ্ছে ইস্তিশাব থেকে সৃষ্ট আরেকটি মূলনীতি। তাই দেখা যাচ্ছে যে কোনোভাবে নির্দিষ্ট হয়ে পড়ার পূর্ব পর্যন্ত সাধারণ বিষয় ('আম) ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবশ্যই 'আম' হিসেবে বহাল থাকবে। সাধারণ খোদায়ী বিধান যেমনটি নির্দিষ্ট হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সাধারণই থাকে তেমনই ওই বিধানের বৈধতা অনুরূপভাবে বহাল থাকবে যতক্ষণ না তা রহিত করা হবে। এর অর্থ হলো, আইনসংক্রান্ত খোদায়ী বিধান বৈধ হিসেবে বহাল থাকবে এবং তা অবশ্যই বাস্তবায়ন করতে হবে যতক্ষণ না তা রহিত বা অন্য আয়াত দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে।[২২] আলোচ্য নীতি সম্পর্কে আলোচনার সময় আল শাওকানী কতিপয় আলেমের ভিন্ন মতের বিবরণ তুলে ধরেন, তাতে বলা হয় যে, এ পরিস্থিতিতে আইনের বিধান শব্দের ব্যাখ্যার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়, ইস্তিশাব প্রয়োগের মাধ্যমে নয়।[২৩] এ কথার অর্থ হচ্ছে, খোদায়ী বিধান হচ্ছে সাধারণ বা সুনির্দিষ্ট অথবা ওই বিধান বৈধ হিসেবে বহাল রয়েছে এবং রহিত করা হয়নি, আর এটি নির্ধারণ করা হয় শব্দের ব্যাখ্যার সাহায্যে, ইস্তিশাব প্রয়োগের মাধ্যমে নয়। এর উদাহরণ হলো, উত্তরাধিকার হিসেবে পুরুষ অংশ নারীর দ্বিগুণ, এ হলো কুরআনের একটি সাধারণ বিধান (সুরা আল নিসা ৪ : ১১), হাদিস দ্বারা সুনির্দিষ্ট করা না হলে এটি সাধারণ বিধান হিসেবেই অব্যাহত থাকত :

www.pathagar.com

لا يرث القاتل

'খুনি উত্তরাধিকারী হতে পারবে না'।[২৪] অনুরূপভাবে কিবলা সম্পর্কিত সুন্নাহর বিধান কার্যকর ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত কুরআনের আদেশ দ্বারা (সুরা আল বাকারা ২ : ১৪৪) তা রহিত করা হয়। এ আদেশে কিবলা জেরুসালেম থেকে কাবা শরিফের দিকে পরিবর্তন করা হয়। এগুলোর সবই সুস্পষ্ট তাই আল শাওকানী যথার্থ বলেছেন, এসব বিষয়ে ইস্তিশাব অবলম্বনের কোনো প্রয়োজন নেই। ইস্তিশাব থেকে আমরা যে প্রেক্ষাপট জানতে পারি তা হলো, ঘটনাটি এমন হতে পারে যে, আইনের সাধারণ বিধি অন্য আইন দ্বারা সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে কি না সে ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে অথবা যখন একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে আইনটি রহিত হয়ে গেছে কি না সে ব্যাপারেও সন্দেহের অবকাশ রয়েছে, ইস্তিশাবে সুনির্দিষ্টকরণ বা রহিতকরণের অনুপস্থিতিতে আইনের সাধারণ অবস্থা বজায় রয়েছে বলে অনুমান করা হয় যতক্ষণ না এর বিপরীত অবস্থা প্রমাণের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩. দায় থেকে প্রকৃত মুক্তি লাভের অনুমিতি (বারাআহ আল জিম্মাহ আল আসলিয়াহ)। এর অর্থ হলো, দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত থাকা যতক্ষণ না এর বিপরীত কিছু প্রমাণিত হয়। তাই আইনের বাধ্যবাধকতা না থাকলে কোনো ব্যক্তিকে কোনো দায়দায়িত্ব পালনে বাধ্য করা যাবে না। এর উদাহরণ হলো, কোনো ব্যক্তির জন্য জীবনে একবারের বেশি হজ পালন করা জরুরি নয় অথবা পাঁচ ওয়াক্তের অতিরিক্ত আরেক ওয়াক্ত নামাজ আদায় করার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ শরিয়ত এ ধরনের দায়িত্ব আরোপ করেনি। অনুরূপভাবে কোনো ব্যক্তি আইনগত তথ্য প্রমাণ বা তদন্তের মাধ্যমে দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত দণ্ডযোগ্য হবে না।[২৫] অবশ্য এ নীতির বিস্তারিত বাস্তবায়নের ব্যাপারে হানাফী ও শাফেয়ী ফকিহদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ক দাবি করল যে সে খ-এর কাছে ৫০ ডলার পাবে। কিন্তু খ তা অস্বীকার করল। প্রশ্ন হচ্ছে, অস্বীকার করার পর এ ঘটনার নিষ্পত্তি করা (সুলব) কি বৈধ হবে। হানাফীগণ এ প্রশ্নের হ্যাঁ সূচক জবাব দিয়েছেন, কিন্তু শাফেয়ীগণ মনে করেন যে, অস্বীকৃতি জানানোর পর নিষ্পত্তি অনুমোদনযোগ্য নয়। শাফেয়ীদের যুক্তি হলো, যেহেতু খ নিষ্পত্তির আগেই ঘোষণা করেছে সেহেতু তার ক্ষেত্রে দায় থেকে প্রকৃত মুক্তি লাভের মৌলনীতি প্রযোজ্য হবে। এর অর্থ হলো, সে আদৌ কোনো দায় বহন করবে না। এ কারণে খ এর কাছ থেকে ক এর কোনো কিছু গ্রহণ করা বৈধ হবে না। তাই এখানে নিষ্পত্তির কোনো কার্যকারিতা নেই।

www.pathagar.com

অন্যদিকে হানাফীগণের যুক্তি হলো, দাবির পর খ এর দায়হীনতা অলঙ্ঘনীয় নয়। অন্য কথায় এ দাবি আলোচ্যনীতি কার্যকরের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে এবং খ কে অনির্দিষ্টকালের জন্য দায়মুক্ত মনে করা যেতে পারে না, তাই দুই পক্ষের মধ্যে অনির্দিষ্টকালের জন্য বৈরিতা রোধের স্বার্থে তাদের মধ্যে নিষ্পত্তি অনুমোদনযোগ্য।[২৬]

৪. কোনো জিনিসের আদি অবস্থার অনুমোদনযোগ্যতা (আল আসল ফি আল আশাইয়া), আমরা ইতোমধ্যে ইবাহার নীতিমালা নিয়ে আলোচনা করেছি যা ইস্তিশাবের মূলনীতির একটি শাখা। উপরিউক্ত আলোচনার সারসংক্ষেপ হিসেবে এ কথা বলা যায় যে, যেসব বিষয় শরিয়ত তার পরিপন্থী বলে নিয়ন্ত্রণ করেনি তা অনুমোদনযোগ্য। এ ক্ষেত্রে বিপরীত কিছু প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তা অনুমোদনযোগ্য থাকবে বলে মনে করা হয়। ইবাহা প্রয়োগের একটি ব্যতিক্রম হলো, নারী ও পুরুষের মধ্যকার সম্পর্ক। এ ক্ষেত্রে মৌলিক নিয়ম হচ্ছে, হারাম, যদি বিয়ের মাধ্যমে তা বৈধতা প্রাপ্ত না হয়। হাম্বলীগণ ইবাহাকে ব্যাপক গুরুত্ব প্রদান করেছেন এবং তারা একে প্রতিশ্রুতি (ইলতিজাম) বলে গণ্য করেছেন, যদি না কুরআনে এর বিপরীত কোনো আয়াত থাকে। হাম্বলী মূলনীতি অনুযায়ী ইবাদত-বন্দেগির বৈধতা প্রদান করে কুরআনের সুস্পষ্ট বিধান না থাকলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। কিন্তু লেনদেন ও বিক্রয় চুক্তির ক্ষেত্রে এ নিয়ম বৈধ, যদি না এর বিপরীত কোনো নস থাকে।[২৭] উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ইবাহা সম্পর্কিত হাম্বলী মত অনুসারে সম্ভাব্য পাত্র-পাত্রী তাদের বিয়ের চুক্তির (কাবিননামা) শর্ত নির্ধারণ করতে পারবে, এমনকি তাতে স্বামী একাধিক বিয়ে করতে পারবে না, এ শর্তও অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে। এ বিষয়ে কেবলমাত্র হাম্বলীগণ এ মত ব্যক্ত করেছেন, তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহর মতে, এ শর্ত হচ্ছে একাধিক বিয়ে করার বৈধতা প্রদান সংক্রান্ত শরিয়াহর বিধানের ওপর বিধিনিষেধ আরোপের শামিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহর মতে শরিয়াহর বিধান প্রয়োগে এ ধরনের বাধা প্রদান করা যাবে না। আল্লাহ তায়ালা একাধিক বিয়ে করার অনুমতি প্রদান করেছেন এবং কোনো ব্যক্তির পক্ষে তা বাতিল করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে হাম্বলীগণ যুক্তি দেখান যে, যেহেতু বিয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে এক স্ত্রীতে সন্তুষ্ট থাকা সেহেতু বহু বিবাহ বৈধ কিন্তু তা শর্ত নয় এবং স্ত্রীরা এর বিরুদ্ধে শর্ত আরোপ করতে পারবে না মর্মে কোনো নসে আভাস দেয়া হয়নি। তাই এ শর্ত আরোপ বৈধ এবং স্বামী তা মেনে চলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

www.pathagar.com

উপসংহার

ইস্তিশাব নিজস্ব অধিকার বলে কোনো স্বাধীন প্রমাণ বা বিচারিক আইন সংগ্রহ পদ্ধতি নয় বরং তা প্রধানত, বিদ্যমান দলিল বাস্তবায়নের একটি উপায় হিসেবে কাজ করে যার বৈধতা ও অব্যাহত প্রাসঙ্গিকতা ইস্তিশাবের বিধান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আলেমগণ কেন ইস্তিশাবকে ফতোয়ার শেষ কারণ হিসেবে গণ্য করেছেন এ থেকে তার একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে এবং ইস্তিশাব অন্যান্য দলিলের ওপর অগ্রাধিকার পাওয়ার অধিকার রাখে না। সাহাবিগণ রা. এর ওপর খুবই কম নির্ভরশীল ছিলেন কারণ শরিয়াহর বিকাশের ক্ষেত্রে তারা অবতীর্ণ ও যৌক্তিক উভয় দলিলের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল থাকায় ইস্তিশাব তেমন একটা কাজে আসেনি। হানাফী মাজহাবের ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য; তারা আইনগত বিধিবিধান নির্ণয়ে কদাচিত ইস্তিশাবের সাহায্য অবলম্বন করেছেন। অন্যান্য দলিলের অনুপস্থিতি অথবা বিদ্যমান দলিল প্রয়োগের প্রাসঙ্গিকতা প্রতিষ্ঠার একটি উপায় হিসেবে ইস্তিশাব প্রয়োগযোগ্য। লক্ষণীয় মজার ব্যাপার হলো, অন্যান্য যৌক্তিক প্রমাণ গ্রহণের ক্ষেত্রে যারা বিশেষ কঠোরতা অবলম্বন করেছিলেন তারাই ইস্তিশাবকে অধিকতর ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন। তাই আমরা দেখতে পাই যে কিয়াসের বিরোধীরা যেমন, জাহেরী ও শিয়া ইমামিয়ার আখবারী শাখা বিভিন্ন বিষয়ে সবচেয়ে বেশি ইস্তিশাবের ওপর নির্ভর করে আহকাম নির্ধারণ করেন, অন্য দিকে ফকিহদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সে ক্ষেত্রে কিয়াস প্রয়োগ করেন। অনুরূপভাবে শাফেয়ীগণ যারা ইস্তিহছান প্রত্যাখ্যান করেন তারাই আবার হানাফী ও মালেকীদের চেয়ে অনেক বেশি ও ঘন ঘন ইস্তিশাবের ওপর নির্ভর করেন। প্রায় সব ক্ষেত্রে যেখানে হানাফী ও মালেকীগণ ইস্তিহছান বা প্রচলিত প্রথা (উরফ) প্রয়োগ করেন সেখানে শাফেয়ীগণ ইস্তিশাব অবলম্বন করেন।[২৮]

ইস্তিশাবকে প্রায় একটি প্রধান নীতি হিসেবে বর্ণনা করা হয় কারণ তা প্রধানত কোনো ঘটনা বা বিষয়কে প্রতিষ্ঠিত বা বাতিল করার সাথে সংশ্লিষ্ট, আর এরূপ হওয়ার কারণেই সাক্ষ্য প্রমাণের নিয়মাবলির ক্ষেত্রে এর প্রাসঙ্গিকতা অনেক বেশি। দণ্ডবিধি ও ফৌজদারি আইনের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে ইস্তিশাবের প্রয়োগ কিছুটা নিয়ন্ত্রিত রয়েছে, এসব বিষয় প্রধানত শরিয়াহর সুনির্দিষ্ট বিধান অথবা সংবিধিবদ্ধ আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ফকিহগণ কেবলমাত্র অনুমানভিত্তিক প্রমাণের দ্বারা দণ্ড প্রয়োগে সার্বিকভাবে সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছেন। এ কথা বলার পর বলা যায় যে, দায়দায়িত্বের আদি অনুপস্থিতির মূলনীতি নিঃসন্দেহে ইস্তিশাবের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যা কেবল ফৌজদারি আইনের ক্ষেত্রেই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় না, সাংবিধানিক আইন ও দেওয়ানি মামলাও সাধারণভাবে প্রয়োগ করা হয়।

www.pathagar.com

বৈধতার নীতি একটি অতি জরুরি উপাদান এবং তা আইনের শাসনের মূলনীতি বলেও পরিচিত। ইস্তিশাবের এসব বৈশিষ্ট্য আবার বৈধতার আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যাতে আইন যেখানে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেনি সেখানে অনুমোদনযোগ্যতা হচ্ছে সাধারণ নিয়ম।

ইস্তিশাব সম্পর্কে একজন সংস্কারপন্থীর অভিমত তুলে ধরার মাধ্যমে এ অধ্যায়ের আলোচনা সমাপ্ত করতে চাই। হাসান তুরাবী তার পুস্তিকা তাজদীদ উসুল আল ফিকহ আল ইসলামিতে ইস্তিশাবের তাৎপর্য তুলে ধরে এ মূলনীতির ব্যাপারে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। লেখক এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে বলেন যে, নিজের আওতায় স্বাভাবিক ন্যায়বিচার, অনুমোদিত প্রথা ও সামাজিক লোকাচারকে অন্তর্ভুক্ত করার শক্তি ইস্তিশাবে নিহিত রয়েছে।

হাসান তুরাবীর মতে, ইসলামের লক্ষ্য না ছিল জীবনের সবদিক ও খুঁটিনাটিসহ পৃথিবীতে নতুন জীবন প্রতিষ্ঠা করা অথবা আরব সমাজের সব প্রথা ও লোকাচার বাতিল ও বদল করা। এ বিশ্বাস থেকেই ইস্তিশাবের মৌলিক বৈধতা পাওয়া গেছে। রসুল সা. তার সামনের সব কিছুরই বিরোধিতা করার দৃষ্টান্ত দেখাননি বরং বিদ্যমান সামাজিক মূল্যবোধের বড় অংশকে গ্রহণ ও অনুমোদন করেন এবং যেগুলো নিপীড়নমূলক ও অগ্রহণযোগ্য সেগুলোকে পরিবর্তন ও বদল করার চেষ্টা করেছিলেন। এ ছাড়া আমরা কুরআনে 'আমর বিল উরফ' এর উল্লেখ দেখতে পাই, যার অর্থ হচ্ছে, 'প্রচলিত প্রথা অনুসারে কাজ কর' যদি ইসলামি শরিয়তে তা সুনির্দিষ্টভাবে বাতিল ঘোষণা বা সংশোধন করা না হয়।

অনুরূপভাবে কুরআন যখন বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে আমাদের ন্যায়বিচার, কল্যাণ (ইহসান) ও নিরপেক্ষতা অবলম্বন করার নির্দেশ দেয় তখন তাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ন্যায়বিচারের মূলনীতির কথা উল্লেখ করা হয় যাতে সাধারণভাবে মানবজাতি ও সুরুচিসম্পন্ন লোকদের সুবিবেচনাকে সমুন্নত করা হয়ে থাকে। এভাবে পৃথিবীর জীবনে আলোকিত মানব প্রকৃতির সহায়তা ও অনুপ্রেরণায় সাধারণভাবে নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা গঠিত হয়েছে যাতে যা অন্যায়, অনৈতিক ও অবাঞ্ছিত বলে মনে হয়েছে তা সংশোধনের চেষ্টা করা হয়েছে। শরিয়তে অনেক কিছুর বিধান সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি, সে কারণে এসব ক্ষেত্রে খোদায়ী বিধানের সাধারণ শিক্ষা ও সুবুদ্ধি-বিবেচনার আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এ হলো হাসান তুরাবীর ইস্তিশাবের বিচারিক মূলনীতি সংক্রান্ত আলোচনার সারসংক্ষেপ। ইস্তিশাবের বস্তুগত অংশে অনুমোদনযোগ্যতাকে শরিয়াহর মৌলিক নিয়ম বলে ঘোষণা করা হয়েছে আর তা হলো, মানুষকে দায়দায়িত্ব মুক্ত বলে মনে করা হবে যতক্ষণ না আইনে তার বিপরীত কিছু নির্ধারণ করা হয় এবং মানুষ নিজেদের

www.pathagar.com

কল্যাণে পৃথিবীর সব কিছু ব্যবহার করতে পারবে যতক্ষণ না আইন তা করাকে নিষিদ্ধ করা হবে। তাই দেখা যাচ্ছে যে, এ মূলনীতির প্রাচীন সূত্রবদ্ধকরণে যে ধরনের গুরুত্ব ও স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে শরিয়াহর একটি দলিল হিসেবে ইস্তিশাব তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব ও স্বীকৃতি পাওয়ার দাবি রাখে।[২৯]

টিকা

১. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২৩৭; আমিদী, ইহকাম, ৪, ১২৭; ইবনে আল কাইয়িম, ইলাম, ১, ২৯৪।

২. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২১৭; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ২৩৪; মাহমাসানী, ফালসাফাহ (জিয়াদেহ অনূদিত), পৃষ্ঠা ৯৩।

৩. ইবনে আল কাইয়িম, ইলাম, ১, ২৯৪; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ২১৮; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ২৩৪।

৪. বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ২১৮।

৫. একই গ্রন্থ।

৬. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২৩৭; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ২৩৫।

৭. আমিদী, ইহকাম, ৪, ১২৮: বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ২২১।

৮. তুলনীয়, আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ২৩৫।

৯. আমিদী, ইহকাম, ৪, ১২৭।

১০. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২৩৮; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ২১৯; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ২৩৬।

১১. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৯২।

১২. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ২৩৬; খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৯২: বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ২১৯; খুদারী, উসুল, পৃষ্ঠা ৩৫৪-৫৫

১৩. ইবনে আল কাইয়িম, ইলাম, ১, ২৯৫; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ২১৯।

১৪. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২৩৮; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ২৩৭; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ২২৩; Coulson, Succession, পৃষ্ঠা ১৯৮।

১৫. যুহাইর, উসুল, পৃষ্ঠা ৪, ১৮০।

১৬. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২৩৭।

১৭. ইবনে আল কাইয়িম, ইলাম, ১, ২৯৪।

১৮. বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ২২১।

১৯. ইবনে আল কাইয়িম, ইলাম, ১, ২৯৬; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ২৩৮।

www.pathagar.com

২০. একই গ্রন্থ।

২১. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ২৩৯।

২২. খুদারী, উসুল, পৃষ্ঠা ৩৫৬; মাহমাসানী, ফালসাফাহ, পৃষ্ঠা ৯০।

২৩. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২৩৮।

২৪. ইবনে মাজাহ, সুনান, ২, ৯১৩, হাদিস নং ২৭৩৫; আল দারিমী, সুনান, (কিতাব আল ফারাইজ), ২, ৩৮৪।

২৫. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২৩৮; মাহমাসানী, ফালসাফাহ, পৃষ্ঠা ৯০; আল সুয়ূ্যতীর আল আসবাব ওয়াল নাজাইর ও মাজাল্লাহ আল আহকাম আল আদলাইয়াহ (অনুচ্ছেদ, ৮) এ দায়দায়িত্ব থেকে আদি মুক্ত অবস্থার মূলনীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

২৬. যুহাইর, উসুল, পৃষ্ঠা ৪, ১৮০-৮১।

২৭. ইবনে আল কাইয়িম, ইলাম, ১, ৩০০।

২৮. তুলনীয়, আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ২৪১।

২৯. তুরাবী, তাজদীদ, পৃষ্ঠা ২৭-২৮।

www.pathagar.com

ষোড়শ অধ্যায়

সাদ্দ আল জারাই (অন্যায়ের পথরোধ)

জরাইয়াহ (বহুবচন, জারাই) শব্দটি ওয়াসিলাহর সমার্থক, যা একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের উপায় বুঝায়। সাদ্দ শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো, 'বন্ধ করা' তাই সাদ্দ আল জারাইর অর্থ হচ্ছে, প্রত্যাশিত পরিণতি লাভের পথ বন্ধ করে দেয়া, যদি বাধা প্রদান করা না হয় তাহলে তা অর্জিত হতে পারে বলে মনে করা হয়। পথ বন্ধ করা বলতে অবশ্যই এ কথা বুঝতে হবে যে, খারাপ পথ রোধ করা, ভালো পথ নয়। অবশ্য সাদ্দ আল জারাই আক্ষরিক অর্থে এর বিপরীত অর্থও প্রকাশ পেতে পারে। বিচারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে সাদ্দ আল জারাইর ধারণা বলতে কল্যাণের পথ উন্মোচিত করাও বুঝায়। কিন্তু আইনশাস্ত্রের একটি মূলনীতি হিসেবে পূর্বের অর্থটিই এখানে প্রকাশ পেয়ে থাকে- তা হলো অন্যায়ের পথ রোধ করা, এ অর্থই সাদ্দ আল জারাইকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছে। এ নীতির প্রাচীন আলোচনায় পরের অর্থটিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়নি সম্ভবত এ কারণে যে, কল্যাণের পথ উন্মোচন হচ্ছে, সার্বিকভাবে শরিয়াহর আসল উদ্দেশ্য ও কাজ, তাই সাদ্দ আল জারাইর ক্ষেত্রে এ অর্থ গ্রহণ বৈসাদৃশ্যপূর্ণ হবে না।

যখন উপায় ও উদ্দেশ্য উভয় কল্যাণ ও মাসলাহার পথে নিবেদিত হয় এবং তা যদি সুস্পষ্ট আদেশ (নস) দ্বারা নির্দেশিত না হয় তা হলে বিষয়টি কিয়াস, মাসলাহা, ইস্তিহ্ছান ইত্যাদির আওতায় পড়বে বলে মনে করা হয়। অনুরূপভাবে যখন কোনো পন্থা ও উদ্দেশ্য অন্যায়ের পথে পরিচালিত হয় তখন তা *শরিয়াহর* সাধারণ বিধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে সাদ্দ আল জারাই অবলম্বন যথার্থ হবে না বলে মনে করা হয়। এ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এটি প্রতীয়মান হয় যে, ভালো-নিরপেক্ষ-মন্দের মানের আলোকে উপায় ও উদ্দেশ্যের মধ্যে ব্যবধান দেখা দিলে সে ক্ষেত্রে আইন বিজ্ঞানের একটি মূলনীতি হিসেবে *সাদ্দ আল জারাই* প্রয়োগ করা হয়। যখন কোনো বৈধ পন্থা অবৈধ পরিণতির পথ প্রশস্ত করে অথবা যখন কোনো বৈধ পন্থা সাধারণ বৈধ পরিণতির পথ প্রশস্ত করে কিন্তু তা অবৈধ উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যবহৃত হয় বলে মনে করা হয়, তা হলে সেটিই হবে সাদ্দ আল জারাই প্রয়োগের উপযুক্ত ক্ষেত্র।

উপায় ও উদ্দেশ্য উভয়ই ভালো বা মন্দ, বাহ্যিক বা নৈতিক হতে পারে এবং তা দৃশ্যমান বা অদৃশ্য হতে পারে। দু'টি বিষয় যুগপৎভাবে উপস্থিত থাকা জরুরি নয়। এর উদাহরণ হলো, খালওয়া বা নারী ও পুরুষের নিরিবিলি পরিবেশে একান্তে সাক্ষাৎ করা অবৈধ কারণ তা জিনার পথ খোলাসা করে। তাতে প্রকৃতপক্ষে জিনা

www.pathagar.com

সংঘটিত হোক বা না হোক। যৌন আবেদন সৃষ্টি করে এমন সব কিছুই যা সুনির্দিষ্ট জিনার পথ প্রশস্ত করে অথবা তার সহায়ক থাকে তা এক কথায় অনুরূপভাবে নিষিদ্ধ বা হারাম। জুমার নামাজের সময় বেচাকেনা ও লেনদেনের মতো নির্দিষ্ট আচার-আচরণ বন্ধ করার মাধ্যমেও সাদ্দ আল জারাই গঠিত হতে পারে। এ ধরনের আচরণ উল্লেখিত নামাজের পথে বাধার সৃষ্টি করে। অন্য কথায় তা অবশ্যই বন্ধ করতে হবে, অর্থাৎ ওই নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ব্যবসায়-বাণিজ্য বন্ধ রাখতে হবে।

সাদ্দ আল জারাইর সমগ্র ধারণাটি অন্যায় বা পাপ কাজ বাস্তবে সংঘটিত হওয়ার আগেই রোধ করার ধারণার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। তাই দেখা যাচ্ছে যে, সবসময়ই বাস্তবে ফলাফল পাওয়া জরুরি নয়। বরং এ ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ট প্রত্যাশা হচ্ছে, কোনো পন্থা অন্যায় বা পাপ কাজের পথ প্রশস্ত করতে পারে বলে মনে করা হলে ওই পন্থা হবে বেআইনি, এমনকি তাতে ধারণা মতো মন্দ ফলাফল পাওয়া না গেলেও। উপরে প্রদত্ত দুইটি উদাহরণে এ বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে *জিনার* পথ প্রশস্ত করুক বা না করুক খালওয়া হারাম এবং *জুমার* নামাজের সময় ব্যবসায় বাণিজ্য নামাজকে ব্যাহত করুক বা না করুক সে সময়ে বেচাকেনা করা না জায়েজ। উপরন্তু সাদ্দ আল জারাই যেহেতু মৌলিকভাবে কোনো অন্যায্য কাজ সংঘটিত হওয়ার আগেই তা রোধ করার চিন্তা করে সেহেতু সুনির্দিষ্ট ফল লাভের বিষয়টি যে উপায় ওই ফল লাভের পথ প্রশস্ত করে তার মূল্যায়নের নির্ভরযোগ্য ভিত্তি হতে পারে না। আবু জাহরাহ যথার্থই এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, উদ্দেশ্য কি তা দেখেই পন্থার প্রকৃতি ও মূল্য নির্ধারণ করা হয়, ওই উদ্দেশ্য ইচ্ছাকৃত না অনিচ্ছাকৃতভাবে সাব্যস্ত করা হয়েছে তা এখানে বিবেচ্য বিষয় নয়। যখন কোনো নির্দিষ্ট কাজ একটি নির্দিষ্ট ফল লাভের পথ প্রশস্ত করে, তা ভালো বা মন্দ যাই হোক না কেন, তখন ওই কাজকে উদ্দেশ্য অর্জনের উপায় বলে গণ্য করা হয়। যে কাজ সম্পাদন করে তার উদ্দেশ্যের প্রশ্নটি উপায়ের বস্তুনিষ্ঠ মান নির্ণয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। বরং প্রত্যাশিত ফলই উপায়ের মান নির্ধারণ করে। যদি ফল ভালো ও প্রশংসনীয় হবে বলে প্রত্যাশা করা হয় তা হলে তা অর্জনের উপায়ও অনুরূপ হবে এবং তা যদি নিন্দনীয় হয় তাহলে তার উপায়ও অনুরূপ হবে বলে মনে করা হবে, তা সম্পাদনকারীর উদ্দেশ্য কী ছিল অথবা প্রকৃতপক্ষে কী ফল অর্জিত হলো তা এখানে ধর্তব্যের মধ্যে পড়বে না। এর উদাহরণ হলো, মূর্তি পূজা মহাপাপ অথবা এর পশ্চাতের উদ্দেশ্য যাই থাকুক, কুরআনে মূর্তিপূজকদের গাল দিতে মুসলমানদের নিষেধ করা হয়েছে। কুরআনের এ সম্পর্কিত আয়াতে বলা হয়েছে : 'এবং এ লোকেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরই ইবাদত করে তোমরা তাদের গালাগালি দিও না, এমন যেন না হয় এরা শিরকের ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে গিয়ে মূর্খতাবশত খোদাকে গালাগালি দিতে শুরু করে' (সূরা আন'আম ৬ : ১০৮)।

www.pathagar.com

এভাবে মূর্তিপূজকদের গালাগাল দিতে নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে একটি পাপের উপায়কে বাধা প্রদান করা হয়েছে, তা না হলে ঈমানদারদের পক্ষ থেকে এ ধরনের আচরণকে হয়তো মিথ্যার নিন্দা জ্ঞাপন ও ঈমানের দৃঢ়তার পরিচায়ক হিসেবে অনুমোদনযোগ্য, এমনকি প্রশংসনীয় বলে বিবেচনা করা হতো। এভাবে কোনো উপায় মূলত প্রশংসনীয় কিন্তু তা মন্দ পরিণতির দিকে ধাবিত করে এবং তারই মান অর্জন করে। উপরন্তু এ উদাহরণে পরিণামে মূর্তিপূজার সাথে সংশ্লিষ্টরা আল্লাহকে গালাগাল করতে পারে এ সম্ভাবনার কারণে তাদেরকে গালাগাল করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অন্যকথায় বলা যায় যে, প্রত্যাশিত ফলাফলকে এখানে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা হয়েছে। এ ফল বাস্তবে রূপ লাভ করে কি না সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর; মূর্তি ও তাদের পূজকদের গালাগাল দেয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তাতে প্রকৃত ফল পাওয়া যাক বা না যাক, সেটা দেখার বিষয় নয়। অনুরূপভাবে নির্দিষ্ট ফল লাভ হবে কি না সে প্রশ্নও আলোচ্য নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। এ কারণে একজন মুসলমান প্রত্যাশিত ফল অর্থাৎ আল্লাহকে গালাগাল দেয়া হতে পারে বলে যদি মনে নাও করে, তা হলেও সে ক্ষেত্রে মূর্তিপূজককে গালাগাল দেয়া নিষিদ্ধ, তার উদ্দেশ্য ভালো বা মন্দ যাই হোক, মূর্তি ও তার পূজকদের গালাগাল দেয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে বস্তুনিষ্ঠতার ভিত্তিতে, তাতে প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।[১] মহান আল্লাহ তায়ালার মৌলিক উদ্দেশ্যের কথা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে সাদ্দ আল জারাই মতবাদে। তাই দেখা যাচ্ছে যে, সাধারণ নিয়ম হচ্ছে উপায় বা পন্থা পরিণতির গুণ অর্জন করে। আল শাতিবী এ ব্যাপারে যথার্থই মন্তব্য করেছেন, আল্লাহ তায়ালা কোনো কাজ বা আচার-আচরণের কল্যাণ ও অকল্যাণ বিবেচনা করে তার কতকগুলোকে হালাল এবং অন্যগুলোকে হারাম করেছেন। যখন কোনো নির্দিষ্ট কাজ বা আচরণে এমন ফল পাওয়া যায়, যা আল্লাহর উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হয় তা হলে সে ক্ষেত্রে ওই কাজ বা আচরণ নয় আল্লাহর উদ্দেশ্যকেই অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।[২] অন্য কথায়, উপায় যদি শরিয়াহর মূল উদ্দেশ্য লঙ্ঘন করে তা হলে তা অবশ্যই রোধ করতে হবে। শরিয়াহর আইনের অধিকাংশ তার উদ্দেশ্যের (মাকাসিদ) ব্যাপারে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং পন্থা এ উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক হয় বা বাধা সৃষ্টি করে। সাধারণত পন্থাকে প্রত্যাশিত পরিণতির আলোকে দেখা হয়ে থাকে এবং এটি যৌক্তিক যে পরিণতি পন্থার চেয়ে অগ্রাধিকার পাবে অর্থাৎ পন্থা তার পরিণতিকে অনুসরণ করবে কিন্তু পরিণতি পন্থাকে নয়। সাধারণত পরিণতি ওয়াজিব হলে পন্থাও ওয়াজিব হবে, আর হারাম হলে তা হারাম হবে। কোন কোনো সময় পন্থা একই সাথে ভালো ও মন্দ উভয় পরিণতির পথ প্রশস্ত করতে পারে, সে ক্ষেত্রে মন্দ (মাফসাদা) যদি কল্যাণের (মাসলাহা) সমপরিমান বা তার চেয়ে বেশি হয় তা হলে পূর্বেরটি পরেরটির চেয়ে অগ্রাধিকার পাবে। অন্যায় রোধের

www.pathagar.com

বিষয়টি কল্যাণ লাভের চেয়ে অগ্রাধিকার পাবে, এ মূলনীতির আলোকে এটি নির্ধারিত হয়েছে।[৩] এভাবে সাদ্দ আল জারাই হচ্ছে আইন বিজ্ঞানের একটি মূলনীতি এবং কতিপয় বিষয় ও আচরণের ব্যাপারে আইন সংক্রান্ত বিধিবিধান (*হুকম শারয়ী*) সংগ্রহের পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছে। বিদ্যমান আইনে হয়তো এসব বিষয় নিয়ন্ত্রিত হয়নি কিন্তু এ মূলনীতি প্রয়োগের মাধ্যমে তা সংগ্রহ করা যেতে পারে।

মূর্তিকে গালাগাল দেয়া নিষিদ্ধ সংক্রান্ত কুরআনের আয়াত (আল আন'আম, ৬ : ১৮৮) উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া আলেমগণ *সাদ্দ আল জারাইর* কর্তৃত্বের সমর্থনে সুরা আল বাকারার একটি আয়াতেরও (২ : ১০৪) উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন। ওই আয়াতে বলা হয়েছে : 'হে ইমানদারগণ, তোমরা রসুলকে 'রাইনা' বলে সম্বোধন করো না বরং তাকে শ্রদ্ধার সাথে সম্বোধন করো এবং তার কথা মনোযোগ দিয়ে শোন।' এখানে নিষেধাজ্ঞার কারণ হলো 'রাইনা' শব্দটি দ্ব্যর্থবোধক-এ শব্দের দুইটি অর্থ রয়েছে-এর একটি হলো, 'অনুগ্রহ করে আমাদের প্রতি মনোযোগী হোন।' এ শব্দের একটু বিকৃত দ্বিতীয় অর্থ হলো, 'আমাদের রাখাল'। ইহুদিরা রসুল সা.-কে গাল দিতে এ শব্দটি ব্যবহার করত এবং এ ধরনের অবমাননাকর পন্থা বন্ধ করতে মুসলমানদের সদুদ্দেশ্য সত্ত্বেও রসুল সা.-কে এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করে সম্বোধন করতে নিষেধ করা হয়েছে, যদিও আলোচ্য শব্দটি স্বাভাবিকভাবে অবমাননাকর নয়।[৪]

সুন্নাহতে সাদ্দ আল জারাইর মূলনীতির কর্তৃত্ব দেখতে পাওয়া যায়; বিশেষ করে রসুল সা. ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে ঋণদাতার উপঢৌকন গ্রহণ নিষিদ্ধ করেছেন নচেৎ তা ঘুষের একটি উপায়ে এবং এ উপহার সুদের বিকল্পে পরিণত হতো। এ ছাড়া রসুল সা. মুনাফিকদের ও ওই সব লোকদের হত্যা করতে নিষেধ করেছিলেন যারা যুদ্ধের সময় মুসলমান সম্প্রদায়ের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল বলে জানা গিয়েছিল। এখানে আশঙ্কা করা হয়েছিল যে এ ধরনের হত্যার ঘটনা খারাপের একটি উপায়ে পরিণত হবে, যেমন- এমন গুজব ছড়িয়ে দেয়া হবে যে, 'মুহাম্মদ নিজ সাহাবিদের হত্যা করছেন'।[৫] এর ফলে শত্রুরা মুসলমানদের ঐক্যকে অগ্রাহ্য করার একটা মওকা পেয়ে যেত। এসব কারণে রসুল সা. মুনাফিকদের হত্যা করার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। একইভাবে রসুল সা. যুদ্ধের সময় চুরির *হাদ* শাস্তি কার্যকর স্থগিত করেন যাতে লোকদের সপক্ষ ত্যাগ করে শত্রু বাহিনীতে যোগদান এড়ানো যায়। একই কারণে অর্থাৎ পাপের বা দুর্যোগের পথ রোধ করার জন্য সেনা কমান্ডারদের যুদ্ধ চলাকালে *হাদ* শাস্তি কার্যকর না করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল।[৬]

www.pathagar.com

মৃত্যুর রোগ-শয্যায় থাকাকালে কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে উত্তরাধিকার হওয়া থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে তালাক দিলে নেতৃস্থানীয় সাহাবিগণ রা. তাকে উত্তরাধিকারের অংশ প্রদান করেন বলে জানা গেছে। সাহাবিগণ রা. একে নিষিদ্ধ করেছিলেন যাতে এ ধরনের তালাক নির্যাতনের একটি উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হতে না পারে। আরো জানা গেছে যে, খলিফা ওমর রাদি আল্লাহু আনহুর কর্মকর্তা হুজায়ফা রাদি আল্লাহু আনহু আল মাদাইনের এক ইহুদি রমনীকে বিয়ে করেন। এরপর খলিফা তাকে চিঠি লিখে বলেন যে, তার উচিত ইহুদি স্ত্রীকে তালাক দেয়া। হুজায়ফা রা. খলিফার কাছে জানতে চান যে, ইহুদি রমণীকে বিয়ে করা কি অবৈধ হয়েছে? খলিফা জবাবে বললেন, না, তবে অন্যরা আহল আল জিম্মার রূপে প্রলুব্ধ হয়ে তার উদাহরণ অনুসরণ করতে পারে। এভাবে খলিফা তৎকালে অন্যায় পরিণতির কথা ভেবে এ কাজের পন্থা বন্ধ করতে চেয়েছিলেন, যদিও কুরআন তাকে বৈধ বলে ঘোষণা করেছিল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, ইবনে আল কাইয়িম অন্যায়ের পথ রোধের লক্ষ্যে বিচক্ষণ সাহাবিগণ ও তৎপরবর্তী আলেমগণের সাদ্দ আল জারাই অবলম্বনের অন্তত ৭৭টি দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন।[৭]

অবশ্য সাদ্দ আল জারাইর বৈধতার প্রশ্নে আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। হানাফী ও শাফেয়ী ফকিহগণ একে নিজস্ব অধিকার বলে আইন বিজ্ঞানের একটি মূলনীতি হিসেবে স্বীকৃতি দেননি। এর কারণ হলো, উপায় সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিধিবিধান কিয়াস এবং হানাফী মতবাদ ইস্তিহ্ছান ও উরফ অবলম্বনে সংগ্রহ করা যেতে পারে। কিন্তু মালেকী ও হাম্বলী ফকিহগণ সাদ্দ আল জারাইকে নিজস্ব অধিকার বলে শরিয়াহর একটি দলিল হিসেবে বৈধ বলে গণ্য করেছেন। এ মতবাদ সম্পর্কে আলেমগণের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি সত্ত্বেও মালেকী ফকিহ আল শাতিবী এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সব মাজহাবের আলেমগণ সাদ্দ আল জারাইর দৃষ্টিভঙ্গির বৈধতার ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন। তবে এর বিস্তারিত ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে ভিন্নমত রয়েছে। তাদের মতপার্থক্য প্রধানত, যুক্তি সংক্রান্ত যাতে পন্থা গঠন করার ক্ষেত্রে যেখানে অন্য কিছু বুঝানো হতে পারে। এ ছাড়া সাদ্দ আল জারাইর ধারণা বৈধভাবে প্রয়োগ হতে পারে এমন সম্প্রসারণের ক্ষেত্রেও মতপার্থক্য রয়েছে।[৮] আবু জাহরাহ অনুরূপ উপসংহারে উপনীত হয়েছেন। তিনি বলেন, শাফেয়ী ও হানাফী ফকিহগণ তাদের মালেকী ও হাম্বলী প্রতিপক্ষের সাথে অধিকাংশ বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন এবং মাত্র কয়েকটি বিষয়ে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।[৯] সাদ্দ আল জারাইর নিম্নোক্ত শ্রেণি বিভাগে এ মতবাদ প্রয়োগে মতৈক্যের বিষয় প্রকাশ পেয়েছে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এটা প্রয়োগের ব্যাপারে আলেমদের মধ্যকার মতপার্থক্যের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। এখন

www.pathagar.com

এ বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়া দরকার যে কল্যাণের (মাসলাহা) পথ উন্মোচিত করার লক্ষ্যে সাদ্দ আল জারাই প্রয়োগ করা হলেও এ নীতি সম্পর্কে আলোচনায় অন্যায় (মাফসাদা) রোধ করার বিষয়টি অধিকতর গুরুত্ব পেয়ে থাকে ।

সম্ভাবনার মাত্রা অথবা অন্যকিছু পন্থা কি ধরনের খারাপ পরিণতির দিকে ধাবিত করতে পারে এ ধারণার ভিত্তিতে উসুলের আলেমগণ সাদ্দ আল জারাইকে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন :

১. যে পন্থা নির্দিষ্টভাবে পাপের দিকে ধাবিত করে, যেমন- জনসমাগমস্থলে প্রবেশের দরজায় গভীর করে গর্ত খনন করা রাতে যেখানে কোনো আলো থাকে না, তাই কেউ ওই দরজা দিয়ে প্রবেশ করলে তার গর্তে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদের আহত হওয়ার প্রত্যাশিত ফলাফল প্রায় নিশ্চিত হওয়ার ভিত্তিতে ওই ফলাফল যে পন্থা প্রশস্ত করে তাও সমভাবে নিষিদ্ধ বা হারাম। সব মাজহাবের আলেমগণ নীতিগতভাবে এ ধরনের জারাইর নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে সর্বসম্মত ঐকমত্য পোষণ করেছেন এবং এ ব্যাপারে একটি মতৈক্য (ইজমা) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে জানা গেছে।[১০] এ আলোচনার পর এ কথা বলা যায় যে, ফকিহগণ দুইটি সম্ভাব্য পরিণতির বিষয় বিবেচনা করেছেন। প্রথমত, জারাই প্রথমে পাপ কাজের সমন্বয়ে গঠিত হতে পারে, যেমনটি উপরের উদাহরণে দেখা গেছে। এ ক্ষেত্রে যে ক্ষতি বা অনিষ্ট হতে পারে তার জন্য অপরাধী ব্যক্তিকে দায়ী করা হবে কারণ ওই স্থানে গর্ত খোড়ার কোনো অধিকার বা কর্তৃত্ব তার নেই। দ্বিতীয়ত, জারায়ী এমন কাজের সমন্বয়ে গঠিত হতে পারে যা আসলে বৈধ। এ ক্ষেত্রে আলেমগণ দায়দায়িত্বের প্রশ্নে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। এর উদাহরণ হলো, কোনো ব্যক্তি তার নিজ বাড়িতে পানির কূপ খনন করল কিন্তু তা তার প্রতিবেশীর কূপের এতটা কাছে যে এর ফলে প্রতিবেশীর কূপের দেয়াল ভেঙে পড়ল। এ কাজটি মৌলিকভাবে বৈধ কারণ এখানে মালিকানা স্বত্বের অধিকার চর্চার দ্বারা গঠিত হয়েছে, যা ক্ষতির দায়দায়িত্বের ধারণার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলে মনে করা হয়। অবশ্য অন্যদের মতে, অপরাধী ব্যক্তি ওই ক্ষতির জন্য দায়ী থাকবে। এ সিদ্ধান্তের পক্ষে ইতঃপূর্বে উল্লেখিত মূলনীতির সমর্থন রয়েছে যাতে বলা হয়েছে যে, কল্যাণ লাভের চেয়ে অপরাধ রোধ অগ্রাধিকার পাবে।[১১]

১. দ্বিতীয় প্রকার পন্থা যা খুব সম্ভব (যেমন- যন্নী আল গালিব এর ভিত্তিতে) পাপের পথ প্রশস্ত করতে পারে এবং কদাচিৎ কল্যাণের পথে ধাবিত করে। এর উদাহরণ হলো, যুদ্ধের সময় অস্ত্র বিক্রি করা অথবা মদ প্রস্তুতকারকের কাছে আঙ্গুর বিক্রি করা– যদিও আল শাতিবীর বলেছেন, আলেমদের সর্বসম্মত মত (ইজমা) অনুযায়ী এ লেনদেন অবৈধ। কিন্তু আবু জাহরাহ ও বাদরান উভয়ে বলেছেন যে,

কেবলমাত্র মালেকী ও হাম্বলী আলেমগণ এ ধরনের লেনদেনকে নিষিদ্ধ (হারাম) বলে গণ্য করেছেন কারণ তাতে খারাপ পথ প্রশস্ত করার সম্ভাবনা বেশি যদিও এ ব্যাপারে নিশ্চিত জ্ঞানের উপস্থিতির অভাব রয়েছে, যা সব সময় এ ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তাদের মতে, সম্ভাবনার বিষয় বা যন্নী সাধারণত শরিয়াহর আহকামের বৈধ ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এরই ফলশ্রুতি হিসেবে যখন দেখা যাবে যে, পন্থার খারাপের দিকে ধাবিত করার সম্ভাবনা খুবই বেশি তখন ওই পন্থাকে কেবলমাত্র এ সম্ভাবনার ভিত্তিতেই হারাম ঘোষণা করা যেতে পারে।[১২]

২. চার প্রকার পন্থার তৃতীয়টি হচ্ছে এমন যা প্রায়ই খারাপের দিকে ধাবিত করে কিন্তু তার কোনো নিশ্চয়তা নেই, এমনকি সম্ভাবনাও খুব বেশি নয়। এ ক্ষেত্রে সব সময়ই এমনটি হয়। এর উদাহরণ হলো, এক ধরনের বিক্রয় যা সুদ (রিবা) আদায়ের উপায় হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের বেচাবিক্রিকে 'বুইয়ু আল আযাল' (বিলম্বিত বিক্রয়) নামে পরিচিত যাতে বিক্রীত পণ্য বা তার দাম পরিশোধ পরবর্তী একটি তারিখ পর্যন্ত বিলম্বিত করা হয়, এর উভয়েরই এ শ্রেণির পন্থা বা উপায়ের আওতায় পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, ধরুন, ক এর কাছ থেকে খ দশ রিয়াল মূল্যের একটি পোশাক কিনল। এর দাম ছয় মাসের মধ্যে শোধ করতে হবে। এরপর ক নগদ আট রিয়াল মূল্যে খ এর কাছ থেকে ওই একই পোশাক কিনে নিলো। এ লেনদেন কার্যত খকে ঋণদান বুঝালো এবং এ জন্য তাকে ছয় মাস পরে দুই রিয়াল লাভ দিতে হবে। এ ধরনের বিক্রি সুদের পর্যায়ে পড়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে যদিও তাতে একটা অনিশ্চয়তার উপাদান রয়ে গেছে; আর তা হলো, সুদ নাও হতে পারে। এ ধরনের লেনদেনের বৈধতা বা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম মালেক ও আহমদ ইবনে হাম্বলের মতে, এ ধরনের পন্থা, যার সুদের পথে পরিচালিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা অবৈধ (হারাম) এবং তাতে অবশ্যই বাধা প্রদান করতে হবে। তারা এ কথাও স্বীকার করেছেন যে, বিলম্বিত বিক্রয় প্রকৃতপক্ষে সুদের পর্যায়ে না পড়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। তারা বিক্রয় সংক্রান্ত মৌলিক নিয়মের কথাও স্বীকার করেন যাতে এর বৈধতা রয়েছে, তথাপি তারা সতর্কতামূলক (ইবতিয়াত) ব্যবস্থা হিসেবে এ ধরনের বিক্রিকে অবৈধ হিসেবে রায় দিয়েছেন কারণ তাতে সুদের পথে ধাবিত হওয়ার একটা সম্ভাবনা রয়েছে। সুদ হওয়ার বিষয়টি নিছক সম্ভাবনা, বাস্তবে রূপায়িত নাও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে তা ধর্তব্যের মধ্যে পড়বে না এবং সাধারণভাবে বিক্রয় বৈধ হবে। এ মৌলিক বৈধতা তাতে খারাপ পরিণতি অর্জনের সম্ভাবনার ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করবে না। উপরন্তু এ পরিণতি অর্জন রোধের বিষয়কে আলোচ্য বিক্রয় থেকে সম্ভাব্য কল্যাণ লাভের ওপর অবশ্যই অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

www.pathagar.com

অন্যদিকে ইমাম আবু হানিফা ও শাফেয়ী এ অভিমত প্রকাশ করেন যে, সুনির্দিষ্টভাবে পাপের পথে ধাবিত না করা পর্যন্ত বিক্রয়ের মৌলিক বৈধতা বহাল থাকবে। বিলম্বিত বা অন্য সব ধরনের বিক্রয় মৌলিকভাবে বৈধ এবং বিক্রয় সুদের পথে ধাবিত করবে বলে ইতিবাচক জ্ঞান (ইলম) অথবা শক্তিশালী যন্নীর অনুপস্থিতিতে নিছক পুনঃপুনঃ সংঘটনকে বিক্রয়ের মৌলিক বৈধতা উপেক্ষা করার অনুমোদন দেয়া যাবে না। এ ক্ষেত্রে মালেকী ও হাম্বলী মাজহাবের মতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে কারণ সুন্নাহতে প্রমাণ রয়েছে যে পাপের পথ প্রশস্ত করতে পারে, এমনকি সে ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট দলিল ছাড়াই, সম্ভাবনার পরিস্থিতিতে (অথবা উরফ) আদি অনুমোদনযোগ্যতা বাতিল হয়ে যেতে পারে।[১৩]

অনুরূপভাবে জীবনব্যাপী প্রতিশ্রুতি ছাড়াই নিছক যৌন লিপ্সা পূরণের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত বিয়ের বৈধতার ব্যাপারে আলেমগণ দ্বিমত পোষণ করেছেন। ইমাম মালিক এ ধরনের বিয়েকে অবৈধ (বাতিল) বলে বিবেচনা করেছেন। তার মত অনুযায়ী, কাজের মূল্যায়ন করা হয় তার পেছনের উদ্দেশ্য বা নিয়তের আলোকে এবং যেহেতু বিয়ের নিয়ম হচ্ছে স্থায়ী সেহেতু এ উদ্দেশ্যের অনুপস্থিতি নিকাহকে দুর্বল করে দেবে। এ মতের প্রধান দিক হলো, সম্ভাব্য অপব্যবস্থা রোধ করা, যা আলোচ্য বিয়ের ক্ষেত্রে ঘটতে পারে। অন্যদিকে ইমাম শাফেয়ীর মতে, বিয়ের চুক্তিতে তাকে দুর্বল করার কোনো কিছু অন্তর্ভুক্ত না থাকলে বিয়ে বৈধ হবে। এ মত অনুসারে, লোকদের অন্তরের উদ্দেশ্য নয় বরং কেবলমাত্র সহজবোধ্য ঘটনা যা প্রমাণের সাহায্যে উপলব্ধি করা যায় এবং যার আলোকে শরিয়ত কাজ করে। এ ঘটনায় নিকাহ অপব্যবহারের একটি পন্থা কিনা তা হলো ব্যক্তির বিবেকের বিষয় এবং আইনের ইতিবাচক প্রয়োগ নয়।[১৪] এখানে পার্থক্য হচ্ছে প্রেক্ষাপটের। শাফেয়ী ও হানাফী মতে, চুক্তি বাহ্যত বৈধতার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। অন্যদিকে মালেকী ও হাম্বলী মতে চুক্তির উদ্দেশ্যকে বিবেচনায় এনে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, যা পাপের পথ রোধ করার জন্য অবশ্যই করতে হবে।[১৫] অপরদিকে অবৈধভাবে একান্ত সাক্ষাৎ (খালওয়া) হারাম হওয়ার বিষয়ে আলেমগণ সর্বসম্মতভাবে একমত পোষণ করেছেন যদিও তা ইতিবাচক প্রমাণ বুঝায় না, সম্ভাবনার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, অর্থাৎ তা *জিনার* পথ প্রশস্ত করতে পারে।[১৬]

অনুরূপ আরেকটি উদাহরণে আলেমগণ সাদ্দ আল জারাইর মূলনীতি অবলম্বন করেছেন। তা হলো, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন পরস্পরের মধ্যকার কোনো বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সাক্ষী ও বিচারক হিসেবে কাজ করতে পারবে না। অন্যরা অবশ্য এর বিরোধিতা করেছেন। অনুরূপভাবে কোনো বিচারক ঘটনার সাক্ষ্যপ্রমাণ

www.pathagar.com

আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থাপন ছাড়াই ঘটনা সম্পর্কে ব্যক্তিগত জ্ঞানের আলোকে রায় প্রদান করতে পারেন না, যদি তা করেন তা হলে পক্ষপাতদুষ্ট হবে এবং বিবাদের কোনো এক পক্ষের অনুকূলে বা বিপক্ষে যাবে। এখানে যে মূলনীতি সংশ্লিষ্ট রয়েছে তা হলো, এ ধরনের কর্মকাণ্ড খারাপ পরিণতির দিকে ধাবিত করতে পারে- যেমন সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত করতে আদালতের ব্যর্থতা, তাই বিষয়টি পরিহার করতে হবে। অন্যদিকে হানাফীগণ বিশেষ করে রায় প্রদানের ক্ষেত্রে মনে করেন যে, ব্যক্তিগত জ্ঞানের ভিত্তিতে রায় প্রদান বৈধ। অনেক আলেম এ মত পোষণ করেন যে, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনের বিশেষ করে আত্মীয়দের পরস্পরের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়া হলে তা বস্তুতপক্ষে ন্যায়বিচারের সুযোগ করে দেয় এবং অন্যায়ের দিকে ধাবিত নাও করতে পারে। এ কারণে শাফেয়ী মাজহাবের আলেমগণ পিতা ও পুত্র এবং স্বামী ও স্ত্রীকে পরস্পরের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদান অনুমোদন করেছেন, কিন্তু পক্ষে নয়।[১৭] *এভাবে* নির্দিষ্ট কতিপয় বিষয়ে সাদ্দ আল জারাইর প্রয়োগ এবং ভিন্ন পরিস্থিতিতে তা বৈধভাবে প্রয়োগ করার ব্যাপারে ফকিহগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

৩. চার প্রকার পন্থার সর্ব শেষ প্রকার পন্থা কদাচিৎ খারাপের দিকে ধাবিত করে বলে মনে করা হয় এবং তাতে কল্যাণ লাভের সম্ভাবনাই বেশি থাকে। এর একটি উদাহরণ হলো, এমন স্থানে কূপ খনন করা যাতে কারোর আহত বা ক্ষতির সম্ভাবনা নেই অথবা কোনো স্বৈরাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলা কিম্বা নিজস্ব জমিতে আঙ্গুরের মতো বিভিন্ন ধরনের ফল উৎপাদন করা। অন্যান্য অনেক বিষয়ের মতো উপরের এসব বিষয়ের ফলাফল হিসেবে *মাফসাদা* সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আঙ্গুর উৎপাদনের পর তা জারিত করে মদ তৈরি করার সম্ভাবনা রয়েছে কিন্তু অন্যভাবে কল্যাণ লাভের বিপুল সম্ভাবনা থাকায় এ নিছক সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করা হয়েছে। আলেমগণ সাধারণভাবে এ ধরনের উপায়ের ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন। এ ধরনের উপায়ের আওতায় পড়ে এমন কাজ ও লেনদেনের ব্যাপারে মৌলিক নিয়ম হলো, তা অনুমোদনযোগ্য এবং মাফসাদার পথে ধাবিত করতে পারে নিছক এ সম্ভাবনার কারণে তা করা থেকে কেউ নিবৃত করতে পারবে না। অনুরূপভাবে বলা যায় যে, মাফসাদার বিস্তার ঘটতে পারে নিছক এমন সম্ভাবনার কারণে কাউকে আদালতে সাক্ষ্যদান করা থেকে বিরত রাখা যাবে না অথবা স্বৈরাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলতে বাধা প্রদান করা যাবে না।[১৮]

সাদ্দ আল জারাইর বিষয়ে উপরিউক্ত আলোচনা মূলত উপায় বা পন্থা সম্পর্কিত যা একটি বেআইনি পরিণতির পথ প্রশস্ত করে। অন্যকথায় বলা যায়, হারামকে হালালে পরিবর্তিত করার কোনো চেষ্টা করা যাবে না। যখনই কোনো বৈধ পন্থা

www.pathagar.com

অবৈধ পরিণতির দিকে ধাবিত করবে বলে সম্ভাবনা দেখা দেবে তখনই ওই পন্থা অবৈধ হয়ে যাবে। কিন্তু সাদ্দ আল জারাইতে এমন ঘটনাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যাতে বড় ধরনের খারাপ কাজ রোধের সম্ভাবনা থাকলে সে ক্ষেত্রে হারাম হালাল বা মুবাহতে পরিণত হতে পারে। অন্যকথায় বলা যায়, বড় গোনাহ রোধের লক্ষ্যে ছোট গোনাহকে মেনে নেয়া যেতে পারে। এর উদাহরণ হলো, মুক্তিপণ হিসেবে অর্থ প্রদান করে মুসলিম যুদ্ধবন্দীকে মুক্ত করার অনুমতি রয়েছে। মৌলিকভাবে শত্রুকে অর্থ প্রদান করা বেআইনি কাজ। তাতে শত্রুর শক্তি বৃদ্ধি পায় যা সাধারণত ক্ষতিকর। কিন্তু এখানে তা করার অনুমতি দেয়া হয়েছে কারণ মুসলিম বন্দীদের মুক্তি লাভে মুসলিম বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি পাবে। সাদ্দ আল জারাইর মূলনীতির ভিত্তিতে এ বিধান প্রণীত হয়েছে, যা কাঙ্ক্ষিত কল্যাণ লাভের পন্থা বন্ধ নয় উন্মোচিত করার সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। অনুরূপভাবে বলা যায় যে, মুসলিম সমাজের ক্ষতিসাধন থেকে বিরত রাখতে শত্রুকে অর্থ প্রদানের অনুমতি মুসলমানদের দেয়া হয়েছে, তবে কেবলমাত্র সেই পরিস্থিতিতে যাতে তাদের আত্মরক্ষার ক্ষমতা থাকবে না। উপরন্তু আলেমগণ একমত হয়েছেন যে, নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য ঘুষ প্রদান যদি একমাত্র উপায় হয়, এ ছাড়া আর কোনো পথ যদি খোলা না থাকে, তাহলে এমন পরিস্থিতিতেই কেবল তা দেয়ার অনুমতি রয়েছে। হাম্বলী ও মালেকী ফকিহগণ এ সাথে আরেকটি শর্ত জুড়ে দিয়েছেন– তা হলো, কোনো ব্যক্তির কেবলমাত্র প্রমাণিত অধিকার রক্ষার উপায় হিসেবে ঘুষ দেয়ার অনুমতি আছে, কিন্তু বিতর্কিত অধিকারের ক্ষেত্রে তা করা যাবে না।[১৯]

শরিয়াহর একটি মূলনীতি হিসেবে সাদ্দ আল জারাইর মৌলিক বৈধতা থাকা সত্ত্বেও এর ওপর অত্যাধিক নির্ভরশীল হওয়ার সুপারিশ করা হয়নি। আলেমগণ সতর্ক করে দিয়েছেন যে, এ নীতির অত্যাধিক ব্যবহারে বৈধ (মুবাহ) বিষয় এমনকি প্রশংসনীয় (মানদুব) ও অত্যাবশ্যকীয় (ওয়াজিব) বিষয়ও অবৈধ হয়ে পড়তে পারে, যা উৎসাহিত করা উচিত হবে না। এর একটি উদাহরণ হলো, যখন কোনো সৎ ব্যক্তি কোনো ইয়াতিমের সম্পত্তি অথবা ওয়াকফ সম্পত্তির জিম্মাদার হতে অস্বীকার করে তখন তার পেছনে একটি মহৎ উদ্দেশ্য কাজ করে, তা হলো, পাপে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা পরিহার করা। এ ধরনের অস্বীকৃতির ঘটনায় পাপের পথে ধাবিত করতে পারে এমন উপায়ের গুরুত্বের ব্যাপারে অত্যধিক জোর দেয়া হয়েছে বলে মনে করা হয়েছে। ইয়াতিমের সম্পত্তির অভিভাবকত্বের ব্যাপারে কুরআন কতিপয় নির্দেশনা প্রদান করেছে, যাতে আস্থার বিষয় হিসেবে অভিভাবকের সম্পত্তির সাথে তাদের সম্পত্তির মিশ্রণের অনুমতি দেয়া হয়েছে। উপসংহারে কুরআনের যে আয়াতে ইয়াতিমের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে তা এখানে তুলে ধরতে চাই : 'যদি তোমরা

www.pathagar.com

তোমাদের নিজেদের ও তাদের খরচপত্র ও থাকা-খাওয়া একত্র রাখ তাতে দোষের কিছু নেই, তারা তোমাদের ভাই-বন্ধু ছাড়া আর কিছু নয়। যারা অন্যায় করে আর যারা উপকারের কাজ করে তাদের সব প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ তায়ালা ভালো করে জানেন' (সুরা আল বাকারা, ২ : ২২০)।

সাদ্দ আল জারাইর ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল হওয়ার ব্যাপারে আলেমগণের সতর্ক করে দেয়ার বিষয়ে আলোচনার সময় আবু জাহরাহ প্রখ্যাত মালেকী ফকিহ ইবনে আল আরাবির বক্তব্য উদ্ধৃত করেন- তা হলো, সুনিয়ন্ত্রিতভাবে এ নীতি প্রয়োগ করতে হবে যাতে এর ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথার্থতা ও পরিমিতি বজায় থাকার বিষয়টি নিশ্চিত হয়। আবু জাহরাহ এ ব্যাপারে আল আরাবির সাথে একমত পোষণ করেন যে, পাপের পরিণতিকে যদি উপায় রোধের মাধ্যমে বন্ধ করা যায় তা হলে এটি নিশ্চিত হওয়া দরকার যে ওই পাপের বিষয়টি '*মানসুছ আলাইহ*' অর্থাৎ কুরআন বা সুন্নাহতে ওই বিষয়ে নির্দেশনা রয়েছে। অনুরূপভাবে যখন কোনো কল্যাণ লাভের বিষয় উপায় উন্মোচনের মাধ্যমে লাভ করা যায় তখন ওই কল্যাণের শুদ্ধতা কিয়াসের দ্বারা অবশ্যই *হালাল নুসুস* পর্যায়ে টেকসই হতে হবে (অর্থাৎ *নসে* তা হালাল বা বৈধ বলে ঘোষিত হয়েছে)। তবে আবু জাহরাহ সতর্কতার সাথে আরো বলেন যে, এসব শর্ত অভিমতের পর্যায়ে রয়ে গেছে এবং এ মতবাদের গৃহীত মালেকী ব্যাখ্যায় তা সংযোজন করার দরকার নেই।[২০]

সবশেষে বলা যায়, সম্পত্তির অভিভাবকত্ব ও ওয়াকফ সম্পত্তি দেখভালের উপরিউক্ত উদাহরণে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে যে, কোনো সৎ ব্যক্তির দায়িত্ব গ্রহণের অস্বীকৃতিতে যে ক্ষতি হতে পারে বলে ধারণা করা হয় তা এ দায়িত্ব গ্রহণের কারণে সৃষ্ট অনিষ্টের চেয়ে অনেক বেশি হতে পারে। অর্পিত সম্পত্তির অপব্যবহারের উপায় উন্মুক্ত হতে পারে, এ ভয়ে যদি ইয়াতিমদের উপেক্ষা করা হয় অথবা মিথ্যা প্রশ্রয় পেতে পারে, এ আশঙ্কায় সাক্ষ্য না দেয়া হয় তা হলে তা অবশ্যই বড় ধরনের পাপের উপায় হিসেবে পরিণত হবে, তাই তা পরিহার করতে হবে।

আমরা ভূমিকা বা প্রারম্ভিক কর্ম (মুকাদ্দিমাহ) থেকে উপায়ের পার্থক্য নিরূপণের মাধ্যমে সাদ্দ আল জারাই সম্পর্কিত এ আলোচনা শেষ করতে চাই। অবশ্য এ দুইটি বিষয় কখনো কখনো যুগপৎভাবে আবার আলাদাভাবে সংঘটিত হতে পারে। সংক্ষেপে এ কথা বলা যায় যে, 'প্রারম্ভিক কর্ম' যে পরিণতি লাভের কথা চিন্তা করে তা অর্জনে যে জিনিসের প্রয়োজন হয় তার সমন্বয়ে এ বিষয়টি গঠিত হয়, এ অর্থে পূর্বেরটি ছাড়া পরেরটি বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এর উদাহরণ হলো, অজু নামাজের প্রারম্ভিক কর্ম এবং অজু ছাড়া নামাজ আদায় সম্ভব নয়। কিন্তু উপায় হচ্ছে এমন

www.pathagar.com

বিষয়, যা পরিণতির ক্ষেত্রে অনুরূপ সম্পর্ক বজায় রাখে না। যদিও উপায় সাধারণত ধারণা মতো ফল লাভ হবে বলে প্রত্যাশা করে। অন্যান্য পন্থার মাধ্যমেও ওই ফল পাওয়া যেতে পারে। অন্যকথায় পরিণতি বা ফল একান্তভাবে উপায়ের ওপর নির্ভর করে না। এর একটি উদাহরণ হলো, চুরি করার উদ্দেশে কোনো জায়গায় যাওয়া হলো চুরির প্রারম্ভিক কর্ম, অর্থাৎ এর চিন্তা করা হয়েছে কিন্তু তা চুরি করার কোনো উপায় নয়। নির্দিষ্ট দিকে ট্রেনে চড়ে এ সফর হচ্ছে মৌলিকভাবে একটি নিরপেক্ষ বিষয় এবং উদ্দেশের ভিত্তিতে তা চুরির উপায় গঠন করে, এ কথা বলা যেতে পারে না। কিন্তু তালাকপ্রাপ্ত দম্পতির মধ্যে বিয়ে বৈধ হওয়ার জন্য মধ্যবর্তী বিয়ে বা 'তাহলিল' হচ্ছে প্রস্তাবিত বিয়ের একটি উপায়; কিন্তু তার প্রারম্ভিক কর্ম নয় কারণ পরের কর্মটি একান্তভাবে তাহলিলের ওপর নির্ভরশীল নয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, তাদের মধ্যে স্বাভাবিক মধ্যবর্তী বিয়ে হতে পারে। অনুরূপভাবে একজন নারী ও একজন পুরুষের পরস্পরকে প্রলুব্ধ করা হচ্ছে জিনার একটি উপায় কিন্তু প্রারম্ভিক কর্ম নয় কারণ এ ধরনের প্রলুব্ধকরণ ছাড়াই জিনার ঘটনা ঘটতে পারে। যখন প্রকৃতপক্ষে জিনা সংঘটিত হয় তখনই কেবল জৌনাচারের প্রস্তাব জিনার প্রারম্ভিক কর্ম গঠন করে।

উপায় ও প্রারম্ভিক কর্মের অন্যান্য পার্থক্য সম্পর্কে আমাদের উদ্দেশ্যের আলোকে ইতোমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে, আর তা হলো, এমনকি প্রত্যাশিত ফল অর্জিত না হলেও সাধারণত উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে উপায়কে মূল্যায়ন করা হয় এবং তাকে হারাম বা অবৈধ ঘোষণা করা হয়। অন্যদিকে প্রারম্ভিক কর্মের তেমন কোনো মূল্য থাকে না যদি তা প্রকৃতপক্ষে ওই কাজটি সংঘটিত না হয়, যা তার একটি অংশে পরিণত হতো। প্রারম্ভিক কর্ম ও তার পরিণতির মধ্যকার সম্পর্ক এ অর্থে বিষয়কেন্দ্রিক অর্থাৎ কেবলমাত্র পরিপূর্ণ বা প্রত্যাশিত ফলাফলের আলোকেই মূল্যায়ন করা সম্ভব। এর উদাহরণ হলো, শুক্রবার জুমার নামাজ আদায় করা হলেই কেবলমাত্র মসজিদের দিকে হেঁটে যাওয়ার ওয়াজিব আদায় হবে, অন্যথায় নয়।[২১]

www.pathagar.com

টিকা

১. তুলনীয়, আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ২২৮।

২. শাতিবী, মুয়াফাকাত (দিরাজ সংস্করণ), ৪, ১৯৪।

৩, একই গ্রন্থ, ৪, ১৯৫; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ২৪২।

৪. তুলনীয়, আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ২২৮; ইসমাঈল, আদিল্লাহ, পৃষ্ঠা ১৯৭।

৫. শাতিবী, মুয়াফাকাত, ৪, ৬২; শালাবী, ফিকহ, পৃষ্ঠা ১৮৭।

৬. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ২২৯; শালাবী, ফিকহ, পৃষ্ঠা ১৮৭; ইসমাঈল, আদিল্লাহ, পৃষ্ঠ, ২০০।

৭. ইবনে কাইয়্যিম আল জাওজিয়াহ, ইলাম, ৩. ১২২; শালাবী, ফিকহ, পৃষ্ঠা ১৮৮।

৮. শাতিবী মুওয়াফাকাত, ৪, ২০১।

৯. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ২২৭-২২৮।

১০. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ২২৮; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ২৪৩।

১১. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ২৩০; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ২৪৩।

১২. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ২৩১; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ২৪৪।

১৩. শাতিবী, মুয়াফাকাত, ৪, ২০০; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ২৪৪; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ২৩২।

১৪. ইসমাঈল, আদিল্লাহ, পৃষ্ঠ, ১৭৫।

১৫. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ২৩১।

১৬. বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ২৪৫।

১৭. শালাবী, ফিকহ, পৃষ্ঠা ১৮০; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ২৪৪; ইসমাঈল, আদিল্লাহ, পৃষ্ঠ, ২১১।

১৮. শাতিবী, মুওয়াফাকাত, ২, ২৪৯; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ২৪৫; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ২৩০।

১৯. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ২৩২।

২০. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ২৩৩।

২১. তুলনীয়, বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ২৪৫-৪৬; ইসমাঈল, আদিল্লাহ, পৃষ্ঠা ১৭১।

www.pathagar.com

বিআইআইটি থেকে প্রকাশিত বইয়ের তালিকা (পার্ট - ২)

Professor Dr. Muhammad Luqman (Edited)

Islamic Management: Islamic Perspective ২০০/-

Md. Golam Mohiuddin *PhD* & Afroza Bulbul

Islamization and Standardization of Knowledge... ১৩০/-

খ. সামাজিক বিজ্ঞান

আব্দুলহামিদ আহমাদ আবুসুলায়মান

ইসলামের দৃষ্টিতে রাজনৈতিক সংঘাত ও সহিংসতা নিয়ন্ত্রণ ৬০/-

ইসলাম ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ২৫০/-

আকরাম জিয়া আল উমরী *পিএইচডি*

রাসূলের (সঃ) যুগে মদীনার সমাজ (১ম খন্ড) ১৫০/-

রাসূলের (সঃ) যুগে মদীনার সমাজ (২য় খন্ড) ১৭০/-

আবদুর রশিদ মোতেন

রাষ্ট্রবিজ্ঞান : ইসলামি প্রেক্ষিত ১৫০/-

তাহির আমিন

জাতীয়তাবাদ ও আর্ন্তজাতিকতাবাদ : উদারতাবাদ, মার্কসবাদ ও ইসলাম ১০০/-

মোহাম্মদ হাশিম কামালি *পিএইচডি*

ইসলামে মত প্রকাশের স্বাধীনতা ২৫০/-

মুহাম্মদ আল ব্যুরে *পিএইচডি*

প্রশাসনিক উন্নয়ন : ইসলামি প্রেক্ষিত ৩০০/-

জাফর ইকবাল *পিএইচডি*

শিক্ষক প্রশিক্ষণ : ইসলামি প্রেক্ষিত ১৫০/-

প্রফেসর আবদুন নুর

লোক-প্রশাসন : সংগঠন, প্রক্রিয়া ও অনুচিন্তা ২৬০/-

অধ্যাপক জয়নুল আবেদিন মজুমদার (সম্পাদনা)

আমাদের সংস্কৃতি বিচার্য বিষয় ও চ্যালেঞ্জসমূহ ৬০/-

এম আবদুল আযিয *সম্পাদিত*

গণতন্ত্র ও ইসলাম ১০০/-

সন্ত্রাসবাদ ও ইসলাম ৮০/-

www.pathagar.com

সপ্তদশ অধ্যায়

হুকম শারয়ী (শরিয়াহর আইন বা মূল্য)

উসুলের আলেমগণ হুকম শারয়ীর সংজ্ঞায় বলেছেন যে, মুকাল্লাফের (পূর্ণ বুদ্ধি-জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ) আচার-আচরণ সম্পর্কে খোদার পক্ষ থেকে বাণী বা বার্তা যা দাবি, অভিরুচি, পছন্দ অথবা বিধিবদ্ধ আইনের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। দাবি (তালাব বা ইকতিদা) সাধারণত আদেশ অথবা নিষেধের আকারে প্রকাশ করা হয়। আদেশ সংক্রান্ত দাবি হচ্ছে এমন কিছু, যা মুকাল্লাফকে পালন করতে হবে অপরদিকে নিষেধ হচ্ছে এমন দাবি যা তাকে পরিহার করতে হবে। দাবি বাধ্যতামূলক হতে পারে, আবার বাধ্যতামূলক নাও হতে পারে। বাধ্যতামূলক হওয়ার ক্ষেত্রে মুকাল্লাফের জন্য তা মেনে চলা ছাড়া আর কোনো পথ খোলা নেই। যখন কোনো দাবিতে কোনো কিছু করা বা না করার বিষয় সুনির্দিষ্ট প্রমাণের (কাতয়ী দলিল) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তাকে যথাক্রমে হয় ওয়াজিব অথবা হারাম বলে উল্লেখ করা হয়। এ হলো সুনির্দিষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠের মত। তবে হানাফী ফকিহ্গণের মতে, যদি কুরআন-সুন্নাহতে বর্ণিত এ দাবির অর্থ (দালালাহ্) অথবা যথার্থতার (সুবুত) দিক থেকে সুনিশ্চিত না হয় তাহলে তা ওয়াজিব হবে। আর এ উভয় বিষয় সুনিশ্চিত হলে তা হবে ফরজ। কোনো কিছু পরিহার করার দাবির বিষয়ে হানাফীদের মত হলো, যদি তা অর্থ ও যথার্থতা উভয়ের সুনিশ্চিত প্রমাণ থাকে তাহলে তা হবে হারাম। অন্যথায় তা হবে মাকরূহ তাহরিমী। যখন দাবির বিষয় স্পষ্ট ভাষায় জোরালো না হয় এবং বিষয়টি ব্যক্তির পছন্দের ওপর ছেড়ে দেয়া হলে তাকে মানদুব (সুপারিশকৃত) বলা হয়। অপরদিকে পছন্দ, ইচ্ছা বা অভিরুচি (তাখাইয়ীর) হচ্ছে আরেক ধরনের হুকম শারয়ী যা ব্যক্তিকে কোনো কিছু করা বা তা পরিহার করার স্বাধীনতা প্রদান করেছে। এ ধরনের হুকম সাধারণভাবে মুবাহ (অনুমোদনযোগ্য) বলে পরিচিত। বিধিবদ্ধ আইন বা ওয়াদ না দাবি না অভিরুচি বরং আইনের বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যার একটি বিষয় যা কারণ (সাবাব) হিসেবে কোনো কিছুকে আইনে পরিণত করে অথবা অন্য কিছু অর্জনের জন্য একটি শর্ত (শার্ত) অথবা তা এক ধরনের প্রতিবন্ধক (মানি) বোঝাতে পারে এবং তা অর্জনের পথে একটি বাধা হিসেবে কাজ করতে পারে।[১]

এর কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা যেতে পারে- কুরআনে মুমিনদের সম্বোধন করা এক আদেশ বলা হয়েছে, 'তোমরা বন্ধনগুলো পুরোপুরি মেনে চলো', (আল মায়েদা, ৫ : ১)। মুকাল্লাফকে উদ্দেশ্য করে দেয়া খোদার এ বক্তব্য একটি সুনির্দিষ্ট দাবির সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। মুকাল্লিফকে সম্বোধন করে নিষিদ্ধের (হারাম) দাবির

www.pathagar.com

দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায় কুরআনের সুরা হুজরাতে। যাতে বলা হয়েছে : 'হে ইমানদার লোকেরা, না পুরুষ ব্যক্তি অপর পুরুষ ব্যক্তিদের বিদ্রূপ করবে, হতে পারে যে, সে তোমাদের চেয়ে উত্তম...' (সুরা নিসা, ৪ : ১১)। পছন্দ বিষয়ক হুকম এর উদাহরণ হিসেবে আমরা কুরআনের এ আয়াত উল্লেখ করতে পারি যাতে মুমিনদের শিকার করার অনুমতি দেয়া হয়েছে : 'ইহরামের অবস্থা (পবিত্র হজ পালনের জন্য পরিধান করা পোশাক) শেষ হয়ে গেলে অবশ্য তোমরা শিকার করতে পারো' (আল মায়েদা, ৫ : ২)। পছন্দের বিষয়ে গঠিত কুরআনের আরেকটি আয়াত (সুরা বাকারা, ২ : ২২৯) দেখতে পাওয়া যায়, তাতে বলা হয়েছে : 'তোমাদের যদি ভয় হয় যে, তারা (দম্পতি) পরস্পর খোদার বিধান অনুযায়ী চলতে পারবে না, তখন তাদের পরস্পরের মধ্যে এমন ব্যবস্থা করে দেয়া গোনাহের কাজ হবে না যে, স্বামীকে কিছু বিনিময় দিয়ে স্ত্রী বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নেবে।' এভাবে বিবাহিত যুগলকে পরস্পরের সম্মতিতে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর অনুমতি দেয়া হয়েছে। এ ব্যবস্থা 'খুল' নামে পরিচিত। তারা ইচ্ছে করলে এমনটি করতে পারে, কিন্তু যদি তারা তা না করে তাতে কিছু আসে-যায় না, এ ব্যাপারে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। কুরআনে আরেক ধরনের পছন্দের বিষয় দেখতে পাওয়া যায় ভুলবশত হত্যাকাণ্ড ঘটানোর ক্ষতিপূরণ বা কাফফারা প্রদানের বিধানে। এখানে অপরাধীকে একটি দাস মুক্ত করে দেয়া, অথবা ৬০ জন মিসকিনের খাবার খাওয়ানো অথবা দুই মাস একটানা রোজা পালনের যে কোনো একটি করার সুযোগ দেয়া হয়েছে, (সুরা আল নিসা, ৪ : ৯২)। নিম্নের হাদিসটিতে ব্যক্তিকে হুকমের ব্যাপারে তার পছন্দের পন্থা বেছে নেয়ার সুযোগ দেয়া হয়েছে :

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فان لم يستطع

فبلسانه ، فان لم يستطع فبقلبه وذلكأضعف

الايمان

> যদি তোমাদের কেউ কোনো অন্যায় কাজ হতে দেখতে পায়, তাহলে তার উচিত হবে হাত দিয়ে তা বন্ধ করে দেয়া। যদি সে তা করতে অসমর্থ হয়, তাহলে তার উচিত হবে কথার সাহায্যে তার প্রতিবাদ করা। তাও যদি সে করতে না পারে তাহলে তার উচিত হবে মনে মনে তা ঘৃণা করা আর এটি হচ্ছে ইমানের দুর্বলতম রূপ।[২]

এখানে মুকাল্লাফের সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়েছে এবং বিরাজমান পরিস্থিতি তার এ সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে। সর্বশেষে আইন

www.pathagar.com

পাস করা বা ওয়াদা সংক্রান্ত হুকমের উদাহরণ হিসেবে আমরা নিম্নোক্ত হাদিস উল্লেখ করতে পারি। তাতে বলা হয়েছে :

لا يرث القاتل

> 'হত্যাকারী উত্তরাধিকারী হতে পারে না'।[৩] এ হলো মুকাল্লাফের আচরণ সম্পর্কিত একটি খোদায়ী বক্তব্য যা না দাবি না অভিরুচি বরং আইনের সিদ্ধান্তের একটি বিষয়, যাতে একটি নির্দিষ্ট ঘটনার চিত্র ফুটে উঠেছে।

হুকম শারয়ীর পরিচিতির বিষয়ে উসুলের আলেম ও ফকিহ্দের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। 'তোমরা বন্ধনগুলো পুরোপুরি মেনে চলো' সম্পর্কিত কুরআনের পূর্বোল্লিখিত উদাহরণের প্রসঙ্গে দেখতে পাই যে, উসুলের আলেমগণের মতে, এখানে খোদ আয়াতেই দাবি প্রকাশ পেয়েছে, তাই আয়াতটিই হুকম শারয়ীর প্রতিনিধিত্ব করছে। অবশ্য ফকিহ্দের মতে, এটি হচ্ছে ওই দাবির ফল অর্থাৎ বাধ্যবাধকতার (উজুব) যা হুকম শারয়ী রূপে প্রকাশ পেয়েছে। আরেকটি উদাহরণ হলো, হারাম সংক্রান্ত কুরআনের বিধান যাতে ইমানদারদের উদ্দেশ্য করে যাতে বলা হয়েছে : 'জিনার কাছেও যেও না' (সুরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ৩২)। উসুলের আলেমদের মতে, খোদ আয়াতটিতেই হুকম শারয়ীর বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু ফকিহ্দের মতে, তা হচ্ছে এ আয়াতের দাবির ফল, অর্থাৎ নিষিদ্ধ (তাহরীম) যা হুকম শারয়ীর প্রতিনিধিত্ব করছে। অনুরূপ এর আগে উদ্ধৃত শিকারের অনুমতি সংক্রান্ত কুরআনের খোদ আয়াতই উসুলের আলেমদের মতে, হুকম শারয়ীর প্রতিনিধিত্ব করছে। কিন্তু ফকিহ্দের মতে, আয়াতের ফল অর্থাৎ অনুমোদনযোগ্যতাই (ইবাহা) হচ্ছে হুকম। উসুলের আলেম ও ফকিহ্দের মধ্যে মতপার্থক্যের এই প্রেক্ষাপটের ব্যাখ্যা করার পর এ কথা বলা যায় যে, শরিয়াহর বিধিবিধানের ওপর এ মতপার্থক্যের অবশ্য বাস্তবে কোনো প্রভাবই পড়েনি। তাই হুকমের যে দু'টি দিককে তারা তুলে ধরেছেন তা কার্যত একই।[৪]

হুকম শারয়ীকে দু'টি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। তাহলো– আল হুকম আল তাকলিফী (সীমা নিরূপণীয় আইন) ও আল হুকম আল ওয়াদয়ী (ঘোষণামূলক আইন)। পূর্বেরটি দাবি অথবা পছন্দের সমন্বয়ে গঠিত এবং পরেরটি কেবল বিধিবদ্ধ আইনের সমন্বয়ে গঠিত। আল হুকম আল তাকলিফীর যথাযথ বর্ণনা দেয় নিরূপণীয় আইন। কারণ তাতে মূলত মানুষের কাজের স্বাধীনতার মাত্রার সীমা নির্দেশ করা হয়। আল হুকম আল ওয়াদয়ীতে 'ঘোষণামূলক আইনের' ব্যাখ্যা পেশ করা হয়, কারণ এ ধরনের হুকম প্রধানত কারণ (সাবাব) ও তার ফলাফল (মুসাব্বাব) অথবা শর্ত (শার্ত) ও তার উদ্দেশ্য (মাশরূত)-এর মধ্যকার আইনগত

www.pathagar.com

বিষয় সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়।[৫] এভাবে সীমা নির্দেশক আইনকে খোদার তরফ থেকে কোনো বাণী বা বার্তা হিসেবে বর্ণনা করা যায় যাতে মুকাল্লাফের কাছে কিছু করার বা তা করা থেকে বিরত থাকার দাবি জানানো হয় অথবা তাকে এ দুইয়ের মাঝে যে কোনো একটিকে গ্রহণ করার সুযোগ দেয়া হয়। এ ধরনের হুকম সুপরিচিত পাঁচ ধরনের হয়ে থাকে। তাহলো, ওয়াজিব (বাধ্যতামূলক), মানদুব (সুপারিশকৃত), হারাম (নিষিদ্ধ), মাকরূহ (অপছন্দনীয়) ও মুবাহ্ (অনুমোদনযোগ্য)। ঘোষণামূলক আইনকেও পাঁচ শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে, তাহলো, সাবাব (কারণ), শার্ত (শর্ত), মানি (প্রতিবন্ধকতা), আজিমাহ (কঠোরতা) যা রুখসাহর (নমনীয়তা) বিপরীত এবং সহিহ্ (বৈধ), যা বাতিলের (অকার্যকর) বিপরীত।[৬] আমরা প্রথমে সীমা নিরূপণীয় আইন ও এর বিভিন্ন উপবিভাগ নিয়ে আলোচনা করব।

১. সীমা নির্দেশক আইন (আল হুকম আল তাকলিফী)

উপরে যেমনটি বলা হয়েছে যে, ‘সীমা নির্দেশক আইন’ হচ্ছে খোদার কাছ থেকে আসা বাণী বা বার্তা, যা নির্দেশ বা পছন্দের সমন্বয়ে গঠিত এবং তা পাঁচ ধরনের হয়ে থাকে। তা হলো, ওয়াজিব, মানদুব, হারাম, মাকরূহ ও মুবাহ। আমরা এ বিষয়গুলোর প্রতিটি সম্পর্কে নিম্নে পৃথকভাবে আলোচনা করব।

১.১ *বাধ্যতামূলক (ওয়াজিব, ফরজ)*

সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে, ওয়াজিব ও ফরজ সমার্থ্যবোধক এবং উভয়ই আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে মুকাল্লিফের প্রতি কোনো কিছু করার বিষয়ে অবশ্যই পালনীয় ও বাধ্যতামূলক দাবি জানানো হয়। ওয়াজিব সম্পর্কিত কোনো কিছুর ওপর আমল করলে পৃথিবীতে ও পরকালে পুরস্কৃত করা হবে আর তা না করলে শাস্তি পেতে হবে। অবশ্য হানাফীগণ ফরজ ও ওয়াজিবের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। এভাবে সর্বোচ্চ গুরুত্বপ্রাপ্ত বাধ্যবাধকতামূলক কাজ হলো ফরজ। কুরআন বা সুন্নাহতে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে কোনো আদেশ দেয়া হলে তা হবে ফরজ, কিন্তু কোনো কিছু করার আদেশ যদি ধারণামূলক (যন্নী) দলিল বা কর্তৃত্ব (authority), যেমন আহাদ হাদিসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে তা হবে দ্বিতীয় পর্যায়ের বাধ্যতামূলক কাজ (ওয়াজিব)। নামাজ আদায়, হজ্জ পালন, পিতা-মাতার কথা মেনে চলা ইত্যাদি বাধ্যতামূলক আদেশগুলো ফরজের অন্তর্ভুক্ত। কারণ এগুলো কুরআনের সুনির্দিষ্ট আয়াতের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু অন্যদিকে নামাজে প্রতি রাকাতে বাধ্যতামূলক সূরা আল ফাতিহা তেলাওয়াত, এশার নামাজ শেষে তিন রাকাত বিতরের নামাজ আদায় ইত্যাদি ওয়াজিবের শ্রেণিভুক্ত। কারণ উভয়ই যে

www.pathagar.com

হাদিসের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার যথার্থতা সন্দেহ থেকে পুরোপুরি মুক্ত নয়। একজন মুসলমানকে বাধ্যতামূলক কাজ, তা ফরজ বা ওয়াজিব যেটাই হোক, তা অবশ্যই পালন করতে হবে। যদি সে তা পালন করে তাহলে সে প্রতিদান প্রাপ্তি ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের পথ নিশ্চিত করল। কিন্তু সে যদি ইচ্ছাকৃতভাবে তার প্রতি অবহেলা করে তাহলে সে নিজেকে শাস্তিরযোগ্য হিসেবে পরিণত করল। এই দুই ধরনের বাধ্যতামূলক কাজের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। হানাফীগণসহ সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহদের মতে, সুনির্দিষ্ট দলিলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বাধ্যতামূলক আদেশকে কেউ বিশ্বাস করতে অস্বীকার করলে সে অবিশ্বাসী বা কাফেরে পরিণত হবে, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণির বাধ্যতামূলক আদেশ (ওয়াজিব) অস্বীকার করলে সে কাফেরে পরিণত হবে না, তবে সে বড় গোনাহগারে (ফাসেকে) পরিণত হবে। এভাবে কেউ যদি তার স্ত্রী, সন্তান ও গরিব পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য পালনে অবহেলা করে, তাহলে তা হবে গোনাহের কাজ, কুফরি নয়।[৭]

ফরজ ও ওয়াজিবের মধ্যে পার্থক্যের আরেকটি পরিণতি হচ্ছে যে, শরিয়তে অপরিহার্য কোনো একটি ফরজ কাজের প্রতি অবহেলা করা হলে পুরো কাজটিই বাতিল হয়ে যাবে। এর উদাহরণ হলো, ফরজ নামাজের সময় কোনো ব্যক্তির রুকু বা সিজদা বাদ পড়লে পুরো নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু সে যদি সূরা ফাতিহা পাঠ না করে তাহলে মূলত তার নামাজ হয়ে যাবে, কিন্তু তা ত্রুটিপূর্ণ হবে। এ হলো হানাফীগণের মত। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে, উভয় ক্ষেত্রেই নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। অবশ্য এ ব্যাপারে হানাফী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহদের মধ্যকার এ পার্থক্যকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় বরং একটি বাহ্যিক রূপ হিসেবে গণ্য করা হয়। এ কারণে তাদের মতানৈক্যের ফল সার্বিকভাবে অতি নগণ্য।[৮] আল গাজ্জালী শাফেয়ীসহ সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি লিখেছেন : 'আমাদের মতে, ফরজ ও ওয়াজিবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, এ দু'টি বিষয় সমার্থক। হানাফীদের মতে, ফরজ সুনির্দিষ্ট কর্তৃত্বের ভিত্তিতে আর ওয়াজিব ধারণামূলক দলিলের ভিত্তিতে গঠিত। আবারো বলছি, আমরা ওয়াজিবকে সুনির্দিষ্ট ও ধারণামূলক (মাকতু ওয়া মাজনুন) শ্রেণিতে বিভক্ত করাকে অস্বীকার করছি না এবং অর্থ একবার সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর বিভিন্নভাবে তাকে প্রকাশ করার ব্যাপারে কোনো আপত্তি নেই।[৯]

ওয়াজিবকে অন্তত তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথমে ওয়াজিবকে ব্যক্তিগত (আইনি) ও সম্মিলিত (কেফায়ী) বিভক্ত করা হয়েছে। ওয়াজিব 'আইনিতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হয় এবং নীতিগতভাবে কোনো ব্যক্তির জন্য বা তার পক্ষে অন্য কেউ তা করতে পারবে না। ওয়াজিব (ফরজ) 'আইনির

www.pathagar.com

উদাহরণ হলো, নামাজ, হজ, জাকাত, চুক্তির বাধ্যবাধকতা পূরণ করা ও পিতামাতার বাধ্যগত থাকা। ওয়াজিব কেফায়ী যেসব বাধ্যবাধকতার সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে তা সামগ্রিকভাবে সমাজকে সম্বোধন করা হয়েছে। সমাজের কিছু সদস্য তা পালন করলে ওই বিধান প্রতিপালিত হয়ে যাবে এবং সমাজের অন্যদের এর দায় থেকে মুক্ত করে দেয়া হবে। এর উদাহরণ হলো, জিহাদ (পবিত্র লড়াই), জানাজার নামাজ, হিসবাহ (সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ), হাসপাতাল নির্মাণ, আগুন নেভানো, সাক্ষ্য প্রদান করা, বিচারকের দায়িত্ব পালন ইত্যাদি। এসবই হলো সমাজের সম্মিলিত বাধ্যবাধকতামূলক কর্তব্য তাই এগুলো ওয়াজিব (ফরজ) কেফায়ী। এভাবে কোনো ব্যক্তি যখন এমন অবস্থায় মারা যায় যে, তার দাফনের খরচও বহন করার মতো কোনো সম্পত্তি থাকে না, সে ক্ষেত্রে সমাজের ওয়াজিব কেফায়ী হচ্ছে তার সুষ্ঠুভাবে দাফনের খরচ বহনসহ সব ব্যবস্থা করা । এ ব্যয় নির্বাহে সমাজের কতিপয় ব্যক্তি অবদান রাখলেই সমগ্র সমাজের পক্ষ থেকে কর্তব্য পালন হয়ে যায়। অবশ্য যারা ওয়াজিব কেফায়ী কর্তব্য পালনে শরিক হন প্রকৃত পক্ষে কেবল তারাই পুণ্য (সওয়াব) অর্জন করেন।

অনেক সময় সম্মিলিত দায়দায়িত্ব ব্যক্তিগত দায়দায়িত্বে পরিবর্তিত হয়ে যায়। উদাহরণ হলো, জিহাদ একটি ওয়াজিব কেফায়ী কিন্তু যখন দুশমন কোনো এলাকায় হামলা চালায় ও এলাকাটি অবরোধ করে রাখে, তখন সেখানকার প্রত্যেক অধিবাসীর জন্য তা রক্ষা করা ব্যক্তিগত কর্তব্যে পরিণত হবে। অনুরূপভাবে যখন কোনো শহরে একজন মাত্র মুজতাহিদ থাকেন তখন ইজতিহাদ করা তার ব্যক্তিগত কর্তব্যে পরিণত হয়।[১০]

ওয়াজিবকে আবার দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, তাহলো ওয়াজিব মুওয়াক্কাত ও ওয়াজিব মুতলাক। ওয়াজিব মুওয়াক্কাত হচ্ছে সময়সীমা সাপেক্ষ ওয়াজিব আর ওয়াজিব মুতলাক হচ্ছে 'নিরঙ্কুশ বা বাধ্যবাধকতামুক্ত ওয়াজিব' যা এ ধরনের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত। রোজা ও ফরজ নামাজ হচ্ছে মুওয়াক্কাত ওয়াজিবের উদারহণ। কারণ এগুলোকে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অবশ্যই আদায় করতে হয়। কিন্তু হজ পালন ও কাফফারা আদায়ে এ ধরনের বিধি নিষেধ নেই, তাই তা নিরঙ্কুশ ওয়াজিব। শর্ত হচ্ছে কোনো ব্যক্তি তার জীবনের কোনো এক সময়ে একবার হজ পালন করবে এবং মৃত্যুর আগে যে কোনো সময় কাফফারা আদায় করলেই চলবে।[১১] উপরন্তু নিরঙ্কুশ ওয়াজিবকে নিরঙ্কুশ বলার কারণ হলো, তা আদায়ের কোনো সময়সীমা নেই এবং অনুষ্ঠানের সময় উপস্থিত হলে প্রতিবারই তা পালন করা যেতে পারে। এর উদাহরণ হলো, পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য পালন করা এবং হিসবাহ, অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ দান করা ও অসৎ কাজর নিষেধ করা, যখন সময় আসবে তখনই এগুলো করতে হবে।

www.pathagar.com

এ বিভক্তির ফল হচ্ছে যে, ওয়াজিব মুওয়াক্কাত কেবলমাত্র তখনই আদায় করা যায়, যখন এর নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হয়, যা আগেই তড়িঘড়ি করে করা যায় না আবার বিলম্বেও করা যায় না। তবে প্রদত্ত সময়সীমার মধ্যে আদায়ের ব্যাপারে মুকাল্লাফের জন্য নমনীয়তার ব্যবস্থা রয়েছে। উপরন্তু মুওয়াক্কাত ওয়াজিবের ক্ষেত্রে মুকাল্লাফকে বিশেষভাবে তা আদায়ের জন্য ইচ্ছা পোষণ (নিয়ত) করা প্রয়োজন।[১২]

সবশেষে বলা যায় যে ওয়াজিবকে আরো দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। তাহলো, পরিমাণবাচক ওয়াজিব (ওয়াজিব মুহাদ্দাদ) ও অপরিমাণবাচক ওয়াজিব (ওয়াজিব গায়ের মুহাদ্দাদ)। পূর্বেরটি উদাহরণ হলো, নামাজ, জাকাত, বিক্রয় ও লেনদেনের ক্ষেত্রে ক্রেতা কর্তৃক দাম পরিশোধ ভাড়া সংক্রান্ত চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ভাড়া পরিশোধ ইত্যাদি। এসবই পরিমাণবাচক ওয়াজিব। অনুরূপভাবে সুনির্দিষ্ট শাস্তি (হুদুদ) ওয়াজিব মুহাদ্দাদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ এসব শাস্তির সুনির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। অপরিমাণবাচক ওয়াজিবের উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কারোর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনকে সহায়তা করার কর্তব্য, গরিবদের সেবা করা, ক্ষুধার্তকে খাবার খাওয়ানা, স্ত্রীকে মোহরানা প্রদান করা, নামাজে দাঁড়ানো (কিয়াম), রুকু ও সিজদা করা, ওজুর সময় মাথা মাসহে করা, অপরাধের তাজির শাস্তির পরিমাণ নির্ধারণ যে অপরাধ শাস্তিযোগ্য কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এ শাস্তির পরিমাণ কি হবে তা নির্ধারণ করে দেননি। (বিচারক বা কাজীর দায়িত্ব হচ্ছে প্রত্যেক অপরাধী ও তার অপরাধের অবস্থা বিবেচনা করে শাস্তির পরিমাণ কী হবে তা নির্ধারণ করা)। এর ফলশ্রুতিতে মুকাল্লাফ-সে কোনো ইমানদার ব্যক্তি, কাজী অথবা ইমাম যেই হোন না কেন, অপরিমাণবাচক ওয়াজিবের ক্ষেত্রে পরিমাণ নির্ধারণের ব্যাপারে তিনি বেশ নমনীয়তার সুবিধা ভোগ করে থাকেন।[১৩]

এ বিভক্তির ফল হচ্ছে যে পরিমাণবাচক ওয়াজিব প্রদত্ত সময়সীমার মধ্যে পালন করা না হলে ব্যক্তির ওপর তার দায়ভার (জিম্মাহ) পড়ে। যেমন অপরিশোধিত জাকাত অথবা অপরিশোধিত ঋণ। অন্যদিকে গায়ের মুহাদ্দাদ ওয়াজিব পালনে ব্যর্থ হওয়ার ফলশ্রুতিতে ব্যক্তির ওপর কোনো দায়ভার পড়বে না।

প্রশ্ন হচ্ছে, পরিমাণবাচক ওয়াজিবের অতিরিক্ত আদায়ের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অংশের মূল্য কী হবে। এ ধরনের ওয়াজিব অতিরিক্ত আদায় করলে তা খোদ ওয়াজিবের অংশে পরিণত হবে কি না। এ ব্যাপারে ২টি প্রধান মত রয়েছে। তার একটিতে বলা হয়েছে, পরিমাণবাচক ওয়াজিবের আদায় করা অতিরিক্ত অংশও ওয়াজিবে পরিণত হবে। কিন্তু অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মত হচ্ছে, সর্বনিম্ন প্রয়োজনের অতিরিক্ত যেটুকু করা হবে তা কেবল মানদুবে পরিণত হবে। এ কারণে নিম্নতম প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু করতে না পারলে সে জন্য কোনো শাস্তি আরোপ করা হবে না।[১৪]

www.pathagar.com

ওয়াজিবের উপায়কেও ওয়াজিব বলা সঠিক হবে না অথবা ওয়াজিবের প্রয়োজনীয় একটি উপাদানকেও সবক্ষেত্রে ওয়াজিব বলা ঠিক হবে না। কারণ এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিতে মুকাল্লিফের ব্যক্তিগত সামর্থ্যকে উপেক্ষা করার প্রবণতা প্রকাশ পেতে পারে, বিশেষ করে সে যদি যা করতে হবে তা করতে অসমর্থ হয়। এর উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যথেষ্ট সংখ্যক লোকের অভাবে কোনো এলাকায় শুক্রবার জুমার নামাজ অনুষ্ঠিত না হওয়া। তাই এ কথা বলা অধিকতর সঠিক হবে যে, যখন ওয়াজিবের উপায় এমন একটি কাজের সমন্বয়ে গঠিত হয় যা মুকাল্লিফের ক্ষমতার মধ্যে থাকে, তাহলে তাও ওয়াজিব হবে।[১৫]

ওয়াজিব ও মানদুবের মধ্যে পার্থক্যের ভিত্তির বিষয়ে সাধারণভাবে বলা যায় যে, কেউ ওয়াজিব উপেক্ষা করলে গোনাহগার (ইকাব) হবে, অপরদিকে মানদুব পালন না করলে কোনো গোনাহ হবে না। অনুরূপ ভিত্তির ওপর হারাম ও মাকরূহর পার্থক্য গড়ে উঠেছে। কোনো কিছু করা যদি দণ্ডনীয় হয় তাহলে তা হারাম হবে অন্যথায় তা মাকরূহ হবে। সাধারণভাবে এ কথা সত্য। কিন্তু এর সাথে এ অনুশর্ত অবশ্যই যোগ করতে হবে যে, বাধ্যতামূলক কাজ বা ওয়াজিবের জন্য শাস্তি প্রয়োজনীয় শর্ত নয়। উপরন্তু এর সাথে ইমাম গাজ্জালীর কথাকে যোগ করা যায়। তিনি বলেছেন, দুনিয়া বা আখেরাতে যেখানেই হোক না কেন, শাস্তির উপাদান সুনিশ্চিত নয়। অন্যদিকে ইতিবাচক জ্ঞানের আলোকে সাধারণত ওয়াজিব পার্থিব জীবনে প্রয়োগযোগ্য এবং এ ছাড়া তা বোধগম্য অগ্রগতি বা পুরস্কার লাভের পথ প্রশস্ত করতে পারে। আর এর প্রতি অবহেলার আধ্যাত্মিক শাস্তি দান অবশ্য পরকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা হয়েছে ও দুনিয়াতে তা স্থগিত রাখা হয়েছে। তাই দেখা যাচ্ছে যে, শাস্তি দানের বিষয়াদি ওয়াজিবের প্রয়োজনীয় শর্ত নয়। যখন সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা কোনো কাজ ছাড়াই তা মানুষের জন্য বাধ্যতামূলক বলে স্থির করেন এবং তা না করলে শাস্তির কথা উল্লেখ করা না হলেও এরূপ নির্দেশ দেয়ার কাজও হবে ওয়াজিব।[১৬]

১.২ *মানদুব (সুপারিশকৃত)*

মানদুব বলতে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে একটি নির্দেশ বুঝায় যাতে মুকাল্লাফকে কিছু করতে বলা হয়, তার জন্য অবশ্য তা বাধ্যতামূলক নয়। মুকাল্লিফ এ দাবি পালন করলে পুণ্য (সওয়াব) অর্জন করবে, কিন্তু তা করতে ব্যর্থ হলে কোনো শাস্তি পাবে না। এর উদাহরণ হলো, সেবামূলক দাতব্য প্রতিষ্ঠান (ওয়াকফ) গঠন, গরিবদের দান করা বা ভিক্ষা দেয়া, রমজান মাস ছাড়া অন্য সময়ে রোজা পালন, রোগীর সেবা করা ইত্যাদি। এ ধরনের অন্যান্য কাজও এর আওতায় পড়বে। মানদুব সুন্নাত, মুস্তাহাব ও নফল ইত্যাদি নামেও পরিচিত। এগুলো সবই

www.pathagar.com

সমার্থবোধক এবং একই সংজ্ঞার আওতায় পড়ে।[১৭] যদি কোনো কাজ রসুল সা. কোনো সময় করতেন আবার অন্য সময় বাদও দিতেন, তাহলে ওই কাজকে বলা হয় সুন্নত। দুই প্রকার সুন্নাত রয়েছে, তাহলো, সুন্নাতে মুয়াক্কাদা (শক্তিশালী সুন্নাত, সুন্নাত আল হুদা বলে পরিচিত) ও সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদা বা অত্যাচরণ সুন্নত। সুন্নাতে মুয়াক্কাদার উদাহরণ হলো, জামায়াতে নামাজ আদায়ের জন্য আহ্বান জানানো (আজান), জামায়াতে নামাজে শরিক হওয়া, ওজুর সময় কুলকুচি করা ইত্যাদি। গায়ের মুয়াক্কাদা উদাহরণ হলো, বাধ্যতামূলক নয় এমন সেবামূলক কাজ। জোহর ও আসরের ওয়াক্তের ফরজ নামাজের আগে অতিরিক্ত নামাজ আদায়। সুন্নাতে মুয়াক্কাদা পালন করলে আল্লাহর তরফ থেকে পুণ্য অর্জন করা যায় এবং তা অবহেলা করা নিছক দোষণীয়, কিন্তু শাস্তিযোগ্য নয়। অবশ্য কোনো এলাকার সব লোক যদি সুন্নাতে মুয়াক্কাদা পরিত্যাগ করার ব্যাপারে সম্মত হয় তাহলে সুন্নাত অবমাননা করার কারণে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। অন্যদিকে অত্যাচরণ সুন্নাত পালনে সওয়াব হয়, কিন্তু তা অবহেলা দোষণীয় নয়। আরেক প্রকার সুন্নাত রয়েছে, একে বলা হয়, সুন্নাহ আল জাওয়ায়িদ। এতে একজন মানুষ হিসেবে রসুল সা. যেসব কাজ ও আচরণ করেছেন সেসব বিষয়ই তুলে ধরা হয়েছে। যেমন- তার পোশাক-পরিচ্ছেদের ধরন, পছন্দনীয় খাবার-দাবার ইত্যাদি। এগুলো পালন না করা না তিরস্কারযোগ্য না দোষণীয়।[১৮]

মানদুব সব সময় কুরআনে আদেশের আকারে উল্লিখিত হয় এরপর এর সাথে এমন নির্দেশনা থাকে যাতে এ আদেশকে সুপারিশকৃত বুঝানো হয়। এ ধরনের আদেশের একটি উদাহরণ হলো, নির্দিষ্ট মেয়াদে ঋণদান ও গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তা লিখে রাখা প্রয়োজন (আল বাকারা ২ : ২৮২)। কিন্তু একই আয়াতে এরপরে বলা হয়েছে যে, 'তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কারোর ওপর নির্ভর করে তার সাথে কোনো কাজ করে তাহলে যার ওপর নির্ভর করা হয়েছে তার কর্তব্য হলো আমানতের হক যথাযথরূপে আদায় করা।' এ আয়াতে এ অর্থ প্রকাশ পেয়েছে যে, ঋণদাতা যদি ঋণ গ্রহীতাকে বিশ্বাস করে তাহলে তারা দলিল রচনার শর্ত ত্যাগ করতে পারে। এমন দাবির আরেকটি উদাহরণ দাস সংক্রান্ত কুরআনের বিধানে কেবলমাত্র সুপারিশ বুঝানো হয়েছে : 'আর তোমাদের মালিকানাধীনদের মধ্য থেকে যারা মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তির আবেদন করে তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হও (ফাকাতিবুহুম) যদি তাদের মধ্যে কল্যাণের সন্ধান পাও' (আল নূর, ২৪ : ৩২)। এ আয়াতের শেষাংশে পছন্দের উপাদান রয়েছে যা এর আদেশকে মানদুবে পরিণত করেছে। কিন্তু আয়াতের সঙ্গে এ ধরনের প্রমাণ অনুপস্থিত থাকলে সে ক্ষেত্রে অনেক সময় শরিয়াহর সাধারণ মূলনীতির আলোকে কুরআনের আদেশ মানদুবে মূল্যায়িত হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

অনেক সময় পৃথকভাবে আদেশ নয় বরং আকর্ষণীয় ভাষার মাধ্যমে মানদুব প্রকাশ করা হয়। নিম্নের হাদিসে এর উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায় :

من ترضا يوم الجمعة فيها ونعمت ، ومن
اغتسل أفضل

> শুক্রবার জুমার নামাজের জন্য ওজু করা ভালো কিন্তু গোসল করা উত্তম-(আফজাল)।[১৯]

এ ব্যাপারে প্রশ্ন উঠেছে যে, এক সময় মানদুব হিসেবে যাত্রা শুরু করার পর মানদুব হিসেবেই তা বহাল থাকবে না কি তা পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহতভাবে বাধ্যতামূলক থাকবে। হানাফীগণ মনে করেন, এক সময় মানদুব শুরু হলে, তা বাধ্যতামূলকে পরিণত হয় এবং তা অবশ্যই সম্পূর্ণ করতে হবে। এর উদাহরণ হলো, কেউ নফল রোজা পালন শুরু করল, কিন্তু তা পূর্ণ করতে পারল না, তাহলে সে তা পালনের ব্যাপারে দায়বদ্ধ থাকবে এবং পরে তাকে কাজা আদায় করতে হবে। কিন্তু শাফেয়ীগণের মতে, মানদুব কখনো ওয়াজিবে পরিণত হয় না এবং সব সময়ই মানদুব থাকে, তাই যে তা পালন শুরু করবে সে যখনই ইচ্ছে হবে তখনই তা ভঙ্গ করতে পারবে। মানদুব সম্পন্ন করতে না পারলে কাজা আদায় করার কোনো প্রয়োজন হবে না। এমতকেই সাধারণভাবে অগ্রাধিকার দেয়া হয়।[২০]

১.৩ *হারাম (নিষিদ্ধ)*

সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে, হারাম (মাহজুর বলেও পরিচিত) হচ্ছে কোনো কিছু না করার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার একটি বাধ্যতামূলক দাবি যা সুনির্দিষ্ট বা ধারণামূলক দলিলের ভিত্তিতে গঠিত হয়েছে। হারাম কাজ করা শাস্তিযোগ্য এবং তা থেকে বিরত থাকা সওয়াবের কাজ। কিন্তু হানাফীগণের মতে, হারাম হচ্ছে কোনো কিছু পরিত্যাগ করা সংক্রান্ত বাধ্যতামূলক দাবি যা সুনির্দিষ্ট দলিলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যদি এ দাবি ধারণামূলক দলিলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে তা হবে মাকরূহ তাহারিমী, হারাম নয়। হারাম ও মাকরূহ তাহরিমীর মধ্যে মিল রয়েছে, উভয় কাজ করা শাস্তিযোগ্য এবং তা করা থেকে বিরত থাকলে সওয়াব পাওয়া যাবে। কিন্তু এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে; তাহলো ইচ্ছাকৃতভাবে হারামকে অস্বীকার কুফরির দিকে ধাবিত করে, কিন্তু মাকরূহ তাহরিমী অস্বীকারের ক্ষেত্রে এমনটি হয় না।[২১]

কুরআন ও সুন্নাহতে নানাভাবে হারাম বিষয় বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে তার সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হয়েছে :

www.pathagar.com

প্রথমত: আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় হারাম বা তার ব্যুৎপন্ন শব্দ থাকতে পারে। এর উদাহরণ হিসেবে কুরআনের এ আয়াত তুলে ধরা যায় যাতে বলা হয়েছে : 'তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে (হুররিমাত আলাইকুম) মৃত জন্তু, রক্ত ও শূকরের মাংস' (সুরা আল মায়েদা, ৫ : ৩) এবং 'আল্লাহ তায়ালা ব্যবসায়কে হালাল কিন্তু সুদকে হারাম করেছেন' (সুরা বাকারা, ২ : ২৭৫)। অনুরূপভাবে হাদিসে বলা হয়েছে :

كل المسلم على المسلم حرام ، دمه وماله وعرضه

> প্রত্যেক মুসলমানের সব কিছু, তার রক্ত, তার সম্পত্তি ও তার সম্মান অন্য মুসলমানের জন্য নিষিদ্ধ (হারাম) করা হয়েছে।[২২]

দ্বিতীয়ত, অন্যান্য নিষিদ্ধ শব্দ ও পরিভাষার মাধ্যমেও হারাম বুঝানো হয়ে থাকে যাতে নির্দিষ্ট ধরনের আচরণ পরিহার করা প্রয়োজন হয়। এর উদাহরণ হলো, কুরআনের আয়াতে বলা হয়েছে : 'কাউকে হত্যা করো না (লা-তাকতুলু) কারণ, 'আল্লাহ তায়ালা জীবনকে পবিত্র হিসেবে সৃষ্টি করেছেন' (সুরা মায়েদা, ৫ : ৯০) এবং 'অবৈধভাবে একজন আরেকজনের সম্পত্তি গ্রাস করো না [লা তাকুলু]' (সুরা বাকারা, ২ : ১৮৮)।

তৃতীয়ত, নির্দিষ্ট ধরনের আচরণ পরিহার করার জন্য আদেশের আকারেও হারাম প্রকাশ করা হয়। এর উদাহরণ হলো, কুরআনের আয়াত, যাতে বলা হয়েছে মদপান ও জুয়া খেলা হচ্ছে শয়তানের কাজ তাই ইমানদারদের নির্দেশ হয়েছে 'তা পরিহার করো [ফা ইজতানিবুহু]' (সুরা আল মায়েদা ৫ : ৯০)।

চতুর্থত, 'এটি করা অনুমোদনযোগ্য নয়', বা 'এটি করা বেআইনি', এ ধরনের কথা উচ্চারণের মাধ্যমেও হারাম প্রকাশ পেতে পারে। এসব কথা যে প্রেক্ষাপটে বলা হয় তাতে তা পুরোপুরি নিষিদ্ধ এমন নির্দেশনা প্রকাশ পায়। এর উদাহরণ হলো কুরআনের এমন আয়াত যাতে ঘোষণা করা হয়েছে, 'স্ত্রীলোকদের উত্তরাধিকারী হয়ে বসা তোমাদের পক্ষে মোটেই হালাল নয়' (আন নিসা, ৪ : ১৯)। অথবা হাদিসে বলা হয়েছে :

لا يحل مال امرى مسلم إلا بطيب عن نفسه

> কোনো মুসলমানের সম্মতি ছাড়া তার মাল-সম্পত্তি গ্রহণ অন্য মুসলমানের জন্য হালাল নয় (লা ইয়াহিল্লু)।[২৩]

www.pathagar.com

পঞ্চমত, নির্দিষ্ট ধরনের আচরণের শাস্তির আইন প্রণয়নের ঘটনায়ও হারাম চিহ্নিত হয়ে থাকে। কুরআন ও সুন্নাহতে এ ধরনের অনেক দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়। এ ধরনের হারামের সবচেয়ে স্পষ্ট উদাহরণ হচ্ছে হাদ শাস্তিসমূহ। হাদ শাস্তিগুলোর বিষয় এর নাম থেকে আভাস দেওয়া হয়েছে যে শাস্তির পরিমাণ ও যে আচরণের কারণে এ দণ্ড দেয়া হয় তার ধরন উভয় সুনির্দিষ্ট। এ ছাড়া যে আয়াতে তাহরিম বুঝায় তাতে সুনির্দিষ্টভাবে শাস্তির উল্লেখ ছাড়াই নির্দিষ্ট কাজের কেবল তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করা হতে পারে। এভাবে কুরআনে নিম্নোক্ত ভাষায় ইয়াতিমের সম্পত্তি গ্রাস করার নিন্দা জানিয়ে তাকে হারাম করেছে : 'যারা ইয়াতিমদের মাল অন্যায়ভাবে হরণ করে তারা মূলত আগুন দিয়েই তাদের পেট ভর্তি করে এবং তারা নিশ্চয়ই জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে' (সুরা নিসা, ৪ : ১০)।

হারাম দুই ভাগে বিভক্ত : (ক) হারাম লি-জাতিহ বা 'যা নিজস্ব কারণেই হারাম', যেমন- চুরি, খুন, ব্যাভিচার, বিয়ে নিষিদ্ধ কোনো নারীকে বিয়ে করা, বিনা ওজুতে নামাজ আদায়, এসব কাজ সহজাত মহাঅপরাধ হওয়ায় তা নিষিদ্ধ বা হরাম করা করা হয়েছে। (খ) হারাম লিগাইরিহ বা 'যা অন্য কোনো কারণে হারাম।' কোনো কাজ মূলত বৈধ ছিল কিন্তু বিশেষ পরিস্থিতি সৃষ্টির কারণে তা হারামে পরিণত হয়েছে। এর উদাহরণ হলো, বিয়ে করতে ইচ্ছুক কোনো ব্যক্তির বিয়েকে বৈধতা দিতে কেবলমাত্র তাহলিলের উদ্দেশ্যে চুক্তিবদ্ধ বিয়ে, চুরি করা পোশাক পরে নামাজ আদায়, কোনো পুরুষের বাগদত্তা নারীর কাছে বাগদানের প্রস্তাব দেয়া। এসব কাজের সবই বৈধ ছিল কিন্তু সৃষ্ট পরিস্থিতির কারণে তা হারাম হয়ে গেছে। দুই প্রকার হারামের এ পার্থক্যের ফলে নিজ বোনকে বিয়ে করা, মৃত জন্তুর গোশত বিক্রি করার মতো হারাম লি-জাতিহ হচ্ছে মূলত বাতিল, অন্যদিকে নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের ঘটনা, যা বাহ্যত কারণ আরোপের ফলে ঘটে থাকে তাহলো ফাসিদ (বিধি বিরুদ্ধ কাজ) বাতিল নয় এবং এ কারণে তা তার অভীষ্ট উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারে। তাহলিলের উদ্দেশ্যে চুক্তিবদ্ধ বিয়ে স্পষ্টত নিষিদ্ধ কিন্তু তৎসত্ত্বেও তা বৈধভাবে অনুষ্ঠিত হয়। অনুরূপভাবে শুক্রবার জুমার সময় সম্পাদিত বিষয় চুক্তি হচ্ছে হারাম লি গাইরিহ এবং নিষিদ্ধ। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে, নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও এ বিক্রয় কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে, তবে ব্যতিক্রম হচ্ছেন হাম্বলী ও জাহেরিগণ, তারা এ ধরনের বিক্রয়কে বাতিল বলে গণ্য করেন।[২৪]

এ পার্থক্যের আরেকটি ফল হলো মারাত্মক পরিস্থিতিতে জরুরি প্রয়োজনের ক্ষেত্রে হারাম লি জাতিহ অনুমোদনযোগ্য নয়, ঐসব বিষয় ছাড়া যেগুলো জীবনের পাঁচটি মৌলিক বিষয়ের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করে। তাহলো– জীব, ধর্ম, জ্ঞান-বুদ্ধি, বিবেক, বংশধারা ও সম্পত্তি। এভাবে জীবন বাঁচানোর একান্ত তাগিদে কুফরির কথা

www.pathagar.com

উচ্চারণ ও মদপানের অনুমতি রয়েছে। অন্যদিকে কেবল জীবন রক্ষা নয় উপরন্তু দুঃখ-কষ্ট রোধের ক্ষেত্রেও হারাম লি গাইরিহর অবলম্বনে অনুমতি রয়েছে। এভাবে জীবনের জন্য হুমকি সৃষ্টি করেনি এমন অসুস্থতার ক্ষেত্রেও রোগীকে গোপনে মদ দেয়ার অনুমতি ডাক্তারকে প্রদান করা রয়েছে।[২৫]

দুই প্রকার হারামের মধ্যে পার্থক্য করার আরেকটি পথ হচ্ছে– যা কতিপয় আলেম উল্লেখ করেন, হারাম লি গাইরিহ্ এমন কাজের সমন্বয়ে গঠিত হয়, যা হারাম লি জাতিহর দিকে ধাবিত করে। এ দৃষ্টিতে এক ব্যক্তি কর্তৃক অন্য ব্যক্তির গোপন অঙ্গের দিকে তাকানো নিষিদ্ধ কারণ তা জেনার দিকে প্ররোচিত করে, যা হারাম। অনুরূপভাবে দুই বোনকে একসাথে বিয়ে করা হারাম। কারণ এতে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয় (কাত আল আরহাম) যা হারাম।[২৬]

১.৪ মাকরূহ (অপছন্দনীয়)

মাকরূহ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার এমন একটি দাবি যা মুকাল্লিফকে কোনো কিছু পরিহার করতে নির্দেশ দেয়; কিন্তু তা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ নয়। মাকরূহ হচ্ছে মানদুবের বিপরীত, এ অর্থ হলো মানদুব উপেক্ষা করা মাকরূহ। যেহেতু মানদুব কোনো বাধ্যতামূলক আইন গঠন করে না সেহেতু আমরা এ কথা বলতে পারি যে, মাকরূহ এমন কিছু, যা করার চেয়ে পরিহার করা অধিকতর পছন্দনীয়। কেউ মাকরূহ কাজ করলে শাস্তিযোগ্য হবে না। সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে, এতে তার ওপর কোনো নৈতিক দোষও আরোপ করা হবে না। হানাফীগণ দুই প্রকার মাকরূহর মধ্যে কেবল মাকরূহ তানজিহির ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেন, কিন্তু মাকরূহ তাহরিমির ব্যাপারে নয়। তাদের মতে, মাকরূহ তাহরিমি বর্জন না করলে নৈতিকভাবে দোষণীয় হতে হবে, কিন্তু এ জন্য কোনো শাস্তি হবে না। সব আলেম এ ব্যাপারে একমত যে, মাকরূহ পরিহার করা প্রশংসনীয় কাজ এবং এতে আল্লাহর নৈকট্য হাসিল হয়।[২৭]

কুরআন-সুন্নাহতে মাকরূহর সমর্থনে এমন বিষয়ের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় যা সুনির্দিষ্টভাবে মাকরূহ বলে শনাক্ত হয় অথবা এমন শব্দসমূহ দ্বারা চিহ্নিত হতে পারে যা মাকরূহর সমার্থক অর্থ প্রকাশ করে। উদাহরণ হিসেবে একটি হাদিস উদ্ধৃত করা যায়, যাতে বলা হয়েছে :

كره النبي الصلاة نصف النهار حتى تزول
الشمس إلا يوم الجمعة

'রসুল সা. দিবসের মধ্যভাগে সূর্য হেলে না পড়া পর্যন্ত নামাজ আদায়কে নিরুৎসাহিত করেন, কিন্তু এর ব্যতিক্রম হলো জুমার দিন

www.pathagar.com

> শুক্রবার'। হাদিসটিতে প্রকৃতপক্ষে যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তাহলো 'রসুল সা. অপছন্দ করতেন (কারিহা আল নবি) ওই নির্দিষ্ট সময়ে নামাজ আদায়।[২৮]

নিম্নের হাদিসটি মাকরূহর সমার্থক শব্দ ব্যবহারের একটি উদাহরণ। এতে বলা হয়েছে :

أبغض الحلال الى الله الطلاق

> অনুমোদনযোগ্য সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ (আবগাদ আল হালাল) হচ্ছে তালাক।[২৯]

নিষেধাজ্ঞার আকারেও মাকরূহ প্রকাশ করা হয়েছে, কিন্তু এর ভাষায় কেবলমাত্র তিরস্কারযোগ্যতা নির্দেশ করা হয়েছে। এর উদাহরণ হলো, কুরআনের আয়াত, মুমিনদের সম্বোধন করে তাতে বলা হয়েছে : 'এমন কথা জিজ্ঞাসা করো না, যা তোমাদের সামনে জাহির করে দিলে তোমাদের পক্ষে অসহ্য মনে হবে' (সুরা মায়েদা ৫ : ১০)। এ ধরনের বিবরণ নিম্নের হাদিসটিতে দেখতে পাওয়া যায় :

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك

> তোমাদের কাছে সন্দেহজনক মনে হলে তা পরিত্যাগ করে যা সন্দেহমুক্ত তা গ্রহণ করো।[৩০]

মাকরূহ হচ্ছে নিষিদ্ধের (তাহরিম) সর্বনিম্ন মাত্রা এবং এ অর্থে তা হালাল ও হারামের মধ্যবর্তী ধূসর এলাকায় পড়ে এমন কিছু সুবিধাজনক শ্রেণির বিষয় বা ঘটনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যেখানে ওই সব ঘটনাকে সুনির্দিষ্টভাবে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। তবে এগুলোর সমর্থনে যে দলিল রয়েছে তা এগুলোকে হারাম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিশ্চিত পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি।[৩১]

ইতোমধ্যে বলা হয়েছে যে, হানাফীগণ মাকরূহকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন, মাকরূহ তানজিহি ও মাকরূহ তাহরিমি। মাকরূহ তানজিহিকে অপছন্দনীয় বলে বিবেচনা করা হয়। যেমন- জামাতে নামাজ আদায়ের আগে তার পবিত্র বজায় রাখার উদ্দেশ্য পিঁয়াজ বা রসুন না খাওয়া অথবা নফল নামাজ আদায়ে অবহেলা করা। উদাহরণ হলো, জোহরের ফরজ নামাজের আগের অতিরিক্ত নামাজ। এ ধরনের মাকরূহ হারাম নয় বরং মুবাহর কাছাকাছি। এটি না করা শাস্তিযোগ্য নয়, কিন্তু তা করলে সওয়াব পাওয়া যাবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমগণ সাধারণভাবে মাকরূহর যে বিবরণ দিয়েছেন হানাফীগণের মাকরূহ তানজিহি তার অনুরূপ। সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম মাকরূহর গুরুত্ব সম্পর্কে যে কথা বলেছেন তাহলো মাকরূহর

www.pathagar.com

কাজ করা শাস্তিযোগ্য নয় তবে তা থেকে বিরত থাকা প্রশংসনীয়। অন্যদিকে মাকরূহ তাহরিমি বা 'নিষিদ্ধের মাত্রায় অপছন্দনীয় কাজ' হচ্ছে হারামের কাছাকাছি। কোনো কাজ সুনির্দিষ্টভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলে তা হারাম বোঝাবে অন্যথায় তা মাকরূহ তাহরিমি হবে। এর উদাহরণ হলো, পুরুষের জন্য স্বর্ণের অলঙ্কার বা সিল্কের পোশাক পরা যা আহাদ (বিচ্ছিন্ন) হাদিসের দলিলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই দু'টি বিষয় উল্লেখের সময় হাদিসটিতে আরো বলা হয় :

هذان حرامان لرجال أمتي حلالان لنسائهم

আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য এগুলো হারাম, কিন্তু নারীদের জন্য বৈধ (হালাল)।[৩২]

অনুরূপভাবে কোনো ব্যক্তির জন্য মাকরূহ তাহরিমি হচ্ছে এমন কিছু কেনার জন্য প্রস্তাব দেয়া যা কেনার জন্য ইতোমধ্যে একজন প্রস্তাব দিয়েছে। হাদিসে এ ধরনের ক্রয় ঠিক ওই ভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে যেভাবে একজন পুরুষের বাগদত্তা নারীর কাছে বাগদানের প্রস্তাব দেয়াকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[৩৩]

لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب

على خطبة إلا ان يأذن له

(সুনানে আবু দাউদ-২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫৬, হাদিস নম্বর ২০৭৫)

'কোনো ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের দামাদামির ওপর নিজে দামাদামি না করে এবং তার ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তাবের ওপর নিজেকে প্রস্তাব না দেয়।'

যেহেতু উপরিউক্ত দু'টি হাদিসই আহাদ হাদিস যার যথার্থতা সংশয়মুক্ত নয়। তাই এ নিষেধাজ্ঞা হারাম থেকে নামিয়ে মাকরূহ করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে হানাফী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের মধ্যকার মতপার্থক্যের বিষয় মাকরূহ যে দলিলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার প্রকৃতির সাথে সম্পর্কিত। যখন কোনো নিষেধাজ্ঞা আল্লাহর কাছ থেকে নির্দেশমূলক দাবির আকারে প্রকাশ করা হয় কিন্তু তার যথার্থতা বা অর্থের ক্ষেত্রে কিছুটা সংশয় থাকলে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম তাকে হারাম শ্রেণিভুক্ত বলে গণ্য করেছেন। তবে হানাফীগণ একে বলেছেন, মাকরূহ তাহরিমি। হানাফীগণের মাকরূহকে দুই ভাগে বিভক্ত করার বিষয় তাদের ওয়াজিব ও ফরজকে বিভক্ত করার বৈশিষ্ট্যের অনুরূপ।[৩৪]

www.pathagar.com

১.৫ মুবাহ (অনুমোদনযোগ্য)

মুবাহকে মুকাল্লাফের আচরণ সম্পর্কিত আল্লাহ তায়ালার নির্দেশনা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, যাতে তাকে কোনো কিছু করা বা না করার সুযোগ প্রদান করা হয়েছে, (একে হালাল ও জায়েজ হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে)। খোদায়ী নির্দেশনা স্পষ্ট নসের আকারে, যেমন কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে জানানো হতে পারে যাতে খাদ্যদ্রব্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'আজ তোমাদের জন্য সমস্ত পাক জিনিসই হালাল (উহিল্লা) করে দেয়া হয়েছে...' (সুরা আল মায়েদা ৫ : ৬)। অন্যভাবে বলা যায়, এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মুকাল্লাফ যদি নির্দিষ্ট পন্থায় কাজ করার ইচ্ছে পোষণ করে তাহলে তাতে তার পাপ ও দোষ হবে না বা কোনো দায়ভারও বহন করতে হবে না। উদাহরণ হিসেবে বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার অনুমোদনযোগ্যতা সম্পর্কে বলা যায়। কুরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'তোমরা যদি কোনো মহিলার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দাও তাহলে তা তোমাদের জন্য দোষণীয় হবে না [লা জুনাহা 'আলাইকুম]' (সুরা আল বাকারা ২ : ২৩৫)। অনুরূপভাবে অতীব জরুরি অবস্থায় পাপ কাজ করার অনুমতি কুরআনে দেয়া হয়েছে, 'তবে কোনো ব্যক্তি যদি অক্ষমতার মধ্যে অবস্থান করে এবং এ অবস্থায় আইন ভঙ্গ করার কোনো প্রেরণা ছাড়াই বা প্রয়োজনের সীমা না পেরিয়ে এর মধ্য থেকে কোনোটা খায় সেজন্য তার কোনো গোনাহ হবে না [ফালা ইসমা 'আলাইহ] (সুরা আল বাকারা ২ : ১৭৩)।[৩৫]

অনেক সময় কুরআনের কোনো আদেশ কেবলমাত্র অনুমোদনযোগ্যতা বুঝায়। আলোচ্য আচরণের প্রকৃতি অথবা সংশ্লিষ্ট অন্য প্রমাণ থেকে বিষয়টি এমন হওয়ার আভাস প্রকাশিত হয়। এর একটি উদাহরণ হলো, কুরআনের আয়াত যাতে মুসল্লিদের শুক্রবার জুমার নামাজ শেষে 'জমিনে ছড়িয়ে পড়ার' নির্দেশ দেয়া হয়েছে (সুরা আল জুম্মাহ ৬২ : ১০)। ইমানদারকে 'জমিনে ছড়িয়ে পড়ার' জন্য এখানে আদেশ দেয়া হলেও আদেশের প্রকৃতি এবং যে ধরনের কর্মকাণ্ডের সাথে তা সম্পর্কিত তাতে এটি বোঝা যাচ্ছে যে, এ আদেশে কেবলমাত্র অনুমোদনযোগ্যতা বুঝানো হয়েছে।

নির্দিষ্ট ধরনের আচরণের ফল কী হবে সে ব্যাপারে আইনে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত পাওয়া না গেলে সে ক্ষেত্রে ইস্তিশাব আল আসল (অব্যাহত থাকার অনুমান) মতবাদ অনুযায়ী অনুমোদনযোগ্যতা (ইবাহা) মূল অবস্থায় বহাল থাকবে এবং তা অব্যাহত রয়েছে বলে অনুমান করা হবে। এ অনুমানের সমর্থন দেখতে পাওয়া যায় কুরআনের আয়াতে যাতে মানবজাতিকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা 'তোমাদের কল্যাণের জন্য পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টি করেছেন' (সুরা

www.pathagar.com

বাকারা, ২ : ২৯)। এর গূঢ় অর্থ থেকে বোঝা যায় যে, পৃথিবীর সব কিছু প্রথমত, মানবজাতির ব্যবহার ও কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে মুবাহ না হলে আলোচ্য কল্যাণ লাভ সম্ভব হবে না।

মুবাহকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণির মুবাহ হচ্ছে যার ওপর কেউ আমল করলে অথবা না করলে কারোর কোনো ক্ষতি হয় না। যেমন- খাওয়া, শিকার করা অথবা মুক্ত বাতাসে হাঁটা। দ্বিতীয় শ্রেণির মুবাহ যা করলে ব্যক্তির কোনো ক্ষতি হয় না, যদিও তা করা নিষিদ্ধ। এর মধ্যে রয়েছে, নিষিদ্ধ কাজগুলো যা আল্লাহ তায়ালা অতীব জরুরি প্রয়োজনে করার অনুমতি দিয়েছেন। যেমন- ভীতিকর অবস্থায় পড়ে গেলে কুফরির কথা উচ্চারণ অথবা জীবন বাঁচাতে মরা জন্তুর গোশত খাওয়া। তৃতীয় শ্রেণির মুবাহ প্রকৃতপক্ষে পৃথক কোনো মুবাহ নয়। ভালো বিকল্পের অভাবে একে মুবাহর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ শ্রেণির মুবাহ এমন বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত, যা এক সময় বাস্তবে করা হতো কিন্তু পরে তা নিষিদ্ধ করা হয় এবং অনুশর্ত আরোপ করে এ নিষিদ্ধের আগে যারা এর সাথে জড়িত ছিল তাদের তার দায় থেকে মুক্ত করে দেয়া হয়। কুরআনে এভাবে কতিপয় আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ করা হয়। এরপর ওই আয়াতেই বলা হয়েছে, 'ওই ধরনের বিয়ের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হচ্ছে যা অতীতে সংঘটিত হয়েছিল' (সুরা নিসা ৪ : ২২)। অনুরূপভাবে রসুল সা.-এর মদিনায় হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত মদপান নিষিদ্ধ ছিল না, (সুরা আল শামসের আয়াত ৫ : ৯০) নাজিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তা মুবাহর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ আয়াতে মদ পুরোপুরি হারাম করা হয়।[৩৬]

আল গাজ্জালী মুবাহর ব্যাখ্যায় বলেছেন, শিশু, পাগল বা প্রাণীর কাজের ক্ষেত্রে মুবাহ পরিভাষা প্রয়োগ হবে ভুল, তেমনি আল্লাহর কাজকেও মুবাহ বলা সঠিক হবে না। ইসলাম আগমনের পূর্বে যেসব কাজ করা হতো ও ঘটনা সংঘটিত হতো তাকেও মুবাহ বলা যাবে না। এ ব্যাপারে আমাদের মত হলো- এগুলো পরিত্যক্ত বিষয় (তার্ক) যার সুস্পষ্ট অর্থ হলো, ওই ধরনের কর্মকাণ্ড আদৌ মূল্যায়ন করা যায় না। আল গাজ্জালী আরো বলেন, সঠিক মুবাহ সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার প্রকাশ্য অনুমতির সমন্বয়ে গঠিত হয় যাতে কোনো কাজ করা অথবা তা করা থেকে বিরত থাকার সুযোগ দেয়া হয়েছে, যা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ অথবা পার্থিব জীবনে সম্ভাব্য কল্যাণ অর্জন বা ক্ষতির থেকে রক্ষা পাওয়া উভয় দিক বিবেচনায় অনুমোদনযোগ্য।[৩৭]

উসুলের আলেমগণ মুবাহকে সুনির্দিষ্টভাবে একটি হুকম শারয়ী বলে বিবেচনা করে থাকেন, যদিও নিছক সম্ভাবনার ভিত্তিতে একে আল হুকম আল তাকলিফীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কারণ মৌলিকভাবে পাঁচ প্রকার সুনির্দিষ্ট আইনের একটি হিসেবে

www.pathagar.com

মুবাহতে কোনো দায়দায়িত্ব (তাকলিফ) নেই। হানাফীগণ ওয়াজিব ও মাকরূহর উপবিভাগের ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের সাথে ভিন্ন মত পোষণ করলেও মুবাহর ক্ষেত্রে তারা তা করেননি।

ওয়াজিব ও মাকরূহর দু'টি উপবিভাগের কথা স্মরণ রেখে হানাফীগণ হুকম আল তাকলিফকে ৭টি ভাগে বিভক্ত করেছেন। অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমগণ একে মাত্র পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন।

২. ঘোষণামূলক আইন (আল হুকম আল ওয়াদয়ী)

ঘোষণামূলক আইন খোদার তরফ থেকে নির্দেশনা বলে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যা কোনো কিছুকে অন্য কিছুর কারণ, (সাবাব), শর্ত (শার্ত) বা অন্তরায় (মানি) হিসেবে কার্যকর হয়েছে। ব্যভিচারের শাস্তি সংক্রান্ত কুরআনের আয়াতে কারণের দৃষ্টান্ত রয়েছে, যাতে খোদ ব্যভিচারের কাজকে এর শাস্তির কারণ হিসেবে আইনে পরিণত করা হয়েছে (সুরা বাকারা, ২ : ২৪)। শর্ত সংক্রান্ত ঘোষণামূলক আইনের দৃষ্টান্ত কুরআনের হজ সংক্রান্ত আয়াতে দেখতে পাওয়া যায়, যাতে বলা হয়েছে, 'লোকদের ওপর খোদার এ অধিকার রয়েছে যে, এ ঘর পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য যার রয়েছে সে যেন হজ সম্পন্ন করে' (সুরা আলে ইমরান, ৩ : ৯৭)। ওপরের উভয় আয়াত প্রকৃতপক্ষে সুনির্দিষ্ট আইন, সেই সাথে ঘোষণামূলক আইনও, এ দুইয়ের সমন্বয়ে তা গঠিত হয়েছে। প্রথম আয়াতের সুনির্দিষ্ট আইন হচ্ছে, ব্যভিচারীকে অবশ্য ১০০ ঘা কোড়া মারতে হবে এবং দ্বিতীয় আয়াতে নিজেরই কর্তব্য হচ্ছে হজ পালন করা। প্রথম আয়াতের ঘোষণামূলক আইনের কারণ হলো ব্যভিচার করা, আর এর পরিণাম হচ্ছে শাস্তি। দ্বিতীয় আয়াতের আইন কার্যকর করতে হলে শর্ত অবশ্যই থাকতে হবে। এভাবে দ্বিতীয় আয়াতে হজ পালনের জন্য ব্যক্তির সফর করার সামর্থ্যকে শর্ত হিসেবে কার্যকর করা হয়েছে। ঘোষণামূলক আইনের আরো স্পষ্ট উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায় নিম্নোক্ত হাদিসে। এতে বলা হয়েছে :

لا نكاح الا بساهدين

দুইজন সাক্ষী ছাড়া বিয়ে হবে না।[৩৮]

তাই বিয়ে বৈধ হওয়ার জন্য দুইজন সাক্ষী থাকা হচ্ছে একটি শর্ত। সবশেষে অন্তরায় সংক্রান্ত ঘোষণামূলক আইনের উদাহরণ নিম্নোক্ত হাদিসে দেখতে পাওয়া যায়, এতে বলা হয়েছে :

لا وسية لوارث

উত্তরাধিকারীকে কোনো অসিয়ত করা যাবে না।[৩৯]

www.pathagar.com

এখানে স্পষ্টত : অসিয়তকারী ব্যক্তি ও তার সম্পত্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির মধ্যকার আত্মীয়তার সম্পর্ক অসিয়তের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। অনুরূপভাবে আরেকটি হাদিসে এ আইনের বিধান করে দেয়া হয়েছে :

لا يرث القاتل

> 'হত্যাকারী উত্তরাধিকারী হতে পারবে না'। এখানে হত্যার ঘটনা ওয়ারিশ হওয়ার পথে অন্তরায়ের সৃষ্টি করেছে।[৪০]

সুনির্দিষ্ট আইন কার্যকর করার ক্ষমতা সাধারণত মুকাল্লাফের এখতিয়ারে থাকে। উদাহরণ হলো, মুকাল্লাফের প্রতি নামাজ ও জাকাত সংক্রান্ত দাবি, উভয়ই আদায় করা তার সামর্থ্যের মধ্যে রয়েছে। অন্যদিকে ঘোষণামূলক আইন মুকাল্লাফের ক্ষমতার মধ্যে বা বাইরে থাকতে পারে। এর উদাহরণ হলো, দিনের নির্দিষ্ট সময়ের আগমন যা নামাজের কারণ (সাবাব) হয়, যা মুসল্লিদের ক্ষমতা ও এখতিয়ার বহির্ভূত।[৪১]

সুনির্দিষ্ট আইনের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ঘোষণামূলক আইনের কাজ হলো ব্যাখ্যামূলক। ঘোষণামূলক আইন সুনির্দিষ্ট আইনের বিভিন্ন উপাদানের ব্যাখ্যা প্রদান করে। এভাবে ঘোষণামূলক আইন নির্দিষ্ট অবস্থা বা ঘটনার সাথে সুনির্দিষ্ট আইনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার কারণ, শর্ত, অন্তরায়ের ব্যাপারে আমাদের অবহিত করে। এর উদাহরণ হলো, ঘোষণামূলক আইনের দ্বারা আমরা জানতে পারি যে, বিক্রয় চুক্তির ক্ষেত্রে প্রস্তাব পেশ ও গ্রহণ ক্রেতার মালিকানা স্বত্ব সৃষ্টির কারণ হয়, এভাবে তালাক বৈবাহিক অধিকার ও দায়দায়িত্বের পরিসমাপ্তির কারণ হয় এবং কোনো ব্যক্তির মৃত্যু তার সম্পত্তির ওপর ওয়ারিশদের অধিকার প্রতিষ্ঠার কারণ হয়। অনুরূপভাবে ঘোষণামূলক আইনের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, ওপরের হিসেবে স্বেচ্ছায় সম্পত্তি দান (হেবা) ও সেবামূলক কাজে সম্পত্তি দান করার (ওয়াকফ) জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক পরিপক্বতা বা সাবালকত্ব হচ্ছে শর্ত।[৪২]

শরিয়াহর বিধিবিধানকে তাকলিফী ও ওয়াদয়ীতে বিভক্ত করার মৌলিক ধারণা আধুনিক পশ্চিমা আইনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়েছে। এর উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আমরা ভাড়া আইন পড়লে দেখতে পাই যে, তার একটি ধারণা মতে, ভাড়া চুক্তি অনুযায়ী ভাড়াটিয়াকে ভাড়া পরিশোধ করতে হয়। এ হচ্ছে হুকম তাকলিফ যা একটি আদেশের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। অনুরূপভাবে বাণিজ্যিক কাজে ভাড়াটিয়া বাড়ি ব্যবহার করতে পারলে যে শর্ত থাকবে তা একটি দাবি বা একটি নিষেধাজ্ঞার সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে এবং যদি এমন একটি ধারা থাকে যে, ভাড়াটিয়া সাবলেট দিতে পারবে– তাহলে তা হবে একটি সুবিধা যা ভাড়াটিয়া ইচ্ছে করলে ব্যবহার

www.pathagar.com

করতে পারে আবার নাও পারে। একথা বলা নিস্প্রয়োজন যে, এ ধরনের চুক্তির ক্ষেত্রে দুইপক্ষ ইচ্ছা করলে নির্দিষ্ট শর্ত ও অন্তরায় সংযুক্ত করতে পারে।[৪৩]

যেমনটি ওপরে বলা হয়েছে যে, ঘোষণামূলক আইনকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে তিনটি কারণ, শর্ত ও অন্তরায় সম্পর্কে ইতোমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। এর সাথে সংযুক্ত অন্য দুই প্রকার ঘোষণামূলক আইন হলো, আজিমাহ (কঠোর আইন) যা রুখসার (সুবিধাজনক আইন) বিপরীত এবং বৈধ (সহিহ) যা অবৈধের (বাতিল) বিপরীত। আল হুকম আল ওয়াদয়ীর আওতায় প্রথম তিনটি শ্রেণিকে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয় এর সংজ্ঞা থেকে স্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু আল হুকম আল ওয়াদয়ীর আওতায় শেষ দুই প্রকারকে আজিমাহ ও রুখসাহ এবং সহিহ ও বাতিলকে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রদানের দরকার হতে পারে। এ প্রসঙ্গে এ কথা বলা উত্তম হবে যে ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত প্রায় প্রতিটি সুবিধা নির্দিষ্ট কারণের ভিত্তিতে মানদুব করা হয়েছে, ওই সুবিধা ব্যবহার করতে হলে ওই কারণ অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে। এর উদাহরণ হলো, রোজা ও নামাজের ক্ষেত্রে সুবিধা প্রদানের কারণ হচ্ছে সফর, অসুস্থতা অথবা কষ্ট লাঘব। ঘোষণামূলক আইনে উপবিভাগ হিসেবে সহিহ ও বাতিলে বিভক্ত করা প্রসঙ্গে আরো বলা যায় যে, হুকমের বৈধতার শর্তাবলি পূরণ করা হলে হুকম বৈধ হবে এবং এসব শর্ত পূরণ না করা হলে তা অবৈধ হবে। সংক্ষেপে এটুকু বলা যায় যে, সবশেষের দু'টি বিভাজন মৌলিকভাবে শর্ত ও কারণ সম্পর্কিত হওয়ায় তাকে ঘোষণামূলক আইনের শ্রেণি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[৪৪]

আমরা এখন আল হুকম আল ওয়াদয়ীর পাঁচটি বিভাগ সম্পর্কে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করব।

২.১ *কারণ (সাবাব)*

সাবাব হচ্ছে গুণ বিশেষ যা স্পষ্ট ও স্থির (ওয়াসফ জাহির ওয়া মুনাদাবাত)। আল্লাহ তায়ালা একে এমনভাবে হুকমের সূচক হিসেবে শনাক্ত করেছেন যাতে হুকমের উপস্থিতির জন্য এর উপস্থিতি জরুরি। আর এর অনুপস্থিতির অর্থ হবে হুকুম অনুপস্থিত। সাবাব হচ্ছে এমন কাজ হতে পারে যা মুকাল্লিফের ক্ষমতার মধ্যে থাকে। যেমন- খুন ও চুরি যা তাদের অবস্থা অনুযায়ী যথাক্রমে খুনের বদলে খুন (কিসাস) ও হাদ দণ্ডের কারণ হয়। অন্যদিকে সাবাব মুকাল্লিফের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূতও হতে পারে। যেমন- নাবালকত্ব ছোট শিশু ও তার সম্পত্তির অভিভাবকত্বের কারণ হয়ে থাকে। মুকাল্লিফের ক্ষমতার ভেতরে বা তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেখানে সাবাব উপস্থিত থাকুক না কেন, এর ফল (যেমন- মুসাব্বাব) এমনকি মুকাল্লিফ না চাইলেও স্বাভাবিকভাবে উপস্থিত থাকবে। এর উদাহরণ হলো, কোনো ব্যক্তি যদি

www.pathagar.com

তার স্ত্রীকে প্রত্যাহারযোগ্য তালাক দেয় তাহলে তার সাথে পুনরায় বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের অধিকার তার থাকবে, এমনকি সে প্রকাশ্যে ওই অধিকার অস্বীকার করলেও। অনুরূপভাবে কোনো ব্যক্তি বিয়ের চুক্তি করলে সে তার স্ত্রীকে মোহরানা প্রদান ও ভরণপোষণের ব্যয়ভার বহন করতে বাধ্য থাকবে, এমনকি সে ওই চুক্তিতে স্পষ্ট ভাষায় এগুলোর বিপরীত শর্ত সংযুক্ত করলেও। আল্লাহ তায়ালা কখনো কোনো কিছুকে কারণ হিসেবে শনাক্ত করলে আল্লাহ তায়ালার ফরমান গুণে তার ফল কার্যকর হবে, মুকাল্লিফ সেরূপ চাক বা না চাক তাতে কিছু যায় আসে না।[৪৫]

২.২ *শর্ত (শার্ত)*

শর্ত বলতে স্পষ্ট ও স্থির গুণ বুঝানো হয়ে থাকে। যার অনুপস্থিতি হুকমের অনুপস্থিতিকে অপরিহার্য করে তোলে, কিন্তু উপস্থিতিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এর উদ্দেশ্য (মাশরুত) সংঘটিত হয় না। উদাহরণ হলো, বিধিসঙ্গত বিয়ে হচ্ছে তালাকের পূর্বশর্ত কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, বৈধ বিয়ে অবশ্যই তালাকের পথ প্রশস্ত করবে। অনুরূপভাবে নামাজের অত্যাবশ্যকীয় শর্ত হচ্ছে ওজু, কিন্তু ওজু থাকলেই নামাজ আদায় করা জরুরি নয়।

স্বাভাবিকভাবে শর্ত হচ্ছে কারণের সম্পূরক এবং একে পূর্ণ ফল প্রদান করে। উদাহরণ হলো, খুনের বদলে খুন, অবশ্য এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে পরিকল্পিত ও শত্রুতাবশত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করা। বিয়ের চুক্তি যৌন মিলন উপভোগকে বৈধতা প্রদান করে অথবা এর কারণ ঘটায়। অবশ্য এর সাথে শর্ত হচ্ছে দুইজন সাক্ষী এ বিয়ের সাক্ষ্য দেবে। প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করা ছাড়া চুক্তির আইনগত ফলাফল পুরোপুরিভাবে অর্জন করা সম্ভব হয় না।

আল্লাহ তায়ালা অথবা মুকাল্লিফ শর্ত উপস্থাপন করতে পারে। যখন আল্লাহ তায়ালা কোনো শর্ত নির্ধারণ করেন তখন তাকে বলা হয় শার্ত শারয়ী বা 'আইনগত শর্ত'। কিন্তু যখন মুকাল্লিফ শর্ত উপস্থাপন করে তখন তাকে বলা হয় শার্ত জলী বা 'তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ভাবিত শর্ত। পূর্বেরটির উদাহরণ হলো, বিয়ের চুক্তির সাক্ষীগণ, আর পরেরটির উদাহরণ হলো বিয়ের চুক্তিতে স্বামী-স্ত্রীর কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাস করার শর্ত উপস্থাপন।

রুকনের (স্তম্ভ, অত্যাবশ্যকীয় শর্ত) সাথে শর্তের পার্থক্য রয়েছে। রুকনে কোনো জিনিসের নির্যাস অন্তর্ভুক্ত থাকে। এর অর্থ হলো আইন বা হুকম তার রুকনের অনুপস্থিতিতে টিকে থাকতে পারে না। যখন রুকনের সমগ্র বা এমনকি এর একাংশ অনুপস্থিত থাকে তখন হুকম পুরোপুরি অকার্যকর হয়ে পড়ে, এর ফলে ওই রুকন বাতিল হয়ে যায়। অন্যদিকে শর্ত হুকমের নির্যাসের অংশ নয়, বরং সম্পূরক অংশ। উদাহরণ হলো, রুকু ও সিজদা হচ্ছে নামাজের অত্যাবশ্যকীয় শর্ত (রুকন) এবং

www.pathagar.com

নামাজের একান্ত নির্যাসের অংশ কিন্তু ওজু হচ্ছে নামাজের একটি শর্ত, কারণ এটি হচ্ছে একটি গুণ যার অনুপস্থিতিতে নামাজ বিঘ্নিত হয়, কিন্তু তা তার নির্যাসের অংশ নয়।[৪৬]

২.৩ *অন্তরায় (মানি)*

অন্তরায়কে একটি কাজ বা গুণ বুঝায় যার উপস্থিতি হুকম বা হুকমের কারণকে বাতিল করে দেয়। উভয় ক্ষেত্রে ফলাফল একই, অর্থাৎ মানির উপস্থিতির অর্থ হচ্ছে হুকমের অনুপস্থিতি। উদাহরণ হলো, ভিন্ন ধর্ম ও হত্যাকাণ্ড উভয় বৈধ উত্তরাধিকারী ও তার পরলোকগত আত্মীয়ের উত্তরাধিকার হওয়ার পথে অন্তরায়। প্রকৃতপক্ষে তাদের মধ্যে আত্মীয়তার বৈধ সম্পর্ক (কারাবাহ) বজায় থাকতেও পারে। কিন্তু অন্তরায়ের উপস্থিতির কারণে এখানে হুকম অর্থাৎ উত্তরাধিকার হওয়ার বিষয়টি অনুপস্থিত হয়ে গেছে।

কারণ (সাবাব) অথবা খোদ হুকমের ওপর মানির প্রভাবের ভিত্তিতে একে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথমত, যে মানি এ অর্থে কারণকে প্রভাবিত করে যে এর উপস্থিতির জন্য কারণ বাতিল হয়ে যায়। উদাহরণ হলো- জাকাত দানযোগ্য ব্যক্তির ঋণী থাকা। বস্তুতপক্ষে এখানে ঋণ জাকাতের কারণ সম্পত্তির মালিক হওয়ার অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঋণী ব্যক্তি অসচ্ছল অবস্থায় থাকায় তাকে জাকাত দেয়ার জন্য তার আদৌ কোনো সম্পত্তি রয়েছে বলে বিবেচনা করা হয় না। এভাবে যখন কারণ বাতিল হয়ে যায় অনুরূপ হুকম জাকাত দানের কর্তব্য বাতিল হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, এমন মানি রয়েছে যা হুকমকে প্রভাবিত করে। এ ধরনের অন্তরায়ের উপস্থিতি সরাসরি হুকমকে বাতিল করে দেয়। এমনকি কারণ ও শর্ত উভয় উপস্থিত থাকার পরও। এর উদাহরণ হলো, পিতৃত্ব যা কিসাসের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদি কোনো পিতা ছেলেকে হত্যা করে তাহলে তার মৃত্যুদণ্ড হবে না, তাকে অবশ্য অন্যভাবে শাস্তি দেয়া যেতে পারে। ইমাম মালিকী ব্যতীত সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে, পিতৃত্ব এভাবে কিসাসের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে যদিও এখানে কিসাসের কারণ হলো খুন এবং শর্ত হলো বৈরিতা ও ইচ্ছাকৃত খুন, উভয়ই বিদ্যমান রয়েছে। অন্যদিকে ইমাম মালিকী মনে করেন, ইচ্ছাকৃতভাবে সন্তানকে হত্যার জন্য পিতাকেও কিসাসের শাস্তি দেয়া যেতে পারে।[৪৭]

২.৪ *দৃঢ় আইন (আজিমাহ) ও নমনীয় আইন (রুখসাত)*

যে আইন বা হুকমে তার প্রাথমিক ও তীব্র কঠোরতা লাঘব করার মতো কোনো পরিস্থিতির উল্লেখ থাকে না যাতে এর মূল শক্তি নমনীয় অথবা পুরোপুরিভাবে স্থগিত হতে পারে, তাই হলো আজিমাহ। অন্য কথায় এ হচ্ছে এমন আইন যা

www.pathagar.com

আল্লাহ তায়ালা প্রথমত, প্রতিপালন দেখতে চেয়েছেন। এর উদাহরণ হলো, সালাত, জাকাত, হজ, জিহাদ ইত্যাদি যা আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক সুস্থ ও বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য পালনের নির্দেশ দিয়েছেন, এসবই আজিমাহর অন্তর্ভুক্ত। অপরদিকে কোনো আইন বা হুকম যখন নমনীয় (সুবিধাজনক) পরিস্থিতির সাথে সংযুক্ত থাকে তখন তা রুখসাত হবে। আজিমাহ যেখানে আইনের সাধারণ অবস্থা রুখসাত সেখানে ব্যতিক্রমী প্রকাশ, যদি এ ধরনের ব্যতিক্রমী অবস্থা থাকে তাহলে আল্লাহ তায়ালা কঠিন অবস্থায় সুবিধা প্রদান ও নমনীয়তা অবলম্বনের লক্ষ্যে তা মঞ্জুর করেন। এভাবে যে আইনে রমজান মাসে সফরকালে রোজা ভঙ্গের সুবিধা মঞ্জুর করা হয়েছে, তা হচ্ছে প্রত্যেকের জন্য রোজা পালনের অবস্থাটি স্বাভাবিক নিয়মের একটি ব্যতিক্রম। এ সুবিধাজনক আইন কেবলমাত্র সফরকালে বৈধ, সফর শেষ হলেই পুনরায় আজিমাহ অবশ্যই পালন করতে হবে। অনুরূপভাবে কোনো মুসলমান যদি তার ইমান পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয় তাহলে তা করার অনুমতি রয়েছে, যদিও দৃঢ় আইনে তাকে আমৃত্যু অবশ্যই ইমানের ওপর অটল থাকতে হবে। এ ঘটনায় অব্যাহতি প্রদানের বিষয় কোনো ব্যক্তির জীবন বাঁচানোর অধিকারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কুরআনে (সুরা নাহল, ১৬ : ১০৬) যা স্পষ্ট ভাষায় মঞ্জুর করা হয়েছে। এ আয়াতে কঠিন পরিস্থিতিতে কুফরির শব্দ উচ্চারণ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। দৃঢ় আইন হয় আদেশ অথবা নিষেধের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। তাই হত্যা, চুরি, জিনা, মদপান ইত্যাদি নিষিদ্ধ বিষয়ের সবই কুরআনের আজিমাহর দৃষ্টান্ত।[৪৮]

আজিমাহ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার আদেশ, যা পালন করা মুকাল্লিফের জন্য বাধ্যতামূলক। আর রুখসাত হচ্ছে ওই আদেশ সম্পর্কিত সুবিধার প্রকাশ। এ দু'টি বিষয় আন্তঃনির্ভরশীল, প্রথমত, আজিমাহ থাকলেই কেবল রুখসাতের অস্তিত্ব বজায় থাকতে পারে। উদাহরণ হলো, আল্লাহ তায়ালা সাওয়াল (রমজানের পরের মাস) মাসকে মুসলমানের জন্য রোজা পালন বাধ্যতামূলক করেননি। এটি কোনো সুবিধা নয়, কারণ প্রথমত এখানে তা পালনের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। অনুরূপভাবে খাদ্য ও পানীয় সম্পর্কে ইবাহার স্বাভাবিক অবস্থা রুখসাত নয়, কিন্তু বিশেষ পরিস্থিতিতে হারাম গোশত খাওয়ার অনুমতি হচ্ছে রুখসাত। পানির অভাবে তায়াম্মুমের (সুপারিশ বালু বা মাটি দিয়ে শুষ্ক ওজু পালন) অনুমোদনকে রুখসাত বলা সঠিক হবে না। যখন পানি পাওয়া যাবে না তখন দ্বিতীয়ত, সঠিকভাবে ওজু করা সম্ভব হবে না। কিন্তু চরম ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় ওজুর বিকল্প হিসেবে তায়াম্মুম করা হবে রুখসাত। এখানে দেখার বিষয় হচ্ছে রুখসাতে ব্যক্তি একটি বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণে অবশ্যই সক্ষম হবে।[৪৯]

www.pathagar.com

চার প্রকারের রুখসাত সংঘটিত হয়। প্রথমত, জরুরি প্রয়োজনের কারণে নিষিদ্ধ বা হারাম কাজ করার অনুমতি দান; যেমন- মৃত জন্তুর গোশত খাওয়া এবং চরম অনাহার অথবা পিপাসার্ত অবস্থায় মদপান করা। দ্বিতীয়ত, ওয়াজিব স্থগিতকরণের আকারে রুখসাত হয়, যখন ওয়াজিব পালন অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়, তখন এটি হয়। যেমন- সফরকালে কসর নামাজ (সংক্ষিপ্ত আকারে নামাজ আদায়) অথবা সফরকালে রোজা না রাখা। তৃতীয়ত, লেনদেনের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে অনানুমোদিত ব্যক্তিকে বৈধতা প্রদানের আকারে রুখসাত হয়। যেমন- ইজারা ও ভাড়া দেয়া, অগ্রিম বিক্রয় (সালাম) এবং নির্মাণযোগ্য পণ্যের (ইস্তিস্না) জন্য অর্ডার দেয়া। এগুলোর সবই অস্বাভাবিক, কারণ এখানে চুক্তির সময় এর অন্তর্ভুক্ত পণ্যের অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু জনগণের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ব্যতিক্রমীভাবে এর অনুমোদন দেয়া হয়। সর্বশেষে রুখসাত পূর্বের জামানায় অবতীর্ণ কতিপয় কঠোর আইন থেকে মুসলিম উম্মাহকে সুবিধা প্রদানের আকারে এসেছে। উদাহরণ হলো, কারোর সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ জাকাত প্রদান, মসজিদের বাইরে নামাজ আদায় করার অনুমোদনহীনতা এবং যুদ্ধলব্ধ মালামাল (গণিমতের মাল) গ্রহণ করা অবৈধতা। এগুলো পূর্ববর্তী ধর্মগুলোর অনুসারীদের ওপর আরোপ করা হলেও ইসলামি শরিয়তে তা অপসারণ করা হয়েছে।[৫০]

২.৫ বৈধ, অনিয়ম ও অকার্যকর (সহিহ, ফাসিদ, বাতিল)

এগুলো হলো শারয়ী মূল্য যাতে মুকাল্লিফকৃত বৈধ কাজের বিবরণ দান ও মূল্যায়ন করা হয়। এসব মানদণ্ড অনুযায়ী কোনো কাজের মূল্যায়ন নির্ভর করে আলোচ্য কাজ তার জন্য শরিয়ত নির্ধারিত অত্যাবশ্যকীয় শর্তাবলি (আরকান), শর্তসমূহ (শুরুত) পূরণ করেছে কি না এবং এর সঠিক সম্পাদনের পথে কোনো অন্তরায় নেই তা নিশ্চিত করার ওপর। উদাহরণ হলো, সালাত (নামাজ) হলো শারয়ী কাজ এবং এ ব্যাপারে শরিয়ত যেসব অত্যাবশ্যকীয় শর্ত (রুকন) ও শর্ত (শুরুত) নির্ধারিত করে দিয়েছে তা পূরণ হলেই কেবল নামাজ বৈধ হবে। অন্যদিকে নামাজের অত্যাবশ্যকীয় শর্ত ও শর্তগুলোর কোনো একটি অপূরণ থাকলে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে একটি চুক্তি প্রয়োজনীয় সব শর্ত পূরণ করলে এবং তা সম্পাদনের পথে কোনো বাধা না থাকলে তাকে বৈধ বলে বর্ণনা করা হয় অন্যথায় তা বাতিল বলে গণ্য হবে। যখন শর্ত অনুযায়ী নামাজ আদায় করা হয় তখন ওয়াজিব পালন হয়ে যায়, এর অন্যথা হলে তা অপূরণ থেকে যায়। একটি বৈধ চুক্তিতে এর সব আইনগত পরিণামের বিষয় উপস্থাপন করা হয়; অন্যদিকে বাতিল চুক্তি এর আইনগত উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হয়। আলেমগণ ইবাদত-বন্দেগীর ফলাফলের বিষয়ে একমত হয়েছেন যে তা হয় বৈধ হবে অথবা বাতিল হবে। এর

www.pathagar.com

অর্থ হলো, এর মধ্যবর্তী কোনো শ্রেণি বিভাগ নেই। বৈধ কাজ যখন অত্যাবশ্যকীয় (আরকান) কারণ, শর্ত ও অন্তরায়সহ সব শর্ত পূরণ করে তখন তা সঠিক হয়। আর যখন এর কোনো একটির অভাব বা ত্রুটি থাকে তখন তা বাতিল হয়ে যায়। বাতিল হয়ে যাওয়া ইবাদত-বন্দেগীর কোনো কাজ সূচনাতেই অস্তিত্বহীন এবং তার কোনো ধরনের ফল ভোগ করতে হবে না। সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমগণ লেনদেনের ব্যাপারে অনুরূপ মত পোষণ করেন। অর্থাৎ কোনো বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সব দিক পূরণ করা হলেই কেবল ওই লেনদেন সঠিক হবে। আর কেবলমাত্র বৈধ বিক্রয় চুক্তিই এর আইনগত পরিণতি প্রদান করতে পারে। অর্থাৎ ক্রেতাকে বিক্রীত পণ্যের মালিকানা স্বত্ব প্রদান এবং বিক্রেতাকেও এর মূল্যের (সামান) ওপর মালিকানা স্বত্ব প্রদান করে। কোনো বিক্রয় চুক্তির যে কোনো শর্তের অভাব থাকলে তা বাতিল হয়ে যাবে। অবশ্য হানাফীগণ এ ধরনের কমতির সুনির্দিষ্ট প্রকৃতির প্রশ্নে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের থেকে ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। আলেমদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মনে করেন যে, অবৈধতার বিষয়টি একটি একশিলা ধারণা। কারণ অবৈধতার কোনো ছায়া ও মাত্রা নেই। লেনদেনের বিষয় হয় বৈধ অথবা বাতিল হবে এবং এ দুইয়ের মধ্যে আর কোনো কিছু নেই। এ মত অনুযায়ী ফাসিদ ও বাতিল হচ্ছে একই অর্থবোধক দু'টি শব্দ তা ইবাদত-বন্দেগীর বিষয় অথবা নাগরিক লেনদেন সম্পর্কিত হোক না কেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মতে, কোনো চুক্তিতে অত্যাবশ্যকীয় শর্ত (রুকন) যেমন মৃত জন্তু বিক্রয় করা অথবা কোনো শর্ত লঙ্ঘিত হলে, যেমন- অনির্ধারিত মূল্যে বিক্রি করা, তাহলে এই চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে এবং কার্যত তার কোনো অস্তিত্ব থাকবে না।

হানাফীগণ অবশ্য বৈধ ও বাতিলের মধ্যবর্তী একটি শ্রেণি বিভাগ করেছেন, তাহলো ফাসিদ। যখন কোনো চুক্তির অত্যাবশ্যকীয় শর্তের (রুকন) কমতি থাকে তখন ওই চুক্তি বাতিল হয়ে যায় এবং তার কোনো আইনগত বৈধতা থাকে না। অবশ্য এ কমতি যদি চুক্তির একটি শর্ত লঙ্ঘিত হয় তাহলে তা হবে ফাসিদ, বাতিল নয়। একটি ফাসিদ চুক্তিতে কোনো কোনো বিষয়ে কমতি থাকলেও তা চুক্তি হিসেবে বলবৎ থাকে এবং কিছুটা আইনগত গুরুত্ব বহন করে, কিন্তু পরোপুরি নয়। এভাবে একটি ফাসিদ বিষয় চুক্তিতে কোনো ক্রেতা ক্রয়কৃত পণ্যে নিজ দখলে নেয়ার পর তার ওপর তার মালিকানা স্বত্ব কায়েম হয়, কিন্তু তা অস্তিত্বহীন বস্তুর (ইনতিফা) ওপর ক্রেতার অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করে না। অনুরূপভাবে বিধি বহির্ভূত বিবাহ চুক্তি যেমন- সাক্ষী ছাড়া বিয়ে, এমনকি বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার পরও বর-কনে অথবা কাজীকে এ কমতি দূর করতে হবে অথবা বিয়ে বাতিল করতে হবে। বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার আগে এ ত্রুটি জানা থাকলে, বিয়ে সম্পন্ন করা হবে বেআইনি। কিন্তু

www.pathagar.com

তারপরও স্ত্রী মোহরানা পাবার অধিকারী হবে এবং বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পর তাকে অবশ্যই ইদ্দত পালন করতে হবে। ফাসিদ বিয়ের মাধ্যমে জন্মগ্রহণকারী সন্তান বৈধ হবে, কিন্তু স্ত্রী ভরণপোষণের অধিকার পাবে না এবং এ ধরনের বিয়ের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ওয়ারিশি অধিকার সৃষ্টি হবে না।

হানাফীগণের মতে ফাসিদ হচ্ছে এমন কিছু, যা অবশ্যই বৈধ (মাশরু) কিন্তু তাতে একটি গুণের (ওয়াসফ) কমতি রয়েছে। এ গুণ বাতিলের বিপরীত। আর নির্যাস ও গুণ উভয় দিক থেকে কমতি থাকায় বাতিল হচ্ছে অবৈধ (গায়ের মাশরু)। ফাসিদ সম্পর্কে হানাফীগণের দৃষ্টিভঙ্গি এ ধারণার ভিত্তিতেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, কমতি লেনদেনের গুণকে প্রভাবিত করে নির্যাসকে (আসল) নয়, যা প্রায় অপসারণ ও সংশোধন করা যেতে পারে। উদাহরণ হলো, মূল্য নির্ধারণ ছাড়াই কোনো বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন করা হলে এর মূল্য (সামান) নির্দিষ্ট করা সম্ভব। এভাবে অনিয়মের বিষয় চুক্তিতে থাকলে তা জানা মাত্রই অথবা যত দ্রুত সম্ভব তা সংশোধন করা যায়।[৫১]

৩. হুকম শারয়ীর স্তম্ভগুলো (আরকান)

হুকম শারয়ী বা শরিয়াহর আইন বা মূল্য তিনটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। সব কিছুর প্রথমে রয়েছে হুকম অবশ্যই হাকিম অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার অনুমতি সাপেক্ষে হতে হবে। এ ছাড়া এর একটি বিষয়বস্তু অবশ্যই থাকতে হবে, যাতে বলা হয়, মাহকুম ফিহ, এরপর থাকবে সংশ্লিষ্ট লোকজন অর্থাৎ মাহকুম আলাইহে, তাদেরকে অবশ্যই হুকম অনুধাবনযোগ্য অথবা অন্তত তা গ্রহণে সক্ষম হতে হবে। নিম্নে পৃথক শিরোনামে আমরা এগুলো নিয়ে আলাদাভাবে আলোচনা করব।

৩.১ *আইনদাতা (হাকিম)*

আলেমগণের সর্বসম্মত মত হচ্ছে যে, ইসলামে সব আইনের উৎস হচ্ছে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা, যার ইচ্ছা ও আদেশ মুকাল্লিফ সরাসরি অবতীর্ণ ওহির মাধ্যমে অথবা পরোক্ষভাবে অনুমিতি, যুক্তিলব্ধ বিশেষ দৃষ্টান্তের ও ইজতিহাদের মাধ্যমে জানতে পারে। পবিত্র কুরআন বারবার আমাদের জানিয়ে দিয়েছে যে, 'আদেশ প্রদানের অধিকার একমাত্র আল্লাহ তায়ালার (সুরা আলে ইমরান, ৬ : ৫৭)। মুসলিম সমাজের আইন ও বিচারের বৈধতা ও বিষয়বস্তু অবশ্যই মহান আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত মূলনীতি ও মূল্যবোধ থেকে সংগ্রহ করতে হবে। এ হলো কুরআনের সূরা আল মায়েদার (সুরা মায়েদা, ৫ : ৪৫ ও ৪৯) আয়াতের মর্মার্থ। এতে আল্লাহ প্রদত্ত আইন মানতে অস্বীকারকারীদের কাফের বলে ঘোষণা করা

www.pathagar.com

হয়েছে। এমনকি রসুল সা. আদেশ দানের অধিকার রাখেন না, কারণ তার আদেশ অথবা শাসক, ইমাম, মনিব বা পিতার আদেশ এ ক্ষেত্রে নিজস্ব অধিকার বলে বাধ্যতামূলক কর্তৃত্ব গঠন করে না বরং আল্লাহ তায়ালার আদেশের ভিত্তিতে এ ধরনের ব্যক্তির আনুগত্য করার বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মানব বুদ্ধিজ্ঞান অথবা আকল কেবল নিজস্ব অধিকার বলে আইনের একটি উৎস হতে পারে না।[৫২]

মুকাল্লিফের অনুসরণীয় আচরণ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা বা হুকম জানা ও শনাক্তকরণের পথ বা উপাদান নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। আমরা কি নবী-রসুলগণের সা. সহায়তা ও মধ্যস্থতা এবং কিতাবগুলো ছাড়াই আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তির সাহায্যে তা জানতে পারি অথবা মানব বুদ্ধি কী খোদায়ী হেদায়েত ছাড়াই আইন নিশ্চিত করতে সক্ষম? অনুরূপভাবে যুক্তি ও ওহির মধ্যকার মিল ও সামঞ্জস্যের বিষয়েও অনুরূপ প্রশ্ন রয়েছে, অর্থাৎ মানববুদ্ধি কোনো কিছু ভালো (হাসান) বা মন্দ (কাবিহ) বলে স্থির করলে আল্লাহ তায়ালার হুকম কি যুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া অতীব জরুরি? এসব প্রশ্নের উত্তরে আলেমগণ তিনটি ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। নিম্নে তাদের এসব মত সম্পর্কে আলোচনা করা হবে :

প্রথমত, আবুল হাসান আল আশআরির (মৃত্যু, ৩২৪ হি.) অনুসারী আশআরীগণ মনে করেন যে, খোদায়ী হেদায়েত বা নির্দেশনার সাহায্য ছাড়া মুকাল্লিফের আচরণের কোনটি ভালো ও মন্দ তা নির্ধারণ করা অথবা মুকাল্লিফের আচরণ সংক্রান্ত আল্লাহ তায়ালার হুকম শনাক্ত করা মানব বুদ্ধিজ্ঞানের দ্বারা সম্ভব নয়। কারণ মানুষের যুক্তি ও বিচার-বিবেচনায় ভুল হয়ে থাকে। যখন কোনো একজন কোনো কাজকে ভালো বলে মূল্যায়ন করল, তখনই অন্য একজন তাকেই বলছে মন্দ। উদাহরণ হলো, আমরা সাধারণত বলে থাকি, সততাই উত্তম, কিন্তু যখন তা কোনো স্বৈরাচারী শাসকের হাতে নিরীহ লোকের মৃত্যুর কারণ হওয়ার আশঙ্কা থাকে তখন তাকে মন্দ বলে মনে করা হয়। তাই দেখা যাচ্ছে যে, কোনো কিছুর মূল্য নির্ণয় করা মানববুদ্ধির কাজ নয় এবং আমরা এ কথা বলতে পারি না যে, আকল যাকে ভালো বলে মনে করে, তা আল্লাহর দৃষ্টিতেও অবশ্যই ভালো হবে অথবা তা যাকে মন্দ বলে মনে করে তা আল্লাহর দৃষ্টিতেও মন্দ হবে। এভাবে আশাআরীগণের মতে, বস্তুর প্রকৃতির সূত্র ধরে অথবা আমাদের উপলব্ধির আলোকে তা ভালো না মন্দ সেটা স্থির করা যায় না বরং আল্লাহ তায়ালাই তা স্থির করে থাকেন। যখন আল্লাহ তায়ালা কোনো কাজ করার অনুমতি অথবা আদেশ দেন, তখন তা সঠিক/ভালো কাজ এবং তিনি যখন কোনো কাজকে হারাম বা নিষিদ্ধ করেন, তখন এটি নিশ্চিত হয়ে যায় যে, আলোচ্য কাজটি অন্যায় বা মন্দ। তাই দেখা যাচ্ছে যে, কোনো কাজ ভালো না মন্দ তার মানদণ্ড হচ্ছে শারয়ী, আকল নয়। এই মত

www.pathagar.com

অনুযায়ী আইনে যা করার আদেশ দেয়া হয় তা ভালো এবং যা করতে নিষেধ করা হয় তা মন্দ। সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম এ মতকে সমর্থন করেন। এ মত আইনের শাসনের মূলনীতি বলে পরিচিত (যা বৈধতার মূলনীতি বলেও পরিচিত)। এ মত যে বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করেছে তাহলো, কোনো ব্যক্তির কাছে আগেই আইন সম্পর্কে জানানো না হলে তার জন্য কোনো কাজ করা অথবা তা করা থেকে বিরত থাকার প্রয়োজন হবে না। স্পষ্ট যোগাযোগের মাধ্যমে কোনো কাজের অবস্থা সম্পর্কে জানানো না হলে তা করার জন্য কাউকে পুরস্কৃত অথবা তা না করার জন্য দণ্ডিত করা যাবে না। কোনো ব্যক্তি যদি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বসবাস করে এবং কখনোই আল্লাহ তায়ালার বাণী গ্রহণ না করে, তাহলে সে মুকাল্লিফ নয় এবং সে পুরস্কার বা শাস্তির যোগ্য হবে না। এ মতের সমর্থনে পবিত্র কুরআনের বাণী উদ্ধৃত করা হয় যাতে ঘোষণা করা হয়েছে : 'আর আমরা আজাব দেই না যতক্ষণ না (লোকদেরকে হক ও বাতিল বুঝানোর জন্য) একজন বার্তাবাহক না পাঠাই' (সুরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ১৫)। এ আয়াত থেকে যে নির্দেশনা পাওয়া গেছে তাহলো, পুরস্কার ও শাস্তির বিষয়টি আইন প্রকাশের ভিত্তিতে স্থির হয়, মানব বুদ্ধির বিচারে নয়। কুরআনের অন্যত্র আমরা খোদায়ী কালাম নাজিলের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে দেখতে পাই '... যাতে রসুলগণের পাঠানোর পর লোকদের যেন খোদার বিরুদ্ধে কোনো যুক্তি না থাকে' (সুরা নিসা, ৪ : ১৫)। কুরআনের আরেকটি স্থানে নিশ্চিত করে বলা হয়েছে যে, লোকদের যথাযথভাবে অবহিত করার পরই শাস্তি আরোপ করা হয়, তার আগে নয়। কাফেরদের উদ্দেশে কুরআনে এভাবে বিষয়টি ঘোষণা দেয়া হয়েছে : 'আমরা যদি উহার আসার আগে কোনো আজাব দিয়ে ধ্বংস করে দিতাম তাহলে এ লোকেরাই বলতো যে, হে আমাদের খোদা, তুমি আমাদের নিকট কোনো রসুল পাঠালে না কেন, (তাহলে) লজ্জিত ও কলঙ্কিত হওয়ার আগেই আমরা তোমার আয়াতগুলো অনুসরণ করা শুরু করে দিতাম' (সুরা ত্বাহা, ২০ : ১৩৪)।

আশআরীগণের মতে, কেবলমাত্র ইসলামে আগমনের পরেই আল্লাহ তায়ালার আদেশ মুকাল্লিফের আচরণের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়; এর আগে তা পালনের বাধ্যবাধকতার কোনো ভিত্তি নেই। প্রকৃতপক্ষে ওহির মাধ্যমে কুফরিকে হারাম ও ইমানকে ওয়াজিব ঘোষণা করার আগে তা ছিল না হারাম না ওয়াজিব।[৫৩]

দ্বিতীয়ত, ইবরাহীম আল নাজ্জামের অনুসারী মুতাজিলাগণ মনে করেন যে, মানব বুদ্ধিজ্ঞান এমনকি কিতাব ও রসুল সা.-এর মধ্যস্থতা ছাড়াই মুকাল্লিফের আচরণ সংক্রান্ত খোদার আইন শনাক্ত করতে পারে। আকল আপনা থেকেই যা উপলব্ধি করতে পারে শারয়ী কেবলমাত্র তার ওপর থেকে পর্দার অপসারণ করে থাকে এবং প্রকৃত অর্থে আকল ও শারয়ী এক ও অভিন্ন। বুদ্ধিজ্ঞান (আকল) মানব আচরণের

www.pathagar.com

কল্যাণ ও অনিষ্টের আলোকে তার ভালো ও মন্দ শনাক্ত করতে পারে। মুকাল্লিফের আচরণ সম্পর্কিত আল্লাহর আইন কেবল মানববুদ্ধিজ্ঞানের দ্বারা শনাক্তযোগ্যই নয় উপরন্তু তা মানবজ্ঞানের নির্দেশনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণও। আল্লাহ তায়ালা মুকাল্লিফকে কেবলমাত্র তা করতে বলেছেন, যা কল্যাণকর এবং তা করতে নিষেধ করেছেন, যা অনিষ্টকর। আকল যাকে ভালো বা সঠিক বিবেচনা করে আল্লাহর দৃষ্টিতেও তা ভালো এবং আল্লাহ যা ভালো মনে করেন আকলের দৃষ্টিতেও তা ভালো, তাই কোনো ব্যক্তি যুক্তির নির্দেশনার বিপক্ষে কাজ করলে সে শাস্তি পেতে পারে, আর যে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করবে সে পুরস্কৃত হবে। এভাবে কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহ তায়ালার কোনো নির্দেশনা না পেয়ে থাকে তারপরও তাকে মুকাল্লিফ হিসেবে বিবেচনা করা হবে এবং বিবেকের ভিত্তিতে তাকে দায়ী করা হবে এবং সে অনুযায়ী তার পুরস্কার ও শাস্তি নির্ধারিত হতে পারে। মুতাজিলাগণ অত্যন্ত জোরালো ভাষায় বলে থাকেন যে, যা প্রকৃতিগতভাবে খারাপ এমন কোনো কিছুর আদেশ দেয়া অথবা প্রকৃতগতভাবে যা ভালো এমন কোনো কিছু নিষেধ করা আল্লাহ তায়ালার পক্ষে অসম্ভব। এর সুস্পষ্ট অর্থ হচ্ছে শারয়ী ও আকল সবসময়ই পরস্পর অভিন্ন মত পোষণ করে।[৫৪]

আল গাজ্জালী ভালো ও মন্দ স্থির করার বিষয়কে পুরোপুরি আপেক্ষিক প্রস্তাবে রূপান্তরিত করার প্রবণতার জন্য মুতাজিলাদের মতের সমালোচনা করেছেন। যখন কোনো ব্যক্তি কোনো কাজের ব্যাপারে সম্মত হয়, কিন্তু অন্যজন তাতে অসম্মতি ব্যক্ত করে, এখানে প্রথমজনের দৃষ্টিতে কাজটি ভালো, কিন্তু পরের জনের দৃষ্টিতে তা মন্দ। ভালো ও মন্দ সম্পর্কে এ ধরনের আপেক্ষিক ও পারিপার্শ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ পুরোপুরি অগ্রহণযোগ্য। এর ভিত্তিতে শরিয়ত কাজ করে না এবং তা করতেও পারে না। এর পরিবর্তে শরিয়ত বস্তুনিষ্ঠ অবস্থার ভিত্তিতেই মুকাল্লিফের কাজ ও আচরণের মূল্যায়ন করে থাকে; তাতে বিশেষ স্বার্থে সম্মতি বা অসম্মতির বিষয় বিবেচনা করা হয় না। আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো কাজের আদেশ দেন অথবা তার প্রশংসা করেন তা প্রশংসারযোগ্য এবং সবক্ষেত্রেই ভালো।[৫৫] আল শাওকানীও মুতাজিলাদের মতের সমালোচনা করেন এবং ওই মতের কতিপয় দুর্বলতা তুলে ধরে বলেন যে, মানব আচরণের এমন কতিপয় ক্ষেত্র রয়েছে, যা যৌক্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে সমাধানযোগ্য নয়। এ কথা সত্য যে, আকল সত্য ও মিথ্যা মূল্য নির্ণয় করতে পারে, যেমন- সত্য কল্যাণকর আর মিথ্যা ক্ষতিকর। এ ছাড়া আকল নিমজ্জমান ব্যক্তি অথবা অনাহারী মানুষের জীবন বাঁচানোর মূল্যও উপলব্ধি করতে পারে তথাপি তা রমজানের শেষ দিনে রোজা পালনের পুণ্য অথবা এর পরের দিন রোজা পালন করার মহাপাপ নির্ধারণ করতে পারে না। এ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র শারয়ীর দ্বারাই ভালো-মন্দ নির্ণয় করা যায়, আকলের সাহায্যে নয়।[৫৬]

www.pathagar.com

নামাজ ও হজসহ অধিকাংশ ইবাদতই এ শ্রেণির আওতায় পড়ে। মানববুদ্ধি তাদের মূল্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হতে পারে, কারণ তার মধ্যে হিতসাধনের ইচ্ছা ও করুণা (লুৎফ্) রয়েছে, যা অশ্লীলতা ও দুর্নীতি রোধ করে; কিন্তু কেবল আকল এর পক্ষে ইবাদাহ্‌র প্রকৃত মূল্য নির্ণয় করা সম্ভব নয়।[৫৭]

ভালো ও মন্দ সম্পর্কে মুতাজিলাদের মত হচ্ছে আইন শাস্ত্রে এক ধরনের উপযোগবাদীর দৃষ্টিভঙ্গির বাস্তব রূপায়ন। কারণ ওই আইন হচ্ছে একটি ভালো আইন যা সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সর্বোচ্চ কল্যাণ সাধন করে। এখানে কোন ব্যক্তি যে কাজ করে তা তার ও অন্যদের কী কল্যাণ বা ক্ষতি সাধন করে তারই আলোকে তা ভালো না মন্দ সেটা মূল্যায়ন করা হয়। যেসব কাজ এ প্রেক্ষাপটের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় সহজভাবে তার কোনো পরিণাম নেই বলে গণ্য করা হয়। সেগুলোকে আবাস অর্থাৎ পুরোপুরি 'নিষ্ফল' বলে অভিহিত করা হয়।

তৃতীয়ত, আবু মনসুর আল মাতুরিদীর (মৃত্যু, ৬৩৩ হি.) মত অনুযায়ী মাতুরিদীগণ এর মাঝামাঝি একটি পন্থার প্রস্তাব করেছেন যা হানাফীগণ গ্রহণ করেছেন এবং একে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মত বলে গণ্য করা হয়। এ মত অনুযায়ী, মুকাল্লিফের আচরণের ভালো ও মন্দ অবশ্য মানব জ্ঞানবুদ্ধির দ্বারা নির্ণয় ও মূল্যায়ন করা যেতে পারে। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, এ ধরনের অন্তরায় সংক্রান্ত আল্লাহ তায়ালার আইন সবসময়ই আকলের নির্দেশনার অনুরূপ হবে, কারণ মানব বুদ্ধিজ্ঞান ভুলের উর্ধ্বে নয়। তাই ভালো ও মন্দের জ্ঞান অবশ্যই খোদায়ী যোগাযোগের ভিত্তিতেই হতে হবে। এ মত মূলত ওপরের দু'টি মতের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। তবে এতে আশআরিদের মতের প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়ার প্রবণতা রয়েছে, যাতে বলা হয়েছে, মুকাল্লিফের দায়িত্বের বিষয় নির্ধারণ করা হয় আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত আইনের ভিত্তিতে, মানব যুক্তির নির্দেশনা অনুসারে নয়। আকল ভালো ও মন্দ উপলব্ধি করতে সক্ষম, কিন্তু এ মূল্যায়ন পুরস্কার ও শাস্তির ভিত্তি গঠন করে না, এটি এমন বিষয় যা স্থির করার দায়িত্ব একান্তভাবেই আল্লাহ তায়ালার। আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো কিছুকে ভালো বলে জানাবেন তা পুরস্কার বা সওয়াব পাওয়ারযোগ্য বলে বিবেচিত হবে এবং তিনি কোনো কিছুকে নিষিদ্ধ করলে তা হবে মন্দ, কেউ তা করলে সে জন্য তাকে শাস্তি পেতে হবে। এ মত মুতাজিলাদের এ মতেরও স্বীকৃতি দিয়েছে, যাতে বলা হয়েছে মানোবিজ্ঞানের ঘটনা বা বস্তুর অন্তর্নিহিত মূল্য উপলব্ধিযোগ্য, যা বস্তুর বা ঘটনার প্রকৃতির মূল্য অনুধাবন ও চিহ্নিত করতে পারে। মাতুরিদীরা অবশ্য কেবল আকলের ভিত্তিতে পুরস্কার ও শাস্তি মঞ্জুর করা হতে পারে, মুতাজিলাদের এ মতের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছেন।[৫৮]

www.pathagar.com

৩.২ *হুকমের বিষয়বস্তু (আল হুকম ফীহ্)*

'মাহম ফীহ' বলতে মুকাল্লিফের কাজ, অধিকার ও দায়দায়িত্ব বুঝায় যা আদেশ, নিষেধ অথবা অনুমোদনযোগ্যতার বিষয়বস্তু গঠন করে। যখন আল্লাহ্ তায়ালার কোনো বিধানকে হয় ওয়াজিব অথবা মানদুব আকারে প্রকাশ করা হয়, তখন উভয় ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে কোনো না কোনোভাবে কাজ করতে হয়। অনুরূপভাবে আল্লাহ তায়ালার কোনো হুকম যখন নিষিদ্ধ (তাহরিম) বা তিরস্কারের (কারাবাহ্) আকারে গঠিত হয় তখনো তা মুকাল্লিফের আচরণের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, সব ধরনের আদেশ ও নিষেধ মুকাল্লিফের কাজ ও আচরণের সাথে সংশ্লিষ্ট। কখনো আল্লাহ তায়ালার কোনো দাবি সুনির্দিষ্ট আইনের (আল হুকম আল তাকলিফ) আকারে উপস্থাপন করা হয় যেমন- রোজা, জিহাদ, জাকাত ইত্যাদি। এখানে হুকমের বিষয়বস্তু হচ্ছে মুকাল্লিফের কাজ। অনুরূপভাবে কখনো আল্লাহ তায়ালার দাবি ঘোষণামূলক আইনের (আল হুকম আর ওয়াদয়ী) আকারে প্রকাশ পায়, যেমন- নামাজের শর্ত ওজু, অথবা মালিকানার কারণ (সাবাব) বিক্রয়, অথবা উত্তরাধিকারী হওয়ার অন্তরায় (মানি) খুন করা। হুকমের এসব বিষয়বস্তু মুকাল্লিফের কাজের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। ব্যক্তির আচরণের সমন্বয়ে কখনো হুকম ফীহ গঠিত হয় না, তথাপি তা এর সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে। এর উদাহরণ হলো, রমজানের আগমন, যা রোজা পালনের কারণ (সাবাব) ব্যক্তির কাজ নয়, তথাপি তা কারণের পরিণাম (মুসাব্বা), অর্থাৎ রোজা হিসেবে মুকাল্লিফের কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট।[৫৯] হুকম-এর বিষয়বস্তু গঠনের জন্য ব্যক্তিকে কোনো কিছু করতে হয় অথবা তা পরিহার করতে হয়। এ জন্য তাকে অবশ্যই নিম্নের তিনটি শর্ত পূরণ করতে হবে।

প্রথমত, ব্যক্তিকে কাজ বা আচরণের ধরন সম্পর্কে অবশ্যই জানতে হবে যাতে তার যা করা প্রয়োজন তা সে করতে পারে অথবা যা করতে তাকে নিষেধ করা হয়েছে তা থেকে সে নিবৃত থাকতে পারে।[৬০] যে দ্ব্যর্থবোধক আয়াত বা প্রবচন এ জ্ঞানের অংশ গঠন করে না, তা আদেশ অথবা নিষেধের কোনোটিরই ভিত্তি হতে পারে না। উদাহরণ হচ্ছে নামাজ, রোজা, জাকাত ও হজ সম্পর্কিত কুরআনের দ্ব্যর্থবোধক (মুজমাল) আয়াত রসুল সা. কর্তৃক ব্যাখ্যা ও সুস্পষ্ট না করা পর্যন্ত এগুলো কারোর জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়নি। এসব বাধ্যতামূলক কাজ কোন পদ্ধতিতে করা হবে তাও সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। উপরন্তু আলেমগণ এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, প্রয়োজনীয় নির্দেশনা বা ব্যাখ্যার বিষয়ে অবশ্য বিলম্ব করা যাবে না এবং প্রয়োজন হলে যথাসময়ে তা অবশ্যই প্রদান করতে হবে, অন্যথায় তা বাধ্যবাধকতার (তাকলিফ) ভিত্তি গঠন করতে ব্যর্থ হবে।

যখন আমরা বলি যে, কোনো ব্যক্তিকে কাজের প্রকৃতি সম্পর্কে অবশ্যই জানতে হবে, তাহলে তা জানা তার জন্য অতীব প্রয়োজনীয় হবে। এর অর্থ হলো তার

www.pathagar.com

পক্ষে এ ধরনের জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব। তাই যখন কোনো ব্যক্তির শক্তি-সামর্থ্য পরিপূর্ণভাবে তার নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং তার পক্ষে আইন সম্পর্কে জানা সম্ভব হয় তাহলে সে তার আইনগত দায়দায়িত্বের বিষয় জানে বলে মনে করা হবে। এ ক্ষেত্রে আইন তার ওপর প্রযোজ্য করতে হবে এবং শরিয়াহর বিধিবিধানের ব্যাপারে তার অজ্ঞতা এ ক্ষেত্রে কেবল অজুহাত হতে পারবে না। ব্যক্তির প্রকৃত জ্ঞানবুদ্ধি যদি আইনের অপরিহার্য শর্ত হয় তাহলে আইন লঙ্ঘনের সব ক্ষেত্রে এ ধরনের জ্ঞানের বিষয় প্রমাণ করা অত্যন্ত কঠিন হবে। তাই এ বিষয়টি নিশ্চিত করাই যথেষ্ট যে কোনো ব্যক্তি সরাসরি শরিয়াহর জ্ঞান অর্জন করতে পারে অথবা যারা এ ধরনের জ্ঞানের অধিকারী তাদের কাছ থেকে তা জেনে নিতে পারে।

দ্বিতীয়ত, ব্যক্তির যে কাজ করা প্রয়োজন তা অবশ্যই তার সামর্থ্যের মধ্যে থাকতে হবে অথবা নিষিদ্ধের ক্ষেত্রে কাজটি পরিহার করার ক্ষমতাও তার আওতার মধ্যে থাকতে হবে। পবিত্র কুরআনে এ মূলনীতির কথা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে : 'আল্লাহ তায়ালা কোনো প্রাণীর ওপর তার শক্তি-সামর্থ্যের অধিক দায়িত্ব বোঝা চাপিয়ে দেন না' (সুরা বাকারা, ২ : ২৮৬) এবং 'আল্লাহ যাকে যতটা দিয়েছেন তার বেশি ব্যয় করার দায়িত্ব তিনি তার ওপর চাপিয়ে দেননি' (সুরা তালাক, ৬৫ : ৭)।

কোনো কাজ ধারণাগতভাবে অবাস্তব মনে হতে পারে। যেমন- কোনো ব্যক্তিকে একইসাথে সজাগ ও ঘুমিয়ে থাকতে বলা অথবা তাকে একইসাথে কিছু করতে ও না করতে বলা। অনুরূপভাবে কোনো কাজ করা বাস্তবিক পক্ষে অসম্ভব হতে পারে। যেমন- প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ ছাড়াই কোনো ব্যক্তিকে উড্ডয়ন করার আদেশ প্রদান। অসম্ভব কোনো কিছু করা কারোর জন্য প্রয়োজনীয় হতে পারে না এবং কাজটি যদি প্রকৃতিগতভাবে অসম্ভব অথবা নির্দিষ্ট অবস্থার আলোকে তা করা ব্যক্তির সাধ্যের বাইরে তাতে এর কোনো ব্যত্যয় ঘটবে না।[৬১]

এ বিধানের স্বাভাবিক ফলাফল হচ্ছে, কোনো ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তির পক্ষে কাজ করতে অথবা অন্য কোনো যোগ্য ব্যক্তিকে কাজ করা থেকে বিরত রাখতে বাধ্য করা যাবে না। কারণ এমনটি করা হলে তা হবে কাউকে অসম্ভব কিছু করতে বলার শামিল। অতএব কাউকে আইনগতভাবে তার ভাইয়ের পক্ষে জাকাত প্রদান অথবা তার পিতার পক্ষে নামাজ আদায় কিংবা প্রতিবেশীকে চুরি করা থেকে বিরত রাখতে বাধ্য করা যাবে না। এ ধরনের পরিস্থিতিতে মুকাল্লিফ বৈধভাবে যে কাজটি করতে পারে বলে প্রত্যাশা করা যেতে পারে তাহলো, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করার সাধারণ কর্তব্যের অংশ হিসেবে সদুপদেশ (নসিহত) প্রদান করা। আর একজন আইন মান্যকারী নাগরিক হিসেবে এ ক্ষেত্রে তার পক্ষে তা করাই সম্ভব।

www.pathagar.com

অনুরূপভাবে কাউকে এমন কিছু করতে বাধ্য করা বা করা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করা যাবে না যে ব্যাপারে তার জন্য আর কোনোপথ খোলা থাকবে না। যেমন- কাউকে তার প্রকৃতিগত ও জীব বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডের বিপরীত কিছু করতে বলা। এভাবে আমরা যখন হাদিসে মুসলমানদের 'ক্রোধ পরিহার (লা তাগদাব)' করতে বলা হয়েছে এবং স্পষ্ট ভাষায় (জাহির) এ আচরণকে পরিহার করার দাবি জানানো হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে এখানে যা বুঝানো হয়েছে, তাহলো, অনিয়ন্ত্রিত ক্রোধের ক্ষতিকর পরিণাম যাতে কোনো ব্যক্তি আইনকে নিজ হাতে তুলে নেয়, এ বিষয়টি অবশ্যই পরিহার করতে হবে। এর আরেকটি উদাহরণ হলো, কুরআন ইমানদারদের নির্দেশ দিয়েছে : 'যেন যা কিছু ক্ষতি তোমাদের হয় সে জন্য তোমরা হতাশাগ্রস্ত না হয়ে পড়, আর যা কিছু আল্লাহ তায়ালা তোমাদের দান করেন তা পেয়ে তোমরা গৌরব-স্ফীত হয়ে না পড়' (সুরা আল হাদিদ, ৫৭ : ২৩)। আনন্দ-বেদনা হচ্ছে প্রাকৃতিক বিষয়। তাই মৌলিকভাবে তা ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে না। এখানে প্রকৃতপক্ষে যা বুঝানো হয়েছে তাহলো, প্রত্যেকের উচিত নিজের বা অন্যের প্রতি সহিংসতার মতো বেদনাদায়ক ঘটনা পরিহার করা এবং সুখ ও আনন্দ যেন ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও নিন্দনীয় আচরণের পথে ধাবিত না করে তা নিশ্চিত করা।

সব বাধ্যবাধকতার সাথে অবশ্য কিছুটা কষ্টও জড়িত থাকে। এ ধরনের কষ্ট জনগণ সহ্য করতে পারে, বিদ্যমান অধিকার ক্ষুণ্ন বা ক্ষতি করা এর লক্ষ্য নয়। শরিয়ত অসহনীয় কষ্ট আরোপ করে না। এর উদাহরণ হলো, শরিয়ত অবিরাম রোজা পালন (সাওয়াম আল-ভিজাল) অথবা সারারাত জেগে ইবাদত-বন্দেগী করা নিষিদ্ধ করেছে। উপরন্তু শরিয়ত লোকদের কষ্ট রোধ করার জন্য কতিপয় সুবিধা প্রদান করেছে এবং তা প্রয়োগ করার জন্য জোরালো ভাষায় সুপারিশ করেছে। নিম্নের হাদিসে এ বিষয়টির ওপর তাগিদ দেয়া হয়েছে :

إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكرهان

تؤتى معصيته

> আল্লাহ তায়ালা তাঁর দেয়া সুবিধা গ্রহণ করা দেখতে ঠিক তেমনি ভালোবাসেন, যেমনটি তিনি কোনো গোনাহ হতে দেখাকে ঘৃণা করেন।[৬২]

আরেকটি হাদিসে মুমিনদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে :

خذوا من الأعمال ما تطيقون

www.pathagar.com

'সাধ্য অনুযায়ী তোমরা তোমাদের কর্তব্য পালন করবে।'[৬৩]

এর সুস্পষ্ট অর্থ হলো, কোনো কাজ কোনো ব্যক্তির সাধ্যের মধ্যে থাকলেই কেবল তার ওপর তার আইনগত বাধ্যবাধকতা বর্তাবে। হুকম শারয়ী কখনো কখনো ব্যক্তির ওপর অস্বাভাবিক কষ্ট আরোপ করে থাকে। যেমন- কঠিন অবস্থায় জিহাদ ও হিসবাহ বা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের মতো কতিপয় সম্মিলিত দায়দায়িত্ব। জিহাদের জন্য জীবন কোরবানি করার প্রয়োজন হয়, যা নিঃসন্দেহে চরম কষ্টসাধ্য। কিন্তু যে মূল্যবোধ সমুন্নত রাখা ও রক্ষার জন্য জিহাদ করা হয় তার আলোকে জিহাদকে জরুরি ও ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করা হয়।[৬৪]

সর্বশেষে কাজ করা বা না করার দাবি অবশ্যই এমন কর্তৃত্বশীল উৎস থেকে উৎপন্ন হতে হবে যে মুকাল্লিফকে আনুগত্য করার আদেশ দিতে পারে। এর অর্থ হলো হুকম অবশ্যই আল্লাহ বা তাঁর রসুল সা.-এর তরফ থেকে আসতে হবে। প্রধানত এ শর্তের কারণে যেসব সাক্ষ্য প্রমাণ বা দলিলের ভিত্তিতে আইন প্রণীত হয় তা অবশ্যই শনাক্ত ও ব্যাখ্যা করতে হবে। এর ফলশ্রুতিতে আমরা দেখতে পাই যে, ফকিহগণের বিচারিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে স্বাভাবিকভাবে, বিশেষ করে মুকাল্লিফের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে শরিয়াহর এমন বিধিবিধান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে তার দালিলিক ভিত্তির (হুজ্জিয়াত) ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।[৬৫]

এরপর আমরা হুকমের বিষয়বস্তুর আওতায় অধিকারের শ্রেণি বিভাগ নিয়ে আলোচনা করব। একে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। তাহলো- হক আল্লাহ ও হক আল-আব্‌দ্।

মুকাল্লিফের কাজ হয় আল্লাহর অধিকার (হক আল্লাহ) অথবা মানুষের অধিকার (হক আল-আব্‌দ্) অথবা উভয়ের সমন্বয়ে গঠিত হয়। আল্লাহর হক বলা হয় এজন্য নয় যে তাতে আল্লাহ তায়ালার কোনো উপকার হয় বরং এজন্য যে তাতে নিছক ব্যক্তি বিশেষের নয়, সার্বিকভাবে গোটা সমাজের কল্যাণ হয়। অন্যকথায় জনগণের অধিকার, মানুষের অধিকার বা ব্যক্তির অধিকারের থেকে আলাদা, এ কারণে তা কার্যকর করার কর্তব্য হচ্ছে রাষ্ট্রের। অন্যদিকে ব্যক্তির অধিকার কার্যকরের বিষয়টি তাদের ওপর নির্ভর করছে, যাদের এ অধিকার বিপর্যস্ত হয়েছে, ইচ্ছা করলে তারা এ অধিকার কার্যকর করার দাবি করতে পারে আবার নাও পারে।[৬৬] আলেমগণ এ অধিকারকে পুনরায় চারটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করেছেন। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

প্রথমত, যেসব কাজ একান্তভাবেই আল্লাহর অধিকারের সমন্বয়ে গঠিত হয় যেমন এবাদত বন্দেগী যার মধ্যে রয়েছে নামাজ ও জিহাদ। এগুলো হচ্ছে ইসলামের স্তম্ভ

www.pathagar.com

এবং ইসলামি বিধিবিধান প্রতিষ্ঠার জন্য এগুলো অতীব জরুরি। এগুলোকে বলা হয় হুকুক আল্লাহ আল-খালিসাহ বা আল্লাহর অবিমিশ্র অধিকার। আট প্রকারে এ অধিকারের প্রমাণ দেখতে পাওয়া যায় :

ক. আল্লাহর যেসব অধিকার একান্তভাবে ইবাদত-বন্দেগীর সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে যেমন- ধর্ম গ্রহণের ও প্রচারের ঘোষণা (ইমান), নামাজ, জাকাত, হজ ও জিহাদ।

খ. যেসব অধিকার ইবাদত-বন্দেগী ও আর্থিক দায়দায়িত্ব উভয়ের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে যেমন- রমজান মাস শেষে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে দান (সাদকাতুল ফিতরা) করা।

গ. যেসব অধিকারের ক্ষেত্রে আর্থিক দায়দায়িত্বের পরিমাণ ইবাদত-বন্দেগীর চেয়ে বেশি যেমন- উৎপাদিত ফসলের ওপর এক-দশমাংশ কর ধার্য করা।

ঘ. এমন আল্লাহর অধিকার যাতে আর্থিক দায়দায়িত্ব রয়েছে তবে শাস্তির প্রতি ঝোঁক বেশি; যেমন- বিজিত ভূখণ্ডে কৃষি জমির ওপর খারাজ কর আরোপ।

ঙ. যেসব অধিকার কেবলমাত্র শাস্তির সমন্বয়ে গঠিত হয়ছে; যেমন- হুদদ অর্থাৎ চুরি ও জিনার জন্য নির্ধারিত শাস্তি ইত্যাদি।

চ. ছোটোখাট শাস্তির (উকুবা কাসিরা) সমন্বয়ে গঠিত অধিকার যেমন- হত্যাকারীকে তার হত্যার শিকার ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়া রহিত করা। এ কারণে একে 'উকুবা কাসিরা' বলা হয় যে এতে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়।

ছ. ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি অবহেলাজনিত শাস্তি; যেমন- কাফফারা।

জ. একান্ত অধিকার; এ অর্থে যে কেবলমাত্র অধিকারের সমন্বয়ে তা গঠিত হয়েছে এবং কোনো একজন মুকাল্লিফকে সম্বোধন করা হয়নি বরং সমাজের সবাই অন্তর্ভুক্ত যেমন- খনিজসম্পদ অথবা যুদ্ধলব্ধ মাল (গানাইম) এর ওপর সমাজের অধিকার।[৬৭]

দ্বিতীয়ত, এমন কাজ যা একান্তভাবেই মানুষের অধিকারের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। যেমন- চুক্তি কার্যকর করার অধিকার অথবা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার, ক্রয়কৃত পণ্যের ওপর ক্রেতার অধিকার, পরিশোধ করা মূল্য লাভের ওপর বিক্রেতার অধিকার, ক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার (শুফ) ইত্যাদি। এ ধরনের অধিকার কার্যকর করার বিষয়টি পুরোপুরিভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ওপর নির্ভর করে। সে এগুলো দাবি করতে পারে অথবা এমনকি কোনো বিবেচনা ছাড়াই তা ছেড়ে দিতে পারে।

তৃতীয়ত, এমন কাজ যা সমাজ ও ব্যক্তি উভয়ের সম্মিলিত অধিকারের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে এবং এতে দুই লোকের মধ্যে সমাজের অধিকারের প্রভাবাধিক্য

www.pathagar.com

পরিলক্ষিত হয়। হানাফীদের মতে, মিথ্যা অপবাদ দানকারীকে (কাজিফ) শাস্তি দানের অধিকার এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এ অপবাদের মাধ্যমে সমাজের একজন সদস্যের সম্মানের ওপর হামলা করা হয়। যেহেতু কাজফের ঘটনায় আল্লাহর অধিকার প্রধান্য পায় সেহেতু কেউই এ অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিকে (মাকজুফ) শাস্তি থেকে অব্যাহতি প্রদান করতে পারে না। অবশ্য শাফেয়ীরা এর বিপরীত মত প্রকাশ করেছেন। তারা বলেন, কাজফ হচ্ছে একান্তভাবেই মানুষের অধিকার এবং যে ব্যক্তির দুর্নাম করা হয়েছে সে অপরাধীকে ক্ষমা করার অধিকার রাখে। মানুষের জীবন, জ্ঞান-বুদ্ধি ও সম্পত্তি রক্ষার লক্ষ্যে যেসব কাজ করা হয়, তা এ শ্রেণির আওতায় পড়ে। এর একটি উদাহরণ হলো, সরকারি কাজ সম্প্রদানের ব্যাপারে পরামর্শ করা (শূরা) অথবা রাষ্ট্র প্রধান নির্বাচনের বিষয়ে বায়াত গ্রহণ সংক্রান্ত অধিকার হচ্ছে ব্যক্তির অধিকার। মালিকী ফকিহ আল কারাফীর মতানুসারে, ইসলামের সব অধিকারই ব্যাপক অর্থে আল্লাহর অধিকার। তাই হক আল্লাহর অংশ গঠন ছাড়া কোনো অধিকার গঠিত হতে পারে না। এভাবে কোনো ব্যক্তি যখন একটি বাড়ি কেনে তখন সে ব্যক্তিগত অধিকারের চর্চা করে কারণ তা তার জন্য কল্যাণকর হয়। কিন্তু লেনদেনে আল্লাহর অধিকার সংযুক্ত থাকে কারণ ক্রেতা ক্রয়মূল্য পরিশোধ করতে বাধ্য থাকে। তবে আল্লাহর অধিকার ও ব্যক্তির অধিকারের মধ্যে পার্থক্যের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো ব্যক্তি তা মওকুফ করতে পারে কি না। এভাবে বিক্রেতা ক্রেতাকে দাম পরিশোধ করা থেকে অব্যাহতি দিতে পারে এবং স্ত্রী স্বামীকে মোহরানা পরিশোধের দায় থেকে মুক্ত করে দিতে পারে। কিন্তু কোনো ব্যক্তি কাউকে ফরজ নামাজ অথবা জাকাত প্রদান করা থেকে অব্যাহতি দিতে পারে না।[৬৮]

চতুর্থত, অনেক বিষয় রয়েছে যাতে জনগণ ও ব্যক্তির অধিকার একত্রে সংযুক্ত রয়েছে এবং তাতে ব্যক্তির অধিকারের আধিক্য রয়েছে। হত্যার বদলে হত্যা (কিসাস) ও খুন বা মারাত্মক জখমের রক্তমূল্য (দিয়াত) এ শ্রেণির অধিকারের আওতায় পড়ে। সমাজ এ ধরনের অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় শাস্তি প্রদানের অধিকার রাখে, কিন্তু কিসাস ও ভুলবশত হত্যার ঘটনায় দিয়াতের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারীদের অধিকার এবং জখমের দিয়াতের বেলায় এর শিকার ব্যক্তির অধিকার অধিকতর গুরুত্ব পেয়ে থাকে। এসব ঘটনায় তারা যে দুঃখকষ্ট ও ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে তার কারণেই এ রকম করা হয়েছে। কিসাসের ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির অভিভাবকের (ওয়ালী) অপরাধীকে ক্ষমা করে দেয়ার অথবা তার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করার অধিকার রয়েছে। কিন্তু মৃত ব্যক্তির স্বজনরা ক্ষমা করে দেয়ার পরও সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্রের অপরাধীকে দণ্ড প্রদানের অধিকার থাকবে।[৬৯]

www.pathagar.com

৩.৩ *আইনগত অধিকার (আহলিয়াত)*

হুকম শারয়ীর তিনটি স্তম্ভের (আরকান) এ সর্বশেষ অংশে একান্তভাবে মহকুম আলাইহির অর্থাৎ যে ব্যক্তির উদ্দেশ্যে হুকম এসেছে তার আইনগত অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট। এখানে যে বিষয়টি দেখতে হবে, তাহলো, যাকে উদ্দেশ্য করে হুকম এসেছে সে তা অনুধাবনে সক্ষম কি না এবং তার দায়িত্বের (তাকলিফ) বিষয় সে উপলব্ধি করতে পারে কি না। যেহেতু মুকাল্লিফের মানসিক শক্তির অধিকারী হওয়ার বিষয়টি হচ্ছে তাকলিফের মৌলিক মাপকাঠি। আর আইন পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে, যা ব্যক্তির মানসিক সুস্থতা ও শক্তি-সামর্থ্যকে প্রভাবিত করে। যেমন- নাবালকত্ব, মানসিক ভারসাম্যহীনতা, জোরজবরদস্তির শিকার হয়ে কিছু করা, উন্মুক্ত অবস্থা, নিষিদ্ধ (হাজর) ও ভুল করে কিছু করা।

আইনগত ক্ষমতাকে প্রাথমিকভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। অধিকার ও দায়দায়িত্ব গ্রহণ করার বা স্বাভাবিকভাবে তা উপলব্ধির ক্ষমতা, একে বলা হয়, আহলিয়া আল উযুব এবং অধিকার ও দায়িত্বে সক্রিয়ভাবে চর্চা করা- একে বলা হয়, আহলিয়া আল-আদা। পূর্বেরটিকে 'গ্রহণোন্মুখ আইনগত ক্ষমতা' এবং পরেরটিকে 'সক্রিয় আইনগত ক্ষমতা' বলে বর্ণনা করা হয়।[৭০]

প্রত্যেক ব্যক্তিকেই এক ধরনের বা অন্য ধরনের আইনগত ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। গ্রহণোন্মুখ আইনগত ক্ষমতা হচ্ছে সীমিত পর্যায়ে অধিকার ও বাধ্যবাধকতার বিষয়ে উপলব্ধি করার ব্যক্তি সামর্থ্য। অন্যদিকে সক্রিয় আইনগত ক্ষমতা তাকে অধিকার পূরণ ও দায়দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম করে তোলে। যেমন- বৈধ কাজ করা ও লেনদেন করা এবং আল্লাহ তায়ালা ও অন্য মানুষের প্রতি তার দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করা। গ্রহণোন্মুখ আইনগত সামর্থ্যের অস্তিত্বের মাপকাঠি হচ্ছে খোদ মানুষের জীবন। অন্যদিকে সক্রিয় আইনগত সামর্থ্যের মাপকাঠি হচ্ছে জ্ঞানবুদ্ধির পরিপক্বতা। গ্রহণোন্মুখ আইনগত সামর্থ্য যা প্রত্যেক মানুষকেই দেয়া হয়েছে, সে যোগ্য অথবা অযোগ্য যাই হোক না কেন। একজন মস্তিষ্ক বিকৃত ব্যক্তি, গর্ভস্থ ভ্রূণ, একজন নাবালক ও বোকা মানুষ (সাফীহ), সুস্বাস্থ্যের অধিকারী অথবা অসুস্থ ব্যক্তি, সবাই মানুষ হিসেবে তাদের মর্যাদার কারণে গ্রহণোন্মুখ বৈধ সামর্থ্যের অধিকারী হয়ে থাকে।[৭১]

নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত বুদ্ধি-জ্ঞানের পরিপক্বতা ও যোগ্যতা লাভের পরই কেবল সক্রিয় আইনগত সামর্থ্য অর্জিত হয়। যে ব্যক্তি তার কাজ ও কথা উপলব্ধি করতে পারে কেবল সেই কোনো চুক্তি সম্পাদন, দায়িত্ব পালনের যোগ্য হবে অথবা আইন লঙ্ঘনের কারণে শাস্তি পাবে। দায়িত্বের (তাকলিফ) ভিত্তি হচ্ছে সক্রিয় আইনগত সামর্থ্য যা হৃদয়-মনের উপলব্ধি ও অনুধাবনের সামর্থ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

www.pathagar.com

কিন্তু যেহেতু বুদ্ধি ও অনুধাবন হচ্ছে লুকায়িত গুণ, যা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনায়াসে স্পষ্ট বুঝা যায় না, তাই আইন পূর্ণবয়স্ক (বালেগ) হওয়ার সাথে ব্যক্তিগত দায়িত্বের বিষয়কে সম্পর্কিত করেছে, যা হচ্ছে একটি স্পষ্ট ঘটনা এবং বাস্তব সাক্ষ্য-প্রমাণের সাহায্যে তা প্রমাণ করা যায়। অবশ্য বয়স নয় বরং ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তাই তার আইনগত ক্ষমতা নির্ধারণ করে। এ কারণে মানসিক ভারসাম্যহীন লোক বালেগ ব্যক্তি অথবা যে কোনো বয়সের ঘুমন্ত বালেগ ব্যক্তিকে তার আচরণের জন্য দায়ী করা হয় না। একটি হাদিসে এ মূলনীতি স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে :

رُفع القلم عن ثلاثة: عن الناءم حتى
يستيقظ وعن السبي حتى يحتلم وعن
المجنون حتى يعقل

'তিন ব্যক্তির ওপর থেকে কলম তুলে নেয়া হয়েছে, তারা হলো, ঘুমিয়ে থাকা মানুষ জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত, শিশুর বালেগ না হওয়া পর্যন্ত এবং পাগল ব্যক্তি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত'।[৭২]

গ্রহণোন্মুখ আইনগত ক্ষমতা হয় 'অপরিপূর্ণ' অথবা 'পরিপূর্ণ' হতে পারে। মাতৃগর্ভে অনাহত শিশুর এ ক্ষমতা এ অর্থে অসম্পূর্ণ যে সে কেবলমাত্র কতিপয় অধিকার লাভ করে। যেমন- উত্তরাধিকার ও অসিয়ত। কিন্তু সে অন্যদের প্রতি কোনো দায়দায়িত্ব পালন করতে পারে না। যখন কোনো ব্যক্তি অধিকার লাভ ও অন্যদের প্রতি দায়িত্ব পালন উভয় করতে পারে তখন তার গ্রহণোন্মুখ আইনগত সামর্থ্য পরিপূর্ণ হয়। এ ধরনের আইনগত সামর্থ্য প্রত্যেক মানুষ জন্মের মুহূর্ত থেকেই অর্জন করে। শৈশব ও শিশুকালের পরবর্তী বিভিন্ন পর্যায়ে একটি শিশু তার অভিভাবকের মাধ্যমে হলেও কতিপয় দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম। যেমন- রক্ষণাবেক্ষণ, লোকসানের (দামান) দায় গ্রহণ এবং তার জন্য যেসব কাজ করা হয়েছে তার মূল্য পরিশোধ করা।

সক্রিয় আইনগত সামর্থ্যের জন্য তিনটি সম্ভাব্য পরিস্থিতির কথা চিন্তা করা হয়।

প্রথমত, কোনো ব্যক্তি সক্রিয় আইনগত সামর্থ্যের পুরোপুরি অভাব থাকতে পারে। যেমন- শিশুর অতি শৈশব অবস্থা অথবা যে কোনো বয়সের পাগল ব্যক্তি। যেহেতু তাদের জ্ঞান-বুদ্ধির ক্ষমতা প্রদান করা হয়নি তাই তাদের কথা ও কাজের জন্য কোনো আইনগত পরিণাম ভোগ করতে হবে না। কোনো শিশু বা পাগল ব্যক্তি কোনো লোককে হত্যা করলে অথবা অন্য কোনো ব্যক্তির সম্পত্তি ধ্বংস করলে তাদের কেবলমাত্র সম্পত্তির সূত্রে দায়ী করা যেতে পারে, কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে নয়।

www.pathagar.com

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, তাদের কিসাস বা অন্য কোনো ধরনের শাস্তি দেয়া যাবে না।

দ্বিতীয়ত, কোনো ব্যক্তি আংশিকভাবে সক্রিয় আইনগত সামর্থ্যের অধিকারী হতে পারে। যেমন- বোধসম্পন্ন বা বুঝতে সক্ষম শিশু (আল সাবী আল মুমাইয়িজ), অর্থাৎ ৭ থেকে ১৫ বছর বয়সের শিশু অথবা বোকা মানুষ (মাতুহ্), সে পাগলও নয় আবার পুরোপুরি বুদ্ধিহীনও নয় বরং তার বুদ্ধিজ্ঞান ত্রুটিপূর্ণ ও দুর্বল, সে আইনগত ক্ষমতার অধিকারী তবে তা ত্রুটিপূর্ণ। তাদের উভয়ই সক্রিয় আইনগত সামর্থ্যের অধিকারী যা অসম্পূর্ণ ও আংশিক।[৭৩] কোনো বোধসম্পন্ন শিশু ও নির্বোধ ব্যক্তি কেবলমাত্র কাজ সম্পাদন ও লেনদেন করতে সক্ষম যা পুরোপুরি তাদের জন্য কল্যাণকর হয়। যেমন- এমনকি অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াই কোনো উপহার বা দান গ্রহণ করা। কিন্তু আলোচ্য লেনদেন যদি তাদের জন্য পুরোপুরি অসুবিধাজনক হয় যেমন- কোনো উপহার দান, অসিয়ত করা অথবা তালাক প্রদান- এমনকি অভিভাবকেরা এসব অনুমোদন করলেও তা বৈধ হবে না। যেসব লেনদেনে লাভ ও ক্ষতি উভয় থাকে, তা অভিভাবকের (ওয়ালী) অনুমতিক্রমে হয়ে থাকলে কেবল বৈধ হবে অন্যথায় তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

তৃতীয়ত, বুদ্ধিবৃত্তিক পরিপক্বতা অর্জনের মাধ্যমে সক্রিয় আইনগত সামর্থ্য পরিপূর্ণ হয়। যেহেতু প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তি এ সক্ষমতা অর্জন করে থাকে সেহেতু তাকে সে সক্রিয় আইনগত সামর্থ্যের অধিকারী বলে মনে করা হয়, যদি তার বুদ্ধিগত ত্রুটি থাকার বা পাগল হওয়ার কোনো প্রমাণ না পাওয়া যায়।

যেসব ব্যক্তি পূর্ণ যোগ্যতাসম্পন্ন হয় অনেক সময় অন্যদের অধিকার সংরক্ষণে তাদের ওপরও নিষেধাজ্ঞা (হাজর) আরোপ করা হয়। কোনো ব্যক্তিকে বিচারিক আদেশের মাধ্যমে নির্দিষ্ট বিষয়ে তার লেনদেনের ওপর এ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হতে পারে। এভাবে ঋণদাতার অধিকার রক্ষার্থে ঋণ গ্রহীতার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়ে থাকে।

কোনো ব্যক্তি মৃত্যুর রোগশয্যায় (মারাদ ওয়া মাউত) থাকলেও তার আইনগত ক্ষমতার ত্রুটি থাকতে পারে। কঠিন রোগগ্রস্ততা ও আসন্ন মৃত্যুর ভয় ব্যক্তির মানসিক ও দৈহিক ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ন করে। কিন্তু সাধারণ অসুখ-বিসুখ ও অন্যান্য অবস্থা যা কোনো ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থার কোনো ক্ষতি করে না ফলে তা তার সক্রিয় আইনগত সামর্থ্যকে প্রভাবিত করে না। অংশত এ কারণে ইমাম আবু হানিফা সম্ভবত সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহদের থেকে ভিন্নমত পোষণ করে বলেছেন যে, নির্বুদ্ধিতা (সাফাহাত), ঋণগ্রস্ততা ও অসতর্কতা (গাফিলতি) কোনো ব্যক্তি সক্রিয় আইনগত সামর্থ্যকে ক্ষুণ্ন করে না। আবু হানিফা এসবকে নিষেধাজ্ঞা আরোপের

www.pathagar.com

সঠিক কারণ হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন, তার মতে, এসব ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপে কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা অনেক বেশি।[৭৪]

টিকা

১. গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ১ খণ্ড, ৪২; শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ৬; খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা, ১০০।

২. সহিহ মুসলিম, পৃষ্ঠা ১৬, হাদিস নম্বর ৩৪।

৩. শাফেয়ী, রিসালাহ, পৃষ্ঠা, ৮০; ইবনে মাজাহ, সুনান, ২ খণ্ড, ৯১৩, হাদিস নম্বর ১৭৩৫।

৪. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা, ১০০; খুদ্রারী, উসুল, পৃষ্ঠা, ১৮; আবু ঈদ, মাবাহিছ, পৃষ্ঠা, ৫৮।

৫. তুলনীয়, আবদুর ওহিম, Jurisprudence, পৃষ্ঠা, ১৯৩; ইংরেজি পরিভাষা ব্যবহারে জন্য।

৬. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা, ১০১; কাসিম, উসুল, পৃষ্ঠা, ২১৩।

৭. আবু ঈদ, মাবাহিছ, পৃষ্ঠা ৬৩; কাসিম, উসুল, পৃষ্ঠা ২১৬; আবদুর ওহিম, Jurisprudence, পৃষ্ঠা, ১৯৭।

৮. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা, ২৩-২৪; আবু ঈদ, মাবাহিছ, পৃষ্ঠা ৬৩

৯. গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ১ খণ্ড, ৪২।

১০. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা, ১০৯; কাসিম, উসুল পৃষ্ঠা, ২১৮; আবু ঈদ, মাবাহিছ, পৃষ্ঠা ৬৯।

১১. মুতাজিলারা এ মত পোষণ করেন যে, এ ধরনের নমনীয়তা ওয়াজিবের গোটা ধারণাকে বাতিল করে দেয়। কারণ তাদের মতে, ওয়াজিব পছন্দের বিষয়কে সর্বাংশে বিরোধিতা করে। কিন্তু আলেমদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তাদের এ মতকে খণ্ডন করে দিয়ে বলেছেন, ওয়াজিবকে ওয়াজিব মুয়াক্কাত ও ওয়াজিব মুতলাকে বিভক্ত করার ভেতর কোনো প্রয়োজনীয় বিরোধ নেই। বিস্তারিত জানতে দেখুন, গাজ্জালী মুস্তাস্ফা, ১ খণ্ড, ৪৩-৪৪।

১২. খুদারী, উসুল, পৃষ্ঠা, ৩৩; খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা, ১০৮।

১৩. গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ১ খণ্ড, ৪৭; খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ১১০; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা, ৩৫; খুদারী, উসুল, পৃষ্ঠা, ৪২।

১৪. আল গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ১ খণ্ড, ৪।

১৫. একই গ্রন্থ, ১ খণ্ড, ৪৭; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা, ২৩।

১৬. আল গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ১ খণ্ড, ৪২

১৭. একই গ্রন্থ, ১ খণ্ড, ৪২; খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা, ১১২; আবদুর ওহিম, Jurisprudence, পৃষ্ঠা, ১৯৭।

১৮. আবু, ঈদ, মাবাহিছ, পৃষ্ঠা, ৭১; খুদারী, উসুল, পৃষ্ঠা, ৪৬।

১৯. তাবরিজী, মিশকাত, ১ খণ্ড, ১৬৮, হাদিস নম্বর ৫৪০।

২০. গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ১ খণ্ড, ৪৮; আবু ঈদ, মাবাহিছ, পৃ. ৭২-৭৪, কাসিম, উসুল, পৃ. ৩২২।

২১. কাসিম, উসুল, পৃষ্ঠা, ২২৩; Aghnides, Muhammedan Theories, পৃষ্ঠা, ৮৯; আবদুর ওহিম, Jurisprudence, পৃষ্ঠা, ১৯৮।

www.pathagar.com

২২. মুসলিম, সহিহ মুসলিম, পৃষ্ঠা, ৪৭১, হাদিস নম্বর ১৭৭৫।
২৩. বায়হাকী, আল সুনান আল কুবরা, ৩, ১০।
২৪. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা, ১১৩; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা, ৩৪১; আবু ঈদ, মাবাহিছ, পৃষ্ঠা, ৭০।
২৫. আবু জাহরাহ উসুল, পৃষ্ঠা, ৩৫; কাসিম, উসুল পৃষ্ঠা, ২২০ ও ২২৬।
২৬. আবু জাহরাহ উসুল, পৃষ্ঠা, ৩৪।
২৭. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা, ১১৪, আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা, ৩৬।
২৮. তাবরিজী, মিশকাত, ১ খণ্ড, ৩৩০, হাদিস নম্বর ১০৪৭।
২৯. একই গ্রন্থ, ২, পৃষ্ঠা, ৯৭৮, হাদিস নম্বর ৩২৮০; আবু ঈদ, মাবাহিছ, পৃষ্ঠা ৮০।
৩০. তাবরিজী, মিশকাত, ২ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৮৪৫, হাদিস নম্বর ২৭৭৩।
৩১. কাসিম, উসুল, পৃষ্ঠা, ২২৫।
৩২. আবু দাউদ, সুনান, ৩ খণ্ড, ১১৩৩, হাদিস নম্বর ৪০৪৬।
৩৩. আবু দাউদ সুনান, ২, ৫৫৬, হাদিস নম্বর ২৭৫।
৩৪. আবু ঈদ, মাবাহিছ, পৃষ্ঠা, ৮০-৮২; খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা, ১১৬; Aghnides, Muhammedan Theories, পৃষ্ঠা, ৮৯।
৩৫. গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা ১ খণ্ড, ৪২; খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা, ১১৫; আবদুর ওহিম, Jurisprudence, পৃষ্ঠা, ১৯৮।
৩৬. আবু ঈদ, মাবাহিছ, পৃষ্ঠা, ৮৪-৮৮।
৩৭. গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ১, ৪২।
৩৮. আবু দাউদ, সুনান, ২ খণ্ড, ৫৫৭, হাদিস নম্বর ২০৭৮।
৩৯. আবু দাউদ, সুনান, ২ খণ্ড, ৮০৮, হাদিস নম্বর ২৮৬৪।
৪০. শাফেয়ী, রিসালাহ, পৃষ্ঠ, ৮০; ইবনে মাজাহ, সুনান ২ খণ্ড, ৯১৩, হাদিস নম্বর ২৭৩৫
৪১. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা, ১০২; আবু ঈদ, মাবাহিছ, পৃষ্ঠা, ৬০।
৪২. আবদুর ওহিম, Jurisprudence, পৃষ্ঠা, ৬১-৬২।
৪৩. তুলনীয়, খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা, ১০৪।
৪৪. কাসিম, উসুল, পৃষ্ঠা, ২২৮; আবু ঈদ, মাবাহিছ, পৃষ্ঠা, ১০৫।
৪৫. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা, ৬; খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা, ১১৮; আবু ঈদ, মাবাহিছ, পৃষ্ঠা, ৯২।
৪৬. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা, ১১৮; আবু ঈদ, মাবাহিছ, পৃষ্ঠা, ৯৬-৯৯; কাসিম, উসুল, পৃষ্ঠা, ২৩১।
৪৭. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা, ১২০; আবু ঈদ, মাবাহিছ, পৃষ্ঠা, ১০১।
৪৮. Aghnides, Muhammedan Theories, পৃষ্ঠা, ৮৫; আবু ঈদ, মাবাহিছ, পৃষ্ঠা, ১০৪।
৪৯. গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ১, ৬২-৬৩।
৫০. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা, ৫৫০; আবু ঈদ, মাবাহিছ, পৃষ্ঠা, ১০০-১১২।

www.pathagar.com

৫১. আবু জাহরাহ, উসুল পৃষ্ঠা, ৫১-৫২; আবু ঈদ, মাবাহিছ, পৃষ্ঠা, ১০৩-১০৪, কাসিম, উসুল, পৃষ্ঠা, ২৩৬-২৩৮।

৫২. আল গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ১, ৫৩; আবু জাহরাহ, উসুল, ৫৪।

৫৩. শাওকানী, ইরশাদ, ৭; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা, ৫৭, খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা, ৯৭।

৫৪. গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ১, ৩৬; খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ৯৮, আবু ঈদ, মাহবুব, পৃষ্ঠা, ১২১।

৫৫. গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা ১, ১৩৬।

৫৬. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা, ৭।

৫৭. গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ১, ৩৬।

৫৮. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা, ৫৬; খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা, ৯৯; আবু ঈদ, মাবাহিছ, পৃষ্ঠা, ১২৩; কাসিম, উসুল, পৃষ্ঠা, ২৩৯-২৪৩।

৫৯. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা, ১২৮; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা, ২৪৯।

৬০. এই প্রেক্ষাপটে জ্ঞান বলতে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক আদেশ বা নিষেধের প্রকৃতি উপলব্ধি করা বুঝায়, যাতে সে তদানুযায়ী কাজ করতে পারে। এতে মনের সম্মতি (তাসদিক) বুঝায় না। যদি এটি শর্ত হতো তাহলে অবিশ্বাসীদের মুকাল্লিফের অর্থের বাইরে রাখা হতো। আসলে তা বাইরে না। দেখুন, আল শওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা, ১১।

৬১. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা, ১১, খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা, ১২৮; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা, ২৫০।

৬২. ইবনে হাম্বল, মুসনাদ, ২ খণ্ড, ১০৮।

৬৩. মুসলিম, সহিহ মুসলিম, পৃষ্ঠা, ১০৪, হাদিস নম্বর ৩৭৮।

৬৪. তুলনীয়, আবু ঈদ, মাবাহিছ, পৃষ্ঠা, ১৩৯।

৬৫. আবদুর ওহিম, Jurisprudence, পৃষ্ঠা, ২০২; আবু জাহরা, উসুল, পৃষ্ঠা, ২৫৬।

৬৬. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা, ১২৮; আবু ঈদ, মাবাহিছ, পৃষ্ঠা, ১২৮।

৬৭. আবু সিনা নাসারিয়া আল হক, পৃষ্ঠা, ১৭৯; আবু ঈদ, মাবাহিছ, পৃষ্ঠা, ১৪১।

৬৮. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা, ১৮১।

৬৯. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা, ২৫৭; আবু ঈদ, মাবাহিছ, পৃষ্ঠা, ১৪৫।

৭০. তুলনীয়, আবদুর ওহিম, Jurisprudence, পৃষ্ঠা, ২১৭।

৭১. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা, ১৩৬।

৭২. তাবরিজী, মিশকাত, ২ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৯৮০; হাদিস নম্বর ৩২৮৭।

৭৩. একজন নির্বোধ (মাতাহ) হচ্ছে এমন ব্যক্তি যার উপলব্ধির বিষয়ে লক্ষণীয় ত্রুটি রয়েছে। একজন বোকা ও বেপরোয়া লোকের (সাফীহ) আইনগত সামর্থ্যের ত্রুটি রয়েছে বলে মনে করা হয়। তবে তার মাত্রা মাতুহর চেয়ে কম। তুলনীয়, আবদুর ওহিম, Jurisprudence, পৃষ্ঠা, ২৪০।

৭৪. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা, ১৪০; আবদুর ওহিম, Jurisprudence, পৃষ্ঠা, ২২০।

www.pathagar.com

অষ্টাদশ অধ্যায়

সাক্ষ্য প্রমাণের বিরোধ

সমান শক্তিসম্পন্ন দু'টি প্রমাণ পরস্পর বিপরীত হলে তাদের মধ্যে বিরোধের (তায়ারুদ) সৃষ্টি হয়। এর অর্থ হলো, একই সময় ও স্থানে তার একটি যদি কোনো কিছুকে সমর্থন করে আর অন্যটি নাকচ করে দেয়। এভাবে বিষম শক্তিসম্পন্ন প্রমাণের মধ্যে বিরোধ দেখা দিতে পারে বলে আশা করা যায় না। কারণ এ ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে অধিকতর শক্তিশালী প্রমাণটি বহাল থাকবে। তাই সুনির্দিষ্ট (কাতয়ী) ও ধারণামূলক (যন্নী) প্রমাণের মধ্যে যথার্থ কোনো বিরোধ দেখা দিতে পারে না, না নস ও ইজমার মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হতে পারে, আর না বিরোধ দেখা দিতে পারে ইজমা ও কিয়াসের মধ্যে। কারণ এদের মধ্যে কোনো কোনোটি অন্যটির চেয়ে শক্তিশালী এবং শক্তিশালীগুলোই বহাল থাকবে। কুরআনের দুটি আয়াত বা হাদিসের দুটি বিধানের মধ্যে কিংবা কুরআনের আয়াত ও মুতাওয়াতি হাদিস অথবা দুটি অমুতাওয়াতির হাদিস কিংবা কিয়াসের দুটি বিধানের মধ্যে অবশ্য বিরোধ দেখা দিতে পারে। যেমন কুরআনের দুটি আয়াত অথবা একটি হাদিস ও একজোড়া হাদিসের মধ্যে অথবা একটি কিয়াস ও একজোড়া ইজমার মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তা হবে সমশক্তিসম্পন্নের বিরোধ। কারণ সংখ্যার সমন্বয়ে শব্দ গঠিত হয় না এবং এর ফলশ্রুতিতে একটি আয়াত, হাদিস বা কিয়াসকে জোড়ার জন্য জায়গা করে দেয়া অবশ্যই জরুরি নয়। দুটি বিরোধপূর্ণ প্রমাণের শক্তি খোদ সাক্ষ্য প্রমাণ অথবা বাহ্যিক কারণ যা একটির বিপক্ষে অপরটির দিকে পাল্লা ভারী করতে পারে। এর উদাহরণ হলো, দু'টি বিচ্ছিন্ন হাদিস বা আহাদ হাদিসের মধ্যে যেটি ফকিহ বর্ণনা করেছেন সেটি অফকিহর বর্ণনা করা হাদিসের চেয়ে শক্তিশালী হবে।[১]

দু'টি সাক্ষ্য প্রমাণের মধ্যে সমন্বয় করা সম্ভব না হলেই কেবল বিরোধের সৃষ্টি হয়, এ অর্থে যে, একটির বিষয়বস্তু অন্যটির থেকে আলাদা করা যায় না অথবা তাদের প্রয়োগের সময়ের বিষয়ে অনুরূপভাবে পৃথক করা সম্ভব হয় না। এর উদাহরণ হলো, মদপান সম্পর্কিত কুরআনের তিনটি পৃথক বিধান। কিন্তু এসব বিধান এক সাথে নাজিল করা হয়নি, একটির পর আরেকটি নাজিল হয়েছে। এর ফলে তাদের মধ্যে কোনো বিরোধ সৃষ্টি হয়নি। অনুরূপভাবে অনুসন্ধানে জানা যায় যে, দৃশ্যত সাংঘর্ষিক দুটি বিধান পৃথক পরিস্থিতিতে একই বিষয়ে প্রয়োগ করা হলে সে ক্ষেত্রেও তাদের মধ্যে কোনো বিরোধ থাকবে না।

দুটি ধারণামূলক (যন্নী) প্রমাণের ক্ষেত্রে সত্যিকারের বিরোধ দেখা দিতে পারে। কিন্তু সুনির্দিষ্ট (কাতয়ী) প্রমাণের ক্ষেত্রে হয় না। এভাবে কুরআনের সুনির্দিষ্ট

www.pathagar.com

বিধানের মোকাবেলায় সুন্নাহ্‌র বিরোধকে সত্যিকার নয়, বাহ্যত বিরোধের দৃষ্টান্ত বলে মনে করা হয়। উপরন্তু আলেমগণের মত হচ্ছে যে, দুটি কুরআনের আয়াত বা দুটি হাদিস কিংবা একটি আয়াত ও একটি হাদিসের মধ্যে যথার্থ বিরোধ দেখা দেয় না। এসব সাক্ষ্য প্রমাণের মধ্যে কোনো বিরোধ দেখা দিলে তা শুধুমাত্র ব্যাহত (জাহিরি) বলে মনে করা হয় এবং তাতে বাস্তবতা ও বিষয়বস্তুর ঘাটতি বা ত্রুটি থাকতে পারে। আল্লাহ তায়ালার সর্বব্যাপক অসীম জ্ঞান বিরোধপূর্ণ আইন প্রণয়ন সমর্থন করতে পারে না। আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় যেসব মুজতাহিদ উপলব্ধি করতে অসমর্থ বলে মনে করা হয় কেবল তারাই খোদায়ী আইনের মধ্যে বাহ্যত বিরোধ দেখতে পায়। কেবলমাত্র সুস্পষ্ট রহিতকরণের (নাসখ) ঘটনায় খোদায়ী বিধানের মধ্যে সত্যিকারের বিরোধের অস্তিত্ব রয়েছে বলা যেতে পারে, যা প্রধানত স্বয়ং রসুল সা. শনাক্ত ও নির্ধারণ করেন।[২] দুইটি নুসুসের বিধানের মধ্যে বাহ্যত বিরোধ দেখা দিলে সে ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্য কী তা অবশ্যই আবিষ্কার করার চেষ্টা করতে হবে এবং তার আলোকেই ওই বিরোধ নিরসন করতে হবে। বরং খোদায়ী বিধানের মধ্যে সত্যিকারের কোনো বিরোধ থাকতে পারে না- এই ধারণার ভিত্তিতেই তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও অগ্রাধিকার প্রদান করাকে গুরুত্ব দেয়া হয়। তাই তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা অথবা একটির ওপর অপরটিকে অগ্রাধিকার দেয়া প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এর অর্থ হবে কোনো বিষয়ের দুটি দলিলেই উভয়টি অথবা অন্তত একটি বহাল রাখতে হবে ও বাস্তবায়ন করতে হবে। তাই মুজতাহিদকে অবশ্যই তাদের মধ্যে যতদূর সম্ভব সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু তিনি যদি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন সম্ভব নয়, তাহলে তাকে একটির ওপর অপরটিকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। কেউ যদি সমন্বয় সাধন ও অগ্রাধিকার প্রদান প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়, তাহলে তাকে নিশ্চিত হতে হবে যে, রহিতকরণের পন্থা অবলম্বন করা যায় কি না। আর এটিকে সর্বশেষ উপায় হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। কিন্তু যখন রহিতকরণও সমস্যা নিরসনে ব্যর্থ হয় তখন এর ওপর আমল করা বন্ধ করে দিতে হবে এবং বিরোধপূর্ণ উভয় আয়াত পরিত্যক্ত হবে।[৩]

নুসুস ও ইজমার মধ্যে অথবা ইজমার দুটি বিধানের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়া অচিন্তনীয়। প্রথমত এর স্পষ্ট কারণ হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী কোনো ইজমা গঠিত হতে পারে না। দুটি কিয়াস অথবা নুসুস ও ইজমা ব্যতিরেকে অন্য দুটি দলিলের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে কোনো একটির ওপর অন্যটি অগ্রাধিকার পাবে না এবং তাদের সমন্বয় সাধন সম্ভব হয় না। সে ক্ষেত্রে উভয়টি অবশ্যই বাতিল হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে রহিতকরণ কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নয়। কারণ

www.pathagar.com

রহিতকরণ মৌলিকভাবে কুরআন ও সুন্নাহর চূড়ান্ত বিধিবিধানের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ এবং তা ইজমার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক নয় এবং ধারণামূলক দলিলের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে তেমন একটা কাজে আসে না।

আলেমগণ কুরআনে রহিতকরণের অনেক দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। আমরা এর মধ্যে মাত্র দুটির উল্লেখ করতে পারি। কিন্তু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এ বিরোধ যথার্থ নয়। প্রথম উদাহরণটি হচ্ছে বিধবা নারীর সুনির্দিষ্ট অপেক্ষাকালীন সময় (ইদ্দত) সম্পর্কিত। এ বিষয়ে দুটি আয়াতের একটিতে (সুরা বাকারা, ২ : ২১৪) বলা হয়েছে : স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীকে চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করতে হবে। কিন্তু কুরআনের অন্য স্থানে গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে আরেকটি বিধান রয়েছে। এ আয়াতে (সুরা তালাক, ৬৫ : ৪) গর্ভবতী মহিলাদের ইদ্দতের ব্যাপারে সমাধান বর্ণিত হয়েছে আর তাহলো– গর্ভবতী মহিলার ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এ বিধান গর্ভবতী বিধবার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাকে গর্ভাবস্থা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অবশ্যই অপেক্ষা করতে হবে। তাই দেখা যাচ্ছে, যে মহিলার স্বামী যেদিন মারা যায় সেদিনই সে সন্তান প্রসব করলে ওই দু'টি বিধানের দ্বিতীয়টি অনুযায়ী তার ইদ্দত পালন সম্পন্ন হয়ে গেছে, আর প্রথম বিধান অনুযায়ী তখনো তাকে চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করতে হবে। এখানে গর্ভবতী মহিলার ইদ্দত প্রশ্নে দুইটি আয়াত বিরোধপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়।

কুরআনের দুটি আয়াতের মধ্যে বাহ্যত বিরোধের দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা অসিয়ত করার বৈধতা সম্পর্কিত দুইটি আয়াত উল্লেখ করতে পারি (সুরা বাকারা, ২ : ১৮০)। স্পষ্ট ভাষায় অসিয়ত করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে : তোমাদের মধ্যে কারোর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে এবং সে ধনসম্পত্তি রেখে গেলে তার পিতামাতা ও নিকট আত্মীয়দের প্রচলিত ন্যায়নীতি অনুযায়ী অসিয়ত করাকে তোমাদের জন্য ফরজ করে দেয়া হয়েছে।' আরেকটি আয়াত (সুরা নিসা, ৪ : ১১) দ্বারা এই বিধানকে রহিত করা হয়েছে বলে মনে করা হয়। এ আয়াতে প্রত্যেক নিকট আত্মীয়ের জন্য মিরাসী সম্পত্তির অংশীদার হওয়াকে ফরজ করে দেয়া হয়েছে। এ অংশীদারের বিষয়টি অসিয়তকারীর ইচ্ছা অনুযায়ী নয় বরং আল্লাহর ইচ্ছানুসারেই অবশ্যই নির্ধারিত হতে হবে। এভাবে বাহ্যত আয়াত দুটির মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন সম্ভব এবং পৃথক পরিস্থিতিতে উভয় আয়াত বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। উদাহরণ হিসেবে এই দুটি আয়াতের মধ্যে প্রথমটি এমন পরিস্থিতির জন্য সংরক্ষিত হতে পারে যাতে অসিয়তকারীর পিতামাতা আইনগত অক্ষমতাজনিত কারণে, যেমন- ধর্মের ভিন্নতার জন্য তারা উত্তরাধিকার হওয়া থেকে বাদ পড়েছে।

www.pathagar.com

যেহেতু এ ক্ষেত্রে পিতামাতাকে দ্বিতীয় আয়াতের সুযোগ-সুবিধার বাইরে রাখা হবে, এটাতে কোনো বিরোধের সৃষ্টি হবে না। তাই এ ক্ষেত্রে রহিতকরণেরও দরকার হবে না। উপরের বিধবাদের ইদ্দত সম্পর্কিত আয়াতের ব্যাপারে একই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা যেতে পারে। দুইটি আয়াতের প্রথমটিতে বলা হয়েছে, বিধবার ইদ্দতকাল হবে চার মাস দশ দিন। দ্বিতীয় আয়াতে গর্ভবতী মহিলার ইদ্দতকাল গর্ভাবস্থার অবসান না হওয়া পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। দুইটি আয়াতের সমন্বয় সাধন এভাবে করা যেতে পারে যে, বিধবারা এর মধ্যে যেটি দরকার হবে সেটি পালন করবে। যদি গর্ভবতী মহিলা স্বামীর মৃত্যুর পর চার মাস দশ দিন পুরা হওয়ার আগেই সন্তান প্রসব করে তাহলে তাকে ওই মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু চার মাস দশ দিন অপেক্ষা করার পরও যদি তার সন্তান প্রসব না হয় তাহলে তার ইদ্দত সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত চলবে। এভাবে আলোচ্য আয়াত দুটির মধ্যকার বাহ্যত বিরোধ সুনির্দিষ্টকরণের (তাখসিস) মাধ্যমে দূর করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় আয়াতটি গর্ভবতী বিধবাদের প্রসঙ্গে প্রথম আয়াতের সাধারণ বিধানকে সুনির্দিষ্ট করেছে।[8]

প্রতীকী ব্যাখ্যার (তাবিল) মাধ্যমে দু'টি সাধারণ (আম) প্রমাণের সমন্বয় সাধন করে তাদের পরস্পরের প্রয়োগের পরিসর ও বিষয়বস্তু পৃথক করা যেতে পারে। ধরুন– নামাজের বিষয়ে দুটি বিরোধপূর্ণ নির্দেশ রয়েছে যার একটিতে বলা হয়েছে 'আমার উম্মতের জন্য নামাজ ফরজ', আর অন্যটিতে বলা হয়েছে– 'আমার উম্মতের জন্য নামাজ ফরজ নয়।' এই দুটি বিধানের সমন্বয়ের জন্য মনে করা যেতে পারে, যে প্রথমটিতে বয়স্ক (বালেগ) ও মানসিক সুস্থ লোকদের এবং দ্বিতীয়টিতে শিশু (নাবালক) ও মানসিক অসুস্থ লোকদের কথা চিন্তা করা হয়েছে। যদি এমনটি করা সম্ভব না হয়, দুটি বিধানকে তাদের স্ব স্ব প্রয়োগের সময়ের আলোকে সমন্বয় করা যেতে পারে অথবা মনে করা যেতে পারে যে, তাদের প্রতিটিতে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতির কথা চিন্তা করা হয়েছে। একটি অথবা উভয় বিধান প্রকৃতিগতভাবে সুস্পষ্ট (জাহির) বিধান হতে পারে এবং এভাবে তাবিলের জন্য উন্মুক্ত থাকতে পারে। যাতে বিরোধ পরিহার করা যায় সে জন্য জাহিরের স্পষ্ট অর্থের থেকে ভিন্ন ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে।

সাক্ষ্য দান সম্পর্কিত বাহ্যত দুটি পরস্পরবিরোধী হাদিসের মাধ্যমে এর উদাহরণ তুলে ধরা যেতে পারে। দু'টি রেওয়ায়েতের প্রথমটিতে গ্রেফতারের উদ্দেশ্যে রসুল সা.-এর ভাষণের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে :

اَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهُوْدِ؟ قَالُوْا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ : قَالَ الَّذِيْ يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ اَنْ يُسْأَلَهَا

www.pathagar.com

'কে সর্বোত্তম সাক্ষ্য দেয় তা কি আমি তোমাদেরকে জানাব?' জবাবে শ্রোতারা বললেন, 'ইয়া রসুল, আপনি আমাদেরকে জানান।' এর জবাবে তিনি উপস্থিত লোকদেরকে বললেন, সে হলো ওই ব্যক্তি যে অনুরোধ জানানোর আগেই সাক্ষ্য প্রদান করে।[৫]

অবশ্য আরেকটি হাদিসে রসুল সা. বলেছেন,

خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ إِنَّ بَعْدَهُمْ قَوْمًا يَشْهَدُوْنَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُوْنَ

'সর্বোত্তম উম্মত হচ্ছে তারা যাদের সাথে আমি বাস করছি, এরপর যারা আসবে তারা, অতঃপর যারা আসবে তারা কিন্তু তারপরেও লোকরা সাক্ষ্য দেবে, যদিও তাদেরকে তা দেয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।[৬]

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, প্রথম হাদিসে যে বিষয়টি সুপারিশ করা হয়েছে দ্বিতীয় হাদিসে তাকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে। প্রথম হাদিস অনুযায়ী সাক্ষ্যের সর্বোত্তম রূপ হচ্ছে বিনা অনুরোধে সাক্ষ্য প্রদান করা। অন্যদিকে দ্বিতীয় হাদিসে একে ভ্রূকটি করা হয়েছে। যেহেতু দুটি হাদিসের কোনোটিতেই বিশেষ প্রেক্ষাপটের কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়নি তাই তাবিলের মাধ্যমে বিবেচনা করা যায় যে, প্রথম হাদিসটিতে আল্লাহর অধিকারের কথা (হুকুম আল্লাহ) চিন্তা করা হয়েছে আর দ্বিতীয়টিতে মানুষের অধিকারের (হুকুম আল ইবাদ) কথা ভাবা হয়েছে। এভাবে রূপক বিশ্লেষণের মাধ্যমে হাদিস দু'টির মধ্যকার আপাত বিরোধ নিরসন করা যায়।[৭]

এমনকি দুটি বিরোধপূর্ণ আদেশের উভয়টিই সুনির্দিষ্ট (খাস) হলেও রূপক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তার সমাধান করা যেতে পারে। এ ঘটনায় পুনরায় তাবিল অবলম্বন পুনরায় দুটি বিরোধপূর্ণ নির্দেশের প্রতিটির বিষয়বস্তু ও পরিধি পৃথক করার উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আহমদ তার কর্মচারীকে দুটি নির্দেশ দিলেন। তার একটিতে বললেন, 'জায়েদকে এক হাজার দিনার প্রদান কর' এবং অন্যটিতে বললেন, 'জায়েদকে এক হাজার দিনার প্রদান করো না'। এখানে পরিস্থিতি যদি অনুমোদন করে তাহলে এখানে প্রথম নির্দেশটিতে আহমদ ও জায়েদের মধ্যকার স্বাভাবিক সম্পর্ক প্রকাশ পেয়েছে আর দ্বিতীয়টিতে দুজনের মধ্যকার বৈরী পরিস্থিতি প্রকাশ পেয়েছে।[৮]

বিরোধপূর্ণ দুটি নির্দেশের একটি সাধারণ (আম) ও অপরটি সুনির্দিষ্ট (খাস) হলে সে ক্ষেত্রে তাখসিস আল আম অর্থাৎ 'সাধারণের একাংশকে সুনির্দিষ্টকরণ' বলে

www.pathagar.com

পরিচিত পদ্ধতি অনুসরণে পরেরটির পরিধি থেকে পূর্বেরটি বাতিল করার মাধ্যমে এদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যেতে পারে। এ থেকে আবারও একথা বুঝানো হয়েছে যে, দু'টি বিধানের প্রতিটি একে অপরের থেকে আলাদা হলে ভিন্ন বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে তাদের প্রয়োগ করা হয়েছে এবং উভয় বিধানই কার্যকর থাকতে পারে। অনুরূপভাবে কোনো আয়াত বা রেওয়ায়েতের শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ হতে পারে এবং অপরটি একটি আয়াত বা রেওয়ায়েতের সাথে বিরোধপূর্ণ বলে মনে হতে পারে এবং তার একটিকে বিশ্লেষণ করে সীমিত ও অপরটিকে নিরঙ্কুশ অর্থে উন্নীত করার মাধ্যমে ওদের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও বিরোধ দূর করা যেতে পারে। এ গ্রন্থের বিশ্লেষণের নিয়মাবলি শীর্ষক পৃথক অধ্যায়ে এসব দৃষ্টান্ত ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অন্যান্য পদ্ধতির উদাহরণ প্রদান করা হয়েছে।

সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে বিরোধ নিরসণের পরবর্তী পদক্ষেপ হবে একটি বিধানের ওপর অন্যটির অগ্রাধিকার দেয়া। এ সম্পর্কে উপরে আলোচনা করা হয়েছে। অনুসন্ধানে দেখা যেতে পারে যে, দু'টি বিধানের মধ্যে একটির পক্ষে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী দলিলের সমর্থন রয়েছে। মৌলিকভাবে এ ক্ষেত্রে অসম শক্তিসম্পন্ন দু'টি বিধানের বিরোধ নিরসন করা হয়। এ ক্ষেত্রেও একটি বিধানের ওপর আরেকটি বিধানকে অগ্রাধিকার প্রদান, এমনকি একটির দ্বারা অপরটির এক ধরনের সুস্পষ্টকরণ বা ব্যাখ্যা বুঝাতে পারে। শক্তির অসমতা বিষয়বস্তু (মতন) বা যথার্থতার প্রমাণের (রেওয়ায়েত) ক্ষেত্রে হতে পারে। বিবরণের সুস্পষ্টতা অথবা ভাষার সাথে মতন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেওয়ায়েত, বর্ণনাকারীদের ঐতিহাসিক নির্ভরযোগ্যতার মতন বা বিষয়বস্তুর সংশ্লিষ্ট ভিত্তিতে অগ্রাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে রূপকের চেয়ে আক্ষরিক, ইশারার (কিয়াসের) চেয়ে স্পষ্টকে (সারিহ), পরোক্ষ অর্থের (ইশারা আল মতন) চেয়ে স্পষ্ট অর্থকে (ইবারা আল-নস) এবং অনুমানভিত্তিক অর্থের (দলালত আন-নস) চেয়ে পরোক্ষ অর্থকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। অনুরূপভাবে যেসব শব্দ অধিকতর স্পষ্ট অর্থ প্রকাশ করে সেগুলোকে অপেক্ষাকৃত কম অর্থ প্রকাশকারী শব্দের চেয়ে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। এভাবে মুফাচ্ছারের (দ্ব্যর্থহীন) ওপর মাহকুমের (প্রাঞ্জল), মুফাচ্ছারের ওপর নস (স্পষ্ট) এবং জহুরের (প্রকাশ্য) ওপর নসকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। অস্পষ্ট শব্দগুলোর মধ্যে দুরূহর (মুশকিল) চেয়ে সাবিত (অস্পষ্ট), মুজমালের (দ্ব্যর্থবোধক) চেয়ে মুশকিল (দুরূহ) এবং মুতাশাবিহাতের (দুর্বোধ্য) চেয়ে মুজমালকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়, যেগুলো অন্যত্র ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের নিয়মাবলি আলোচনা প্রসঙ্গে পুনরায় আলোচনা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

বর্ণনার ক্ষেত্রে সমতার অভাব প্রধানত হাদিসের সাথে সংশ্লিষ্ট উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, মাশহুরের সাথে মুতাওয়াতুরের তুলনা করলে সে ক্ষেত্রে মুতাওয়াতুর অগ্রাধিকার পাবে। অনুরূপভাবে বিচ্ছিন্ন হাদিসের (আহাদ) চেয়ে মশহুর হাদিসকে অগ্রাধিকার দেয়া হয় এবং একজন অফকিহ্ বর্ণনাকারীর হাদিসের চেয়ে ফকিহ্ বর্ণনাকারীর হাদিসকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। যেসব ব্যক্তির স্মরণশক্তি ভালো বলে জানা গেছে তাদের বিবরণকে যাদের স্মরণশক্তির বিষয় নিশ্চিত নয় তাদের বিবরণের চেয়ে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। অনুরূপভাবে বলা যায় যে, নেতৃত্ব স্থানীয় সাহাবিদের বর্ণিত হাদিস অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত সাহাবিদের বর্ণিত হাদিসের চেয়ে অগ্রাধিকার পাবে। কারণ নেতৃস্থানীয় সাহাবিগণ অব্যাহতভাবে রসুল সা.-এর সহচর্য লাভের কারণে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। হানাফীগণও বর্ণনাকারীর কাজকর্মকে তার বর্ণিত হাদিসের সমর্থনমূলক বিষয় বলে বিবেচনা করেন যা হাদিসটির শক্তি বৃদ্ধি করে। অন্যদিকে মালিকীগণ মদিনার জীবনাচরণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হাদিসকে এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এমন হাদিসের চেয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন। অনুরূপভাবে কোনো বর্ণনাকারী ঘটনার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকলে তার বর্ণনাকে এর সাথে জড়িত নয় এমন বর্ণনাকারীর বর্ণনার চেয়ে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। তাই দেখা যাচ্ছে যে, রসুল সা. হজ পালনকালে হালাল অবস্থায় অর্থাৎ হজ্বের ইহরাম পরা অবস্থার অবসান ঘটলে মায়মুনাকে বিয়ে করেন বলে রসুল সা.-এর পত্নী মায়মুনা রা. এর বর্ণিত হাদিসকে ইবনে আব্বাস রা. কর্তৃক বর্ণিত এ সম্পর্কিত হাদিসের চেয়ে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। ইবনে আব্বাসের হাদিসে বলা হয়, রসুল সা. ইহরামের পবিত্র অবস্থায় মায়মুনাকে বিয়ে করেন।[৯] এভাবে অধিকতর নির্ভরযোগ্য বর্ণনা সূত্রে বর্ণিত হাদিসকে দু'টি রেওয়ায়েতের হাদিসের মধ্যে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

কখনো কখনো মুজতাহিদকে এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে যাতে দেখা গেছে যে, দু'টি বিরোধপূর্ণ হাদিস এমন বিষয়ের অনেকগুলোর দৃষ্টিতে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী এবং অন্যদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল, সে ক্ষেত্রে মুজতাহিদকে নিজস্ব ইজতিহাদের মাধ্যমে এদের সঠিক শক্তি ও দুর্বলতা যাচাই ও নির্ণয় করতে হবে।

আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, হাদিসের ছয়জন ইমাম- আল-বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, আল নাসাঈ, আত-তিরমিজি ও ইবনে মাজাহর বর্ণিত হাদিসের মধ্যে কারো কারোর বর্ণিত হাদিস অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। এর মধ্যে প্রথম দুইজন ইমামের বর্ণনা করা হাদিসগুলো অন্যদের চেয়ে অগ্রাধিকার পাবে এবং যদি দুটি বিরোধপূর্ণ হাদিসের একটি বুখারি এবং অন্যটি মুসলিম বর্ণনা করেন, তাহলে বুখারির হাদিসটি মুসলিমের চেয়ে অগ্রাধিকার পাবে।[১০]

www.pathagar.com

অগ্রাধিকার প্রাপ্তির অন্য আরেকটি নিয়ম অনুযায়ী সমর্থনসূচক সাক্ষ্য প্রমাণ নেতিবাচক প্রমাণের চেয়ে অগ্রাধিকার পাবে। দাসের অধিকার সংক্রান্ত দুটি হাদিসের বিধান উল্লেখ করে এর দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। তাতে বলা হয়েছে, একজন নারী দাসত্ব থেকে মুক্ত হলে তালাক পেয়ে যাবে। এতে বলা হয়েছে, বারিরাহ নামে আয়েশা রা.-এর এক দাসী মুগিস নামে আরেকজন দাসকে বিয়ে করেছিল। আয়েশা রা. তাকে মুক্ত করে দিলেন এবং সে মুগিসের থেকে আলাদা হয়ে যেতে চাইল। মুগিস তখনো দাস ছিল। বিষয়টি রসুল সা.-এর নজরে আনা হলে তিনি বারিরাহকে মুগিসের সাথে বিবাহিত অবস্থায় থাকতে অথবা তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার যে কোনো একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ দিলেন। কিন্তু একই ঘটনা সম্পর্কে দ্বিতীয় হাদিসে বলা হয়েছে, বারিরাহকে যখন মুক্ত করে দেয়া হয়। তখন তার স্বামী মুগিস একজন মুক্ত মানুষ ছিল। দুটি হাদিসে স্বামীর মর্যাদার বিষয়ে বিরোধ রয়েছে। কিন্তু নিশ্চিত জানা গেছে যে, মূলত মুগিস একজন দাস ছিল এবং এ ব্যাপারে কোনো বিরোধ নেই। যে রেওয়ায়েতটি মূল অবস্থা অস্বীকার করা হয়েছে সেটি হ্যাঁ বাচক সাধারণ নিয়মের আলোকে উপেক্ষা করা হয়েছে। অর্থাৎ যে প্রমাণ মূল অবস্থা অব্যাহত রাখাকে যথার্থ করে তা ওই অবস্থা অস্বীকার করে যে প্রমাণ তার চেয়ে অগ্রাধিকার পাবে। এ কারণে ফকিহগণ মত প্রকাশ করেন যে, কোনো দাস নারী কোনো দাস পুরুষের সাথে বিবাহিত অবস্থায় দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করলে বিবাহিত অবস্থায় থাকা অথবা বিচ্ছেদ ঘটানোর সুযোগ সে পাবে। কিন্তু স্বামী যদি মুক্ত মানুষ হয় তা হলে সে এ সুযোগ পাবে না বলে মনে করেন ইমাম মালিক ও শাফেয়ীসহ সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমগণ। অবশ্য আবু হানিফার মতে, এমনকি স্বামী স্বাধীন মানুষ হলেও সে এ সুযোগ পাবে।[১১]

অগ্রাধিকার প্রদানের আরেকটি নিয়ম রয়েছে, যা সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে। তা হলো অনুমোদন যোগ্যতার চেয়ে নিষেধকে অগ্রাধিকার পাবে। একটি বিষয়ে সমশক্তি সম্পন্ন দুটি বিরোধপূর্ণ বিধানের যদি একটি নিষিদ্ধ ও অপরটি অনুমোদন বুঝায় তাহলে, প্রথমটি পরেরটির চেয়ে অগ্রাধিকার পাবে। এ কথা বলার পরেও অবশ্য মুজতাহিদের পক্ষে এ নিয়ম উপেক্ষা করা সম্ভব এবং এর পরিবর্তে তিনি যে বিধান সহজ হবে সেটিকে যেটি কষ্টকর হবে তার চেয়ে অগ্রাধিকার দিতে পারবেন।[১২]

যদি দু'টি বিরোধপূর্ণ বিধানের মধ্যে সমন্বয় সাধন অথবা একটি চেয়ে অন্যটির অগ্রাধিকার প্রদানের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে রহিতকরণের পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। এ জন্য এসব আয়াতের অবতীর্ণের সময় (আসবাব আল-নুজুল), এ সংক্রান্ত সুন্নাহর বর্ণনা এবং দুই আয়াতের মধ্যকার কালানুক্রমিক ক্রম

অনুসন্ধান করা প্রয়োজন হবে। যদি এটি করা অসম্ভব হয়, তাহলে অবশ্যই আয়াতের রহিতকরণ ব্যবস্থা নিতে হবে এবং মুজতাহিদ এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী সাক্ষ্য প্রমাণ অবলম্বন করতে পারেন। এভাবে কুরআনের দুইটি বিধানের মধ্যে যদি বিরোধ সৃষ্টি হয় তাহলে তিনি উভয় আয়াত পাঠ করে সুন্নাহর আলোকে বিষয়টি নির্ধারণ করতে পারেন। সুন্নাহর দুইটি বিধানের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে সে ক্ষেত্রে মুজতাহিদ নিম্নক্রম অনুযায়ী তা নির্ধারণ করলে প্রথমে তিনি সাহাবিগণের ফতোয়ার উল্লেখ করবেন। তা পেতে ব্যর্থ হলে কিয়াসের আলোকে তিনি তা নির্ধারণ করবেন। মুজতাহিদ যদি নিম্ন পর্যায়ের কোনোটিতে সিদ্ধান্ত পেতে ব্যর্থ হয় তাহলে তিনি শরিয়াহর সাধারণ নিয়ম অবলম্বন করবেন। এ ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য হবে নিম্নের উদাহরণে এ বিষয়টি তুলে ধরা হলো। জামাতে নামাজ আদায়ের সময় কুরআন তিলওয়াতের একাংশের বিষয়ে দুটি বিরোধপূর্ণ বিধান রয়েছে। এখানে যে বিষয়টি সমাধান করা প্রয়োজন তাহলো জামাতে নামাজে শামিল মুক্তাদিসহ ইমামের সাথে সাথে সুরা ফাতিহা পাঠ করা প্রয়োজন কি না অথবা তাদেরকে নীরব থাকার দরকার হবে কি না। এ ব্যাপারে কুরআন থেকে দুটি পরস্পর বিরোধী উত্তর পাওয়া যেতে পারে। আলোচ্য দুইটি আয়াতের প্রথমটিতে বলা হয়েছে : আর যখন কুরআন মজিদ তোমাদের সামনে পাঠ করা হয়, তখন খুবই মনোযোগ সহকারে তা শুনবে এবং চুপচাপ থাক। সম্ভবত তোমাদের ওপরও রহমত নাজিল হবে (আল-আরাফ, ৭ : ২০৪)। এ আয়াত অনুসারে ইমাম যখন কুরআন তেলাওয়াত করবেন তখন মুক্তাদিদের চুপচাপ থাকা উচিত। অন্য এক আয়াতে অবশ্য ইমাম ও মুক্তাদি উভয়কে কুরআন পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 'যতটুকু কুরআন তোমরা সহজে পাঠ করতে পার, ততটাই পড়তে থাক (আল-মুজাম্মিল, ৭৩ : ২০)। যদিও এ দুটি আয়াতের কেনোটিতেই নির্দিষ্ট কোনো নামাজের কথা উল্লেখ করা হয়নি, তৎসত্ত্বেও তা দৃশ্যত মুক্তাদিদের অবস্থানের বিষয়ে বিরোধপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এর একটির চেয়ে অন্যটিকে অগ্রাধিকার দেয়ার মতো অতিরিক্ত কোনো দলিল প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তাই উভয়ের ওপর আমল করা হয় এবং বিষয়টি সুন্নাহর আলোকে নির্ধারণ করা হয়েছে। হাদিস থেকে এটি জানা গেছে যে, রসুল সা. নামাজের ইমামতি করার সময় মুক্তাদিদের বললেন, তারা তার সাথে কুরআন পাঠ করে কি না? তাদের উত্তর শোনার পর তিনি ইমামের সাথে সাথে কুরআন না পড়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু এরপর এ বিষয়ে বর্ণিত হাদিসগুলোর সাথে এর অসামাঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হয়েছে, যা থেকে এ বিষয়ে ফকিহদের মতপার্থক্যের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আবু হানিফা, মালিক, ইবনে হাম্বল ও আল শাফেয়ী (পরে তিনি তার আগের মত পরিবর্তন করেন) মনে করেন যে, যেসব নামাজে ইমাম উচ্চস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করেন সেসব নামাজে মুক্তাদির সুরা

www.pathagar.com

ফাতিহা পড়ার দরকার নেই। কিন্তু ইমাম যখন মনে মনে কুরআন পড়েন তখন মুসল্লিদের সুরা ফাতিহা পড়া উচিত। হানাফী ফকিহগণ মনে করেন, এর কোনো ক্ষেত্রেই ইমামের পেছনে মুক্তাদিদের কুরআন তেলাওয়াতের দরকার নেই।[১৩]

যে সব ঘটনায় সুন্নাহর সাহায্যে কোনো বিষয় নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না তখন মুজতাহিদ সাহাবিদের রা. ফতোয়ার সাহায্য গ্রহণ করেন এবং তা না পেলে কিয়াস অবলম্বন করেন। এর উদাহরণ হলো, রসুল সা. কিভাবে সূর্য গ্রহণের সময়ের নামাজ বা সালাতুল কুসুফ আদায় করতেন সে ব্যাপারে দুটি বিরোধপূর্ণ বিবরণ রয়েছে। এর একটি বিবরণে বলা হয়েছে, রসুল সা. দুই রাকাত নামাজ আদায় করেন। প্রত্যেক রাকাতে দু'বার রুকু করেন এবং দু'বার সিজদা করেন। কিন্তু অন্য এক হাদিসে বলা হয়েছে, দুই রাকাতের মধ্যে প্রত্যেক রাকাতে চারটি রুকু ও চারটি সিজদা রয়েছে। এ ব্যাপারে আরেকটি হাদিসও রয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, এ নামাজে প্রতি রাকাতে তিনটি রুকু ও তিনটি সিজদা রয়েছে।[১৪] এ বিরোধপূর্ণ বিষয়বস্তুর মধ্যে সমন্বয় সাধন অথবা একটির ওপর অন্য বিবরণের অগ্রাধিকার প্রদান করা সম্ভব না হওয়ায় এ সম্পর্কিত সব ক'টি বিবরণের ওপর আমল বাতিল করা হয়েছে এবং কিয়াসের মাধ্যমে বিষয়টি নির্ধারণ করা হয়েছে। যেহেতু সালাত আল-কুসুফ হচ্ছে এক প্রকার নামাজ সেহেতু তার ক্ষেত্রে নামাজের স্বাভাবিক নিয়ম প্রয়োগ করা হয়েছে। যেহেতু সব ফরজ নামাজে কোনো ধরনের ব্যতিক্রম ছাড়াই প্রতি রাকাতে একটি রুকু ও দু'টি সিজদা রয়েছে এবং কিয়াসের মাধ্যমে সালাত আল কুসুফের ক্ষেত্রে তা সম্প্রসারিত করা হয়েছে।[১৫]

দুইটি কিয়াসের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে যদি পরস্পরের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব না হয় তাহলে তার একটিকে অবশ্যই অগ্রাধিকার দিতে হবে। যে কিয়াসের কার্যকর কারণ (ইল্লত) একটি স্পষ্ট আয়াত বা রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে তাকে যে কিয়াসের ইল্লত অনুমানের (ইসতিম্বাত) মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে, তার চেয়ে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। অনুরূপভাবে যে কিয়াসের ইল্লত পরোক্ষ বিধানের (ইশারাহ আল-নস) ভিত্তিতে গঠিত তা যে কিয়াসের ইল্লত নিছক যথার্থ ও যৌক্তিক গুণসম্পন্ন এবং যা অনুমান ও ইজতিহাদের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয় তার চেয়ে অগ্রাধিকার পায়। যখন কিয়াসের ইল্লত নস-এ স্পষ্টভাবে বিবৃত হয় অথবা ইজমা কর্তৃক কিয়াসের ফলাফল সমুন্নত রাখা হয় তখন কোনো বিরোধ দেখা দেবে বলে আশা করা যায় না। ব্যতিক্রমী ঘটনার ক্ষেত্রে নসে স্পষ্ট বিবরণ থাকা সত্ত্বেও কোনো মুজতাহিদ ওই সব বিষয়ে অজ্ঞতাবশত অনুমিতি কার্যকর কারণের (ইল্লাহ মুস্তানবাতাহ) ভিত্তিতে কিয়াস গঠন করে অন্যরকম ফলাফল পান তবে তা অগ্রাহ্য করা হবে।[১৬]

www.pathagar.com

অনুমিত ইল্লতের ভিত্তিতে গঠিত দুটি কিয়াসের মধ্যে বিরোধ দেখা দিতে পারেই। কারণ এ ধরনের ইল্লতের ক্ষেত্রে ধারণামূলক যুক্তি ও ইজতিহাদের বিষয় সংশ্লিষ্ট থাকে। এভাবে দুইজন মুজতাহিদ ইল্লত শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন। এর উদাহরণ হলো, নাবালক মেয়ের বিয়ে করা সংক্রান্ত বাধ্যতামূলক অভিভাবকত্বের ইল্লত (উয়াইলিয়া আল-ইজবার)। ইমাম আবু হানিফার মতে এ বিয়ের ক্ষেত্রে অভিভাবকের ইজবার ক্ষমতার ইল্লত হবে নাবালিকার আশ্রিত অবস্থা। অন্যদিকে ইমাম শাফেয়ী মেয়েটির কুমারিত্বকে তার ইল্লত বলে বিবেচনা করেন। ইজতিহাদের এ পার্থক্যের কারণে কিয়াসেও পার্থক্য দেখা দেয় এবং যে কার্যকর কারণের ভিত্তিতে কিয়াস গঠন করা হয় তার ওপর নির্ভর করে মুজতাহিদদ্বয় পরস্পরের থেকে পৃথক ফল পেতে পারে। অবশ্য এ ধরনের পার্থক্য সহনীয় হয় এবং দু'জন ইমামের কেউই ইজতিহাদের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যকে অনুৎসাহিত করেননি। দু'টি বিরোধপূর্ণ কিয়াসের কোনোটিকে অন্যটির চেয়ে অগ্রাধিকার দেয়া সম্ভব হয় না এমন ক্ষেত্রে মুজতাহিদ যেটি তার কাছে ভালো মনে হয় সেটিকে ইচ্ছানুযায়ী অগ্রাধিকার দিতে পারেন। এমনকি এ ধরনের অগ্রাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে তার ব্যক্তিগত মত ছাড়া আর কোনো ভিত্তি নাও থাকতে পারে।[১৭]

ওপরে বর্ণিত পদ্ধতিগুলোর কোনোটাই যদি কোনো বিষয়ে বিধান নির্ণয়ে প্রয়োগ করা না যায় তাহলে মুজতাহিদ শরিয়াহর মূল নিয়মের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন। শরিয়াহর ওই বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা পাওয়া যায়নি এ কথা ধরে নিয়ে এটি করা হবে। এর একটি উদাহরণ হলো, হিজড়ার ক্ষেত্রে শরিয়াহর বিধান কী তা নির্ণয় করা। তারা পুরুষ না নারী জাতীয় তা নির্ধারণ করা হয়নি এবং একটি অন্যটির ওপর অগ্রাধিকার দেয়া সম্ভব হয় না। এ ক্ষেত্রে মূল নিয়মের আশ্রয় গ্রহণের অর্থ হলো, বিষয়টি প্রথমে যে অবস্থায় ছিল সে অবস্থাই থাকবে। যেহেতু এ সংক্রান্ত দুটি সম্ভব নয় এবং একটিকে অন্যটির ওপর অগ্রাধিকার দেয়া সম্ভব হচ্ছে না, সেহেতু একপক্ষ বা অন্যপক্ষের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। বরং তা হবে একটি সতর্কতামূলক পদক্ষেপ; কারণ পরিস্থিতি থেকে ওই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের আভাস পাওয়া যেতে পারে। উদাহরণ হলো, কোনো কোনো পরিস্থিতিতে ওয়ারিশি সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ক্ষতি রোধের জন্য সতর্কতামূলক ব্যাখ্যা বিবেচনা করে তাকে পুরুষ আবার অন্য পরিস্থিতিতে নারী বলে বিবেচনা করা হয়।[১৮]

এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে মুজতাহিদের জন্য জরুরি বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে তিনি শরিয়াহর সাধারণ মূলনীতি ও চেতনার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিতে

পারবেন না। কোনো সাক্ষ্য প্রমাণের ভালো ও মন্দ দিক বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তিনি কখনোই আল্লাহ্ তায়ালার মৌলিক উদ্দেশ্যের থেকে তার দৃষ্টি সরাতে পারবেন না।

টিকা

১. বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৪৬১; খুদারী, উসুল, পৃষ্ঠা ৩৫৯;, Aghnides, Muhammedan Theories, পৃষ্ঠা, ৬৬।

২. গাজ্জালী মুস্তাস্ফা, ২ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১২৬; খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ২৩০।

৩. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা ২২৯; খুদারী, উসুল, পৃষ্ঠা ৩৫৯।

৪. আবু জাহবাহ, উসুল, পৃ. ২৪৫; বাদরান, উসুল, পৃ. ৪৬৭; খাল্লাফ, ইলম, পৃ., ২৩১।

৫. মুসলিম, সহিহ, পৃষ্ঠা, ২৮১, হাদিস নম্বর ১০৫৯; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা, ৪৬৫।

৬. তাবরিজী, মিশকাত, ৩ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৬৯৫, হাদিস নম্বর ৬০০১।

৭. বাদরান, উসুল পৃষ্ঠা, ৪৬৬।

৮. তুলনীয়, খুদারী, উসুল, পৃষ্ঠা, ৩৬১।

৯. আবু দাউদ, সুনান, ২ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৪৮৬-৮৭, হাদিস নম্বর ১৮৩৯ ও ১৮৪০, গাজ্জালী মুস্তাস্ফা, ২ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১২৮, খুদারী, উসুল, পৃষ্ঠা, ১৬৭।

১০. আবু জাহারাহ, উসুল, পৃষ্ঠা, ২৪৬।

১১. আবু দাউদ, সুনান, ২ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৬০১-৬০২, হাদিস নম্বর ২২২৩-৭, পাদ টিকা নম্বর ১৫৪৮, বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা, ৪৬৫, খুদারী, উসুল, পৃষ্ঠা, ৩৬৩।

১২. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা, ২৩২; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা, ৪৭০, খুদারী উসুল, পৃষ্ঠা, ৩৬৭।

১৩. আবু দাউদ, সুনান, ২ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২১১, হাদিস নম্বর ৮২৫ ও পাদ টিকা নম্বর ৩৭৩; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা, ৪৬৮-৬৯, খুদারী, উসুল, পৃষ্ঠা, ৩৫৯।

১৪. আবু দাউদ, সুনান, ১ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৩০৪, হাদিস নম্বর ১১৭৩-৭।

১৫. বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা, ৪৬৯।

১৬. খাল্লাফ, ইলম, পৃষ্ঠা, ২৩২, বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা, ৪৭০।

১৭. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা, ২৪৭-৪৮; খুদারী, উসুল, পৃষ্ঠা, ৩৬০।

১৮. বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা, ৪৬৯-৭০।

www.pathagar.com

উনিশ অধ্যায়

ইজতিহাদ (ব্যক্তিগত গবেষণা)

ইসলামি আইনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস হচ্ছে ইজতিহাদ। কুরআন ও সুন্নাহর পরই হচ্ছে এর অবস্থান। ইজতিহাদ ও শরিয়াহর অবতীর্ণ খোদায়ী উৎসের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো, ইজতিহাদ হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া। অন্যদিকে আল্লাহর তরফ থেকে ওহি নাজিল ও নবুওতি আইন প্রাপ্তির পথ রসুল সা.-এর ওফাতের (মৃত্যু) সাথে সাথে বন্ধ হয়ে গেছে। এ অর্থে ইজতিহাদ খোদায়ী বিধিবিধানের ব্যাখ্যা প্রদান এবং পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে মুসলিম উম্মাহর ন্যায়বিচার, মুক্তি ও সত্যপথ লাভের আকাঙ্ক্ষা অর্জনের সাথে একে সম্পর্কিত করার প্রধান উপায় হিসেবে অব্যাহতভাবে বিদ্যমান থাকবে।

যেহেতু ইজতিহাদ অবতীর্ণ খোদায়ী বিধানের থেকে তার বৈধতা লাভ করে থাকে, সেহেতু কুরআন ও সুন্নাহর সাথে তার কতটুকু মিল রয়েছে সে আলোকেই তার বিশুদ্ধতা পরিমাপ করা হয়। তাই দেখা যাচ্ছে যে ইসলামি আইনের উৎসগুলো একান্তভাবে একশিলা ধরনের এবং সাধারণভাবে গৃহীত ফিকাহর মূলকে প্রাথমিক ও গৌণ শ্রেণিতে বিভাজন আসলে একটি বাহ্যিক বিষয়, বাস্তব নয়। অবতীর্ণ খোদায়ী বিধিবিধান ও যুক্তির মধ্যে অর্জিত মিলের মাত্রার ওপর শরিয়াহর অত্যাবশ্যকীয় ঐক্য নিহিত রয়েছে। আর ইজতিহাদ হচ্ছে এ ঐক্য বজায় রাখার প্রধান উপায়। কুরআন-সুন্নাহ ব্যতিরেকে ইসলামি আইনের অন্য যেসব উৎস রয়েছে তার সবই হচ্ছে ইজতিহাদের বিভিন্ন ধরনের প্রকাশ এবং এদের মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায় তা মূলত পদ্ধতিগত। এভাবে সর্বসম্মত মতৈক্য, কিয়াস, আইনগত অগ্রাধিকার, জনস্বার্থ বিবেচনা (মাসলাহা) ইত্যাদির সবই কেবল ইজতিহাদের মূল শিরোনামের অধীনে নয় বরং কুরআন ও সুন্নাহর মধ্য দিয়ে আন্তঃসম্পর্কিত।[১] এটি হয়েছে অংশত এসব উপবিভাগের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের কারণে। এগুলোকে প্রায়ই যুগপৎ ও একই সাথে সংঘটিত হতে দেখা যায়। এভাবে প্রায়ই কিয়াস, মাসলাহা বা ইস্তিহ্ছান ইত্যাদির ভিত্তিতে ইজমার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যদিও তা ইজমা নামে পরিচিত। অনুরূপভাবে কিয়াস ও ইস্তিহ্ছান পরস্পরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত এ অর্থে যে প্রধান দুই প্রকার ইস্তিহ্ছান একই বিষয়ে দু'টি কিয়াসের মধ্যকার বিষয় বিবেচনার আলোকে গঠিত হয়। মাসলাহা ও ইস্তিহ্ছানের মধ্যকার পার্থক্য মূলত পদ্ধতিগত। কারণ এ দু'টি বিষয় কার্যত একই। এর একটি হচ্ছে ইজতিহাদের মালেকী দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ, আর অন্যটি হানাফীগণের মত। এতে এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে, শরিয়াহর অবতীর্ণ সব সাক্ষ্য প্রমাণ হচ্ছে একটি মাত্র বিষয়ের প্রতিফলন, আর তা হলো ইজতিহাদ।

www.pathagar.com

মূল শব্দ জাহাদা থেকে ইজতিহাদ শব্দটি এসেছে। এর আক্ষরিক অর্থ হলো প্রচেষ্টা চালানো অথবা যে কোনো কাজ সম্পাদনে প্রয়াস চালনো যা করতে বেশ কষ্ট হয়। কেউ যদি কেবল হালকা ধরনের কাজ করতে পারে কিন্তু কঠোর পরিশ্রম করতে পারে না তা হলে তার ঐ কাজকে জাহাদা বলা হবে না। অবশ্য বিচারিক ক্ষেত্রে ইজতিহাদ প্রধানত বিচারকের দৈহিক সামর্থ্যের সমন্বয়ে নয় বরং তার বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টার সমন্বয়ে গঠিত হয়। ইজতিহাদের সংজ্ঞায় বলা যায় যে শরিয়তে সূত্রসমূহের বিস্তারিত সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে এর বিধিবিধান সংগ্রহের লক্ষ্যে অধিকতর সম্ভাবনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিচারকের সর্বাত্মক বিনিয়োজিত প্রচেষ্টা হচ্ছে ইজতিহাদ।[২] কতিপয় আলেম ইজতিহাদের সংজ্ঞায় বলেছেন যে উৎস থেকে শরিয়াহর বিধিবিধান অনুমান অথবা এ ধরনের বিধান প্রণয়ন করা এবং নির্দিষ্ট সমস্যার ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ, প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার সব মেধা ও ধীশক্তিকে নিয়োজিত করা।[৩] ইজতিহাদ অত্যাবশ্যকীয়ভাবে অনুমানের সমন্বয়ে গঠিত, যা একটি ধারণামূলক দলিল (যন্নী); ফলে স্পষ্ট আয়াত বা রেওয়ায়েতকে তার থেকে এর বিধিবিধান সংগ্রহের বহির্ভূত রাখা হয়েছে। এ ছাড়া নিজস্ব মতামত ও বিচার-বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে কোনো বিদ্বান ব্যক্তির কাছ থেকে জেনে অথবা প্রাসঙ্গিক সাহিত্য বিবেচনায় এনে কোনো হুকম উদ্ভাবন করাকেও বহির্ভূত রাখা হয়েছে। তাই দেখা যাচ্ছে যে, কোনো ব্যক্তি শরিয়াহর বিস্তারিত বিধিবিধান জানেন কিন্তু সরাসরি এর উৎসসমূহ থেকে আহকাম সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিজস্ব বিচার-বিবেচনার চর্চা বা প্রয়োগ করতে সক্ষম নন, তাহলে তিনি মুজতাহিদ নন। অন্য কথায় বলা যায় যে হুকম শারয়ীর বিষয়ে মতামত প্রণয়নের সমন্বয়ে ইজতিহাদ গঠিত হয়। ইজতিহাদে ধারণামূলক উপাদান বজায় থাকায় তা সঠিক হবে বলে মনে করা হয় কিন্তু তা ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনাও নাকচ করে দেয়া যায় না। এ প্রেক্ষাপটে যন্নীকে ইলম থেকে পৃথক করা যায়, যা ইতিবাচক জ্ঞান অর্থ ব্যক্ত করে। যেহেতু শরিয়াহর চূড়ান্ত বিধান ইতিবাচক জ্ঞান বুঝায় সেহেতু তা ইজতিহাদের আওতার মধ্যে পড়ে না।[৪] ইজতিহাদের অত্যাবশ্যকীয় অর্থ থেকে এ ধারণাও প্রকাশ পেয়েছে যে বিচারক বা জুরি এমনভাবে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান যাতে তিনি অনুভব করেন যে তার পুনরায় চেষ্টা চালানোর আর কোনো শক্তিই অবশিষ্ট নেই। বিচারক যদি সাক্ষ্য প্রমাণ আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হন, যা করার সামর্থ্য তার আছে তাহলে তার ওই মত বাতিল বলে গণ্য করা হবে।[৫] সবশেষে বলা যায়, ইজতিহাদের সংজ্ঞা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে কেবলমাত্র একজন বিচারক (ফকিহ) ইজতিহাদ করতে পারেন। ইজতিহাদের শর্তাবলি অর্থাৎ মুজতাহিদের পদমর্যাদায় উন্নীত হতে হলে যেসব গুণাবলি অর্জন করা প্রয়োজন তাকে অবশ্যই তা পূরণ করতে হবে। যখন এসব শর্তাবলি পূরণ করা হবে তখন একজন মুজতাহিদ অপরিহার্যভাবে অবশ্যই একজন

www.pathagar.com

ফকিহতেও পরিণত হবেন। এভাবে ইজতিহাদের সংজ্ঞায় আহকাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বপ্রণোদিত হয়ে সাধারণ মানুষের প্রচেষ্টা চালানোর পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।[৬]

ইজতিহাদের বিষয়বস্তু অবশ্যই শরিয়াহর বিষয় হতে হবে, আরো পরিষ্কারভাবে বলা যায় যে ইজতিহাদ শরিয়াহর বাস্তব বিধিবিধান সম্পর্কিত হতে হবে, যা যাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় তাদের (যেমন মুকাল্লিফ) আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। এ বিষয়টি ইজতিহাদের ক্ষেত্রকে একান্তভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক (আকলী) ও প্রথাগত (উরফী) অথবা ইন্দ্রীয়ের দ্বারা উপলব্ধি করা যায় এমন সব বিষয় থেকে বহির্ভূত রেখেছে এবং তাকে উৎসগুলোতে উপস্থিত সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে হুকম শারয়ীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়নি। এভাবে মহাবিশ্ব সৃষ্টি, আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব, নবি-রসুল পাঠানো ইত্যাদি বিষয় নিয়ে চর্চা করা ইজতিহাদের কাজ নয় কারণ এসব বিষয়ে একটিমাত্র সঠিক মত রয়েছে এবং কেউ এ মতের সাথে ভিন্নমত পোষণ করলে সে ভুল করবে। অনুরূপভাবে ইমানের স্তম্ভগুলোর বাধ্যবাধকতামূলক অবস্থা অথবা খুন, চুরি, জেনা ইত্যাদি হারাম হওয়ার বিষয় নিয়ে চর্চা করাও ইজতিহাদের কাজ হতে পারে না। কারণ এগুলো হচ্ছে শরিয়াহর সুস্পষ্ট সত্য যা কুরআনের আয়াত বা হাদিসের স্পষ্ট বক্তব্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।[৭]

কুরআন ও সুন্নাহতে প্রাপ্ত বিস্তারিত সাক্ষ্য প্রমাণকে নিম্নলিখিত চারটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে :

১. যথার্থতা ও অর্থ উভয় দিক থেকে চূড়ান্ত সাক্ষ্য প্রমাণ।

২. যথার্থ কিন্তু অর্থের দিক থেকে ধারণামূলক সাক্ষ্য প্রমাণ।

৩. যথার্থতার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে কিন্তু অর্থ সুনির্দিষ্ট এমন সাক্ষ্য প্রমাণ।

৪. যথার্থতা ও অর্থ উভয় দিক থেকে ধারণামূলক সাক্ষ্য প্রমাণ।

উপরিউক্ত চার শ্রেণির সাক্ষ্য প্রমাণের মধ্যে প্রথম শ্রেণির দলিলের স্পষ্ট নুসুসের ক্ষেত্রে যেমন- নির্ধারিত শাস্তির (হুদুদ) মতো বিষয়ে ইজতিহাদ প্রযোজ্য হবে না। তবে অন্য তিন শ্রেণির দলিলের ক্ষেত্রে ইজতিহাদ প্রযোজ্য হবে। নিম্নে এর কতিপয় উদাহরণ তুলে ধরা হলো :

যে সাক্ষ্য প্রমাণ যথার্থ কিন্তু অর্থ ধারণামূলক সে সম্পর্কিত ইজতিহাদের উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায় কুরআনের (সুরা বাকারায়, ২ : ২২৮), এতে বলা হয়েছে : 'যে সব স্ত্রী লোককে তালাক দেয়া হয়েছে তারা যেন তিন মাসিক ঋতু আসা পর্যন্ত নিজেদের বিরত রাখে।' এ আয়াতের যথার্থতার ব্যাপারে কোনো সংশয় নেই কারণ

www.pathagar.com

কুরআন আগাগোড়া যথার্থ ও নির্ভুল। কিন্তু এর অর্থ বিশেষ করে 'কুরু' এর সঠিক অর্থের ব্যাপারে সংশয়ের পথ উন্মুক্ত রয়েছে। কুরু হচ্ছে একটি সমনাম শব্দ যা একই সাথে 'মাসিক ঋতুকাল' ও 'দু'মাসিকের মধ্যবর্তী পরিচ্ছন্ন অবস্থা' উভয় অর্থ প্রকাশ করে। ইমাম আবু হানিফা ও ইবনে হাম্বল পূর্বের অর্থটি গ্রহণ করেছেন অন্যদিকে ইমাম শাফেয়ী ও মালিক পরের অর্থটি গ্রহণ করেছেন। এর ফলে তাদের নিজ নিজ ইজতিহাদে অনুরূপ পৃথক ফলাফল পাওয়া গেছে।[৮]

দ্বিতীয় শ্রেণির সাক্ষ্য প্রমাণের ওপর ইজতিহাদ প্রধানত হাদিস সম্পর্কিত বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট যার একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ থাকতে পারে কিন্তু যথার্থতার বিষয়টি নিয়ে সংশয়ের অবকাশ রয়েছে। এর উদাহরণ হিসেবে উটের জাকাত সম্পর্কিত হাদিস উদ্ধৃত করা যায়, এতে বলা হয়েছে :

من كل خمس شاة

'পাঁচটি উটের জন্য জাকাত হিসেবে একটি ছাগল প্রদান করতে হবে'[৯]। এর একটি স্পষ্ট অর্থ রয়েছে। আর এ কারণে ফকিহগণ একমত হয়েছেন যে, পাঁচটির কম উট থাকলে কোনো জাকাত দিতে হবে না। যেহেতু এ হাদিসটি একটি বিচ্ছিন্ন বা আহাদ হাদিস তাই এর যথার্থতার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। এ হাদিসের ক্ষেত্রে ইজতিহাদে এর সনদের যথার্থতা ও বর্ণনাকারীদের নির্ভরযোগ্যতার বিষয়ে এক ধরনের অনুসন্ধান চালানো হয় এবং এসব বিষয়ে ফকিহগণ একমত হননি। এর কারণ, তারা এ ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন মানদণ্ড প্রয়োগ করেছেন এবং এর ফলশ্রুতিতে তারা ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। ইজতিহাদের ভিন্নতা থাকলে তার সিদ্ধান্তও ভিন্ন ভিন্ন ও পরস্পরবিরোধী হবে, তাই তার কোনোটির ওপর নির্ভর করা যাবে না এবং সব ক'টিই বাতিল হয়ে যাবে। ফলে এসবের ভিত্তিতে কোনো দায়দায়িত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না।[১০]

যথার্থতা ও অর্থ উভয় দিক দিয়ে ধারণামূলক দলিল সম্পর্কিত ইজতিহাদের উদাহরণ হিসেবে আমরা নিম্নের হাদিসটি উল্লেখ করতে পারি। এতে বলা হয়েছে :

لا صلاة إلا بفتحه الكتاب

সুরা আল ফাতিহা তেলাওয়াত ব্যতিরেকে কোনো নামাজ আদায় হবে না (লা সালাতা)।[১১]

বিচ্ছিন্ন হাদিস হওয়ায় এর যথার্থতা সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়নি। অনুরূপভাবে এ অর্থে এর ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে- তা হলো, এ থেকে এ অর্থ বুঝানো হতে পারে যে সুরা আল ফাতিহা ছাড়া হয় সালাত বৈধ হবে না অথবা কেবল অসম্পূর্ণ হবে। হানাফীগণ পরের অর্থটি গ্রহণ করেছেন। সবশেষে বলা যায় যে, নুসুস অথবা ইজমাতে কোনো দলিল পাওয়া যায় না এমন বিষয়ের ব্যাপারে ইজতিহাদ কিয়াস, বিচারিক অগ্রাধিকার (ইস্তিহশান) অথবা জনস্বার্থ বিবেচনা (মাসলাহা) ইত্যাদির আকারে সম্পাদিত হতে পারে।

ইজতিহাদের মূল্য (হুকম)

খোদায়ী অবতীর্ণ উৎস থেকেই ইজতিহাদের সব অংশ তার আইনগত বৈধতা লাভ করে থাকে। অংশত এ কারণে এবং আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করা মানুষের কর্তব্য অংশত সে কারণে ইজতিহাদ চর্চা হচ্ছে একটি ধর্মীয় কর্তব্য। আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, কোনো সমস্যা দেখা দিলে সে সম্পর্কে জরুরি ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে কেউ এগিয়ে না এলে সে ক্ষেত্রে ইজতিহাদ হচ্ছে সব যোগ্য মুজাহিদদের জন্য সম্মিলিত দায়িত্ব (ফরজে কেফায়া)। অন্তত একজন মুজতাহিদ ইজতিহাদ না করা পর্যন্ত এ কর্তব্য অপূর্ণ থেকে যাবে। যদি দু'জন মুজতাহিদ অথবা বিচারককে ওই সমস্যা সমাধান করতে বলা হয় এবং তাদের একজন তা করার চেষ্টা করলে অন্যজন এ কর্তব্য পালনের দায় থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন। কিন্তু জরুরি বিষয়ের ক্ষেত্রে যোগ্য মুজতাহিদের জন্য ইজতিহাদ করা ব্যক্তিগত অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্যে (ওয়াজিব বা ফরজে আইন) পরিণত হবে, কারণ তাৎক্ষণিকভাবে ইজতিহাদ করার চেষ্টা না হলে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হতে অথবা সত্যের বিচ্যুতি ঘটতে পারে। বিশেষ করে যে সময় ইজতিহাদের চেষ্টা করার মতো অন্য কোনো যোগ্য লোক পাওয়া যাবে না সে ক্ষেত্রে এ বিষয়টি বিশেষভাবে প্রযোজ্য হবে। খোদ মুজতাহিদের জন্য ইজতিহাদ করা হচ্ছে ওয়াজিব আইন, তাকে অবশ্যই ওই বিষয়ের সমাধান বের করতে হবে, যা ব্যক্তিগতভাবে তাকে প্রভাবিত করে। কারণ যে মুজতাহিদ উৎস থেকে সরাসরি হুকম সংগ্রহ করতে সক্ষম তার জন্য অনুকরণ (তাকলিদ) নিষিদ্ধ। ইজতিহাদ করার ব্যাপারে জরুরিয়াত না থাকলে অথবা অন্য মুজতাহিদ বর্তমান থাকলে, সে ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করা হবে কোনো মুজতাহিদের জন্য শুধুমাত্র ফরজে কেফায়ী। উপরন্তু মুজতাহিদের কাছে কোনো নির্দিষ্ট সমস্যার বিষয় উত্থাপন করা না হলে অথবা খোদ ফকিহ নিজ উদ্যোগে তাত্ত্বিক পুনর্গঠনের পন্থায় কোনো সমস্যা নিরসনের চেষ্টা না করলে সে ক্ষেত্রে সব বিষয়ে ইজতিহাদ করা অনুমোদনযোগ্য (মানদুব)। সবশেষে এ কথা বলা যায় যে, ইজতিহাদ

www.pathagar.com

কুরআন-সুন্নাহ ও সুনির্দিষ্ট ইজমার চূড়ান্ত বিধানের পরিপন্থী হলে তা করা হবে হারাম।[১২]

উসুলের আলেমগণ একমত হয়েছেন যে, মুজতাহিদ তার নিজস্ব ইজতিহাদের ফলাফল মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন। যখন তিনি কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে কোন বিধান প্রণয়ন করবেন এবং তা তার দৃঢ়বিশ্বাস ও ইমানের ভিত্তিতে গঠিত হতে হবে এবং তিনি এ বিষয়ে অন্যান্য মুজতাহিদের অনুকরণ করতে পারবেন না। তাদের ইজতিহাদ তার 'অনুরূপ বা বিপরীত যাই হোক না কেন, মুজতাহিদের জন্য তার ওপর তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত খোদায়ী আদেশের সমতুল্য যা তাকে অবশ্যই পালন করতে হবে। তাই একে পরিত্যাগ করা অথবা এ সম্পর্কে অন্য কারোর অনুকরণ করা তার জন্য বৈধ হবে না। তবে তিনি যে বিষয়ে ইজতিহাদ করেছেন তা জরুরি না হলে এবং ওই বিষয়ে অনুসন্ধানের মতো সময় তার হাতে থাকলে সে ক্ষেত্রে তিনি অন্য মুজতাহিদের অনুকরণ করতে পারবেন বলে অনেক আলেম মনে করে থাকেন। অবশ্য অধিকতর অগ্রাধিকার প্রাপ্ত মত হচ্ছে যে তাকে অবশ্যই তাকলিদ পরিহার করতে হবে এমনকি কোনো ব্যক্তিকে তার চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞানী বলে মনে হলেও। কেবলমাত্র উম্মি ব্যক্তিরাই অন্যদের অনুকরণ করবে।[১৩] পবিত্র কুরআনের একটি আদেশের মর্মার্থ থেকে এ বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে। যাদের যোগ্যতা ও জ্ঞান রয়েছে তাদের উদ্দেশ্য করে আয়াতটিতে বলা হয়েছে : 'তাদেরকে ইনসাফ ও সত্যের পথে প্রচেষ্টা চালাতে বলা হয়েছে' (আল হাশর, ৫৯ : ২২)। কুরআনের অন্যত্র (সুরা মুহাম্মদ, ৪৭ : ২৪) আমরা দেখতে পাই : 'তারা কি কুরআন সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে না, অথবা তারা কি তাদের অন্তরকে তালাবদ্ধ করে রেখেছে?'

কুরআনের আরেকটি আয়াতে (সুরা নিসা ৪ : ৫৯) একই সিদ্ধান্ত অভিব্যক্ত হয়েছে, যাতে সব বিরোধের বিচার ফায়সালা আল্লাহ ও তাঁর রসুল সা.-এর ওপর ন্যস্ত করতে বলা হয়েছে। এসব আয়াত ও কুরআনের অনুরূপ অন্যান্য আয়াতে কুরআন ও রসুল সা.-এর শিক্ষা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা ও গবেষণা করা জ্ঞানবান ব্যক্তিদের কর্তব্য, এ মন্তব্যের প্রতি সমর্থন পাওয়া যায়। কুরআনের প্রকাশ্য নির্দেশনায় (জাওয়াহির) সঠিক অর্থ সাহাবিগণের রা. জীবনাচরণ থেকে উপলব্ধি করা যায়। তারা সাধারণত বিভিন্ন বিষয় চিন্তা গবেষণা করতেন এবং প্রত্যেকে নিজ নিজভাবে ইজতিহাদ করতেন, এসব ক্ষেত্রে তারা অন্য কারোর অনুকরণ করতেন না।[১৪]

এভাবে মুজতাহিদ তার নিজের বিষয়ে কর্তৃত্বের (হুজ্জাহ) অধিকারী। তার কর্তব্য হচ্ছে, যারা অবগত নয় তাদেরকে নির্দেশনা প্রদান করা। কিন্তু তাকে অবশ্যই

www.pathagar.com

সূত্রের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। এটি হচ্ছে কুরআনের আরেকটি আয়াতের মর্মার্থ যাতে যারা জ্ঞানের অধিকারী নয় তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে : 'এ জিকরওয়ালাদের (আহল আল জিকর) কাছে জিজ্ঞাসা কর যদি তোমরা নিজেরা না জানো' (সূরা নাহল, ১৬ : ৪৩)। এভাবে কেবলমাত্র যারা জ্ঞান রাখে না তারাই অন্যদের কাছ থেকে পথনির্দেশনা চাইতে পারে, কিন্তু যাদের নিজেদেরই সঠিক উত্তর সংগ্রহের সামর্থ্য ও জ্ঞান রয়েছে তাদের জন্য এটি করার দরকার নেই। এ আয়াতে আহল আল জিকর বলতে আলেমদের বুঝানো হয়েছে, কোনো বিষয়ে তারা সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদানের বাস্তব জ্ঞান তারা রাখে কি না সেটা এখানে ধর্তব্য নয়। শুধু শর্ত হচ্ছে যে, সমস্যাটির বিষয়ে অনুসন্ধান ও তার সমাধান করার ক্ষমতা তাদের রয়েছে।[১৫]

যখন কোনো মুজতাহিদ নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে সমাধান অর্জনের চেষ্টা করলেন এবং সম্ভাব্যতার ভিত্তিতে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, কিন্তু কিছুকাল পর ওই বিষয়ে তার সিদ্ধান্তে পরিবর্তন ঘটলে এবং তা কেবলমাত্র তাকে ব্যক্তিগতভাবে প্রভাবিত করলে তিনি তার আগের সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করতে অথবা পরিবর্তন করতে পারবেন। এর উদাহরণ হলো, তিনি যদি অভিভাবকের (ওয়ালি) সম্মতি ছাড়াই একজন মহিলার সাথে বিবাহের সম্বন্ধ স্থাপন করেন এবং পরে এ ধরনের বিয়ের বৈধতার বিষয়ে তার মত পরিবর্তন করেন, তাহলে তাকে অবশ্যই এ নিকাহ বাতিল করতে হবে। কিন্তু তার ইজতিহাদ যদি অন্যদের প্রভাবিত করে তাহলে অধিকাংশ আলেমের মত হলো, তিনি তার আগের সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করতে পারবেন না। এর উদাহরণ হলো, তিনি বিচারক হিসেবে কাজ করলেন এবং নিজস্ব ইজতিহাদের আলোকে কোনো বিষয়ে রায় প্রদান করলেন, এ ক্ষেত্রে তিনি তার রায় পরিবর্তন করতে পারবেন না। যদি একটি ইজতিহাদের সিদ্ধান্ত অন্য ইজতিহাদের দ্বারা উপেক্ষা করা হয় তাহলে পরের ইজতিহাদও অবশ্যই অনুরূপভাবে পরিবর্তন হতে পারে। আর এতে অনিশ্চয়তা দেখা দেবে এবং আহকামের বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ্ন হবে।[১৬]

এক রেওয়ায়েতে জানা গেছে, ওমর ইবনে খাত্তাব রা. 'হাজাবিয়া' নামে পরিচিত একটি মামলার রায় দেন। ওই মামলায় একজন মহিলা স্বামী, মা, দু'জন রক্ত সম্পর্কীয় ভাই ও দু'জন বৈপিত্রেয় ভাই রেখে মারা যায়। ওমর ইবনে খাত্তাব রা. সব ভাইকে তার সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ প্রদান করেন। তখন এক পক্ষ বলল যে, এর আগের বছর তিনি (ওমর রা.) কিন্তু সব ভাইকে এক-তৃতীয়াংশের অংশীদার করেননি। এর জবাবে খলিফা বললেন, এটি ছিল তখনকার জন্য আমার সিদ্ধান্ত, কিন্তু আজ আমি এ ব্যাপারে ভিন্নভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এভাবে ওমর রা. তার

www.pathagar.com

উভয় সিদ্ধান্তকে বহাল রাখেন এবং পরেরটির দ্বারা আগেরটির বৈধতা ক্ষুণ্ন হওয়ার সুযোগ দেননি।[১৭]

অনুরূপভাবে কোনো বিষয়ে পরবর্তীতে নিছক ভিন্ন অভিমতের কারণে একজন আইনগত বিচারকের সিদ্ধান্তকে অন্য একজন বিচারক উপেক্ষা করতে পারবেন না। এক বিবরণে জানা গেছে যে, এক ব্যক্তির মামলা আলী ও জায়েদ রা. নিষ্পত্তি করেন। লোকটি এ রায়ের কথা ওমর ইবনে খাত্তাবকে রা. জানান, তার কথা শুনে ওমর রা. বলেন যে, তিনি যদি বিচারক হতেন তাহলে বিষয়টি ভিন্নভাবে নিষ্পত্তি করতেন। তার কথা শুনে লোকটি বললেন, আপনি তো খলিফা, তাহলে আপনি কেন তা করছেন না? ওমর ইবনে খাত্তাব জবাবে বললেন, এটি যদি কুরআন বা সুন্নাহর বিধান প্রয়োগের বিষয় হতো তাহলে তিনি এতে হস্তক্ষেপ করতেন, কিন্তু যেহেতু এ সিদ্ধান্ত রায়-এর ভিত্তিতে হয়েছে তাই এক্ষেত্রে এগুলোর সবই সমান গুরুত্বপূর্ণ।[১৮]

যেহেতু বিষয়টি আইনি অভিমত সংক্রান্ত সেহেতু একটি নির্দিষ্ট মত যে ভুল সে ব্যাপারে কেউই নিশ্চিত হয়ে বলতে পারে না যে, যে মতটি ইতোমধ্যে বিচারিক রায়ে বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে তার বৈধতা এর বিপরীত মতের চেয়ে অনেক বেশি। অবশ্য প্রাথমিক সিদ্ধান্তটিতে যদি আইন লঙ্ঘিত হয়েছে বলে দেখা যায় সে ক্ষেত্রে তা অবশ্যই উপেক্ষা করতে হবে। এ হলো ওমর ইবনে খাত্তাবের রা. সিদ্ধান্তের মর্মার্থ। আবু মুসা আল আশায়ারীকে রা. লেখা এক চিঠিতে ওমর রা. তার সিদ্ধান্ত জানান, তিনি লিখেন : 'একটি রায় প্রদানের পর তুমি যদি তা পুনর্বিবেচনা করে ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হও তাহলে ওই রায় প্রত্যাহারে তোমার আগের সিদ্ধান্তকে সে ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াতে দিও না, কারণ ন্যায়বিচারের প্রতি অবহেলা করা যাবে না। জেনে রেখো, অবিচারের প্রতি জিদ করে অটল হয়ে বসে থাকার চেয়ে তা প্রত্যাহার করা উত্তম'।[১৯]

এ ক্ষেত্রে সাহাবিগণের রা. দৃষ্টান্ত আইনগত পদ্ধতি প্রণয়নের পথ প্রশস্ত করেছে, যাতে শর্ত দেয়া হয়েছে যে, একই ধরনের একটি ইজতিহাদ দ্বারা আরেকটি ইজতিহাদকে বাতিল করা যাবে না (আল ইজতিহাদ লা ইউনকাদ বি মিসলিহি)। এর ফলে বিচারক ও মুজতাহিদ যদি তার পূর্বের ইজতিহাদ ত্রুটিপূর্ণ ছিল বলে মনে না করেন তাহলে তিনি অবশ্যই তা পরিবর্তনের চেষ্টা করতে পারবেন না। এভাবে বিচারক-কাম-মুজতাহিদের ব্যক্তিগত মত ইজতিহাদের ভিত্তিতে গঠিত বিচারিক সিদ্ধান্ত অন্য একজন বিচারকের মতের নিছক পার্থক্যের কারণে পরিবর্তনযোগ্য নয়। এ থেকে আরো আভাস পাওয়া যায় যে, খোদ রায় ঘোষণাকারী বিচারক পরবর্তীতে ইজতিহাদের ভিত্তিতে তার পূর্বের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারেন যদি

www.pathagar.com

তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, এটি করা অধিকতর উপযোগী হবে। কিন্তু বিচারিক সিদ্ধান্ত হচ্ছে এমন একটি বিষয় যা স্পষ্টত নিবর্তনমূলক প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত রায়দাতা বিচারক তা পরিবর্তন করতে নিরুৎসাহ বোধ করে থাকেন।

ইজতিহাদের প্রমাণ (হুইয়াহ)

কুরআন, সুন্নাহ ও যুক্তির বিচারে (আকল) ইজতিহাদ বৈধতা অর্জন করেছে। প্রথম দু'টি সূত্রের মধ্যে সুন্নাহতে অধিকতর সুনির্দিষ্টভাবে ইজতিহাদকে বৈধতা প্রদান করা হয়েছে। আল গাজ্জালী এ ব্যাপারে মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. বর্ণিত একটি হাদিসের উল্লেখ করেছেন যাতে স্পষ্ট ভাষায় ইজতিহাদের প্রতি দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করা হয়েছে।[২০] আল গাজ্জালী আরো বলেন যে এ হাদিসটির গুরুত্ব নেই বলে দাবি করা হয় কারণ এটি একটি মুরসাল হাদিস (অর্থাৎ হাদিসটির সনদ এক স্থানে অবিচ্ছিন্ন নয়, যে সাহাবি রা. রসুল সা.-এর থেকে হাদিসটি শুনেছিলেন তার নাম এতে উল্লেখ করা হয়নি)। যেহেতু মুসলিম উম্মাহ হাদিসটি গ্রহণ করে নিয়েছে এবং সর্বাবস্থায় তার ওপর নির্ভর করেছে তাই এর যথার্থতার ব্যাপারে বিতর্কের আর কোনো অবকাশ নেই।[২১] আরেকটি হাদিসে বলা হয়েছে :

الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران

وان اجتهد فاخطأ فله أجر

> 'যখন কোনো বিচারক সঠিক রায় প্রদান করবে তখন সে দু'টি পুরস্কার লাভ করবে, কিন্তু সে যদি ভুল রায় দেয় তাহলেও সে একটি পুরস্কার পাবে।[২২] এ হাদিস থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, ইজতিহাদ করার ফলাফল যাই হোক না কেন তাতে কখনোই কোনো গোনাহ হয় না। ইজতিহাদের প্রয়োজনীয় শর্তাবলি অনুসৃত হলে তার ফলাফল সব সময়ই পুরস্কারযোগ্য হবে, কখনোই নিন্দনীয় হবে না।[২৩]

আরেকটি হাদিসে রসুল সা. এরশাদ করেছেন :

اجتهدوا فكل ميسر لما خلق له

> 'তার সৃষ্টির প্রত্যেককে যে জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা সম্পাদনে চেষ্টা সাধনা ও সংগ্রাম (ইজতাহিদু) করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে'।[২৪]

আরেকটি হাদিসও রয়েছে যাতে বলা হয়েছে :

www.pathagar.com

من يرد الله به خيراً يفقهه في الذين

'আল্লাহ তায়ালা যখন তাঁর কোনো বান্দার প্রতি অনুগ্রহ করেন তখন তিনি তাকে দীন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে সক্ষম করে তোলেন (তাফাক্কাহ)'।[২৫]

এ বিষয়ে আলেমগণ আরো দু'টি হাদিস উদ্ধৃত করেছেন, তার একটিতে বলা হয়েছে :

طلب العلم فرضة على كل مسلم

و مسلمة

'প্রত্যেক মুসলিম পুরুষ ও নারীর জন্য জ্ঞান অর্জন করা ফরজ'। অন্যটিতে আলেমদের রসুল সা.-এর উত্তরাধিকারী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।[২৬]

س

العلماء ورثة الأنبياء

ইজতিহাদের সাথে শেষ দু'টি হাদিসকে প্রাসঙ্গিক হিসেবে উল্লেখ করার মাধ্যমে এ কথা নিশ্চিত করা হয়েছে যে, ইজতিহাদ হচ্ছে ইসলামে সৃজনশীলতা ও জ্ঞানের প্রধান উপায় বা হাতিয়ার।

ইজতিহাদের সাথে সম্পর্কিত কুরআনের বহু আয়াত রয়েছে কিন্তু সেগুলোর সবই প্রকৃতিগতভাবে সম্ভাব্যনীয় (জাওয়াহির)। আলেমগণ কিয়াসের সমর্থনে কুরআনের যেসব আয়াত উদ্ধৃত করেছেন (দেখুন, পৃষ্ঠা ২১৭) তার সবই ইজতিহাদের সমর্থনে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। এ ছাড়া আমরা (সুরা তাওবাতে, ৯ : ১২২) দেখতে পেয়েছি : 'অধিবাসীদের প্রত্যেক অংশ হতে কিছু লোক বের হয়ে চলে এসে দীনের সমঝ লাভে আত্মনিয়োগ করত (লি-ইয়াতা-ফাক্কাহু ফিল-দীন) এবং লোকদেরকে সতর্ক করত।' দীনের সমঝ বা জ্ঞান লাভে আত্মনিয়োগ করা হচ্ছে ইজতিহাদের মূল কথা যা উম্মাহর জীবনের একটি নিরবচ্ছিন্ন বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত। আর দীনের জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য। আর যারা সমাজ মানুষকে পথ নির্দেশনা প্রদান এবং বিচ্যুতি ও অজ্ঞতার ব্যাপারে সতর্ক করেন তাদেরকে তাফাক্কুহ বা ধর্মীয় বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করা প্রয়োজন। একই কথা বলা হয়েছে সুরা আনকাবূতে (২৯ : ৬৯) 'আর যারা আমাদের জন্য চেষ্টা-সাধনা করবে (ওয়াল লাজিনা জাহাদু) আমরা অবশ্যই তাদের পথ দেখাব।' এ আয়াতের মজার ব্যাপার হলো 'সুবুহলানা (আমাদের পথসমূহ)' বহু বচনে প্রকাশ করা হয়েছে, এ থেকে আভাস পাওয়া যেতে পারে যে, সত্যের অনেক পথ রয়েছে এবং যারা তা অর্জনে

www.pathagar.com

চেষ্টা করতে পারে তাদের জন্য এর সবই উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া আমরা সুরা আন নিসায় (৪ : ৫৯) দেখতে পাই : 'তোমাদের মধ্যে যদি কোনো ব্যাপারে মতবৈষম্যের সৃষ্টি হয় তাহলে তাকে আল্লাহ ও তার রসুলের সা. দিকে ফিরিয়ে দাও।' এ আয়াত বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য কুরআন, সুন্নাহ ও আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্য সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখা প্রয়োজন যার ভিত্তিতেই বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলো সুরাহা ও নিষ্পত্তি করা যেতে পারে।

সাহাবিগণ রা. ইজতিহাদ চর্চা করতেন এবং এ ব্যাপারে তাদের সর্বসম্মত সমর্থন রয়েছে বলে দাবি করা হয়।[২৭] বিরোধপূর্ণ বিষয়ে সমাধান অর্জনের লক্ষ্যে তারা কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে রায় প্রদান করতেন। কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহতে তার সমাধান না পেলে সে ক্ষেত্রে তারা ইজতিহাদ অবলম্বন করতেন। বস্তুতপক্ষে নিরবচ্ছিন্ন সাক্ষ্যের (তাওয়াতুর) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নসের অনুপস্থিতিতে সাহাবিগণ রা. ইজতিহাদ অবলম্বন করতেন।[২৮]

ইজতিহাদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি হচ্ছে, যেহেতু শরিয়াহর নুসুস সীমিত সেহেতু উম্মাহর জীবনে নতুন নতুন অভিজ্ঞতায় অব্যাহতভাবে যে নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হবে তার সমাধানে ইজতিহাদের প্রয়োজন হবে। তাই সমাজের বিদ্বান ব্যক্তিবর্গের জন্য ইজতিহাদের মাধ্যমে এ ধরনের সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করাকে অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্যে পরিণত হয়েছে।[২৯]

ইজতিহাদের শর্তাবলি (গুরুত)

মুজতাহিদকে অবশ্যই একজন মুসলমান ও সুস্থ চিন্তাভাবনার অধিকারী যোগ্য ব্যক্তি হতে হবে। তিনি বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতার ক্ষেত্রে এমন একটি পর্যায়ে উপনীত হবেন, যা তাকে একটি স্বাধীন রায় গঠনে সক্ষম করে তুলবে। রসূল সা.-এর উত্তরাধিকারী হিসেবে মুজতাহিদ তার ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করবেন এবং তার রায় তার অনুসারীদের জন্য একটি প্রমাণ হিসেবে গণ্য হবে, তাই তাকে অবশ্যই মুসলমান হতে হবে এবং ধর্মীয় জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা সম্পর্কে তার গভীর জ্ঞান থাকতে হবে। যে ব্যক্তি ইজতিহাদের এক বা একাধিক শর্ত পূরণে ব্যর্থ হবেন তিনি অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন এবং ইজতিহাদ চর্চা হতে বিরত থাকবেন। নিম্নে ইজতিহাদের অনিয়ন্ত্রিত রূপকে সামনে রেখে এর শর্তাবলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। একে প্রায়ই ইজতিহাদ ফিল শার বলে উল্লেখ করা হয়। অপরদিকে এর বিপরীত হচ্ছে নির্দিষ্ট মাজহাবের আওতাধীনে অথবা কোনো মাজহাবের সীমার মধ্যে নির্দিষ্ট বিষয়ের বিভিন্ন ধরনের ইজতিহাদ।

www.pathagar.com

মুজতাহিদের যোগ্যতা সম্পর্কে সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাওয়া যায় আবু হুসাইন আল বসরীর (মৃত্যু, ৪৩৬/১০৪৪) আল মুতামাদ ফী উসুল আল ফিকহ্ গ্রন্থে। আল বসরীর আলোচনার ব্যাপকভিত্তিক রূপরেখা পরে সামান্য পরিবর্তন সাপেক্ষে গ্রহণ করেছেন আল সিরাজী (মৃত্যু, ৪৬৭/১০৮৩) আল গাজ্জালী, (মৃত্যু, ৫০৫/১১১১) ও আল আমিদী (মৃত্যু, ৬৩২/১২৩৪)। এর অর্থ এ নয় যে, আল বসরীর পূর্বে যেসব আলেম ছিলেন তারা ইজতিহাদের শর্তাবলির প্রতি দৃষ্টি দেননি বরং তখন থেকেই পরের উসূলের আলেমগণ অবিরতভাবে এসব শর্ত গ্রহণ করেন যা ইজতিহাদের একটি মানসম্মত বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে।[৩০] নিম্নে এ শর্তাবলি তুলে ধরা হলো :

আরবি ভাষার ওপর এতটুকু জ্ঞান অর্জন করা যাতে একজন বিদ্বান ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। আরবি ভাষার ওপর পূর্ণ দক্ষতা ও পাণ্ডিত্য অর্জন করা শর্ত নয়। তবে মুজতাহিদকে ভাষার অর্থগত সূক্ষ্ম তারতম্য সম্পর্কে অবশ্যই জ্ঞান রাখতে হবে এবং কুরআন-সুন্নাহ সঠিকভাবে উপলব্ধি করে তা থেকে অত্যুচ্চ যোগ্যতার সাথে আহকাম সংগ্রহ করতে সক্ষম হতে হবে।[৩১]

আল শাতিবী অবশ্য আরবি জ্ঞানের ওপর অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন : যে ব্যক্তি আরবি ভাষার ওপর সাধারণ জ্ঞান রাখেন তার পক্ষে ইজতিহাদের উচ্চতম পর্যায়ে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। কুরআন ও সুন্নাহ অনুধাবনের ক্ষেত্রে তাদের ভাষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এ ব্যাপারে কমতি রয়েছে এমন কোনো ব্যক্তির ইজতিহাদ গ্রহণযোগ্য হবে না। তিনি আরো লিখেছেন : যেহেতু মুজতাহিদের সিদ্ধান্ত সাধারণ মানুষের জন্য একটি প্রমাণ (হুজ্জাহ) সেহেতু কর্তৃত্বের এ মাত্রার কারণে মুজতাহিদের জন্য সূত্রসমূহে সরাসরি প্রবেশের যোগ্যতা এবং আরবি ভাষায় পরিপূর্ণ পারদর্শিতা অর্জন করা অপরিহার্য।[৩২]

এ ছাড়া মুজতাহিদকে কুরআন ও সুন্নাহ, কুরআনের মাক্কী ও মাদানী বিষয়বস্তু, অবতীর্ণের সময় (আসহাব-আল নুজুল) এবং রহিতকরণের ঘটনাবলি সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় যে, কুরআন ও সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত আইনগত বিষয়গুলো বা আয়াত আল আহকামের ওপর তার পূর্ণ দখল থাকতে হবে। তবে কুরআনের বিভিন্ন সাধারণ বর্ণনা ও রূপক বিবরণ এবং পরকাল সম্পর্কিত বিষয়গুলো এমনটি হওয়া জরুরি নয়।[৩৩]

আল গাজ্জালী, ইবনে আল আরাবি, আবু বকর আল রাজিসহ কিছু আলেমের মতে, মুজতাহিদকে কুরআনের আইন সংক্রান্ত আয়াত সম্পর্কে অবশ্যই জানতে হবে যার সংখ্যা হবে প্রায় পাঁচশ'। আল শাইবানী অবশ্য মনে করেন যে, এ ধরনের

www.pathagar.com

সুনির্দিষ্টকরণ সুনিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়। কারণ একজন মুজতাহিদ কুরআনে প্রাপ্ত কাহিনী ও রূপক বিবরণ থেকেও আইনগত বিধান অনুমান করতে পারেন। আয়াত আল আহকাম সম্পর্কে জ্ঞানের মধ্যে সুন্নাহ ও সাহাবিগণের রা. মতের বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখসহ কুরআনে বিভিন্ন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও (তাফসির) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল কুরতুবীর তাফসির আল-কুরতুবী ও আবু বকর আলী আল-জাসাসের আহকাম আল কুরআন-এর কথা বিশেষভাবে সুপারিশ করা হয়েছে।[৩৪]

এরপর যে বিষয়টি আসছে তাহলো, মুজতাহিদকে অবশ্যই সুন্নাহ সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে- বিশেষ করে সুন্নাহর যে অংশে ইজতিহাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটি হলো যারা ইজতিহাদের বিভক্তির (তাযজিয়াহ) স্বীকার করেন (নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে) তাদের অভিমত। কিন্তু যদি মনে করা হয় যে, ইজতিহাদ অবিভাজ্য তাহলে মুজতাহিদকে অবশ্যই সামগ্রিকভাবে সুন্নাহ, বিশেষ করে আহকাম সম্পর্কিত বিবরণসমূহ সম্পর্কে জানতে হবে যাকে প্রায় আহাদিস আল আহকাম বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। তাকে সুন্নতের রহিতকরণের ঘটনাসমূহ, সাধারণ ও সুনির্দিষ্ট (আম ও খাস), নিরঙ্কুশ ও নির্দিষ্ট (মুতলাক ও মুকাইয়িদ) ও হাদিস বর্ণনাকারীদের নির্ভরযোগ্যতা বা অনির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে অবশ্যই জ্ঞান রাখতে হবে। তার জন্য আহাদিস আল আহকাম বা বর্ণনাকারীদের নাম মুখস্থ করা জরুরি নয়, তবে উল্লেখ করার প্রয়োজন হলে হাদিসগুলো কোথায় পাওয়া যাবে তাকে অবশ্যই তা জানতে হবে এবং দুর্বল হাদিস থেকে নির্ভরযোগ্য হাদিস এবং সহিহ থেকে জয়ীফ হাদিসের পার্থক্য করার ক্ষমতা অবশ্যই তার থাকতে হবে।[৩৫] ইমাম গাজ্জালী উল্লেখ করেন যে, আহাদিস আল আহকাম সম্পর্কে সঠিকভাবে পরিচিত হওয়ার জন্য সুনান আবু দাউদ, সুনান আল বায়হাকী অথবা ইবনে হাম্বলের মুসনাদের ওপর জ্ঞান অর্জন যথেষ্ঠ হবে। আহমদ ইবনে হাম্বলের বরাত দিয়ে অন্য এক মতে বলা হয়েছে যে, আহাদিস আল আহকামের সংখ্যা প্রায় ১,২০০।[৩৬]

মুজতাহিদকে অবশ্যই 'ফুরু' সম্পর্কিত গ্রন্থগুলোর সারমর্ম এবং যেসব বিষয়ে ইজমা গঠিত হয়েছে তা জানতে হবে। তাকে সাহাবি রা. তাবেয়ীন, শীর্ষ স্থানীয় ইমাম ও অতীতের মুজতাহিদগণের সর্বসম্মত মত যাচাই-বাছাই ও বিশ্লেষণ করার ক্ষমতার অধিকারী হতে হবে যাতে তিনি এ ধরনের ইজমার পরিপন্থী কোনো মত প্রকাশের সম্ভাবনার হাত থেকে নিরাপদ থাকতে পারেন। আল শাওকানীর মতে, যিনি মুজতাহিদের পদমর্যাদায় অভিষিক্ত হবেন তার পক্ষে চূড়ান্ত ইজমার বিষয়ে অবহিত না থাকা হবে অভাবনীয় ঘটনা। একজন মুজতাহিদ তার কর্ম সংশ্লিষ্টতার কারণে বিপরীত মতগুলো সম্পর্কেও অবশ্যই অবহিত থাকতে হবে, কেননা বলা

www.pathagar.com

হয়ে থাকে যে, 'জনগণের মধ্যকার ওই ব্যক্তি সবচেয়ে জ্ঞানী যিনি জনগণের মতপার্থক্য সম্পর্কেও সবচেয়ে ভালো জ্ঞান রাখেন।[৩৭]

উসুলের আলেমগণ মুজতাহিদের যোগ্যতা সম্পর্কে আলোচনাকালে কিয়াস সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আইনের গ্রন্থসমূহে সুনির্দিষ্টভাবে আইন যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে সার্বিকভাবে কুরআন ও সুন্নাহতে পুরোপুরি সেভাবে তা উল্লেখিত হয়নি বরং তাতে এ ধরনের বিধিবিধানের কারণ হিসেবে সাধারণ বিধান ও নির্দেশনা নিহিত থাকে। এভাবে একজন মুজতাহিদ তা থেকে কোনো নজীরবিহীন ঘটনার ক্ষেত্রে বিধান কী হবে তা উদ্ভাবনের লক্ষ্যে কিয়াস অবলম্বন করতে সক্ষম হন। তাই কিয়াসের নিয়মাবলি ও পদ্ধতি সম্পর্কে একজন মুজতাহিদের যথেষ্ট জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। ইমাম শাফেয়ী এ ব্যাপারে এতটাই গুরুত্ব দিয়েছেন যে, তিনি ইজতিহাদকে কিয়াসের সমতুল্য বলে গণ্য করেছেন। অন্য কথায় কিয়াস হচ্ছে ইজতিহাদের মূলভিত্তি, যদিও দু'টি বিষয় এক নয়। অনেক আলেম ইজতিহাদ ও কিয়াসকে অভিন্ন ও এক বলে দাবি করা সত্ত্বেও আল গাজ্জালী মনে করেন যে, ইজতিহাদ কিয়াসের চেয়ে অনেক বেশি বিস্তৃত কারণ তা কিয়াস ছাড়াও সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশের বিভিন্ন পদ্ধতির সমন্বয়ে গঠিত হয়।[৩৮]

উপরন্তু মুজতাহিদকে শরিয়াহর উদ্দেশ্য (মাকাসিদ) সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে যা মাসালিহর (জনস্বার্থ বিবেচনা) সমন্বয়ে গঠিত হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাকাসিদ হলো সেগুলো যেগুলোকে আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং চিহ্নিত করেছেন এবং এগুলোকে অন্য সবের চেয়ে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এভাবে দেখা যাচ্ছে যে, 'পাঁচটি মূলনীতি' অর্থাৎ জীবন, ধর্ম, বুদ্ধি-বিবেক, বংশধারা ও মাল-সম্পদ সংরক্ষণ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা স্বীকৃত উদ্দেশ্য। এগুলো হলো জরুরি মাসালিহ। এ কারণে এগুলোকে সহায়ক (হাজিয়াত) ও অলংকরণ (তাহসিনিয়াত) থেকে পৃথক করা হয়েছে। এ ছাড়া মুজতাহিদকে ফিকহর সাধারণ মূলনীতি যেমন- কষ্ট দূর করা (রাফ আল হারাজ) সম্পর্কে অবশ্যই জানতে হবে, অর্থাৎ নিশ্চয়তা অবশ্যই সন্দেহ ও এ ধরনের অন্যান্য নীতির অগ্রাধিকার পাবে যার লক্ষ্য হচ্ছে আহকামের কঠোরতা রোধ করা। তাকে অবশ্যই যথার্থ মাসালিহ ও খেয়ালবশত অনুপ্রাণিত হয়ে যেসব কাজ করা হয় তার মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা অধিকারী হতে হবে এবং মূল্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সঠিক ভারসাম্য স্থাপনে সমর্থ হতে হবে।[৩৯]

আল শাতিবী ওপরের বর্ণিত শর্তাবলিকে সংক্ষেপে দু'টি প্রধান শিরোনামের অধীনে প্রকাশ করেছেন। এর একটি হলো, শরিয়াহর উদ্দেশ্যের ওপর যথার্থ দখল থাকা এবং অন্যটি হলো, অন্যান্য সূত্র ও তা থেকে বিধিবিধান সংগ্রহের পদ্ধতি সম্পর্কে

www.pathagar.com

সঠিক জ্ঞান থাকা। এর প্রথমটি মৌলিক এবং দ্বিতীয়টি প্রথমটি অর্জনে সহায়ক হিসেবে কাজ করে।[৪০]

আরো বলা হয়েছে যে, মুজতাহিদের অবশ্যই যুক্তি ও দলিলের দৃঢ়তা ও দুর্বলতার মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা থাকতে হবে। এ শর্তের আলোকে কিছু আলেম এ মত প্রকাশ করেছেন যে, যুক্তিবিজ্ঞান (মানতিক) সম্পর্কে মুজতাহিদের জ্ঞান থাকতে হবে। কিন্তু এটি কোনো শর্ত নয়। কারণ সাহাবিগণের রা. জামানায় জ্ঞানের একটি শাখা হিসেবে যুক্তিবিজ্ঞান সৃষ্টি হয়নি কিন্তু তাতে ইজতাহিদ চর্চায় তাদের সামর্থ্য ক্ষুণ্ন হয়নি।[৪১]

সর্বশেষ কথা হলো, মুজতাহিদকে অবশ্যই একজন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ ('আদিল) মানুষ হতে হবে, তিনি পাপ কাজ থেকে দূরে থাকবেন এবং তার সিদ্ধান্ত বা রায় জনগণের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে। আর তার নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা হবে প্রশ্নাতীত এবং আত্মস্বার্থ চিন্তার কলঙ্কমুক্ত। যেহেতু ইজতিহাদ একটি পবিত্র আমানত তাই কেউ বিদাত ও নিজের খায়েশ পূরণের মতো কলঙ্কজনক কাজে জড়িত হলে সে ইজতিহাদের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।[৪২] এগুলো হলো স্বতন্ত্র ইজতিহাদের শর্তাবলি। কিন্তু যারা ইজতিহাদের 'বিভক্তিকে' স্বীকার করে নিয়েছেন তারা তাদের মতে, বিশেষ বিষয়ের ওপর মুজতাহিদ ওই সব বিষয়ে ইজতিহাদ চর্চা করতে পারবেন। ওই সব বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমন বিষয়ে তার জ্ঞানের স্বল্পতা ইজতিহাদের ব্যাপারে তার যোগ্যতাকে ক্ষুণ্ন করবে না।[৪৩]

পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, ইজতিহাদ পরিত্যক্ত হওয়ার আংশিক কারণ হলো, এর চর্চার জন্য যে যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন তা 'এতটা নিষ্কলুষ ও কঠোর এবং এতটা উচ্চমার্গের নির্ধারণ করা হয়েছে যে, মানুষের পক্ষে তা পূরণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে'।[৪৪] ইজতিহাদের চর্চাকে অনুৎসাহিত করার লক্ষ্যে আপতত দৃষ্টিতে যথার্থ নয়, এমন ধারণা প্রধানত তাকলিফের সমর্থকরা উপস্থাপন করেন। আবদুর রহমান (ও আরো অনেকে) প্রকৃত শর্তের ব্যাপারে যথার্থই বলেছেন যে, একজন মুজতাহিদের যে যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন তা নিতান্ত মধ্যমানের বলে প্রতীয়মান হয়েছে এবং বর্তমান যুগের মানুষ এসব যোগ্যতা অর্জনের অযোগ্য এমনটি ধারণা করার কোনোই যুক্তি থাকতে পারে না।[৪৫] ইজতিহাদের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলি পূরণ করা পরবর্তী যুগসমূহের আলেমদের সাধ্যের বাইরে, এমন কোনো দলিল তেমন একটা দেখতে পাওয়া যায় না। এর বিপরীতে একজন পর্যবেক্ষক মত প্রকাশ করেন যে, 'আইনজ্ঞ বা ফকিহর জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রিক জ্ঞান আইনের একটি দিক বা অন্যদিক সম্পর্কে ইজতিহাদ চর্চায় তাকে সক্ষম করে তোলে'।[৪৬] আইন প্রণয়ন নীতিমালা বা আইন তত্ত্বে তার কাজকে সহজ করে দেয়া হয়েছে- বিশেষ

www.pathagar.com

করে ওই নির্দিষ্ট হাদিসে বলা হয়েছে, এ ক্ষেত্রে মুজতাহিদ ভুল করলে তাকে পাপের শাস্তি থেকে কেবল মুক্ত করে দেয়াই হয়নি উপরন্তু তাকে সওয়াব প্রাপ্তির অধিকারী বলে গণ্য করা হয়েছে। এ ছাড়া ইজতিহাদের বিভক্তি সম্পর্কিত আইনগত তত্ত্বের স্বীকৃতির ভিত্তিতে শরিয়াহর নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ ওই নির্দিষ্ট বিষয়ে ইজতিহাদ করতে সক্ষম হবেন, এমনকি অন্যসব শাখা বা বিষয়ে সমভাবে তাদের জ্ঞান না থাকলেও। আমরা এ বিষয়টি নিয়ে এখন আলোচনা করব।

ইজতিহাদের বিভাজ্যতা

প্রশ্ন হচ্ছে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি ওই বিষয়ে ইজতিহাদ করতে পারবে কি না অথবা ইজতিহাদ চর্চা করতে সক্ষম হতে প্রথমেই তার পূর্ণাঙ্গ মুজতাহিদের যোগ্যতা অর্জন করা প্রয়োজন হবে কি না। সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মত হলো, একবার মুজতাহিদের প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করার পর কোনো ব্যক্তি শরিয়াহর সব ক্ষেত্রে ইজতিহাদ চর্চা করার যোগ্যতা অর্জন করে। তাদের মত অনুযায়ী, মুজতাহিদের বুদ্ধিবৃত্তিক সামর্থ্য ও যোগ্যতাকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করা যাবে না। অন্য কথায় বলা যায়, ইজতিহাদ হচ্ছে অবিভাজ্য বিষয়। আমরা কোনো ব্যক্তিকে একইসাথে বিয়ে-সাদী সংক্রান্ত আইনের ক্ষেত্রে মুজতাহিদ এবং ইবাদতবন্দেগী বা এরূপ অন্য কোনো বিষয়ে অনুকরণকারী (মুকাল্লিদ) বলতে পারি না। এরূপ বলা হবে অর্থগত দিক থেকে বৈপরিত্যপূর্ণ কারণ একই ব্যক্তি একই সাথে ইজতিহাদ ও তাকলিদ করতে পারেন না।[৪৭] শরিয়াহর একটি বিধান সম্পর্কিত অভিমত বা যন্নী প্রণয়নের সময় ইজতিহাদের অধিকাংশ কাজই সম্পাদন করতে হয়– এ ধারণার বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে সংখ্যাগরিষ্ঠের এ মত প্রকাশ পেয়েছে। বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতার প্রয়োজনীয় পর্যায়ে উন্নীত পূর্ণ যোগ্যতাসম্পন্ন মুজতাহিদই কেবল এ ধরনের যন্নী প্রকাশ করতে পারেন। আরো যুক্তি দেখানো হয় যে, শরিয়াহর সব শাখাই পরস্পরের সাথে আন্তঃসম্পর্কিত এবং এর কোনটির ব্যাপারে অজ্ঞতা অন্য বিষয়ে ভুলত্রুটি অথবা ভ্রান্ত ধারণার পথ প্রশস্ত করতে পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতের সমর্থনে আরো যুক্তি দেখানো হয় যে, কোনো ব্যক্তি একবার মুজতাহিদের পদমর্যাদায় অভিষিক্ত হলে যেসব বিষয়ে তিনি নিজে ইজতিহাদ চর্চা করতে সক্ষম সেসব বিষয়ে তিনি আর অন্যদের অনুকরণ করতে পারবেন না।[৪৮] সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের কেউ কেউ আবার ইজতিহাদের অবিভাজ্যতার ব্যতিক্রম কিছু মেনে নেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। যেমন- উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিষয়কে শরিয়াহর আইনের ক্ষেত্রে এটা একটি স্বনির্ভর শাখা হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং এটা অন্যান্য শাখার জ্ঞান থেকে স্বতন্ত্র। তাই কেবলমাত্র এ ক্ষেত্রে জ্ঞানের

www.pathagar.com

অধিকারী ফকিহ ফিকহর অন্যান্য শাখা থেকে বিচ্ছিন্ন থেকেও এ বিষয়ে ইজতিহাদ চর্চা করতে পারবেন।[৪৯]

কিছু মালেকী, হাম্বলী ও জাহিরি আলেম অবশ্য মনে করেন যে, ইজতিহাদ বিভাজনযোগ্য। কোনো ব্যক্তি যদি শরিয়াহর কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে সুবিজ্ঞ ও পারদর্শী হন তাহলে তিনি কেবল ওই বিষয়ে ইজতিহাদ করতে পারবেন। এতে কোনোভাবেই ইজতিহাদের গ্রহণীয় নীতিমালার কোনো লঙ্ঘন হবে না। এ মত অনুযায়ী অনুরূপভাবে একই ব্যক্তির পক্ষে একই সাথে মুজতাহিদ ও মুকাল্লিদ উভয় হওয়ার সম্ভাবনার বিষয়ে কোনো আপত্তি নেই। এভাবে একজন মুজতাহিদ যে বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী সে বিষয়েই তার ইজতিহাদ চর্চার সুযোগকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারেন। বস্তুতপক্ষে অনেক সময় অনেক বিখ্যাত ইমামের ক্ষেত্রে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। তারা নির্দিষ্ট বিষয়ে তাদের জ্ঞানের কমতির কথা স্বীকার করেছেন। ইমাম মালিক অন্তত ৩৬টি বিষয় সম্পর্কে সঠিক জবাব তার জানা নেই স্বীকার করেছেন বলে জানা গেছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও একজন পূর্ণাঙ্গ মুজতাহিদ হিসেবে ইমাম মালিকের যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।[৫০]

অনেক বিশিষ্ট আলেম ইজতিহাদের বিভাজ্যতাকে সমর্থন করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন আবুল হুসাইন আল বসরী, আল গাজ্জালী, ইবনে আল হুমাম, ইবনে তাইমিয়া, তার শিষ্য ইবনে আল কাইয়িম ও আল শাওকানী। আল গাজ্জালী এ মত প্রকাশ করেন যে, কোনো ব্যক্তি কিয়াসের বিষয়ে বিশেষভাবে পারদর্শী হলে এমনকি তিনি যদি হাদিসের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নাও হন, তাহলেও তিনি কিয়াসের আদলে ইজতিহাদ চর্চা করতে পারবেন। এই মতের সমর্থকদের মতে, শরিয়াহর সব শাখার ওপর জ্ঞান লাভ যদি শর্ত হিসেবে সংযুক্ত করা হয় তাহলে অধিকাংশ আলেমই তা পূরণ করতে ব্যর্থ হবেন এবং তা ইজতিহাদের ওপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করবে। আল শাওকানী, বাদরান ও আল কাসাবের মতে, দুই মতের মধ্যে এটি অগ্রাধিকার পাওয়ারযোগ্য।[৫১] কেউ কেউ আরো বলতে চান যে, আধুনিক যুগে তথ্যের বিপুল ভাণ্ডার এবং এর দ্রুত প্রবৃদ্ধির গতির বিষয় বিবেচনা করে জ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন ইজতিহাদের মৌলিকত্ব ও সৃজনশীলতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হবে। এভাবে ইজতিহাদের বিভাজ্যতা আধুনিক যুগের গবেষণার শর্তের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হবে। সবশেষে আবারো বলা যায়, কেউ এমনও বলেন যে, মুজতাহিদদের বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়, যেমন- নির্দিষ্ট মাজহাবের মুজতাহিদ বা নির্দিষ্ট বিষয়ের মুজতাহিদ যাতে ইজতিহাদের বিভাজ্যতার ধারণাকে নিশ্চিত করা হয়েছে।

www.pathagar.com

ইজতিহাদের পদ্ধতি

বিভিন্ন আকারে ইজতিহাদ সম্পাদন করা হয়ে থাকে, যেমন- কিয়াস, ইস্তিহছান, মাসলাহা-মুরসালাহা ইত্যাদি এবং এদের প্রতিটির নিজস্ব নিয়মনীতি রয়েছে, যা দ্বারা তা নিয়ন্ত্রিত হয়। অন্য কথায় বলা যায়, ইজতিহাদ চর্চার জন্য একই ধরনের কোনো পদ্ধতি নেই। তৎসত্ত্বেও আলেমগণ মত প্রকাশ করেন যে, ইজতিহাদ চর্চার ক্ষেত্রে ফকিহকে সর্বপ্রথম অবশ্যই কুরআন ও হাদিসের নুসুসকে অনুসন্ধান করতে হবে এবং একে অবশ্যই অন্যসব দলিল প্রমাণের চেয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। কোনো বিষয়ে নস পাওয়া না গেলে সে ক্ষেত্রে তিনি কুরআন ও হাদিসের সুস্পষ্ট (জাহির) আয়াত বা রেওয়ায়েত অবলম্বন করতে পারেন এবং বিষয় অনুসারে সাধারণ (আম), সুনির্দিষ্ট (খাস), নিরঙ্কুশ, নির্দিষ্ট ইত্যাদি সংক্রান্ত বিধিবিধান প্রয়োগের মাধ্যমে তার ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারেন। কোনো বিষয়ে কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত বা কাউলি হাদিস পাওয়া না গেলে সে ক্ষেত্রে মুজতাহিদ আমলি (ফিলী) হাদিস ও নীরব সম্মতির (তাকরিরি) হাদিস অবলম্বন করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হলে, তাকে দেখতে হবে যে ওই সমস্যা সম্পর্কে বিখ্যাত ফকিহদের রচনায় ইজমা অথবা কিয়াসের কোনো সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় কি না। এসব রচনায় কোনো দিকনির্দেশনা পাওয়া না গেলে সে ক্ষেত্রে তাকে কিয়াসের সাথে সঙ্গতি রেখে মৌলিক ইজতিহাদ করার চেষ্টা করতে হবে। এতে ফার-এর (যে সমস্যার সমাধান চাওয়া হয়) অনুরূপ ইল্লতের দৃষ্টান্ত হিসেবে কুরআন, সুন্নাহ অথবা ইজমা অবলম্বন করতে হবে। তা শনাক্ত করা হয়ে যাওয়ার পর মুজতাহিদকে প্রয়োজনীয় বিধান সংগ্রহ করার লক্ষ্যে কিয়াসের মূলনীতি প্রয়োগ করতে হবে। কিয়াস গঠিত হওয়ার ভিত্তি হিসেবে কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনার অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে মুজতাহিদ ইজতিহাদের যে কোনো স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন, যেমন- ইস্তিহছান, মাসলাহা-মুরসালাহা, ইস্তিশাব ইত্যাদি। এভাবে একটি সমাধান অর্জনে নিয়মাবলি এমনভাবে প্রয়োগ করতে হবে, যা এসব মতবাদের সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।[৫২]

ইমাম শাফেয়ী উপরিউক্ত পদ্ধতি প্রণয়ন করেন। নিম্নের নিয়মাবলি অনুসরণের জন্য তিনি সুখ্যাতি লাভ করেন। কোনো ঘটনা সংঘটিত হলে মুজতাহিদকে অবশ্যই সর্বপ্রথম কুরআনের নুসুস যাচাই করতে হবে, কিন্তু তিনি যদি তাতে কিছুই না পান তাহলে তাকে অবশ্যই মুতাওয়াতির হাদিস অবলম্বন করতে হবে, এরপর একক হাদিস। যদি প্রয়োজনীয় নির্দেশনা তাতেও পাওয়া না যায় তাহলে তাকে কুরআনের সুস্পষ্ট (জাহিরি) আয়াত সন্ধান করতে হবে, তা না করা পর্যন্ত তাকে কিয়াস অবলম্বন করা থেকে বিরত থাকতে হবে। তিনি যদি এমন সুস্পষ্ট আয়াত পান, যা

www.pathagar.com

সাধারণ (আম) তাহলে তাকে সুনির্দিষ্ট করতে তাকে হাদিস অনুসন্ধান করতে বা কিয়াস অবলম্বন করতে হবে। কিন্তু তিনি যদি সুস্পষ্ট আয়াতকে সুনির্দিষ্ট করার মতো কোনো কিছুই না পান তাহলে তিনি তাকে অবস্থান অনুযায়ী প্রয়োগ করতে পারবেন। তিনি যদি কুরআন ও সুন্নাহর কোনো সুস্পষ্ট আয়াত বা হাদিসের বিবরণ পেতে ব্যর্থ হন তাহলে তাকে মাজাহিব অনুসন্ধান করতে হবে। তিনি যদি তাদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতৈক্য দেখতে পান তাহলে তিনি তা প্রয়োগ করতে পারবেন, অন্যথায় তাকে কিয়াস অবলম্বন করতে হবে। কিন্তু এটি করতে হলে তাকে শরিয়াহর সাধারণ মূলনীতির প্রতি অধিকতর নজর দিতে হবে- এর বিস্তারিত সহায়ক বিষয়ের প্রতি নয়। যদি তার পক্ষে এটি পাওয়া সম্ভব না হয় এবং অন্য সব চেষ্টা ব্যর্থ হয় তাহলে তিনি দায়-দায়িত্বের মৌলিক অনুপস্থিতির মূলনীতি (আল-বারাআহ আল আসলিয়াহ) প্রয়োগ করতে পারবেন। এসবই অবশ্যই সাক্ষ্য প্রমাণের বিরোধের (আল তায়ারুদ আলবাইন আল আদিল্লাহ) ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় এমন নিয়মাবলি সম্পর্কে পূর্ণ অবগত থেকে প্রয়োগ করতে হবে। এর অর্থ মুজতাহিদকে অবশ্যই এ ধরনের বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতিসমূহ জানতে হবে অথবা প্রয়োজনীয় বলে প্রমাণিত হলে একটির অনুকূলে অন্যটিকে বর্জন করতে হবে। এভাবে প্রাপ্ত বিধান অত্যাবশ্যকীয় (ওয়াজিব), নিষিদ্ধ (হারাম), তিরস্কারযোগ্য (মাকরূহ) অথবা সুপারিশযোগ্য (মানদুব) হতে পারে।[৫৩]

যে পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে ইজতিহাদ করা হয় তার আলোকে নিম্নোক্ত চার প্রকারে ইজতিহাদ সম্পাদিত হয়। প্রথমত এক ধরনের বিচারিক সাদৃশ্য (কিয়াস) যা একটি কার্যকর কারণের (ইল্লত) ভিত্তিতে গঠিত হয়। দ্বিতীয় প্রকার ইজতিহাদ ইল্লতের উপস্থিতি ছাড়াই সম্ভাব্যতার (যন্নী) সমন্বয়ে গঠিত হয় যেমন- নামাজের সময় অথবা কিবলার দিক নির্ধারণে ইজতিহাদ চর্চা। তৃতীয় প্রকার ইজতিহাদ সূত্রের বিষয়গুলোর বিশ্লেষণ এবং বিরাজমান দলিলের থেকে আহকাম সংগ্রহের সমন্বয়ে গঠিত হয়। এ ধরনের ইজতিহাদকে ইজতিহাদ বায়ানী বা 'ব্যাখ্যামূলক ইজতিহাদ' বলা হয়, যা 'সাদৃশ্যপূর্ণ ইজতিহাদ' বা ইজতিহাদ কিয়াসের চেয়ে অগ্রাধিকার পায়। চতুর্থ প্রকার ইজতিহাদকে ইজতিহাদ ইস্তিল্লাহি বলে উল্লেখ করা হয়, যা মাসলাহার ওপর ভিত্তি করে গঠিত হয় এবং এতে শরিয়াহর চেতনা ও উদ্দেশ্যের আলোকে আহকাম সংগ্রহ করা হয় যা ইস্তিস্লাহ, বিচারক অগ্রাধিকার (ইস্তিহছান), উপায়-উপকরণের অন্তরায় (সাদ্দ আল জারাই) এবং অন্য কয়েক ধরনের পদ্ধতির আকারে হতে পারে। ইমাম শাফেয়ী কেবলমাত্র প্রথম ধরনের ইজতিহাদ অর্থাৎ ইজতিহাদ আল কিয়াস গ্রহণ করেছেন কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম মনে করেন যে, ইজতিহাদ কেবলমাত্র কিয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এবং উপরের যে কোনোভাবে তা সম্পাদিত হতে পারে।[৫৪]

www.pathagar.com

রসুল সা. ও সাহাবিগণের রা. ইজতিহাদ

এখানে যে প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করা হবে তাহলো রসুল সা.-এর সব সিদ্ধান্তকে কি খোদায়ী অনুপ্রেরণাজাত বলে গণ্য করা হবে অথবা তা ইজতিহাদেরও অংশ কি না। আলেমগণ সাধারণভাবে একমত হয়েছেন যে, রসুল সা. সমসাময়িক ও সামরিক বিষয়ে ইজতিহাদ চর্চা করেছেন কিন্তু শরিয়াহর বিষয়ে সিদ্ধান্তসমূহ সঠিকভাবে ইজতিহাদের আওতায় পড়বে কি না সে ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। আশারি, মুতাজিলা, ইবনে হাজম, আল জাহিরি এবং কতিপয় হাম্বলী ও শাফেয়ী আলেমের মতে, কুরআনের স্পষ্ট দলিল থেকে জানা গেছে যে, রসুল সা.-এর প্রতিটি বক্তব্যই ওহির অংশ। সুরা আল নাজম (৫৩ : ৩) এ বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে : 'সে নিজের ইচ্ছায় কোনো কথা বলে না, এসবই তার কাছে পাঠানো (ওহি) ছাড়া আর কিছু নয়।' এ আয়াতে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে যে কথা বলা হয়েছে তাহলো-রসুল সা.-কে খোদায়ী অবতীর্ণ বাণী দ্বারা পরিচালিত করা হয় এবং এরই আলোকে তার সব কথাকে বিবেচনা করতে হবে। এর অর্থ হলো, রসুল সা.-এর সব সিদ্ধান্তই ওহির সমন্বয়ে গঠিত এবং ইজতিহাদের আকারে তার কোনোটিই সংঘটিত হয়নি।[৫৫]

আলেমদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অবশ্য মনে করেন যে, রসুল সা. যেমন ইজতিহাদ চর্চার অনুমতি দিয়েছেন, তেমনি নিজেও তা চর্চা করেছেন। কুরআনের অসংখ্য আয়াতে এ কথার সমর্থন দেখতে পাওয়া যায়। এসব আয়াতে মুমিনদের সাথে সাথে রসুল সা.-কে কুরআন সম্পর্কে গভীর ধ্যান করার এবং সৃষ্টি জগতের বিষয়ে গবেষণা ও চিন্তার আহ্বান জানানো হয়েছে। ওপরে উদ্ধৃত সুরা আল নাজমের আয়াতে যে কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে, তাহলো খোদ কুরআন মজিদ, রসুলের সা. উচ্চারিত সব কথাই নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের মতে, আরো বলা হয়েছে যে, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার ঘটনাও (শানে আল-নাজল) এ ব্যাখ্যাকে সমর্থন করে। কুরআন রসুল সা.-এর নিজস্ব রচনা এবং তা আল্লাহর বাণী নয়, কাফেরদের এ দাবি খণ্ডন করে দিতে এ আয়াত নাজিল করা হয়েছে। এ ছাড়া রসুল সা. প্রায় কিয়াস ও ইজতিহাদের পন্থায় যুক্তি প্রয়োগ করতেন এবং ওহি না পাওয়া পর্যন্ত সব বিষয় মুলতবি করতেন না।[৫৬]

রসুল সা. কর্তৃক ইজতিহাদ চর্চার দাবিকে নাকচ করে দিয়েছে এ বিষয়ে সংখ্যালঘুদের একটি মত। তারা মনে করেন যে, রসুল সা.-এর ইজতিহাদ চর্চার বিষয়টি যদি সঠিক হতো তাহলে তার মতের বিরোধিতা করার অনুমোদন থাকত। কারণ মতপার্থক্য ও বিরোধিতার অনুমোদন করাই হচ্ছে ইজতিহাদের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু রসুল সা.-এর বিরোধিতা করা সুস্পষ্ট ভাষায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং তার

www.pathagar.com

আনুগত্য করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কর্তব্য। কুরআনে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে (আন নিসা, ৪ : ১৪ ও ৫৮)।

এ ব্যাপারে তৃতীয় আরেকটি মত রয়েছে, যাতে দলিলের বিরোধপূর্ণ প্রকৃতির কারণে পুরোপুরি স্থগিত করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী এ মত ব্যক্ত করেছেন বলে বলা হয় এবং আল বাকিলানী ও আল গাজ্জালী একে সমর্থন করেছেন। আল শাওকানী অবশ্য এ মতকে নাকচ করে দিয়ে বলেছেন যে, কুরআন থেকে আমরা স্পষ্ট নির্দেশনা দেখতে পেয়েছি যে, যাতে রসুল সা.-এর জন্য কেবল ইজতিহাদের অনুমোদনযোগ্য বলা হয়নি উপরন্তু এ ক্ষেত্রে তারও ভুলত্রুটি হওয়া সম্ভব ছিল।[৫৭]

তৎসত্ত্বেও যেসব আলেম এমত পোষণ করেন তারা আরো বলেন যে, এ ধরনের ত্রুটি স্থায়ী ছিল না। এর অর্থ হচ্ছে রসুল সা.-এর যে কোনো ত্রুটি হলে তা স্বয়ং রসুল সা. অথবা পরে অবতীর্ণ ওহির মাধ্যমে সংশোধন করা হতো।[৫৮] আমরা কুরআনে রসুলকে সা. ত্রুটির জন্য ভর্ৎসনা করা সংক্রান্ত কিছু আয়াত দেখতে পাই। এর উদাহরণ হিসেবে সুরা আনফালের একটি আয়াত (৮ : ৬৭) তুলে ধরা যেতে পারে : 'কোনো নবির জন্য এটি শোভা পায় না যে, তার কাছে বন্দী লোক থাকবে, যতক্ষণ সে জমিনে শত্রুবাহিনীকে খুব ভালো করে দমন না করবে।' বদর যুদ্ধের বন্দীদের ব্যাপারে এ আয়াত নাজিল হয়। শত্রু পক্ষের ৭০ জন যুদ্ধে বন্দী হয়েছিল বলে জানা গেছে। রসুল সা. সর্বপ্রথম এদের বিষয়ে হজরত আবু বকর রা.-এর সঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি মুক্তিপণ নিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দেয়ার পক্ষে মত দেন। অন্যদিকে এ ব্যাপারে হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব রা. এদেরকে হত্যা করা উচিত বলে মত প্রকাশ করেন। রসুল সা. আবু বকরের মতকে গ্রহণ করেন এরপর এ আয়াত নাজিল হয়, যাতে মুক্তিপণ নিয়ে বন্দীদের ছেড়ে দেয়াকে অনুমোদন করা হয়নি। অন্যত্র সুরা আত তাওবায় (৯ : ৪৩) রসুল সা.-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে : 'আল্লাহ্ তোমায় ক্ষমাসুন্দর করেছেন, কিন্তু কে সঠিক কথা বলেছে তা তোমার কাছে সুস্পষ্ট হওয়ার আগেই কেন তুমি তাদের এরূপ কথার অনুমতি দিলে?' তাবুক যুদ্ধে যারা অংশ নেয়নি তাদের বিষয়ে তদন্ত হওয়ার আগেই রসুল সা. তাদের অব্যাহতিদানের বিষয় মঞ্জুর করেন। আয়াতটি এ বিষয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। এই আয়াত ও কুরআনের অন্যান্য অনুরূপ আয়াত থেকে এ নির্দেশনা পাওয়া গেছে যে, রসুল সা. বিভিন্ন সময়ে নিজস্ব ইজতিহাদের ভিত্তিতে কাজ করেছেন। তিনি যদি খোদায়ী নির্দেশনা অনুসরণে কাজ করতেন তাহলে সেসবের জন্য তাকে কখনোই ভর্ৎসনা করা হতো না অথবা ভুলের জন্য খোদায়ী ক্ষমা মঞ্জুর করা হতো না।[৫৯]

www.pathagar.com

সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে, রসুল সা. ইজতিহাদ অবলম্বন করেছেন। এ ব্যাপারে সুন্নাহতেও সমর্থন দেখতে পাওয়া যায়। এক হাদিসে রসুল সা. ইরশাদ করেন :

انما أقضي بينكم برأحي فيما لم ينزل علّى فيه وحسي

যখন কোনো বিষয়ে আমি ওহির নির্দেশনা না পাই তখন আমি আমার নিজের মত (রায়) অনুযায়ী তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেই।[৬০]

এ বিষয়ে পরবর্তী যে প্রশ্নটি রয়েছে তাহলো, রসুল সা.-এর জীবদ্দশায় সাহাবিগণের রা. জন্য ইজতিহাদ করা কি বৈধ ছিল? সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে এটি করা বৈধ ছিল এবং এটি রসুল সা.-এর উপস্থিতিতে না অনুপস্থিতিতে করা হয়েছে সেটা কোনো ধর্তব্যের বিষয় নয়। তবে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিষয়ের ব্যাপারে অবশ্য আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইবনে হাজম মনে করেন যে, হালাল ও হারাম বিষয় ছাড়া অন্যান্য সব বিষয়ে এ ধরনের ইজতিহাদ জায়েজ। অন্যদিকে আমিদী ও ইবনে আল হাজিব এ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, এটি হচ্ছে কেবলমাত্র যন্নী বিষয় যা কোনো সুনির্দিষ্ট বিধান প্রতিষ্ঠা করে না। অনেক আলেম আরো বলেছেন যে, তারা মনে করেন যে, সাহাবিগণের রা. কেবলমাত্র ওই ইজতিহাদ বৈধ হবে, যা রসুল সা.-এর উপস্থিতিতে তার অনুমতিক্রমে করা হয়েছে অথবা রসুল সা. কোনোভাবে তা অনুমোদন করেছেন। রসুল সা.-এর জীবদ্দশায় সাহাবিগণের রা. ইজতিহাদকে যারা বৈধ বলে মনে করেন না তারা মনে করেন যে, প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত জানতে রসুল সা.-এর কাছে সাহাবিগণের রা. প্রবেশের সুযোগ ছিল এবং ওই সিদ্ধান্ত ছিল চূড়ান্ত ও অকাট্য। কেউ যদি বিচারিক বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানতে সক্ষম হয় তাহলে তার জন্য ইজতিহাদ, অর্থাৎ ধারণামূলক সিদ্ধান্ত লাভের চর্চা বৈধ হবে না।[৬১]

এ মতকে অবশ্য দুর্বল বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। কারণ এতে রসুল সা.-এর কাছে প্রবেশের সুযোগকে গ্যারান্টি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। কোনোরূপ বিলম্ব ছাড়াই সাহাবিগণের রা. কতিপয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের সম্ভাবনা থাকার বিষয়ে এতে গুরুত্ব দেয়া হয়নি। তাই এ ব্যাপারে সঠিক মত হচ্ছে সাহাবিগণ রা. বিভিন্ন সময়ে ইজতিহাদ চর্চা করেছেন, রসুল সা.-এর উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি উভয় ক্ষেত্রে তারা এটি করেছেন অনেক বাস্তব ঘটনায় যার সমর্থন দেখতে পাওয়া যায়। আর সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমগণ এ মতকে সমর্থন করেছেন। মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. বর্ণিত একটি হাদিসে এ ব্যাপারে স্পষ্ট সমর্থন দেখতে পাওয়া যায়। রসুল সা. মুয়াজকে রা. (ইয়ামেনে অবস্থান করার সময়) তার অনুপস্থিতিতে ইজতিহাদ করার কর্তৃত্ব প্রদান করেন।[৬২] রসুল সা.-এর অনুপস্থিতিতে ইজতিহাদ করেছেন এমন অসংখ্য নামের

www.pathagar.com

মধ্যে আবু বকর, সাদ, মুয়াজ, আমর ইবনে আল আশ ও আবু মুসা আল আশরারি রা. নাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।[৬৩]

একটি হাদিসে এ কথা জানা গেছে যে, রসুল সা. যখন আমর ইবনে আল আসকে রা. কয়েকটি বিরোধ নিষ্পত্তির কর্তৃত্ব প্রদান করেন তখন তিনি রসুল সা.-কে জিজ্ঞেস করেন যে, আপনি উপস্থিত থাকতেই কি আমি ইজতিহাদ করব? এর জবাবে রসুল সা. বলেন, 'হ্যাঁ, তুমি যদি সঠিক বিচার কর তাহলে দু'টি পুরস্কার পাবে, কিন্তু ভুল করলে মাত্র একটি পাবে।' অনুরূপ আরেকটি রেওয়ায়েত থেকে জানা গেছে, রসুল সা.-এর উপস্থিতিতে সাদ ইবনে মুয়াজ রা. বনু কুরাইজার ইহুদিদের ব্যাপারে একটি রায় প্রদান করেন এবং রসুল সা.তার রায় অনুমোদন করেন।[৬৪]

ইজতিহাদের সত্যতা ও বিভ্রান্তি

প্রত্যেক মুজতাহিদ তার সিদ্ধান্ত সঠিক বলে মনে করতে পারেন কি না অথবা কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে অনেকগুলো সমাধানের মধ্যে মাত্র একটিকে সঠিক বলে গণ্য করে অন্যগুলোকে বাদ দেয়া হবে কি না সে ব্যাপারে ফকিহদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। এ প্রশ্নের মূল ইজতিহাদের সত্যতার ঐক্য বা বহুত্বতার অনিশ্চয়তার মধ্যে নিহিত রয়েছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তায়ালা কী প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য সুনির্দিষ্ট সমাধান পূর্ব থেকেই নির্ধারণ করে রেখেছেন এবং কেবলমাত্র তাই-ই সঠিক বলে গণ্য করা হবে? যদি উত্তরটি হ্যাঁ সূচক হয় তাহলে যে কোনো বিচারিক সমস্যার একটি মাত্র সঠিক সমাধান থাকবে আর অন্য সব হবে ক্রটিপূর্ণ। এর ফলে আরো বড় ধরনের একটা প্রশ্নের অবতারণা হবে তাহলো, ক্রটিপূর্ণ ইজতিহাদ করার মাধ্যমে মুজতাহিদের পক্ষে গোনাহের কাজ করা কী আদৌ সম্ভব? মুজতাহিদের কাজ সঠিক হোক বা না হোক তার জন্য হাদিসে সওয়াবের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, এ ছাড়া বস্তুতপক্ষে ইজতিহাদ হচ্ছে একটি পবিত্র দায়িত্ব পালন করা, তাই তাত্ত্বিকভাবে কোনো মুজতাহিদের পক্ষে গোনাহের কাজ করা কী সম্ভব?

আল্লাহ্‌র একত্ববাদ (তাওহিদ), তাঁর গুণাবলি, রসুল সা.-এর নবুওয়াত, আখিরাত ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় ধর্মবিশ্বাসের প্রশ্নে আলেমগণ একমাত্র সত্যের ব্যাপারে একমত হয়েছেন। তাই এ বিষয়ে যে কেউ যে কোনো মুজতাহিদ বা অন্য কেউ হোক না কেন, যেই ভিন্নমত পোষণ করবে সে আপনা-আপনি ইসলাম পরিত্যাগ করবে।[৬৫]

বিচারিক বা শারয়ী বিষয়ে আশআরী ও মুতাজিলাসহ সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম দুই ধরনের ইজতিহাদকে স্বীকৃতি দিয়েছেন :

www.pathagar.com

১. সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট আয়াত ও হাদিস দ্বারা নির্ধারিত শরয়ী বিষয়গুলো যেমন- নামাজ ও ইমানের অন্যান্য স্তম্ভগুলোর অত্যাবশ্যকীয়তা এবং চুরি, ব্যাভিচারী ইত্যাদি হারাম বিষয়গুলো। এসব বিষয়ে একমাত্র সত্য রয়েছেন যা সম্পর্কে মুজতাহিদ ভিন্নমত পোষণ করতে পারবেন না। যে কেউ এসবের বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করবে সে গোনাহগার হবে। অনেকের মতে, এমনকি এতে ফাসেকি ও কুফরি করা হবে।

২. কুরআন ও হাদিসের সূত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি এমন শারয়ী বিষয়ে অনেক মতপার্থক্য রয়েছে। আশআরী ও মুতাজিলাদের মত হচ্ছে, এসব বিষয়ে ইজতিহাদ সব সময়ই প্রশংসাযোগ্য এবং এর ফলাফলের প্রকৃতি যাই হোক না কেন তা সত্যের অনুষঙ্গে পরিণত হয়। কিন্তু চারজন শীর্ষস্থানীয় ইমাম ও অন্যান্য আলেমের মতে, কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে পরস্পরবিরোধী মতের মধ্যে মাত্র একটিকেই সঠিক বলে গণ্য করা যেতে পারে। এর কারণ একই ব্যক্তির পক্ষে এক ও অভিন্ন জিনিসকে একই সময়ে ও একই সাথে বৈধ ও অবৈধ উভয় হতে পারে বলা সম্ভব নয়।[৬৬]

এ মতের সমর্থনে একই বিষয়ে হজরত দাউদ ও সোলায়মান আ.-এর দু'টি রায় সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা এ দু'টি রায়ের মাত্র একটিকে অনুমোদন করেছেন। আয়াতটিতে বলা হয়েছে :

> আর এ নিয়ামতই আমি দাউদ ও সেলায়মানকে দান করেছিলাম। স্মরণ কর সে সময়ের কথা যখন তারা উভয়ে একটি শস্যক্ষেতের মোকদ্দমার ফায়সালা করছিল, সেখানে রাতের বেলায় ছড়িয়ে পড়েছিল অন্য লোকদের ছাগল এবং আমি নিজেই দেখছিলাম তাদের বিচার। সে সময়ে আমি সোলায়মানকে সঠিক ফায়সালা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম, অথচ প্রজ্ঞা ও জ্ঞান আমি উভয়কেই দান করেছিলাম (আল আম্বিয়া ২১ : ৭৮-৭৯)।

কোনো এক শরয়ী সমস্যার একাধিক সঠিক সমাধান যদি থাকত তাহলে এ আয়াতে দাউদ ও সোলায়মান উভয় নবীর ফায়াসালাকে সমুন্নত রাখা হতো। এভাবে আয়াতটিতে ইজতিহাদের সত্যের একক বৈশিষ্ট্যের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। উপরন্তু সাহাবাগণের রা. ইজতিহাদ চর্চার বিষয়ে দৃষ্টিপাত করলে এটি দেখা যাবে যে, তারা তাদের নিজেদের ভুলত্রুটি হওয়ার কথাই কেবল স্বীকার করেননি উপরন্তু পরস্পরের সমালোচনাও করেছেন। তাদের সবাই যদি ইজতিহাদের ক্ষেত্রে সঠিক হতেন তাহলে তাদের পরস্পরের সমালোচনা করার কিছুই থাকত না অথবা তাদের নিজ নিজ ইজতিহাদের ত্রুটি থাকার সম্ভবনার কথা স্বীকার করতেন না। এর একটি

www.pathagar.com

উদাহরণ হলো, কালালাহর (পিতামাতা ও সন্তানহীন মৃত ব্যক্তি) বিষয়ে প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর রা.-এর বক্তব্য। তিনি বলেন, 'আমি আমার নিজস্ব মত অনুযায়ী কালালাহর বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। যদি তা সঠিক হয় তাহলে তা হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুপ্রেরণার ফসল আর ভুল হলে তা হবে আমার ও শয়তানের'।[৬৭] আরো বলা হয়েছে যে, ওমর ইবনে খাত্তাব রা. একটি মামলার ফায়সালা করে দিলেন। সে সময় উপস্থিত বিবদমান একটি পক্ষ বলল, 'আল্লাহর শপথ, এটিই সত্য'। জবাবে খলিফা বললেন, 'তিনি সত্যে উপনীত হয়েছেন কি না তা তিনি জানেন না, কিন্তু সত্যে উপনীত হতে চেষ্টা-সাধনার কোনো ত্রুটি করেননি তিনি।[৬৮]

ইজতিহাদ সম্পর্কিত বিভিন্ন হাদিস ও সাহাবিগণের রা. বাস্তব কর্মকাণ্ডে স্পষ্টত : ইজতিহাদে ভুল হওয়ার বিষয়কে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। মুজতাহিদ সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন অথবা ভুল করতে পারেন কিন্তু উভয়ক্ষেত্রে তার কাজ প্রশংসনীয় এবং পুরস্কার বা সাওয়াব পাওয়ার যোগ্য।

এর বিপরীতে সংখ্যালঘুর মতে বলা হয়েছে, ইজতিহাদী বিষয়ে পূর্ব নির্ধারিত কোনো সত্য নেই। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা কোন বিশেষ সমাধানকে সত্য বলে নির্ধারণ এবং অন্যগুলোকে বাতিল করেননি। তাই ইজতিহাদের ফলাফল ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে এবং একাধিক সিদ্ধান্ত তাদের উৎকর্ষতার আলোকে সত্য বলে বিবেচিত হতে পারে। এ মতের সমর্থনে তারা কুরআনের উপরোল্লিখিত একই আয়াত উদ্ধৃত করেছেন, যাতে দাউদ ও সোলায়মান আ.-এর কথার শেষাংশ উল্লেখ করা হয়েছে : 'আমি প্রজ্ঞা ও জ্ঞান উভয়কে দান করেছিলাম।' তাদের কোনো একজন যদি ভুল করতেন তাহলে আল্লাহ তায়ালা কি তাদেরকে এভাবে প্রশংসা করতেন। তাই এর জবাবে বলা যায় যে, উভয়ে সঠিক পথে ছিলেন এবং প্রত্যেকে মুজতাহিদ নিজ নিজ পন্থায় সত্যে উপনীত হয়ে থাকেন। তারা আরো যুক্তি দেখান যে, কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে যদি একটিমাত্র সত্য থাকত তাহলে মুজতাহিদ তার নিজস্ব ইজতিহাদের ফলাফল পালনে বাধ্য থাকতেন না। তার কর্তব্য হলো অন্য সব বাদ দিয়ে নিজ ইজতিহাদ অনুসরণ করা। এ থেকে এটি জানা যাচ্ছে যে, প্রত্যেক মুজতাহিদই সত্যে উপনীত হন।[৬৯] এ মত শরিয়াহর শাসনের ক্ষেত্রে আরো সমর্থন লাভের চেষ্টা করে যাতে ইমাম অথবা মুজতাহিদকে আরেকজন মুজতাহিদকে বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেয়ার কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়েছে যিনি ইজতিহাদের ক্ষেত্রে তার সাথে দ্বিমত পোষণ করতে পারেন। এর উদাহরণ হলো, হজরত আবু বকর রা. জায়েদ ইবনে সাবিতকে রা. বিচারক নিয়োগ করেন। সাহাবিগণের রা. মধ্যে সাধারণভাবে এ বিষয়টি জানা ছিল যে, অনেক বিষয়ে জায়েদ রা. আবু বকর রা.-এর সাথে ভিন্নমত

www.pathagar.com

পোষণ করতেন। ইজতিহাদী বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ যদি সত্য থেকে বিচ্যুত হওয়া অথবা ভুলত্রুটিতে জড়িয়ে পড়া বুঝাত তাহলে আবু বকর রা. জায়েদকে রা. বিচারক পদে নিয়োগ দিতেন না। সবশেষে বলা যায়, এ মতের সমর্থকরা একটি হাদিস উল্লেখ করে থাকেন, যাতে বলা হয়েছে :

أصحابي كالنجوم بأيّهم أقتديتم أهتديتم

'আমার সাহাবিরা নক্ষত্রের মতো, তোমরা তাদের যে কোনো একজনকে অনুসরণ করলেই সঠিক পথে পরিচালিত হবে'। যদি সত্যের ঐক্যের ধারণার কোনো সারবত্তা থাকত তাহলে রসুল সা. হয়তো তার সত্য অর্জনকারী সাহাবিগণকেই রা.অনুসরণ করার বিষয় সুনির্দিষ্ট করে দিতেন।[৭০]

এসব মতপার্থক্য নিরসন করা যেতে পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমগণ একটি মশহুর হাদিসের আলোকে এ বিষয়টি নিষ্পত্তি করার পক্ষে মত দিয়েছেন। হাদিসটি আবারো উল্লেখ করতে চাই : 'যখন কোনো বিচারক ইজতিহাদ করে সঠিক রায় প্রদান করেন তখন তিনি দু'টি পুরস্কার লাভ করেন। কিন্তু ভুল করলেও তিনি একটি পুরস্কার লাভ করেন।' এ হাদিসে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, মুজতাহিদ হয় ঠিক (মুসিব) অথবা ভুল (মুখতি) করে থাকেন, অর্থাৎ কিছু মুজতাহিদ সত্য লাভ করেন এবং অন্যরা তা করতে পারেন না। কিন্তু এজন্য তাদের কারোরই গোনাহ হয় না, কারণ এ প্রচেষ্টার জন্য তাদের উভয়কেই পুরস্কৃত করা হয়। তাই দেখা যাচ্ছে যে, যদি কেউ মনে করেন যে, যত মুজতাহিদ রয়েছেন তত সত্য রয়েছে, তাহলে তিনি স্পষ্ট এ হাদিসের অর্থ থেকে দূরে সরে যাবেন। প্রত্যেক মুজতাহিদ যদি সত্যে উপনীত হন তাহলে এ হাদিসে মুজতাহিদদের দু'টি ভাগে বিভক্ত করা অর্থহীন হয়ে পড়বে।[৭১]

শ্রেণি বিভাগ ও বিধিনিষেধ

হিজরি পঞ্চম/একাদশ শতকের উসুলের আলেমগণ ইজতিহাদের ওপর বিধিনিষেধ আরোপের চেষ্টা করেন এবং ইজতিহাদকে কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেন। প্রাথমিকভাবে একে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়, তাহলো, স্বাধীন ইজতিহাদ ও সীমিত ইজতিহাদ। যে ইজতিহাদের মাধ্যমে সূত্রসমূহের দলিল থেকে আইন সংগ্রহের লক্ষ্যে যে ইজতিহাদ করা হয় তা 'স্বাধীন ইজতিহাদ' বলে পরিচিত এবং নির্দিষ্ট মাজহাবের আওতাধীনে প্রধানত আইনের বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট ইজতিহাদকে 'সীমিত ইজতিহাদ' বলে উল্লেখ করা হয়। ইসলামের প্রথম আড়াই শতাব্দী ধরে আইনগত সমস্যা সমাধানে বিশেষজ্ঞগণের

www.pathagar.com

নিজস্ব সমাধান পেশ করার অধিকারকে কখনোই অস্বীকার করার চেষ্টা করা হয়নি। কেবল পরে প্রশ্ন উঠেছে কে ইজতিহাদ করার যোগ্য। হিজরি তৃতীয় নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এ ধারণা প্রবল হতে শুরু করে যে, কেবলমাত্র অতীতের শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞগণ ইজতিহাদ চর্চার অধিকার ভোগ করতেন।[৭২] এটি হলো 'ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হওয়া' বলে পরিচিত জামানার সূচনা। পঞ্চম হিজরি শতকের পূর্ব পর্যন্ত ইজতিহাদকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করার কোনো চেষ্টা করা হয়নি। আল গাজ্জালী (মৃত্যু, ৫০৫/১১১১) সর্বপ্রথম ইজতিহাদকে উপরোল্লিখিত দু'টি শ্রেণিতে বিভক্ত করেন।[৭৩] পরে এ বিভক্তিকে প্রথমে পাঁচটি এবং পরে সাতটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। নিজ জমানার বিরাজমান মতের প্রতিনিধিত্বকারী আল গাজ্জালী স্বীকার করেন যে, স্বাধীন মুজতাহিদগণ ইতোমধ্যে কালের গর্ভে হারিয়ে গেছেন।[৭৪] এর প্রায় দুই শতাব্দী পরে মুজতাহিদদের পাঁচ শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। দশম হিজরি শতকে মুজতাহিদদের সাতটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয় এবং হিজরি ষষ্ঠ/দ্বাদশ শতক থেকে পরবর্তী যুগের ফকিহগণকে সাত ভাগের মধ্যে কেবল শেষোক্ত দু'টি শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[৭৫] নিম্নে এ সাত শ্রেণির মুজতাহিদদের বিবরণ তুলে ধরা হলো :

১. পূর্ণাঙ্গ মুজহাতিদ (মুজতাহিদ ফিল শার)। যেসব মুজতাহিদ ইজতিহাদের সব শর্ত পূরণ করেন তাদেরকে এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তারা বিভিন্ন সূত্রের দলিল থেকে আহকাম সংগ্রহ করেন এবং এটি করার ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট মাজহাবের রীতিনীতির দ্বারা তারা নিয়ন্ত্রিত হননি। সাহাবিগণের রা. মধ্যকার বিদ্বান ব্যক্তিবর্গ এবং তৎ পরবর্তীকালের শীর্ষস্থানীয় ফকিহগণ যেমন- সাদ ইবনে আল মুসাইয়্যিব ও ইব্রাহীম আল নাখায়ী, চার মাজহাবের শীর্ষস্থানীয় ইমামগণ, শিয়াদের শীর্ষস্থানীয় ইমাম মুহাম্মদ আল বাকির ও তার ছেলে জাফর আল সাদিক, আল আওজায়ী এবং আরো অনেককে স্বাধীন মুজতাহিদ বলে শনাক্ত করা হয়েছে। তাদের কর্তৃত্বের বলে সর্বসম্মত মতৈক্য, সাদৃশ্য, বিচারিক অগ্রাধিকার, মাসলাহা-মুরসালাহা, ইত্যাদি বিষয় শরিয়াহর গৌণ দলিল হিসেবে প্রণীত ও প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।[৭৬]

আবু ইউসুফ ও আল শায়বানীকে সাধারণত দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়। আবু জাহারাহ্ শীর্ষস্থানীয় আলেমদের জীবন ও কর্মের ওপর অনেক লেখালেখি করেছেন। তিনি এ দু'জনকে পূর্ণাঙ্গ মুজতাহিদ বলে গণ্য করেছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় সারির মুজতাহিদের থেকে প্রথম সারির মুজতাহিদের পার্থক্য করার মানদণ্ড হচ্ছে মৌলিকত্ব ও স্বাধীন চিন্তা। এ যদি কারণ হয় তাহলে একজন মুজতাহিদ অন্য আরেকজনের মতের সাথে নিছক একমত পোষণ

www.pathagar.com

করেছেন ঠিক এর ভিত্তিতে পদমর্যাদা নির্ধারণ করা হবে গুরুত্বহীন। শীর্ষস্থানীয় মুজতাহিদদের অনেকে অন্য আলেমদের মতের সাথে একমত পোষণ করেছেন বলে জানা গেছে। এর উদাহরণ হলো, আবু হানিফা অনেক সময় তার ওস্তাদ ইব্রাহীম আল নাখায়ী-এর মতের সাথে একমত পোষণ ও তা অনুসরণ করেছেন বলে জানা গেছে। তবে তিনি এটি করেছেন অনুকরণবশত নয় বরং তার অকাট্য যুক্তির কারণে।[৭৭]

প্রশ্ন হচ্ছে এ ধরনের ইজতিহাদের দরজা এখনো উন্মুক্ত রয়েছে কি না অথবা ইজতিহাদের তথাকথিত দরজা বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে এরও পরিসমাপ্তি ঘটেছে কি না। এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হলেন হাম্বলীগণ। তারা মনে করেন যে, সব ধরনের ইজতিহাদের দরজা উন্মুক্ত রয়েছে। তবে অন্য তিন মাজহাবের আলেমগণ মোটামুটিভাবে স্বাধীন ইজতিহাদের পরিসমাপ্তি ঘটার মতকে মেনে নিয়েছেন।[৭৮]

আরেকটি সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন যা নিয়ে আলেমগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে আলোচনা হয়, তাহলো নীতিগতভাবে কোনো জামানা বা প্রজন্মের সব মুজতাহিদদের বিলুপ্তির ধারণা আদৌ গ্রহণযোগ্য কি না। শরিয়ত কি একই সাথে এ ধরনের সম্ভাবনাকে বিবেচনা করতে প্রস্তুত এবং নিজের চলমান ধারাও বজায় রাখতে চায়? আল আমিদী, ইবনে আল হাজিব, ইবনে আল হুমাম, ইবনে আল সুবকি ও জাকারিয়া আল আনসারীসহ উসুলের অধিকাংশ আলেম এ প্রশ্নের হ্যাঁ সূচক জবাব দিয়েছেন। তবে এর ব্যতিক্রম হচ্ছেন হাম্বলীগণ। হাম্বলীগণ যুক্তি দেখান যে, মুসলিম সমাজের জন্য ইজতিহাদ একটি বাধ্যতামূলক কর্তব্য এবং পুরোপুরিভাবে এর পরিত্যাগ হবে বিভ্রান্তিকর এবং ভুল ধারণাকে মেনে নেয়ার শামিল যা হাদিসে নিরোধ করা হয়েছে। ওই হাদিসে বলা হয়েছে :

لا تجتمع أمتي على االضلاله

'আমার উম্মত কখনো ভুলের ওপর একমত হবে না'।[৭৯]

ইজতিহাদ হচ্ছে ওয়াজিব। 'আইনি বা কেফা'য়ী যাই হোক না কেন, এ কারণে তা কখনো বন্ধ হবে না, তার নিশ্চয়তা রয়েছে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। আরেকটি হাদিসেও বিষয়টি এভাবে প্রকাশ পেয়েছে :

لاتزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين

حتى تقوم الساعة

www.pathagar.com

> আমার উম্মতের একটি অংশ অবিরতভাবে সব সময়ই হকের পথে অটল থাকবে, তারা হবে প্রভাবশালী শক্তি এবং রোজ কিয়ামত না আসা পর্যন্ত তারা দমিত হবে না।[৮০]

যেহেতু জ্ঞান ছাড়া হকের পথ সফলভাবে অনুসরণ করা সম্ভব নয়, তাই প্রদত্ত যে কোনো যুগে (আসর) মুজতাহিদদের বিরাজিত/টিকে থাকার বিষয়টি এ হাদিসে প্রকাশ পেয়েছে। উপরন্তু অনেক আলেম মনে করেন যে, সীমিত ইজতিহাদ বা কেবলমাত্র ফতোয়া প্রদান করার মাধ্যমে ইজতিহাদের দায়িত্ব পালন সম্পূর্ণ হয় না। হাম্বলীগণের মতে, ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার দাবি স্পষ্টত খারিজ হয়ে গেছে। ইজতিহাদ কেবল উন্মুক্তই নেই, উপরন্তু এমন কোনো যুগ আসবে না যাতে কোনো মুজতাহিদ বর্তমান থাকবেন না। শিয়া ইমামিয়ারাও এ একই মত পোষণ করেন। শিয়ারা অবশ্য তাদের স্বীকৃত ইমামদের অনুসরণ করেন। কেবল তাদের অনুপস্থিতিতেই তারা ইজতিহাদ চর্চা করে থাকেন এ শর্তে যে তারা মূলনীতি ও বিস্তারিত বিবরণ উভয় ক্ষেত্রে ইমামদের সিদ্ধান্ত মেনে চলবেন। ইমামদের সিদ্ধান্ত পাওয়া না গেলেই কেবল সে ক্ষেত্রে শিয়ারা কুরআন সুন্নাহর পর আকলকে দলিল হিসাবে বিবেচনা করে থাকেন।[৮১] সবশেষে এ কথা বলা যেতে পারে যে ইজতিহাদ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ধারণা শরিয়াহর কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মতবাদের সাথে সাংঘর্ষিক বলে প্রতীয়মান হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে ইজমার মতবাদ ও কিয়াস সম্পর্কিত বিস্তারিত কার্যপ্রণালীকে আইনের জীবন্ত প্রমাণ হিসেবে বিবেচনা করে তা অবলম্বন করা হয় এবং প্রত্যেক যুগে মুজতাহিদদের উপস্থিতি বজায় থাকে বলে মনে করা হয়।[৮২]

২. মাজহাবের অন্তর্ভুক্ত মুজতাহিদগণ। এসব ফকিহ নির্দিষ্ট মাজহাবের ইমামদের প্রণীত মূলনীতিমালা অনুসরণ করে ওই মাজহাবের সীমার মধ্যে থেকে আইন প্রণয়ন করেন। এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত প্রখ্যাত ফকিহগণের মধ্যে রয়েছেন হানাফী মাজহাবের জুফার ইবনে আল হাজায়েল ও হাসান ইবনে জিয়াদ, শাফেয়ী মাজহাবের ইসমাঈল ইবনে ইয়াহিয়া আল মুজানী, উসমান তাকী আল দীন ইবনে আল সালাহ ও জালাল আল দীন আল সুয়ূতী। মালেকী মাজহাবের ইবনে আব্দুল বার ও আবু বকর ইবনে আল আরাবি এবং হাম্বলী মাজহাবের ইবনে তাইমিয়া ও তার শিষ্য ইবনে কাইয়িম আল জাওজিয়াহ। দেখা গেছে যে এসব বিশিষ্ট আলেম নিজ নিজ মাজহাবের মূলনীতি অনুসরণে সাধারণ মূলনীতির বাস্তবায়নে নির্দিষ্ট সমস্যার বিষয়ে যুক্তি পেশের ক্ষেত্রে তারা তাদের

www.pathagar.com

নিজেদের ইমামদের অনুসরণ করতে বাধ্য বলে মনে করতেন না। তারা এমন অনেক মত প্রকাশ করেছেন, যা তাদের শীর্ষস্থানীয় ইমামদের মতের বিরোধী ছিল। এ থেকে তাদের উপরিউক্ত অবস্থানের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়।[৮৩]

৩. নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কিত মুজতাহিদ। এসব ফকিহ্ নির্দিষ্ট বিষয় বা ঘটনার ক্ষেত্রে আইনের ব্যাখ্যা প্রদান ও প্রয়োগে সুযোগ্য ছিলেন প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের মুজতাহিদগণ যেসব বিষয় নিস্পত্তি করে যাননি। তারা নেতৃস্থানীয় মুজতাহিদদের বিরোধিতা করেননি এবং সাধারণভাবে নিজ নিজ মাজহাবের প্রতিষ্ঠিত মূলনীতি অনুসরণ করেন। তাদের প্রধান ভাবনা ছিল উর্ধ্বতন মুজতাহিদগণ সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করে যাননি এমন নতুন নতুন বিষয়ে আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করা। এ শ্রেণির মুজতাহিদদের মধ্যে রয়েছেন হানাফী মাজহাবের আবুল হাসাম আল কারখি, আবু জাফর আল তাহাবি, শাফেয়ী মাজহাবের আবুল ফজল আল মারওয়াজি ও আবু ইসহাক আল শিরাজী, মালেকী মাজহাবের আবু বকর আল আবহারি এবং হাম্বলী মাজহাবের আমর ইবনে হুসাইন খিরাকি।

উপরিউক্ত তিন শ্রেণির ফকিহ্গণকে মুজতাহিদ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। তবে নিম্নের অবশিষ্ট চার শ্রেণির ফকিহ্কে অনুসরণকারী হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে।[৮৪]

৪. তথাকথিত আসহাব আল তাখরীজ। এ শ্রেণির আলেমগণ আহকাম সংগ্রহ করেননি তবে মূলনীতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন এবং অস্পষ্টতার ক্ষেত্রে কোন মতটি অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য অথবা বিশেষ পরিস্থিতিতে উপযোগী হবে তা নির্দেশ করতে তারা সক্ষম ছিলেন।[৮৫]

৫. আসহাব আল তারজিহ। এ শ্রেণির আলেমগণ সঠিক (সহিহ্) ও অগ্রাধিকার (রাজিহ, আরজাহ) ও ঐকমত্যের বিষয়াবলির সংগে দুর্বল মতগুলোর তুলনা ও পার্থক্য নিরূপণ করতে সক্ষম ছিলেন। এ শ্রেণির ফকিহ্দের মধ্যে রয়েছেন হানাফী মাজহাবের গ্রন্থ প্রণেতা 'আলা' আল দীন আল কাসানী ও বুরহান আল দীন আল মারগিনানী, শাফেয়ী মাজহাবের মুহাইয়ি আল দীন আল নবোবি, মালেকী মাজহাবের ইবনে রুশদ আল কুরতুবি এবং হাম্বলী মাজহাবের মুয়াফাক আল দীন ইবনে কুদামাহ।[৮৬]

৬. তথাকথিত আসহাব আল তাশহিহ। এ শ্রেণির ফকিহ্গণ নিজ নিজ মাজহাবের দৃষ্টিতে স্পষ্ট (জাহির আল রিওয়াইয়াহ), বিরল ও অস্পষ্ট (আল নাওয়াজির) বিবরণীর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারেন। যাদের লেখা পাঠ্য বই বিভিন্ন

www.pathagar.com

মাজহাবে ব্যবহৃত ও অনুসৃত হয় তারা এ শ্রেণিতে পড়েন।[৮৭] এখানে এ কথা বলা যায় যে উপরিউক্ত তিন শ্রেণি অনেকটা একই রকম এবং তাদেরকে একটি শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। তারা এমন ধরনের ফকিহ্ যারা বিদ্যমান মত বা দৃষ্টিভঙ্গির তুলনা এবং তার শক্তিমত্তা ও দুর্বলতা মূল্যায়ন করেছেন।

৭. সর্বশেষ শ্রেণিতে রয়েছে মুকাল্লীদুন বা অনুকরণকারীরা। এ শ্রেণির আলেমদের উপরোল্লিখিত যোগ্যতার অভাব রয়েছে এবং ওপরের কোনো শ্রেণিতে তারা পড়েন না। তাদের সম্পর্কে বলা হয় যে 'তারা চিকন ও মোটা এবং ডান ও বামের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন না কিন্তু রাতের বেলা কাঠ সংগ্রহকারীদের মতো যাই-ই পান তাই-ই একত্র জড়ো করতে পারেন।'[৮৮]

এ শ্রেণি বিভাগের কথা উল্লেখকালে Aghnides সম্ভবত যথার্থ মন্তব্য করেছেন, 'শেষোক্ত শ্রেণির মুজতাহিদগণ চিন্তার ক্ষেত্রে বড় ধরনের স্বাধীনতার পরিচয় দিতে পারেননি বলে ভিত্তিহীন ধারণা পোষণ করা হয়।'[৮৯] ইজতিহাদের বিধিনিষেধ আরোপ ও তৎপরবর্তী 'এর দরজা বন্ধ করে দেয়ার' বেশির ভাগ দিক হচ্ছে ঐতিহাসিক ঘটনা এবং ইজতিহাদের আইনগত তত্ত্বে তার প্রতি কোনো সমর্থন দেখতে পাওয়া যায় না। অনুরূপভাবে হিজরি চতুর্থ শতকে আলেমগণ ইজতিহাদ অপ্রয়োজনীয় বলে যে অপরিবর্তনযোগ্য সর্বসম্মত মত প্রকাশ করেন তা ছিল এক ধরনের অচিন্তনীয় ও অসমর্থনযোগ্য ঘটনা।[৯০] হাম্বলী ও শিয়া ইমামীয়াসহ অসংখ্য আলেম এ ধরনের মতৈক্যকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাদের প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে এ দাবির অসারতার বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে।

সমগ্র মুসলিম বিশ্বের লেখকগণ তাকলিদের সমালোচনা করতে শুরু করেছেন এবং তারা খোদায়ী নির্দেশিত আইনগত মূলনীতি হিসেবে ইজতিহাদের বৈধতা অব্যাহতভাবে বজায় রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। শাহ ওয়ালি উল্লাহ্, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল সানয়ানি, মুহাম্মদ বিন আলী আল শাওকানী, ইবনে আলী আল সানুসীর নেতৃত্বে বহু বিশিষ্ট আলেম ইজতিহাদ পুনরুজ্জীবিত করার আহ্বান জানান।[৯১] ঊনবিংশ শতকে মিসরের সালাফি আন্দোলন আধুনিক পরিস্থিতির আলোকে ইসলামের সংস্কার সাধন এবং তাকলিদ পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করার আহ্বান জানায়।

আল শাওকানী (মৃত্যু, ১২৫৫/১৮৩৯) স্বাধীন মুজতাহিদদের বিলুপ্তির দাবিকে দৃঢ়তার সাথে অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন যে, এ দাবি হচ্ছে চরম অজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ এবং তাকে দৃঢ়তার সাথে অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করতে হবে। একই লেখক অনেক বিখ্যাত আলেমের উল্লেখ করেন যারা শরিয়ত সম্পর্কিত জ্ঞানের ক্ষেত্রে উচ্চতম মর্যাদায় উন্নীত হয়েছিলেন। উদাহরণ হিসেবে তাদের মধ্যকার

www.pathagar.com

শাফেয়ী মাজহাবের অন্তত ছয়জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে যারা অব্যাহতভাবে অগাধ পাণ্ডিত্যের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছিলেন। তারা হলেন, ইজ্জ আল দীন ইবনে আব্দুস সালাম, তার শিষ্য ইবনে দাকিক আল ঈদ, তার শিষ্য মুহাম্মদ সায়ীদ আল নাস, তার শিষ্য ইবনে হাজর আল আশকালানী, তার শিষ্য জায়েন আল দীন আল ইরাকি এবং তার শিষ্য জালাল আল দীন আল সুয়ুতি। তাদের সবাই ছিলেন পূর্ণাঙ্গ মুজতাহিদ। তাদের রচনাগুলোতে অত্যুচ্চ জ্ঞান-গরিমার প্রকাশ ও শরিয়তে তাদের অবদানে এ বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। এ ছয়জনের মধ্যে প্রথম দু'জন বিশেষভাবে বিখ্যাত। মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল জারকাশির সুস্বীকৃত গ্রন্থ আল বাহর আল মুহিত-এ স্বীকার করেছেন যে তারা উভয়ে মুজতাহিদের পদমর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছিলেন। আল শাওকানি লিখেছেন, 'এ কথা বলা স্পষ্টত নির্বুদ্ধিতার শামিল হবে যে মহান আল্লাহ তায়ালা বিগত জমানার আলেমদের জ্ঞানভাণ্ডার ও ইজতিহাদের ক্ষমতা দান করেছিলেন কিন্তু তৎপরবর্তী জমানার আলেমদের তা প্রদানে তিনি অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।' তাকলিদের সমর্থকরা আমাদের যা বলছেন, তাহলো- আমাদের হাতে কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও আমাদের অন্য লোকদের থেকে তা শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সমস্ত প্রসংশা আল্লাহর জন্য, আসলে এমন কথা বলা হচ্ছে সবচেয়ে বড় মিথ্যাচার (বুহতানুন আজিম) এবং একে যথার্থ প্রতিপন্ন করার কোনো যুক্তি জগতে নেই।[৯২]

ইকবাল লাহোরি ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হওয়ার কথিত ঘটনাকে 'একটি নিছক কল্পকাহিনী' বলে বিবেচনা করেছেন। তার মতে, এর জন্য আংশিকভাবে দায়ী ইসলামে আইনগত চিন্তার স্ফটিকীকরণ ও আংশিকভাবে দায়ী বুদ্ধিবৃত্তিক অলসতা, বিশেষ করে আধ্যাত্মিক অবক্ষয়ের সময় মহান চিন্তানায়কেরা নিষ্কর্মা হয়ে পড়েছিলেন। ইকবাল আরো বলেন : পরবর্তীকালের কতিপয় বিদ্বান ব্যক্তি যদি এ কল্পকাহিনী সমুন্নত রাখেন 'সে ক্ষেত্রে আধুনিক ইসলাম বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতার এ স্বেচ্ছা আত্মসমর্পণ মেনে চলতে বাধ্য নয়'।[৯৩]

আবু জাহরাহ একইভাবে ইজতিহাদের দরজা বন্ধের তথাকথিত ঘটনার সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, 'সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা মানব বুদ্ধি চর্চার যে দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছেন তা বন্ধ করে দেয়ার অধিকার কারোর কিভাবে থাকতে পারে? যেই এ দাবি পেশ করুক না কেন তা প্রমাণের পক্ষে তার কাছে সন্দেহাতীত কোনো যুক্তি নেই। আবু জাহরাহ আরো বলেন : আসল ব্যাপার হচ্ছে সক্রিয়ভাবে ইজতিহাদ চর্চার পথ অনুসরণ করা না হলে তার বিরূপ প্রভাবে লোকেরা শরিয়াহর উৎসসমূহ থেকে আরো দূরে সরে যাবে। তাকলিদের জোয়ারের কারণে কিছু লোক এত দূর পর্যন্ত বলে থাকেন যে কুরআন ও হাদিসের এখন আর কোনো ব্যাখ্যা-

www.pathagar.com

বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। তাই ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে আবু জাহরাহর উক্তি হলো, 'আসল ব্যাপার থেকে অনতিক্রম্য দূরত্বে আমরা চলে গেছি এবং এ ধরনের বাড়াবাড়ি থেকে আমরা আল্লাহর আশ্রয় কামনা করছি'।[৯৪]

উপসংহার

প্রাথমিক যুগের আলেমগণ তৎকালে যে পরিস্থিতিতে ইজতিহাদ চর্চা করতেন এখন আর সে অবস্থা নেই। আধুনিক যুগে সরকারের কর্ম সম্পাদনের প্রধান উপায় হিসেবে সাধারণভাবে সংবিধিবদ্ধ আইন প্রচলনের কারণে ইজতিহাদের ওপর আরো বিধিনিষেধ আরোপের পথ প্রশস্ত হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে ইসলামি দেশগুলোর অধিকাংশের দেশীয় আইনকে বিধিবদ্ধ আইনি গ্রন্থে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। একই সাথে সংবিধিবদ্ধ আইনের ব্যাখ্যার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে আইন-আদালতের ওপর। এ সবের ফলে ইজতিহাদের ওপর নিরুৎসাহব্যঞ্জক প্রভাব পড়ছে। মুজতাহিদকে কোনো স্বীকৃত মর্যাদা প্রদান করা হয় না এবং আইন ও বিচার-আদালত প্রশাসনে পালন করার মতো কোনো নির্দিষ্ট ভূমিকা তার নেই। এ বিষয়টির প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় অনেক ইসলামি দেশের সংবিধানে। এসব সংবিধানে ইজতিহাদের বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরবতা পালন করা হয়েছে। এ হলো ইজতিহাদের প্রতি চরম অবহেলার প্রকাশ। এ প্রেক্ষাপটে ইকবাল তার বিখ্যাত গ্রন্থ The Reconstruction of Religious Thought in Islam এ প্রস্তাব করেন যে, ইজমা ও ইজতিহাদ (তিনি একে আন্দোলনের মূলনীতি বলে উল্লেখ করেছেন) ব্যবহারের একমাত্র উপায় হচ্ছে রাষ্ট্রের আইনি কর্মকাণ্ডের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করতে ইজতিহাদকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে একে আধুনিক সরকারকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে (পৃষ্ঠা- ১৭৪)।

মূলত একই মত প্রকাশ করেছেন আল তামাবি। তিনি বলেন, অতীতে ফকিহগণ ব্যক্তিগত পর্যায়ে যেভাবে ইজতিহাদ চর্চা করতেন আধুনিক যুগের পরিস্থিতিতে সেভাবে এর চর্চা আর উপযোগী হবে না। আমাদের যুগে ইজতিহাদ পুনরুজ্জীবিত করতে হলে যে ধরনের প্রচেষ্টার প্রয়োজন সরকারকে অবশ্যই তার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। যেহেতু শিক্ষা হচ্ছে আধুনিক সরকারের কাজ ও দায়িত্ব তাই মুজতাহিদের যে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ থাকা প্রয়োজন সরকারের পক্ষে তাকে তা প্রদান করা সম্ভব এবং এভাবে সে বিশেষ যোগ্যতার ওপর ভিত্তি করে তাকে মুজতাহিদের পদমর্যাদায় উন্নীত করতে পারে। আল তামাবি সুযোগ্য মুজতাহিদদের নিয়ে একটি কাউন্সিল গঠনের সুপারিশ করেন যে কাউন্সিল সংবিধিবদ্ধ আইন প্রণয়ন ও অনুমোদনের ব্যাপারে পরামর্শ দেবে যাতে শরিয়াহর মূলনীতিমালার সাথে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।[৯৫]

www.pathagar.com

অবশ্য এ কথা বলার অর্থ এ নয় যে শরিয়াহর বিভিন্ন শাখা শিক্ষার ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপদ্ধতি অথবা ইজতিহাদ চর্চা সেকেলে হয়ে পড়েছে। এর বিপরীতে উত্তম সমাধান ও আরো পরিশুদ্ধ বিকল্প অনুসন্ধানে আলেম ও বিজ্ঞজন তাদের ব্যক্তিগত পর্যায়ের অবিরাম প্রচেষ্টায় যে অবদান রাখছেন তাকে কখনোই কোনোভাবে খাটো করে দেখা যাবে না। এ ছাড়া আরো আশা করা যায় যে, ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা পদ্ধতির শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার সংরক্ষণে সরকারও ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে এবং আইন ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে অধিকতর অবদান রাখার জন্য আলেমদের উৎসাহ প্রদান করবে। বর্তমানে অনেক ইসলামি দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও আইন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো আইনজীবী ও ব্যারিস্টারদেরকে আধুনিক আইনের ধারায় প্রশিক্ষণ প্রদানে রয়েছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এসব প্রতিষ্ঠানের উচিত হবে সম্ভাব্য মুজতাহিদদের প্রশিক্ষণ দানে ঐতিহ্যবাহী ও আধুনিক আইন উভয়ের সমন্বয়ে ব্যাপকভিত্তিক ও সুপরিকল্পিত শিক্ষা কর্মসূচির উদ্যোগ গ্রহণ করা। আর এসব কার্যাবলি বিশ্ববিদ্যালয় ও আইন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্মিলিত ক্ষমতার বাইরে বলে মনে হয় না কারণ ইসলামি আইন শিক্ষার ওপর তাদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা রয়েছে।

উপরন্তু একটি শরিয়ত সরকার উপদেষ্টা, শিক্ষা ও বিচার সংক্রান্ত ঊর্ধ্বতন পদে নিয়োগদানের ক্ষেত্রে যোগ্য মুজতাহিদদের অন্তর্ভুক্ত করতে আগ্রহী হওয়া উচিত বলে মনে করা হয়। এতে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার একটি ভিত্তি গঠিত হবে ও উন্নততর কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীরা উৎসাহিত হবে এবং সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে তাদের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট ভূমিকা পালনের ক্ষেত্র সৃষ্টিতে সহায়ক হবে।

টিকা

১. আমিন ইসলাহী (Islamic Law, পৃষ্ঠা ১০৯) এভাবে যথার্থই বলেছেন : ইসলামি আইনের তিনটি বিশিষ্ট ও মৌলিক উৎস রয়েছে, তা হলো- পবিত্র কুরআন, রসুল সা.-এর সুন্নাহ এবং ইজতিহাদ।

২. আমিদী, ইহকাম, ৪, ১৬২; শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২৫০; খুদারী, উসুল, পৃষ্ঠা ৩৬৭।

৩. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ৩০১।

৪. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২৫০; যুহাইর, উসুল, ৪, ২২৩-২৫; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৪৭১।

৫. গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ২, ১০২; আমিদী, ইহকাম, ৪, ১৬২।

৬. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২৫০।

৭. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ২২৫; যুহাইর, উসুল, ৪, ২২৫; Aghnides, Muhammedan Theories, পৃষ্ঠা ৯১; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৪৭১।

৮. কাসসাব, আদওয়া, পৃষ্ঠা ১৯; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৪৭৩।

www.pathagar.com

৯. আবু দাউদ, সুনান (হাসান অনূদিত), ২, ৪০৭, হাদিস নম্বর ১৫৬২।

১০. কাসসাব, আদওয়া, পৃষ্ঠা ৩০; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৪৭৪।

১১. আবু দাউদ, সুনান (হাসান অনূদিত), ১, ২০৯, হাদিস নম্বর ৮১৯।

১২. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২৫৩; খুদারী, উসুল, পৃষ্ঠা ৩৬৮; যুহাইর, উসুল, ৪, ২২৭।

১৩. গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ২, ১২১; আমিদী, ইহকাম, ৪, ২০৪; কাসসাব, আদওয়া, পৃ. ১১৯।

১৪. আমিদী, ইহকাম, ৪, ১৪; খুদারী, উসুল, পৃষ্ঠা ৩৮০।

১৫. আমিদী, ইহকাম, ৪, ২০৬; কাসসাব, আদওয়া, পৃষ্ঠা ১২১।

১৬. আমিদী, ইহকাম, ৪, ১৪; খুদারী, উসুল, পৃষ্ঠা ৩৮০।

১৭. ইবনে আল কাইয়িম, ইলাম, ১, ১১৭; কাসসাব, আদওয়া, পৃষ্ঠা ১০৮; বাদরান, উসুল, পৃষ্ঠা ৪৮৫।

১৮. একই গ্রন্থ।

১৯. গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ২, ১২০; আমিদী, ইহকাম, ৪, ১৮৪; ইবনে আল কাইয়িম, ইলাম, ১, ৭১-৭২; মাহমাসসানী, ফালসাফাহ (জিয়াদেহ অনূদিত), পৃষ্ঠা ৯৭।

২০. আবু দাউদ, সুনান (হাসান অনূদিত), ৩, ১০১৯, হাদিস নম্বর ৩৫৮৫। এ হাদিসের পূর্ণ বিবরণ রয়েছে এ বইয়ের ২১৮ পৃষ্ঠায়।

২১. গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ২, ৬৩-৬৪।

২২. আবু দাউদ, সুনান (হাসান অনূদিত), ৩, ১০১৩, হাদিস নম্বর ৩৫৬৭।

২৩. গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ২, ১০৫; আমিদী, ইহকাম, ৪, ১৮৬।

২৪. বুখারি, সহিহ, (ইস্তাম্বুল সংস্করণ), ৬, ৮৪; আমিদী, ইহকাম, ৪, ২০৯।

২৫. একই গ্রন্থ ১, ২৫-২৬।

২৬. ইবনে মাজাহ, সুনান, ১, ৮১, হাদিস নম্বর ২২৪; আমিদী, ইহকাম, শাতিবী, ৪, ২৩০, ২৩৪, মুওয়াফাকাত, ৪, ১৪০।

২৭. ইবনে কাইয়িম, ইলাম, ১, ১৭৬; মাহমাসসানী, ফালসাফাহ, পৃষ্ঠা ৯৫; কাসসাব, আদওয়া, পৃষ্ঠা ১৯।

২৮. গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ২, ১০৬; ইবনে কাইয়িম, ইলাম, ১, ১৭৬; কাসসাব, আদওয়া, পৃষ্ঠা ১৯।

২৯. তুলনীয়, কাসসাব, আদওয়া, পৃষ্ঠা ২০।

৩০. তুলনীয়, Hallaq, The Gate, পৃষ্ঠা ১৪-১৭।

৩১. গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ২, ১০২; আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ৩০২।

৩২. শাতিবী, মুওয়াফাকাত, ৪, ৬০।

৩৩. গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ২, ১০১।

www.pathagar.com

৩৪. শাওকানী, ইরশাদ, পৃ. ২৫০-৫১; আবু জাহরাহ, উসূল, পৃ. ৩০৪; যুহাইর, উসূল, ৪, ২২৬।

৩৫. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২৫১; আবু জাহরাহ, উসূল, পৃষ্ঠা ৩০৪।

৩৬. গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ২, ১০১;শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২৫১।

৩৭. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২৫১; গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ২, ১০১;আবু জাহরাহ, উসূল, পৃষ্ঠা ৩০৫।

৩৮. গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ২, ৫৪; শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২৫২; আবু জাহরাহ, উসূল, পৃষ্ঠা ৩০৬।

৩৯. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২৫২; আবু জাহরাহ, উসূল, পৃষ্ঠা ৩০৭; বাদরান, উসূল, পৃষ্ঠা ২০৮।

৪০. শাতিবী, মুওয়াফাকাত, ৪, ৫৬; আবু জাহরাহ, উসূল, পৃষ্ঠা ৩০৭।

৪১. আবু জাহরাহ, উসূল, পৃষ্ঠা ৩০৮-৩০৯; গাজ্জালী (মুস্তাস্ফা, ২, ১০৩) মনে করেন যে, ইজতিহাদের জন্য আরবি, হাদিস ও উসূলে ফিকাহর ওপর জ্ঞান থাকা জরুরি। অবশ্য উসূলের ওপর জ্ঞানের বিষয়টি ভিন্ন শর্তের আলোকে পুনরাবৃত্তিমূলক; কারণ কিয়াস ও অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে ওই সব শর্ত মুজতাহিদকে অবশ্যই পূরণ করতে হয় এবং এগুলো উসূলের বিষয়বস্তুর আওতায় পড়ে।

৪২. গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ২, ১০১; শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২৫২।

৪৩. গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ২, ১০২-১০৩; কাসসাব, আদওয়া, পৃষ্ঠা ৩৮।

৪৪. তুলনীয়, ফজলুর রহমান, ইসলাম, পৃষ্ঠা ৭৮।

৪৫. আব্দুর ওহিম, Jurisprudence, পৃষ্ঠা ১৭৪।

৪৬. Hallaq, The Gate, পৃষ্ঠা ১৪।

৪৭. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২৫৪; আবু জাহরাহ, উসূল, পৃষ্ঠা ৩১৮; বাদরান, উসূল, পৃষ্ঠা ৪৮৬।

৪৮. আমিদী, ইহকাম, ৪, ২০৪; শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২৫৫।

৪৯. কাসসাব, আদওয়া, পৃষ্ঠা ৯৬।

৫০. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২৫৫; আবু জাহরাহ, উসূল, পৃষ্ঠা ৩১৮; বাদরান, উসূল, পৃষ্ঠা ৪৮৬।

৫১. গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ২, ১০৩; শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২৫৫; বাদরান, উসূল, পৃষ্ঠা ৪৮৬।

৫২. শিরাজী, লুমা, পৃষ্ঠা ৮৩-৮৪।

৫৩. শাফেয়ী, রিসালাহ, পৃষ্ঠা ২৬১-৬২; শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২৫৮।

৫৪. কাসসাব, আদওয়া, পৃষ্ঠা ২৪; Hallaq, The Gate, পৃষ্ঠা ১২।

৫৫. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২৫৫।

www.pathagar.com

৫৬. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ২৫৬; যুহাইর, উসুল, ৪, ২২৭।

৫৭. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২৫৬; গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ২, ১০৪।

৫৮. কাসসাব, আদওয়া, পৃষ্ঠা ৬১।

৫৯. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২৫৬; গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ২, ১০৪; কাসসাব, আদওয়া, পৃষ্ঠা ৬১।

৬০. আবু দাউদ, সুনান (হাসান অনূদিত), ৩, ১০১৭, হাদিস নম্বর ৩৫৭৮; কাসসাব, আদওয়া, পৃষ্ঠা ৫৮। এ বিষয়ে অন্যান্য হাদিস সম্পর্কে জানতে দেখুন, শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২৫৬।

৬১. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২৫৭; যুহাইর, উসুল, ৪, ২৩৪।

৬২. গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ২, ১০৪।

৬৩. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২৫৭; যুহাইর, উসুল, ৪, ২৩৭।

৬৪. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২৫৭; কাসসাব, আদওয়া, পৃষ্ঠা ৮০। গাজ্জালী রসুল সা.-এর উপস্থিতিতে ইজতিহাদের বৈধতার বিষয়ে কিছুটা আপত্তি প্রকাশ করেছেন। কারণ তিনি মনে করেন যে, রসুল সা. অনুমতি না দিলে তার উপস্থিতিতে ইজতিহাদ করা হবে শিষ্টাচারের পরিপন্থী (মুস্তাস্ফা, ২, ১০৪)।

৬৫. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২৫৯।

৬৬. একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ২৬০-৬১; যুহাইর, উসুল, ৪, ২৩৮।

৬৭. আমিদী, ইহকাম, ৪, ১৮৭; ইবনে আল কাইয়িম, ইলাম, ১, ১৭৭।

৬৮. আমিদী, ইহকাম, ৪, ১৮৭।

৬৯. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২৬২; যুহাইর, উসুল, ৪, ২৩৯; কাসসাব, আদওয়া, পৃষ্ঠা ১০২-১০৩।

৭০. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২৬২; আমিদী, ইহকাম, ৪, ১৫২; যুহাইর, উসুল, ৪, ২৪১।

৭১. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২৬১।

৭২. তুলনীয়, Schacht, 'Ijtihad', Encyclopedia of Islam, ৪, ১০৩৯।

৭৩. Hallaq, The Gate, পৃষ্ঠা ১৮।

৭৪. গাজ্জালীর বক্তব্য উদ্ধৃত করার সময় শাওকানী এ বৈধতাকে প্রশ্ন সাপেক্ষ বলে মনে করেছেন (ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২৫৩)। তিনি আরো বলেন যে, গাজ্জালী নিজেই বলেছেন যে তিনি শাফেয়ীর সব মত অনুসরণ করেন না, তাই এ ক্ষেত্রে তার কিছুটা স্ববিরোধিতা প্রকাশ পেয়েছে।

৭৫. ইজতিহাদের শ্রেণি বিভাগ সম্পর্কে ঐতিহাসিক বিবরণ বিস্তারিতভাবে জানতে দেখুন, Hallaq, The Gate, পৃষ্ঠা ৮৪।

৭৬. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ৩১০; ২৩৮; কাসসাব, আদওয়া, পৃষ্ঠা ৩৮; আব্দুর ওহিম, Jurisprudence, পৃষ্ঠা ১৮২-৮৩।

www.pathagar.com

৭৭. একই গ্রন্থ।

৭৮. এ বিষয়ে সুন্নিহ মাজহাবগুলোর অবস্থান সম্পর্কে আলোচনাকালে আবু জাহরাহ (উসুল, পৃষ্ঠা ৩১১) বলেন যে বিষয়টি সুনির্দিষ্ট নয়, যেমন- হানাফীগণ কামাল আল দীন আল হুমামকে প্রথম শ্রেণির মুজতাহিদ বলে গণ্য করে থাকেন।

৭৯. মুসলিম, সহিহ, পৃষ্ঠা ২৯০, হাদিস নম্বর ১০৯৫ শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২৫৩; গাজ্জালী, মুস্তাস্ফা, ১, ১১১।

৮০. একই গ্রন্থ।

৮১. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ৩১২; কাসসাব, আদওয়া, পৃষ্ঠা ১১২।

৮২. তুলনীয় আব্দুর ওহিম, Jurisprudence, পৃষ্ঠা ১৭৪।

৮৩. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ৩১২; কাসসাব, আদওয়া, পৃষ্ঠা ৩৯; আব্দুর ওহিম, Jurisprudence, পৃষ্ঠা ১৮৩।

৮৪. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ৩১৪; কাসসাব, আদওয়া, পৃষ্ঠা ৪০; Aghnides, Muhammedan Theories, পৃষ্ঠা ৯৫; মাওসূয়া জামাল, ১, ২৫৩ ও ৭, ৩৮৭।

৮৫. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ৩১৫; কাসসাব, আদওয়া, পৃষ্ঠা ৪০; Aghnides, Muhammedan Theories, পৃষ্ঠা ৯৬।

৮৬. একই গ্রন্থ।

৮৭. একই গ্রন্থ।

৮৮. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ৩১৬।

৮৯. Aghnides, Muhammedan Theories, পৃষ্ঠা ৯৬।

৯০. তুলনীয়, Wess, 'Interpretation', পৃষ্ঠা ২০৮।

৯১. হিজাজ ও ভারতীয় উপমহাদেশে ইজতিহাদ পুনরুজ্জীবন প্রচেষ্টার বিবরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন, ফজলুর রহমান, ইসলাম, পৃষ্ঠা ১৯৭; এনায়েত, Modern Islamic Political Thought, পৃষ্ঠা ৬৩।

৯২. শাওকানী, ইরশাদ, পৃষ্ঠা ২৫৪।

৯৩. ইকবাল, Reconstruction, পৃষ্ঠা ১৭৮।

৯৪. আবু জাহরাহ, উসুল, পৃষ্ঠা ৩১৮।

৯৫. তামাবি, আল সুলুতাত, পৃষ্ঠা ৩০৭।

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জি

- আহমদ ফাহমি মুহাম্মদ আবু সিনা, নাজারিয়াহ আল হাক্ক, তাওফিক উবায়দা সম্পাদিত আল ফিকহ্ আল ইসলামি আসাস তাশরিতে প্রকাশিত, কায়রো : মাতাবি আল আহ্রাম, ১৩৯১/১৯৭১।
- Aghnides, Nicolas P. Muhammedan Theories of Finance. New York : Longmans Green & co.,1916. Reprint, Lahore : Premier Book House,1957.
- সাইফ আল দীন আলী ইবনে মুহাম্মদ আল আমিদী, আল ইহকাম ফী উসুল আল আহকাম, ৪ খণ্ড, আবদ আল রাজ্জাক আফিফি সম্পাদিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈরুত : আল মক্তব আল ইসলামি, ১৪০২/১৯৮২।
- আবু ইয়াহিয়া জাকারিয়া আল আনসারি, গাইয়েহ আল উসুল ইলা লুবাব আল উসুল। কায়রো : ঈসা আল বাবী আল হালাবী।
- আবু বকর বিন আব্দুল্লাহ ইবনে আল আরাবি, আহকাম আল কুরআন। কায়রো: মাতবাহ দার আল সায়াদাহ, ১৩৩০ হি.।
- সাঈদ মুহাম্মদ আসগারি, কিয়াস ওয়া সায়ার-ই তাকউইন-ই আন্দার হুকুক-ই ইসলাম। ১৩৬১/১৯৮২।
- মুহাম্মদ মোস্তফা আযামী, Studies in Hadith Methodology and Literature. Indianapolis : American Trust Publications, 1977.
- আবু আল আইনাইন বাদরান, উসুল আল ফিকহ্ আল ইসলামিয়া। আলেকজান্দ্রিয়া : মুয়াস্‌সাসাহ শাবাব আল জামিয়াহ, ১৪০৪/১৯৮৪।
- বয়ান আল নুসুস আল তাশরিয়াহ : তুরুকুহ ওয়া আনওয়া উহ। আলেকজান্দ্রিয়া : মুয়াস্‌সাসাহ শাবাব আল জামিয়াহ, ১৪০২/১৯৮২।
- আবুল হুসাইন মুহাম্মদ বিন আলী আল বাসরী, আল মুতামাদ ফি উসুল আল ফিকহ্, শায়েখ খলীল আল মায়েস। বৈরুত : দার আল কুতুব আল ইসলামিয়া, ১৪০৩/১৯৮৩।
- আবু বকর আহমদ বিন আল হুসাইন আল বায়হাকি। আল সুনান আল কুবরা। ১০ খণ্ড, বৈরুত: দার আল ফিকর।
- মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল আল বুখারি, সহিহ্ আল বুখারি। ইস্তাম্বুল : আল মাকতাবাহ আল ইসলামিয়া, ৮ খণ্ড, ১৯৮১।
- সহিহ্ আল বুখারি, ইংরেজি অনুবাদ মুহাম্মদ মহসিন খান, ৯ খণ্ড, লাহোর : কাজী পাবলিকেশন্স, ১৯৭৯।
- আলা আল দীন আব্দুল আজিজ আল বুখারি। কাশফ আল আসরার আলা উসুল আল বাজদাবি। ইস্তাম্বুল ২২ : ১৩০৭ হি.।

www.pathagar.com

- Coulson, Noel, J. Conflicts and Tensons in Islamic Jurisprudence, Chicago & London : University of Chicago Press, 1969.
- Coulson, L.B. Jurisprudence. Plymouth: Mcdonald & Evans, 1979.
- মুহাম্মদ আল দারিমি, সুনান আল দারিমি, ২ খণ্ড, বৈরুত : দার আল কুতুব আল ইসলামিয়া।
- আবু দাউদ আল সিজিস্তানি, সুনান আবু দাউদ। ইংরেজি অনুবাদ আহমদ হাসান, তিন খণ্ড, লাহোর : আশরাফ প্রেস, ১৯৮৪।
- Denffer, Ahmad Von, 'Ulum al Qur'an : An Introduction to the Sciences of Qur'an. Leicester: The Islamic Foundation, 1983.
- Dias, R. W. Jurisprudence, 4th edn. London: Butterworths, 1976.
- হারুন, দীন। আল নাফাকাহ্ ওয়াল শিকাক ওয়া তায়াদ্দুদ আল জাওয়াত। কুয়ালালামপুর : মাতবায়াহ্ ওয়াতান, ১৪০৫/১৯৮৫।
- Encyclopedia of Islam, New edn. Leiden : E.J. Brill, 1965-countinuing.
- হামিদ, এনায়েত, Modern Islamic Political Thought. London: Macmillan Press Ltd, 1982.
- আবু হামিদ মুহাম্মদ আল গাজ্জালী, আল মুস্তাফা মিন ইলম আল উসুল, কায়রো : মাকতাবা আল তিযারিয়াহ্, ১৩৫৬/১৯৩৭।
- রিয়াজুল হাসান, গিলানি, The Reconstructiion of Religious Thought in Islam. লাহোর : রিপন প্রেস, ১৯৭৭।
- Goldziher, Ignaz. Introduction to Islamic Theology and Law. Trans. Andras and Ruth Hamori. Princeton (New Jersey) : Princeton University Press, 1981.
- Guraya, Muhammad Yusuf. Origins of Islamic Jurisprudence (with special refrence to the Muwatta of Imam Malik). লাহোর : শাহ্ মুহাম্মদ আশরাফ, ১০৮৫।
- জামাল আল দীন আবু আমর, ইবনে আল হাজিব। মুখতাছার আল মুন্তাহা। কনস্টান্টিনোপল : আল মাকতাবা আল ইসলামিয়া, ১৩১০ হি.।
- Hallaq,Wael B. 'The Gate of Ijtihad: A Study in Islamic Legal History'. PhD dissertation (University of Washington).
- আহমদ ইবনে হাম্বল। মুসনাদ আল ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ছয় খণ্ড, বৈরুত : দার আল ফিকর।
- আহমদ হাসান। The Early Devolopment of Islamic Jurisprudence, Islamabad: Islamic Research Institute, 1970.

www.pathagar.com

--- The Doctrine of Ijma in Islam. Islamic Research Institute,1976.

--- The Principle of Istihsan in Islamic Jurisprudence', Islamic Studies, 16 (1977), 347-363.

--- Rationality of Islamic Legal Injunctions: The Problem of Valuation (Ta'lil),' Islamic Studies, 13 (1974) 95-110.

- আবু মুহাম্মদ আলী বিন আহমদ ইবনে হাজম। আল ইহকাম ফি উসুল আল আহকাম। আহমদ মুহাম্মদ শাকির সম্পাদিত, চার খণ্ড। বৈরুত: দার আল আফাক আল জাদিদা, ১৪০০/১৯৮০।
- মুহাম্মদ হাসান হিতু। আল ওয়াযিজ ফি উসুল আল তাশরি আল ইসলামি। দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈরুত : মাওয়াসসাসাহ্ আল রিসালাহ, ১৪০৫/১৯৮৪।
- Hughes, Thomas Patrick. A Dictionary of Islam, London, 1885. Rev. edn, Lahore : The Book House, n.d.
- মুহাম্মদ ইকবাল। The Reconstruction of Religious Thoughts in Islam. লাহোর : শেখ মুহম্মাদ আশরাফ, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৮২।
- আমিন আহসান ইসলাহী। Islamic Law, Concept and Codification, ইংরেজি অনুবাদ এস এ রউফ। লাহোর : ইসলামিক পাবলিকেসন্স লি:, ১৯৭৯।
- আব্দুল হামিদ আবু আল মুকাররিম ইসমাঈল। আল আদিল্লাহ আল মুখতালাফ ফিহা আসারুহা ফি আল ফিকহ্ আল ইসলামি। কায়রো : দার আল মুসলিম।
- জামালুদ্দিন আবু মুহাম্মদ আব্দুর ওহিম আল ইসনাবী। আল তামহিদ ফি তাখরীজ আল ফুরু আলাল উসুল। বৈরুত : মাওয়াস্সাসাহ্ আল রিসালাহ, ১৪০৪/১৯৮৪।

---নিহাইয়াহ্ আল সুল ফি শারহ্ মিনহাজ আল উসুল ইলা 'ইলম আল উসুল। তিন খণ্ড। কায়রো : মাতবাহ্ আল তাওফিক।

- মুহাম্মদ হাশিম কামালী, 'The Citizen and State in Islamic Law', Shari'ah Law Journal 3 (April, 1986) 15-47. মালয়েশিয়ার সেলাঙ্গর আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত।

--- 'Qiyas (Analogy),' The Encyclopedia of Religion, New York : The Mcmillan Publishing company, 1987, xii, 128 ff.

- আল সাঈদ আব্দুল লতিফ কাসসাব, আদওয়া হাওল ক্বাদাইয়া আল ইজতিহাদ ফি আল শরিয়াহ্ আল ইসলামিয়া। কায়রো : দার আল তাওফিক, ১৪০৪/১৯৮৪।
- Kerr, Malcom H. Islamic Reform. Berkeley : University of California Press, 1961.
- মজিদ খাদ্দুরি, Islamic Jurisprudence : ইমাম শাফেয়ীর রিসালাহ। Baltimore: Johns Hopkins press, 1961. পুনর্মুদ্রণ, Cambridge: The Islamic Texts Society, 1987.

www.pathagar.com

- আব্দুল ওহাব খাল্লাফ, ইলম উসুল আল ফিকহ, দ্বাদশ সংস্করণ, কুয়েত : দার আল কালাম, ১৩৯৮/১৯৭৮।

  --- মাসাদির আল তাশরি, আল ইসলামি ফিমা লা নসবা ফিহ, কুয়েত : দার আল কালাম, ১৩৯৮/১৯৭৮।
- মুহাম্মদ আল শারবিনী আল খতিব, মুগনি আল মুহতাজ ইলা মারিফাহ মায়ানি আল ফাজ আল মিনহাজ, কায়রো : মুস্তাফা আল বাবি আল হালাবি, ১৩৭৭/১৯৫৮।
- মুস্তাফা সাঈদ আল খিন, আসার আল ইখতিলাফ ফিল কাওয়াইদ আল উসুলিয়্যাহ ফি ইখতিলাফ আল ফুকাহা, তৃতীয় সংস্করণ, বৈরুত : মাওয়াস্সাসাহ আল রিসালাহ, ১৪০২/১৯৮২।
- শায়েখ মুহাম্মদ আল খুদারি, উসুল আল ফিকহ, সপ্তম সংস্করণ, কায়রো : দার আল ফিকর, ১৪০১/১৯৮১।

  --- তারিখ আল তাশরি আল ইসলামি, সপ্তম সংস্করণ, বৈরুত : দার আল ফিকর, ১৪০১/১৯৮১।
- সুবহি রজব মাহমাসসানি, ফালসাফাহ আল তাশরি ফিল ইসলাম : The Philosophy of Jurisprudence in Islam, ফারহাত জে জিয়াদেহ অনূদিত, Leiden: E. J. Brill. 1981.
- মুহাম্মদ বিন ইয়াজিদ আল কাজবিনী ইবনে মাজাহ, সুনান ইবনে মাজাহ, ইস্তাম্বুল : কাগরি ইয়ামলারি, দুই খণ্ড, ১৪০১/১৯৮১।
- Makdisi, John, 'Legal Logic and Equity in Islamic Law, American Journal of Comparative Law, 33 (1985), 63-92.
- বুরহান আল দীন আল মারগিনানী, হিদায়া, ইংরেজি অনুবাদ Hamilton, লাহোর : প্রিমিয়ার বুক হাউজ, ১৯৮২।
- আল মাওসুয়াহ আল ফিকাইয়াহ, আওকাফ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত। কুয়েতঃ মাতবায়াহ আল মাওসুয়াহ, ১৪০০/১৯৮০।
- মাওসুয়াহ আল ফিকহ আল ইসলামি, (মূলত ছিল মাওসুয়াহ জামাল আব্দুন নাসির), কায়রো : আল মাজলিস আল আলা লিল শুউনআল ইসলামিয়া, ১৩৯১ হি.।
- মুহাম্মদ ইউসুফ মুসা, আহকাম আল আহওয়াল আল শাখছিয়াহ, কায়রোঃ দার আল কিতাব আল আরাবি, ১৩৭৬/১৯৫৬।

  ------ আল মাদখাল লি দিরাসাহ আল ফিকহ আল ইসলামি, দ্বিতীয় সংস্করণ, কায়রো : দার আল কিতাব আল আরাবি, ১৩৭৩/১৯৫৩।
- আবু আল হুসাইন ইবনে আল হাজ্জাজ আল নিসাপুরী মুসলিম, মখতাছার সহিহ মুসলিম, আল আলবানি সম্পাদিত, চতুর্থ সংস্করণ, বৈরুত : আল মক্তব আল ইসলামি, ১৪০২/১৯৮২।

www.pathagar.com

- মরতোজা মুতাহহারি, Jurisprudence and its Principles, মুহাম্মদ সালমান তাওহিদি অনূদিত, New York (Elmhurst) : Tahrike Tarsile Qur'an Inc., c. 1982.
- মুহাম্মদ ফারুক আল নাবহান, আল মাদখাল লিল তাশরি আল ইসলামি : নিশায়াতুহ, আদওয়ারুহ আল তারিখিয়াহ, মুস্তাকবালুহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈরুত : দার আল কালাম, ১৯৮১।
- মুহায়ি আল দীন আবু জাকারিয়া ইয়াহিয়া ইবনে শারাফ আল নবোবি, মিনহাজ আল তালিবীন, ইংরেজি অনুবাদ, E,C. Howard, লাহোর : ল' পাবলিশিং কোম্পানি।
- আলহাজ এ এম নূর, Qias as a Source of Islamic Law, Journal of Islamic and Comparative Law, 5 (1974), 18-51.
- Osborn, P, G. A ConciseLaw Dictionary, 5th edn., London: Sweet & Maxwell,1964.
- Paret R., 'Istihsan and Istislah', Encyclopedia of Islam, New Edition, Leiden : E.J, Brill, 1965, continuing.
- আনোয়ার আহমদ কাদরি, Islamic Jurisprudence in the Modern World, দ্বিতীয় সংস্করণ, লাহোর : শায়েখ মুহাম্মদ আশরাফ, ১৯৮১।
- মান্না খলীল আল কাত্তান, আল তাশরি ওয়াল ফিকহ ফিল ইসলাম, তারিখান ওয়া মানহাজান, চতুর্থ সংস্করণ, বৈরুত : মাওয়াসসাসাহ আল রিসালাহ, ১৪০৫/১৯৮৫।
- শিহাব আল দীন আল কারাফি, কিতাব আল ফুরূক, কায়রো : দার আল কুতুব আল আরাবিয়া, ১৩৪৬ হি.
- আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে কাইয়িম আল জাওজিয়াহ, আল তুরুক আল হিকমিয়াহ ফিল সিয়াসিয়াহ আল শরিয়াহ, কায়রো : আল মুয়াসসাসাহ আল আরাবিয়া লিল তিবাহ, ১৩৮০/১৯৬১।

  ------ ইলাম আল মুওয়াক্কিইন আন রাব্ব আল আলামীন, মুহাম্মদ মুনীর আল দামাস্কি সম্পাদিত, কায়রো : ইদারা আল তিবায়াহ আল মুনিরিয়াহ, চার খণ্ড। ।
- The Qura'n, text, Translation and Commentary by AbdullahYusuf Ali, Jedda : Islamic Education Centre 1984. Reprint by the Muslim Converts Association of Singapore, n.d.
- The Qura'n,The First American Version, Translation and Commentary by Thomas B Irving, Brattleboro (Vermont) : Amna Books, 1985.
- আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ আল জামি আল কুরতুবি, আল জামি লী আহকাম আল কুরআন (তাফসির আল কুরতুবি নামেও পরিচিত), তৃতীয় সংস্করণ, কায়রো : দার আল কুতুব আল আরাবিয়া, ১৩৮৭/১৯৬৭।
- মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন রুশদ আল কুরতুবি, বিদাইয়া আল মুজতাহিদ, কায়রো : মুস্তাফা আল বাবি আল হালাবি, ১৪০১/১৯৮১।

www.pathagar.com

- আব্দুর রহিম, Principles of Muhammedan Jurisprudence, London: Luzac and Co., 1911.
- ফজলুর রহমান, Islamic Methodology in History, Karachi; Islamic Research Institute, 1965.

  --- Islam, 2nd edn., Chicago and London: University of Chicago Press, 1970.
- ফকর আল দীন বিন উমার আল রাজী, আল তাফসির আল কবীর (মাফাতিহ্ আল গায়েব নামেও পরিচিত), বৈরুত : দার আল ফিকর, ১৩৯৮/১৯৭৮।
- মুহাম্মদ রশীদ রিদা, তাফসির আল কুরআন আল আযিম, (তাফসির আল মানার নামেও পরিচিত), চতুর্থ সংস্করণ, কায়রো : মাতবায়াহ্ আল মানার, ১৩৭৩ হি.।
- আব্দুর রহমান আল সাবুনি, মুহদারাত ফিল শরিয়হ্ আল ইসলামিয়া, প্রকাশক বিহীন, ১৩৯২/১৯৭২।
- আব্দুর রহমান আল সাবুনি, খলিফা বাবকর ও মাহমুদ তানতাবি, আল মাদখাল আল ফিকহি ওয়া তারিখ আল তাশরি' আল ইসলামি, কায়রো : মাকতাবাহ্ ওয়াহবাহ্, ১৪০২/১৯৮২।
- মুহাম্মদ সাদিক আল সদর, আল ইজমা ফিল তাশরি আল ইসলামি, বৈরুত : মানশুরা উবায়দা, ১৯৬৯।
- সুবহি আল সালিহ্, মাবাহিস ফি উলুম আল কুরআন, পঞ্চদশ সংস্করণ, বৈরুত : দার আল ইলম লি আল মালায়ীন, ১৯৮৩।
- শামস আল দীন মুহাম্মদ আল সারাখসি, উসুল আল সারাখসি, আবুল ওয়াফা আল আফগানী সম্পাদিত, কায়রো : মাতবায়াহ্ দার আল কিতাব আল আরাবি, ১৩৭২ হি.।

  --- আল মাবসুত, ৩০ খণ্ড, কায়রো : মাতবায়াহ্ আল সায়াদাহ্, ১৩২৪ হি.।
- Schacht, Joseph, An Introduction to Islamic Law, Oxford: Clarendon Press,1964, rept. 1979.
- জাকী আল দীন আল শাবান, মুহাম্মদ তাওফিক উবায়দা সম্পাদিত আল ফিকহ্ আল ইসলামি তাশবিতে প্রকাশিত আসাস আল 'মানহাজ আল কুরআন ফি বায়ান আল আহকাম', কায়রো : মাতাবি আল আহরাম, ১৩৯১/১৯৭১, পৃষ্ঠা ১১-৬৫।

  --- উসুল আল ফিকহ্ আল ইসলামি, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈরুত : দার আল কুতুব, ১৯৭১।
- মুহাম্মদ শাব্বির, The Authority and Authenticity of Hadth as a Source of Islamic Law, নতুন দিল্লি : কিতাব ভবন, ১৯৮২।
- মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস শাফেয়ী, কিতাব আল উম্ম, সাত খণ্ড, কায়রো: দার আল শাব, ১৩২১ হি.।

www.pathagar.com

- --- আল রিসালাহ, মুহাম্মদ সায়ীদ কিলানি সম্পাদিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, কায়রো : মুস্তাফা আল বাবি আল হালাবি, ১৪০৩/১৯৮৩।
- শাহ ওয়ালি উল্লাহ, ইজালা আল কাফাহ আন খিলাফাহ ওয়াল খুলাফাহ, করাচি : বেরেইলী, ১২৮৬/১৮৬৯।

  ---- কুররাহ আল আয়নাইন ফি তাফজিল আল শায়াখাইন, দিল্লি : ১৩১০/১৯৩১।
- মুহাম্মদ মুস্তাফা শালাবী, আল ফিকহ আল ইসলামি বায়ান আল মিসালিয়াহ ওয়া আল ওয়াকিইয়াহ, বৈরুত : আল দার আল জামিয়াহ, ১৯৮২।
- মাহমুদ আল শালতুত আল ইসলাম, 'আকিদাহ ওয়া শরিয়াহ, কুয়েতঃ দার আল কালাম, ১৯৬৬।
- আবু ইসহাক ইবরাহীম আল শাতিবি, আল মুওয়াফাকাত ফি উসুল আল আহকাম, মুহাম্মদ হাসানাইন মাখলুফ সম্পাদিত, কায়রো : আল মাতবায়াহ আল সালাফিয়াহ, ১৩৪১ হি.।

  --- আল মুওয়াফাকাত ফি উসুল আল শরিয়াহ, শায়েখ আব্দুল্লাহ দিরাজ সম্পাদিত, কায়রো : মাক্তাবাহ আল তিযারিয়াহ আল কুবরা, ।

  ---আল ইতিসাম, কায়রো : মাতবায়াহ আল মানার, ১৩৩২/১৯১৪।

  --- ফাতহ আল কাদির, তৃতীয় সংস্করণ, কায়রোঃ দার আল ফিকর, ১৩৯৩/১৯৭৩।
- আবু ইসহাক আল শিরাজী, আল লুমাফি উসুল আল ফিকহ, কায়রো : দার আল রায়দ আল আরাবি, ১৯৭০।
- মুস্তাফা হুসনী আল শিবাই, আল সুন্নাহ ওয়া, মাকানাতুহা ফিল তাশরি আল ইসলামি, তৃতীয় সংস্করণ, বৈরুত, ১৪০২/১৯৮২।
- আবু দাউদ আল সিজিস্তানি, সুনান, ইংরেজি অনুবাদ আহমদ হাসান, তিন খণ্ড, লাহোর : আশরাফ প্রেস, ১৯৮৪।
- জালাল আল দীন আল সুয়ুতি ও জালাল আল দীন আল মাহাল্লি, তাফসির আল কুরআন আল আযীম (তাফসির আল জালালাইন নামেও পরিচিত), কায়রো : দার আল ফিকর, ১৪০২/১৯৮১।
- আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জারির তাবারি, জামি আল বায়ান আন তাবিল আইয়ি আল কুরআন, কায়রো : দার আল মায়ারিফ, ১৩৭৪ হি.।
- মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আল খতিব আল তাবরীজী, মিশকাত আল মাসাবীহ, মুহাম্মদ আল দীন আল আলবানী সম্পাদিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈরুত : আল মাক্তাব আল ইসলামি, তিন খণ্ড, ১৩৯৯/১৯৭৯।

www.pathagar.com

- সাদ আল দীন মাসঊদ বিন উমার তাফতাজানি, আল তালবিহ্ আলাল তাওদীহ, উবায়দুল্লাহ বিন মাসউদ সদর আল শরিয়াহ এর আল তাওদিহ্ ফি হাল গাউয়ামিদ আল তানকিহর সংক্ষিপ্ত রূপ, কায়রো : ঈসা আল বাবী আল হালাবি, ১৩২৭/১৯৫৭।
- আব্দুর রহমান তাজ, আল সিয়াসাহ্ আল শরিয়াহ্, কায়রো : মাতবায়াহ্ দার আল তালিফ, ১৩৭৩/১৯৫৩।
- তাকী আল দীন ইবনে তাইমিয়া, মাসায়ালাহ আল ইস্তিহছান, অনুবাদ ও সম্পাদনা, George Makdisi, as 'Ibn Taymmiyyah's Manuscript on Istihsan' in G Makdisi ed. Arabic and Islamic Studies in Honour of Hamilton A.R. Gibb, Leiden: E.J. Brill, 1965.
- সুলায়মান মুহাম্মদ আল তামাবি, আল সুলুতাত আল সালাস ফিল দাসাতীর আল আরাবিয়াহ ওয়া ফিল ফিকর আল সিয়াসী আল ইসলামি, দ্বিতীয় সংস্করণ, কায়রো : দার আল ফিকর আল আরাবি, ১৯৭৩।
- নজম আল দীন আল তুফি, আল মাসালীহ্ আল মুরসালাহ, আব্দুল ওহাব খাল্লাফের মাসাদির আল তাশরি আল ইসলামি ফিমা লা নাসসা ফিহ্ এর পরিশিষ্টে ৪০ পৃষ্ঠার এ নিবন্ধ স্থান পেয়েছে, কুয়েত : মাতবায়াহ্ দার আল কালাম, ১৯৭০।
- Bernard Weiss, Interpretation in Islamic Law: The Theory of Ijtihad', The American Journal of Comparative Law, 26 (1978), 199-212.
- ইয়াকুব ইবনে ইব্রাহীম আবু ইউসুফ, কিতাব আল খারাজ, দ্বিতীয় সংকারণ, কায়রো : আল মাতবায়াহ আল সালাফিয়াহ, ১৩৫২ হি.।
- S.M. Yusuf, Studies in Islamic History and Culture, লাহোর : শায়েখ মুহাম্মদ আশরাফ, ১৯৭০।
- মুহাম্মদ আবু জাহরাহ, উসুল আল ফিকহ, কায়রোঃ দার আল ফিকর আল আরাবি, ১৩৭৭/১৯৫৮।

  ...ইবনে হাম্বল, কায়রোঃ দার আল ফিকর আল আরাবি, (১৩৬৭/১৯৪৭)।
- মুস্তাফা জায়েদ, আল মাসলাহা ফিল তাশরি আল ইসলামি ওয়া নজম আল দীন আল তুফি, দ্বিতীয় সংস্করণ, কায়রো : দার আল ফিকর আল আরাবি, ১৩৮৪/১৯৬৪।
- আব্দুল করীম জায়েদান, আল ফারজ ওয়াল দাওলাহ্ ফিল শরিয়াহ্ আল ইসলামিয়া, দ্বিতীয় সংস্করণ, Gary (Indiana) : International Islamic Federation of Organizations, 1390/1970.
- মুহাম্মদ আবু আল নূর জুহাইর, উসুল আল ফিকহ, চার খণ্ড, কায়রো : দার আল তিবায়াহ আল মুহাম্মাদিয়াহ, ১৩৭২/১৯৫২।

www.pathagar.com

শব্দার্থ

- আদল : ন্যায়বিচার, সত্যনিষ্ঠ, ন্যয়পরায়ণ।
- আদালাহ : ন্যায়বিচার, চারিত্রিক সততা।
- আদিল্লাহ (দলিল এর বহুবচন) : প্রমাণ, সাক্ষ্য, নির্দেশনা।
- আহাদ : একক বা বিচ্ছিন্ন হাদিস, একজন মাত্র ব্যক্তি বা বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির বর্ণিত হাদিস।
- আহাদিস (হাদিস এর বহুবচন) : রসুল সা.-এর কাজ ও কথার বিবরণ ও বক্তব্য।
- আহকাম (হুকমের বহুবচন) : আইন-কানুন, মূল্য, আদেশ।
- আহলিয়াহ : বৈধ ক্ষমতা।
- আহলিয়াহ আল আদা : সক্রীয় বৈধ ক্ষমতা যা অধিকার ও দায়দায়িত্ব প্রদান করে।
- আহলিয়াহ আল উযুযুব : গ্রহণীয় সক্রীয় বৈধ ক্ষমতা যা গ্রহণের ক্ষেত্রে ভালো কিন্তু দায়দায়িত্ব বর্তায় না।
- আমল : কাজ, অনুশীলন, নজির।
- আম : সাধারণ, অনির্দিষ্ট।
- আমর (বহুবচন আওয়ামীর, উমুর) : আদেশ, বস্তু, কাজ।
- আকল : বুদ্ধিজ্ঞান, যৌক্তিকতা, কারণ।
- আরকান (রুকন এর বহুবচন) : স্তম্ভসমূহ, অপরিহার্য শর্তাবলি।
- আসল : মূল, সূত্রপাত, উৎস ।
- আসার : আক্ষরিক অর্থ ফল, চিহ্ন, পদাংক; এর আরেক অর্থ হলো রসুল সা.-এর সাহাবিগণের বা কাজ ও দৃষ্টান্তসমূহ।
- আইয়াহ (বহুবচন, আয়াত) : আক্ষরিক অর্থ চিহ্ন, নিদর্শন, কুরআনের একটি অংশ যা প্রায়ই 'আয়াত' হিসেবে উল্লেখ করা হয়।
- আজিমাহ : কঠোর বা অপরিবর্তনীয় আইন। একে লঘু করার কোনো উপাদান না থাকায় তা মূল অবস্থা বজায় রয়েছে।
- বাতিল : অকার্যকর।
- বায়ান : ব্যাখ্যা, স্পষ্টকরণ।
- দলালাহ : অর্থ নির্দেশনা বা নিহিত অর্থ।
- দলালাহ আল নস : প্রদত্ত আয়াতের অনুমিত বা নিহিত অর্থ।
- দলিল : প্রমাণ, নির্দেশনা, সাক্ষ্য।
- ফকিহ (বহুবচন, ফুকাহা) : বিচারক, ফিকাহ সম্পর্কে সুবিজ্ঞ ব্যক্তি।

www.pathagar.com

- ফার : আক্ষরিক অর্থ শাখা বা উপবিভাগ এবং (কিয়াসের প্রেক্ষাপটে একটি নতুন ঘটনা।
- ফরজ : বাধ্যতামূলক, বাধ্যবাধকতা।
- ফরজে আইন : ব্যক্তিগতভাবে বাধ্যতামূলক।
- ফরজে কেফায়ী : সামষ্টিগতভাবে বাধ্যতামূলক।
- ফাসিদ : দুর্নীতিবাজ, বাতিল, ত্রুটিপূর্ণ (বাতিল যা অকার্যকর বুঝায় তার বিপরীত)।
- ফুরু (ফারর বহুবচন) : শাখাগুলো বা সহায়ক বিষয়গুলো যেমন- ফুরু আল ফিকহ্ যার অর্থ ফিকহ্র একটি শাখা।
- হাদ (বহুবচন, হুদুদ) : আক্ষরিক অর্থ- সীমা, নির্ধারিত শাস্তি।
- হাজ : পবিত্র কাবা শরিফে জীবনে একবার হজ্জ আদায় করা।
- হাকীকী : যথার্থ, মূল, আক্ষরিক (রূপকের বিপরীত)।
- হক্ক আল্লাহ : আল্লাহ্র অধিকার, জনসাধারণের অধিকার ।
- হক্ক আল আবদ (হক্ক আল আদামী) : মানুষের অধিকার, ব্যক্তিগত অধিকার।
- হিজরত : মক্কা ছেড়ে রসুল সা.-এর মদিনায় চলে যাওয়া, এ দিন থেকে ইসলামি পঞ্জিকার সাল গণনা শুরু হয়।
- হিরাবাহ : মহাসড়কে ডাকাতি।
- হিসবাহ : আক্ষরিক অর্থ- হিসাব বা গণন পরীক্ষাকরণ, তবে সাধারণত আমর বিল মারুফ ওয়া নাহি আন আল মুনকার অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা বুঝাতে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।
- হুজ্জিয়াহ : কোনো সিদ্ধান্ত বা ধারণা বৈধতা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য প্রমাণ/কর্তৃত্বের অধিকার উপস্থাপন করা।
- হুকম (বহুবচন, আহকাম যেমন হুকম শারয়ী) : শরিয়াহর আইন, মূল্য বা সিদ্ধান্ত।
- আল হুকম আল তাকলিফি : সুনির্দিষ্ট আইন যা অধিকার ও দায়দায়িত্বের সীমা নির্দেশ করে।
- আল হুকম আল ওয়াদয়ী : ঘোষণামূলক আইন যা পরিস্থিতি, ব্যতিক্রমী অবস্থা ও যোগ্যতার মতো বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে আল হুকম আল তাকলিফির যথাযথ বাস্তবায়ন নিয়ন্ত্রণ করে।
- ইবারা আল নস : প্রদত্ত আয়াতের সুস্পষ্ট অর্থ যা তার শব্দসমূহ থেকেই প্রকাশ পেয়ে থাকে।
- ইদ্দাহ : তালাক বা স্বামীর মৃত্যুর পর কোনো নারীর অপেক্ষার মেয়াদ।
- ইফতার : দিনশেষে রোজা ভঙ্গ করা।
- ইজমা : সর্বসম্মত ঐকমত্য।

www.pathagar.com

- ইজতিহাদ : আক্ষরিক অর্থ– প্রচেষ্টা চালানো, পারিভাষিক অর্থ হলো কোনো মুজতাহিদ কর্তৃক আপনা থেকে সুস্পষ্ট নয় এমন সূত্রগুলো থেকে বিষয়ে আইন সংগ্রহের প্রচেষ্টা।
- ইখতিলাফ : আইন সংক্রান্ত বিষয়ে মতপার্থক্য।
- ইল্লাহ : কোনো নির্দিষ্ট বিধানের কার্যকর কারণ বা যুক্তি।
- ইকতিদা আল নস : প্রদত্ত আয়াতের প্রয়োজনীয় অর্থ।
- ইশারা আল নস : পরোক্ষ অর্থ যা প্রদত্ত আয়াত থেকে শনাক্ত করা যায়।
- ইসমাহ : অভ্রান্ততা, ভুলত্রুটি করা থেকে সুরক্ষা।
- ইস্তিহছান : কোনো কিছুকে ভালো মনে করা, বিচারিক অগ্রাধিকার।
- ইস্তিশাবঃ অব্যাহত আছে বলে মনে করা, পূর্ব অবস্থা বজায় রয়েছে বলে মনে করা।
- ইস্তিস্ল্যাহ : জনস্বার্থ বিবেচনা করা।
- ইস্তিনবাত : অনুমান করা, প্রদত্ত আয়াতের অনেকটা লুকায়িত অর্থ সংগ্রহ করা।
- জিহাদ : পবিত্র যুদ্ধ বা সংগ্রাম।
- জুমহুর : প্রভাবশালী সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ।
- কাফফারা (বহুবচন, কাফফারাত) : অনুশোচনা, কৃতকর্মের শাস্তি মেনে নেয়া।
- কালাম : আক্ষরিক অর্থ– বক্তৃতা কিন্তু প্রায়ই ইলম আল কালাম অর্থাৎ 'ধর্মতত্ত্ব' ও মতবাদ সম্পর্কিত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত রূপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- কারাহা (অথবা কারাহাইয়াহ) : ঘৃণ্য, অপছন্দনীয়।
- খবর : সংবাদ, প্রতিবেদন, এ ছাড়া তা হাদিসেরও সমার্থক।
- খফি : গোপন, অজ্ঞাত, এ ছাড়া তা অস্পষ্ট শ্রেণির শব্দগুলোও বুঝায়।
- খাস : সুনির্দিষ্ট, এমন শব্দ বা আয়াত যা সুস্পষ্ট অর্থ ব্যক্ত করে।
- আল খুলাফা আল রাশিদুন : সঠিক নির্দেশনা প্রাপ্ত খলিফাগণ, ইসলামের প্রথম চারজন খলিফা।
- কিতাবিয়াহ : মুসলিম ছাড়া অন্য আহলি কিতাবের মহিলা অনুসারীরা।
- মাজহাব (বহুবচন, মাজাহিব) : ফিকহ বা ধর্মতাত্ত্বিক স্কুল।
- মাফকুদ : নিখোঁজ ব্যক্তি, সে কোথায় আছে তা অজ্ঞাত রয়েছে।
- মাফহুম আল মুখালাফাহ : ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বিচ্যুত অর্থ যা আয়াতের স্পষ্ট অর্থ থেকে ভিন্ন।
- মাজাজি : রূপক, আলঙ্কারিক।
- মাকরূহ : অপছন্দনীয়, তিরস্কারযোগ্য।

www.pathagar.com

- মানদুব : প্রশংসনীয়।
- মায়ানী : অন্তরায়, প্রতিবন্ধকতা।
- মুনসুখ : রদ হয়ে যাওয়া, রহিত হয়ে যাওয়া।
- মাকাসিদ (বহুবচন, মাকসুদ) : উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।
- মাশহুর : সুপরিচিত, বহুল প্রচারিত।
- মাসলাহা : জনস্বার্থ বিবেচনা।
- মাওদু (বহুবচন, মাওদুয়াত) : মিথ্যা, জাল।
- মুবাহ : অনুমোদনযোগ্য।
- মুফাসসার : ব্যাখ্যাকৃত, সুস্পষ্টকৃত।
- মুহারাবাহ : মহাসড়কে ডাকাতি।
- মুকাল্লাফ : পূর্ণ বুদ্ধিজ্ঞান সম্পন্ন যোগ্য ব্যক্তি।
- মুখতাসার : সংক্ষিপ্ত রূপ, সারাংশ, বিশেষ করে শিক্ষার উদ্দেশ্যে মুখস্থ করে রাখার জন্য প্রণীত ফিকহ সংক্রান্ত পুস্তিকা।
- মুহকাম : প্রাঞ্জল, যে শব্দ বা আয়াত দৃঢ় ও দ্ব্যর্থহীন অর্থ ব্যক্ত করে।
- মুজমাল : অস্পষ্ট, দ্ব্যর্থবোধক শব্দ যা অস্পষ্ট শব্দের শ্রেণিভুক্ত।
- মুনাসিব : সঠিক, আইনের মৌলিক উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- মুকাইয়াদ : নির্ধারিত, বিশেষায়িত বা নির্দিষ্ট।
- মুরসাল : 'বিচ্ছিন্ন' বা 'সংযোগ বিচ্ছিন্ন' হাদিস, বিশেষ করে সাহাবি রা. পর্যায়ে।
- মুশকিল : কঠিন, দুরূহ, একে অস্পষ্ট শব্দ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত বলেও উল্লেখ করা হয়।
- মুশতারাক : ভিন্ন অর্থবোধক, একাধিক অর্থবোধক শব্দ বা শব্দাবলী।
- মুসনাদ : অবিচ্ছিন্ন বর্ণনাক্রম সংবলিত হাদিস।
- মুতাশাবিহ : জটিল, দুর্বোধ্য, একে সম্পূর্ণ অস্পষ্ট অর্থ বিশিষ্ট শব্দ বা আয়াতের শ্রেণিভুক্ত বলেও উল্লেখ করা হয়।
- মুতলাক : সন্দেহাতীত, নির্দিষ্ট।
- নাহি : নিষিদ্ধ।
- নাকলী : সঞ্চারিত, যেমন- 'সঞ্চারিত প্রমাণ' যা 'যৌক্তিক প্রমাণ' থেকে আলাদা করা যায়।
- নাসিখ : বাতিলকারক, যা মানসুখের (রহিত হওয়ার) বিপরীত।

www.pathagar.com

- নাস্‌খ : বাতিল, রহিতকরণ।
- নস : সুস্পষ্ট আদেশ, আয়াতের স্পষ্ট বিধান।
- নিকাহ্ : বিয়ের সম্পর্ক স্থাপন।
- নুসুস (নসএর বহুবচন) : আয়াতের স্পষ্ট বিধানসমূহ।
- কাজফ : মিথ্যা অপবাদ দান।
- কাজিফ : মিথ্যা অপবাদ দানকারী।
- কাজী : বিচারক।
- কাত্তয়ী : সুনির্দিষ্ট, চূড়ান্ত, অনুমানমূলক উপাদান থেকে মুক্ত।
- কিসাস : ন্যায়সঙ্গত বদলা গ্রহণ।
- রাজম : পাথর নিক্ষেপে হত্যা।
- রিওয়াইয়াহ : বর্ণনা, প্রচার।
- রুখসাহ : সুযোগ-সুবিধা দান বা সুবিধা প্রদানকারী আইন অর্থাৎ লঘু করার উপাদান বর্তমান থাকার কারণে আইন পরিবর্তন করা হয়েছে।
- রুকন : স্তম্ভ, অত্যাবশ্যকীয় উপাদান।
- সাবাব (বহুবচন, আসবাব): কারণ, কোনো কিছু অর্জনের উপায়।
- সহিহ্ : বৈধ, বিশুদ্ধ।
- সালাহ্ : ফরজ নামাজ।
- সনদ : ভিত্তি, প্রমাণ, কর্তৃত্ব।
- শারত : (বহুবচন, শুরুত) : শর্ত।
- শূরা : পরামর্শ।
- শুরব : মদপান।
- তাহ্লিল : তালাকপ্রাপ্ত দম্পতির মধ্যে পুনরায় বিয়ের একমাত্র লক্ষ্যে চুক্তিবদ্ধ মধ্যবর্তী বিয়ে।
- তাহ্রিম : নিষিদ্ধ বা কোনো কিছুকে হারাম মনে করা।
- তা'দিয়াহ : হস্তান্তরযোগ্যতা।
- তা'লিল : যুক্তি, কোন বিধানের কার্যকর কারণ অনুসন্ধান করা।
- তা'বিল : রূপক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ।
- তা'জির : নিরোধ করা, বিচক্ষণতার সাথে কাজী কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি।

www.pathagar.com

- তাখসিস : সাধারণকে সুনির্দিষ্ট করা।
- তাকলিফ : দায়দায়িত্ব, বাধ্যবাধকতা।
- তালাক : স্বামীর পক্ষ থেকে বিয়ে বিচ্ছেদ।
- তাকিয়া : নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচার জন্য নিজের মতকে গোপন করা।
- তাকলিদ : অনুকরণ, অপরের মত ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করা।
- তাশরি : আইন।
- তাওয়াতুর : অবিরতভাবে ঘটা, অব্যাহত প্রামাণিক সাক্ষ্য।
- তায়াম্মুম : পানি পাওয়া না গেলে সে ক্ষেত্রে পরিষ্কার মাটি বা বালি দিয়ে ওজু করা।
- তাযকিয়াহ : সাক্ষীর বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাই করা, জেরা করা।
- সামান : ক্রয়মূল্য।
- উলুল আল আমর : কর্তৃপক্ষীয় ব্যক্তি এবং সামাজিক বিষয়ে দায়িত্বশীল।
- উম্মাহ : ইসলামে বিশ্বাসী মানব মণ্ডলী।
- উসুল আল কানুন : আধুনিক আইন শাস্ত্র।
- ওহি : অবতীর্ণ খোদায়ী বাণী।
- ওয়াজিব : বাধ্যতামূলক যা প্রায়ই ফরজের সমার্থক।
- ওয়াজিব আইনি : ব্যক্তিগতভাবে বাধ্যতামূলক।
- ওয়াজিব কেফায়ী : গোটা সমাজের সামষ্টিগতভাবে বাধ্যতামূলক।
- ওয়ালি : অভিভাবক।
- ওয়াকফ : জনকল্যাণমূলক কাজে দান।
- ওয়সফ : (বহুবচন, আওসাফ) : যোগ্যতা, গুণ, বিশেষণ।
- উইলাইয়া (এ ছাড়া, ওয়ালাইয়া) : কর্তৃত্ব, (নাবালক বা মানসিক রোগীদের) অভিভাবকত্ব।
- ওজু : পবিত্র পানি দিয়ে ওজু করা।
- যন্ন : ধারণা, সন্দেহ, আন্দাজ-অনুমান।
- যন্নী : ধারণামূলক, সন্দেহজনক।
- জাহির : প্রকাশ্য, দৃশ্যমান, স্পষ্ট।
- জিনা : ব্যাভিচার, অবৈধ যৌন মিলন।

www.pathagar.com

বিআইআইটি থেকে প্রকাশিত বইয়ের তালিকা (পার্ট - ৩)

আব্দুলহামিদ আহমদ আবুসুলাইমান *পিএইচডি* **ও প্রফেসর জেফরি লাং** *পিএইচডি*

বৈবাহিক সমস্যা ও কুরআনের সমাধান ৩০/-

আল্লামা খররুম জাহ্ মুরাদ

সুবহে সাদিক: আত্মিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের নির্দেশনা ১২০/-

মূল্যবোধ, ক্ষমতা ও সমাজ পরিবর্তন ইসলামী কর্মকৌশল ২০০/-

মারওয়ান ইবরাহীম আল-কায়সি *পিএইচডি*

ইসলামে নৈতিকতা ও আচরণ : ইসলামি আদবের দিকনির্দেশনা ১২০/-

Syed Sajjad Husain *PhD*

Civilization and Society ৩০০/-

A Young Muslim's Guide to Religions in the World ২০০/-

Shah Abdul Hannan

Social Laws of Islam ৪০/-

Md. Moniruzzaman

The Islamic Theory of Jihad and International System ২০০/-

M. Anisuzzaman ***PhD*** **& Prof. Zainul Abedin Majumder**

Leadership: Western and Islamic ৭০/-

M. Zohurul Islam ***FCA*** **(Editor)**

Islamization of Academic Discipline ২০০/-

ঘ. ইতিহাস - ঐতিহ্য

আব্দুলহামিদ আহমদ আবুসুলায়মান *পিএইচডি*

মুসলিম মানসে সংকট ১৫০/-

মুসলিম ইচ্ছা ও অনুভূতি সংকট ২২৫/-

তারিক রমাদান

মুসলিমের ইউরোপ ১৫০/-

পাশ্চাত্যের মুসলিম ও ইসলামের ভবিষ্যৎ ৩৩৫/-

ঙ. বিজ্ঞান ও সভ্যতা

এম এ কে লোদী সম্পাদীত

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুশীলনের ইসলামায়ন ১৫০/-

www.pathagar.com

ত্বাহা জাবির আল্ আলওয়ানী *পিএইচডি*

আল কুরআন ও মহাবিশ্ব : সমন্বিত ধারায় অধ্যয়ন ৭০/-

Muin-Ud-din Ahmad Khan ***PhD***

Origin and Development of Experimental Science ১২০/-

Major Md. Zakaria Kamal

Man and Universe ২০০/-

Prof. Omer Hasan Kasule Sr. ***PhD***

Medical Education : Islamic Perspective ২০০/-

Medical Ethics ৫০/-

মেডিকেল এথিক্স : ইসলামি দৃষ্টিকোণ ৬০/-

চ. সাহিত্য ও সংস্কৃতি

মালিক বদরী *পিএইচডি*

অভিচিন্তন : অনুভবের দৃশ্যময়তা ৫০/-

আব্দুলহামিদ আহমদ আবুসুলায়মান *পিএইচডি*

নির্মাতাদের দ্বীপ ১২০/-

নির্মাতাদের দ্বীপের গুপ্তধন ১২৫/-

আইআইআইটি স্টাইলশীট

লেখক, অনুবাদক ও কপি সম্পাদক গাইড ৫০/-

Poet Farruk Ahmed

Islam in Bengali Verse ১০০/-

ছ. নারী বিষয়ক

বি. আইশা লেমু ও ফাতিমা হীরেন

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী ৫০/-

আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ্

রাসুলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা ১ম খণ্ড ২৫০/-

রাসুলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা ২য় খণ্ড (সাদা ২৫০) অফসেট ⇨ ৩০০/-

রাসুলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা ৩য় খণ্ড ২০০/-

রাসুলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা ৪র্থ খণ্ড (সাদা ২৫০) অফসেট ⇨ ৩০০/-

জামাল আল বাদাবী *পিএইচডি*

ইসলামে পোশাকের বিধান ২০/-

www.pathagar.com

জ. আইন ও আইনশাস্ত্র

জাস্টিস মুহাম্মদ তাকি ওসমানি

সুন্নাহ্র আইনগত মর্যাদা ১০০/-

ঝ. ধর্মতত্ত্ব

জামাল আল বাদাবী *পিএইচডি*

ইসলামি শিক্ষা সিরিজ (একত্রে ৩ খণ্ড) ৩০০/-

ত্বাহা জাবির আল্ আলওয়ানী *পিএইচডি*

উসূলুল ফিক্হ ১২০/-

কুরআন ও সুন্নাহ : স্থান-কাল-প্রেক্ষিত ৫০/-

ইসলামের মতানৈক্য পদ্ধতি ১২০/-

ইসমাঈল রাজী আল ফারুকী *পিএইচডি*

আত-তাওহীদ : চিন্তাক্ষেত্রে ও জীবনে এর অর্থ ও তাৎপর্য ২০০/-

প্রফেসর রশীদ আহমদ জালন্ধরী *পিএইচডি*

তাফসীর সাহিত্য ও সাহিত্যিক ১০০/-

আব্দুলহামিদ আহমদ আবুসুলায়মান *পিএইচডি*

জ্ঞানের ইসলামায়ন ৩০/-

ইসলামের দন্ডবিধি ২০/-

প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী *পিএইচডি*

ইসলামে দাওয়াতের পদ্ধতি ও আধুনিক প্রেক্ষাপট ২০০/-

জ্ঞান ইসলামীকরণ : স্বরূপ ও প্রয়োগ, প্রফেসর ৩০/-

প্রফেসর ইয়াসার কানদেমীর *পিএইচডি*

শিশুতোষ ৪০ হাদিস ১২০/-

প্রফেসর বেলাল হোসেন *পিএইচডি*

তাইসীরুত তাফসীর (সুরাহ আল-হুজরাত) ২৫০/-

জেফরি লাং

আত্মসমর্পণের দ্বন্দ্ব ২৪০/-

ড. জামাল বাদি এবং ড. মুস্তাফা তাজদিন

সৃজনশীল চিন্তা : ইসলামি পরিপ্রেক্ষিত ২৩০/-

ইব্রাহিম আহমদ উমর *পিএইচডি*

জ্ঞান ও ঈমান ৮০/-

www.pathagar.com

Professor Md. Athar Ali ***PhD***
Shah Wali Allah's Concept of Ijtihad and Taqlid ২৫০/-

M. Zohurul Islam *FCA* Edited
Interfaith Relation : National & Regional Perspective ১০০/-

Editorial Board
Selections From Akram Khan's Tafsirul Qur'an ১৭৫/-

Prof. Muin-ud-Din Ahmad Khan
Islamic Revivalism ২৫০/-

Edited by : Abdun Noor & Mamtaj Uddin Ahmed
Classification and Integration of Knowledge in Islamic Epistemology ৩০০/-

Professor Israr Ahmad Khan ***PhD***
Qur'anic and Hadith : Studies Critical Reflection on Some Issues ২৩০/-

U.A.B Razia Akter Banu ***PhD***
Islam in Bangladesh ৩০০/-

ঞ. Journals (Half yearly)

Bangladesh Journal of Islamic Thought (BJIT)
$ 20.00 Individual $ 30.00 Institution, Tk. ১৫০/-
International Journal of Islamic Thought (IJITs) ২০০/-
$ 35 Individual $ 50 Institution

www.pathagar.com

Textbooks

☐ Business Studies Series

Financial Accounting : Conventional and Islamic Approach 400/-
By Prof. Dr. Md. Jahirul Hoque, Prof. Dr. Begum Ismat Ara Huq & Afzal Ahmad

Principles of Accounting : Conventional and Islamic Approach 300/-
By Md. Zohurul Islam, *FCA*

Fundamental of Finance : Conventional and Islamic Approach 300/-
By Prof. Dr. H. M. Mosarof Hossain, Kazi Md. Tarique, & Md. Mahfujur Rahman

Financial Markets and Institutions : Conventional and Islamic ... 350/-
By Prof. Dr. H. M. Mosarof Hossain & Humaira Parveen Runi

Principles of Marketing : Conventional and Islamic Approach 350/-
By Prof. Dr. Syed Rashidul Hasan, Md. Shariful Haque, Md. Mahabub Alom & Mohsina Fatema

Total Quality Management : Conventional and Islamic Approach 300/-
By Afroza Bulbul, Farhana Ferdousi & Prof. Dr. Md. Ataur Rahman

☐ Human Science Series

Reading Shakespeare from Islamic Perspective 150/-
By Prof. Dr. Sadruddin Ahmed, Ali Azgor Talukder, Mohammad Kaosar Ahmed, K. Ahmed Alam & Muhammad Tofazzel Hossain

History of Islam : Prophet Muhammad (SAAS) and Khulafae ... 250/-
By Muhammad Omor Faruq & Dr. Mahfuzur Rahman Akhanda

Development of Muslim Art and Architecture in Bangladesh 350/-
By Muhammad Ashraful Islam & Prof. Dr. M. Nurul Islam Manjur

Family Institution Social Welfare and Welfare Society 200/-
By Dr. Md. Yousuf Ali, Dr. Meer Monjur Mahmood & Md. Ayub Hossain

Communicative Arabic 200/-
By Prof. Dr. Mahfuzur Rahman, Dr. Obayedul Islam, Dr. Anwarul Kabir & Md. Kamrul Hasan

www.pathagar.com

Social Science Series

Fundamentals of Public Administration 250/-

By Prof. Dr. Begum Rokshana Mili & Dr. Amir Mohammad Nasrullah

Bengal from Partition to Partition, 1905 – 1947 250/-

By Prof. Dr. K M Mohsin

Education Series

Introduction to Value Education 200/-

By Rowshan Zannat, Mohammad Alamgheer & Prof. Dr. Md. Abdul Awal Khan

Research Methodology 250/-

By Dr. Md. Amran Hossain, Rowshan Zannat & M Abdul Aziz

Law Series

Introduction to Legal Theories 700/-

By Prof. Dr. Md. Maimul Ahsan Khan

Application of Ethics in Morals, Manners and Laws 250/-

By Prof. Dr. ABM. Mahbubul Islam & Md. Shahadat Hossain

www.pathagar.com

গ্রন্থ পরিচিতি

ইসলামি আইনের মূলনীতি (Principles of Islamic Jurisprudence) গ্রন্থটিতে মুসলিম আইনের (উসুল আল ফিকহ-এর) বিস্তারিত তাত্ত্বিক বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। একে প্রায়ই ইসলামি জ্ঞান বিজ্ঞানের সবচাইতে স্পর্শকাতর শাখা হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। ইবাদত-বন্দেগী ও ধর্মীয় আইন-কানুন যে পদ্ধতিতে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে সেসব বিষয়ই স্থান পেয়েছে মুসলিম আইনের মূলনীতিতে। মানবজাতির মধ্যে ঐক্য পুণরুদ্ধার, সমাজে ন্যায়বিচার ও পরহেজগারিতা প্রতিষ্ঠা এবং অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে মানবজাতিকে সহায়তা করার জন্য আসমানি কিতাব প্রদান করা হয়েছে। তাই প্রত্যেক সংস্কৃতিতে তা যাতে বাস্তবায়নযোগ্য হয় সেভাবেই তার ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে। অবশ্য এক্ষেত্রে কোনোভাবেই এর চেতনা ও অলংঘনীয় বিধি বিধানসমূহকে অগ্রাহ্য করা যাবে না। এ লক্ষ্য অর্জন করতে আইনি কর্তৃত্বের অতিরিক্ত যেসব উৎসকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে- মতৈক্য (ইজমা), সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া (কিয়াস), জনস্বার্থ (মাসলাহা) ও প্রচলিত রেওয়াজ (উরফ)। ইসলামি আইন সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যে ফকিহ বা ইসলামি আইন বিশেষজ্ঞগণ এর প্রয়োগের ক্ষেত্রে পাঁচটি নীতিকে সুরক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। সেগুলো হলো - জীবন রক্ষা, সম্পদ রক্ষা, বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা, বংশধারা রক্ষা এবং ধর্ম/ইমান রক্ষা।

লেখক পরিচিতি

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ হাশিম কামালী ১৯৪৪ সালে আফগানিস্তানে যে পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন আফগানিস্তানের আইন ও বিচার বিভাগে দীর্ঘদিন ধরে ওই পরিবারের কাজ করার একটি অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং পরবর্তীতে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। পরে তিনি আফগানিস্তানের বিচার মন্ত্রণালয়ে পাবলিক অ্যাটর্নি হিসেবে কাজ করেন। ড. কামালী লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলমিক ল' অ্যান্ড মিডল ইস্টার্ন স্টাডিজের ওপর ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। অতঃপর তিনি মন্ট্রিলের ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটির ইসলামিক ইনস্টিটিউটের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরের পদ অলংকৃত করেন। তিনি কানাডার 'সোসাল সায়েন্স অ্যান্ড হিউম্যানিটিজ রিসার্চ কাউন্সিলের' রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট হিসেবেও কাজ করেন। ড. কামালী ১৯৮৫ সালে ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়া (IIUM)'য় ইসলামিক ল' অ্যান্ড জুরিস্প্রুডেন্সের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। হাশিম কামালী 'ল' ইন আফগানিস্তান : এ স্ট্যাডি অব কনস্টিটিউশন্স', 'ম্যাট্রিমোনিয়াল ল' অ্যান্ড দ্য জুডিশিয়ারি' এবং 'ফ্রিডম অব এক্সপ্রেশন ইন ইসলাম' গ্রন্থের লেখক (Leiden, E.J. Brill, 1985)। বিশ্বের বিখ্যাত জার্নালগুলোতে লেখকের অনেক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

ISBN : 978-984-8471-29-6

9 789848 471296

www.pathagar.com